তাফসীরে সাঈদী
আমপারা
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

তাফসীরে সাঈদী

আমপারা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

تَـفْـسِـيْـرِ سَـعِـيْـدِىْ

তাফসীরে সাঈদী

আমপারা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ISBN-984-885-000-7

আঃ প্রঃ ৩১০

৩য় প্রকাশ (আধুঃ ১ম প্রকাশ)
মহররম ১৪২৪
চৈত্র ১৪০৯
মার্চ ২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TAFSIR-E-SAYEDEE (تفسير سعيدى) Ampara by Moulana Delawar Hossain Sayedee, Co-operated by Moulana Rafeeq bin Sayedee. Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price: Taka 200.00 Only.
Six Doller (U. S.) Only
Three pound only

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল-হাম্‌দুলিল্লাহ–সূরা ফাতিহার পরে আমপারার তাফসীর সমাপ্ত করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শোকর আদায় করছি। সেই সাথে পবিত্র কোরআনের অবশিষ্ট ২৯ পারার তাফসীর সমাপ্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'য়ালার রহমত কামনা করছি। কোরআনের তাফসীর স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– اِنَّ الْقُرْاٰنَ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا অর্থাৎ কোরআনের কতকাংশ অপর কতকাংশের তাফসীর করে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– كِتٰبَ اللّٰهِ تُبْصِرُوْنَ بِهٖ وَتَنْطِقُوْنَ بِهٖ وَتَسْمَعُوْنَ بِهٖ وَيَنْطِقُ بَعْضُهٗ بِبَعْضٍ وَيَشْهَدُ بَعْضُهٗ عَلٰى بِبَعْضٍ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এমন যে, এর দ্বারা তোমরা দেখবে, কথা বলবে ও শুনবে। এই কিতাবের কতকাংশ অপর কতকাংশের সাহায্যে কথা বলে, কতকাংশ অপর কতকাংশের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ এই কোরআন মহান আল্লাহর এক চিরন্তন ও শাশ্বত কিতাব। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–لَاتُحْصٰى عَجَائِبُهٗ وَلَاتُبْلٰى غَرَائِبُهٗ فِيْهِ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى وَمَنَارُ الْحِكْمَةِ অর্থাৎ কোরআন কোনদিন পুরাতন বা জীর্ণ হবে না, এর আশ্চর্য ধরনের বিস্ময়কারিতা কখনো শেষ হবে না, কোরআন হচ্ছে হেদায়াতের মশাল এবং এই কিতাব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক কূল-কিনারাহীন অগাধ জলধী। এর ভেতরে রয়েছে অফুরন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও অনায়ত্ব অসংখ্য দিক-দিগন্ত। মানবীয় অনুসন্ধিৎসা অফুরন্ত এই জ্ঞান-ভান্ডার থেকে নিত্য-নতুন তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম। প্রত্যেক অনুসন্ধানেই প্রতিটি যুগের সুক্ষ্ম চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ মানব জীবনের জন্য যুগোপযোগী আইন-বিধান ও তত্ত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন, যদি তাঁরা প্রতিটি পর্যায়ে অভ্রান্ত পথে দৃঢ় থাকেন।

কোরআনের তাফসীর যুগের চাহিদা পূরণ করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বলেন–اِنَّ الْقُرْاٰنَ يُفَسِّرُهُ الزَّمَانُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই কাল ও সময়ই কোরআনের ব্যাখ্যা করে। কোরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াত দিয়েই করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বিষয়টি এক আয়াতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে ভিন্ন আয়াতে সেই বিষয়টিই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এসেছে। মহান আল্লাহর রহমতে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পন্থানুসারে কোরআন দিয়েই কোরআনের তাফসীর করার চেষ্টা করে থাকি। সূরা আল-ফাতিহা ও আমপারার তাফসীরও কোরআন হাদীস দিয়েই করেছি। ভিন্ন বিষয় যা কিছু আলোচিত হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক বিষয় স্পষ্টভাবে অনুধাবনের লক্ষ্যে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ اُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ অর্থাৎ এই কোরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করবে, সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর

সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায় বিচার করবে। যে এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সে সহজ-সরল পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।'

দীর্ঘ ৪২টি বছর অতিক্রান্ত হতে চললো, আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ করে তাঁর এই গোলামকে কোরআনের কথা বলার তাওফীক দিয়েছেন। প্রায় দুই যুগ পূর্ব থেকেই আমার শুভাকাংখী মহল বিশেষ করে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর ডাইরেক্টর, প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক ও অমর শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ) কর্তৃক রচিত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন-এর অনুবাদক এবং আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হাফেজ মাওলানা মুনির উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব আমাকে তাগিদ দিয়ে আসছেন কোরআনের তাফসীর গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য। আমার মনেও প্রবল আকাংখা ছিল কোরআন থেকে যে কথাগুলো মহান আল্লাহ তাঁর এই গোলামকে বলার তাওফীক দিয়েছেন, তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু আমার নিদারুণ ব্যস্ততার কারণে মনের আকাংখাকে বাস্তবে রূপ দেয়া ইতোপূর্বে সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করে আমার শুভাকাংখী মহলের তাগিদ বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছেন। এই তাফসীর গ্রন্থে সূরাসমূহের বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে হাফেজ মাওলানা মুনির উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব কর্তৃক অনুবাদ কৃত 'কোরআন শরীফের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' থেকে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে দান করুন এর সর্বোত্তম ও যথার্থ বিনিময়।

ময়দানের বক্তব্য বহুলাংশে ময়দানেই থেকে যায়। সেক্ষেত্রে চিন্তাশীল পাঠকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ আলোচিত বিষয় স্থায়ীভাবে পৌঁছে দেয়ার মানসে শব্দধারণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে বর্ণমালায় সুন্দর ও সুপাঠ্য করে সাজিয়েছে আমার সন্তানতুল্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক আব্দুস সালাম মিতুল। শুধু শব্দ ধারণ যন্ত্রের সাহায্যই নয়-সে আমাকে ছায়ার মতোই অনুসরণ করে আমার সফর সঙ্গী হিসাবে আমার পাশে অবস্থান করে আমার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহন করে পান্ডুলিপি রচনা করেছে এবং পরবর্তীতে আমি প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করেছি।

আমার নিদারুণ ব্যস্ততা, দেশে অনুপস্থিতি ও সময়ের স্বল্পতার কারণে এই বিশাল গ্রন্থের প্রতিটি শব্দের প্রতি যতটা যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি। এ কারণে মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কোনো তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়লে তা আমাকে জানানোর জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করছি। সুতরাং, ভুল-ত্রুটি সংশোধনে যে কোন পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণীয়। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশা-আল্লাহ। অনুলিখক এবং প্রকাশকসহ গ্রন্থটির সাথে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যতটুকু যোগ থাক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল সবাইকে দান করুন এর উত্তম ও যথার্থ বিনিময়।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

আরাফাত মঞ্জিল

৯১৪, শহীদবাগ, ঢাকা

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর

তাফসীরে সাঈদী

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

ডাইরেক্টর, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

❑ আমাদের সামনে যে গ্রন্থটি রয়েছে তার নাম 'তাফসীরে সাঈদী'। নাম দেখে যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন যে, এর সাথে বিশেষ একজন ব্যক্তির নাম জড়িত আছে।

❑ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' হাতে নিয়ে যেমন আমরা বুঝতে পারি যে, এর সাথে আল্লামা ইবনে কাছীরের নাম জড়িত, 'তাফসীরে ওসমানী' নিয়ে আমরা এর অমর রচয়িতা শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদকে অনুভব করি, তেমনি 'তাফসীরে সাঈদী' দেখেও আমরা বুঝতে পারি এই গ্রন্থের সাথে জড়িত আছে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী এদেশের মানুষের প্রিয় মোফাস্‌সের আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

❑ এ বছরের প্রথম দিকের ঘটনা, 'তাফসীরে সাঈদী' প্রথম খণ্ড সূরা 'আল ফাতেহা' তখন সবে মাত্র বাজারে বেরিয়েছে। মোহ্‌তারাম মওলানা কোরআনের এই অমূল্য তোহফাটি একদিন আমার হাতে তুলে দিয়ে কেমন লাগলো-জানাতে বললেন। কোরআনের পাঠশালায় তাফসীরের একজন নগণ্য ছাত্র হওয়ার কারণে এই সুবাদে মোহ্‌তারাম মওলানার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের ভালোবাসার কারণে তার রচিত তাফসীরের প্রতি আমার আগ্রহ থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক, আর এ স্বাভাবিক আগ্রহের কারণেই বাসায় এসে তাফসীর খণ্ডটি পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে আমি নিজেই যেন স্মৃতির পাতায় হারিয়ে গেলাম......।

❑ দিন তারিখ ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে সময়টা যে ১৯৭৩ সালের শেষের দিককার হবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ আমি তখন খুলনা থেকে প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের নির্বাহী সম্পাাদক। একদিন আমার এক সহকর্মী এসে আমাকে খবর দিলেন আজ আসরের পর শহরের টুটপাড়া জামে মসজিদে একটি তাফসীর মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হবে, শহরের গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত থাকবেন। জানতে চাইলাম কোরআনের তাফসীর পেশ করবেন কে-তিনি বললেন, মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। সহকর্মী বন্ধুটি আমাকে বিশেষভাবে সেখানে হাযির থাকার অনুরোধ জানালেন। আমিও যথারীতি সে মাহ্‌ফিলে হাযির হলাম। সম্ভবত সেখানেই আমি মওলানা সাহেবকে সর্বপ্রথম দেখেছি। যদ্দুর মনে পড়ে ঘণ্টাখানেক আমি মওলানা সাহেবের মুখে কোরআনের তাফসীরও শুনেছি।

❑ গত বছর অর্থাৎ ২০০১ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে আমি ও আমার স্ত্রী বিশিষ্ট লেখিকা মোহ্‌তারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাণী নিয়ে কানাডার শিল্প নগরী টরেন্টো সফরে গিয়েছিলাম। মাহ্‌ফিল শেষে আমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জীবন্ত চেহারা দেখার জন্যে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলাম। নায়াগ্রা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট শহর আছে-নাম হ্যামিলটন, প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেখানে আমাদের কিঁছুক্ষণের যাত্রা বিরতি করার কথা। বিরতির এই পর্বে আশ-পাশ থেকে কয়জন বন্ধু-বান্ধব আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় মওলানা সাঈদী সাহেবের তাফসীর মাহফিলের প্রসঙ্গ এলো। তারা বললেন, পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের এই দূরতম শহরে অবস্থিত প্রায় সব কয়জন বাংলাদেশী কোনো না কোনোভাবে তার তাফসীর শুনেছেন। কেউ সামনে বসে, কেউ টিভির পর্দায়, কেউ অডিওর ফিতায়, কেউবা আবার ভিডিও ও সিডির স্ক্রীনে। তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কথা তারা অনেকেই প্রথম তার অডিও ভিডিও থেকেই শুনেছেন বলে আমাদের বললেন।

❑ ১৯৭৩ সালের খুলনার টুটপাড়া জামে মসজিদ থেকে ২০০১ সালে কানাডার হ্যামিলটন শহরে অবস্থিত আমার বন্ধুর ড্রয়িং রুম পর্যন্ত-সময়ের হিসেবে তা ৩ দশকের মতো, ভৌগোলিক দূরত্বে তা প্রায় ১৪ হাজার মাইল। এতো বিশাল সময় ধরে এই বিস্তৃত ভূখন্ডে কোরআনের ভুবনে যার একচ্ছত্র উপস্থিতি বিরাজমান তিনি হচ্ছেন আমাদের কালের একজন শীর্ষস্থানীয় কোরআনের মোফাস্‌সের আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

❑ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আজ মুসলিম মিল্লাতের একজন বড়ো মাপের আলেমে দ্বীন ও বাংলাদেশের একজন সুদক্ষ পার্লামেন্টারীয়ান, তার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা আজ দেশে বিদেশে অনেকের কাছেই ঈর্ষার বস্তু।

❑ ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান, ২০০০ সালে একই তাফসীরের সমাপনী অনুষ্ঠান ও সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের মহামান্য

রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিতে 'কোরআন শরীফের সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' প্রকল্পের দু'দিন ব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার এ বিপুল জনপ্রিয়তা দেখতে পেয়েছি। হাজার হাজার মানুষ কিভাবে একজন মানুষের কথা শুনার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে পারে তা শুধু বাস্তবে দেখেই অনুভব করা যায়। এই বিপুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি এসব অনুষ্ঠানে আমি একান্ত কাছে থেকে কোরআনের প্রতি তার অগাধ ভালবাসাও লক্ষ্য করেছি। একথা বলা আমার মনে হয় আজ মোটেই অসঙ্গত হবে না যে, আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্য কোনো আলেমে দ্বীন ও রাজনৈতিক নেতার ভাগ্যেই এতো জনপ্রিয়তা ও এতো পরিমাণ ভালোবাসা এক সাথে জোটেনি। এদিক থেকে নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের ইতিহাসের এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

❑ হ্যাঁ, আমি আপনাদের যে গ্রন্থের কথা বলছিলাম তা হচ্ছে 'তাফসীরে সাঈদী'। বাংলা ভাষায় তাফসীরের ক্রমিক ধারায় যার বয়েস নিতান্ত কম, সম্ভবত মাস চারেকের বেশী নয়। এই চার মাস সময়ের মধ্যেই এই গ্রন্থটির ৩টি সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। এতো স্বল্প সময়ে কোনো বইয়ের এতো বিপুল গ্রহণযোগ্যতা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের কোরআন কেন্দ্রিক সাহিত্যে একটি বিরল ঘটনা।

❑ 'তাফসীরে সাঈদী'কে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের এক সুবিন্যস্ত নির্যাস বলা যায়। তার এই বিশাল জ্ঞান কোষের সূচনা পর্ব হচ্ছে সূরা আল ফাতেহা। ৫২০ পৃষ্ঠা জুড়ে সূরা আল ফাতেহার যে বিষদ তাফসীর তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন সত্যিকার অর্থে তা শুধু তার জন্যেই মানায়। আমাদের সময়ের অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থগুলোর সাথে এর মূল্যায়ন করলে এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সহজেই একজন পাঠকের সামনে ভেসে উঠবে। একজন নিষ্ঠাবান পাঠক যখন এই তাফসীরের পাতায় কোরআনের মর্মার্থ খুঁজতে থাকবেন তখন তার মনে হবে বিজ্ঞ মোফাস্‌সের বুঝি নিজেই তার সামনে বসে তার কাছে কোরআনের দরস পেশ করছেন। মূল তাফসীরকারকের সাথে তার পাঠকের এ সরাসরি সম্পর্কের কারণেই এ তাফসীরের প্রতিটি বর্ণনাকেই পাঠকের কাছে জীবন্ত মনে হবে। সে কারণেই কোরআনে বর্ণিত দৃশ্যগুলো ও কোরআনে বর্ণিত সে দৃশ্যের চরিত্রগুলোকে এখানে আর ইতিহাসের বিষয় বলে মনে হয় না। ইতিহাসের এ বিষয়গুলোকে অতীতের ঘটনা থেকে একটি চলমান চলচিত্রে উপস্থাপন করার এ দুরূহ কাজটি এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। এটা আসলেই একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই দুঃসাধ্য কাজটি সম্পাদনের জন্যে 'তাফসীরে সাঈদী' দীর্ঘদিন ধরে এখানকার তাফসীর সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে রাখবে।

❑ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রায় ৪ দশক ধরে কোরআনের চর্চা করছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের কাছে কোরআনের তাফসীর পেশ করে আসছেন। বাংলাদেশের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের শত শত শহর বন্দরে লক্ষ লক্ষ মানুষদের সামনে তিনি কোরআনের কথা পেশ করছেন। মনে হয় আজ গোটা পৃথিবীতে এমন একটি জনপদও খুঁজে বের করা যাবে না যেখানে বাংলা ভাষাভাষী মানুষরা তার সুললিত কণ্ঠে কোরআনের তাফসীর শুনেননি, কিংবা তারা তার তাফসীরের কোনো অডিও ভিডিও দেখেননি।

❑ গত চার দশক ধরে তার লক্ষ কোটি ভক্তরা তাফসীর মাহ্‌ফিলের শুধু অডিও ভিডিও ভিসিডিই দেখে আসছেন। তারা এখন 'তাফসীরে সাঈদীর' পাতায় তাকে এক নতুন রূপে দেখতে পাবেন। যে মানুষটির কণ্ঠের সাথে তারা এতদিন ধরে পরিচিত ছিলেন তারা এখন তার তাফসীরের পাতায় পাতায় তার শানিত লেখনীর গভীর আবেদনের সাথেও পরিচিত হতে পারবেন। আমি একথা বিশ্বাস করি যে, তার যাদুময় কণ্ঠের মতো তার লেখনীও একজন পাঠককে কোরআনের প্রেমে আকৃষ্ট করতে পারবে।

❑ হাজার বছরের আমাদের তাফসীর শাস্ত্র, 'তাফসীরে তাবারী' থেকে 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এ এক সুদীর্ঘ পথ। এ পথের সর্বত্রই কোরআনের মহান তাফসীরকারকরা নিজেদের জ্ঞানদীপ্ত যোগ্যতা দ্বারা কোরআনকে মানুষের কাছে পেশ করেছেন। আরব আজম ও পূর্ব পশ্চিমে যেখানেই কোরআনের যে তাফসীরটি প্রকাশিত হয়েছে তার সবকয়টিই ছিল এক একটি নতুন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এর প্রত্যেকটি তাফসীরের রয়েছে আবার একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। আর তা হচ্ছে সে তাফসীরগুলো সে কালের প্রয়োজন পূরণ করতে পুরোপুরিই সক্ষম হয়েছে। এ কারণেই দেখা যায় কালের আবর্তনের সাথে যুগ ও জগতের প্রয়োজনকে সামনে রেখেই আমাদের তাফসীরকারকরা এগিয়ে গেছেন। কোরআনকে প্রিয় নবীর হাদীসের আলোকে বুঝার প্রয়োজনে 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' রয়েছে। 'ফেকার' প্রয়োজন পূরণের জন্যে রয়েছে 'জাওয়ামেউল আহকাম'। কোরআনের তার ভাষা ব্যাকরণের সৌন্দর্যের প্রয়োজনে রয়েছে তাফসীরে 'কাশশাফ' ও বায়যাভী'। মূলত এর সবকটিই ছিল যুগের প্রয়োজন। আবার কোরআনকে ইসলামী জীবন বিধানের আলোকে বুঝার জন্যে এসেছে 'তাফহীমূল কোরআন' ও 'তাদাব্বুরে কোরআন'। আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা ও বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কার উদ্ভাবনীর

আলোকে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের জবাবের জন্যে এসেছে সাইয়েদ কুতুব শহীদের 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'। আসলে এর প্রতিটি তাফসীরই ছিল আধুনিক, কারণ এগুলো সে যমানায় সমস্যাকে সামনে রেখেই কথা বলেছে।

❑ এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের কালে এসে পৃথিবী অতীতের সব কয়টি সময়ের চাইতে বেশী জটিল হয়ে পড়েছে। আবু জেহেল আবু লাহাবদের শেরকী আচরণকে এ কালের মোশরেকেরা বিজ্ঞান ও যুক্তির লেবাস পরিয়ে পেশ করছে, মানবীয় দর্শন ও বিজ্ঞান এদের হাতে পড়ে আজ যেন নিজেই চলার পথই হারিয়ে ফেলেছে। গোটা দুনিয়া জাহানে আজ যখন মানবীয় চিন্তা দর্শনের ভয়াবহ আকাল দেখা দিয়েছে, তখন আল্লাহর বান্দাহদের সামনে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যাকে পেশ করার জন্যে সাহসী ও যোগ্য বান্দাদের কলম নিয়ে এগিয়ে আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই। 'আমাদের কাছে 'ইবনে কাছীর' আছে, আমাদের কাছে 'তাফহীমুল কোরআন' ও 'ফী যিলালিল কোরআন' আছে, তাই আর নতুন তাফসীরের প্রয়োজন নেই'-আমি ব্যক্তিগতভবে এমন মতবাদে বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্ তায়ালা এ যমীনে মানুষদের পাঠিয়ে তার উন্নতি ও উৎকর্ষের ধারাকে স্থবির করে রাখেননি, আর রাখেননি বলেই এখানে প্রতিদিন জ্ঞান বিজ্ঞানে ও চিন্তা দর্শনে নতুন নতুন জিনিস এসে জমা হচ্ছে। আমরা যদি আজ আল্লাহ্র কোরআন দিয়ে এসব নতুন নতুন জিনিসের মোকাবেলা করতে না পারি তাহলে সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আমরাও আল্লাহর কেতাবকে বাইবেলের মতো বাস্তবতা বিবর্জিত একটি সেকেলে গ্রন্থে পরিণত করে ফেলবো।

❑ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী দেশ জাতির এক যুগ-সন্ধিক্ষণে তাফসীর লেখার কাজে হাত দিয়েছেন, এটা আমাদের জন্যে একটি আশা ও আনন্দের সংবাদ, এ কাজটি সম্ভবত তার আরো আগেই করা উচিৎ ছিলো। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' 'তাফসীর ফী যিলায়িল কোরআন' এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার সময়ই আমি তাকে এমনি একটি মৌলিক তাফসীর রচনা করতে অনুরোধ করেছিলাম, সেই থেকে গত ছয় সাত বছরে আমি তার কাছে অসংখ্যবার এই একই অনুরোধ জানিয়েছি। এক পর্যায়ে আমি তাকে আরবী কবিতার এই বিখ্যাত পংক্তিটি উল্লেখ করে বলেছি, 'মান হাফেযা শাইয়ন ফাররা, ওয়া মান কাতাবা শাইয়ান কাররা' (কেউ যদি কিছু জিনিস মুখস্ত করে রাখে, দেখা যায় কালের আবর্তনে এক সময় তা হারিয়ে যায়, আর কেউ যদি সেই জিনিসটি লিখে রাখে তাহলে তা স্থায়ীভাবে চিরদিনের জন্যে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়)। আমি যখনি এ কথাগুলো তাকে বলতাম তখন তিনি তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মৃদু হেসে নিজের অক্ষমতার কথা বলতেন, কিন্তু তার এ অসম্মতি সত্ত্বেও তার কাছ থেকে আমার এমনি ধরনের একটি কাজের প্রত্যাশা ছিল। আজ গোটা দেশ ও জাতির সাথে আমিও তার কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি তার সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যাশার মৃত্যু হতে দেননি। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আমাদের সবার দোয়া ও কামনা যে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে আজ বিশাল তাফসীর রচনায় তিনি হাত দিলেন তা অচিরেই সমাপ্তির পর্যায়ে পৌছুক, পথ যতোই দীর্ঘ হোক না কেন তার পাথেয় যদি লোভনীয় হয় তাহলে তার দূরত্ব এমনিই কমে আসে।

❑ পাঠকদের অনেকেরই উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় মোফাসসের মওলানা আবুল কালাম আযাদের বিখ্যাত তাফসীর 'তরজুমানুল কোরআন-'এর সাথে পরিচয় থাকার কথা। বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এই তাফসীরের 'উম্মুল কিতাব' নামে সূরা ফাতেহার তাফসীর প্রকাশ করেছিলেন, 'উম্মুল কিতাব' উর্দূ সাহিত্যে কোরআন গবেষণার ক্ষেত্রে এমন একটি যুগের সূচনা করেছিল যার প্রয়োজন মনে হয় সময়ের ব্যবধানে কখনো শেষ হয়ে যাবে না।

❑ এই তাফসীরের ভূমিকা লিখতে গিয়ে আল্লামা সাঈদী এক জায়গায় বলেছেন, তার মুখ থেকে সূরায়ে ফাতেহার এই তাফসীর শুনে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় প্রায় অর্ধশত লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যেখানে তার মুখের কথা শুনে অমুসলিমরা মুসলমান হলেন সেখানে তার লিখিত তাফসীর পড়ে আমরা কি খাঁটি মুসলমান হতে পারি না?

❑ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর তাফসীর থেকে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। তার এ সাধনা কোরআনের অমূল্য কীর্তিকে কাল থেকে কালান্তরে পৌছে দেবে বলে আমরা আশা করি।

❑ টলমল নদীর উচ্ছল রূপ যেমন মাঝিকে তীরের কথা ভুলিয়ে দেয় তেমনি 'তাফসীরে সাঈদী'ও আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে তার অন্যান্য প্রসঙ্গ ভুলিয়ে রেখেছিলো। তাছাড়া তার এ মহান গ্রন্থের ওপর আমি জানি আরো অনেকেই লিখবেন, আমি তো সূচনা করলাম মাত্র। আমি চেয়েছিলাম আমার এ 'সূচনা' শুধু সূচনা হয়েই থাক। ❑

সূচীপত্র

সূরা আন্-নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৭৮

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে ব্যবহৃত আন্-নাবা' শব্দটিকেই গোটা সূরার নামকরণ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সূরায় আলোচিত বিষয়াদিই স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা দাওয়াতী কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে। নবুওয়াত লাভ করার পরে আল্লাহর রাসূল দাওয়াতী কাজ শুরু করার পর পরই মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্বলিত সূরাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরাটিও ঐসব সূরাসমূহের অন্তর্গত। অর্থাৎ মক্কায় রাসূলের দাওয়াতী কাজের সূচনায় এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। যে পরিবেশে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে, তা ছিল জাহিলিয়াতের এক অন্ধকার পরিবেশ। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এই মানুষের যে সম্মান ও মর্যাদা স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দান করেছেন, সে সম্মান ও মর্যাদা তদানীন্তন পরিবেশে মানুষের ছিল না। মাতৃ জাতি নারীর মর্যাদা বা স্বীকৃত কোন অধিকার সে পরিবেশে ছিল না। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতার মুখ অন্ধকারে ছেয়ে যেতো। তারা কন্যা সন্তানকে অমর্যাদার প্রতীক হিসাবে গণ্য করতো। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে সেই নিষ্পাপ কন্যা শিশুকে জীবন্ত কবরস্থ করা হতো।

অপরের সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া কোন অপরাধের কাজ বলে বিবেচনা করা হতো না। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা প্রলয়ঙ্করী রক্তাক্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো। সে যুদ্ধ বংশ পরম্পরায় শতাব্দী কাল পর্যন্ত স্থায়ী হতো। শোষণমূলক সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে গরীবকে আরো গরীবে এবং ধনীকে আরো ধনীতে পরিণত করা হতো। রাজনৈতিক দিক থেকে চরম স্বৈরাচারী ব্যবস্থার যাঁতাকলে প্রতি মুহূর্তে মানবতা লাঞ্ছিত হচ্ছিলো। ধর্মীয় দিক থেকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকলেও সে বিশ্বাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল অংশীদারিত্বের বা শিরকের ওপরে। তারা ধারণা করতো, স্রষ্টা তার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিজের ক্ষমতায় অনেককেই অংশীদারিত্ব প্রদান করেছেন। এ জন্য তারা নানা ধরনের জড় পদার্থ এবং নশ্বর শক্তিকে শক্তির প্রতীক মনে করে তার পূজা আরাধনা করতো। এভাবে নানা ধরনের অব্যবস্থা গোটা মানবতাকে নিঃশেষে গ্রাস করেছিল। গোটা পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র মক্কায় ঠিক এমনি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে প্রেরণ করে আখিরাতের বিষয় সম্বলিত সূরাসমূহ অবতীর্ণ করে অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবমন্ডলীকে সতর্ক করলেন।

বিশাল একটি ঘরকে যদি আলোকিত করতে হয় তাহলে সে ঘরের এক কোণে নয়– ঠিক মধ্যখানে (Centre Point) আলো প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। তাহলে সমভাবে গোটা ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়বে। এভাবেই বিশ্বনবী ও কোরআনকে পৃথিবীর এমন একটি স্থানে প্রেরণ করলেন, যে স্থানটি ছিল সমস্ত মানুষের মিলন কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকেই সমস্ত মানবমন্ডলীকে কিয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করা হলো, যেন মানুষ গোলামীর সমস্ত জিঞ্জির ছিন্ন করে রাসূলের নেতৃত্বে একমাত্র আল্লাহর গোলামী করে এবং মন-মস্তিষ্কে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করে উন্নত চরিত্র সৃষ্টি করে। আর আল্লাহর রাসূলও মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ঐ কেন্দ্র থেকেই কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলেন।

এ সূরার আলোচিত বিষয় হলো কিয়ামত ও পরকাল। কিয়ামত ও পরকালে যাদের বিশ্বাস নেই বা এ সম্পর্কে যারা উদাসীন, তাদের সামনে কিয়ামত সংঘটিত হবার প্রমাণ উপস্থাপন

করে সতর্ক করা হয়েছে যে, পরকাল যে হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিয়ামত কিভাবে হবে, পরকালে অবিশ্বাসীদের পরিণতি কি হবে, এ সম্পর্কে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। পরকালের বিষয়ভিত্তিক এ সূরাটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে দ্বীনি আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস সামনে রেখে এ সূরা অধ্যয়ন করতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর রাসূল মক্কায় যখন দাওয়াতী কাজের সূচনা করেছিলেন, তখন তিনি তিনটি বিষয়কে ভিত্তি করে শুরু করেছিলেন। তার প্রথমটি ছিল তাওহীদ, দ্বিতীয়টি ছিল রেসালাত এবং তৃতীয়টি ছিল আখিরাত।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সে সমাজের মানুষগুলো আল্লাহকে অবিশ্বাস করেনি। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো এবং সেই সাথে আল্লাহর অংশীদার স্থাপন করতো। বর্তমানে যুগে এক শ্রেণীর মানুষ যেমন আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং একই সাথে এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কাছে পৌঁছতে হলে বা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে কোন মাধ্যম প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তারা কেউ কল্পিত দেব-দেবীকে স্রষ্টার কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে, কেউ বা মাজারে শায়িত মৃত মানুষকে এবং এক শ্রেণীর পীরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, বিপদ থেকে মুক্তির মাধ্যম, আশা পূরণের মাধ্যম, ধন-দৌলত দান করার মালিক মনে করে তাদের দরবারে ধর্ণা দিয়ে থাকে।

সে যুগেও বর্তমান যুগের ন্যায় একই ভাবে আল্লাহর সাথে শির্ক করা হতো। যুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য, সন্তান লাভের এবং ধন-সম্পদ লাভের আশায়, বিপদ থেকে, রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায় কল্পিত শক্তির সামনে নিজেকে নত করে দিত এবং মানুষের বানানো আইনের আনুগত্য করতো—বর্তমান যুগের মানুষ যেমন করে থাকে। এসব থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহর রাসূল অন্যান্য নবীদের ন্যায় সর্বপ্রথম তাদের প্রতি আহ্বান জানালেন, একমাত্র আল্লাহই হলেন সমস্ত শক্তির উৎস—তিনি ব্যতীত একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ নয়। তিনিই কেবল মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। সুতরাং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে, তাঁর সামনে গোলামীর মাথা নত করে দিতে হবে। তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং পূজা লাভের অধিকারী। অতএব যাবতীয় কল্পিত শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ না করে শুধুমাত্র আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মমর্পণ করতে হবে। তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাওহীদের এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে।

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি' শিরোণাম থেকে 'ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন)

মক্কায় প্রাথামিক পর্যায়ে দাওয়াতী কাজের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল রেসালাত বা রাসূলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাঁকে অনুসরণ করা। (রাসূলকে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার রচিত 'সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি' নামক পুস্তকটি পড়ুন।)

আন্দোলনের তৃতীয় যে ভিত্তি ছিল, তা হলো একদিন এই বিশাল জগৎ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ মন্ডলী, বৃক্ষ তরু-লতা, নদী-সাগর, মহাসাগর তথা সমস্ত কিছুই নিমিষে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আখিরাতের ময়দানে আল্লাহ আদালত প্রতিষ্ঠা করবেন। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মৃত মানুষকে জীবিত করা হবে এবং তারা তাদের জীবনের যাবতীয় কাজের হিসাব আল্লাহর আদালতে দিতে বাধ্য থাকবে। হিসাব-নিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে যারা একমাত্র

আল্লাহর গোলাম তথা সৎ লোক বলে বিবেচিত হবে, তারা পুরস্কার হিসাবে জান্নাত লাভ করবে এবং চির সুখের স্থান জান্নাতে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যারা আল্লাহর বিদ্রোহী বান্দা হিসাবে পরিগণিত হবে, তারা তাদের কর্মের প্রতিফল হিসাবে জাহান্নাম লাভ করবে এবং চরম যন্ত্রণাময় স্থান জাহান্নামই হবে তাদের বাসস্থান।

উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের একটিও তদানীন্তন যুগের অধিকাংশ মানুষ গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবে প্রথম ও তৃতীয় বিষয়টি গ্রহণ করতে তারা চরম কঠোরতা প্রদর্শন করলেও দ্বিতীয় বিষয়টির প্রতি দ্বীনি আন্দোলন বিরোধিদের দোদুল্যমানতা ছিল। কারণ, যে লোকটি তাদের সামনে নিজেকে আল্লাহর নবী হিসাবে পরিচয় দিচ্ছিলো, সে লোকটির দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবন তাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার ছিল। তাদের দেখা এবং পরিচিত মহলের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে উন্নত চরিত্রের লোক, আমানতদার, সত্যবাদী, বিচক্ষণ, সুস্থমতিত্ব, জ্ঞানী, পরোপকারী, আত্মীয় ও বন্ধু বৎসল, দয়ালু এবং ওয়াদা পূরণকারী আর দ্বিতীয় কোন লোক ছিল না। জীবনে কখনো অতিসতর্ক মুহূর্তেও তাঁর পবিত্র মুখ থেকে মিথ্যা একটি শব্দও নির্গত হয়নি। এমন একজন মহৎ ব্যক্তি শুধুমাত্র নবুওয়াতের ব্যাপারে মিথ্যাদাবী করবেন–এ বিষয়টি তারা মেনে নিতে পারছিল না। অপরদিকে তাঁকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত ছিল। এই বিষয়টি তাদের কাছে এক মহাসঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। না পারছিল তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করতে আর না পারছিল তাঁকে নবী বা রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে।

তাদের কাছে সবথেকে আপত্তির বিষয় ছিল পরকাল। কেননা, তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতো কিন্তু সে বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল অংশীদারিত্বের ওপরে। অপরদিকে নবুওয়াতের দাবীদার লোকটির সততার ব্যাপারেও সন্দেহ করার মতো জোরালো কোন প্রমাণ তাদের হাতে ছিল না। কিন্তু মানুষের মৃত্যুর পরে তার দেহের ওপর দিয়ে শতকোটি বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তার চিহ্ন মাত্র থাকছে না। এই মানুষকে আবার পূর্বের দেহের অবিকল আকৃতি দিয়ে জীবিত করে তার কাছ থেকে কাজের যাবতীয় হিসাব গ্রহণ করা হবে, এই সুন্দর পৃথিবী এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে, এসব বিষয় তাদের কাছে ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। পূর্বে কোনদিন না শোনা আখিরাতের বিষয়টি যখন রাসূল তাদের সামনে পেশ করলেন, তখন বিস্ময়ের ধাক্কায় তারা বিমূঢ় হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই আল্লাহ-রাসূল কর্তৃক ঘোষিত পরকালের বিষয়টিকে তারা বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করলো। পরকালের বিষয়টি তাদের জ্ঞান-বিবেকের বিপরীত বাস্তবতার দিক দিয়ে অসম্ভব মনে করে অন্যদের কাছে তারা বিষয়টিকে বিশ্বাসের অযোগ্য এবং কল্পনারও অতীত বলে প্রচার করতে থাকলো।

অপরদিকে সে সমাজের লোকদেরকে অভ্রান্ত পথের পথিক করতে হলে সর্বপ্রথম তাদেরকে পরকালে আদালতে আখিরাতে জাবাবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা রাসূলের জন্য ছিল অপরিহার্য। পরকাল হবে– এই স্বীকৃতি তাদের কাছ থেকে আদায় না করলে সত্য আর মিথ্যার ব্যাপারে অভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও পদ্ধতি গ্রহণ, উত্তম আর অধমের মানদন্ড পরিবর্তন এবং আল্লাহর গোলামী ব্যতীত অন্যের গোলামীর পথ পরিহার করে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে তাদেরকে পরিচালিত করা ছিল সম্পূর্ণ এক অসম্ভব ব্যাপার। ঠিক এসব লক্ষ্য সামনে রেখেই রাসূলের মক্কী জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সূরাসমূহে তদানীন্তন মানুষের চিন্তা-চেতনায় আখিরাত বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে দেয়ার জন্যই সর্বাধিক

প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে; এই বিষয়টির ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে মর্মস্পর্শী অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। সচেতন জনক-জননী যেমন গভীর মমতায় অবাধ্য অবুঝ সন্তানকে সঠিক পথে আনার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টায় মমতা মিশ্রিত যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বুঝাতে থাকেন, এর থেকেও শতগুণে বেশী প্রচেষ্টা পরকালের আলোচনা সম্বলিত সূরাসমূহে লক্ষ্য করা যায়।

পরকালের বিশ্বাস দৃঢ় করণের বর্ণনায় এমন সব উপমা, বর্ণনা ভঙ্গি আর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আল্লাহর একত্ব তথা তাওহীদ বিশ্বাস মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই দৃঢ়তা লাভ করতে পারে। একই সাথে এই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং পবিত্র কোরআন যে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে, এ বিষয়টিও যুক্তি ও প্রমাণের সাথে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরকাল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এত কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে তা গোটা কোরআনের একের তৃতীয়াংশ হবে। অর্থাৎ ত্রিশ পারা কোরআনের দশ পারার সমান হবে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, আল্লাহর কোরআনের একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কেন এত কথা বলা হলো ?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, মানুষকে যে স্বভাব আর প্রকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, তদুপরি ইবলিস শয়তান তাকে প্রতি মুহূর্তে অবৈধ পথ অবলম্বনের জন্য প্ররোচিত করছে, সুতরাং মানুষ কোনক্রমেই সৎ হতে পারে না। মানুষের বানানো কোন আইন দিয়েই মানুষের ভেতরের অসৎ প্রবণতার গতিরোধ করা সম্ভব নয়। বাঁধন যত তীব্র হয়–বাঁধন ছেঁড়ার তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পায়। অবৈধ পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে আইনের বাঁধন যত তীব্র হবে, এই আইনকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ পথে অগ্রসর হবার মানসিকতা ততই বৃদ্ধি পাবে। কারণ মানুষ জানে, নির্জনে একাকী কোন দুষ্কর্ম সংঘটিত করলে তা আইনের চোখে পড়বে না এবং সে সাজাও লাভ করবে না। এ জন্য মানুষের ভেতরে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যে অনুভূতিই মানুষকে নির্জনে একাকী অপরাধ করা থেকে বিরত রাখবে। আর একমাত্র পরকালের প্রতি বিশ্বাসই সে অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। একজন মানুষের চেতনায় যখন এ কথা জাগ্রত থাকবে যে, সে যা করছে এবং যা মনের গহীনে কল্পনা করছে, এসব কিছুই মহান আল্লাহর জ্ঞানের আওতায় রয়েছে এবং এসব কিছুর জবাবদিহি তাকে মৃত্যুর পরের জগতে আদালতে আখিরাতে দিয়ে পুরস্কার বা শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। তখন সে মানুষের পক্ষে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকা অতি সহজ হয়।

পরকালের জবাবদিহির এই অনুভূতি যে মানুষের ভেতরে সক্রিয় থাকে, তার পক্ষে নবীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়াও খুবই সহজ হয়। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কী জীবনে দ্বীনি আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষদের মনে পরকালের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়করণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানেও যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাওয়াতী কাজ করে থাকেন, তাঁদেরকেও রাসূলের কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে মানুষের মনে পরকালের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়করণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রচেষ্টা যখন সফল হবে, তখনই তার কাছে সরাসরি আন্দোলনের দাওয়াত পেশ করতে হবে এবং সে ব্যক্তিও কোন প্রশ্ন ব্যতীতই নিজের ধন-সম্পদ ও জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

❋

সূরা আন্ নাবা-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-৪০-রুকু-২

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿১﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿২﴾ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴿৩﴾

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿৪﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿৫﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴿৬﴾

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿৭﴾ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿৮﴾ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿৯﴾ وَّجَعَلْنَا

الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿১০﴾ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿১১﴾ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿১২﴾

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿১৩﴾ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿১৪﴾

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿১৫﴾ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿১৬﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ

مِيْقَاتًا ﴿১৭﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿১৮﴾ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ

فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿১৯﴾ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿২০﴾ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ

مِرْصَادًا ﴿২১﴾ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿২২﴾ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿২৩﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ

فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿২৪﴾ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿২৫﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿২৬﴾ اِنَّهُمْ

كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿২৭﴾ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿২৮﴾ وَكُلَّ شَىْءٍ

اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿২৯﴾ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿৩০﴾ اِنَّ

لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿৩১﴾ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿৩২﴾ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿৩৩﴾ وَّكَاْسًا

دِهَاقًا ﴿৩৪﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿৩৫﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً

حِسَابًا ﴿৩৬﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ

مِنْهُ خِطَابًا ۝ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا

مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ

اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ مَاٰبًا ۝ إِنَّا أَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۚ يَوْمَ يَنْظُرُ

الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِي كُنْتُ تُرٰبًا ۝

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) (এই জনপদের যারা অধিবাসী) তারা কোন বিষয়টি সম্পর্কে একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে ? (২) (তারা কি) সেই মহাসংবাদের ব্যাপারেই (একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে) ! (৩) (এমন একটি বিষয়ে) যাতে তারা নিজেরাও কোনো ঐকমত্য পোষণ করে না। (৪) কিন্তু এরা তো অচিরেই (সঠিক) ঘটনা জানতে পারবে, (৫) আবারও (তোমরা শুনে রাখো, কেয়ামত আসবেই এবং) অতি সত্বরই তারা (এ সম্পর্কে) জানতে পারবে। (৬) (তোমরা কি আমার সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে ভেবে দেখোনা?) আমি কি এই ভূমিকে বিছানার মতো করে তৈরী করে রাখিনি? (৭) (ভূমিকে স্থির রাখার জন্যে) আমি কি পাহাড়সমূহকে (এর গায়ে) পেরেকের মতো গেড়ে রাখিনি? (৮) (হ্যাঁ) আমিই তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি। (৯) আমি তোমাদের ঘুমকে শান্তির বাহন করে তৈরী করেছি। (১০) আমি রাতকে (তোমাদের জন্যে) আবরণ করে দিয়েছি। (১১) দিনগুলোকে জীবিকা অর্জনের (সুবিধের) জন্যে আমি (আলোকোজ্জ্বল করে) রেখেছি। (১২) আমি তোমাদের ওপর সাতটি মযবুত আসমান বানিয়েছি। (১৩) (এতে) উপস্থাপন করেছি একটি উজ্জ্বল (ও অতি উত্তপ্ত) বাতি। (১৪) আমি মেঘমালা থেকে অবিরাম বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছি, (১৫) যেন তা দিয়ে আমি শ্যামল ভূমিতে শস্যদানা উৎপাদন করতে পারি। (১৬) তরিতরকারি ও সুনিবিড় বাগবগিচা (সাজাতে পারি)। (১৭) অবশ্যই ফায়সালার একটি দিন সুনির্দিষ্ট (করে রাখা) হয়েছে।

(১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, সেদিন এই (প্রলয়ংকরী) ফুঁ'র সাথে সাথে তোমরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে। (১৯) (যখন) আসমান খুলে দেয়া হবে (তখন) তা অনেকগুলো খোলা দরজায় পরিণত হয়ে যাবে। (২০) পর্বতমালাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে তুলোর ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হবে। (২১) নিশ্চয় (সেদিন) জাহান্নাম হবে (পাপীদের জন্য) এক (গোপন) ফাঁদ। (২২) বিদ্রোহীদের জন্যে তা হবে (নিকৃষ্টতম) আবাসস্থল। (২৩) সেখানে তারা অনন্ত কাল ধরে পড়ে থাকবে। (২৪) সেখানে তারা কোনো ঠান্ডা ও পানীয় (জাতের) কিছুর স্বাদ ভোগ করবে না। (২৫) ফুটন্ত পানি, পুঁজ, দুর্গন্ধময় রক্ত, ক্ষত ছাড়া (ভিন্ন) কিছুই থাকবে না।

(২৬) (এই হচ্ছে তাদের) যথাযথ প্রতিফল, (২৭) (কারণ) এরা হিসাব-নিকাশের (এই দিন থেকে কিছুই) আশা করেনি। (২৮) (বরং) তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে।

(২৯) আমি (তাদের) যাবতীয় কর্মকান্ডের রেকর্ড সংসক্ষিত করে রেখেছি। (৩০) অতএব তোমরা (আযাব) উপভোগ করতে থাকো। (আজ) আমি তোমাদের জন্যে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি ছাড়া কিছুই করবো না।

রুকু ২

(৩১) (অপরদিকে) পরহেযগার লোকদের জন্যে রয়েছে (পরম) সাফল্য, (৩২) (তা হচ্ছে সুসজ্জিত) বাগবাগিচা, আঙ্গুর (ফলের সমারোহ) (৩৩) (আরো রয়েছে) পূর্ণ যৌবনা ও সমবয়সী সুন্দরী তরুণী–(৩৪) এবং উপচেপড়া পানপাত্র। (৩৫) এখানে তারা কোনো বাজে কথা ও মিথ্যা শুনতে পাবে না। (৩৬) তোমার মালিকের তরফ থেকে (এটা হচ্ছে) যথাযথ পরস্কার। (৩৭) (মহান আল্লাহ তা'য়ালা) যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে–তার মালিক দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা–তাঁর সামনে কেউই কথা বলার ক্ষমতা রাখে না। (৩৮) সেদিন (পরাক্রমশালী মালিকের সামনে জিররাঈল-) রূহ ও অন্যান্য ফেরেশ্তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা যাদের অনুমতি দেবেন, তারাই সেদিন শুধু কথা বলতে পারবে এবং তারা সত্য কথাই বলবে।

(৩৯) এই দিনটি (আসবে এবং তা) সত্য, কেউ ইচ্ছে করলে নিজের মালিকের কাছে নিজের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে। (৪০) আমি আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। সেদিন মানুষ দেখতে পাবে তার হাত দুটি (এ দিনের জন্যে) কী কী জিনিস পাঠিয়েছে। (এই দিনকে) অস্বীকারকারী ব্যক্তি তখন বলে উঠবে, (ধিক এমনি এক জীবনের জন্যে) হায়, কতো ভালো হতো যদি মানুষ (না হয়ে) আমি আজ মাটি হতাম !

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এ সূরার আলোচিত বিষয় শিরোণামে আমরা এ কথা আলোচনা করেছি যে, এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে জীবিত করে তাদের কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে–রাসূল যখন এ কথা তদানীন্তন মানুষগুলোর সামনে পেশ করেছিলেন, তখন তারা গভীর বিস্ময়ের সাথে এ সংবাদ শুনতো। আর মানুষের স্বভাব হলো, কোন বিষয়ে যখন তাদের ভেতরে বিস্ময় সৃষ্টি করে, তখন তা নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়ে। মক্কার অধিবাসীদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। কিয়ামতের বিষয়টিও তাদের ভেতরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হলেই তারা রাসূলের বলা কিয়ামতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতো। এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, কিয়ামত ঘটবে এ সংবাদ কি তারা ইতোপূর্বে কোন নবী-রাসূলের মুখে কখনো শোনেনি ? কেননা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন, তাঁরা সবাই তো কিয়ামতের বিষয় তাদের অনুসারীদেরকে অবগত করেছিলেন। সুতরাং পূর্ব থেকে তো কিয়ামতের বিষয়টি সে সমাজে প্রচলিত থাকার কথা।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, ইতিহাস বলে–বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বে সে সমাজে প্রায় আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম তদানীন্তন সমাজে যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তা অধিকাংশ মানুষ বিস্মৃত হলেও সে আদর্শের প্রভাব তখন পর্যন্ত সমাজে সামান্য হলেও বিদ্যমান ছিল। যে কাবাঘর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর সন্তান ও আল্লাহর নবী হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামকে সাথে করে পুনর্নির্মাণ করেন, সেই কাবাঘরের মাথায় পৌত্তলিকগণ মূর্তি স্থাপন করে। তাওহীদের অমীয় আদর্শ পৌত্তলিকতার ঘৃণ্য আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। এক সময়ে

তাওহীদের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখা গোটা আরবকে আলোকিত করেছিল, সে আলোক শিখা জোনাকীর আলোর ন্যায় মিটমিট করে জ্বলতে থাকে। মুশরিকদের শত অপচেষ্টাতেও তাওহীদের শিখা নির্বাপিত হয়নি।

তদানীন্তন সমাজের কিছু সচেতন সতর্ক দৃষ্টির অধিকারী, সত্যানুসন্ধিৎসু মানুষ ছিলেন, যারা মনে প্রাণে মূর্তিপূজা ঘৃণা করতেন। কালের মহাস্রোতে এই শ্রেণীর মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সময়ে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন, সে সময় পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব ছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শের অনুসারী বা নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসন্ধানকারীদেরকে সে সময়ে হানিফী বলা হতো।

গোটা আরবে মূর্তিপূজার প্লাবন বয়ে গেলেও এক শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব সেখানে ছিল যারা মূর্তিকে সমস্ত অন্তর দিয়ে যে শুধু ঘৃণাই করতো তা নয়-বিরোধিতাও করতো। প্রতি বছরের শেষে মূর্তিপূজকরা মূর্তির সমাবেশ ঘটাতো। এই ধরনের এক সমাবেশে জায়েদ ইবনে আমর, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, ওসমান ইবনে হুওয়াইরেস, আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ প্রমুখ বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কোরায়েশ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা। ওসমান ছিলেন আব্দুল উজ্জার নাতি, আব্দুল্লাহ ছিলেন হযরত হামজার ভাইয়ের সন্তান, জায়েদ ছিলেন হযরত ওমরের চাচা আর ওয়ারাকা ছিলেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার চাচাত ভাই। মূর্তির সমাবেশে তারা অজস্র মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করেই তাদের মনের জগতে গুঞ্জন আরম্ভ হলো-আমরা কেন নিষ্প্রাণ পাথরের সামনে নিজেদের মাথানত করি? কেন আমরা এই জড় পদার্থের আরাধনা করি? এসব কাজ তো অনর্থক! এসব পাথরের মূর্তি তো কারো কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে কেন আমরা এসবের আরাধনা করবো?

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার অনেক পূর্ব থেকেই তাঁর সাথে জায়েদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। জায়েদ মূর্তিকে ঘৃণা করে মহাসত্যের অনুসন্ধানে সে সময়ে সিরিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঐসব ধর্মে সত্যের সন্ধান পেলেন না বিধায় তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হলো না। পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন। পরিচিতদের কাছে তিনি বলতেন-আমি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শকে বিশ্বাস করি, হানিফী ধর্ম মেনে চলি।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শকে সে যুগে কেন হানিফী বলা হতো ? এ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। তবে কোরআন-হাদিস, ইতিহাস ও গবেষকদের গবেষণা থেকে যতটুকু জানা যায়, যারা সে যুগে মূর্তিপূজা বর্জন করেছিল তাদেরকে হানিফী বলা হতো। পবিত্র কোরআনেও এই হানিফী শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের বলা কথাটি মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এভাবে বলেছেন, হানিফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন-আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।

এখানে হানিফ্ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বিরত থাকার অর্থে। পবিত্র কোরআনের মুফাস্সীরদের মধ্যে এই শব্দের অর্থ নিয়ে কিছুটা মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। একদল মুফাস্সীর বলেন, হানিফী শব্দের অর্থ হলো-বর্জন করা, ত্যাগ করা বা বিরত থাকা। কারণ, আরবে যারা মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল তাদেরকে হানিফী বলা হতো।

আরেক দল মুফাস্সির বলেন, হানিফ শব্দটা সুরিয়ানী এবং ইবরানী ভাষায় কপটতার অর্থে, মোনাফেকীর অর্থে, কাফের হবার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ একদল মানুষ মূর্তির সাথে বিদ্রোহ করেছিল। সুতরাং আরবের পৌত্তলিকদের ভাষায় তারা মোনাফিক, কাফের হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে পৌত্তলিকরা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শের অনুসারীদেরকে হানিফী উপাধি দান করেছিল। সুতরাং তাওহীদের অনুসারীগণও গর্বের সাথে নিজেদেরকে হানিফী হিসাবে পরিচয় দান করতো।

হযরত আছমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন-আমি জায়েদকে দেখেছি, সে কাবাঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সমবেত কোরাইশদের লক্ষ্য করে আক্ষেপের স্বরে বলতো-হে কোরাইশের দল ! আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের আদর্শের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নেই।

তদানীন্তন আরব সমাজে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এই ধরণের অমানবিক প্রথার জায়েদই প্রথম বিরোধিতাকারী ব্যক্তি। তিনি এধরণের অনেক কন্যা সন্তানকে নিজে প্রতিপালন করেছেন। (বোখারী)

মক্কার গোত্রপতি ওতবা ছিল হযরত মোয়াবিয়ার নানা এবং উমাইয়ার মামাত ভাই। উমাইয়া দেওয়ানের অস্তিত্ব বর্তমানেও আছে। সে ছিল উঁচু স্তরের কবি। এই উমাইয়াও মূর্তি পূজার বিরোধিতা করতো। এসবের বিরোধিতা করে সে কাব্য রচনা করেছিল। বদর যুদ্ধ যখন অনুষ্ঠিত হয় সে সময়েও সে জীবিত ছিল। বদরের যুদ্ধে ওতবা নিহত হলে সে খুবই ব্যথিত হয়েছিল। কবিতার মাধ্যমে সে তাঁর শোক প্রকাশ করেছিল। বোধহয় এ কারণেই সে আল্লাহর নবীর আন্দোলনে যোগ দেয়নি।

হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল একদিন তাঁর এক সাহাবীকে নিয়ে ভ্রমণে ছিলেন। পথে উক্ত সাহাবী কবি উমাইয়ার কবিতা আবৃত্তি করলো। আল্লাহর নবী তাকে আরো উৎসাহিত করলেন কবিতা পাঠ করার জন্য । সাহাবী অনেক বড় একটা কবিতা আবৃত্তি করলেন। সমস্ত কবিতা শুনে আল্লাহর রাসূল মন্তব্য করলেন, উমাইয়া মুসলিম হবার কাছাকাছি এসেও মুসলমান হতে পারেনি। কায়েস ইবনে নুশবাহ্ নামক এক ব্যক্তি মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিল। সেই মূর্তির যুগেও সে এক আল্লাহর ওপরে বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহর রাসূল যখন দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন, তখনই সে ইসলামে শামিল হয়েছিল। আরবের বিখ্যাত বাগ্মী কায়েস ইবনে ছায়েদাল আইয়াদিও নিজেকে মূর্তিপূজা হতে বিরত রেখেছিল। এ ধরণের অনেকেই তদানীন্তন আরবে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতো। ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ মূর্তিপূজা ত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

বনী আমের ইবনে সা'সায়া বংশের একজন ব্যক্তি তাঁর নাম ছিল আন্না বিগাতুল জা'য়াদী। তিনি মূর্তি পূজার কঠোর বিরোধী ছিলেন এবং পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস করতেন। জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডের জবাব আদালতে আখেরাতে দিতে হবে তা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং মানুষের কাছে বলতেন। তিনি রোজা পালন করতেন এবং আল্লাহর কাছে তওবা করতেন।

বনী আদী ইবনে নাজ্জার বংশের সিরমা ইবনে আনাসও ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর রিরোধী। মহানবীর আগমনের পূর্বে তিনি অত্যন্ত সহজ সরলভাবে জীবন-যাপন করতেন। কোন ধরনের মাদকদ্রব্য তিনি ব্যবহার করতেন না। নিজের স্ত্রীর মাসিক হলে তিনি স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন না। স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে তিনি গোছল ফরজ হয়েছে মনে করতেন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু পরে তা গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহর কোন শরীক নেই। ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতিতে তিনি পাক-নাপাক বুঝে চলতেন।

আল্লাহর নবীর দরবারে তিনি যখন এসে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। আল্ ইস্তিয়াব, আল্ ইসাবা এবং ইবনে হিশাম নামক বিখ্যাত গ্রন্থসমূহে এ ধরনের অনেক মানুষের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিলেন। এদের ভেতরে অনেকে নামাজ আদায় করতেন। তবে কিভাবে কোন নিয়মে নামাজ আদায় করতেন তা জানা যায় না। সুতরাং ইতিহাস বলে, তদানীন্তন যুগে কিছু সংখ্যক মানুষের মনে পরকাল সম্পর্কে ধারণা ছিল বলেই তারা এ বিষয়ে মতানৈক্য করতো। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় এ সূরার তৃতীয় আয়াতে 'মুখতালিফুন' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে।

তবে এ কথাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পরকালের অস্পষ্ট ধারণা যাদের মধ্যে ছিল-তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এ জন্য আল্লাহর নবী যখন কিয়ামতের বিষয় তাদের সামনে পেশ করে বলছিলেন, 'কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং আখিরাতের ময়দানে আদালতে আখিরাতে তোমরা এই দেহ নিয়েই উত্থিত হয়ে আল্লাহর সামনে নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদিহি করবে।' তখন তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েছিল। তারা বলতো, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার যে-আমরা পচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবো। আমাদের দেহের কোন চিহ্ন থাকবে না। পুনরায় আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। (বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'বিচার দিবসের প্রতি সন্দেহ পোষণকারীদের যুক্তি' শিরোণাম থেকে 'বিচার দিবস সম্পর্কে কোরআনের যুক্তি' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে কিয়ামাতের বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে 'আনিন নাবায়িল আজিম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, মহাসংবাদ বা বড় খবর'। এ কথা দ্বারা কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। প্রশ্ন হলো, কিয়ামতের বিষয়টিকে কেন মহাসংবাদ বলা হলো? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, এই বিশাল পৃথিবী এবং এর অভ্যন্তরের সাগর-মহাসাগর, গগনচুম্বী পাহাড়-পর্বত, দূরনিলীমায় অবস্থিত নিহারিকাপুঞ্জ, গ্রহ-উপগ্রহ, গ্যালাক্সীসমূহ নিমিষে ধ্বংস স্তুপে পরিণত হবে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে শেষ মানুষটি পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ আল্লাহর আদালতের দিকে দৌড়াতে থাকবে। এই অকল্পনীয় বিষয়টিই অচিরেই চরম বাস্তবে পরিণত হবে। এ জন্যই এটাকে মহাসংবাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ গুলো যদি সংবাদ মাধ্যমে শোনে যে, আটলান্টিক মহাসাগর হঠাৎ করে ছোট্ট একটি ডোবায় পরিণত হয়েছে। এই অসম্ভব সংবাদটি যেমন বর্তমান জগতের মানুষের কাছে একটি অকল্পনীয় মহাসংবাদে পরিণত হবে, তেমিন সে যুগের মানুষের কাছেও কিয়ামতের বিষয়টি এক মহাসংবাদে পরিণত হয়েছিল।

এই বিষয়টি তাদেরকে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে, একে অপরের সাথে দেখা হলেই তারা কিয়ামতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতো এবং বিষয়টি ঘটবে কি ঘটবে না, তার সাম্ভাব্যতা নিয়ে মতভেদ করতো। তারা বলতো-

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظٰمًا وَّرُفَاتًا ءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا-

আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদের পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করে ওঠানো হবে?

তাদের এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে বলতে বললেন-

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْحَدِيْدًا-اَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ...اِلَى اخِرِالايَةِ

এদেরকে বলে দাও, তোমরা পাথর বা লোহাই হয়ে যাও অথবা তার চাইতেও বেশী কঠিন কোন জিনিস, যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনীশক্তি লাভ করার বহুদূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে ? জবাবে বলো, তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন। তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, তাহলে এটা কবে হবে ? তুমি বলে দাও, অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫০-৫১)

উল্লেখিত আয়াতে 'ইনগাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে-যার অর্থ হলো, বিদ্রূপ বা বিস্ময়ের ভঙ্গিতে মাথা ওপর নিচে ঝুকানো। এভাবে তারা মাথা ঝুকিয়ে রাসূলের সাথে কিয়ামতের বিষয়টি নিয়ে বিদ্রূপ করতো। শুধু তাই নয়, কিয়ামত হবে কি হবে না এবং হলেও তার ধরনটা কেমন হবে, এসব নিয়েও তারা পরস্পরে মতানৈক্য করতো।

এ জন্যই এ সূরার তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, এ বিষয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের উক্তিতে লিপ্ত। মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'মুখতালিফুন'। এই শব্দটি এসেছে 'ইখতিলাফনু' শব্দ থেকে। 'মুখতালিফুন' শব্দের অর্থ হলো মতভেদ সৃষ্টিকারীগণ, বিভিন্ন প্রকার বা পৃথক পৃথক।

অর্থাৎ তারা এ ব্যাপারে নানা ধরনের মতামত ব্যক্ত করতো। বিশ্বজাহানের শেষ পরিণতি কি হবে, সে সম্পর্কে তারা কোন সর্বসম্মত বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল না। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তাদের অবস্থা ছিল 'নানা মুনির নানা মত'-এর মতো। এরা কেউ ছিল খৃষ্ট মতবাদের প্রভাবে প্রভাবিত। অর্থাৎ তারা পরকালীন জীবন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল বটে, কিন্তু সে জীবন বর্তমানের মতো দৈহিক না হয়ে আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জীবন হবে বলে ধারণা করতো। দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পূর্বে নবী-রাসূলগণ পরকাল সম্পর্কে যে সঠিক চিত্র মক্কার জনগোষ্ঠীর কাছে পেশ করেছিল, তা সম্পূর্ণ ম্রিয়মান হয়ে গেলেও আবছা একটা ধারণার রেশ তাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। তবে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তারা চরম সন্দিহান ছিল। কেউ বলতো-

مَا نَدْرِىْ مَاالسَّاعَةُ-اِنْ نَّظُنُّ اِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ-

কিয়ামত কি জিনিস তা আমরা জানি না। আমরা কিছুটা ধারণা পোষণ করি মাত্র। দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের নেই। (সূরা জাসিয়া-৩২)

আবার একদল ছিল, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল বটে কিন্তু সরাসরি পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করতো। তারা দাবী করতো-

قَالُوا ائْتُوْا بِابَائِنَا اِنْكُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

(আখিরাতের ব্যাপারে) তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে দেখাও। (সূরা জাসিয়া-২৫)

আরেকটি দলের অস্তিত্ব ছিল, যারা প্রকৃতিতে বিশ্বাস করতো এবং স্পষ্ট বলতো-

مَاهِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ-

জীবন বলতে তো শুধু আমাদের পৃথিবীর এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। (সূরা জাসিয়া-২৪)

মক্কায় আরেক দল লোক ছিল যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করতো। তারা দাবী করতো- قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ-

এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণের সঞ্চার করবে কে ? (ইয়াছিন-৭৮)

এভাবে তারা পরকাল সম্পর্কে পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হতো। এদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ-اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ-يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ-

শপথ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও রূপের অধিকারী আকাশের। (পরকাল সম্পর্কে) তোমাদের কথাবার্তা পরস্পর বিভিন্ন। এটা (পরকাল) মেনে নিতে কেবল সেসব লোকই অপ্রস্তুত হয়, যে প্রকৃত সত্য হতে বিমুখ। (সূরা যারিয়াত-৭-৯)

আকাশের মেঘমালা আর নিহারিকাপুঞ্জের বাইরের দৃশ্যের নানা ধরণ হয়ে থাকে এবং এসবের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই আকাশের শপথ করে বলছেন, তোমরাও ঠিক তেমনিভাবে পরকাল সম্পর্কে নানা ধরনের কথা বলছো এবং তোমাদের একের কথা আরেকজনের থেকে ভিন্ন। তোমরা কেউ মন্তব্য করছো, এই জগৎ অনাদি অনন্ত, চিরন্তন এবং শাশ্বত-কখনো এটা ধ্বংস হবে না। এর কোন শেষ নেই। কেউ বলছো, কিয়ামত বলে কোন কিছু কোনদিন হবে না। আবার কেউ বলছো-এই বিশ্ব-ব্যবস্থা চির নতুন, নিত্য পরিবর্তনশীল এবং এক সময়ে এ পৃথিবী শেষ হয়ে যেতে পারে। তবে মানুষসহ অন্যান্য যেসব জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে, তা আর কখনো সৃষ্টি হবে না বা এসব পুনরায় সৃষ্টি করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

তোমাদের মধ্যে আবার কেউ এই ধারণা পোষণ করো যে, পুনরুজ্জীবন সম্ভব বটে কিন্তু তার প্রক্রিয়া হলো, মানুষ এই পৃথিবীতে পাপ-পুণ্য যা করে থাকে তার ফল ভোগ করার জন্য সে পুনরায় এই পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করে থাকে। কেউ বলে থাকো, পুনর্জন্ম হবে বটে তবে তার পূর্বে কর্ম অনুসারে ব্যক্তিকে জান্নাত বা জাহান্নামে যেতে হবে, তারপর সে পুনর্জনম লাভ করবে। তোমাদের কারো ধারণা হলো, এই পৃথিবীর জীবনটাই একটা শাস্তিভোগ বিশেষ আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মন-মানসিকতা পৃথিবীর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই পৃথিবীতে বারবার মৃত্যুবরণ করে এখানেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে থাকে। মানুষের প্রকৃত মুক্তি হলো তার ধ্বংস হয়ে যাবার মধ্যেই নিহিত এবং এভাবেই মানবাত্মা মহানির্বাণ লাভ করে থাকে। তোমাদের মধ্যে আরেকটি দল রয়েছে, যারা ধারণা করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেই সাথে তারা এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশে অথবা শূলের ওপর মৃত্যু দিয়ে মানুষের চিরদিনের পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং সেই পুত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার পাপ কর্মের শাস্তিভোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

আরেকটি দল তোমাদের মধ্যে রয়েছে, যারা কিয়ামত, পরকাল বা মৃত্যুর পরবর্তী দ্বিতীয় বিশ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে এবং সেই সাথে এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আমাদের পীর সাহেব বা যে মাজারে আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করে থাকি, তিনি কিয়ামতের পরে আখিরাতের ময়দানে আমাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে আমাদেরকে বিপদ মুক্ত করবেন। আমরা যে পীর বা বুযর্গের অনুসরণ করি, তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র। তিনি আল্লাহর ওপরে প্রভাব বিস্তার করে তার মুরীদদেরকে পাপের পরিণতি থেকে হেফাজত করবেন।

এ ব্যাপারেও তারা একমত হতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন মাজার বা পীরের মুরীদগণ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে থাকে। পরকাল সম্পর্কে মানুষের বক্তব্য ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা ও পরস্পরিক বৈষম্য এ কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে যে, ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে মানুষ তার নিজের ও এই সৃষ্টি জগতসমূহের শেষ পরিণতি সম্পর্কে যে মতবাদ আবিষ্কার করেছে, তা কোনক্রমেই বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয় বরং তা চরম ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। পরকাল সম্পর্কে মানুষের যদি প্রকৃত সত্য জ্ঞান থাকতো, তাহলে তাদের মতামত এতটা পরস্পর বিরোধী হতো না। মানুষের কাছে পরকাল জানার জন্য যখন সামান্যতম কোন সূত্রই নেই, তখন রেসালাতের মাধ্যমকে গ্রহণ করা ব্যতীত মানুষের কোন উপায় নেই।

পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণকারীদের বিতর্ককে কেন্দ্র মহান আল্লাহ এ **সূরার ৪ ও ৫ নং** আয়াতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, তোমরা যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক করছো, তা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা অচিরেই সেই মহাসত্যের, রূঢ়বাস্তবতার সম্মুখীন হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পরকালের পূর্ণ অবয়ব যখন তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে, তখন বুঝতে পারবে–আমার রাসূল যে ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন, তা নির্মম সত্য এবং এ ব্যাপারে তোমরা যে ধারণা পোষণ করছো, তার কোন ভিত্তি ছিল না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাহ্কে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তিনি চান না তাঁর বান্দাহ্ আদালতে আখিরাতে মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হোক। পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর বান্দাহ্ পৃথিবীতে সংযত জীবন-যাপন করে জান্নাত লাভ করুক, এ জন্য তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বান্দাহ্র সামনে কতিপয় নিদর্শনের উল্লেখ করে চিন্তার খোরাক দিয়ে বলছেন, এসব কিছু সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করলেই তো অনুভব করতে সক্ষম হবে, পরকাল হবে কি হবে না। সেই চিন্তার খোরাকগুলো রয়েছে এ **সূরার ৬ থেকে ১১ নং** আয়াতসমূহে।

এই সূরার ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়ারূপে সৃষ্টি করেছি।' মহান আল্লাহ এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তুমি তোমার নিজের দিকে এবং পৃথিবীর প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিত জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো-কিভাবে আমি সমস্ত কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আমি এমনভাবে সৃষ্টি করেছি, যা তোমরা কিছুই জানো না। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ.اِلَى اخِرِالاية

মহান পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিলোকের যাবতীয় জোড়া সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। (সূরা ইয়াছিন–৩৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মক্কায় দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত করছিলেন, তার মধ্যে প্রথমটি ছিল মহান আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা যে ধারণা পোষণ করছো, তা মারাত্মক ভুল। তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ যে এক এবং অদ্বিতীয়, উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত বিষয়টি তার পক্ষে আরো একটি অকাট্য যুক্তি। মানুষের সামনে সৃষ্টির শুরু থেকে উপস্থিত সত্যগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটিকে নিয়ে এ কথা বলা হচ্ছে যে, সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তোমরা যেসব জিনিস নিজের চোখে দেখছো এবং এসব সম্পর্কে কোন চিন্তা-গবেষণা না করে জীবন কাল অতিবাহিত করছো, এসব গুলোর মধ্যেই মহাসত্যের

সন্ধান দেয়ার মতো অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন রয়েছে। তোমরা দেখছো নারী আর পুরুষের এই যে জোড়া, এই জোড়াই তো তোমাদের জন্মের উৎস। প্রাণী জগতের বংশধারাও পুরুষ আর স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর মিলনের মাধ্যমেই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে তোমরা জানো যে, তাদের মধ্যের বিপরীত লিঙ্গের জুড়ি বাঁধার নীতি কার্যকর রয়েছে। এমনকি প্রাণহীন জড় পদার্থের মধ্যেও দেখা যায় বিভিন্ন বস্তু যখন একটি অন্যটির সাথে জোটবদ্ধ হয় তখনই এসবের ভেতর থেকে বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে।

স্বয়ং পদার্থের মৌলিক গঠন ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বৈদ্যুতিক শক্তির সংযোগেই সম্পন্ন হয়েছে। এই জোটবদ্ধতা–যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এসব সৃষ্টি প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি কুশলতার এমন সব সুক্ষ্মতা ও জটিলতা সম্পন্ন এবং তার ভেতরে প্রতিটি জোড়ায় সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের মধ্যে এমন সব যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী কোন মানুষ দৃষ্টির সামনে দৃশ্যমান ও দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্যমান একটি সৃষ্টিকেও কোন আকস্মিক ঘটনাচক্র বলে মন্তব্য করতে পারে না। আবার এ কথাও তারা বলতে পারে না যে, এসবের ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টা রয়েছে এবং এসব স্রষ্টা অসংখ্য অগণিত জোট সৃষ্টি করে এদের মধ্যে বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তা সহকারে জুটি নির্বাচিত করে দিয়েছেন। নর ও নারীর পরস্পরের জুড়ি হওয়া এবং তাদের জুড়ি হবার ফলে নবতর জিনিসের সৃষ্টি হওয়া স্বয়ং স্রষ্টার একত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও মিলন বিশ্বপ্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত বিধান এবং তা এক চিরন্তন–শ্বাশত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে। প্রতিটি প্রাণী, উদ্ভিদ ও বস্তুর মধ্যে। সৃষ্ট জীব, জন্তু ও বস্তুনিচয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার তাৎপর্য হলো, সৃষ্টির মূল রহস্য দুটো জিনিসের পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে মিলে মিশে একই মোহনায় অবস্থান করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যখনই এভাবে দুটো জিনিসের মিলন সংঘটিত হবে, তখনই সে মিলনের মধ্য থেকে তৃতীয় আরেকটি জিনিসের উদ্ভব হতে পারে। সৃষ্টিজগতের কোন একটি জিনিসও চিরন্তন এই নিয়ম ও পদ্ধতির বাইরে নয়। এর ব্যতিক্রম কোথাও দৃষ্টি গোচর হতে পারে না।

এই যে একই মোহনায় মিলন অবস্থান এবং তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা শুধুমাত্র মানবজাতি, প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদরাজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সুক্ষ্ম ও ব্যাপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোন একটি জিনিসও এ ব্যবস্থা থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমন কৌশলে রচিত ও সজ্জিত যে, এখানে সর্বত্রই পুরুষ জাতি এবং স্ত্রী জাতি। এ দুটো প্রজাতি সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে বিদ্যমান। এ দুটো প্রজাতির ভেতরে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে আকর্ষিত করছে। এ আকর্ষণের কারণেই মানুষের ভেতরে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং বিয়ের মাধ্যমে মিলিত জীবন-যাপন করে। সমস্ত প্রাণীজগতেও এ আকর্ষণ কার্যকর রয়েছে।

মানুষ এবং প্রাণীসমূহ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের কারণে একের কাছে আরেকজন যেতে পারে এবং মিলিত হতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদজগৎ তথা জড়জগতের অবস্থা ভিন্নরূপ। এসব সৃষ্টির সূচনাতে যে স্থানে অবস্থান করে, পরিসমাপ্তিতেও সেই একই স্থানে অবস্থান করে। এরা অবস্থানচ্যুত হতে পারে না। উদ্ভিদ জগতে ফুলের থেকে ফল সৃষ্টি হয়। আর এ জন্য আল্লাহ

তা'য়ালা পরাগায়নের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ফুলের প্রতিটি উর্বর পুংকেশরের মাথায় একটি করে পরাগধানী সৃষ্টি করেছেন। এই পরাগধানীর ভেতরেই পরাগরেণু উৎপাদিত করেন। নির্দিষ্ট একটি সময়ে পরাগধানী যেন ফেটে যায় এবং পরাগরেণু কীট-পতঙ্গ ও বাতাসের মাধ্যমে একই গাছের অন্য একটি ফুলের অথবা একই প্রজাতির অন্য একটি গাছের কোন একটি ফুলের গর্ভমুন্ডের সাথে যেন লেগে যায়, এ ব্যবস্থা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকেই বলা হয়েছে পরাগায়ন (Pollination)।

এ বিষয়টি কিভাবে সংঘটিত হয়, তা অবলোকন করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না দিয়েও এই একটি মাত্র বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেই আল্লাহর রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শৈল্পিক নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ কত যে বিস্ময়কর; কত যে প্রশংসামূলক, তা দেখে যেমন হতবাক হতে হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেও শেষ করা যাবে না। ফুলসমূহের চলৎশক্তি নেই; তারা চলাফেরার মাধ্যমে একটি আরেকটির সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বাতাসের মাধ্যমে, পানির মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমর, মৌমাছি ও সুদর্শন দৃষ্টি-নন্দন প্রজাপতির মাধ্যমে ফুলের পুরুষ কেশরকে স্ত্রী কেশরের সাথে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব মহান আল্লাহ সর্বভূক প্রাণী আরশোলা, তেলাপোকাকে দেননি। কারণ তাঁর বান্দারা এই ফুলের সৌরভ গ্রহণ করে, ফুল দেখতে সুন্দর আর এ জন্য ফুলের ওপর বিচরণ করে সে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন দৃষ্টি নান্দনিক প্রজাপতির ওপরে এবং মৌমাছি আর ভ্রমরের ওপরে।

কি অপূর্বদর্শন এই ভ্রমর আর প্রজাপতি। এদেরকে দেখলে মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন সাধনা করে তার দেহে অপূর্ব সৌন্দর্যের পশরা অঙ্কন করেছে। শত সহস্র প্রজাপতি; একটি প্রজাতির সাথে আরেকটি প্রজাতির রংয়ের কোন মিল নেই। আল্লাহ সুন্দর এবং ফুলও সুন্দর, এই সুন্দর ফুলগুলোর ওপরে কুৎসিত দর্শন এবং নোংরা কোন প্রাণী বিচরণ করে পরাগায়ন ঘটালে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ ক্ষুন্ন হতো। ফুলের সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহান আল্লাহ অপূর্ব সুন্দর প্রজাপতিকেই নির্বাচিত করেছেন, তারা গোটা বিশ্বব্যাপী পরাগায়ন ঘটাবে। মহান আল্লাহর রুচিবোধ যে কত সুন্দর, কত মার্জিত ও উন্নত রুচি, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ ঘটেছে।

আল্লাহর একত্বের প্রমাণ কেউ যদি পেতে চায়, কেউ যদি তাওহীদ সম্পর্কে অবগত হতে চায়, তাহলে তাকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব সৌন্দর্য আর সামঞ্জস্যতা দেখে মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হতে থাকবে-তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং এসব সৃষ্টি এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। ফুলের যে সৌন্দর্য সকালে দেখা যাচ্ছে, বিকালেই তা মলিন হয়ে যাচ্ছে। মানুষের যে সৌন্দর্য শিশু কিশোর যুবক বয়সে অবলোকন করা যাচ্ছে, তা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে সৃষ্টি ক্রমশঃ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং পুনরায় আরেকটি নতুন সৃষ্টি হচ্ছে। অলক্ষ্যে থেকে যিনি এসব কর্ম করছেন, তিনি এক এবং একক না হলে এসবের মধ্যে অবশ্যই ব্যতিক্রম দেখা যেত। যিনি বর্তমানে এসব সৃষ্টি করছেন আবার ধ্বংসও করছেন, তিনিই একদিন সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দিয়ে পরকালীন জীবন প্রতিষ্ঠিত করবেন, এসবের প্রমাণ তো গোটা সৃষ্টিজগৎ ব্যাপীই বিরাজমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সামান্য এক কাতরা পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিভাবে এবং সে মানুষের বংশ কিভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন-

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّ صِهْرًا-

আর তিনিই পানি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আবার তার থেকে বংশীয় ও শ্বশুরালয়ের দুটি ভিন্ন ধারা প্রবাহিত করেছেন। (সূরা ফুরকান-৫৪)

নগণ্য এক কাতরা পানি থেকে মানুষের মতো এত সুন্দর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি নির্মাণ করা তো আর সামান্য কৃতিত্বের বিষয় নয়। এই কৃতিত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। শুধু তাই নয়, তাঁর আরো কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি মানুষসহ অন্যান্য সৃষ্টির একটি নয় বরং দুটো প্রজাতি-নর আর নারী সৃষ্টি করেছেন। মানুষের দুটো প্রজাতি তথা নর আর নারীর মানবিক গুণাবলীর দিক দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত হলেও দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু এ পার্থক্যের কারণে এ দুটো সৃষ্টি পরস্পর বিরোধী এবং বিপরীতমুখী নয় বরং পরস্পরের সাথে এক দুর্দমনীয় আকর্ষণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জোড়ায় পরিণত হয়েছে। তারপর এ জোড়াগুলোর মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি এক অপূর্ব ভারসাম্য সহকারে পৃথিবীতে পুরুষও সৃষ্টি করছেন আবার নারীও সৃষ্টি করছেন। এসব সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র আল্লাহর ব্যতীত অন্য কোন শক্তির সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ বা অবদান নেই। এই সৃষ্টি থেকেই পুত্র এবং নাতিদের একটি ধারা চলছে, তারা অন্যের ঘর থেকে বিয়ের মাধ্যমে তাদের জুটি নিয়ে আসছে। অন্যদিকে কন্যা ও নাতনীদের আরেকটি ধরা চলছে এবং তারা অন্যের জুটি হয়ে ভিন্ন আরেকটি পরিবারে চলে যাচ্ছে। এভাবে একটি পরিবারের সাথে আরেকটি পরিবারের মিলিতি রূপের মাধ্যমে গোটা দেশ এক বংশ ও একই সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ছে।

এসব কিছুর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ এ জন্যই করা হচ্ছে যে, সহজে যেন মানুষ তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয়। কারণ এসব বিষয় মানুষকে ঐ তিনটি বিষয়ের দিকে স্পষ্ট ইশারা দিয়ে চলেছে। মানুষ দেখছে, কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা মৃত থেকে জীবিত আর জীবিত থেকে মৃত বের করে আনেন। আল্লাহ বলেন-

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ...اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

তিনি জীবিত থেকে মৃত্যুকে বের করেন এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। অনুরূপভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা থেকে) বের করে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা রূম-১৯)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতি মুহূর্তে মানুষের সামনে মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত তকে মৃত বের করে আনছেন, মৃত ভূমিকে তিনি বৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণদান তথা সজিব করছেন, সেই আল্লাহ তোমাদের মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না, এ কথা তোমরা কি করে কল্পনা করো ? তিনি প্রতিটি মুহূর্তে জীবিত মানুষ এবং প্রাণীদের মধ্য থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করছেন যেগুলোর মধ্যে জীবনের সামান্যতম গন্ধও নেই। তিনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে জীবন সঞ্চার করে অসংখ্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, অথচ যেসব উপায়-উপকরণ, উপাদান থেকে তোমাদের দৃষ্টির সামনের জীবন্ত সত্তাগুলোর শরীর গঠিত হচ্ছে তাদের মধ্যে সামান্যতমও জীবনের কোন লক্ষণ নেই। ঐ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতি মুহূর্তে তোমাদের এ দৃশ্য প্রদর্শন করছেন যে, অনুর্বর, অনুন্নত, অনাবাদী পতিত ভূমিতে বৃষ্টির সঞ্জীবনী সুধা বর্ষিত হবার সাথে সাথেই হঠাৎ করে সেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের বিপুল সমারোহ পরিলক্ষিত হয়।

এসব কিছু দেখার পরও তোমরা কি করে চিন্তা করো যে, সৃষ্টির এ কারখানা পরিচালনাকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের ইন্তেকালের পরে পুনরায় তাকে জীবিত করতে সক্ষম হবেন না ? তিনি তো সেই আল্লাহ–যাঁর প্রজ্ঞার পূর্ণতা হচ্ছে, তিনি মানুষকে শুধুমাত্র একটি জাতি সৃষ্টি করেননি বরং তাকে দুটো জাতির আকারে রূপ দান করেছেন। মানবিকতার দিক দিয়ে এই উভয় জাতি একই পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সৃষ্টির মূল ফরমুলাও একই ধরনের। কিন্তু তারা উভয়ই একের থেকে অপরের পৃথক শরীরিক গঠন, মানসিক ও আত্মিক গুণাবলী এবং আবেগ-অনুভূতি ও উদ্যোগ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে থাকে। এখানেই শেষ নয়, এই উভয় জাতির মধ্যে এমন বিস্ময়কর আকর্ষণ ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যার ফলে তারা একে অন্যের প্রেম সম্পর্কিত জোড়ায় পরিণত হয়েছে। একের শরীর, অনুভূতি এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যোগসমূহ আরেকটির শরীর, অনুভূতি ও প্রবৃত্তির চাহিদা ও দাবীসমূহ পরিপূর্ণরূপে পূরণ করতে সক্ষম। এ ছাড়াও সেই বিজ্ঞানী স্রষ্টা এই উভয় জাতির মানুষের সৃষ্টির সূচনা থেকেই বরাবর এই আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করে যাবেন।

পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এমনটি কখনো কোন দেশ বা জাতির মধ্যে ঘটেনি যে, সে দেশে বা জাতির মধ্যে শুধুমাত্র পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তানই জন্মগ্রহণ করছে। আল্লাহ যা কিছুই করছেন তা আনুপাতিক হারে এবং ভারসাম্য রক্ষা করে করছেন। এটা এমনই এক ব্যবস্থা যার ভেতরে কোন মানুষের হস্তক্ষেপ বা বুদ্ধি-কৌশল তথা নিজস্ব আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের কোন টেকনোলজি প্রয়োগের সামান্যতম কোন অবকাশ নেই। কন্যা সন্তান শুধু কন্যা সন্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর পুত্র সন্তান শুধু পুত্র সন্তানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করবে–এ ব্যাপারেও মানুষের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করার সামান্যতম কোন সুযোগ নেই। পরস্পরের জোড়া সৃষ্টির জন্য যে উপায়-উপকরণ ও অনুভূতি প্রয়োজন, তা প্রদান করে কোন প্রাণীকে পৃথিবীতে আনা হবে, এ ক্ষমতাও মানুষের নেই। নর ও নারীর সৃষ্টির যে কৌশল অগণিত বছর ধরে সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে কার্যকর থাকা নিছক কোন আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না অথবা একের অধিক স্রষ্টার কাজও হতে পারে না।

এসব কিছুই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, একজন মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টাই তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও মহাশক্তির মাধ্যমে সূচনাতে পুরুষ ও নারীর একটি সর্বাধিক সুন্দর ও উপযোগী কাঠামো নির্মাণ করেন। তারপর সে কাঠামো অনুসারে অসংখ্য পুরুষ ও নারীকে তাদের পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহকারে গোটা পৃথিবীতে ভারসাম্যমূলকভাবে একটি আনুপাতিক হারে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ......اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর সহসা তোমরা হলে মানুষ, (পৃথিবীর বুকে) ছড়িয়ে পড়েছো। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-গবেষণা করে। (সূরা আর রূম-২০-২১)

যাবতীয় সৃষ্টি কোন অপরিকল্পিত নয় এবং তা একাধিক কোন স্রষ্টার কাজও নয়। বরং একক স্রষ্টা স্বয়ং পরিকল্পিতভাবে নর ও নারী সম্পর্কে এ ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে নর তার প্রাকৃতিক দাবী নারীর কাছে এবং নারী তার প্রাকৃতিক দাবী পুরুষের কাছ থেকে লাভ করবে

এবং তারা উভয়ে পরস্পরের সাথে একই বন্ধনে আবদ্ধ থেকেই প্রশান্তি লাভ করবে। এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাকে স্রষ্টা একদিকে মানব মন্ডলীর বংশধারা অব্যাহত থাকার এবং অন্যদিকে মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অস্তিত্ব দান করার মাধ্যমে পরিণত করেছেন। যদি এ দুটো জাতিকে শুধুমাত্র দুটো পৃথক কাঠামোয় নির্মাণ করা হতো এবং তাদের মধ্যে এমন অস্থিরতা সৃষ্টি না করা হতো, যা তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক ব্যতীত প্রশান্তিতে পরিণত হতে পারতো না তাহলে সম্ভবত পশুর মতো মানুষের বংশধারাও এগিয়ে যেতো কিন্তু তাদের সাহায্যে কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব লাভের কোন সম্ভাবনাই থাকতো না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে নর ও নারীর মধ্যে পরস্পরের জন্য এমন চাহিদা, তৃষ্ণা ও অস্থিরতার অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছেন যার ফলে তারা উভয়ে মিলে একসাথে না থাকলে শান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে না। গোটা প্রাণী জগতের বিপরীতে মানব জাতির মধ্যে এটাই হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ। এ শান্তির অন্বেষাই তাদেরকে একত্রে ঘর বাঁধতে বাধ্য করে। আর এ কারণেই পরিবার ও গোষ্ঠী অস্তিত্ব লাভ করে। এরই ফলে মানুষের জীবনে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। এ বিকাশে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা অবশ্যই সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এটা তার প্রকৃত উদ্যোক্তা নয়। প্রকৃত উদ্যোক্তা হলো এই অস্থিরতা, যাকে নর ও নারীর অস্তিত্বের মধ্যে সংস্থাপিত করে তাদেরকে একই বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর বাঁধতে বাধ্য করেছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা ভাবতে পারেন যে, এ বিপুল প্রজ্ঞা প্রকৃতির অন্ধ শক্তিসমূহ থেকে হঠাৎ এমনই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা কয়েকজন স্রষ্টা কি এমন ধরনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতো, যার ফলে তারা এ গভীর জ্ঞানময় উদ্দেশ্য সামনে রেখে হাজার হাজার বছর থেকে অবিরাম অসংখ্য নর ও নারীকে এ বিশেষ অস্থিরতা সহকারে সৃষ্টি করে যেতে থাকবে? এ তো মাত্র একজন মহাজ্ঞানী স্রষ্টার সুস্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ যে এক এবং অদ্বিতীয় তার আরেকটি প্রমাণ হলো, আল্লাহর কোরআন বলছে-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ-يَهَبُ ...اِلَى اٰخِرِالْاٰيَةِ

যমীন ও আকাশের বাদশাহীর একচ্ছত্র অধিকর্তা হলেন আল্লাহ-তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম। (সূরা আশ্ শূরা-৪৯-৫০)

আল্লাহ যে এক এবং একক, সমস্ত সৃষ্টির ওপরে যে একমাত্র তারই নিরঙ্কুশ (Absolute) শাসন চলছে, এটা তারই প্রমাণ। কোন মানুষ-সে পার্থিব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের যত বড় অধিকর্তাই হোক না কেন, অন্যদের সন্তান দেয়া তো দূরের কথা নিজের জন্য নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তান জন্ম দানেও সে কখনো সক্ষম হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে নিঃসন্তান বা বন্ধ্যা করে দিয়েছেন সে কোন ওষুধ, কোন চিকিৎসা এবং কোন ঝাড়-ফুঁক বা তাবীজ-কবজ দিয়ে সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ যাকে শুধু কন্যা সন্তান দিয়েছেন সে কোনভাবেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করতে পারেনি এবং যাকে শুধু পুত্র সন্তান দিয়েছেন সে কোনভাবেই একটি কন্যা সন্তানের মুখ দেখেনি। যদি আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে অন্য কারো সামান্য কর্তৃত্ব থাকতো, তাহলে এসব ব্যাপারে অবশ্যই ব্যতিক্রম দেখা দিতো। এসব দেখে শুনেও কেউ যদি তাওহীদের প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে তার থেকে বড় হতভাগা আর

কপাল পোড়া কে হতে পারে ? এসব কপাল পোড়া হতভাগাদেরকে জিজ্ঞাসা করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন-

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ..اِلَى اخِرِالاية

তোমরা যদি এসব লোকদের জিজ্ঞেস করো, যমীন ও আকাশ কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে এরা নিজেরাই বলবে, ঐগুলো সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তা সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা বানিয়েছেন এবং সেখানে তোমাদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছেন। যাতে তোমাদের গন্তব্যস্থলের পথ খুঁজে পাও। যিনি আকাশ থেকে একটি বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছেন। তোমাদের এভাবেই একদিন মাটির ভেতর থেকে বের করে আনা হবে। তিনিই মহান সেই সত্তা যিনি সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আয্ যুখরুফ-৯-১২)

মৃত যমীনে বৃষ্টির পানি বর্ষণ করে যেমন আল্লাহ তা'য়ালা মৃত উদ্ভিদে প্রাণ দান করেন অর্থাৎ মৃত যমীন থেকে জীবিত বের করে আনেন, তেমনি এই মানুষকেও মাটি থেকেই কিয়ামতের দিন বর্তমান রূপে বের করে আনবেন। মানুষ নিজের চোখে এসব দেখছে, তবুও তার ভেতরে চিন্তা আসছে না, তাকেও একদিন আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে বের করে আনবেন এবং সেদিন তাকে সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى- اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ..اِلَى اخِرِالاية

মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে ? (তার কি কোন হিসাব হবে না এ কথা কি সে মনে করেছে ?) সে কি শুক্র রূপ নিকৃষ্টতম পানির একটি ফোঁটা ছিল না, যা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয় ? এরপর তা একটি মাংসপিন্ডে পরিণত হলো। তারপর আল্লাহ তার দেহ বানালেন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুসমান ও সংগতিপূর্ণ করে দিলেন। তারপর তা থেকে পুরুষ ও নারী দুই ধরনের মানুষ বানালেন। (এমন শক্তিধর) আল্লাহ কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন ? (সূরা আল কিয়ামাহ্-৩৬-৪০)

যারা মনে করে মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় বিশ্ব ব্যবস্থা আর প্রতিষ্ঠিত হবে না, মানুষ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে, এই পৃথিবীর জীবনই শেষ, আর কোন জীবন নেই, উল্লেখিত আয়াত তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সাম্ভাব্যতার এটাই অকাট্য প্রমাণ। মানুষ নিজের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুক সে কি ছিল। কিভাবে কোথা থেকে সে বর্তমান অস্তিত্ব লাভ করেছে। (মানুষ শুক্র থেকে মাতৃগর্ভে কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করে, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'সমস্ত প্রশংসা ঐ রব-এর' শিরোণাম পড়ুন)

প্রাথমিক শুক্রকীট থেকে সৃষ্টির সূচনা করার পর একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ বানিয়ে দেয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ মহান আল্লাহরই নিজস্ব সৃষ্টি কুশলতার অনিবার্য ফসল-এই কথা যারা মনে প্রাণে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের কাছে এই প্রমাণটির জওয়াবে বলার মত কোন কথা আর অবশিষ্ট নেই। কারণ যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন বা সৃষ্টি করেন, তিনি যে পুনরায় তার মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব দিতে পারেন, এ মহাসত্য কোন যুক্তিতেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। যারা আল্লাহর এই সৃষ্টিকে 'নিছক দুর্ঘটনা' বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, সৃষ্টির সূচনা থেকে বর্তমান

সময় পর্যন্ত পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ও জাতিতে একই ধরনের সৃষ্টি কর্মের ফলে কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের জন্ম ক্রমাগত এমন আনুপাতিক হারে সংঘটিত হয়ে চলেছে যার ফলে কোন জাতিতে বা দেশে শুধুমাত্র কন্যা বা পুত্রই জন্ম হয়নি। এমনটি হলে ভবিষ্যতে সে দেশ বা জাতির বংশধারা সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে যেতো।

সমস্ত সৃষ্টি কর্মটি শুধুমাত্র দুর্ঘটনাসঞ্জাত হলে উল্লেখিত বিষয় কিভাবে সম্ভব হচ্ছে ? এ প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা দেয়া কি কিয়ামতে অবিশ্বাসী নাস্তিকদের পক্ষে সম্ভব ? কন্যা ও পুত্রের আনুপাতিক হারে জন্মগ্রহণও কি একটা নিছক দুর্ঘটনার ফসল ? যদি তাই দাবী করা হয়, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এ দাবী অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক দাবী। এ দাবীর পেছনে কোন যুক্তি নেই। এই ধরনের দাবী একজন নিতান্ত জ্ঞানহীন, নির্লজ্জ ও দায়িত্বহীন ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব। আমাদের কাছে বর্তমানে যদি কেউ দাবী করে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মহানগরীগুলো দুর্ঘটনার ফলে গড়ে উঠেছে, তাকে যেমন উন্মাদ বলে ধরে নেয়া হবে, তেমনি কেউ যদি দাবী করে এই পৃথিবী দুর্ঘটনার ফসল, এর পেছনে কোন স্রষ্টা নেই, থাকলেও তিনি একজন নন, কিয়ামত হবে না, মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব, তাকেও উন্মাদদের দলে শামিল করা হবে।

সূরা নাবা-এর ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য ঘুমকে শান্তির বাহন করেছি।' পৃথিবীতে মানুষকে কর্মক্ষম, সচল ও কর্মোপযোগী বানিয়ে রাখার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সৃষ্টি কুশলতা সহকারে তার জন্য প্রকৃতিতে ঘুমের অমোঘ দাবী ও চাপ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তার কারণেই সে ক্রমাগত আট, দশ, বার বা ষোল ঘন্টা সময় পর্যন্ত পরিশ্রম করার পর ক্রমাগত কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আল্লাহর তা'য়ালার এই ব্যবস্থার মধ্যেও অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্যে। আল্লাহ বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ...اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে ঘুমানো এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন এমনসব মানুষের জন্য যারা (গভীর মনোযোগ সহকারে) শোনে। (সূরা আর রূম-২৩)

উল্লেখিত আয়াতে যে অনুগ্রহ সন্ধানের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো জীবিকার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম করা। মানুষ যদিও রাতের পরিবেশে ঘুমের মাঝে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এবং দিবাভাগে জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু প্রতিটি মানুষই এমনটি করে না। এমন অসংখ্য লোক রয়েছে যারা দিনে ঘুমায় আর রাতে জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম দান করে। এ জন্য সূরা রূমের এই আয়াতে রাত ও দিনকে একই সাথে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই দুটো সময়ে তোমরা ঘুমাও এবং নিজেদের জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যেও শ্রম দিয়ে থাকো।

এই যে দিন ও রাতের ঘুম এবং জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো, এটাও এমন ধরনের নিদর্শনের অন্যতম যা থেকে একজন মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টার নিখুঁত ব্যবস্থাপনার সন্ধান লাভ করা যায়। এই দিন ও রাতের বিষয়টি মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা শুধু স্রষ্টাই নন বরং তিনি নিজের সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, করুণাশীল ও মমতাসিক্ত এবং সৃষ্টির প্রয়োজন ও কল্যাণের লক্ষ্যে তিনি নানা ধরনের ব্যবস্থাও করে চলেছেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'আমি আমার সৃষ্টির প্রতি অমনোযোগী নই এবং আমার রহমত প্রতি মুহূর্তে সমস্ত সৃষ্টিকে সিক্ত করে চলেছে।'

মানুষ এই পৃথিবীতে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত পরিশ্রম করতে পারে না। বরং প্রত্যেকবার কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর তাকে কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়। এই বিশ্রামের ভেতর দিয়ে সে পুনরায় কয়েক ঘন্টা শ্রম দেয়ার শক্তি অর্জন করে। উদ্দেশ্যে মহাবিজ্ঞানী ও করুণাময় আল্লাহ মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র ক্লান্তির অনুভূতি এবং কেবলমাত্র বিশ্রামের আকাংখা সৃষ্টি করেই বিরত হননি বরং ঘুমের এমন একটি শক্তিশালী চাহিদা মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন যার ফলে মানুষের ইচ্ছা ব্যতীতই এমন কি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কয়েক ঘন্টার জাগরণ ও পরিশ্রমের পর ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। এই ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা শেষ হলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষকে ত্যাগ করে। এই ঘুমের স্বরূপ ও অবস্থা এবং মৌল কারণগুলো বর্তমান সময় পর্যন্তও মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। এটা অবশ্যই জন্মগতভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এবং সৃষ্টি কাঠামোতে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা যথাযথভাবে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে হয়ে থাকে, বিষয়টি এ কথার স্বাক্ষর বহন করে যে, পরিশ্রমের পরে বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও ঘুম কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং কোন মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা একটি নির্ভূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন।

এই নিদর্শনের মধ্যে একটি বিরাট প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও কল্যাণ এবং উদ্দেশ্যমুখীতা স্পষ্ট সক্রিয় রয়েছে। বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা ও ঘুম এ কথার সাক্ষী দেয় যে, যিনি মানুষের প্রকৃতিতে এই বাধ্যতামূলক উদ্যোগ প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি নিজেই মানুষের জন্য তার চেয়ে বেশী কল্যাণকামী। বিশ্রামের অনুভূতি ও ঘুমকে যদি তিনি বাধ্যতামূলক না করতেন, তাহলে এই মানুষ জোরপূর্বক জেগে থেকে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করে নিজের কর্মশক্তি ও প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলতো।

এরপর জীবিকা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে 'আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান' এই শব্দগুলো উল্লেখিত আয়াতে ব্যবহার করে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আরেকটি নিদর্শনের দিকে ইশারা দিয়েছেন। যদি এই পৃথিবীর ও আকাশের বিপুল ও অগণিত শক্তি সম্ভারকে জীবিকার কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করার কাজে না লাগিয়ে দেয়া হতো এবং পৃথিবীতে মানুষের জন্য জীবিকার অসংখ্য সহজ লভ্য পথ সৃষ্টি না করা হতো, তাহলে মানুষ তার বাঁচার তাগিদে জীবিকার সন্ধানই বা কোথায় করতো ? এখানেই শেষ নয় বরং জীবিকার এ অনুসন্ধান এবং অর্জন করা এমন অবস্থায়ও সম্ভব হতো না যদি এই কাজের জন্য মানুষকে সর্বাধিক উপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা না দান করা হতো। সুতরাং মানুষের মধ্যে জীবিকা অন্বেষণের যোগ্যতা এবং তার অস্তিত্বের বাইরে জীবিকার উপকরণসমূহ বিদ্যমান থাকা স্পষ্টভাবে একজন অতি করুণাময় ও মহামর্যাদাবান সত্তার অস্তিত্বের সন্ধান দিয়ে দেয় এবং এ কথাও বলে দেয় যে, স্রষ্টা মাত্র একজন এবং সমস্ত কিছুই সেই একজনের ইশারায় আনুগত্য করে যাচ্ছে।

সূরা নাবা-এর ১০ এবং ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আমি রাতকে আচ্ছাদনকারী ও দিনকে জীবিকার্জনের সময় বানিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বানিয়েছেন এ জন্য যে, এ সময় যেন তাঁর প্রিয় বান্দাহ্রা আলোর চাকচিক্য থেকে মুক্ত অবস্থায় পরম প্রশান্তির সাথে আরামদায়ক নিদ্রা উপভোগ করতে পারে। আর দিনকে আলোয় আলোকিত করেছেন এ জন্য যে, এই সময় তাঁর বান্দাহ্রা যেন ভীতিহীন চিত্তে জীবিকার্জনের লক্ষ্যে মনোসংযোগ করতে সক্ষম হয়। এই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে নিরবচ্ছিন্নভাবে দিন-রাতের আবর্তন হচ্ছে, এর মধ্যে প্রাণী জগতের জন্য অসংখ্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

কিন্তু এখানে অসংখ্য কল্যাণের মধ্য থেকে মাত্র একটি কল্যাণের দিকে ইশারা দেয়া হয়েছে এ কথা অনুভব করানোর জন্য যে, রাত ও দিনের আবর্তন–বিবর্তন কোন উদ্দেশ্যহীন বিষয় নয় এবং কোন দুর্ঘটনার মাধ্যমে এসব বিষয় সংঘটিত হচ্ছে না। এর পেছনে প্রাণী জগতের জন্য যেমন কল্যাণ নিহিত রয়েছে তেমিন স্রষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে।

স্রষ্টার সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে বান্দাহ্র জন্য বিশেষ কল্যাণ ও তার স্বার্থের সম্পর্ক রয়েছে। বান্দাহ্র অস্তিত্ব এবং দেহ সত্তার সংস্থা ও গঠন-প্রকৃতির স্বস্তি ও প্রশান্তির জন্য যে অন্ধকারের প্রয়োজন তা রাতে এবং তার জীবিকার জন্য যে আলোর প্রয়োজন তা দিনে পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা বান্দাহ্র প্রয়োজন অনুসারেই হয়ে থাকে এবং এই বিষয়টি এ কথার স্পষ্ট সাক্ষী দেয় যে, এর পেছনে একজন মহান স্রষ্টার মহাপরিকল্পনা কার্যকর রয়েছে এবং সেই স্রষ্টা মাত্র একজন। স্রষ্টা একজন না হলে সমস্ত কিছু এমন নিয়ম অনুসারে কিছুতেই সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ.....اِلَى اخِرِالايَةَ

তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, সেই সময় তোমরা শান্তি লাভ করবে এবং দিনকে উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়েছেন। এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যা (উন্মুক্ত কর্ণে নবীর আহ্বান) শুনে। (সূরা ইউনুস-৬৭)

দিন-রাতের আসা-যাওয়াও পূর্ব থেকে পৃথিবীতে দৃশ্যমান সত্যগুলোর অন্যতম। স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীতে এগুলো যথারীতি ঘটে যাচ্ছে–এ কারণে মানুষ এগুলোর প্রতি মনোসংযোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। পক্ষান্তরে দিনের আগমন কিভাবে সংঘটিত হয় এবং রাত কিভাবে একটু একটু করে দিনের আলো নির্বাপিত করে অন্ধকারে সমস্ত কিছু ঢেকে দেয়–এই যে রাত ও দিনের আসা-যাওয়ার মধ্যে কোন ধরনের বিজ্ঞতা ও মহাকৌশল সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে মানুষ যদি চিন্তা-গবেষণা করতো তাহলে সে নিজেই অনুভব করতে সক্ষম হতো যে, এসব কিছু একজন মহাশক্তিশালী ও মহাবিজ্ঞানী প্রতিপালকের অস্তিত্ব এবং তাঁর একত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। সূরা ইয়াছিনের ৩৭ থেকে ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ -نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ.....اِلَى اخِرِالايَةَ

এদের জন্য রাত হচ্ছে আরেকটি নিদর্শন। আমি তার ওপর থেকে দিনকে সরিয়ে দেই তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়। আর সূর্য, সে তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ধেয়ে চলছে। এটি প্রবল পরাক্রমশালী জ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসাব। আর চাঁদ, তার জন্য আমি মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, সেগুলো অতিক্রম করে সে শেষ পর্যন্ত আবার খেজুরের শুকনো শাখার মতো হয়ে যায়। না সূর্যের ক্ষমতা রয়েছে চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাতের ক্ষমতা রয়েছে দিনকে অতিক্রম করতে পারে, এসব কিছুই একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সন্তরণ করছে।

পৃথিবীর সামনে থেকে সূর্যের সরে না যাওয়া পর্যন্ত কখনো দিবাবসান ও রাতের আগমন ঘটতে পারে না। দিবাবসান ও রাতের আগমনের মধ্যে যে চরম নিয়মানুবর্তিতা পাওয়া যায় তা সূর্য ও পৃথিবীকে একই অপরিবর্তনশীল বিধানের আওতায় আবদ্ধ না রেখে সম্ভবপর ছিল না। তারপর এ রাত ও দিনের আসা-যাওয়ার যে গভীর সম্পর্ক পৃথিবীর সৃষ্ট প্রাণীকুলের সাথে পরিলক্ষিত হয় তা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, চরম বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোন বিজ্ঞ স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে অনুগ্রহ করে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই

পৃথিবী পৃষ্ঠে মানুষ, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব, পানি ও বাতাসের অস্তিত্ব এবং নানা ধরনের খনিজ সম্পদের অস্তিত্বও প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীকে সূর্য থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করানোর এবং তারপর পৃথিবীর নানা অংশের একটি ধারাবাহিকতা সহকারে নির্ধারিত বিরতির পর সূর্যের সামনে আসার এবং তার সামনে থেকে সরে যেতে থাকার ফসল।

যদি পৃথিবীর দূরত্ব সূর্য থেকে একটু কম বা বেশী হতো অথবা তার এক অংশে প্রতি মুহূর্তে রাত ও অন্য অংশে দিন অবস্থান করতো অথবা দিন-রাতের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত বা খুবই কম গতিসম্পন্ন হতো অথবা নিয়ম অনুসারে না ঘটে হঠাৎ কখনো দিন বা রাতের আগমন ঘটতো, তাহলে পৃথিবী কোন প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হতো না। শুধু তাই নয় বরং এ অবস্থা যদি হতো তাহলে পৃথিবীর নিষ্প্রাণ জড় পদার্থসমূহের বর্তমান আকৃতি থেকে ভিন্ন আকৃতির হতো।

এসব দেখে কোন মানুষ যদি একেবারে মূর্খ না হয় এবং অন্তরের চোখ বন্ধ করে না রাখে, তাহলে সে মানুষ এসব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন এক আল্লাহর কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে, যিনি এই পৃথিবীর বুকে এই বিশেষ ধরনের সৃষ্ট প্রাণী জগতকে অস্তিত্ব দান করার ইচ্ছে করেন এবং সৃষ্টির যথাযথ প্রয়োজন অনুসারে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধন স্থাপন করেন। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তথা তাওহীদ যারা মানতে অস্বীকার করে তারা এ কথা বলুক যে, সৃষ্টিজগতের এই বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ কয়েকজন স্রষ্টার সাথে সংশ্লিষ্ট করা অথবা কোন অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক আইনের আওতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব কিছু সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা কতটা মূর্খতার পরিচয় বহন করে?

রাত ও দিনের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগমনের অর্থ পৃথিবী ও সূর্যের ওপর একই আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্য চলছে, এখানে অন্য কারো আধিপত্য বিস্তারের সামান্যতম সুযোগ নেই। রাত আর দিনের ঘুরে ফিরে আসা এবং পৃথিবীর আর সমস্ত সৃষ্টির জন্য তা উপকারী হওয়া এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, একমাত্র আল্লাহই এসব জিনিসের স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক। তিনি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করে এমনভাবে এই ব্যবস্থা চালু করেছেন যেন তাঁর সৃষ্টির জন্য সমস্ত কিছুই কল্যাণকর হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ....اِلٰى اٰخِرِالاٰيَةُ

আল্লাহই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা রাতের পরিবেশে আরাম করতে পারো। আর দিনকে আলোকিত করেছেন। সত্য এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পাশীল। তবে অধিকাংশ লোক শুকরিয়া আদায় করে না। (মু'মিন-৬১

ভূগোল সম্পর্কে যাদের সাধারণ জ্ঞান রয়েছে তারাও এ কথা জানে যে, পৃথিবী নামক এই গ্রহের দুটো গতি রয়েছে এবং তার একটি নাম হলো আহ্নিক গতি ও অপরটির নাম হলো বার্ষিক গতি। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে আমাদের এই পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার ঘুরে আসে। আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবী নিজ অক্ষের ওপর ঘুরছে এবং এ কারণে দিন রাতের আবর্তন ও বিবর্তন হচ্ছে। এই কক্ষগতির সাথে অক্ষগতির একটা সুসামঞ্জস্য রয়েছে বলেই দিন, রাত ও ঋতুর আবর্তন হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অক্ষগতির সঠিক কারণ কি এবং তার উৎস কোথায় ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান শুধুমাত্র অনুমানলব্ধ। সম্প্রসারণশীল এই মহাবিশ্বের শাসনে বার্ষিক গতির পাশাপাশি দিন রাত আবর্তনকারী এই আহ্নিক গতি একটি মহাবিস্ময়কর বিষয়।

এই পৃথিবী যদি চাঁদের সমান হতো অথবা তার নিজস্ব ব্যাসের এক চতুর্থাংশ হতো, তাহলে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বর্তমানে যতটা রয়েছে তার এক ষষ্ঠাংশ হতো। এই ষষ্ঠাংশ শক্তি সম্পন্ন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কখনো পৃথিবীর বায়ূমন্ডলীয় পানিকে ধরে রাখতে সমর্থ হতো না। এই পৃথিবীতে মওজুদ সমস্ত পানির ভান্ডার দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতো। বাতাসের জলীয় বাষ্পমাত্রা বায়ূমন্ডলীয় বলয় থেকে বিমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী হারিয়ে ফেলতো তার তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি লাভ করতো ফলে এখানে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেত না। সূর্যের প্রাণঘাতী অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray) প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে পৌছে সমস্ত কিছু মুহূর্তে চিরকালের জন্য ভস্মীভূত করে দিতো। পৃথিবী হারিয়ে ফেলতো তার জীবন সংক্ষরণ ক্ষমতা। বর্তমান ব্যাসের দ্বিগুণ হলে বর্ধিত পৃথিবীর উপরিভাগের পরিমাণ বর্তমান ভূ-পৃষ্ঠের চারগুণ হতো।

এমন একটি অবস্থায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল বৃদ্ধি লাভ করতো বর্তমানের দ্বিগুণ যা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে সৃষ্টি করতো ৩০ পাউন্ড চাপ। মারাত্মকভাবে কমে যেত বায়ূমন্ডলের স্তরগত উচ্চতাসমূহ। এই উচ্চতা কমে যাওয়ার ফলে অনিবার্য ধ্বংসের ভয়াবহ বিভীষিকা নেমে আসতো এই পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ উল্কা এই পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে আসে। আমরা অনুভবও করতে পারিনা, আল্লাহ উর্ধ্ব জগতে যে বায়ূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তার পুরুত্ব ও ব্যাপ্তি দিয়ে পৃথিবীর প্রাণীকুল ও অন্যান্য বস্তুকে ধ্বংসকারী উল্কাপতন থেকে হেফাজত করে যাচ্ছে। পৃথিবীর আকারের বৃদ্ধি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বর্ধিত করে দিত, তাহলে নীচে নেমে আসতো বায়ূমন্ডলের এই অদৃশ্য প্রতিরোধী ব্যবস্থার বিস্তার। পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌছার পূর্বে বায়ূমন্ডলীয় ঘর্ষণে ভস্মীভূত না হয়ে উল্কাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে আঘাত হানার পথ সুগম হয়ে পড়তো। ফলে মুহূর্তে সমস্ত প্রাণী ধ্বংস স্তুপে পরিণত হতো।

এই পৃথিবী বর্তমানে সূর্য থেকে যে দুরত্বে অবস্থান করছে, এর থেকে যদি দ্বিগুণ দুরত্বে সরিয়ে নেয়া হতো তাহলে পৃথিবী বর্তমানে সূর্যের কাছ থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ লাভ করছে, তখন লাভ করতো মাত্র এক চতুর্থাংশ। এই দুরত্বের কারণে বার্ষিক গতির মাত্রা হতো বর্তমানের অর্ধেক কিন্তু অক্ষ পরিধির পরিমাপ হতো বর্তমানের দ্বিগুণ। ফলে একটি বছরের পরিমাপ হতো চারটি বছরের সমান। এতে যে ফলাফল হতো তাহলো দুরত্ব জনিত কারণে তাপমাত্রার এক মারাত্মক হ্রাসপ্রাপ্তি যা বর্তমানের এক চতুর্থাংশ অথবা তারও কম মাত্রায় পৌছে যেতো। শীত মৌসুমের ব্যাপ্তি বর্তমানের চারগুণ দীর্ঘতর হয়ে যেতো ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমস্ত প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ জমাট বদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এমনকি প্রচন্ড খরা মৌসুমে কোন একটি তরুলতাও প্রয়োজনের সময় এক বিন্দু মুক্ত পানি লাভ করতে সক্ষম হতো না।

আবার পৃথিবীর সৌর দুরত্ব বর্তমান দুরত্বের অর্ধেক হলে কক্ষপথের পরিধি নেমে আসতো অর্ধেকে কিন্তু গতিবেগ হতো দ্বিগুণ। যার ফলে বর্তমানের একটি সৌর বছর হতো মাত্র ৩ মাস দীর্ঘ। এমন অবস্থায় সূর্য থেকে আগত তাপের পরিমাণ হতো বর্তমানের চেয়ে চারগুণ অধিক। ফলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে রাত ও দিনের আবর্তনের মাধ্যমে এসব কল্যাণ তাঁর সৃষ্টির জন্য রেখেছেন। এসবের পেছনে স্রষ্টা যদি একজন না হয়ে অধিক হতো, তাহলে আবহমান কাল থেকে একই নিয়মে এসব চলতো না, ব্যতিক্রম অবশ্যই হতো। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ

করেছি যে, আল্লাহর রাসূল দ্বীনি আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন পরিচালিত করেছেন। তার প্রথমটি ছিল তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। আখিরাতের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তাওহীদের বিষয় এসব আয়াতে এ জন্য আলোচনা করা হয়েছে, যেন মানুষের মনে তাওহীদ সম্পর্কে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে।

(**এই সূরার ১২ থেকে ১৬ নং** আয়াতসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'হাম্‌দ ও তাস্‌বীহ্ শুধু আল্লাহর জন্য' শিরোণাম থেকে 'সুরক্ষিত আকাশ জগৎ' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

মানুষের সামনে দৃশ্যমান এসব নিদর্শনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ এ জন্য করা হয়েছে যে, যারা পরকাল অবিশ্বাস করে তারা নিজেদের চোখ খুলে পৃথিবীতে অবস্থিত পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, রাত দিনের আবর্তন, নিজেদের ঘুম ও জাগরণ, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ঐ বিশাল আকাশ রাজ্যের সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃষ্টিপাত এবং মৃত জমীনের সজীবতা লাভ ইত্যাদির প্রতি তাকিয়ে দেখুক, কিভাবে এগুলো সংঘটিত হচ্ছে। এসব বিষয় স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই পৃথিবী একজন স্রষ্টার পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি হয়েছে এবং কোন বিচক্ষণ মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা ব্যতীত এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। সমস্ত সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের ভেতরেই এক অদ্বিতীয় বিচক্ষণতা ও নান্দনিক সৃষ্টিকুশলতা বিদ্যমান এবং কোন সৃষ্টিই উদ্দেশ্যহীন নয়। সুতরাং যে মহাশক্তিধর স্রষ্টা দৃশ্যমান অদৃশ্যমান প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনিই একে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে দিয়ে অন্যভাবে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না, এ ধরনের কথা কেবলমাত্র মূর্খ আর অর্বাচীনই উচ্চারণ করতে পারে।

(**এই সূরার ১৭ নং থেকে ২০ নং** আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'যিনি বিচার দিবসের মালিক' শিরোণাম থেকে 'বিচার দিবসে মানুষকে এককভাবে জবাবদিহি করতে হবে' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন)

২১ নং আয়াত থেকে ২৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে জাহান্নাম একটি ঘাঁটি বিশেষ এবং এই স্থানটি তাদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, যারা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে আল্লাহদ্রোহী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং তারা সেখানে যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা পানের উপযোগী কোন পানীয় লাভ করবে না, যা কিছু পান করবে তাহলো উত্তপ্ত পানি এবং ক্ষতের ক্ষরণ। এটা তাদের কর্মফল। বিচার দিবসের প্রতি তাদের কোন বিশ্বাস ছিল না এবং তারা আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা মনে করতো।

শিকার ধরার জন্য নির্মিত কোন বিশেষ স্থানকেই ঘাঁটি বলা হয়। আরবী 'রাছাদ' শব্দ থেকে 'মিরছাদ' শব্দ এসেছে এবং এর অর্থ হলো ঘাঁটি। প্রশ্ন হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামকে ঘাঁটি কেন বলেছেন?

জাহান্নামকে এ জন্যই ঘাঁটি বলা হয়েছে যে, তা শিকার ধরার জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে এবং জাহান্নামের শিকার হবে তারাই যারা এই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান নিজেরাও অনুসরণ করেনি এবং অন্যকেও অনুসরণ করতে বাধার সৃষ্টি করেছে। পরিবার, সমাজ ও দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার ফলে সাধারণ মানুষ ইচ্ছে থাকার পরও আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে পারেনি। বিপুল সংখ্যক অনুসারী লাভ করেছে কিন্তু অনুসারীদেরকে কখনো আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করেনি। পরিবার, সমাজ ও দেশের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়েও অধীনস্থদেরকে কখনো আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান করেনি। যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত

করার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করেছে, তাদেরকে মিথ্যা অজুহাতে কারারুদ্ধ করেছে। তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। জাতির সামনে তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে নানা ধরনের কূটজাল বিস্তার করেছে।

পরকালে অবিশ্বাসী এসব দাম্ভিক লোকজন আল্লাহ বিরোধী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্রমশঃ জাহান্নাম নামক সেই ঘাঁটির দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে। আল্লাহর ক্রোধ উদ্রেককারী কর্মকান্ড এরা করতে থাকে আর এসব কর্মের কারণে শয়তান প্রকৃতির এক শ্রেণীর লোকজন এদের প্রশংসা করে। এসব অর্বাচীনরা আরো প্রশংসা এবং অর্থের লালসায় আল্লাহ বিরোধী কর্মকান্ডে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে থাকে। তাদের মনের গহীনে কখনো এ চিন্তার উদ্রেক হয় না যে, এসব কর্ম আল্লাহর ক্রোধ সৃষ্টি করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে–বর্তমান পৃথিবীতে যারা চলচ্চিত্রে নগ্ন ভূমিকায় অভিনয় করছে তাদের নোংরামি দেখে শয়তান প্রকৃতির লোকজন ভূয়সী প্রশংসা করে থাকে এবং তারা এ ক্ষেত্রে প্রভূত অর্থও লাভ করে থাকে। এই অর্থ আর প্রশংসা এসব অভিনেতা আর অভিনেত্রীদেরকে নগ্নতার শেষ স্তরে পৌঁছে দেয় অর্থাৎ জাহান্নামের নিকটতর করে দেয়।

এরা অনুভবও করতে পারে না, তারা জাহান্নামের কতটা কাছে এসে পৌঁছেছে। এভাবে আল্লাহদ্রোহী লোকজন একটু একটু করে নিজ কর্মের মাধ্যমে সেই ভয়ঙ্কর ঘাঁটি–জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তারপর পৃথিবীর জীবনকাল শেষ হবার পরে তাদের আবাসস্থল হয় জাহান্নাম এবং তারা হঠাৎ করেই সেই ঘাঁটিতে ধরা পড়ে যায়, যে ঘাঁটি সম্পর্কে পৃথিবীর জীবনে তারা উদাসীন ছিল। এখানে তারা কতদিন অবস্থান করবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে 'ফিহা আহ্কাবা' অর্থাৎ জাহান্নামের ভেতরে একটার পরে আরেকটা যুগ শেষ হতে থাকবে এবং সেটা এমন যুগ, যা কখনো শেষ হবে না। আল্লাহর কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا .....اِلَى اخِرِالاية

ভালো করে জেনে রাখো, যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, গোটা পৃথিবীর ধন-সম্পদও যদি তাদের করায়ত্ত হয় এবং তার সাথে সম পরিমাণ সম্পদ আরো একত্র করে দেয়া হয় আর তারা যদি তা ফিদিয়া হিসাবে দিয়ে কিয়ামত দিনের আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তবুও তা তাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না, তারা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে বাধ্য। তারা জাহান্নামের অগ্নি-গহ্বর থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু তা থেকে তারা বের হতে পারবে না। তাদের জন্য স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট করা হবে। (সূরা মায়িদা-৩৬-৩৭)

আল্লাহদ্রোহী হিসাবে যারা পরিচিতি লাভ করেছে, তারা কখনোই জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে না। জান্নাতীরা জান্নাতে যেমন চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহবিদ্রোহীরা তেমনি জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। জাহান্নামে একটি যুগ অতিবাহিত হতে না হতেই আরেকটি নতুন যুগের সূচনা হবে। এভাবে একের পর এক চলতেই থাকবে। আল্লাহর কোরআনে এই বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য কোথাও আহ্কাব শব্দ, কোথাও খুলুদ শব্দ আবার কোথাও আবাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হলো চিরকাল। জাহান্নাম নামক সেই ভয়ংকর স্থানটা হচ্ছে বিচিত্র রকমের অসহনীয় যন্ত্রণার বিশাল বিভিষীকাময় অগ্নিদীপ্ত কারাগার। এর মধ্যেকার আযাবের কারণে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি মানবদেহের মধ্যে অবস্থিত হৃদপিন্ড, নাড়ীভূড়ি, শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা ইত্যাদীর বিকৃতি ঘটবে। সেখান হতে

মুক্তি পাবার বা পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ নেই। ওই জাহান্নামে আযাবের কারণে কোনদিন মৃত্যু হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمَاأَدْرٰكَ مَا سَقَرُ-لَاتُبْقِىْ وَلَاتَذَرُ-لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ-

আর তুমি কি জানো, জাহান্নাম কি? তা শান্তিতেও থাকতে দেয়না আবার ছেড়েও দেয় না। চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। (সূরা মুদ্দাচ্ছির-২৭)

পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। জাহান্নামেও আল্লাহর বিধান অমান্যকারীগণ বর্ণনাতীত কষ্ট পাবে। কিন্তু সেখানে তাদের কারো মৃত্যু হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

জাহান্নামে মৃত্যু বলে কিছু থাকবে না। কোরআন বলছে, (জাহান্নামে) সে মরবেও না আবার জীবিতও থাকবে না। (সূরা আ'লা-১৩)

সেদিন জাহান্নাম প্রচন্ড ক্রোধে যেন ফেটে পড়তে চাইবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ......اِلٰى اخِرِالاٰيَةُ

তারা (অপরাধীগণ) যখন সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন (জাহান্নামের) ক্ষিপ্রতার তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে। এবং (জাহান্নামের আগুন) উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ আক্রোশে এমন অবস্থা ধারণ করবে যে মনে হবে প্রচন্ড ক্রোধে তা ফেটে পড়বে। (সূরায়ে মুলক-৭-৮)

হাশরের ময়দানে অপরাধীদেরকে দেখে জাহান্নাম প্রচন্ড আক্রোশে গর্জন করতে থাকবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا ......اِلٰى اخِرِالاٰيَةُ

জাহান্নাম যখন দূর হতে তাদেরকে (অপরাধীদেরকে) দেখতে পাবে তখন তারা (পাপীগণ) তার (জাহান্নামের) ক্রোধ ও তেজস্বী গর্জন শুনতে পাবে। আর যখন তাদেরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে কেবল মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। (ফুরকান- ১২-১৩)

জাহান্নাম অপরাধীদের যন্ত্রণাময় বাসস্থান। কিন্তু এরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোরআন বলছে-

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ-لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ

জাহান্নামের সাতটি দরোজা (স্তর) আছে। প্রত্যেকটি দরোজার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নির্ধারিত আছে। (সূরায়ে হিজর-৪৪)

অকল্পনীয় যন্ত্রণাদায়ক একটি বিশাল এলাকা নিয়ে জাহান্নাম গঠিত। যেখানে অপরাধের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শাস্তির জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা এলাকা নির্ধারিত আছে। এ সমস্ত এলাকা সাত ভাগে বিভক্ত। যথা—হাবিয়া, জাহীম, সাকার, লাযা, সাঈর, হুতামাহ্ , জাহান্নাম।

পৃথিবীতে পাপীদের শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। সবার পাপ এক ধরনের নয়। চুরির দায়ে কেউ খুনের আসামীর প্রাপ্য শাস্তি পেতে পারে না। মিথ্যা কথা বলার দায়ে কেই মদ পানকারীর প্রাপ্য শাস্তি পেতে পারে না। সেহেতু জাহান্নামের সাতটি স্তরে পাপীদের পাপের ধরণ অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করেছে, দ্বীনি আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, তাদের জন্যই জাহান্নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ-مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ-

প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, সৎপথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, সীমালংঘনকারী এবং দ্বীনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী। (সূরা কাফ-২৪-২৫)

যে সমস্ত কারণে এক শ্রেণীর মানুষকে জাহান্নামে পাঠিয়ে কঠোর আযাব দেয়া হবে, কোরআন ও হাদীস মনোযোগ দিয়ে অধ্যায়ন করলে তার প্রধান প্রধান কারণ জানা যায়। অর্থাৎ জাহান্নামীদের প্রধান প্রধান অপরাধ সম্পর্কে জানা যায়। যেমন-আল্লাহ যে সমস্ত নবী ও রাসূলকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছিলেন, সেই জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহন করতে অস্বীকার করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা। নবী ও রাসূলদের অবর্তমানে যারা অন্যদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে ডাকে, তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ ও শত্রুতা করা। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অনুগ্রহে জীবিত থেকে তাঁর দেয়া নে'মাত ভোগ করেও তাঁর শুকরিয়া আদায় না করে অকৃতজ্ঞ হওয়া। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা নিজে গ্রহণ না করে অপরকে গ্রহণ করতে না দেয়া, অপরকে পথভ্রষ্ট করা, ইসলামী আইন যাতে চালু হতে না পারে সেই চেষ্টা করা। আল্লাহ যে ধন সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ না করা ও মানুষের হক আদায় না করা। জীবনে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করা অর্থাৎ আল্লাহর আই মেনে না চলা। অন্যের প্রতি অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার করা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা। অন্যের মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করা। আল্লাহর সাথে শরীক করা। যা দেয়ার ক্ষমতা শুধু মাত্র আল্লাহর; তা আল্লাহর কাছে না চেয়ে অন্যের কাছে চাওয়া। ইসলামের নামে ভন্ডামী করা। অন্যায় কাজে সাহায্য করা। আল্লাহকে বেশী ভয় না করে মানুষকে বেশী ভয় করা। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্বেও সমাজে দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করা। নিজের সুবিধা অনুযায়ী ইসলামের কিছু আইন মেনে চলা ও কিছু আইন না মানা।

সেদিন অপরাধীদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে তখন জাহান্নামের দ্বার রক্ষী প্রশ্ন করবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا-حَتّٰى اِذَا .....اِلَى اخِرِالاية

অবিশ্বাসী কাফেরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। জাহান্নামের রক্ষক দ্বার খুলে দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে-তোমাদের নিকট কি আল্লাহর রসূলগণ তাঁদের প্রভূর আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনায়নি? তোমরা যে এদিনের সম্মুখীন হবে সে সম্পর্কে তারা কি তোমাদেরকে সর্তক করে দেয়নি? অপরাধীগণ উত্তরে বলবে-হ্যাঁ, তাঁরা সবই তো করেছেন। কিন্তু কাফেরদের জন্যে শাস্তির যে ওয়াদা করা হয়েছিল, সেদিন তা পূর্ণ করা হবে। তারপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করো। অহংকারী কাফেরদের জন্য ভয়ানক গর্হিত স্থান এ জাহান্নাম। আর এখানেই তাদেরকে থাকতে হবে চিরকাল। (সূরা যুমার-৭১-৭২)

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ঘোষণা করছে–

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ-وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

যে সব লোক তাদের অস্বীকার ও অমান্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তা মুলতঃ অত্যন্ত ভয়ংকর আবাসস্থল। (সূরা মুলক–৬)

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ ...اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

যারা কুফুরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে, তাদের উপরে আল্লাহর অভিশাপ, ফেরেশ্‌তাদের ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। এ অবস্থায় তারা (জাহান্নামে) অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাদের শাস্তি কমানোও হবে না অথবা অন্য কোন অবকাশও দেয়া হবে না। (সূরা বাকারা– ১৬১-১৬২)

আল্লাহর নাজিল করা কিতাব পবিত্র কোরআনের সূরা দাহ্‌রে বলা হয়েছে–

اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلاً وَّاَغْلٰلاً وَّسَعِيْرًا-

আমরা কাফেরদের জন্যে শিকল, কণ্ঠ কড়া, ও দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা দাহর–৪)

সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে ধারণা প্রচলিত আছে, যারা ইসলাম ছাড়া অন্য আদর্শ অনুসরণ করে তারাই কাফির। অবশ্যই মানুষের এ ধারণা সত্য। কিন্তু এর পরেও কথা রয়ে যায়। কাফির সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে হলে মুসলিম সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম আরবী শব্দ। যার অর্থ আত্মসমর্পণ করা। অর্থাৎ যে বা যারা স্বইচ্ছায় আল্লাহর আইন-কানুন যা তাঁর নবীর মাধ্যমে মানুষের কাছে এসেছে, তাঁর প্রতি অন্তরের বিশ্বাস পোষণ ও মান্য করে এক কথায় তারাই মুসলিম। মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই কেউ মুসলিম হতে পারে না। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে যদি কেউ ইসলামের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা অবশ্যই কাফের।

কুফুর শব্দের অর্থ গোপন করা, লুকানো। যেমন ঈমান অর্থ মেনে নেয়া, কবুল করা, স্বীকার করা, এর বিপরীতে কুফুর শব্দের অর্থ না মানা, প্রত্যাখ্যান করা, অস্বীকার করা। কোরআন ও হাদিসের বর্ণনার প্রেক্ষিতে কুফুরীর মনোভাব ও আচার আচরণ বিভিন্ন প্রকার। যেমন, আল্লাহকে বা তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা। অথবা তাঁর সার্বভৌমত্ব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার না করা এবং তাকে নিজের ও সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক, প্রভু, উপাস্য ও মাবুদ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। অথবা তাকে একমাত্র মালিক বলে না মানা। আল্লাহকে মেনে নিয়েও মানুষ কাফের হয়। এই ধরনের কাফেরের সংখ্যা বর্তমান মুসলমান নামে পরিচিত বা দাবীদারদের মধ্যে বেশী। অর্থাৎ মুখে আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয় বটে কিন্তু তাঁর বিধান ও হেদায়েত সমূহকে জ্ঞান ও আইনের একমাত্র উৎস হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। নীতিগতভাবে একথা মেনে নেয়া যে, তাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বিধান ও বানীসমূহ যেসব নবী রাসুলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাদেরকে অস্বীকার করা। নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজেদের পছন্দ ও মানসিক প্রবণতা বা গোত্রীয় ও দলীয় প্রীতির কারণে তাদের মধ্যে হতে কাউকে মেনে নেয়া এবং কাউকে না মানা। নবী ও

রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকীদাহ্ বিশ্বাস নৈতিক-চরিত্র ও জীবন-যাপনের বিধান সম্বলিত যে সব শিক্ষা মানুষের কাছে পেশ করেছেন, এসব শিক্ষার কিছু অংশ গ্রহণ ও কিছু অংশ বর্জন করা। আল্লাহর বিধান মেনে নেয়ার পরও জেনে বুঝে পার্থিব কোন স্বার্থের কারণে আল্লাহর বিধানের সাথে নাফরমানি করা। নিজে খুবই ধর্মভীরু" এমনভাব দেখিয়ে মানুষকে ধোকা দেয়া।

উল্লেখিত যাবতীয় চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজ আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার শামিল। উল্লেখিত চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজকে কোরআনে কুফুরি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও কোরআনের কোন কোন আয়াতে 'কুফর' শব্দটি আল্লাহর দান, অনুগ্রহ, নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে অমুসলিমগণ সরাসরি বা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে তেমন একটা কিছু করে না কিন্তু তারাই সবকিছু করাচ্ছে। যাদের মাধ্যমে অমুসলিম শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে তারা সবাই মুসলিম নামেই পরিচিত। এই তথা কথিত মুসলমান নামের দাবীদারগণ কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী লেবাছ পরে ইসলামের সাথে দুশমনি করছে। মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে, মুসলিম নাম ধারণ করে, ইসলামী লেবাছ ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে নেতৃত্বের আসনে বসে একশ্রেণীর মানুষ পার্থিব স্বার্থের কারণে ইসলামের সাথে শত্রুতা করছে। মুলতঃ এরা অমুসলিম শক্তির হাতের পুতুল মাত্র। মহান আল্লাহ কোরআনে বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ-وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ-لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ-وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ-

যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্যে আসমানের দরোজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততোখানি অসম্ভব যতোখানি অসম্ভব সুঁইয়ের ছিদ্র পথে উটের প্রবেশ। অপরাধীদের জন্য প্রতিফল এমনই হওয়া উচিত। তাদের জন্য আগুনের শয্যা ও চাদর নির্দিষ্ট আছে। আমি জালেমদেরকে এরকম প্রতিফলই দিয়ে থাকি? (সুরা আরাফ- ৪০-৪১)

পৃথিবীতে যারা ইসলামের সাথে বিরোধীতা করছে, ইসলামকে শুধু মসজিদ-মাদ্রাসা, খানকায় বন্দী করার চক্রান্ত করছে, তাদের জন্যে আকাশের দরোজা খোলা হবে না। মুখে তারা যতেই ইসলামের কথা বলুক না কেন, তাদের ভন্ডামী আল্লাহ তা'য়ালা দেখছেন। তাদের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব। সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে যেমন কখনো উট প্রবেশ করতে পারবে না, তেমনি ওই সমস্ত লোকের পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব হবে না। এরা যতই নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করুক না কেন-আসলে এরা অবশ্যই জাহান্নামী হবে।

মহান আল্লাহ কোরআনে এক শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তথা শুকর ও কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। এরা হলো ওই সমস্ত মানুষ, যারা পৃথিবীতে পার্থিব যোগ্যতার ভিত্তিতে কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ কবি, কেউ সাহিত্যিক, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ প্রফেসর-প্রিন্সিপাল, কেউ অভিনেতা সেজে বসেছে। পার্থিব ক্ষেত্রে এরা যথেষ্ট জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে এরা একেবারে গন্ড মূর্খের ন্যায়।

এদের মাথায় ঘিলু আছে, তা দিয়ে পৃথিবীতে কি করে উন্নতি করা যায় শুধু সেই চিন্তাই করে। আল্লাহ, রাসূল, কোরআন-হাদীস সম্পর্কে এরা মুহূর্ত কাল ভেবে দেখেনা। এদের চোখ আছে, তা দিয়ে পৃথিবীর রঙ্গ-রস তারা দেখে কিন্তু আল্লাহর বিধান মানুষের কাছে কি দাবী করে, তা ওরা দেখে না। এদের কান আছে, সে কান দিয়ে পৃথিবীতে সব কথা শুনতে পারে কিন্তু আল্লাহ-রাসুলের কথা শুনে না। এরাই হলো জাহান্নামী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ-لَهُمْ....اِلَى اخِرِالاية

আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জ্বীন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, তাদের কাছে অন্তর আছে, কিন্তু তারা তা দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছ তবুও তারা দেখেনা। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তার শুনেনা। তারা জন্তু জানোয়ারের মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট, এরাই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আরাফ-১৭৯)

জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সুরা বাক্বারায় বলা হয়েছে-

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ-اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ-

তোমরা জাহান্নামের ঐ আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যা অবিশ্বাসী কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা বাকারা-২৪)

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা নিজেরা চেষ্টা করে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচার জন্যে। কিন্তু নিজের অধিনস্থ লোকদেরকে আল্লাহর বিধান অনুসারে চলার ব্যাপারে কোন তাগিদ দেয় না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًاوَّ......اِلَى اخِرِالاية

হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে সে আগুন হতে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ, রুঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। যে আদেশ তাদেরকে দেয়া হোক না কেনো, তা ঠিক ঠিকভাবে পালন করে। (সূরা আত-তাহরীম-৬)

সেদিন আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফেরেশ্তাদের নির্দেশ দেবেন-

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ-ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ-ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ .....اِلَى اخِرِالاية

(অপরাধীদেরকে) ধরো এবং গলায় ফাঁস পরিয়ে দাও তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো, আর সত্তর হাত দীর্ঘ শিকল দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দাও। (সূরা আল- হাক্কাহ্-৩০-৩২)

পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ-لَاظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ..اِلَى اخِرِالاية

(অপরাধীদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে) চলো, সে ছায়ার দিকে যা তিনটি শাখা বিশিষ্ট। যেখানে না (শীতল) ছায়া আছে আর না আগুনের লেলিহান শিখা হতে রক্ষাকারী কোন বস্তু । সে আগুন প্রসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। তা এমনভাবে লাফাতে থাকবে, দেখলে মনে হবে যেন হলুদ বর্ণের উট। (সূরা মুরসালাত- ৩০-৩৩)

পবিত্র কোরআনের সুরা মুমিনে বলা হয়েছে-

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ-يُسْحَبُوْنَ.........اِلَى اخِرِالاية

যখন তাদের গলায় শিকল ও জিঞ্জির লাগানো হবে, তখন তা ধরে টগবগ করে ফুটন্ত পানির দিকে টানা হবে এবং পরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (আল মুমিন-৭১-৭২)

পবিত্র কোরআনের সূরা সা'দে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاِنَّ لِلطَّغِيْنَ لَشَرَّمَابٍ-جَهَنَّمَ-يَصْلَوْنَهَا..........اِلَى اخِرِالاية

আর খোদাদ্রোহী মানুষদের নিকৃষ্ট পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে তারা (অনন্তকাল) জ্বলবে। এটা অত্যন্ত খারাপ স্থান, প্রকৃত পক্ষে এ স্থান তাদের জন্যেই। অতএব সেখানে তারা স্বাদ গ্রহণ করবে টগবগে ফুটন্ত পানি, পূঁজ, রক্ত এবং এ ধরণের আরো অনেক কষ্টের। (সূরা সাদ-৫৫-৫৮)

মহান আল্লাহর কোরআনে সূরা হজ্জে বলা হয়েছে-

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ-يُصْهَرُبِه مَا......اِلَى اخِرِالاية

জাহান্নামীদের মাথার ওপরে প্রচন্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু ও চামড়া মুহূর্তের মধ্যে গলে যাবে এবং তাদের জন্য লোহার ডান্ডাসমূহ থাকবে। যখনই তারা শ্বাসরোধক অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে তখনই তাদেরকে প্রতিহত করা হবে এবং বলা হবে দহনের শাস্তি ভোগ করতে থাক। (হজ্জ-১৯-২২)

এই ধরনের কঠিন আযাব থেকে কোন অবাধ্য পাপীগণ রেহায় পাবে না। সবাইকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতেই হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَ........اِلَى اخِرِالاية

যখন তাদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে গলে যাবে, তখন (সাথে সাথে) সেখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেবো; যেনো তারা আযাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বড়োই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালা সমূহ কার্যকরী করার কৌশল খুব ভালো করেই জানেন। (সূরা নিসা-৫৬)

জাহান্নামীদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ-وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ-لَّابَارِدٍ وَّلَاكَرِيْمٍ-

তারা গরম বাষ্প, টগবগ করে ফুটন্ত পানি এবং কালো ধূয়াঁর ছায়ার মধ্যে থাকবে। তা (কখনো) না ঠান্ডা হবে, না শান্তিদায়ক। (সূরা ওয়াকিয়া ৪২-৪৪)

যারা জাহান্নামে যাবে তারা একদল আরেক দলকে দোষ দেবে যে, আমরা তোমাদের কারণেই আজ এই কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নামে এসেছি। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে-

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا-حَتّى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا..اِلَى اخِرِالاية

প্রত্যেকটি দল যখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, নিজের সঙ্গের দলটির উপর অভিশাপ দিতে দিতে অগ্রসর হবে। শেষ পর্যন্ত সকলেই যখন সেখানে সমবেত হবে, তখন প্রত্যেক পরবর্তী লোক পূর্ববর্তী লোকদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব! এ লোকেরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। এখন তাদেরকে আগুনে (আমাদের চেয়ে) দ্বিগুন শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন, সকলের জন্যই দ্বিগুন আযাব কিন্তু তোমরা তা বুঝবে না। (সূরা আ'রাফ-৩৮)

সকলের জন্যই দ্বিগুন আযাব এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, অপরাধীগণ সর্বদাই নিজে অপকর্ম করে

এবং অন্যদের করতে উৎসাহ দেয়। যেহেতু প্রতিটি অপকর্মই বাহ্যিক চাকচিক্যময় তাই তার উৎসাহে বিপুল সংখ্যক লোক সাড়া দেয়। আবার তাদের দেখাদেখি পরবর্তীতে আরেকদল অপরাধ প্রবণ হয়ে যায়। এমনি করে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক অপরাধীদের দল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেকটি দলই পূর্ববর্তী দলকে অনুসরণ করেই অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ে এবং অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক দলকেই দ্বিগুণ শাস্তি দেবেন। কারণ একদিকে যেমন তারা পূর্ববর্তী দলের অনুসারী অপরদিকে তারা তাদের পরবর্তী দলের পথপ্রদর্শক। এ কথাগুলোই আল্লাহ পবিত্র কালামে অন্যভাবে বলেছেন–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى...اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু। তিনি অন্ধকার হতে আলোর দিকে লোকদেরকে পথ দেখান এবং কাফেরদের বন্ধু খোদাদ্রোহী লোকজন তারা লোকদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে পথ দেখায়। (সূরা বাকারা–২৫৭)

পৃথিবীতে নানা ধরনের দল রয়েছে। এসব দলের মধ্যে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি দল আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে দলীয় লোকদের পরিচালিত করে থাকে। আর অধিকাংশ দলই মানুষের বানানো আদর্শের ভিত্তিতে কর্মীদের পরিচালিত করে। এসব পথভ্রষ্ট দলের নেতা–কর্মীরা যখন জাহান্নামে যাবে তখন তারা তাদের নেতাদের দোষ দেবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَ نَا فَاَضَلُّوْنَا...اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

(যখন জাহান্নামীদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে) তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদার ও নেতাদের আনুগত্য করেছি, তারা আমাদেরকে সঠিক সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। হে রব ! এ লোকদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের ওপর কঠিন অভিশাপ বর্ষন করো। (সূরা আহযাব– ৬৭–৬৮)

জাহান্নামীগণ জাহান্নামে জ্বলতে জ্বলতে অসহ্য হয়ে যাবে। তখন চীৎকার করে বলতে থাকবে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنَ اَضَلّٰنَا مِنَ ......اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

হে পরোয়ারদেগার! সেই জ্বিন ও মানুষদেরকে আমাদের সামনে এনে দাও, যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করছিলো। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের তলায় রেখে দলিত মথিত করবো, যেনো তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (সূরা হা-মীম-আস্ সিজদাহ্– ২৯)

জাহান্নামীদের অনুভূতি তীব্র হবে। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং সেদিন বুঝবে যে অন্ধভাবে নেতাদের অনুসরণ করা কতো বড়ো ভ্রান্তনীতি ছিলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ-اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আর এই বিভ্রান্ত লোকেরা (নিজেদের নেতাদেরকে লক্ষ্য করে) বলবে, আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের মর্যাদা দিচ্ছিলাম। (সূরা শুয়ারা– ৯৭–৯৮)

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ-طَعَامُ الْاَثِيْمِ-كَالْمُهْلِ-يَغْلِىْ.....اِلَى اخِرِالايَةُ

যাক্কুম গাছ জাহান্নামীদের খাদ্য হবে: তিলের তেলচিটের মতো। পেটে এমনভাবে উথলিয়ে উঠবে যেমন টগবগ করে পানি উথলিয়ে উঠে। (দোখান- ৪৩-৪৬)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ-

অতঃপর পান করার জন্য তাদের ফুটন্ত পানি দেয়া হবে। (ছাফ্ফাত-৬৭)

যাক্কুম ক্যাক্টাস জাতীয় গাছ-আরবের তিহামা অঞ্চলে এ গাছ জন্মে। এর স্বাদ তিক্ত এবং গন্ধ অসহ্য। ঐ গাছ ভাঙ্গলে দুধের মতো সাদা কষ বের হয়, যা গায়ে লাগলে সাথে সাথে ফোস্কা পড়ে ঘা হয় এবং গা ফুল উঠে। আগেই বলা হয়েছে পৃথিবীর সাথে আখিরাতের কোন বস্তুর নামের মিল থাকলেও মূলত ঐ দু' বস্তু এক নয়। পৃথিবীর যাক্কুম গাছের তুলনায় আখেরাতের যাক্কুম গাছ আরও নিকৃষ্ট। যাক্কুম গাছের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন. তা এমন একটি গাছ-যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়। সূরা-গাশিয়ায় বলা হয়েছে-

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ انِيَةٍ-لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ....اِلَى اخِرِالايَةُ

টগবগ করে ফুটন্ত কূপের পানি তাদেরকে পান করানো হবে। কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবেনা। তা দেহের পুষ্টি সাধনও করবেনা এবং ক্ষুধার উপশমও হবে না । (সূরা গাশিয়া- ৫-৭)

হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতের বাম পাশে যারা অবস্থান করবে তারা বড়ই হতভাগ্য এবং এরাই হবে জাহান্নামের জ্বালানি। পৃথিবীতে এরা ইসলামী বিধি বিধানের তোয়াক্কা করেনি। এরা ধারণা করতো মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই। মিথ্যায় ভরপুর ছিল এদের জীবন। অসৎ কাজই ছিল এদের পেশা। কোরআন-হাদীস সম্পর্কে এরা ছিল উদাসীন। যে কোন পথে যে কোনভাবে এরা টাকা উপার্জন করতো। হারাম-হালাল বলে কোন কথা এদের জীবনে ছিল না। অপরের সম্পদ এরা অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করতো। কোরআন-হাদীস অনুযায়ী যারা জীবন-যাপন করতো, তাদেরকে এরা উপহাস করতো। এরা পৃথিবীতে নিজের শক্তির মহড়া দিয়ে অন্যায় কাজ করতো। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতো। নিজেরা ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকলেও অভাবীদের দিকে এদের দৃষ্টি ছিল না। এরা সেদিন কঠোর শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে। তাদেরকে আযাবের পর আযাব দেয়া হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ-وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ-لاَبَارِدٍ وَّ لاَكَرِيْمٍ...اِلَى اخِرِالايَةُ

এরা অবস্থান করবে উত্তপ্ত বাতাস ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। তাদেরকে অচ্ছাদিত করে রাখবে উত্তপ্ত কৃষ্ণবর্ণ ধুম্ররাশি যা কখনো শীতল ও আরামদায়ক হবে না। এরা ওই সমস্ত মানুষ-যারা পৃথিবীর জীবনে ছিল সুখী সচ্ছল। তাদের সুখী সচ্ছল জীবন তাদেরকে লিপ্ত করেছিল পাপ কাজে। সে সব পাপ কাজ তারা করতো জিদ ও অহংকারের সাথে। তারা বলতো, মৃত্যুর পর তো আমরা কংকালে পরিণত হবো। মিশে যাবো মাটির সাথে। তারপর আবার কি করে আমরা জীবিত হবো? আমাদের বাপ-দাদাকেও এভাবে জীবিত করা হবে ? হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, পরবর্তী এবং পূর্ববতী সকলকেই একদিন উপস্থিত করা হবে। তার জন্য সময়

কালও নির্ধারিত হয়ে আছে। হে পথভ্রষ্ট মিথ্যাবাদীর দল, তোমরা জাহান্নামে 'যকুম' বৃক্ষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। তার দ্বারাই তোমরা উদরপূর্ণ করবে। তারপর তৃষ্ণার্ত উটের মতো তারা পেট ভরে পান করবে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি? (সূরা ওয়াকিয়া-৪২-৫৫)

জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে রক্ত, পূজ, ক্ষরণ খেতে দেয়া হবে আর দেয়া হবে 'যকুম' ফল। এই ফল অত্যন্ত কাঁটা যুক্ত ও বিষাক্ত হবে। তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হবে। যকুম খওয়ার সাথে সাথে পেটে ভয়ংকর যন্ত্রণা শুরু হবে। আর্তচিৎকার করতে থাকবে পাপীগণ। যকুম ফলের ক্রিয়ায় তাদের পেটের নাড়িভূড়ি গলে মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাবে- কিন্তু মৃত্যু হবে না। জাহান্নামীরা কিভাবে জান্নাতীদের কাছ থেকে খাদ্য চাইবে সে সম্পর্কে আল্লাহ শোনাচ্ছেন-

وَنَادَى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيْضُوْا......اِلَى اخِرِ الاٰيَةِ

জাহান্নামীগণ জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদেরকে সামান্য পানি দাও কিংবা আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন তা হতে কিছু আমাদের দিকে নিক্ষপ করে দাও। জবাবে জান্নাতীগণ বলবে, আল্লাহ তা'য়ালা এ দুটি বস্তুই কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (সূরা আ'রাফ-৫০)

পৃথিবী যেমন স্থান-কাল ও পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ কিন্তু আখিরাত স্থান-কালের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে। কেননা জান্নাতের পরিধি যেমন বিশাল ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নামের পরিধিও বিশাল। তবুও এ দু'প্রান্ত থেকে একজন অপরজনের অবস্থা অবলোকন করতে পারবে এবং পরস্পর কথাও বলবে, তাতে তাদের দৃষ্টিশক্তি বা কণ্ঠস্বরের কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না।

জাহান্নামীদেরকে যখন ফেরেশতারা এক হাতে চুলের মুঠি এবং অন্য হাতে পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে তখন জাহান্নামের প্রহরী জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পৌছেনি? তখন কাফেরগণ বলবে হ্যাঁ, পৌছেছিলো কিন্তু আমরা তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম এবং মিথ্যা মনে করতাম। তখন আফসোস করে বলবে- وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ-

হায়! আমরা যদি শুনতাম এবং অনুধাবন (জ্ঞান দিয়ে চিন্তা ভাবনা) করতাম, তবে আমরা আজ দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে নিক্ষিপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল হতাম না। (সূরা মুল্ক-১০)

সূরা আনয়ামে বলা হয়েছে-

وَلَوْتَرٰى اِذْوُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ.....اِلَى اخِرِ الاٰيَةِ

হায়! সে সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে জাহান্নাদের কিনারায় দাঁড় করানো হবে; তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে না করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারতাম! (সূরা আনয়াম-২৭)

তাদের এ আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। পবিত্র কোরআন বলছে-

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ-

তাদেরকে যদি পূর্ববর্তী জীবনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয় তবুও তারা সে সব কাজই করবে যা হ'তে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী। (আনয়াম-২৮)

সূরা যুমারে বলা হয়েছে, যে সব লোক কুফুরী করেছিলো তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছাবে তখন তার (অর্থাৎ জাহান্নামের) দরজাগুলো উন্মুক্ত করা হবে এবং প্রহরীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতে এমন কোন রাসূল কি আসেনি, যে তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমুহ শুনিয়েছে এবং তোমাদেরকে এ বলে ভয় প্রদর্শন করেছে যে, এ দিনটি অবশ্যই একদিন তোমাদেরকে দেখতে হবে? তারা বলবে-হ্যাঁ, এসেছিলো! জাহান্নামীগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশায় আল্লাহর কাছে আবেদন কররে বলবে-

قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ......اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

তারা বলবে হে আমাদের রব! তুমি নিশ্চয়ই আমাদের দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন দান করেছো। এখন আমরা আমাদের অপরাধ সমুহ স্বীকার করে নিচ্ছি। এখন এখান (জাহান্নাম) থেকে বের হবার কোন পথ আছে কি ? (সূরা আল্-মুমিন-১১)

দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবনদান-এর অর্থ হলো, মানুষ অস্তিত্বহীন ছিলো অর্থাৎ মৃত ছিলো আল্লাহ জীবন দান করলেন আবার মৃত্যু দিবেন এবং পুনরায় কিয়ামতের দিন জীবিত করে উঠাবেন। এ কথা কয়টি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুরা বাকারায় স্পস্ট করে বলেছেন-

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ-ثُمَّ ...اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন করে কুফুরী করতে পারো! অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন- মৃত, তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। আবার মৃত্যু দিবেন এবং পুনরায় জীবন দান করে উঠাবেন। তারপর তার দিকেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা-২৮)

অপরাধীগণ প্রথম তিনটি অবস্থা অবিশ্বাস করতো না, কেননা এ তিনটি অবস্থা তাদের চোখের সামনেই ঘটতো। কিন্তু শেষাবস্থা তারা প্রত্যক্ষ করতে পারেনি বলে উপহাস করে উড়িয়ে দিতো। কেননা শেষ অবস্থার খবর একমাত্র নবী রাসূলগণই দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন কার্যত যখন এ অবস্থা ঘটে যাবে তখন তারা স্বীকার করবে এবং কাকুতি মিনতি করবে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার জন্য । সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে-

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا-رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا..اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

সেখানে (জাহান্নামে) তারা চীৎকার করে বলবে-হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান হতে বের করে নাও যেনো আমরা নেক আমল করতে পারি। সে আমল থেকে ভিন্নতর যা আমরা পূর্বে করছিলাম। (সূরা ফাতির-৩৭)

অতঃপর তাদেরকে প্রতিউত্তরে বলা হবে-

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ......اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি, যে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিলো । এখন (আযাবের) স্বাদ গ্রহণ করো। এখানে জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির-৩৭)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ....اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

সেদিন অপরাধীগণ কামনা করবে তার সন্তান, স্ত্রী, ভাই, এবং সাহায্যকারী নিকটবর্তী পরিবার, এমনকি দুনিয়ার সব মানুষকে বিনিময় দিয়ে হলেও নিজেকে আযাব হতে বাঁচিয়ে নিতে। (সূরা আল্ মা' য়ারিজ-১১-১৪)

সূরা আল্-মু'মিনুনে বলা হয়েছে- فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَايَتَسَاءَلُوْنَ-
তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয় থাকবেনা এমন কি পরস্পর দেখা হলেও (কেউ কাউকে) জিজ্ঞেস করবে না। (সূরা আল্ মু' মিনুন-১০১)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا-هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ....اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةُ

যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এই সে আগুন যাকে তোমরা ভিত্তিহীন গুজব মনে করেছিলে। এবার বলো, এটা কি যাদু? না তোমারা কিছুই দেখোনা? এবার যাও এর মধ্যে ভস্ম হ'তে থাকো। এখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করো বা না করো সবই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের সে রকম প্রতিফলই দেয়া হচ্ছে যা তোমরা আমল করেছো । (সূরা তুর-১৩-১৬)

সূরা হাদীদে বলা হয়েছে-

فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا....اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةُ

(যখন ফেরেশতাগণ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, তখন বলবে) আজ তোমাদের নিকট হ'তে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং যারা পৃথিবীতে (প্রকাশ্য দাম্ভিকতার সাথে আল্লাহর আয়াত গুলো) অস্বীকার করেছিলো, (তাদেরকেও বিনিময় নিয়ে মুক্তি দেয়া হবে না) তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সে জাহান্নামই তোমাদের খোঁজ খবর গ্রহণকারী অভিভাবক। কতো নিকৃষ্ট পরিণতি। (সূরা আল্-হাদীদ-১৫)

প্রকৃত বিষয় হলো, জাহান্নাম হতে বের করা তো দূরের কথা একমাত্র জাহান্নাম ছাড়া অন্য কোন বন্ধু বা অভিভাবক কিংবা সাহায্যকারীও পাবেনা। কাজেই সেখানে ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক শাস্তি গ্রহণ করতেই হবে। এমন শাস্তি দেয়া হবে যে, ধৈর্য ধারণের প্রশ্নই উঠে না। তাই বলে ধৈর্য না ধরে জাহান্নামীদের কোন উপায়ও অবশিষ্ট থাকবে না।

সূরা নাবা-এর ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহীদের সমস্ত কার্যকলাপ রেকর্ড করা হচ্ছিলো আর এই রেকর্ড সেদিন তাদেরকে প্রদর্শন করা হবে এবং বলা হবে, এখন শাস্তি অনুভব করো। আজ আমি তোমাদের জন্য শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না। মহান আল্লাহ কিয়ামতের পরে বিচারের দিন সম্পর্কে বলেন-

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ-وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ-وَمَا...اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةُ

বিচারের দিন তারা সেখানে প্রবেশ করবে এবং সেখান হতে কখনো অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি? পুনরায় বলছি, তুমি কি জানো সেই বিচারের দিনটি কি? এটা সেই দিন, যখন কারো জন্যে কিছু করার সাধ্য থাকবে না। সেদিন ফায়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারেই থাকবে। (সূরা ইনফিতার-১৫-১৯)

পবিত্র কোরআনের সূরা তারিকে বলা হয়েছে-

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ-فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلاَ نَاصِرٍ-

সেদিন গোপন অজানা তত্ত্ব ও রহস্য সমূহের যাচাই পরখ করা হবে। তখন মানুষের কাছে না নিজের কোন শক্তি থাকবে না কোন সাহায্যকারী তার জন্য আসবে। (আত-তারিক-৯-১০)

গোপন অজানা তত্ত্ব বলতে মানুষের কর্মসমূহকে বুঝানো হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের কর্মসমূহ এক গোপন অজানা ব্যাপার। মানুষ প্রকাশ্যে যা করে, তা সবারই দৃষ্টি গোচর হয়। কিন্তু এই মানুষই অন্য মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যা করে, সেসব তো কোন মানুষের চোখে পড়ে না। আবার মানুষ প্রাকাশ্যেও এমন অনেক কাজ করে যা দেখে অন্য মানুষ প্রশংসা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ওই প্রশংসামূলক কাজ করলো, ওই কাজের পিছনে যে তার কি উদ্দেশ্য মনোভাব ও নিয়ত গোপন থাকে, যে প্রবণতা, মতলব ও কামনা-বাসনা কাজ করতে থাকে, তার যে গোপন কার্যকরণ নিহিত প্রচ্ছন্ন থাকে, তা অন্য মানুষের নিকট অজানাই রয়ে যায়।

কিন্তু বিচারের দিনে তা সব কিছুই প্রকাশ করে দেয়া হবে। পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি কি কাজ করেছে, কিয়ামতের দিন শুধু সেসব কাজের হিসাব ও বিচারই হবে না বরং কি উদ্দেশ্যে, কি স্বার্থে করেছে, কি ইচ্ছা ও মানসিকতা নিয়ে করেছে তারও অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিচার ও যাচাই করা হবে। মানুষ পৃথিবীতে এমন অনেক কাজ করে, যে কাজের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অন্য মানুষের ওপর পড়ে, অনেক দূর পর্যন্ত সে কাজ প্রভাব বিস্তার করে, অনেকদিন পর্যন্ত সে প্রভাব বজায় থাকে, তা বহু মানুষের অজানা থাকে এবং স্বয়ং যে ব্যক্তি কাজ করেছে তারও অজানা থেকে যায়। এই অজানা রহস্যও সেদিন সর্বসম্মুখে প্রকাশ করে তা সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে যাচাই করা হবে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা স্পষ্ট করা যাক, ধরা যাক একজন লেখক এমন একটি অশ্লীল-নগ্ন বই লেখে প্রকাশ করলো, যে বইটি পাঠ করে বহু মানুষ চরিত্র হারালো, বইটি অনেক দেশের লোক পাঠ করলো এবং তাদের মধ্যে অনেকেই চরিত্র হারালো। এখন যে লেখক ওই ধরনের নোংরা বই লিখলো, সে সঠিকভাবে জানতেও পারলো না তার লেখা বই পড়ে কত মানুষ চরিত্র বরবাদ করেছে। কত দূর পর্যন্ত তার ওই নিকৃষ্ট বইয়ের প্রভাব পড়েছে। কত কাল পর্যন্ত ওই জঘন্য বইয়ের কারণে অসংখ্য মানুষ চরিত্র হারাতে থাকবে। সে কথা লেখকের অজানা রয়ে যায়। আবার যার যুবক সন্তান ওই নোংরা বই পড়ে চরিত্র হারালো সেই পিতা-মাতাও জানতে পারলো না, কি কারণে তার সন্তান চরিত্র হারালো। কিন্তু বিচারের দিন সমস্ত কিছু প্রকাশ করে দিয়ে তার চুলচেরা বিচার করে উপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا.....اِلَى اخِرِ الاٰيَةِ

আর যখন আমল নামা সম্মুখে রেখে দেয়া হবে, তখন তোমরা দেখবে অপরাধীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আর বলছে, হায়রে আমাদের দুর্ভাগ্য! এটা কেমন বই, আমাদের ছোট বড় এমন কোন কাজ বাদ যায়নি (যা এই বইতে) লেখা হয়নি। তারা যে যা কিছু করেছিল তা সমস্তই নিজের সামনে (লেখা ও ছবিসহ) উপস্থিত দেখতে পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি কোন জুলুম করবেন না। (সূরা কাহাফ-৪৯)

পবিত্র কোরআনে সূরা মু'মিনে-এর ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ-لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ.....اِلَى اخِرِالاية

আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার (পৃথিবীতে জীবিত থাকতে) উপার্জনের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

আল্লাহর কোরআনে সূরা যুমারে এসেছে–

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِائَ بِالنَّبِيّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ.....اِلَى اخِرِالاية

(প্রত্যেকের) আমলনামা (কর্মলিপি) সামনে উপস্থিত করা হবে। নবী রাসূল ও সকল সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। মানুষদের মধ্যে যথাযথভাবে (সত্য সহকারে) ফয়সালা করে দেয়া হবে। কারো উপর কোন জুলুম করা হবে না। (সূরা যুমার–৬৯)

এই আয়াতে সাক্ষী বলতে যারা মানুষের মধ্যে নানাভাবে ইসলামের বিধান প্রচার ও প্রসার করেছে তাদেরকে ও সেসব সাক্ষী ও যারা মানুষের কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। এ সমস্ত সাক্ষী শুধু মাত্র মানুষই হবে না, ফেরেশ্তা, জ্বিন, অন্যান্য প্রাণীসমূহ, মানুষের নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তথা পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সাক্ষী প্রদান করবে কিয়ামতের দিন। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের সেবা করার জন্যে– আর মানুষের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমার নে'মাত ভোগ করো এবং আমার দাসত্ব করো। কিন্তু কোন কিছুকেই মহান আল্লাহ মানুষের দাস করে সৃষ্টি করেননি। এমনকি মানুষের নিজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নয়। কারণ শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও আল্লাহ তা'য়ালার গোলাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا...اِلَى اخِرِالاية

তারা যেন সেদিনটির কথা ভুলে না যায়, যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা, নিজেদের হাত-পা তাদের কর্মসমূহের সাক্ষ্য প্রদান করবে। (আন-নুর– ২৪)

আল্লাহার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে মানুষের চেয়ে কোন ভয়ংকর জীব আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই মানুষ পৃথিবীর বুকে অবলীলাক্রমে মিথ্যে বলে, টালবাহানা করে, ছল-চাতুরী করে। কিয়ামতের ময়দানেও এর ব্যতিক্রম করবে না মানুষ। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে টালবাহানা করবে, মিথ্যে কথা বলবে। আল্লাহর আইন অমান্যকারী, অস্বীকারকারী অপরাধীগণ আল্লাহর সামনেও মিথ্যে কথা বলবে। এ অবস্থায় কি ঘটবে, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন–

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَ.....اِلَى اخِرِالاية

আজ আমরা তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি, এদের হাত আমাদের সাথে বলা বলবে, পা সাক্ষ্য দেবে যে, এরা পৃথিবীতে কোথায় কি করেছিল। (সূরা ইয়াছিন– ৬৫)

আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–

حَتّٰى اِذَا مَاجَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُ...اِلَى اخِرِالاية

এরপর সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ, তাদের শরীরের চামড়া সাক্ষ্য দেবে যে, তারা পৃথিবীতে কি কি কাজ করেছিল। তখন তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষী দিলে? উত্তরে ওরা বলবে,

আমাদেরকে সেই আল্লাহই কথা বলার শক্তি দান করেছেন যিনি সব বস্তুকেই বাকশক্তি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা হা-মীম-আস-সাজদা- ২০-২১)

সেদিন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শুধু সাক্ষী দেবে না বরং পৃথিবীতে যত কিছু আছে, সব কিছুকেই কথা বলার শক্তিদান করা হবে। তারা মানুষকে যা যা করতে দেখেছে, সব বলে দেবে। কারণ মানুষ সেদিন জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচার জন্যে মিথ্যে কথা বলবে। ওই সমস্ত অপরাধীগন যে মিথ্যেবাদী-তা আরেকবার প্রমাণ হয়ে যাবে তাদেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পৃথিবীর বস্তুর সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে।

কিয়ামতের পরে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মানুষকে পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করবেন। তার মধ্যে পাঁচটি প্রশ্ন থাকবে প্রধান প্রশ্ন। এই পাঁচটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে যে, তাকে অবশ্য অবশ্যই কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। ওই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেউ এদিক ওদিক এক পা-ও যেতে পারবে না। তিরমিজী শরীফে এসেছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন-সেদিন মানবজাতিকে প্রধানতঃ পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। তার জবাব না দিয়ে তারা এক পা অগ্রসর হতে পারবে না। প্রশ্নগুলো হচ্ছে -(১) তার জীবনের সময়গুলো সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) (বিশেষ করে) তার যৌবন কাল সে কোন কাজে ব্যয় করেছে? (৩) কিভাবে সে অর্থ উপার্জন করেছে? (৪) তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদ সে কিভাবে কোন পথে ব্যয় করেছে? (৫) সে যে সত্য জ্ঞান লাভ করেছিল, সে জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু জীবন-যাপন করেছে ?

এই পাঁচটি প্রশ্নের ভেতর দিয়েই একজন মানুষের গোটা জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। সাধারণতঃ মানুষ তার জীবন পৃথিবীতে দুইভাবে অতিবাহিত করতে পারে। (১) আল্লাহ, রাসূল, পরকাল, আল্লাহর নাজিল করা কিতাবের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কঠিন ভাবে মেনে চলার মাধ্যমে। (২) আল্লাহ, রাসূল, পরকাল, আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাব অবিশ্বাস (বা এগুলোর প্রতি ঠুনকো বিশ্বাস) করে পৃথিবীতে যেমন খুশী তেমনভাবে জীবন-যাপন করা।

পৃথিবীতে মানুষ তার গোটা জীবনের সময় বিশেষ করে যৌবন কাল কোন পথে অতিবাহিত করেছে। যৌবনকাল মানব জীবনের এমন সময় যখন তার কর্মশক্তি ও বৃত্তিনিচয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। বিকশিত হয় তার যৌন প্রবণতা। কুলে কুলে ভরা যৌবনদীপ্ত নদী সামান্য বায়ুর আঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোন সময় যৌবন নদী সীমা লংঘন করে দু'কুল প্লাবিত করে। ঠিক তেমনি মানব জীবনের ভরা নদীতে প্রবৃত্তির দমকা হাওয়ায় তার যৌন তরঙ্গ সীমা লংঘন করতে পারে। এটা অসম্ভবের কিছু নয়।

এখন যৌবনকে যেভাবে খুশী সেভাবে ব্যবহার করা, অথবা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা, এটাই এক মহা পরীক্ষা। যৌবনকাল মানুষের যেমন স্বর্নালী কাল তেমনি বিপদজনক সময়। যৌবনকালকে মানুষ তার দেহের ক্ষমতাকে যেখানে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে, অথবা সংযম, প্রেম-ভালবাসা, ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া-অনুগ্রহ বা অন্যান্য সৎ গুণাবলী দিয়ে সৎ পথে থেকে মানুষের সেবা যত্ন করতে পারে। এজন্যে যৌবনকালের মূল্য অপরিসীম। যুবক বয়সে আন্দোলন, সংগ্রাম ও চেষ্টা-সাধনা করে একটা দেশকে যেমন ধ্বংস করে দেয়া যায় আবার সুন্দর রূপে গড়াও যায়।

মানুষ উপার্জন করেছে কোন পথে-এ প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অর্থ উপার্জন, অর্থ ব্যয় ও অর্থ সম্পদের বন্টনের উপরে গোটা মানব সমাজের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি নির্ভরশীল, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা নিয়ম নীতির মাধ্যম দিয়ে অর্থ-সম্পদ আয় বা উপার্জন করা প্রয়োজন এবং তা ব্যয় করার ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট একটা নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা উচিত-এ কথা এক শ্রেণীর মানুষ মানতে চায় না। তারা মনে করে যে কোন উপায়ে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা যেতে পারে।

সুদ-ঘুষ খেয়ে, অন্যকে ঠকিয়ে, জুয়া খেলে, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে অথবা এমন ধরনের ব্যবসা করে যে ব্যবসার মাধ্যমে জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অশ্লীল নোংরা বই লেখে, চরিত্র বিধ্বংসী অভিনয় করে, নগ্ন সিনেমা তৈরী করে, বেশ্যাবৃত্তি করে, অন্যায়ভাবে মানুষ বেচাকেনা করে, অর্থাৎ যে কোন পথে অর্থ উপার্জন করে ধনশালী হওয়া দিয়ে কথা, ন্যায়-নীতি বা হালাল হারামের কোন প্রশ্ন নেই-এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ অর্থোপার্জন করে।

আবার অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রেও তারা কোন নিয়ম মানতে চায় না। যেমনভাবে খুশী তেমনভাবে ব্যয় করতে চায়। ধন-সম্পদ সমাজের, দেশের, গরীব মানুষের উপকারে আসতে পারে-এমন কাজে অর্থ ব্যয় না করে তারা অপ্রয়োজনীয় ভোগ বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় করে। বাড়ীর পাশের মানুষ বা নিজের একজন গরীব আত্মীয় যিনি অভাবে আছেন, তাকে অর্থ সাহায্য না দিয়ে মদের পেছনে, নগ্ন অশ্লীল গান-বাজনার পেছনে, উদ্দেশ্যহীন খেলাধূলার পেছনে অর্থ ব্যয় করে।

কিন্তু একথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে, হাশরের ময়দানে কঠিনভাবে এর জন্যে জবাবদিহী করতে হবে। আল্লাহর দেয়া বিধান হচ্ছে, সৎপথে সদুপায়ে যেমন প্রতিটি মানুষকে অর্থ উপার্জন করতে হবে, তেমনি সৎপথে ও সৎকাজেই তা ব্যয় করতে হবে। গরীব-দরিদ্র, অক্ষম, অসহায়, অন্ধ, আতুর, উপার্জনহীন আর্তমানুষকে দান করতে হবে। ধন-সম্পদ যেন অকেজো হয়ে শুধু পড়ে না থাকে অথবা তা অযথা ভোগ-বিলাসীতায় ব্যয় না হয়, সে ব্যাপারে চরম সতর্ক থাকতে হবে।

এরপর প্রশ্ন করা হবে মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে। একজন লেখাপড়া না জানা মূর্খ মানুষের কথাই ধরা যাক, লেখাপড়া না জানলেও নিজের স্বার্থ সে ভালোভাবেই বোঝে এবং অর্থ-সম্পদ চেনে ঠিকই। পৃথিবীর জীবনে একজন লেখাপড়া না জানা মানুষের জমির বা অন্য কোন সম্পদ নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে সে সালিশের জন্যে দৌড়ায়, উকিলের কাছে যায়, মোকদ্দমা করে। এ সব স্বার্থের ক্ষেত্রে তার জ্ঞান ঠিকই থাকে-থাকেনা শুধু তার পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষেত্রে। জমা-জমির জন্য মূর্খ মানুষটি দুনিয়ার স্বার্থের টানে উকিলের কাছে ছুটে যায় কিন্তু পরকালের অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি, আল্লাহকে জানার জন্য কোরআন-হাদীস জানা ব্যক্তির কাছে ছুটে যায় না। এ জন্যও তাকে কঠিন জবাব দিতে হবে। লেখাপড়া শিখতে পারিনি, কিছু বুঝতাম না-এসব অজুহাত দেখিয়ে হাশরের ময়দানে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আরেক শ্রেণীর মানুষ, যারা বহু অর্থ ব্যয় করে নানা বিদ্যা অর্জন করে। কিন্তু যে বিদ্যা অর্জন করলে নিজের স্রষ্টাকে জানা যাবে, সে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন করে না। এরাও সেদিন গ্রেফতার হবে। আবার আরেক দল মানুষ, সবধরনের জ্ঞানার্জন করে। কিন্তু জেনে বুঝেই ইসলামী বিধানের সাথে বিরোধিতা করে। এমন মানুষের অভাব নেই যারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত-কিন্তু ইসলামী আইন মেনে চলে না। এ ধরনের সব মানুষকেই আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে, সে তার জ্ঞানকে কিভাবে কোন কাজে ব্যবহার করেছে।

দ্বিতীয় রুকু

এই সূরার ৩১ নং আয়াত থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত ঐ শ্রেণীর লোকদের জন্য পুরস্কারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের পরিচয় ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে মুত্তাকী। অর্থাৎ কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকগুলোই সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে আর সে সাফল্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁরা নে'মাতে পরিপূর্ণ জান্নাত লাভ করবে। (মুত্তাকী শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের শর্ত' শিরোণাম পড়ুন)

জান্নাতের বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ...اِلَى اخِرِالاية

তোমরা একে অপরের সাথে সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রসর হও। তোমার প্রভূর ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে, যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। (হাদীদ-২১)

হাদীসে আছে আল্লাহ যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেবেন তাকেও এ পৃথিবীর মতো দশ পৃথিবীর সমান জান্নাত দেবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا-

সেখানে (জান্নাত) যে দিকে তোমরা তাকাবে শুধু নে'মাত আর নে'মাত এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমরা সেখানে দেখতে পাবে। (সূরা দাহ্র-২০)

জান্নাতে সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। ফুল-ফলের সমাহার এবং সৌন্দর্য শ্যামলতা কখনো ম্লান হবে না। এমন কি গোটা জান্নাত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا-

তাদেরকে সেখানে (জান্নাতে) না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে না শৈত্য প্রবাহ। (সূরা দাহ্র-১৩)

পৃথিবীতে মানুষ যতো বিত্তশালী হোক এবং যতো সুখ-শান্তিই ভোগ করুক না কেনো তবু তার কোন না কোন দুঃখ বা অশান্তি থাকবেই, কোন মানুষই সম্পূর্ণ সুখী নয়। কিন্তু জান্নাতে কোন দুঃখই থাকবে না, এমন কি পৃথিবীতে মাল্টি বিলিয়নার হয়েও আরো বেশী পাওয়ার জন্য এবং ভোগ করার জন্য দুঃখের শেষ থাকে না। পক্ষান্তরে জান্নাতীগণ-যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেয়া হবে তারও কোন অনুতাপ বা দুঃখ থাকবে না। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন-

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ-

তারা সেখানে কখনও কোন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে না এবং কোনদিন সেখান থেকে তাদেরকে বের করেও দেয়া হবে না। (সূরা হিজর-৪৮)

পবিত্র কোরআনের অন্যস্থানে রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ-لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا....اِلَى اخِرِالاية

(জান্নাতীগণ বলবে) তিনি আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে চিরন্তনী আবাসস্থল দান করেছেন, এখন আমাদের কোন দুঃখ এবং ক্লান্তি নেই। (সূরা ফাতির-৩৫)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোষাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না। (মুসলিম)

পৃথিবীতে যতো ঝগড়া ফ্যাসাদ সমস্তই স্বার্থপরতা, অহংকার ও হিংসার কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। জান্নাতে স্বার্থপরতা, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি থাকবে না। সেখানে গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা, ঝগড়া-বিবাদ, অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি কিছুই থাকবেনা। সেখানে শুধু সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করবে। জান্নাতীরা জান্নাতে অর্থহীন ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মহান আল্লাহ বলেন-

لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا-اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا-

সেখানে তারা অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না। যে কথাবার্তা হবে তা ঠিকঠিক ও যথাযথ (সম্প্রীতি পূর্ণ) হবে। (সূরা ওয়াকিয়া -২৫-২৬)

ফেরেশতাগণ জান্নাতীদেরকে সালাম জানাবেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ......اِلٰى اٰخِرِالْاٰيَةِ

অতপর যখন তারা সেখানে (প্রবেশ করার জন্য) আসবে, তখন দ্বার রক্ষীগণ তাদের জন্য দরজাসমুহ খুলে দিবে এবং জান্নাতীদের সম্বোধন করে বলবে, আপনাদের প্রতি অবারিত শান্তি বর্ষিত হোক। অনন্ত কালের জন্য এখানে প্রবেশ করুন। (সূরা যুমার-৭৩)

পৃথিবীতে যতোগুলো বাস্তব ও চাক্ষুষ বস্তু আছে তার মধ্যে মৃত্যু একটি। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষ পার্থিব কোন বস্তু থেকেই অমনোযোগী ও গাফেল নয় একমাত্র মৃত্যু ছাড়া। এমনকি যদিও আমাদের প্রত্যেককেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। এ বাস্তবতার পরও মৃত্যুকে আমরা ভীতির চোখে দেখি এবং মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস পাই। এ ভীতিকর অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা থাকবে জান্নাতীদের জন্য। জান্নাতে কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। সূরা দুখান-এর ৫৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى-وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

সেখানে তারা আর কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। পৃথিবীতে একবার যে মৃত্যু হয়েছে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে দেবেন।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে-হে জান্নাতীগণ ! এখন আর তোমরা কোনদিন অসুস্থ হবে না, সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। কোনদিন আর তোমাদের মৃত্যু হবে না, অন্তকাল জীবিত থাকবে। সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে কখনো তোমরা বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা অফুরন্ত নে'মাত ভোগ করবে কোনদিন শেষ হবে না এবং কখনো দুঃখ অনাহারে থাকবেনা। (মুসলিম-তিরমিজী)

পৃথিবীতে কোন জিনিস পেতে হলে বা ভোগ করতে চাইলে সে জিনিসের জন্য চেষ্টা শ্রম ও কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা বা সম্পদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জান্নাতে ইচ্ছে হওয়া মাত্রই সে জিনিস তার সামনে উপস্থিত পাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا.......اِلٰى اٰخِرِالْاٰيَةِ

সেখানে তোমরা যা কিছু চাও পাবে এবং যার ইচ্ছে করবে সাথে সাথে তাই হবে। এটা হচ্ছে

ক্ষমাশীল ও দয়াবান আল্লাহর তরফ হতে মেহ্মানদারী। (সূরা হা-মীম-আস সিজদা ৩০-৩১)

আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

এবং আমি জান্নাতীদেরকে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ফল ও গোশ্ত প্রদান করতে থাকবো। (সূরা তুর-২২)

এ দান স্থান ও কালের সাথে সীমাবদ্ধ হবে না, নিয়মিতভাবে চিরদিন প্রদান করা হবে। যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا-

এবং সেখানে তাদেরকে নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধ্যা খাদ্য পরিবেশন করা হবে। (মরিয়ম-৬২)

পৃথিবীতে যদিও কোন ব্যক্তি সম্পুর্ণ সুখ সম্ভোগ লাভ করতে পারে না; তবুও যতোটুকু পায় তার মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত ভীত সন্ত্রস্ত থাকে চোর-ডাকাত, প্রতারক এবং মৃত্যুর ভয়ে। কিন্তু জান্নাতের নিয়ামত এবং সুখ ভোগ কোন দিনই কমতি বা শেষ হবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ-وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ-وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ.......اِلَى اخِرِالاية

তাদের জন্য কাঁটাহীন কুলবৃক্ষসমূহ, থরে থরে সাজানো কলা, বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর প্রচুর পুরিমাণে ফল থাকবে। যা কোনদিন শেষ হবে না এবং ভোগ করতে কোন বাধা বিপত্তিও থাকবে না। (সূরা ওয়াকিয়া-২৮-৩৩)

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কুল এমন কোন উত্তম ও উৎকৃষ্ট ফল, জান্নাতে যার সুসংবাদ দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো? কিন্তু সত্য কথা এই যে, জান্নাতের কুল সম্বন্ধে আর কি বলবো, এ দুনিয়ায়ও কোন কোন এলাকার এ ফল এতোই সু-স্বাদু, সুঘ্রাণযুক্ত যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ ধরনের ফল একবার মুখে দিলে ফেলে দেয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। কুল যতো উচ্চমানের হয় তার গাছের কাঁটাও ততো কম হয়ে থাকে। এ কারণেই জান্নাতের কুল ফলের এ রকম প্রশংসা করা হয়েছে যে, জান্নাতের কুলগাছসমূহ একেবারে কাঁটা শুন্য হবে অর্থাৎ জান্নাতের কুল হবে অতীব উত্তম ও উৎকৃষ্টমানের। সে ধরনের কুল পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব নয়। সূরা সাদ-এর ৫০ থেকে ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ-مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا......اِلَى اخِرِالاية

চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ যার দ্বারগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এবং প্রচুর ফল ও পানীয় চেয়ে পাঠাবে, আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকবে। এ জিনিসগুলো এমন যা হিসেবের দিন দান করার জন্য তোমাদের নিকট ওয়াদা করা হয়েছে। এটা আমাদের দেয়া রিজিক, কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না।

হুরদের সাথে জান্নাতে জান্নাতীদেরকে আল্লাহ বিয়ে দেবেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ-وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ-

তারা সামনা সামনিভাবে সাজানো সারি সারি আসন সমূহের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং আমি তাদের সাথে সুনয়না হুরদেরকে বিয়ে দেবো। (সূরা তুর-২০)

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ-

(এসব নে'মাতের মধ্যে থাকবে) তাদের জন্য সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীগণ। (রাহমান-৭০)

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসাবে সূরা ওয়াকিয়ার এক আয়াতে বলা হয়েছে-

انَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاءً-فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا-عُرُبًا اَتْرَابًا-

তাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেবো। তারা হবে নিজেদের স্বামীর প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ। (ওয়াকিয়া)

এখানে পৃথিবীর সেসব মহিলাদের কথা বলা হয়েছে, যারা 'আমলে সালেহ' এর বিনিময়ে জন্নাতে যাবে। তারা পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ, কালা, কুৎসিত, যুবতী, বিধবা, অথবা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন, আল্লাহ জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী, সুনয়না হিসেবে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং তারা আজীবন কুমারী থাকবে কখনো তারা বার্ধক্যে উপনীত হবে না। হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার মহিলারা উত্তম না হুরগণ ? বিশ্বনবী বললেন, দুনিয়ার মহিলারা হুরদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, তার কারণ কি ? তিনি বললেন, তা এ কারণে যে ঐ মহিলারা নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে, ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী করেছে। (তাবারানী)

ঐ সমস্ত হুর এবং স্ত্রীগণ শুধু কুমারীই হবে না এমন অবস্থায় থাকবে যে, জান্নাতীদের স্পর্শের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন তাদেরকে স্পর্শ করেনি বা দেখেওনি। কেননা বিচারের পূর্বে কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা তাই তাদেরকে দেখা বা স্পর্শ করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌّ-

তাদেরকে (জান্নাতীদের) পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বীন স্পর্শ করেনি। (আর-রাহমান-৫৬)

হুরদের রূপ সৌন্দর্যের উপমা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেন- كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ

তারা এমনই সুন্দরী রূপসী, যেনো হীরা ও মুক্তা। (সূরা আর-রাহমান-৫৮)

আল্লাহর কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِالْمَكْنُوْنِ-

তারা এমন সুশ্রী ও সুন্দরী হবে যেনো (ঝিনুকের মধ্যে) লুকিয়ে থাকা মুক্তা। (ওয়াকিয়া-২৩)

জান্নাতীদের জন্য হুরের পাশাপাশি গিলমান থাকবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌمَّكْنُوْنٌ-

আর তাদের সেবা যত্নে সে সব বালক দৌড়াদৌড়ির কাজে নিযুক্ত থাকবে যারা কেবলমাত্র তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। এরা এমন সুন্দর সুশ্রী হবে যেমন (ঝিনুকে) লুকিয়ে থাকা মুক্তা। (তুর)

গিলমান বা সেবকগণ হবে চিরন্তন বালক। এদের বয়স কোনদিনই বাড়বে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ-اِذَارَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ...اِلَى اخِرِالاية

তাদের সেবার জন্য এমন সব বালক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ী করতে থাকবে যারা চিরদিনই বালক থাকবে । তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেনো ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা। (সূরা দাহর-১৯)

সূরা আল্ ওয়াকীয়াতে বলা হয়েছে-

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ-بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ......اِلَى اخِرِالاية

তাদের মজলিস সমূহে চিরন্তন ছেলেরা প্রবাহমান ঝর্ণার সূরায় ভরা পানপাত্র ও হাতলধারী সূরাভান্ড ও আবখোরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ী করতে থাকবে। (সূরা ওয়াকিয়া ১৭-১৮)

জান্নাতে জান্নাতীদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–জান্নাতুল আদ্নে (চিরন্তনী জান্নাত) যারা প্রবেশ করবে তাদেরকে সেখানে স্বর্ণের কংকন ও মনি -মুক্তার অলংকারে সজ্জিত করা হবে এবং তাদেরকে রেশমের কাপড় পরানো হবে। আরেক আয়াতে বলা হয়েছে–

عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ–وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ–

তাদের ওপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক ও মখমলের কাপড় থাকবে। এবং তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে। (সূরা দাহ্র-২১)

সূরা আল-কাহাফে বলা হয়েছে–

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ.........اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে। তারা সূক্ষ্ণ ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করবে এবং উচ্চ আসনের উপর ঠেস লাগিয়ে বসবে। এটা অতি উত্তম কর্মফল ও উঁচু স্তরের অবস্থান। (সূরা কাহাফ-৩১)

আর-রাহমানে বলা হয়েছে– – مُتَّكِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

তারা সবুজ গালিচা ও সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় এলায়িতভাবে অবস্থান করবে। (রাহমান-৭৬)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেন–

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ.....اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

তাদের সম্মুখে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হবে। সে কাঁচ- যা রৌপ্য জাতীয় হবে এবং সেগুলোকে পরিমাণ মতো ভরতি করে রাখা হবে। (দাহ্র-১৫-১৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে–তাদের সামনে সোনার থালা ও পান পাত্র আবর্তিত হবে এবং মন ভুলানো ও চোখের তৃপ্তিদানের জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে এখন তোমারা চিরদিন এখানে থাকবে। (সূরা যুখরুফ-৭১)

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন বালাখানা আছে (স্বচ্ছতার কারণে) যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যায়। (যাদেরাহ্)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীদের চিরুনী হবে স্বর্ণের তৈরী, তাদের ধূপদানী সুগন্ধ কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে। (বুখারী, মুসলিম)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ ......اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

ঐ সমস্ত ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ! যারা আমলে সালেহ (সৎকাজ) করবে, তাদের জন্য এমন সব বাগান সমূহ আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমুহ প্রবাহিত হবে। (আল্‌বাকারা -২৫)

বাগান সমূহের নীচ দিয়ে নদী প্রবাহের অর্থ হচ্ছে, বাগান সমূহের পাশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহমান থাকবে। কেননা বাগ-বাগিচা যদিও নদীর কিনারে হয় তবু তা নদী থেকে একটু উঁচু

জায়গায়ই হয়ে থাকে এবং নদী ও বাগান থেকে সামান্য নীচু দিয়েই প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত জায়গায় ঝর্ণার কথা বলা হয়েছে সেখানে বাগান এবং ঝর্ণা একত্রে থাকবে একথাই বলা হয়েছে। আমরা জানি বাগানের মধ্যে বা একই সমতলে ঝর্ণা থাকা সম্ভব। শুধু সম্ভবই নয় বাগানের শোভা বর্ধনের একটি অন্যতম উৎস ও বটে। তাই কুরআনের ভাষা হচ্ছেঃ সেদিন তারা বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণা সমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-জান্নাতের ছায়া তাদের উপর বিস্তৃত হয়ে থাকবে এবং তার ফল সমূহ সর্বদা আয়ত্বের মধ্যে থাকবে। (সূরা দাহর-১৪)

একই জায়গায় নানা ধরনের ফুল-ফলের বাগান, বড়ো বড়ো ছায়াদার বৃক্ষরাজি, ঝর্ণাসমূহ, সাথে বিশাল আয়তনের অট্টালিকাসমূহ, পাশ দিয়ে প্রবাহমান নদী-নালা, একত্রে এগুলোর সমাবেশ ঘটলে পরিবেশ কতো মোহিনী মনোমুগ্ধকর হতে পারে তা লিখে বা বর্ণনা করে বুঝানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয় শুধুমাত্র মনের চোখে কল্পনার ছবি দেখলে কিছুমাত্র অনুমান করা সম্ভব । জান্নাতে মোট চার ধরনের নদী প্রবাহিত হবে। যথা-পানি, দুধ, মধু ও শরাব। তাছাড়া তিন ধরনের ঝর্ণা প্রবাহমান থাকবে। কাফুর, সালসাবিল ও তাছনীন নামক ঝর্ণা। মহান আল্লাহ বলেন-

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ-فِيْهَا اَنْهٰرٌ-مِّنْ....اِلَى اخِرِ الايَةَ

মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিলো তার পরিচয় হচ্ছে, সেখানে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির নদী প্রবাহমান থাকবে। এমন দুধের নদী প্রবাহিত হবে যা কখনো বিস্বাদ হবে না। এমন শরাবের নদী প্রবাহিত হবে যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় (নেশাহীন) হবে। (তাছাড়া) স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর নদীও প্রবাহিত হবে। (সূরা মুহাম্মদ-১৫)

জান্নাতীদের খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগান সমূহে ও নিয়ামত সম্ভারের মধ্যে অবস্থান করবে। মজা ও স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে সে সব জিনিসের যা তাদের রব তাদেরকে দেবেন। আর তাদের রব তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন। (তাদেরকে বলা হবে) খাও এবং পান করো মজা ও তৃপ্তির সাথে। এটা তো তোমাদের সে সব কাজের প্রতিফল যা তোমরা পৃথিবীতে করছিলে। (সূরা তুর-১৭-১৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে-সেখানে তারা বাঞ্ছিত সুখভোগে লিপ্ত থাকবে। (তাদের অবস্থান হবে) জান্নাতের উচ্চতম স্থানে। যার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলতে থাকবে। (বলা হবে) খাও এবং পান করো, তৃপ্তি সহকারে। সে সব আমলের বিনিময় যা তোমরা অতীত দিনে করেছো। (সূরা আল্ হাক্কাহ-২১-২৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন-وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ

সেখানে তাদের জন্য সর্ব প্রকারের ফল থাকবে এবং আরও থাকবে তাদের রবের নিকট হতে ক্ষমা। (সূরা মুহাম্মদ-১৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে-আর খাদেমগন তাদের সামনে রং বেরংয়ের ফল পেশ করবে, যেনো তারা তাদের যা পছন্দ তাই তুলে নিতে পারে। এছাড়া (বিভিন্ন) পাখীর গোশতও সামনে রাখবে, যে পাখীর গোশত ইচ্ছে নিয়ে খেতে পারবে। (সূরা ওয়াকিয়া-১৯-২০)

সূরা আত্-তুরে বলা হয়েছে-আমরা তাদেরকে ফল গোশ্ত তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী খুব বেশী

বেশী করে দিতে থাকবো। তারা প্রতিযোগীতামূলকভাবে পানপাত্রসমূহ গ্রহণ করতে থাকবে কিন্তু সেখানে কোন প্রকার হৈ-হল্লা বা কোলাহল হবে না। (সূরা তুর- ২২-২৩)

পানীয় দ্রব্যের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ-بَيْضَاءَ لَذَّةٍ ....اِلَى اخِرِالاية

শরাবের ঝর্ণা সমূহ হতে পানপাত্র পূর্ণ করে তাদের মধ্যে পরিবেশন করা হবে। তা উজ্জল পানীয়, পানকারীদের জন্য সুপেয় ও সুস্বাদু হবে কিন্তু তাদের দেহে সেটা কোন ক্ষতি করবেনা এবং তাদের বোধ শক্তিও বিলোপ হবে না। (সূরা ছাফ্‌ফাত-৪৫-৪৭)

যদিও শরাবের আকৃতি পৃথিবীর শরাবের মতো দেখা যাবে কিন্তু তা হবে অত্যন্ত পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত। আল্লাহ তা'য়ারা বলেন- وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا-

তাদের রব তাদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন (নেশাহীন) শরাব পান করাবেন। (সূরা দাহর-২১)

অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَاكَاْسًاكَانَ مِزَاجُهَازَنْجَبِيْلاً-عَيْنًافِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلاً-

তাদেরকে সেখানে এমন সূরাপাত্র পান করানো হবে যাতে আদ্রক জাতীয় দ্রব্যের সংমিশ্রণ থাকবে। এটা হবে জান্নাতের সালসাবিল নামক ঝর্ণাধারা। (সূরা দাহার-১৭-১৮)

উক্ত শরাবের আরো দু'টি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে-সুরা মুতাফ্‌ফিফীনে-

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ-خِتْمُهُ مِسْكٌ-وَفِيْ ذَالِكَ...اِلَى اخِرِالاية

তাদেরকে উত্তম উৎকৃষ্ট মুখবন্ধকৃত শরাব পান করানো হবে এবং তার উপর মিশ্‌কের সীল লাগানো থাকবে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন-২৫-২৬)

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمٍ-عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ-

সে শরাবে তাসনীম মিশ্রিত হবে। এটা একটি র্ঝণা। সে ঝর্ণার পানির সাথে নিকটবর্তী লোকেরা শরাব পান করবে। (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন- ২৭-২৮)

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণনা করেছেন-তিনি বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতের খাবার খাবে এবং পানীয় বস্তু পান করবে কিন্তু সেখানে তাদের মলমুত্র প্রয়োজন হবে না, এমনকি তাদের নাকে ময়লাও জমবে না। ঢেকুরের মাধ্যমে তাদের পেটের খাদ্র দ্রব্য হজম হয়ে মিশ্‌কের সুগন্ধির মতো বেরিয়ে যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতোই তারা তাসবীহ্ তাকবীরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।' (মুসলিম)

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তাদেরকে মলমুত্র ত্যাগ করতে হবে না, মুখে থুথু আসবেনা, আর নাকে কোনরূপ ময়লা জমবে না।' (বুখারী, মুসলিম)

কোরআনে বলা হয়েছে- أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ-فَوَاكِهُ-وَهُمْ مُكْرَمُوْنَ-

তাদের জন্য চেনা-জানা রিজিক রয়েছে। সর্ব প্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি এবং সেখানে তারা সম্মানের সাথে বসবাস করবে। (সূরা আছ্-ছাফ্‌ফাত-৪১-৪২)

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে-

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا-قَالُوْا هَذَا الَّذِىْ...اِلَى اخِرِالاية

জান্নাতের ফল দেখতে পৃথিবীর ফলের মতোই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলবেঃ এ ধরনের ফল তো আমরা পৃথিবীতেই খেয়েছি। (বাকারা–২৫)

ফলগুলো যদিও পৃথিবীর মতো হবে কিন্তু স্বাদে ও গন্ধে সম্পূর্ণ উন্নত ও ভিন্ন ধরনের হবে। প্রতিবার খাওয়ার সময়ই তার স্বাদ গন্ধ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীতে দুঃখ আছে বলেই সুখকে আমরা উপভোগ করতে পারি কিন্তু জান্নাতে যদি দুঃখ না থাকে তবে শুধু সুখ উপভোগ করা যাবে কি? বা সুখ ভোগ করতে করতে একঘেয়েমি লাগবে না? এর দু'টি উত্তর হতে পারে। প্রথমতঃ জান্নাতীগণ জাহান্নামীদের অবস্থা অবলোকন করতে পারবে এবং কথোপোকথনও হবে তাই তাদের সুখকে জাহান্নামীদের সাথে তুলনা করতে কষ্ট হবে না এবং সে সুখে এক ঘেয়েমিও আসবে না। দ্বিতীয়তঃ দুঃখ না থাকলেও সুখের মাত্রা স্থিতিশীল হবে না, পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কাজেই সে সুখভোগ কখনো ক্লান্তি আসবে না বরং সুখভোগের অনুভূতি তীব্র হতে তীব্রতর হবে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا...اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান ও ঈমানের কোন মাত্রায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে, তাদের সে সন্তানদেরকে আমরা (জান্নাতে) তাদের সাথে একত্রিত করবো, আর তাদের আমলে কোন কমতি করা হবে না। (সূরা তুর–২১)

সুরা রা'দে বলা হয়েছে–তারাতো চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশ করবেই, তাদের সাথে তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা, সৎ ও নেক্‌কার তারাও তাদের সাথে সেখানে (জান্নাতে) যাবে। ফেরেশতাগণ চারদিক হতে তাদেরকে সম্বর্ধনা দিতে আসবে এবং বলবে তোমাদের প্রতি শান্তি। (সূরা রা'দ–২৩)

আল্লাহর কোরআনে জান্নাতীদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ডান বাহুর লোক এবং অগ্রবর্তী লোক। সূরা ওয়াকিয়া-এর ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ–مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ–

অতঃপর ডানবাহুর লোক। ডানবাহুর লোকের (সৌভাগ্যের কথা) কি বলা যায়?

মহান আল্লাহ বলেন– وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ–اُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ

আর অগ্রবর্তী লোকেরা তো অগ্রবর্তীই। তারাই তো সান্নিধ্যশালী লোক। (ওয়াকীয়া–১০-১১)

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'জান্নাতীরা তাদের উপরতলার কক্ষের লোকদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন করে তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জল তারকাগুলো দেখতে পাও। তাদের পরস্পর মর্যাদার পাথর্ক্যের কারণে এরূপ হবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ স্তর গুলো কি নবীদের যা অন্য কেউ লাভ করতে পারবে না? তিনি বললেন–কেন পারবে না। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং নবীদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারা ঐ স্তরে যেতে সক্ষম হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, জান্নাতীদের আমলের তারতম্যের কারণে সেখানে তাদের মর্যাদাও বিভিন্ন রকম হবে। অনেক হাদীসে জান্নাতীদের নে'মাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে

বলা হয়েছে নিম্নমানের এক জান্নাতীকে নানা বস্তু দেয়া হবে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতীদেরকে আল্লাহ তাদের আমল ও মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন মানের জান্নাত দেবেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য যা কিছু রেখেছি তা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান তা শুনেনি, কোন হৃদয়ও তা কল্পনা করতে পারেনি। (হাদীসে কুদ্সী-বুখারী, মুসলিম)

হাশরের ময়দানে বিচারের দিনে মানুষের কর্মফল অনুযায়ী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহর আদালতের সামনে থাকবে একটি দল। ডান পাশে থাকবে একটি দল। বাম পাশে থাকবে একটি দল। পবিত্র কোরআন শরীফে এর একটা সুন্দর চিত্র দেখানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً-فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ-مَا اَصْحٰبُ ....اِلَى اخِرِالاية

সেদিন তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হবে। ডান পাশের দল। এ দলটির কথা কি বলবো? "বাম পাশের আরেকটি দল। এ দলটির দূর্ভাগ্যের কথা কি বলা যায় ? আরেকটি দল হলো অগ্রবর্তী (বা সামনের) দল। এটা হলো সেই দল, যাদের মর্যাদা সর্বোচ্চে। তারাই তো সান্নিধ্যশালী লোক। তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করবে। পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে বেশী সংখ্যক হবে। আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে কম সংখ্যক হবে। (সূরা ওয়াকেয়া ৭-১৪)

সামনের দলে তাঁরাই অবস্থান করবে যারা পৃথিবীতে আল্লাহও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় যাবতীয় বিপদ মুসিবত হাসি মুখে বরণ করেছেন। ইসলামী বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে যারা সবচেয়ে বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে যারা সবার আগে সাড়া দিয়েছেন।

সত্য বলার ক্ষেত্রে, দানের ক্ষেত্রে, মানুষের সেবা করার ক্ষেত্রে, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ক্ষেত্রে, ইসলামী বিধি বিধান সমাজে-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে যারা সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে, তাঁরাই আল্লাহর আদালতের সামনের আসনে স্থান পাবে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে, একদিন আল্লাহর নবী তাঁর সাহাবাগণকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জানো কারা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর (কুদরতের) ছায়ায় স্থান গ্রহণ করবে? সাহাবাগণ বললেন, তারা ওই সমস্ত লোক, যারা কোন প্রশ্ন ছাড়াই মহাসত্যকে গ্রহণ (অর্থাৎ ইসলামকে গ্রহণ করে তা মান্য করে চলে) করে। তারা নিজেদের জন্যে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অন্যের ক্ষেত্রেও সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পবিত্র কোরআনে সূরা ওয়াকিয়ায় এই অগ্রবর্তী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে–

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ-مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ....اِلَى اخِرِالاية

তারা বালিশে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে মহামূল্যবান সিংহাসনে বসবে তাদের আশে পাশে চির কিশোরের দল ঘুরে ফিরে আনন্দ পরিবেশন করবে তাদের হাতে থাকবে পানীয় পাত্র। পান পাত্র ও ঝর্ণা থেকে আনা পরিশুদ্ধ সূরা ভরা পেয়ালা। এ সুরা পান করে না মাথা ঘুরবে না জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে। এবং চির কিশোরেরা তাদের সামনে পরিবেশন করবে বিভিন্ন উপাদেয় ফলমূল, যেন তার মধ্যে যা মন চায় তা তারা গ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে বিভিন্ন পাখীর সুস্বাদু গোশ্ত। ইচ্ছা অনুযায়ী তারা

তা খাবে। তাদের জন্যে নির্ধারিত থাকবে সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট অপরূপ অপ্সরী। তাদের সৌন্দর্য হবে সযত্নে রক্ষিত মণি-মুক্তার ন্যায়। পুণ্যফল হিসেবে তারা তা লাভ করবে সে সব সৎকাজের বিনিময়ে যা তারা পৃথিবীতে করেছে। সেখানে তারা শুনতে পাবে না কোন অনর্থক বাজে গালগল্প। অথবা কোন পাপ চর্চা অসদালাপ। তাদের কথাবার্তা আলাপ আলোচনা হবে শালীনতাপূর্ণ। থাকবেনা তার মধ্যে কোন প্রগলভতা। তাদেরকে শুধু, এই বলে সম্বোধন করা হবে, আপনাদের প্রতি সালাম। (সূরা ওয়াকেয়া-১৫-২৬)

হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতের ডান পাশের দল সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করছে-

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ-مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ-فِىْ سِدْرٍ.....اِلَى اخِرِالاية

এরা লাভ করবে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছায়াযুক্ত কন্টকহীন কুল ও ফলবাগান আর সর্বদা প্রবাহিত পানির ঝর্ণাধারা ও অফুরন্ত ফলমূল। এ সকল ফলমূল সকল মৌসুমেই পর্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যাবে এবং তা লাভ করবে ও তার স্বাদ লাভ করতে কোন বাধা বিপত্তি থাকবে না। তারা উচ্চ আসনে সমাসীন থাকবে। তাদের স্ত্রীদেরকে নতুন করে গঠন করা হবে। তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দেয়া হবে। তারা হবে প্রেমদায়িনী। তাদের বয়স হবে সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হবার বয়স। এ সবকিছু ডান পাশের মানুষের জন্যে। (ওয়াকেয়া-২৭-৩৮)

সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা জান্নাতি হবেন তারাই ডান পাশের দলে অবস্থান করবে। জান্নাতে কুমারীগণ ওই সমস্ত নারীই হবেন পৃথিবীতে যারা ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করেছেন। পৃথিবীতে তারা বৃদ্ধা অবস্থায় ইন্তেকাল করলেও জান্নাতে তারা হবেন নব যৌবনা। দুনিয়ায় তারা সুন্দরী অথবা কুৎসিত থাকুন না কেন, জান্নাতে তারা হবেন অকল্পনীয় সুন্দরী। তারা একাধিক সন্তানের মা হয়ে ইন্তেকাল করলেও জান্নাতে হবেন চির কুমারী। স্বামীর সাথে অসংখ্য বার মিলিত হলেও তাদের কুমারীত্ব মুছে যাবে না। এসব সৌভাগ্যবতী নারীগণের স্বামীগণও যদি জান্নাতবাসী হন, তাহলে সেখানে তারা একে অপরকে লাভ করবে। অন্যথায় তাদের নতুন করে বিয়ে হবে।

তিরমিজি শরীফে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, একদিন এক বৃদ্ধা নারী আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললো-ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্যে আপনি দোয়া করুন। আমি যেন আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে পারি। আল্লাহর রাসূল সাধারণত মৃদু রসিকতা করে মানুষকে অনেক সময় আনন্দ দিতেন। ওই বৃদ্ধার সাথে রসিকতা করে তিনি বললেন, কোন বৃদ্ধা তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ! (একটা কথা মনে রাখতে হবে, রাসূল রসিকতা করতেন বটে, কিন্তু সে রসিকতা হতো সত্য ও ন্যায় ভিত্তিক। কাল্পনিক কোন কথা বা মিথ্যে কথা দ্বারা তিনি রসিকতা করতেন না)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে বৃদ্ধা হতাশ হয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চলে যেতে লাগলো। আল্লাহর রাসূল অন্য সাহাবাদের বললেন, তোমরা ওই নারীকে ডেকে বলে দাও, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। আল্লাহ যে নারীদেরকে জান্নাত দান করবেন তাদেরকে তিনি কুমারী করে পয়দা করবেন।

অর্থাৎ কোন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জান্নাতে থাকবে না। পৃথিবীতে মানুষ যত বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়েই মৃত্যুবরণ করুক না কেন, তারা যদি জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পায় তাহলে তারা নতুন যৌবন লাভ করবে।

তাবারানীতে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার একটি বর্ণনায় পাওয়া য়ায় যে, তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে কোরআনে বর্ণিত জান্নাতের কুমারীগণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহর নবী বলেছিলেন, এরা হলো সেই সব নারী যারা পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করেছিল। আর তারা ছিল বৃদ্ধা। তাদের চোখ ছিল কোঠরাগত। মাথার চুল ছিল পাকা এবং সাদা। তারা এরূপ বৃদ্ধা হবার পরেও আল্লাহ তাদেরকে কুমারী করে পয়দা করবেন।

এই সূরার ৩৬ নং এবং ৩৭ নং আয়াতে জান্নাতীদের সৌভাগ্য সম্পর্কে বলা হচ্ছে এসব তাদের কর্মের পূর্ণমাত্রার পুরস্কার স্বরূপ এবং তা তাঁরা লাভ করছে সেই রব্ব–যিনি অত্যন্ত দয়াবান এবং তিনি জমীন ও আকাশসমূহের এবং এই দুইয়ের ম.ধ্য অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের একচ্ছত্র মালিক–তাঁর পক্ষ থেকে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যারা জান্নাত লাভ করবেন, তাঁরা তাঁদের কর্মের বিনিময় যতটুকু ততটুকুই লাভ করবেন না, বরং করুণাময় আল্লাহ বহুগুণ বেশী দান করবেন। আর যারা জাহান্নামে গমন করবে, তারা তাদের কর্মের বিনিময় হিসাবে যতটুকু শাস্তি লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, ততটুকুই ভোগ করবে, সামান্য বেশী কম হবে না। আল্লাহর কোরআন বলছে–

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ–وَلاَ يَرْهَقُ ....اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

যারা ভালো কাজের নীতি অবলম্বন করেছে, তারা ভাল ফল লাভ করবে আর অধিক অনুগ্রহও। কলঙ্ক কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের মুখমন্ডলকে মলিন করবে না। তারাই জান্নাত লাভের অধিকারী; সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল লাভ করবে। লাঞ্ছনা তাদের ললাট লিখন হয়ে থাকবে। আল্লাহর এই আযাব থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই। তাদের মুখমন্ডলে এমন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে যেমন রাতের কালো পর্দা তাদের ওপরে পড়ে রয়েছে। তারাই জাহান্নামে যাবার যোগ্য, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা ইউনুস-২৬-২৭)

অর্থাৎ ভালো কাজের বিনিময়ে যতটুকু প্রতিফল পাওয়ার যোগ্য হবে, তার থেকে কয়েকগুণ বেশী দেয়া হবে, আর মন্দ কাজের বিনিময়ে অতিরিক্ত কোন শাস্তি দেয়া হবে না। যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই দেয়া হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا–وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ.....اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভালো প্রতিদান পাবে এবং এ ধরনের লোকেরা সেদিনের ভীতি-বিহ্বলতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যারা অসৎকাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে অধোমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান পেতে পারো। (সূরা আন নামল-৮৯-৯০)

একই কথা সূরা আল কাসাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا–وَمَنْ جَاءَ ....اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

যে কেউ ভাল কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে তার চেয়ে ভাল ফল এবং যে কেউ খারাপ কাজ নিয়ে আসে তার জানা উচিৎ যে, অসৎ কর্মশীলরা যেমন কাজ করতো ঠিক তেমনিই প্রতিদান পাবে। (সূরা কাসাস-৮৪)

(সূরা নাবার ৩৭ নং আয়াতে ব্যবহৃত 'রব, রাহ্মান ও আকাশসমূহ' শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার ১ নং ও ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন)

সূরা নাবার ৩৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে, যেদিন রূহ ও ফেরেশ্তা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে।' অধিকাংশ তাফসীরকারের মতামত অনুসারে উল্লেখিত আয়াতে 'রূহ' বলতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনে কোথাও তাঁর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কোথাও শুধু 'রূহ' এবং কোথাও 'রূহুল আমীন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামও তো ফেরেশ্তা, সুতরাং তাঁকে ফেরেশ্তাদের কাছ থেকে পৃথক করে কেন রূহ, রূহুল আমীন ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে ?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, তাঁকে ভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর বিশাল মর্যাদার কারণে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। ওহী বহন করার সম্মান তিনি ব্যতীত অন্য কোন ফেরেশ্তা লাভ করেননি। মিরাজে রাসূলকে নিয়ে গমন করার মতো বিরাট মর্যাদা তিনিই লাভ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সনদ দান করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত আমানতদার। তাঁরই নেতৃত্বে কিয়ামতের দিন সমস্ত ফেরেশ্তা আল্লাহর আদালতে কাতারবন্দী হয়ে দন্ডায়মান হবে। এ জন্যই তাঁকে রূহ বা রূহুল আমীন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সূরার ৩৭ নং ও ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যাঁর সাথে কথা বলার সাহস কারো হবে না, যেদিন রূহ ও ফেরেশ্তা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে, কেউ-ই কোন কথা বলবে না–সে ব্যতীত, যাকে পরম দয়াবান অনুমতি দেবেন এবং সে যথাযথ কথা বলবে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ গোটা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। এই বিশ্বে বা এর বাইরেও যদি কিছু থেকে থাকে, সেসব কিছুরই একমাত্র মালিক তিনি। আখিরাতের ময়দানেরও মহান মালিক তিনিই। পরকালে কার ব্যাপারে তিনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন– সে ক্ষমতা শুধু তারই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ-يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

সেদিন (কিয়ামতের দিন) একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধু মহান আল্লাহর। তিনিই মানুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। (সূরা হজ্ব-৫৬)

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে শত শত কোটি মানুষের বিচার কার্য পরিচালনার জন্যে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্যে, কারো কোন সাহায্য বা কারো কোন পরামর্শের প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তিনি নিজেই তো স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সর্বজ্ঞ। প্রতিটি মানুষের প্রকাশ্য ও গোপন কর্মকান্ড সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন তদুপরি ন্যায় ও ইনছাফ প্রদর্শনের জন্যে মানুষের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন কর্ম পুংখানুপুংখরূপে তাঁর নিষ্পাপ ফেরেশতাগণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে আমলনামায় রেকর্ড বানিয়ে রেখেছেন।

এ আমলনামা ফেরেশ্তাগণ লেখেন। তাদের কোন ভুল হয় না। ভুল ভ্রান্তি ও পাপ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাই বলে মহান আল্লাহ ফেরেশতা কর্তৃক লিখিত আমলনামার উপরে নির্ভরশীল নন। কারণ ফেরেশতাগণ অদৃশ্যে কি ঘটছে তা জানতে পারে না। মানুষ ইশারা ইঙ্গিতে পরস্পরে কি বলে, মনে মনে কি চিন্তা করে, এসব তারা জানতে পারেন না। মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে, সে সম্পর্কে ফেরেশতাদের জ্ঞান নেই।

কিন্তু আল্লাহর নিকট বর্তমান, ভবিষ্যত ও অতীত বলে কিছু নেই। মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে তার বর্তমানরূপ তার সামনে উপস্থিত থাকে। সুতরাং ফেরেশ্‌তাদের লিখিত আমলনামা ছাড়াই তিনি তার সঠিক জ্ঞান দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু ন্যায় ও ইনছাফের দৃষ্টিতে এবং মানুষের বিশ্বাসের জন্যে আমলনামা লেখার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কারো পরামর্শ, কারো সাহায্য, কারো সহযোগিতা নিতে হলে আল্লাহকে তার আসন ছেড়ে নিচে নেমে আসতে হবে। অন্য কেউ আল্লাহর উপরে প্রভাব খাটাবে, আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তার করবে, সুপারিশ করে আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে পারবে এ ধরনের বিশ্বাস যার মনে স্থান দেবে তারা আর যা-ই হোক অবশ্যই মুসলমান নয়। সুতরাং বিচারের দিনে কোন পীর, ওলী, মওলানার পরামর্শ বা সুপারিশ গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন আল্লাহর নেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّ لاَشَفَاعَةٌ-

সেদিন (হাশরের দিন) আসার পূর্বে-যেদিন না লেন-দেন হবে, না বন্ধুত্ব উপকারে আসবে, আর না চলবে কোন সুপারিশ। (সূরা বাকারা-২৫৪)

পবিত্র কোরআনের অপর আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ-

কে এমন আছে যে তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারা-২৫৫)

কিন্তু পৃথিবীতে কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা এবং বিশ্বাস যে, এমন কিছু পীর, মাওলানা, ওলী আছেন যাঁরা হাশরের ময়দানে তাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সুপারিশ অনুযায়ী তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে পাঠাবেন। এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে কিয়ামতের ময়দানে তারা তাদের জন্যে সুপারিশ করবে। আর কেউ কারো পাপের জামিনদার হবে-এ বিশ্বাস কোন মুসলমানের হতে পারে না। এ বিশ্বাস হলো যীশুর অনুসারী খৃষ্টানদের। তারা মনে করে তাদের সমস্ত পাপের জামীনদার হলো যীশু। যারা বিশ্বাস করে অমুক 'বাবা' অমুক 'পীর' অমুক 'ওলী' কিয়ামতের ময়দানে আমাদের জন্যে সুপারিশ করবে, তারা আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করার চেয়ে ওই তথাকথিত 'সুপারিশকারীদের' কাছে বেশী ধর্না দেয়। কারণ তারা মনে করে ওই ব্যক্তি আল্লাহর খুব কাছের, আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি, আল্লাহর উপর ওই ব্যক্তির সাংঘাতিক প্রভাব।

এই ধরণের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ নিজের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে পৃথিবীর ভোগ বিলাস থেকে দূরে সরে আল্লাহর আইন মেনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে-তারা ওই সমস্ত মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে, যাদেরকে তারা সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করে। তাদের সন্তুষ্টির জন্যে তাদেরকে নযর নিয়ায দান করা, তাদের নামে গরু, খাসী, মুরগী, নগদ টাকা মানত করা, তাদের কবরে ফুল, মিষ্টি, গোলাপ পানি, মোমবাতি, আগরবাতি, কবরে শায়িত ব্যক্তির নামে ওরশ করা-নিজেরা এগুলো অতি উৎসাহের সাথে করে এবং অপরকেও করতে উৎসাহ দান করে। তাদের বিশ্বাস এসব করলে তিনি হাশরের মাঠে তার জন্যে সুপারিশ করবেন।

আল্লাহর দেয়া বিধান ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবেই এক শ্রেণীর মানুষ ওই ধরণের ভুল করে থাকে। কিছু মানুষের ধারণা মৃত্যুর পরে যদি সত্যই কোন জীবন থেকেই থাকে, তাহলে সে জীবনে সহজে মুক্তি পাবার উপায় কি? এ প্রশ্ন যখন তাদের মনে জাগে তখন শয়তান এসে কুমন্ত্রনা দেয়, "অমুক মাজারে গিয়ে সেজদা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করো। তিনি পরকালে তোমার জন্যে সুপারিশ বা শাফায়াত করবেন।"

শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুযায়ী তারা দল বেঁধে আল্লাহর ওলীদের মাজারে গিয়ে এমন ভক্তি শ্রদ্ধা ও আবেদন নিবেদন জানায়, যে আবেদন নিবেদন জানানো উচিত ছিল মহান আল্লাহর দরবারে। ওই হতভাগা মানুষগুলো একথা বুঝতে চায়না, তাদের আবেদন-নিবেদন কবরের ওই মানুষটি শুনতে পারছে না। শুধু তাই নয় কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যখন তার ওলীদের জানিয়ে দেবেন, তোমাদের মাযারকে কেন্দ্র করে ওই মানুষগুলো এই এই কাজ করেছে। তখন ওলীগণ ওই হতভাগাদের আচরনের কারণে চরম অসন্তুষ্ট হবেন।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা জীবিত অথবা মৃত মানুষকে নিজের প্রভু বানিয়ে নেয় অথবা তাদেরকে খোদার শরীক বানায় তাদের জন্যে অভিশাপ ছাড়া কোন বুজুর্গ-ওলীর পক্ষ থেকে দোয়া বা সুপারিশের আশা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর্তমান পৃথিবীতে কিছু মানুষ তাদের দরবারে যারা যাতায়াত করে তাদের মধ্যে ওই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাই বেশী-সমাজে যারা অসৎ হিসেবে চিহ্নিত।

এই অসৎ দুষ্কৃতিকারী মানুষগুলো প্রকৃত ইসলামের অনুসারী না হয়ে ছুটে যায় এবং শ্রেণীর পীরদের দরবারে বা মাজারে। তাদের বিশ্বাস পরকালে তার পীর সাহেব আল্লাহর দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করে তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ আশায় তারা তাদের পীর সাহেবকে নানা ধারনের মুল্যবান উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। একথা অবশ্যই সত্য যে, কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে যে সমস্ত ব্যক্তিগণকে শাফায়াত বা সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন-তারা অবশ্যই ও সমস্ত মানুষ, পৃথিবীতে জীবিত থাকতে যারা নবী এবং তার সাহাবাগণের ন্যায় জীবন-যাপন করেছেন– এরা অবশ্যই জান্নাতি হবেন।

পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তির নিজেরই মুক্তির কোন আশা নেই, সেই ব্যক্তি আরেকজনের জন্যে সুপারিশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে কি করে? সত্যিকারের যারা পীর, যারা ওলী তাদের জীবন-যাপনের ধরণ বিশ্বনবী এবং তাঁর সাহাবাগণের ন্যায়। তারা সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকেন। প্রকৃত পীর-ওলী জেল-জুলুমের পরোওয়া করেন না। কোন দুষ্কৃতিকারী, সূদখোর, ঘুষখোর, কালোবাজারি, জ্বেনাকার মদ্যপ পীর-ওলীদের বন্ধু হতে পারে না।

কিয়ামতের দিন দুষ্কৃতিকারী অসৎ লোকদের কোন বন্ধুও থাকবে না, কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ-

অন্যায় আচরণকারীদের জন্যে (হাশরের দিন) কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না এবং থাকবেনা কোন সুপারিশকারী যার কথা শুনা যাবে। (সূরা মুমেন-১৮)

বর্তমানে কিছু সংখ্যক নামধারী তথাকথিত পীর-ওলীদের দরবারে ওই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের দেখা যায়-যারা প্রচুর কালো টাকার মালিক। এরা তাদেরকে মূল্যবান উপহার-নগদ টাকা

হাদিয়া নযরানা দান করে। এই তথাকথিত পীরগণ ওই দুষ্কৃতিকারীগণের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা না করে তাদের কাছ থেকে শুধু নযরানাই গ্রহণ করে। এদের নিজেদের নাজাত তো মিলবেই না বরং দুষ্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় দেয়ার কারণে পরকালে এরা শাস্তিই পাবে।

এই ধরণের ভন্ড অর্থলোভী পীর, মওলানাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا ....اِلَى اخِرِالايَةُ

(কিয়ামতের দিন) ওই সব ব্যক্তি–পৃথিবীতে যাদেরকে অনুসরণ করা হতো, (তারা) তাদের অনুসারীদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করবে কিন্তু তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের মধ্যকার সব ধরণের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যারা এসব ব্যক্তিদের অনুসরণ করেছিল তারা বলবে হায়রে, যদি পৃথিবীতে আমাদেরকে একটিবার সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ যেভাবে এরা আমাদের প্রতি তাদের অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করছে, আমরাও তাদের প্রতি আমাদের বিরক্তি দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাদের কৃত কর্মকান্ড এভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা দুঃখ ও অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়বে। কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে তারা বের হবার পথ পাবে না। (সূরা বাকারা–১৬৬-১৬৭)

পূর্ববর্তী উম্মতের ধর্মীয় নেতাগণ অর্থ উপার্জনের লোভে মানুষকে ধর্মের নামে আল্লাহ-রাসূলের পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেত। তারা নিজেদের মুরীদদেরকে সত্যিকারের মুক্তির পথ না দেখিয়ে মুরীদদের নিকট হতে নযর-নেয়াজ গ্রহণ করে নিজেদের মনগড়া পথে পরিচালিত করতো। সূরা তওবায় এ ধরনের পীর, দরবেশ, আলেমদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْ كُلُوْنَ اَمْوَلَ.....اِلَى اخِرِالايَةُ

(আহলে কিতাবদের) অধিকাংশ আলেম, পীর, দরবেশ-অবৈধ উপায়ে মানুষের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখে। (সূরা তওবা-৩৪)

একশ্রেণীর অর্থলোভী পথভ্রষ্ট পীর, মাওলানা ধর্মীয় সিংহাসনে বসে ফতোয়া বিক্রি করে। তারা প্রকৃত দ্বীনদার, পরহেজগার আলেম-ওয়ালামা, পীর-মাশায়েখদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়। এদেরই কারণে কোরআন-হাদীসের প্রকৃত অনুসারী পীরগণ সমাজে মর্যাদা পায় না।

কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ বা শাফায়ত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করে কোরআন ও হাদীস প্রকৃত বিষয় মানুষের সামনে পেশ করেছে। সেদিন সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী হবেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও কিছু নেক মানুষ অন্যের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে। এই সুপারিশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। যারা সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে–তারা হলো ওই সমস্ত ব্যক্তি, যারা পৃথিবীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্যে চরম কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা সহ্য করেও ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালনে সদাসর্বদা তৎপর ছিলেন। এই ধরনের কিছু মানুষ–যারা আল্লাহর প্রিয় পাত্র, তারা আল্লাহর নিকট কোন অন্যায় আবদার করবেন না। কোন দুষ্কৃতিকারীর জন্যে তারা সুপারিশ করবেন না।

সুপারিশ তাদের জন্যেই করবেন-পৃথিবীতে যারা ইসলামের আদেশ-নিষেধ পালন করে চলেছে বটে কিন্তু সামান্য ভুল ভ্রান্তিও করেছেন। তুবও শাফায়াতের পুরো ব্যাপারটা মহান আল্লাহর

মর্জি মোতাবেক হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا

(হে রাসূল) বলে দিন, শাফায়াতের সমগ্র ব্যাপারটি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। (সূরা যুমার-৪৪)

মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারো জন্যে শাফায়াত করতে পারবে না। যে ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ অন্য কাউকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করবেন, সে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছে মতো শাফায়াত করা দূরে থাক আল্লাহর সামনে মুখ খুলতেই পারবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى–

যাদের উপর আল্লাহ খুশী হয়েছেন তারা ব্যতীত আর কারো জন্যে শাফায়াত করা যাবে না। (সূরা আম্বিয়া–২৮)

সুপারিশকারী যা সুপারিশ করবে তা হবে সকল বিচারে সত্য ও ন্যায় সঙ্গত। যারা সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবে তারা নির্দিষ্ট শর্ত অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটা সীমারেখার ভেতরে সুপারিশ করবে। আর এই সুপারিশের ধরণ পৃথিবীর কোন সুপারিশের মতো হবেনা। আল্লাহর নিকট সুপারিশের ধরণও হবে ইবাদত ও বন্দেগীর ন্যায়। মানুষ আল্লাহর কাছে যে পদ্ধতিতে নিজের পাপের ক্ষমা চায় অর্থাৎ কান্না কাটি, অনুনয় বিনয় এবং অত্যন্ত দীনহীন ভঙ্গিতে–তেমনি ভঙ্গিতে শাফায়াতকারী শাফায়াত করবে। তবে শাফায়াতের এই ধরণ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে প্রজোয্য নয়। কারণ তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী। তিনি কি ভঙ্গিতে আল্লাহর দরবারে উম্মতের জন্যে শাফায়াত করবেন সেটা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেকার ব্যাপার।

যিনি সুপারিশ করবেন তার মনে কখনো এ ধারণা জন্মাবেনা যে, তাঁর সুপারিশের কারণে আল্লাহ তার নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। পরম মেহেরবান আল্লাহর অনুগ্রহসূচক অনুমতি পাবার পরে সুপারিশকারী অত্যন্ত দীনতা, হীনতা ও বিনয় সহকারে অনুনয় করে বলবে, হে দুনিয়া ও আখিরাতের মহান মালিক আল্লাহ! তুমি তোমার অমুক বান্দাহর গুনাহ ও ভুল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। তাকে তোমার অনুগ্রহ ও রহমত দান করে ধন্য করো।

সুতরাং সুপারিশ করার অনুমতিদানকারী যেমন আল্লাহ তেমনি তা কবুলকারীও আল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন– لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ–

তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তাদের জন্যে না আর কেউ ওলী বা অভিভাবক আছে, আর না কেউ শাফায়াতকারী। (সূরা আনয়াম-৫১)

শাফায়াতকারী তারাই হবেন যারা আল্লাহর অতি প্রিয়। আর যাদের জন্যে শাফায়াত করা হবে তাদের পাপের অবস্থা এই যে, পাপ ও নেকীর ক্ষেত্রে তাদের পাপ সামান্য বেশী। অর্থাৎ ক্ষমা পেয়েও যেন ক্ষমা না পাওয়ার অবস্থা, ক্ষমার যোগ্যতা লাভে সামান্য অভাব। এই অভাবটুকু পুরণের জন্যেই মহান মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিন অনুগ্রহ করে তাদের জন্যে শাফায়াত করার অনুমতি দান করবেন।

সুতরাং একথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কারো ইচ্ছে অনুযায়ী কেউ কারো জন্যে সুপারিশ করতে পারবে না। যাদের জন্যে সুপারিশ করা হবে তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে,

সুপারিশ করার অনুমতিদান করবেন আল্লাহ, আবার তা কবুলও করবেন তিনিই। তাহলে সুপারিশকারী নিয়োগ করার যুক্তিটা কী?

এর জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কিয়ামতের ময়দানে সেই মুসিবতের দিনে, যে মুসিবতের মহা বিভিষীকা দেখে সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কি হবে তা কল্পনারও বাইরে–স্বয়ং কোন কোন নবীগণও ভয়ে কাঁপতে থাকবেন এবং আল্লাহর সামনে কোন কথা বলার সাহস পাবেন না। সেই অবস্থায় আল্লাহ তার কিছু প্রিয় বান্দাহ্দেরকে শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করে তাদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করবেন। এই মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান পাবার অধিকারী হবেন মুহাম্মাদুর রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তবে এ কথাও সত্য–মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চললেই যে; সে কিয়ামতের ময়দানে জান্নাত লাভ করবে এ ধারণা করা উচিত নয়। বরং মনের আকাংখা এটাই হওয়া উচিত, 'জান্নাতের লোভ নেই জাহান্নামেরও ভয় নেই–চাই শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি।' সুতরাং আল্লাহর রহমত ছাড়া মুক্তি পাওয়া যাবে না।

এই সূরার ৩৯ নং আয়াত থেকে ৪০ আয়াতে বলা হচ্ছে, কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে এবং আখিরাতের ময়দানে বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হবে–এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এখন যার ইচ্ছা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করে সেই দিনের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। আর যার ইচ্ছা সে নিজের প্রবৃত্তির বা শয়তানের অনুসরণ করে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করতে পারে। আদালতে আখিরাতে যা ঘটবে, তা খুব একটা বেশী দূরে নয়–অত্যন্ত কাছে। সেই দিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হলো। সেই দিন মানুষ নিজের কর্মের রেকর্ড দেখতে পাবে। সে দেখবে নিজের চোখে, পৃথিবীতে সে কি ধরনের কর্মকান্ড করেছিল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে যা করেছিল, তা সবই তার সামনে মৌজুদ থাকবে।

পৃথিবীতে যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেনি, এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি, তারা তাদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি দেখে চিৎকার করে বলতে থাকবে, আমি যদি পৃথিবীতে আদৌ মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ না করতাম ! আজকের এই দিনে আমি যদি মাটির সাথে মিশে যেতাম ! আজকে যদি আমাকে পুনরায় জীবিত করা না হতো ! তাহলে আমি আজ যে পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছি, তা থেকে মুক্ত থাকতে পারতাম ! এসব কথা বলে ইসলাম বিরোধী ব্যক্তিগণ সেদিন চিৎকার করে আফসোস করতে থাকবে। কিন্তু তাদের শত চিৎকারেও কোন ফল হবে না, পরিণতি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

উল্লেখিত আয়াতে 'আদালতে আখিরাতে যা ঘটবে, তা খুব একটা বেশী দূরে নয়–অত্যন্ত কাছে'–আল্লাহর এ কথা থেকে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, পৃথিবীতে আমরা দেখছি, কত শত হাজার বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, আর এই আয়াত যেদিন অবতীর্ণ হয়েছে, সেদিন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আগামীতে আরো কত কোটি বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে। তাহলে 'আদালতে আখিরাতে যা ঘটবে, তা খুব একটা বেশী দূরে নয়–অত্যন্ত কাছে' এ কথা দিয়ে আল্লাহ কি বুঝালেন ? এর উত্তর হলো, মানুষের কাছে সময়ের পার্থক্য আর আল্লাহর কাছে সময়ের পার্থক্য এক নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ .....اِلَى اخِرِالاية

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত তাঁর কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর। (সূরা আস্ সাজ্দা-৫)

অর্থাৎ তোমাদের কাছে যে ইতিহাস এক হাজার বছরের আল্লাহর কাছে যেন তা মাত্র একদিনের কাজ। আল্লাহর কোরআনের আরেক আয়াতে বলা হচ্ছে–

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ–

তোমার রব-এর কাছে একদিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে। (সূরা হজ্জ-৪৭)

মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা মানুষেরই সময় নির্ধারক ও পঞ্জিকার হিসাব অনুসারে হয় না। যেমন আজকে একটি ভুল বা সঠিক নীতি অবলম্বন করা হলো এবং কালই তার মন্দ বা ভালো ফলাফল প্রকাশ হয়ে গেলো, বিষয়টি এমন নয়। কোন জাতিকে যদি বলা হয় যে, অমুক কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের কারণে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কথার জবাবে সেই জাতি যদি এই যুক্তি পেশ করে যে, এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার পর আমাদের জীবন কাল থেকে দশ, বিশ বা পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এখনো তো তোমার কথা অনুসারে আমরা ধ্বংস হয়নি। এ কথা যে জাতি বলবে তারা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেবে। কেননা, ঐতিহাসিক ফলাফলের জন্য দিন, মাস বা বছর তো সামান্য বিষয়, শতাব্দীকাল তেমন কোন বিষয় নয়। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা মাআ'রিজে বলা হয়েছে, মানুষের কাছে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ তা মাত্র একদিনে অতিক্রম করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর কাছের আর মানুষের কাছের সময়ের পার্থক্য কখনোই সমান নয়।

মানুষ যতদিন এই পৃথিবীতে কাল ও স্থানের সীমার মধ্যে দৈহিকভাবে জীবন-যাপন করছে, শুধুমাত্র ততদিন পর্যন্তই তাদের সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকতে পারে। মৃত্যুর পরবর্তীতে যখন শুধুমাত্র রূহই অবশিষ্ট থাকবে তখন সময় ও কালের কোন চেতনাই মানুষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না। আদালতে আখিরাতে মানুষ যখন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে, তখন তাদের মনে হবে এই মাত্র কেউ যেন তাদেরকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। তারা যে হাজার হাজার বছর মৃত থাকার পর পুনরায় জীবিত হয়েছে, এই চেতনা আদৌ তাদের থাকবে না।

সূরার নাবার শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে সমস্ত কিছু, যা তার হাত পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার নিজের কর্মসমূহ দেখতে পাবে। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কৃতকর্মের ফলাফলকে পবিত্র কোরআনে 'কিতাব' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই আমলনামা বা কিতাব কিয়ামতের দিন কিসের উপরে লিখিত থাকবে এবং কিসের মাধ্যমেই বা দেয়া হবে, তা জানা মানুষের জন্যে অসম্ভব ব্যাপার। আর কোরআন হাদিসেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। মানুষকে জানানো যদি প্রয়োজন হতো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা জানাতেন।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতিটি কথা, তার প্রতিটি গতিবিধি, তার প্রতি মুহূর্তের কার্যকলাপের ছোট ছোট অংশকে, তার মনোভাব ও ইচ্ছা-আকাংখাকে, মনের গহীনের চিন্তা কল্পনাকে, তার ইশারা-ইঙ্গিতকে কিভাবে সংরক্ষণ করছেন, কিভাবে তার সমস্ত খতিয়ান বান্দার সামনে তুলে ধরবেন–এ ব্যাপারে সমস্ত জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালারই আয়ত্বে। মানুষ কোরআন-হাদীস অধ্যায়ন করে শুধু এতটুকুই বুঝতে পারে, এগুলোকে কিয়ামতের দিন

অবশ্যই একটা আকার আকৃতি দেয়া হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى اِلَى كِتٰبِهَا-اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ.....اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

প্রত্যেক দলকেই সেদিন বলা হবে–এসো, তোমাদের আমলনামা বা রেকর্ড নিয়ে যাও। আজ তোমাদেরকে সে সব আমলের বিনিময়ে দেয়া হবে, যা তোমরা করেছো। এটা আমার তৈরী করা আমলনামা। তোমাদের ব্যাপারে সঠিক ও যথাযথ সাক্ষ্য দেবে। তোমরা (পৃথিবীতে) যা কিছু করছিলে তা সঠিকভাবে লিখে রাখা হতো। (সূরা আল-জাসিয়া–২৮-২৯)

আল্লাহর কোরআনের সূরা মুজাদালায় বলা হয়েছে–সেদিন আল্লাহ সবাইকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন। তারা (পৃথিবীতে) যা কিছু করে এসেছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। তারা (তাদের কর্মসমূহ) ভুলে গিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ যাবতীয় কর্মসমূহ গুনে গুনে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। (সূরা আল-মুজাদালা– ৫)

পবিত্র কোরআনে সূরা যিলযালে মহান আল্লাহ বলেছেন–সেদিন প্রত্যেকটি মানুষ (দলবল ছেড়ে) বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেন তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়। এরপর যে ব্যক্তি অনু পরিমানও নেক আমল করবে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অনু পরিমানও পাপ আমল করবে তা-ও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল–৬-৮)

সেদিন নিজের আমল নামা নিজেকেই পড়তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا-........اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

আর কিয়ামতের দিন আমরা তাদের 'আমলনামা' রেকর্ড প্রকাশ করবো, যাতে সমস্ত কিছু প্রকাশ থাকবে। (বলা হবে) পড়ো, নিজের 'আমলনামা' রেকর্ড। আজ নিজের হিসাব নেয়ার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (সূরা বনী-ইসরাঈল– ১৩-১৪)

পৃথিবীতে যারা ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলেনি তারা বাম হাতে আমলনামা পাওয়ার সাথে সাথে বলবে, এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হতো, তাহলে আযাব থেকে বেঁচে যেতাম! কিন্তু যারা পৃথিবীতে ইসলামের পথে চলেছে, তারা ডান হাতে আমলনামা পেয়ে অত্যন্ত খুশী হবে–কৃতজ্ঞতা জানাবে মহান আল্লাহর দরবারে। পরিশেষে তারা জান্নাত লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন–এরপর যার 'আমল নামা' ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে এবং সে আনন্দ চিত্তে আপনজনের নিকট ফিরে যাবে। আর 'আমলনামা' যার পিছন দিক হতে দেয়া হবে সে মৃত্যুকে ডাকবে। (অবশেষে) সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা ইনশিকাক– ৭-১২)

কোরআন এবং হাদীস অধ্যায়ন করে যতদূর জানা যায়, তাহলো হাশরের ময়াদানে যে ব্যক্তির হিসাব হবে, সে ব্যক্তির পক্ষে জান্নাতে যাওয়া অসম্ভব। কারণ আল্লাহ যদি সেদিন একটি মাত্র প্রশ্নই করেন, পৃথিবীতে তুমি কতটুকু পানি পান করেছো ?

তাহলে তো কোন মানুষই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। অতএব যারা জান্নাতি হবে, তারা হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কোরআন শরীফে "ঈমানদারদের হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে বলতে বুঝানো হয়েছে, ঈমানদারদের হিসাব গ্রহনে কড়া-কড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন করা হবে না। তাকে প্রশ্ন করা হবে না, অমুক অমুক কাজ তুমি কেন করেছিলে–আজ তার কৈফিয়ত দাও!

নবী-রাসূল ব্যতীত পৃথিবীতে কোন মানুষই ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। সুতরাং ঈমানদারদের আমল নামাতেও গোনাহ থাকবে। কিন্তু সে গোনাহ তার সৎ আমলের তুলনায় বেশি হবে না। সে কারণে তার গোনাহ মহান আল্লাহ এমনিতেই মাফ করে দেবেন। আল্লাহ কোরআনে ওয়াদা করেছেন, পৃথিবীতে যারা ইসলামের বিধান মেনে চলবে, তাদের সামান্য পাপ-গোনাহ তিনি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেবেন।

মানুষ সাধারণত দু'ভাবে গোনাহ করে। ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে। ঈমানদারদের আমলনামায় যে সমস্ত গোনাহ থাকবে, সে সমস্ত গোনাহ হলো অনিচ্ছাকৃত গোনাহ, আর পৃথিবীতে ঈমানদারগন যখনই বুঝতো সে গোনাহ করে ফেলেছে, তখন ঈমানদারের স্বভাব অনুযায়ী সাথে সাথে সে সেজদায় পড়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতো। এ সমস্ত কারণেই ঈমানদার ছাড়া পেয়ে যাবে।

আর যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অহংকারের সাথে ইসলামের আইন অমান্য করে উচ্চস্বরে বলে, আমি মদ খাওয়া ছাড়বো না। এই ধরণের ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এই ধরনের মানুষদের কাছ হতে হিসাব গ্রহণে যে কড়া-কড়ি অবলম্বন করা হবে তা বুঝাবার জন্যে পবিত্র কোরআনে "ছুউল হিছাব" শব্দ সূরা রা'দের ১৮ নং আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হলো অত্যন্ত খারাপভাবে হিসাব গ্রহণ করা। হিসাব গ্রহণের সময় অত্যন্ত কড়া-কড়ি আরোপ করা। তারা ক্ষমা ও সকল প্রকার সাহায্য সহানুভূতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–এরা এমন মানুষ যে, তাদের ভালো ও নেক আমলসমূহ আমি গ্রহণ করবো এবং তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো। (সূরা আল-কাহাফ)

বোখারী শরীফে এসেছে কোরআনের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল বলেন, যার কাছ থেকে হিসাব নেয়া হবে, সে-ই বিপদে পড়বে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জানতে চাইলেন–ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা কি বলেননি যে, যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার কাছ হতে সহজভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে? আল্লাহর রাসূল বললেন–এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমলনামা পেশ করা সংক্রান্ত (অর্থাৎ আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেয়া হবে বটে কিন্তু সহানুভূতির সাথে) কিন্তু যাকে কোন প্রশ্ন করা হবে, সেই ধরা পড়বে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার নামাজে এই দোয়া করতে শুনেছি–হে আল্লাহ! আমার হিসাব হাল্কাভাবে গ্রহণ করো।

তিনি যখন সালাম ফিরলেন তখন আমি এর তাৎপর্য জানতে চাইলাম। জবাবে আল্লাহর রাসূল বললেন–হাল্কাভাবে হিসাব গ্রহণের অর্থ এই যে, বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। হে আয়েশা, সেদিন যার কাছ থেকে হিসাব চাওয়া হবে সেই ধরা পড়বে।

কিয়ামতের দিন আমলনামা হাতে পেয়ে ঈমানদারগণ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবে, সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। আর অবিশ্বাসীগণ আমলনামা বাম হতে পেয়ে আফসোস করে বলবে–এখন যদি আমাদের মৃত্যু হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! মহান আল্লাহ বলেন–

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ-فَیَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا..اِلَى اخِرِالايَةُ

সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে (সন্তুষ্ট হয়ে অন্যদেরকে) বলবে–দেখো, পড়ো আমার আমলনামা! আমি ধারণা করেছিলাম আমার নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করা হবে) ফলে তারা আকাংখিত সুখ সম্ভোগে লিপ্ত হবে। আর যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে

বলবে– হায় আমার আমলনামা যদি না-ই দেয়া হতো! আর আমার হিসাব কি, তা যদি আমি না-ই জানতে পারতাম! হায় মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত হতো! (অর্থাৎ মৃত্যুই যদি সবশেষ করে দিত, তাহলে আজ এই হিসাব দিতে হতো না) (সূরা আল-হাক্কাহ– ১৯-২৭)

পবিত্র কোরআন শরীফে কোথাও পাপীদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে তার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। আবার কোথাও বলা হয়েছে তার আমলনামা পিছনে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে মুফাস্সীরগণ বলেন–পৃথিবীতে যারা কোরআনের বিধান অনুযায়ী চলেনি, তারা কিয়ামতের ময়দানে পূর্বেই অনুমান করতে পারবে যে, তাদের আমলনামায় কি কীর্তি লেখা আছে। সুতরাং তাদের বাম হাতে যখন আমলনামা দেয়া হবে তখন তারা তা নিতে চাইবে না। আমলনামা চোখের সামনে দেখেই তারা হাত পেছনে টান দিয়ে নেবে। তবুও তাদের হাতে জোর করে আমলনামা দেয়া হবে। আর মানুষের একটা স্বভাব-তার অপছন্দনীয় কোন কিছু–আপত্তিকর কোন কিছু সে হাতে নেয় না। হাত গুটিয়ে পিছনে রাখে। মানুষের এটা সহজাত প্রবণতা।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে- মানুষ নানা বয়সের হায়াত লাভ করে। কেউ একশো বছরেরও বেশী হায়াত পায়। যে ব্যক্তি একশো দশ বছর হায়াত পেয়েছিল তার ওই একশো দশ বছরের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব যে খাতা বা আমলনামায় লেখা হবে, সে আমলনামার আকৃতি তো বিরাট হবে! এত বিরাট আমলনামা মানুষ কিয়ামতের দিন হাতে নেবে কিভাবে?

কিন্তু এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই উত্তরটা সহজে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান ফিল্ম, কমপিউটার ও মোবাইল ফোন আবিষ্কার করেছে। সর্বক্ষেত্রে তা ব্যবহার হচ্ছে। এই ফিল্মের মধ্যেই পৃথিবীর নানা দৃশ্য ধরে রাখা হচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে। এই ফিল্ম আবিষ্কার করার জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। ছোট একটা ফিল্মের মধ্যে যদি মানুষ পারে ওই বিশাল আকাশের, সমুদ্রের ছবি ধরে রাখতে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা কি পারেন না ওই ধরণের ক্ষুদ্র কোন ফিল্মের মধ্যে মানুষের মাত্র একশো দেড়শো বছরের কর্মকান্ডের ছবি ধরে রাখতে?

কম্পিউটারের ছোট একটা ডিস্ক। ঐ ডিস্কের মধ্যে শত শত কোটি টাকার হিসাব ধরে রাখা যায়। ছোট্ট একটি মোবাইল ফোনের ভেতরে অসংখ্য তথ্য ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডিজিটাল ডায়েরীর ভেতরে অসংখ্য তথ্য ও অগণিত ফোন নম্বর ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছে এই মানুষ। যে আল্লাহ তা'য়ালা তার সৃষ্টি মানুষের মাথায় কম্পিউটার, ডিজিটাল ডায়েরী, মোবাইল ইত্যাদি আবিষ্কারের জ্ঞান দান করেছেন, ঐ আল্লাহ তা'য়ালা কি এর চেয়েও উন্নত কোন কিছুর মাধ্যমে মানুষের সামান্য এক-দেড়শত বছরের কর্মকান্ড ধরে রেখে তা হাশরের ময়দানে মানুষের হাতে দিতে পারবেন না ? সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষকে যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে, এ কথা স্মরণে রেখে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করতে হবে যে, তার যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দিতে হবে এবং তার কর্মলিপি পরকালীন জীবনে তার সামনে পেশ করা হবে।

সূরা আন-নাযিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৭৯

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে 'ওয়ান্ নাযিয়াতি গারকা'–শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে এবং নাযিয়াত শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এ কথা আমরা সূরা 'নাবা'-এর আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর রাসূল মক্কায় প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পরে তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত করতেন। তার প্রথম বিষয় ছিল তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ, দ্বিতীয় বিষয় ছিল রেসালাত এবং তৃতীয় বিষয় ছিল আখিরাত। ইসলামে আখিরাতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আখিরাত বিশ্বাসই মানুষের চরিত্র সংশোধন এবং উত্তম চরিত্র গঠনের একমাত্র মাধ্যম। একজন মানুষ যখন দৃঢ়ভাবে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন তার পক্ষে আল্লাহর একত্ববাদ ও রেসালাতের প্রতি ঈমান আনা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। আলোচ্য সূরাটির মূল বিষয়বস্তুও কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত। কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে এবং মৃত্যুর পরে আরেকটি জগৎ অনন্ত কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এ বিষয়টি মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার লক্ষ্যেই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

এ সূরাটির আলোচিত বিষয়বস্তুই বলে দেয় যে, এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায় দাওয়াতী কার্যক্রমের শিশু অবস্থায়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরতিহীনভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যেন মানুষের মনে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে যায়। কিয়ামতের সেই দিনটি অবশ্যই আগমন করবে এবং তা অস্বীকারকারীদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ–এ বিষয়ে এই সূরায় অত্যন্ত কড়া ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে।

কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং এটা অটল বাস্তবতা। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অন্যান্য সূরায় যেসব দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে, আলোচিত সূরাতেও তার কতিপয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিয়ামত কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়ে সংঘটিত হবে এবং তার দৃশ্যাবলী কত ভয়ঙ্কর হবে, জাগতিক সমস্ত কিছুর একটা শেষ পরিণতির জন্য কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী, তা এ সূরায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবী এবং এর মধ্যেকার যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু এসব জিনিস যে ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এসব কথা ইশারায় বলে মানুষের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সমস্ত কিছুই একটা পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারপর যাদেরকে দিয়ে এই পৃথিবী সাজানো হয়েছে, সেই মানুষগুলোকে শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর আদালতে একত্রিত হয়ে তাদের যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, সে ব্যাপারে বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

মানুষের মন যেন আল্লাহর ভয়ে কম্পিত থাকে এবং তারা যেন আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম না করে, এ জন্য এই সূরার প্রথমেই কিয়ামতের ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। কিয়ামতের লোমহর্ষক দৃশ্যের চিত্র অঙ্কন করার পর কিভাবে চোখের পলকে সেই মহাধ্বংস যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে, তার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এই সূরার প্রথমেই প্রাণ হরণকারী, মহান আল্লাহর আদেশ দ্রুত গতিতে বাস্তবায়নকারী এবং তাঁরই আদেশ অনুসারে গোটা সৃষ্টি জগতের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনাকারী ফেরেশ্তাদের নামে শপথ করে দৃঢ়

নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছে তোমাদের দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান এই সুন্দর পৃথিবী এবং এর ভেতরকার মনোমুগ্ধকর বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই নিমিষে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর মৃত্যুর পরে আরেকটি জগৎ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে এতে সন্দেহের সামান্যতম অবকাশ নেই। যেসব ফেরেশ্তারা আল্লাহর আদেশে প্রাণীসমূহের প্রাণ দেহ থেকে সজোরে বিচ্ছিন্ন করে গোটা দেহের প্রতিটি স্নায়ূর স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়, আবার কতক দেহ থেকে প্রাণ পৃথক করে অত্যন্ত আরামদায়কভাবে, তারপর তারা সে প্রাণ বহন করে উন্মুক্ত আকাশের পরিমন্ডলে সন্তরণ করে যথাস্থানে গমন করে, আল্লাহর আদেশে সেই ফেরেশ্তারাই পুনরায় মানব দেহে প্রাণের সঞ্চার করবে, বিষয়টি তোমাদের কাছে কঠিন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মোটেও কষ্টসাধ্য নয়।

আল্লাহর নিয়োজিত ফেরেশ্তাগণ তাঁরই অমোঘ আদেশে বর্তমানে যেমন গোটা সৃষ্টিসমূহের ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন, সেই ফেরেশ্তাগণই সৃষ্টিজগতে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় সুশৃংখল নিয়ম-নীতি শৃংখলা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে, সেই ধ্বংস স্তুপের মধ্য থেকেই নতুনভাবে পরকালের জগৎ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন, এতে অসম্ভবের কিছু নেই। কারণ তোমরা তোমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছো, প্রভাতের সূর্য কিরণে নব প্রস্ফুটিত গোলাপ তার স্নিগ্ধ পাঁপড়ী কিভাবে মেলে দিয়ে পরিবেশ সুঘ্রাণে সুরভিত করে তোলে। দিবাবসানে গোধূলী লগ্নে সেই দৃষ্টি নন্দন সুরভিত গোলাপের পাঁপড়ী মলিন হয়ে যাবতীয় সৌন্দর্য হারিয়ে ক্রমশঃ নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায়। আবার ফুল ফোটে এবং সেই একই প্রক্রিয়ায় তা ঝরে যায়। তোমরা দেখতে পাচ্ছো, একটিকে ধ্বংস করে নতুন আরেকটি কিভাবে সৃষ্টি করা হচ্ছে। এটা যদি তোমাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে না হয়, তাহলে এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে পরকালীন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বলে কেন ধারণা করছো?

এরপর বলা হয়েছে, যা তোমরা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং কঠিন বলে মনে করো তা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কোন কঠিন বিষয় নয়–বরং তিনি যে প্রক্রিয়ায় তোমাদের দেখা–পরিচিত পৃথিবী ও বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রক্রিয়াতেই তোমাদের না দেখা ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করে পরকাল প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর এসব কিছু করার জন্য ব্যাপক কিছু আয়োজনের কোন প্রয়োজন হবে না, তাঁর একটি মাত্র ইশারাতেই সমস্ত কিছু সংঘটিত হবে। তাঁর আদেশে সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে এক মহা প্রলয়ঙ্করী কম্পন সৃষ্টি হবে, সেই কম্পনের প্রথম আঘাতেই বর্তমানের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমস্ত কিছু গুড়িয়ে দেবে। উপর্যুপরি কম্পনে চোখের নিমিষেই তোমাদের চোখে দেখা পাহাড়-পর্বত ধূলি কণায় পরিণত হবে। যা ছিল ক্ষণপূর্বে দৃশ্যমান, তা নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে যেসব বস্তু ক্ষণপূর্বে গর্বভরে দন্ডায়মান ছিল, তা মুহূর্তে অস্তিত্বহীন–বিলীন হয়ে যাবে। এভাবে একটির পর আরেকটি আঘাত ক্রমাগত আসতেই থাকবে এবং সেই সাথে ঘটতে থাকবে প্রাণ-ওষ্ঠাগতকারী বিভীষিকাময় ঘটনাসমূহ।

ঘটিতব্য এসব ঘটনা সম্পর্কে যারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো, হৃদয়ে অবিশ্বাস লালন করতো, কিয়ামতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করতো, তারা ভয়ে ত্রাসে স্পন্দনহীনের ন্যায় হয়ে যাবে। অসংখ্য হৃদয় সেদিন আতঙ্কে, ভয়ে ত্রাসে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। চোখগুলো তাদের আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে পলকহীন পাথরের চোখে পরিণত হবে। যে বিষয়টির বর্ণনা

নবী-রাসূল ও দ্বীনের দাওয়াত দানকারীদের মুখে শুনে কল্পনার জগতেও স্থান দিতে অরাজী ছিল, তারাই ভয়বিহ্বল চিত্তে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে, সমস্ত কিছু কিভাবে নির্মম নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে সংঘটিত হচ্ছে। যা ছিল তাদের কাছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয়, যার প্রতি ছিল তাদের হৃদয়ে প্রবল অবিশ্বাস, সেই ভয়াবহ ঘটনা তারা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করবে। ভয়ে মহাতঙ্কে তাদের বুকের ভেতরের কলিজা মুখ দিয়ে বের হয়ে আসার উপক্রম হবে।

কিয়ামতের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝপথেই হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম ও আল্লাহদ্রোহী ফেরাউনের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামতের বর্ণনার মাঝে এ ঘটনা উল্লেখ করার কারণ হলো, মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী রাসূলের মুখে কিয়ামতের বর্ণনা শুনে তা অস্বীকার করতো এবং বিষয়টি নিয়ে উপহাস করতো। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করা এবং রাসূল যে মিশন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা। ফেরাউনের ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করে এখানে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা যারা আমার রাসূলের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছো, তারা ফেরাউনের ইতিহাস স্মরণ করো কেননা সেই হতভাগা ব্যক্তিও সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আমার রাসূলের সাথে বিরোধিতা করতো, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো কিয়ামতের প্রতি। আমার রাসূলের সাথে বিরোধিতার পরিণাম কত ভয়ঙ্কর হয়েছে, তা স্মরণে রেখে আমার রাসূলের আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরোধিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করো। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে অন্যায় আচরণ করে ফেরাউন এবং তার সহযোগীবৃন্দ যে নির্মম পরিণতিকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়েছে, তোমরাও যদি সেই একই পরিণতি বরণ করতে আগ্রহী হও, তাহলে বিরোধিতা করতে থাকো ইসলামের সাথে।

তারপর ঐ ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমি সংক্ষেপে উল্লেখ শেষে গোটা বিশ্ব প্রকৃতির সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম দিক অবিশ্বাসীদের সামনে উন্মুক্ত করা হয়েছে, যার ভেতরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহাবৈজ্ঞানিক কলা-কুশলতার কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি যে অসীম জ্ঞানী, তাঁর ইচ্ছাই যে অপ্রতিরোধ্য এবং সমস্ত সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী অতি সংগোপনে তিনিই যাবতীয় কিছু পরিচালনা করছেন, সেসব দিকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করো ঐ মহাশূন্যলোকের দিকে। উর্ধ্বজগতে আমি অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ নিহারিকা পুঞ্জ সৃষ্টি করেছি। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আলো দানকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছি। তাপ ব্যতীত তোমাদের অস্তিত্ব তোমরা কল্পনাই করতে পারো না, সেই তাপ দানকারী বিশাল অগ্নিগোলক-সূর্য সৃষ্টি করেছি। এই সূর্যের থেকেও বিশাল আকৃতির অসংখ্য কোয়াসার নানা ধরনের ছায়াপথের ভেতরে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের কল্পনারও অতীত এত বিশাল আকৃতির অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ এবং সূর্যসমূহ নিমিষে অস্তিত্বহীন করে দিতে সক্ষম, এমন শক্তিসম্পন্ন অন্ধকূপ–ব্লাকহোল আমি সৃষ্টি করেছি উর্ধ্বলোকে। তোমাদের কল্যাণের লক্ষ্যে মহাশূন্যে আমি অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করেছি। অসীম শূন্যে ভাসমান বিশালাকৃতির কঠিন শিলার সাম্রাজ্য আমি সৃষ্টি করেছি। যা ভাসমান রয়েছে আমারই নির্দেশে এবং নির্দেশ দিলেই তা সবেগে তোমাদের দিকে ধাবিত হয়ে তোমাদেরকে চর্বিত তৃণের ন্যায় পরিণত করবে।

আমার সমস্ত সৃষ্টিতেই আমি সমতা রক্ষা করেছি। তোমাদের কল্যাণে দিন-রাত সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এই পৃথিবীর যমীনকে আমি বিস্তীর্ণ করে তা বিছানার ন্যায় বিছিয়ে দিয়েছি। এই যমীন থেকে তোমাদের জন্য পানি এবং উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি। এই যমীন থেকে তোমাদের

খাদ্য বের করার ব্যবস্থা করেছি। এসব কিছু কিভাবে কোন প্রক্রিয়ায় সম্পাদন হচ্ছে, সে সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে গেলে তোমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ো। আমার সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের সামান্য দিক যখন তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয় তখন তোমরা হতবাক হয়ে পড়ো। ভাবতে থাকো, এসব জটিল বিষয় কিভাবে সৃষ্টি করা হলো এবং তা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখন বলোতো, এসব মহাজটিল বিষয়সমূহ সৃষ্টি করা এবং পরিচালনা করা কঠিন না তোমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষকে সৃষ্টি করা কঠিন ? ঐসব মহাজটিলতা সম্পন্ন বস্তুসমূহ সৃষ্টি করার তুলনায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আর প্রকৃত ব্যাপার হলো, কোন কিছুই সৃষ্টি করা আমার কাছে কিছুমাত্র কঠিন বিষয় নয়। অসংখ্য জটিল বিষয় আমি যেমন সৃষ্টি করে তা একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীনে পরিচালিত করছি এটা যেমন আমার কাছে কোন কঠিন ব্যাপার নয়–তেমনি তোমাদের মৃত্যুর পরে পুনরায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করে আমার আদালতে হাজির করা বিন্দুমাত্র কঠিন হবে না।

পৃথিবীকে মানুষের জন্যে বসবাসের উপযোগী করে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে এবং সেই সাথে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, তোমাদের জীবন ধারনের জন্য যা প্রয়োজন, এই পৃথিবীতে আমি তার ব্যবস্থা করেছি। অসংখ্য উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি, নানা ধরনের খাদ্য দান করেছি, পানি দিয়েছি, যমীনকে স্থির রাখার জন্য পাহাড় সৃষ্টি করেছি, তোমাদের প্রশান্তির জন্য রাত সৃষ্টি করেছি। এসব বিষয় তোমাদের চিন্তার জগতে খোরাক দান করছে যে, আমার সৃষ্টির পেছনে একটি বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। সৃষ্টির এত আয়োজন তা খেল-তামাসার জন্যে নয়। সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছি তোমাদের কল্যাণের জন্যে আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার লক্ষ্যে। আমার সৃষ্টি যাবতীয় কিছু তোমরা উপভোগ করবে, পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ করতে থাকবে, তারপর একদিন মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, এমন ধরনের অমূলক কল্পনাও তোমরা করো না। পৃথিবীতে তোমাদের যাকে যে সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়েছে, যাকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, এসব বিষয়ে কারো কাছে কোন হিসাব দিতে হবে না, এমন চিন্তা করা যুক্তি সঙ্গত পারে না।

বরং তোমাদের সকলকে আদালতে আখিরাতে একত্রিত করা হবে, মানুষের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং তারই ভিত্তিতে রচিত হবে মানুষের চিরন্তন ভবিষ্যৎ। মহান আল্লাহর নির্দেশের বেষ্টনির ভেতরে অবস্থান করে এই পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করা হয়েছে কিনা, তিনি যে সুযোগ-সুবিধা, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন, তা আল্লাহর দাস হিসাবে প্রয়োগ ও পালন করা হয়েছে কিনা অথবা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে বা বিরোধিতা করে জীবন পরিচালিত করা হয়েছে কিনা, বিষয়টির চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। সমস্ত মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, পৃথিবীর জীবনে তারা কি ধরনের কর্ম করেছিল। কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে কোথায় বসে কি ধরনের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কারারুদ্ধ বা হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছিল, আল্লাহর কোরআনের প্রচার-প্রসার বন্ধ করার পক্ষে পদেক্ষপ গ্রহণ করা হয়েছিল, তা সবই একে একে দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠবে।

এই সূরার শেষ পর্যায়ে ইসলাম বিরোধিদের সেই পুরনো প্রশ্নের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলকে প্রায়ই একটি প্রশ্ন করতো যে, আমাদের

সামনে যে কিয়ামতের বিষয়টি বারবার উত্থাপন করা হচ্ছে এবং আমরা যেন তা বিশ্বাস করি এ জন্য নানা ধরনের যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে, সেই কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন কোনটি ?

এই প্রশ্ন তারা এ জন্য করতো না যে, 'যেহেতু কিয়ামত আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই কিয়ামত যদি সহসাই এসে যায় তাহলে তো আমরা পুঁজি হিসাবে এমন কিছু সৎকর্ম অর্জন করতে পারিনি, যার বিনিময়ে সেদিন মুক্তি লাভ করতে পারবো। সুতরাং কোনদিন তা ঘটবে তা আমাদেরকে জানিয়ে দিলে আমরা তা ঘটার পূর্বেই সৎকর্ম করে আমলনামা পরিপূর্ণ করে ফেলবো।'

বরং তারা প্রশ্ন করতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে। তবুও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূলকে জানিয়ে দিলেন, ওরা জানতে চায় কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে–আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবার দিনের জ্ঞান আপনার রব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, এ বিষয়ে তিনি ব্যতীত আর কেউ অবগত নয়। আপনি তো শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শনকারী এবং সতর্ককারী তাদের জন্য যারা কিয়ামতের ওপরে আস্থা রাখে। আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করে যান এখন যার ইচ্ছা আপনার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে নিজের স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করে আমার গোলাম হয়ে জান্নাত অর্জন করুক আর যার ইচ্ছা কিয়ামত সম্পর্কে নির্ভীক হয়ে পৃথিবীতে শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে নিজেকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করুক।

পক্ষান্তরে যারা কিয়ামতের প্রতি নির্ভীক হয়ে এই পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন বলে গ্রহণ করেছে, কিয়ামত যখন প্রকৃত অর্থে সংঘটিত হবে তখন তারা ধারণা করবে যে, পৃথিবীতে তারা অত্যন্ত অল্প সময় জীবন-যাপন করেছে। অথচ সেই সামান্য দিনের জীবনকে সুখময় করার স্বার্থে আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেনি, ক্ষণস্থায়ী সুখভোগের লালসায় অনন্ত-অসীম চিরকালীন ভবিষ্যৎ জীবনকে নিজেদের কৃতকর্মের মাধ্যমে কিভাবে সমূলে ধ্বংস করেছে, তা অনুভব করে আক্ষেপ করতে থাকবে। তাদের অহমিকা আর অবিশ্বাস তাদেরকে কোন নির্মম পরিণতির সম্মুখীন করেছে, তা তারা স্বয়ং অনুধাবন করবে কিয়ামতের দিন।

সূরা নাযিয়াত-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-৪৬-রুকু-২

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ (১) وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ (২) وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ (৩) فَالسّٰبِقٰتِ

سَبْقًا ۙ (৪) فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ (৫) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ (৬) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ (৭)

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ (৮) اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ (৯) يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ

فِى الْحَافِرَةِ ؕ (১০) ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ (১১) قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ (১২)

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ (১৩) فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ؕ (১৪) هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ

مُوْسٰى ۘ (১৫) اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ (১৬) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ

اِنَّهٗ طَغٰى ۖ (১৭) فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ (১৮) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ

فَتَخْشٰى ۚ (১৯) فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۖ (২০) فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ (২১) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى

ۖ (২২) فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ (২৩) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۖ (২৪) فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ

الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ؕ (২৫) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ؕ (২৬) ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ

خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ۚ (২৭) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ۙ (২৮) وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا

وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا ۪ (২৯) وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ؕ (৩০) اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا

وَمَرْعٰهَا ۪ (৩১) وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ۙ (৩২) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ (৩৩) فَاِذَا جَآءَتِ

الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۖ (৩৪) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۙ (৩৫) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ

لِمَنْ يَّرٰى (৩৬) فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ (৩৭) وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ (৩৮) فَاِنَّ الْجَحِيْمَ

هِيَ الْمَاْوٰى ۝٣٩ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝٤٠

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝٤١ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۝٤٢

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ۝٤٣ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۝٤٤ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ

يَّخْشٰهَا ۝٤٥ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ۝٤٦

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) শপথ (সেই ফেরেশ্‌তাদের), যারা (অবিশ্বাসীদের শিরায়) ডুব দিয়ে (তাদের আত্মা ছিনিয়ে) আনে, (২) শপথ (সেই ফেরেশ্‌তাদের), যারা (নেককারদের রূহ) সহজভাবে (খুলে নেয়) দেয়, (৩) শপথ (সেই ফেরেশ্‌তাদের), যারা (আমার হুকুম তামিল করার জন্যে) সাঁতরে বেড়ায়, (৪) শপথ (সেই ফেরেশ্‌তাদের), যারা (হুকুম পালনের জন্যে) এগিয়ে চলে, (৫) শপথ (সেই ফেরেশ্‌তাদের), যারা সুষ্ঠুভাবে কর্ম পরিচালনা করে--(৬) (কিয়ামত অবশ্যই আসবে), সেদিন ভূকম্পনের এক প্রচন্ড ঝাঁকুনি দেয়া হবে। (৭) (সবাইকে কবর থেকে উঠানোর জন্যে) সাথে সাথে আরেকটি ধাক্কা হবে, (৮) (এই অবস্থা দেখে) মানুষের অন্তরসমূহ ভয়ে কাঁপতে থাকবে, (৯) সবার দৃষ্টি হয়ে যাবে নিম্নগামী ও ভীত-সন্ত্রস্ত।

(১০) কাফেররা বলে সত্যিই কি আমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া হবে ? (১১) পঁচে-গলে হাড্ডিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও ? (১২) তারা বলে, আমাদের আগের জীবন ফিরিয়ে দেয়া হলে সেটা তো হবে খুবই লোকসানের (একটা) বিষয় ! (১৩) অবশ্যই তা হবে বড়ো ধরনের একটি ঝটকা। (১৪) (এই ঝটকা শেষ না হতেই দেখা যাবে) তারা (সবাই এক ময়দানে) সমবেত হয়ে গেছে। (১৫) হে নবী, তোমার কাছে কি (কখনো) মুসা নবীর কাহিনী পৌঁছেছে ? (১৬) তাকে যখন তার মালিক পবিত্র 'তুর' উপত্যকায় ডেকে বলেছিলেন, (১৭) যাও ফেরাউনের কাছে, কারণ সে বিদ্রোহ করেছে। (১৮) তাকে জিজ্ঞেস করো তুমি কি (ঈমান এনে) পবিত্র হতে চাও ? (১৯) (তাকে এও বলো) আমি তোমাকে তোমার মালিকের পথ দেখাতে পারি, এতে তোমার মনে হয়তো আল্লাহর ভয় জাগবে।

(২০) অতপর সে তাকে (আমার পক্ষ থেকে) নবুওতের বড়ো (বড়ো) নিদর্শন দেখালো। (২১) তারপর সে ব্যক্তি নবীকে মিথ্যা বললো এবং সে (তার) বিরুদ্ধাচরণ করলো। (২২) অতপর চালবাজি করার চেষ্টায় সে (একটু) ফিরে এলো, (২৩) সে দেশবাসীদের জড়ো করলো এবং ডাক দিলো। (২৪) তারপর বললো, আমিই হচ্ছি তোমাদের সবচেয়ে বড় 'রব'। (২৫) অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। (২৬) অবশ্যই এমন সব লোকের জন্যে এতে শিক্ষার নিদর্শন রয়েছে--যারা (আল্লাহ তা'য়ালাকে) ভয় করে।

রুকু ২

(২৭) (তোমরা বলো) তোমাদের (দ্বিতীয়বার) সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন, না আকাশ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন ? (২৮) (অথচ) আল্লাহ তা'য়ালা (শূন্যের মাঝে) তাকে উঁচু করে রেখেছেন, অতপর তাতে তিনি ভারসাম্য আনয়ন করেছেন। (২৯) তিনি রাতকে (অন্ধকারের চাদর দিয়ে) ঢেকে রেখেছেন, আবার তার থেকে (আলো দিয়ে) দিনকে বের করে এনেছেন। (৩০) এরপর যমীনকে তিনি বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। (৩১) তারই অভ্যন্তর থেকে তিনি বের করেছেন পানি ও তার উদ্ভিদরাজি। (৩২) তিনি পাহাড়সমূহকে যমীনের গায়ে পেরেকের মতো করে দিয়েছেন। (৩৩) (এর সব কিছুই) তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারদের জন্যে।

(৩৪) তারপর যখন বড়ো বিপর্যয় তোমাদের সামনে হাজির হবে, (৩৫) সেদিন মানুষ (একে একে) সব কিছু স্মরণ করবে যা করে এসেছে। (৩৬) সেদিন যে ব্যক্তি দেখতে পাবে তার জন্যে জাহান্নামকে খুলে ধরা হবে। (৩৭) হ্যাঁ যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে, (৩৮) (পরকালের তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকে আঁকড়ে থেকেছে। (৩৯) জাহান্নামই হবে তার (একমাত্র) আবাসস্থল। (৪০) (আবার) যে ব্যক্তি এ ভয় করেছিলো যে, তাকে একদিন মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে (এই ভয়ে) নিজের নফকে গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত রেখেছে, (৪১) অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা।

(৪২) তারা তোমার কাছে জানতে চায় কিয়ামতের সেই সময়টি কখন আসবে ? (৪৩) (তুমি বলে দাও) তা তুমি জানবে কি করে ? (৪৪) তার সংঘটিত হবার চূড়ান্ত (জ্ঞান রয়েছে) তোমার মালিকের কাছে। (৪৫) তুমি সাবধানকারী, সে ব্যক্তির জন্যে যে সেদিনকে ভয় করে। (৪৬) যেদিন এরা কিয়ামত দেখতে পাবে সেদিন (তাদের মনে হবে দুনিয়ায়) এরা এক বিকেল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময় অতিবাহিত করে এসেছে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

কিয়ামতের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এক নম্বর আয়াত থেকে পাঁচ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ফেরেশ্তাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এই শপথ কেন করা হলো তা এই পাঁচটি আয়াতে স্পষ্ট করে বলা না হলেও এর পরবর্তী বর্ণনা পাঠ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তা করা হয়েছে কিয়ামতের প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দেয়ার উদ্দেশ্যে। শপথ করার কারণ হলো, কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই–এ কথাটি দৃঢ়তার সাথে বলার উদ্দেশ্যে। শপথ করা হয়েছে ঐসব ফেরেশ্তার নামে যাঁরা মানব দেহের গভীরে–প্রতিটি স্নায়ুতে পৌঁছে দেহ থেকে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে। যারা আল্লাহর বিধান পালন করেনি, অমান্য করেছে বা এই বিধানের বিরোধিতা করেছে, তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা বের করার কাজে নিয়োজিত ফেরেশ্তারা অত্যন্ত আযাবের সাথে দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করে–শপথ করা হয়েছে তাদের নামে। আবার যেসব মানুষ আল্লাহর বিধান নিজেরা অনুসরণ করেছে এবং অন্যকে তা অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, এই বিধান আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে, তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে নিয়োজিত ফেরেশ্তাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এসব ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর গোলামদের আত্মা আরামদায়ক পন্থায় দেহ থেকে বের করে নিয়ে আসে।

শপথ করা হয়েছে সেসব ফেরেশ্তাদের নামে, যারা আল্লাহর আদেশ পালন করে অত্যন্ত তীব্র গতিতে মহাশূন্য অতিক্রম করে যথাস্থানে পৌছে যায়। সেই ফেরেশ্তাদের নামেও শপথ করা হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, সে কাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে আঞ্জাম দেয়। আল্লাহর আদেশ পালনে তাঁরা মুহূর্তকাল দেরী করেন না। আদেশ লাভমাত্র তাঁরা সে কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পাদন করেন। আবার সেই ফেরেশ্তাদের নামেও শপথ করা হয়েছে, যাঁরা আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা মহান আল্লাহর আদেশে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। এসব ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং আল্লাহর আদেশ লাভ করার সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নিজেদের যাবতীয় যোগ্যতা নিয়োজিত করেন। ফেরেশ্তাদের নামে শুধু এ সূরার শুরুতেই শপথ করা হয়নি, সূরা আস্ সাফ্ফাতের শুরুতেও ফেরেশ্তাদের প্রসঙ্গে শপথ করে বলা হয়েছে-

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا-فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا-فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا....اِلٰى اٰخِرِالْاٰيَةِ

সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মানদের শপথ, তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয় তাদের শপথ, তারপর তাদের শপথ যারা উপদেশবাণী শোনায়, তোমাদের প্রকৃত ইলাহ্ হলেন একক সত্বা। (সূরা আস্ সাফ্ফাত-১-৪)

আরবী ভাষায় ফেরেশ্তাদেরকে বলা হয় 'মালায়েকা' এবং এই শব্দটি বহু বচন। এক বচনে বলা হয় 'মালাক'। এ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো 'বাণীবাহক' আর এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে প্রেরিত অথবা ফেরেশ্তা। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কতকগুলো কায়াহীন শক্তির নাম ফেরেশ্তা নয় বরং ফেরেশ্তারা হলেন ব্যক্তিত্বশীল, শ্রারীরিক স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্বসম্পন্ন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অগণিত সৃষ্টি এবং বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ক্ষেত্রে এদের মাধ্যমে নানা ধরনের কর্ম সম্পাদন করিয়ে থাকেন। এদের সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে, এরা হলেন মহান আল্লাহর রাজ্যের কর্মচারী। এদের একমাত্র কাজ হলো আল্লাহর আদেশ কার্যকরী করা। এরা না পুরুষ না নারী। মানুষের ভেতরে যেসব প্রবৃত্তি বিদ্যমান, তা ফেরেশ্তাদের মধ্যে নেই বরং মানবীয় দুর্বলতা থেকে তাঁরা মুক্ত একটি বিশেষ সৃষ্টি।

এক শ্রেণীর অজ্ঞ-মুর্খ মানুষ সেই অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধারণা করে এসেছে যে, এই ফেরেশ্তাগণ হলেন আল্লাহ ক্ষমতার অংশীদার এবং আল্লাহ তা'য়ালা হলেন এদের ওপরে নির্ভরশীল, এদের সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত আল্লাহ তা'য়ালা কোন কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম নন। এরা হলেন আল্লাহর আত্মীয়-স্বজন বা তাঁর কন্যা। (নাউযুবিল্লাহ) কেউ কেউ আবার ফেরেশ্তাদেরকে দেব-দেবীর আসনে আসীন করে তাদের রীতিমত পূজা-আরধনা করে থাকে। মানুষের এসব অজ্ঞতা প্রসূত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। আল্লাহর কোরআনে বিভিন্ন স্থানে ফেরেশ্তাদের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে 'মালায়েকা' শব্দের পরিবর্তে 'রাসূল' শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূল শব্দের অর্থও হলো প্রেরিত। এই অর্থের দিক দিয়ে আরবী ভাষায় দূত, পয়গম্বর, বার্তাবাহক ও রাজদূতের জন্য এই রাসূল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর পবিত্র কোরআনে এই শব্দটি এমন সব ফেরেশ্তাদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা হয় অথবা এমন সব মানুষকে এই রাসূল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ

তাঁর সৃষ্টির কাছে নিজের বাণী পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত করেন। আল্লাহর বিধান যারা অনুসরণ করেনি তাদের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে–

حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ-قَالُوْا اَيْنَ..... اِلى اخِرِالاية

যখন আমার রাসূল (ফেরেশ্তা) তাদের রূহ কবজ করার জন্য এসে পৌঁছাবে সেই সময় তারা তাদেরকে প্রশ্ন করবে যে বলো, এখন কোথায় তোমাদের সেই সব মাবুদ, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকছিলে ? তারা বলবে, 'আমাদের কাছ থেকে আজ তারা সব উধাও হয়ে গিয়েছে।' আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, আমরা বাস্তবেই সত্য অমান্যকারী ছিলাম। (সূরা আল আ'রাফ-৩৭)

আল্লাহর বিধানকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করার লক্ষ্যে যারা নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করতে থাকে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا-اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَاتَمْكُرُوْنَ......اِلى اخِرِالاية

তাদেরকে বলো, আল্লাহ তাঁর চাল ও কৌশলে তোমাদের অপেক্ষা অধিক দ্রুত। তাঁর রাসূল (ফেরেশ্তাগণ) তোমাদের যাবতীয় কুটিল ষড়যন্ত্রকে লিপিবদ্ধ করে রাখছে। (ইউনুস-২১)

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلَقَدْجَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْاسَلٰمًا.....اِلى اخِرِالاية

আর শোন ! ইবরাহীমের কাছে আমার রাসূল (ফেরেশ্তারা) সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছালো। (তাঁরা তাঁকে) বললো, তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জওয়াব দিল, তোমাদের প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক। (সূরা হূদ-৬৯)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী প্রকাশ্য বা গোপন বৈঠকের মাধ্যমে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলো। এদের সেই হীন তৎপরতার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًافَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ-اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّ ....اِلى اخِرِالاية

এই লোকেরা কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ? বেশ তো ! তাহলে আমিও একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এরা কি মনে করেছে, আমি এদের গোপন এবং এদের চুপিসারে বলা কথা শুনতে পাই না ! আমি সব কিছু শুনছি এবং আমার রাসূল (ফেরেশ্তা) তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করছে। (সূরা আয্ যুখরুফ-৭৯-৮০)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে ফেরেশ্তাদের কার্যক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে আরবী 'মালায়েকা' শব্দ ব্যবহার না করে আরবী 'রাসূল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফেরেশ্তা সম্পর্কে একশ্রেণীর মানুষ ধারণা করে থাকে যে, তারা হলেন দেব-দেবী। অথচ তাদের সম্মান ও মর্যাদা অদ্বিতীয় আল্লাহর একান্ত অনুগত আদেশ পালনকারীর থেকে মোটেও বেশী কিছু নয়। তাদের পৃথক কোন ক্ষমতা নেই বরং সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে প্রকৃত শাসনকর্তার হাতে। মানুষের বুঝার জন্য ফেরেশ্তাদের সম্পর্কে সূরা ফাতিরের প্রথম আয়াতে ফেরেশ্তাদের ডানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ডানার ধরণ কেমন তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এ কথার মাধ্যমে

এটা বুঝা যায় যে, বিভিন্ন ফেরেশ্তাকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন পর্যায়ের শক্তি দান করেছেন এবং যাকে দিয়ে যেমন কাজ করাতে ইচ্ছুক তাকে ঠিক তেমনই দ্রুতগতি ও কর্মশক্তি দান করেছেন। সূরা ফাতিরের প্রথম আয়াতে ফেরেশ্তাদের দুটো, তিনটি বা চারটি ডানার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'ইয়াযিদু ফিল খালকি মা ইয়াশাউ' অর্থাৎ নিজের সৃষ্টি কাঠামোয় তিনি যেমনটি চান বৃদ্ধি করেন।'

আল্লাহ তা'য়ালার এ কথার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফেরেশ্তাদের ডানার সংখ্যা চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং কোন কোন ফেরেশ্তাদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রয়োজন অনুসারে চারের অধিক ডানাও দিয়েছেন। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিজী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত জিবারঈল আলাইহিস্ সালামকে এমন অবস্থায় দেখেন যে, তখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছয়শত। তিরমিজী শরীফের আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আল্লাহর রাসূল হযরত জিবরাঈলকে দুই বার তাঁর প্রকৃত অবয়বে দেখেছেন, তখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছয়শত এবং তিনি আকাশ জগতের গোটা শূন্যমার্গ জুড়ে অবস্থান করছিলেন। ফেরেশ্তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَدَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ -

যেসব ফেরেশ্তারা তোমার রব-এর নিকট সান্নিধ্যের মর্যাদার অধিকারী, তারা কক্ষণও নিজেদের বড়ত্বের অহমিকায় পড়ে তাঁর দাসত্ব থেকে বিরত থাকে না। তারা বরং তাঁর তাস্বীহ্ করে এবং তাঁর সামনে অবনত হয়ে থাকে। (সূরা আল আ'রাফ-২০৬)

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার এবং মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে নিজেকে বিরত রাখা শয়তানের কর্মপন্থা আর এর পরিণাম হচ্ছে নিশ্চিত অধঃপতন ও অধোগমন। পক্ষান্তরে আল্লাহর দরবারে মাথা নত করা এবং মহান আল্লাহর দসত্বে অটল-অবিচল হয়ে থাকা ফেরেশ্তা সুলভ কাজ এবং এই কাজের সুফল হচ্ছে, উন্নতি, নৈতিক উৎকর্ষতা এবং আল্লাহ ছুব্হানাহু তা'য়ালার নৈকট্যে ভূষিত হওয়া। এখন যারা এই উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করতে আগ্রহী- তাদের কর্মনীতিকে শয়তানের মত না বানিয়ে আল্লাহর ফেরেশ্তাদের মত বানাতে হবে। মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশ্তাদের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করেছেন-

وَمَنْ عِنْدَهٗ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَدَتِهٖ وَلَايَسْتَحْسِرُوْنَ...اِلى اخِرِ الاية

আর যে ফেরেশ্তারা তাঁর কাছে রয়েছে তারা না নিজেদেরকে বড় মনে করে তাঁর দাসত্ব থেকে বিমুখ হয় এবং না ক্লান্ত ও বিষন্ন হয়, দিন রাত তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, বিরাম-বিশ্রাম নেয় না। (সূরা আম্বিয়া-১৯-২০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ফেরেশ্তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ-لَايَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ -

তারা তো মর্যাদাশালী বান্দাহ্। তারা তাঁর সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধুমাত্র তাঁর আদেশে কর্ম সম্পাদন করে। (সূরা আম্বিয়া-২৬-২৭)

আল্লাহর ফেরেশ্তারা প্রকৃতিগতভাবেই সত্যানুসারী এবং তারা আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে। মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা তাদের হাতেই সুসম্পন্ন হচ্ছে। সূরা নাযিয়াতের প্রথম পাঁচটি আয়াতে যে সমন্বিত পাঁচটি সত্তার শপথ করা হয়েছে, তাদের পরিচয় সম্পর্কে সামান্য মতভেদ রয়েছে। বহু সংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ তাফসীরকারের মতানুসারে সেই পাঁচটি সত্তা হলেন মহান আল্লাহর ফেরেশ্তা। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, এসব হচ্ছে ঐ সমস্ত তারকারাজী যারা স্বীয় কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে বেড়ায় এবং অতি সহজে মহাশূন্যের একস্থান থেকে অন্য স্থানে সন্তরণ করতে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রথম তিনটি সত্তা হলো তারকারাজী এবং চতুর্থ ও পঞ্চম সত্তা হলো ফেরেশ্তাকুল। প্রকৃত বিষয় মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে মূল বিষয় যা-ই হোক না কেন, এসব সত্তার নামে শপথ করে প্রকৃত যে বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে তাহলো, কিয়ামত সংঘটিত হবার বিষয়টি। এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যেই শপথ করা হয়েছে।

এই সূরার ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যেদিন প্রচন্ড গতিতে কম্পিত হতে থাকবে সমগ্র পৃথিবী, এরপরেই আসবে আরেকটি প্রচন্ড ধাক্কা। ঠিক এই বিষয়টিই সূরা যুমার-এর ৬৮ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে-

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ ....اِلى اخِرِالاٰيَةُ

সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। আর তৎক্ষণাত আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সব মরে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের জীবিত রাখতে চান তারা ব্যতীত। এরপর আরেকবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন হঠাৎ সবাই জীবিত হয়ে দেখতে থাকবে। (সূরা যুমার-৬৮)

কিয়ামত সংঘটিত হবার ব্যাপারে সূরা নাযিয়াতে দুটো ধাক্কার কথা বলা হয়েছে এবং সূরা যুমারে দুইবার শিংগায় ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সূরা আন্ নাম্লে দুটো ফুৎকারের অতিরিক্ত আরো একবার শিংগায় ফুৎকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ ..اِلى اخِرِالاٰيَةُ

আর কি হবে সেদিন যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই-তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ এ ভীতি-বিহ্বলতা থেকে রক্ষা করতে চাইবেন। (সূরা আন নাম্ল-৮৭)

হাদীসসমূহে তিনবার শিংগায় ফুৎকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম শিংগাকে বলা হয়েছে 'নাফখাতুল ফাযা' অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্তকারী শিংগা। দ্বিতীয় শিংগাকে বলা হয়েছে 'নাফখাতুস সা'ক-অর্থাৎ মৃত্যু ঘটানোর শিংগা এবং তৃতীয় শিংগাকে বলা হয়েছে 'নাফখাতুল কিয়াম লি রাব্বিল আলামীন-অর্থাৎ যে শিংগায় ফুৎকার দেয়ার পর পরই সমস্ত মানুষ পুনরায় জীবন লাভ করবে এবং নিজের রব-এর দরবারে উপস্থিত হবার জন্য যার যার কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সঠিক রূপ ও ধরন কেমন হবে তার বিস্তারিত বিবরণ মানব বুদ্ধির অগম্য। কোরআন থেকে আমরা যতটুকু জানতে পারি তাহলো,

কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে একবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে ফলে এক মহাধ্বংস যজ্ঞের মাধ্যমে সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এক অজানা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে যাবে।

কত সময় অতিবাহিত হবে তা একমাত্র আল্লাহই অবগত রয়েছেন। তারপর দ্বিতীয় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে ফলে পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে শেষ মানুষটিসহ সমগ্র প্রাণীকুল পুনর্বার জীবন্ত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। শিংগা মানে হলো রণভেরী বা রণতুর্য। বর্তমানে এর বিকল্প হিসাবে বিউগল বলা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীকে একত্র, বিক্ষিপ্ত এবং নির্দেশ দেয়ার জন্য বিউগল বাজানো হয়। মহান আল্লাহ তাঁর বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনা বুঝানোর জন্য এমন সব শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন যা মানুষের জীবনের ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যবহৃত শব্দের সাথে সাদৃশ্য রাকে। এ শব্দ ও পরিভাষাগুলো ব্যবহার করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, মানুষের ধারণা, কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে প্রকৃত বিষয়ের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। এর অর্থ এটা নয় যে মানুষ সত্য সত্যই আল্লাহর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জিনিসকে হুবহু সেই সীমিত অর্থেই গ্রহণ করবে এবং সেগুলোকে পৃথিবীর সীমিত আকারের জিনিস মনে করে নেবে যেমন পৃথিবীতে মানুষের জীবনে পাওয়া যায়। কিয়ামতের যে প্রকম্পনের কথা সূরা নাযিয়াতের ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, সূরা আল হাজ্জ-এ সেই প্রকম্পনের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এই ভাষায়–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ-اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَئٌ .....اِلى اخِرِالاية

হে মানব মন্ডলী ! তোমাদের রব-এর গযব থেকে আত্মরক্ষা করো। প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের প্রকম্পন বড়ই ভয়ঙ্কর জিনিস। যেদিন তোমরা তা দেখবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী নিজের দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আসলে আল্লাহর আযাবই হবে এমনি কঠিন। (সূরা হাজ্জ-১-২)

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তিনবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁকটি মহাতঙ্ক এবং বিভীষিকার সৃষ্টি করবে ফলে মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় ফুঁকে সবাই মৃত্যুবরণ করবে এবং তৃতীয় ফুঁকের পর সবাই জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। তারপর প্রথম ফুঁকের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, সে সময় পৃথিবীর অবস্থা এমন একটি নৌকার মতো হবে, যা ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছে অথবা এমন ঝুলন্ত প্রদীপের মতো হবে, যা বাতাসের তান্ডবে প্রচন্ডভাবে দুলতে থাকবে। সে সময় পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থানকারীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হবে তার চিত্র কোরআনে এভাবে অঙ্কন করা হয়েছে–

فَاِذَانُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ-وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ .....اِلى اخِرِالاية

যখন শিংগায় এক ফুৎকার দেয়া হবে এবং যমীন ও পাহাড় তুলে এক আঘাতে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে তখন সে বিরাট ঘটনা ঘটে যাবে। (সূরা হাক্কা-১৩-১৫)

সূরা নাযিয়াতের ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতে দুটো ধাক্কার কথা বলা হয়েছে। প্রথম ধাক্কাতেই সমস্ত কিছুর ভেতরে মহাকম্পন সৃষ্টি করে তা কাঁপিয়ে হেলিয়ে দেয়া হবে এবং তার রেশ শেষ না হতেই দ্বিতীয় আঘাত এসে সমস্ত কিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। আল্লাহর কোরআন সেদিনের মহাকম্পন–প্রচন্ড ধাক্কা সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে–যখন পৃথিবীকে পুরোপুরি প্রকম্পিত করে দেয়া

হবে এবং সে তার পেটের বোঝা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে আর মানুষ বলবে, এর কি হলো? (সূরা যিলযাল)

অর্থাৎ মৃত্তিকা অভ্যন্তরে যেসব সম্পদ লুকায়িত রয়েছে, অসংখ্য খনিজ দ্রব্যাদি মাটির গহ্বরে রয়েছে। কোথায় কত সম্পদ রয়েছে তা সম্পূর্ণ আবিষ্কার করা কখনো মানুষের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে না। প্রচন্ড ধাক্কায় যে কম্পন সৃষ্টি হবে, তাতে করে পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগ এমনভাবে ওলট-পালট হতে থাকবে, যেভাবে আগুনের উত্তাপে উনুনের ওপরের পাত্রে দ্রব্য নিচেরগুলো ওপরে আসে এবং ওপরের গুলো নিচে চলে যায়। প্রচন্ড ঝড়ের প্রাক্কালে সমুদ্রের যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, যার ফলে সমুদ্রের ওপরের আর নিচের পানি আবর্তিত হতে থাকে। সেদিন প্রচন্ড ধাক্কায় পৃথিবীর অবস্থা তেমনি হবে। ফলে মাটির ভেতর যা কিছু রয়েছে, তা সবই তীব্র গতিতে নির্গত হতে থাকবে। বিশাল আকৃতির পাহাড়গুলো প্রচন্ড ধাক্কায় ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলি কণায় পরিণত হয়ে তা বাতাসের সাথে মহাশূন্যে উড়তে থাকবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا-وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّافَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا-

যেদিন পৃথিবীকে মারাত্মকভাবে ঝাঁকিয়ে দেয়া হবে এবং পাহাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ধূলার মতো উড়তে থাকবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ্-৪-৬)

ধরিত্রীর যে শক্ত পাঞ্জা পর্বতসমূহকে অবিচল রেখেছে সেদিন তা শিথিল হয়ে যাবে। ফলে পর্বতসমূহ স্বীয় মূল থেকে বিচ্ছিন্ন ও উৎপাটিত হয়ে মহাশূন্যে এমনভাবে উড়তে থাকবে, যেমন বর্তমানে খন্ড মেঘমালা উড়ে বেড়ায়। সূরা তুরে বলা হয়েছে–

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا-وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا-

যখন আকাশমন্ডল অত্যন্ত প্রচন্ডভাবে থর থর করে কাঁপবে আর পর্বতসমূহ শূন্যে উড়ে বেড়াবে। (সূরা তুর-৯-১০)

সেদিন উর্ধ্বলোকের সমস্ত শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তখন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে, যে জমাট-বাঁধা দৃশ্য চিরকাল একই রকম দেখাতো, একই রূপে বিরাজ করতো, তা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এর চারদিকে একটা প্রলয় আর অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্তি পাবে কেবল তারাই, যারা আল্লাহর নবীর বিধান অনুসরণ করেছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا..اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

যদি তোমরা নবীর কথা না মানো, তাহলে কেমন করে রক্ষা পাবে সেদিনের বিপদ থেকে, যা বাচ্চাদের বুড়ো করে দেবে এবং যার প্রচন্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে? (সূরা মুয্যাম্মিল-১৭-১৮)

(কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াত ও সূরা নাবার তাফসীর দেখুন)

সূরা নাযিয়াতের ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন বহু হৃদয় আতঙ্কে-ভয়ে ত্রাসে কাঁপতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি হবে সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কের ছায়া গোটা দৃষ্টি জুড়ে বিরাজ করবে। অর্থাৎ সেদিন এমন অসংখ্য মানুষকে দেখা যাবে, যারা কিয়ামতের ময়দানে চারদিকের অবস্থা

দেখে এমনভাবে ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়বে যে, তাদের দৃষ্টিসমূহ পলকহীন হয়ে পড়বে এবং চেহারা আতঙ্কে রক্তশূন্য হয়ে যাবে। এই অবস্থা যাদের হবে তাদের পরিচয় আল্লাহর কোরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতের তাফসীরের 'সেদিন আল্লাহ বিরোধিদের চেহারা ধূলি মলিন হবে' শিরোণাম দেখুন)

আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য অনুসারে কিয়ামতের দিন শুধু তারাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করেনি। রাসূলের অনুসরণে আমলে সালেহ্ করেনি। আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করে সে বিধান প্রতিষ্ঠাকামী আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে।

আর পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেছে এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে, আমলে সালেহ্ করেছে, তাদের ভয়ের কোন কারণ ঘটবে না। প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলা আর প্রাণ ওষ্ঠাগত আতঙ্কের মধ্যেও তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং প্রশান্তির মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে। চারদিকে যে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, তার কোন ছোঁয়াই তাদেরকে স্পর্শ করবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى-اُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ...لى اخرالاية

আর যাদের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে পূর্বাহ্নেই কল্যাণের ফায়সালা হয়ে গিয়েছে তাদেরকে অবশ্যি এ থেকে (ধ্বংসলীলা ও আতঙ্ক) দূরে রাখা হবে, তার সামান্যতম খস্‌খসানিও তারা শুনবে না এবং তারা চিরকাল নিজেদের মনমতো জিনিসের মধ্যে অবস্থান করবে। সেই চরম ভীতিকর অবস্থা তাদেরকে একটুও অস্থির করবে না এবং ফেরেশ্‌তারা এগিয়ে এসে তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে এই বলে, এ তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো। (সূরা আম্বিয়া-১০১-১০৩)

আল্লাহর আদালতে হাশরের ময়দানে আল্লাহর বিধানের বিপরীত জীবন-যাপনকারী মানুষগণ যখন চরম ভীতি ও অস্থিরতার মধ্যে থাকবে, তখন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপনকারী মানুষরা সে সময় মানসিক নিশ্চিন্ততার মধ্যে অবস্থান করবে। কারণ সেখানে যা কিছুই ঘটতে থাকবে তা হবে তাদের আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনার অনুকূলে। ঈমান ও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কর্মের যে পূঁজি নিয়ে তারা এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিল, তা সে সময় পর্যন্ত মহান আল্লাহর করুণায় তাদের মনোবল দৃঢ় করবে এবং আতঙ্ক, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার পরিবর্তে তাদের মনে এই আশার সঞ্চার করবে যে, তারা পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছিল তথা আমলে সালেহ্ করেছিল, তার বিনিময় তারা এখন লাভ করবে। কিয়ামতের দিনে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا-حَتّٰى ...اِلَى اخرالاية

আর যারা নিজেদের রব-এর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন দেখবে জান্নাতের দরজাসমূহ পূর্বেই খুলে দেয়া হয়েছে। এবং তার ব্যবস্থাপক তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা অত্যন্ত ভালো ছিলে-এখন এসো এর মধ্যে চিরকাল থাকার জন্য প্রবেশ করো। (সূরা যুমার-৭৩)

সূরা নাযিয়াতের ১০ থেকে ১২ নম্বর আয়াতে আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকারকারী, পরকাল অবিশ্বাসী ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিনের বিবরণ শুনে তারা সন্দেহ আর সংশয়ে দোলায়িত হয়ে বলে থাকে যে, 'বর্তমানে আমাদের দেহে যেমন জীবন রয়েছে, আমরা সমস্ত কিছু দেখতে সক্ষম হচ্ছি এবং সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাসহ যাবতীয় কিছু অনুভব করছি, কিয়ামতের দিনেও কি আমাদের দেহে এসব অনুভূতিসহ জীবন ফিরে আসবে ? এ তো বড় বিস্ময়ের কথা, আমরা মৃত্যুবরণ করবো, আমাদের দেহের সমস্ত কিছু পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে তার শেষ চিহ্নটুকুও মহাকালের বিবরে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাবে, তারপর পুনরায় আমরা এমন দেহ লাভ করবো এবং সে দেহে প্রাণও ফিরে আসবে ?

আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজ এই বিষয়টির বর্ণনা শুনে তাদের মনে বিস্ময় জাগতো এবং তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জগতে যখন কিছুতেই বিষয়টির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হতো না, অবিশ্বাসের আবরণ পরিবেষ্টিত চেতনার জগৎ ভেদ করে কিয়ামতের বাস্তবতা মনের গহীনে স্পর্শ করতো না, তখন তারা মহাবিস্ময়ে বলে উঠতো, 'এ এক অসম্ভব ব্যাপার ! কখনো এমনটি ঘটা সম্ভব নয়।'

তারপর তারা কিয়ামত সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে আল্লাহর রাসূলসহ ইসলাম পন্থীদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে উপহাসের সুরে বলতো, 'তোমরা বলছো স্বয়ং আল্লাহ এসব কথা বলেছেন, যদি কখনো তোমাদের বলা এসব কথা বাস্তবে পরিণত হয়-ই, আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে দেহে প্রাণ দান করা হয়-ই, তাহলে তো সেই অবস্থা আমাদের জন্য অত্যন্ত অশুভ পরিণতি ডেকে আনবে।'

আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকারকারী এবং পরকাল অবিশ্বাসী গোষ্ঠীর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আর উপহাসের জবাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরার **১৩ ও ১৪** নম্বর আয়াতে বলেন, বর্তমানে তারা কিয়ামতের বিষয়টিকে তারা উপহাসের বিষয়ে পরিণত করেছে। ভেবেছে এ ধরনের ঘটনা কখনোই ঘটবে না এবং তা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। অথচ যা মানুষের চিন্তা শক্তিকে পরাস্ত করে এবং যা মানুষের কল্পনা শক্তিকেও স্পর্শ করতে সক্ষম নয়, সেটাই মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজ বিষয়। তারা যা কল্পনার অতীত বলে ধারণা করছে এবং বিষয়টি নিয়ে বিদ্রুপ করছে, তা সংঘটিত করার জন্য ব্যাপক কোন কিছুর আয়োজন এবং কোন ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের আবশ্যক হবে না। শুধুমাত্র একটি মহাধ্বনি–যাজরাতুন ওয়াহিদাহ্–মহা ভয়ঙ্কর শব্দ, একটি মাত্র ভীষণ শব্দের সৃষ্টি করা হবে, সাথে সাথে এই উপহাসকারী অবিশ্বাসী গোষ্ঠী নিজেদেরকে দেখতে পাবে শুভ্র উজ্জ্বল ধূসর উন্মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হয়ে গিয়েছে।

শুধুমাত্র একটি মহাধ্বনি–যাজরাতুন ওয়াহিদাহ্–মহা ভয়ঙ্কর শব্দ অর্থাৎ শিংগার ধ্বনি। এই ধ্বনি সৃষ্টি করার সাথে সাথে পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানে সবার সমবেত হওয়া পরিপূর্ণরূপে সংঘটিত হবে। মাটির সাথে যা যেখানে মিশে গিয়েছে এবং আগুনে পুড়ে যা ভস্মে পরিণত হয়েছে, পানির সাথে যা কিছু মিশ্রিত হয়েছে তা সবই চারদিক থেকে ছুটে এসে পুঞ্জিভূত হবে এবং নিমিষেই জীবন্ত দেহধারী মানুষে পরিণত হয়ে যাবে। এসব কিছু সংঘটিত হবে চোখের পলক ফেলার পূর্বেই এবং অবিশ্বাসীদের দল নিজেদেরকে আল্লাহর আদালতে উপস্থিত দেখতে পাবে। এই বিষয়টিকে তারা যতই উপহাস করুক বা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করুক, এই অবস্থার মধ্যে নিপতিত হওয়া থেকে তারা নিজেদেরকে কোনক্রমেই রক্ষা করতে সক্ষম

হবে না। এদের অবিশ্বাস আর উপহাস কোন কিছুই সেই দিনের আগমনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।

মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন লাভ করার বিষয়টি তোমরা যারা অসম্ভব বলে ধারণা করছো, তোমরা কি যমীনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো না ? তোমাদের দৃষ্টির সামনেই তো মৃত্যুর পরে যমীনসহ অসংখ্য বস্তুকে আমি জীবিত করছি। লক্ষ্য করো–

وَاللّٰهُ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ......اِلَى اٰخِرِالاٰيَةِ

আল্লাহই বায়ূ প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। এরপর আমি তা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি। এরপর আমি এর মাধ্যমে যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থানও এভাবেই ঘটবে। (সূরা ফাতির-৯)

যমীনকে প্রত্যেক মানুষই নির্জীব ফসলহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় পতিত থাকতে দেখে। কিন্তু বৃষ্টির কয়েকটি ফোটা পড়ার সাথে সাথে সে নির্জীব যমীন হঠাৎ করে তরতাজা গাছপালায় ভরে ওঠে এবং সবুজ-শ্যামল ফসলাদি দোল খেতে থাকে। বার বার যমীনের এ দৃশ্যের দর্শক কেমন করে অসম্ভব মনে করতে পারে যে, আল্লাহর আদেশে সমস্ত মৃত মানুষ এভাবে যমীনের ওপরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে একদিন দাঁড়িয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ........اِلَى اٰخِرِالاٰيَةِ

আল্লাহর বৃষ্টিদান রহমতের প্রভাব লক্ষ্য করো, পতিত যমীনকে তিনি বৃষ্টির মাধ্যমে কিভাবে জীবন্ত করে তোলেন ! নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদের জীবন দানকারী এবং তিনি সর্ববিষয়ে সক্ষম। (সূরা রুম-৫০)

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ......اِلَى اٰخِرِالاٰيَةِ

যিনি আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ঐগুলোর মত পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? কেননা, তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি তাকে আদেশ করবেন যে, হয়ে যাও–আর অমনি তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াছিন-৮১-৮২)

মৃতদেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ যেখানে যে অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, কোথায় কোন বস্তুর সাথে তা মিশ্রিত হয়েছে, এসব কিছু মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয় এবং তিনি তা একত্রিত করতে মোটেও অক্ষম নন। তাঁর ইশারা মাত্র সমস্ত মৃত জিনিস জীবন্ত হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত কাতাদাহ ও হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, মক্কার ইসলামী বিরোধী গোষ্ঠীর একজন নেতা একদিন কবরস্থান থেকে মানুষের একটি জীর্ণ হাড় নিয়ে এসে আল্লাহর রাসূলের সামনে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ ! তুমি বলছো মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। এখন বলো, এই চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়গুলোকে পুনরায় কে জীবিত করবে ? এদের এই অমূলক প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ-قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ-

তারা বলে, কে এই অস্থিগুলো জীবন্ত করবে যখন তা জীর্ণ হয়ে গেছে ? তাদেরকে বলুন, এগুলোকে তিনি জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবারে সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। (ইয়াছিন-৭৯)

قُلْ كُنُوْا حِجَارَةً اَوْحَدِيْدًا-اَوْخَلْقًامِمَّايَكْبُرُفِى صُدُوْرِكُمْ.اِلَى اخِرِالاٰيَةِ

হে নবী ! এদেরকে বলে দিন, তোমরা পাথর বা লোহাই হয়ে যাও অথবা তার চেয়ে কঠিন কোন জিনিসও যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনী শক্তি লাভ করার বহু দূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে–কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে ? জবাবে বলুন তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫০-৫১)

মহান আল্লাহ যে পুনরায় সমস্ত কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তা তাঁর প্রথম সৃষ্টিই প্রমাণ। প্রথমে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তা ধ্বংসের পরে পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেও কষ্টকর নয়। আল্লাহ বলেন– وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُاالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَاَهْوَنُ عَلَيْهِ

আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন পরে তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর পক্ষে সহজতর। (সূরা রুম-২৭)

প্রথমবার সৃষ্টি করাটা যদি তাঁর জন্য কঠিন না হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা কেমন করে ধারণা করতে পারলে যে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন হবে? প্রথমবারের সৃষ্টির মধ্যে তো তোমরা সশীরেরই উপস্থিত আছো। সুতরাং এটা যে কোন কষ্টসাধ্য কাজ নয় এটা তো সুস্পষ্ট। এখন বিষয়টি অত্যন্ত সহজ বুদ্ধির ব্যাপার যে, একবার যিনি কোন একটি জিনিস নির্মাণ করেন সে জিনিসটি পুনর্বার নির্মাণ করা তার জন্য তুলনামূলকভাবে আরো অনেক বেশী সহজ হওয়ার কথা।

কিয়ামতের বিষয় বর্ণনা করার মাঝেই হঠাৎ করে ১৫ থেকে ২৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম ও ফেরাউনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারে যে, বলা হচ্ছিলো কিয়ামত সংঘটনের বিষয়ে–এর মধ্যে হঠাৎ করে হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম ও ফেরাউনের ইতিহাস শোনানো শুরু হলো কেন এবং বিষয়টি কি অপ্রাসঙ্গিক নয়?

প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি মোটেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী পরকাল অস্বীকার করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর রাসূলকে এবং তাঁর ওপরে নাযিল করা কিতাবকে অস্বীকার করছিল। বিষয়টি এমন ছিল না যে সেই লোকগুলো কোন মামুলি বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছিল। বরং তারা তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। এ ব্যাপারে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল এবং বিষয়টিকে তারা যে মোটেও গ্রহণ করবে না, তার প্রমাণও তারা রেখেছিল বদর ও ওহুদ যুদ্ধসহ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত করে। তারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে ধরনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জাল বপন করেছিল, তা কোন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল না। চিরকালের জন্য আল্লাহর রাসূলের আন্দোলনকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করার লক্ষ্যে তারা সর্বশক্তি ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ওদের মত সেই একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিল আল্লাহদ্রোহী ফেরাউন আল্লাহর রাসূল হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে। ঐ ঘৃণিত ব্যক্তি সদলবলে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে পৃথিবীতেও যেমন আল্লাহর গজবে নিপতিত হয়েছিল এবং মৃত্যুর পরের জগতেও আযাবে নিমজ্জিত হয়েছে। সুতরাং ফেরাউন সদলবলে যে ঘৃণিত

কর্ম করে পৃথিবী ও আখিরাতে আল্লাহর আযাবে পতিত হয়েছে, অনুরূপ কাজ করে তারাও যেন পৃথিবী ও আখিরাতে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়ে না যায়, স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিণাম কত ভয়ঙ্কর হয়–এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই আখিরাতের বর্ণনার মাঝ পথেই হযরত মুছা আলাইহিস্ সালাম আর ফেরাউনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অবতারণা করা হয়েছে। অতএব বিষয়টি মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হয়নি এবং মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর কোন বর্ণনা কখনো অপ্রাসঙ্গিক হয় না।

মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীকে ফেরাউনের সেই নির্মম পরিণতির ইতিহাস শোনানোর শুরুতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সূরার ১৫ নম্বর আয়াতে হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলেছেন, তোমাদের কাছে কি মুছার ইতিহাস পৌঁছেছে ? অর্থাৎ তোমাদের সামনে উপস্থিত রাসূলের ন্যায় আমার আরেকজন রাসূল মুছার সাথে জালিম ফেরাউন কি ধরনের আচরণ করেছিল এবং সেই জালিমের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হয়েছে, সে ইতিহাস কি তোমরা অবগত রয়েছো ? ফেরাউনও তোমাদের মতই আচরণ করে আমার গযবে নিপতিত হয়েছে, তোমরাও সেই একই আচরণ করে আমার গযবকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত রয়েছো ?

হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস অত্যন্ত শিক্ষণীয় ইতিহাস আর এ জন্যই আল্লাহর কোরআনে সেই ইতিহাস সব থেকে বেশী এবং বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই সূরার পূর্বে আল্লাহর কোরআনের আরো অনেক সূরায় এই ইতিহাস সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নানাভাবে, বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গিতে। প্রত্যেক স্থানেই প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে সেই ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এমনভাবে সেই ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে ঐ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সাথে আলোচ্য বিষয়ের এটা সুন্দর অপূর্ব যোগসূত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

এ সূরার ১৫ থেকে ২৬ আয়াতে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'তুয়া' নামক উপত্যকায় হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামকে আহ্বান করা থেকে শুরু করে জালিম ফেরাউনকে সদলবলে গ্রেফতার করা পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করে পৃথিবী ও আখিরাতে তার আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, আলোচ্য সূরাটির প্রকৃত আলোচ্য বিষয় পরকালীন জীবনের বাস্তবতা অনুধাবন করা অত্যন্ত সহজ হয়। নির্দিষ্ট দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবেই এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই–এই বাস্তব সত্যকে মানুষের মন-মগজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই এসব ঘটনা ও দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। ইতিহাস বর্ণনার শুরুতেই জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যের মাধ্যমে বলা হয়েছে, তোমাদের কাছে কি মুছার ইতিহাস পৌঁছেছে ? এভাবে জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যের মাধ্যমে ইতিহাস বর্ণনা শুরু করার মূল লক্ষ্য হলো, ঐ ইতিহাস শোনার জন্য শ্রোতার শ্রবণ ইন্দ্রিয় আর হৃদয়ঙ্গম করার চেতনাকে শানিত করা।

১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যখন তাঁর রব তাঁকে আহ্বান জানালেন 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায়। 'আল্লাহ তাঁকে আহ্বান জানালেন' এ কথা না বলে বলা হলো 'রব আহ্বান জানালেন'। অর্থাৎ আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তে 'রব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুফাস্সিরগণ বলেন, এখানে 'রব' শব্দ এ জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে যে, হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের সাথে যে জালিম ফেরাউন অন্যায় আচরণ করেছিল, সেই জালিম স্বয়ং 'রব'-এর দাবী করেছিল। পক্ষান্তরে প্রকৃত রব হলেন মহান আল্লাহ। (প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহই ভালো জানেন।)

১৭ থেকে ১৯ আয়াতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে আদেশ দেয়া হলো ফেরাউনের কাছে মহাসত্যের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ সে ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে সীমা লংঘন করেছে। আর আল্লাহর দেয়া সীমা যারা লংঘন করে তারা স্বাভাবিকভাবেই কলুষতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। নিজেরাও যেমন কলুষিত হয়ে পড়ে তেমনি সে ব্যক্তি স্বীয় পরিবেশকেও কলুষিত করে ছাড়ে ঠিক দুর্গন্ধের মতই। দুর্গন্ধ যেমন নিজের উৎসস্থলেই সীমাবদ্ধ থাকে না, চারদিকের বাতাস ভারী করে তোলে। ঠিক তেমনি কোন মানুষ যখন মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে, আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করে, তখন তার সীমা লংঘনমূলক কাজের জন্যই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অশান্তি ডেকে আনে। ফলে সে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়। এ জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ বিরোধী কর্মকান্ডসমূহ 'অপবিত্র' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই অপবিত্রতা তথা আল্লাহর অপছন্দনীয় কর্মকান্ডের সাথে সম্পর্কহীন হলেই কেবলমাত্র পবিত্র অর্জন করা যায় তথা আল্লাহর প্রিয় গোলামে পরিণত হওয়া যায়।

এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল হযরত মূসাকে বলতে বললেন, ফেরাউনের কাছ থেকে জেনে নাও সে পবিত্রতা অর্জন করতে ইচ্ছুক কি না-অর্থাৎ সে আল্লাহ বিরোধী কর্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছে কি না। সে সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর গোলাম, বর্তমানে সে আল্লাহর গোলামী ত্যাগ করে নিজেকে গোটা জাতির রব-হবার দাবী করছে। এভাবে সে আল্লাহর দেয়া সীমা অতিক্রম করেছে। তার কর্মকান্ড তার নিজের জন্য এবং গোটা জাতির জন্য জুলুম বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই অবস্থা থেকে সে নিজেকে সংশোধন করতে আগ্রহী কি না। যদি আগ্রহী হয় তাহলে আল্লাহর রাসূল তাকে নির্ভুল পথপ্রদর্শন করবেন, যে পথ অবলম্বন করলে সে অপবিত্রতা তথা সীমা লংঘনমূলক আচরণ থেকে মুক্ত থাকবে এবং গোটা জাতিও ইনসাফ লাভ করবে। এই পথ তাকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করবে, তার ভেতরে আখিরাতের ভয় সৃষ্টি হবে, এই চেতনা তার ভেতরে জাগ্রত হবে যে, তার সমস্ত কর্মই আল্লাহ রেকর্ড করছেন, তিনি সমস্ত কিছু দেখছেন এবং শুনছেন, এর ভিত্তিতে কিয়ামতের ময়দানে আদালতে আখিরাতে তার শুভ বা অশুভ পরিণতি নির্ধারিত হবে।

এই চেতনার কারণে তার মাধ্যমে কোন ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদন হবে না। ফলে গোটা জাতি তার মাধ্যমে ইনসাফ লাভ করতে পারবে। এই কথাগুলোই হযরত মূসা তাকে এভাবে বলেছিলেন, 'আমি কি তোমাকে তোমার রব-এর দিকে পথ দেখাবো, যেন তুমি তাঁকে ভয় করতে থাকো।'

২০ থেকে ২৬ নম্বর আয়াতের বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর জাতির সাথে ফেরাউনের জঘন্য আচরণ সম্পর্কিত ইতিহাস সামনে রাখা প্রয়োজন। আর এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ সূরায় আখিরাতের বর্ণনার মাঝ পথে ফেরাউনের ইতিহাস এ জন্যই বর্ণিত হয়েছে, মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী যেমন তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত অস্বীকার করছিল, ফেরাউন এবং তার অনুসারীরাও তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত অস্বীকার করেছিল ফলে তারা কতটা ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল, তা শুনিয়ে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য।

বর্তমান যুগে মিশরের পিরামিড সম্পর্কে যে গবেষণা চলেছে এবং এখন পর্যন্ত চলছে, তাতে করে অতীতের ঘটনাবলী হতে জানা যায় যে, সে যুগে মিশরের শাসকদের বিশেষ উপাধি ছিল ফেরাউন। এটা ছিল মিশরের বাদশাহ্‌দের উপাধি, কোন বিশেষ শাসকের নাম নয়। হযরত

ঈসার তিন হাজার বছর পুর্ব হতে আরম্ভ করে ইস্কান্দারের শাসনকাল পর্যন্ত ফেরাউনদের একত্রিত বংশধর মিশরের উপর রাজত্ব করে এসেছে তথা শাসনকার্য পরিচালিত করেছে।

এই বংশের সর্বশেষ বংশধর ছিল পারস্যের শাসকদের বংশধর। এই পারস্য হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের আবির্ভাবের ৩৩২ বছর পূর্বে ইস্কান্দার কর্তৃক বিজিত হয়। এই ফেরাউনদের মধ্যে হযরত ইউসুফের আমলের ফেরাউন 'হীক্সূস আমালেকা' বংশ হতে উদ্ভূত ছিলেন এবং তা আরব বংশধরগুলোরই একটি শাখা ছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যে সময়ে নবী হিসেবে এসেছিলেন এবং তাঁর সাথে যে ফেরাউনের সংঘর্ষ হয়েছিল সে কোন ফেরাউন ছিল এবং কোন বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল?

'ফেরাউন' শব্দের অর্থ 'সূর্যদেবতার সন্তান'। প্রাচীন মিশরবাসী সূর্যকে 'মহাদেব' বা 'পরমেশ্বর' রূপে মানতো। একে তারা বলতো 'রাই' এবং এর সাথেই ফেরাউনের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, কোন শাসক দেশ শাসনের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব কেবল তখনই পেতে পারে, যদি সে 'রাই' দেবতার রূপ ধারণ করে এবং এই পৃথিবীতে হয় তার প্রতিভূ বা প্রতিনিধি। এই কারণে মিশরে যে রাজবংশই ক্ষমতাসীন হতো, সে-ই নিজেকে সূর্যবংশী বলে প্রচার করতো আর যে শাসকই ক্ষমতাসীন হতো, সে-ই 'ফেরাউন' উপাধি গ্রহণ করে দেশবাসীকে এই ধারণা দিত যে, সে-ই তাদের 'পরমেশ্বর' বা 'মহাদেব।'

এখানে এই কথাও জেনে নেয়া আবশ্যক যে, আল্লাহর কোরআনে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে দু'জন ফেরাউনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারমধ্যে একজন সেই ফেরাউন যার শাসন আমলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয় এবং যার ঘরে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় সেই ফেরাউন, যার কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত ও বনী-ইসরাঈলের মুক্তির দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং যে শেষ পর্যন্ত ডুবে মরেছিল। একালের গবেষকদের মতে প্রথম ফেরাউন ছিল 'দ্বিতীয় রামে'সীস।' তার শাসনকাল ছিল খৃস্টপূর্ব ১২৯২-১২২৫ সন পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় ফেরাউন-কোরআনের আয়াতসমূহে যার উল্লেখ করা হয়েছে, তার নাম ছিল 'মুনফাতা' বা মিনফাতাহ। সে তার পিতা দ্বিতীয় 'রামে'সীস'-এর জীবদ্দশায়ই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে এবং পিতার মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসে। কিন্তু এটা বাহ্যত সন্দেহাতীত কথা নয়। কেননা ইসরাঈলী ইতিহাসের হিসাব মতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মৃত্যু তারিখ হচ্ছে খৃস্টপূর্ব ১২৭২ সন। কিন্তু এটাও ঐতিহাসিক ধারণা-অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষত মিশরীয়, ইসরাঈলীয় ও খৃস্টীয় পঞ্জিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ নির্ভুল সন-তারিখের হিসাব নির্ধারণ বড়ই কঠিন ব্যাপার।

সাধারণ আরব ঐতিহাসিকগণ এবং কোরআনের মুফাস্সীরগণ এই ফেরাউনকেও আমালেকা বংশেরই একজন দাম্ভিক অত্যাচারী কাফের বলে থাকেন এবং কেউ তার নাম ওলীদ ইবনে মুছআব ইব্নে রাইয়্যান বলেন। আবার কোন ঐতিহাসিক তার নাম মুছআব ইবনে রাইয়্যান বলেন। এসব ঐতিহাসিকদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানীদের বা গবেষকদের ধারণা হলো, তার নাম 'রাইয়্যান' অথবা 'রাইয়্যানে আব্বা' ছিল।

ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, তার উপনাম ছিল 'আবু মোররাহ্'। এ মন্তব্য প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিকদের তত্ত্ব বিশ্লেষিত বর্ণনা বা গবেষণার উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালের নতুন মিশরীয় গবেষকদের তত্ত্বানুসন্ধানে এবং শীলালিপির পরিপ্রেক্ষিতে

এ সম্পর্কে অন্য প্রকারের মতামত সামনে এসেছে। তা এই যে, হযরত মূসার যুগের ফেরাউন দ্বিতীয় রীমশীসের পুত্র 'মিন্‌ফাতাহ্'। তার শাসন কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১২৯২ সন হতে (আরম্ভ হয়ে খ্রীষ্টপূর্ব) ১২২৫ সনে শেষ হয়।

যে ফেরাউন বনী ইস্‌রাঈলদেরকে আপদ-বিপদে ও দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত রেখেছিল, সে এই দ্বিতীয় 'রীমসীসই' হতে পারে। এটা ছিল মিশরের শাসকদের উনবিংশ বংশধর। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এই শাসকের শাসনামলেই জন্মগ্রহণ করেন এবং এরই পরিবারে সন্তান স্নেহে প্রতিপালিত হন। প্রাচীনকালের শিলা লিপিসমূহ হতে সন্ধান পাওয়া যায় যে, "আসীবিয়্যাহ্" গোত্রগুলো যারা মিশরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো তাদের এবং ফেরাউনদের এই বংশধরের মধ্যে একাধারে নয় বছর কাল ভীষণ যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছে, সুতরাং এটা অনুমান করা যায় যে, দ্বিতীয় রীমসীস আশংকা করলো, পরিণামে বনী ইসরাঈলের এই বিরাট গোত্র, যাতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ছিল, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত না হয়। এ জন্যে সে বনী ইসরাঈলকে এসমস্ত বিপদে ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে রাখা জরুরী মনে করলো। আল্লাহর কোরআনে এসব ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় রীমসীস্' বয়োবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এ কারণে সে নিজের জীবদ্দশায়ই বড় পুত্র 'মিন্‌ফাতাহ্‌কে' রাজকার্যে শরীক করে নিয়েছিল। রীমসীসের দেড়শত সন্তানদের মধ্যে মিন্‌ফাতাহ্ ছিল ত্রয়োদশ সন্তান সুতরাং মিন্‌ফাতাহই সে ফেরাউন যাকে হযরত মূসা ও হারূন আলায়হিস্ সালাম ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান করেছিলেন এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দেয়ার দাবী জানিয়েছিলেন এবং এরই শাসন আমলে বনী ইসরাঈল মিশর হতে বের হয়েছিল। আর এই ফেরাউনই সমূদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল।

অনিচ্ছাকৃতভাবে হযরত মূসার হাতে একজন মিশরীয় মারা পড়ার ফলে তিনি নিজে গ্রেফতার হয়ে যাবার আশংকা করছিলেন। এ সময় তিনি মিশর ত্যাগ করে মাদ্‌ইয়ানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যার বাড়িতে আশ্রয় লাভ করেছিলেন, সেই সৎ ব্যক্তি তাঁর সাথে নিজের মেয়ে বিয়ে দিলেন। বিয়ের কিছুদনি পরে তিনি নিজের দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে মহান আল্লাহ তাকে ডেকে নিয়ে এক বিরাট দায়িত্ব দান করে তাকে ধন্য করলেন। এই দায়িত্ব তাঁর ওপর মহান আল্লাহ অর্পণ করবেন বলেই তাঁকে সেই শিশু কাল হতেই তিনি হেফাজত করছিলেন। মিশর যাবার পথে কি ঘটেছিল, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা হলো–

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَالَ وَسَارَبِاَهْلِهٖ اٰنَسَ مِنْ......اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করে নিলো এবং নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে চললো তখন তুর পাহাড়ের দিক থেকে একটি আগুন দেখতে পেলো। সে তাঁর পরিবার বর্গকে বললো, 'থামো, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো আমি সেখান থেকে কোন সংবাদ আনতে পারি অথবা সেই আগুন থেকে কোন অংগার নিয়ে আসতে পারি যাতে তোমরা আগুন ব্যবহার করতে পারো।' সেখানে পৌঁছার পর উপত্যকার ডান কিনারায় পবিত্র ভূখন্ডে একটি বৃক্ষ থেকে আহবান এলো, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের অধিপতি। (আল কাসাস-২৯-৩০)

পবিত্র কোরআনের আয়াতে ডান কিনারায় বলতে হযরত মূসার ডান হাতের দিকে যে কিনারা ছিল সেই কিনারা বুঝানো হয়েছে। আর পবিত্র ভূখন্ড বলতে আল্লাহর দ্যুতির আলোকে যে

ভূখণ্ড আলোকিত হচ্ছিল, সেই ভূখন্ডকে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা ত্বা-হা-এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى–اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا...اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةِ

আর তোমার কাছে কি মূসার খবর কিছু পৌছেছে? যখন সে একটি আগুন দেখলো এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকে বললো, 'একটু দাঁড়াও, আমি একটি আগুন দেখেছি, হয়তো তোমাদের জন্য এক আধটি অংগার আনতে পারবো অথবা এ আগুনের কাছ থেকে আমি কোন পথের দিশা পাবো।' সেখানে পৌছলে তাকে ডেকে বলা হলো, 'হে মূসা! আমিই তোমার রব, জুতো খুলে ফেলো, তুমি পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় আছো। আমিই আল্লাহ্, তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি, শোনো যা কিছু অহী করা হয়। আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তুমি আমারই দাসত্ব করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, আমি তার সময়টা অপ্রকাশিত রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকটি প্রাণসত্তা তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান লাভ করতে পরে। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান আনে না এবং নিজের প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছে সে যেন তোমাকে সে সময়ের চিন্তা থেকে নিবৃত্ত না করে। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা ত্ব-হা-৯-১৬)

এটা সে সময়ের ইতিহাস যখন হযরত মূসা মাদ্ইয়ানে কয়েক বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে নিয়ে মিসরে ফিরে যাচ্ছিলেন। হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ এলাকা অতিক্রম করছিলেন। দূর থেকে একটি আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন সেখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে যার সাহায্যে শিশু সন্তান ও পরিবারের লোকজনদের সারারাত গরম রাখার ব্যবস্থা হবে অথবা সামনের দিকে অগ্রসর হবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি পৃথিবীর পথের সন্ধান লাভের কথা চিন্তা করেছিলেন আর লাভ করলেন সেখানে মহাসত্যের পথ। পাহাড়ে ওঠার সময় মহান আল্লাহ তাঁকে পায়ের জুতা খুলে ওঠার আদেশ দিলেন, সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, 'তুয়া' ছিল এই উপত্যকাটির নাম। কিন্তু কোন কোন মুফাস্সীর 'পবিত্র তুয়া উপত্যকা' অর্থ করেছেন, 'এমন উপত্যকা যাকে একটি সময়ের জন্য পবিত্র করা হয়েছে।'

তাওহীদের পরে যে দ্বিতীয় সত্যটি প্রত্যেক যুগে সমস্ত নবী-রাসূলদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে এবং যার শিক্ষা দেবার জন্য তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে আখেরাত। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বলা সূরা ত্বা-হা-এ কেবলমাত্র এ সত্যটি বর্ণনা করাই হয়নি বরং এর উদ্দেশ্যের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। কিয়ামতের সেই প্রতীক্ষিত সময়টি আসার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং যে কাজ করেছে তার প্রতিদান পাবে সে আখেরাতে। তবে পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষে সে সময়টি গোপন রাখা হয়েছে। যার আখেরাতের সামান্য চিন্তা থাকবে সে সব সময় এ সময়টির কথা স্মরণে রাখবে এবং আখিরাতের স্মরণ তাকে ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি বৈষয়িক কাজ কর্মের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইবে সে এ চিন্তার মধ্যে ডুবে যাবে যে, কিয়ামত এখনো অনেক দূরে, বহুদূরে এবং সে কিয়ামত আসার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কিত এ ঘটনা সূরা নাম্ল-এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا–سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا..اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةِ

(তাদেরকে সেই সময়ের কথা শুনাও) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বললো, 'আমি আগুনের মতো একটা বস্তু দেখেছি। এখনি আমি সেখান থেকে কোন খবর আনবো অথবা খুঁজে আনবো কোন অংগার, যাতে তোমরা উষ্ণতা লাভ করতে পারো।' সেখানে পৌছানোর পর আওয়াজ এলো, 'ধন্য সেই সত্তা যে এ আগুনের মধ্যে এবং এর চারপাশে রয়েছে, পাক-পবিত্র আল্লাহ্ সকল বিশ্ববাসীর প্রতিপালক।' (সূরা নম্‌ল-৭-৮)

এটা তখনকার ঘটনা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মাদ্ইয়ানে আট দশ বছর অবস্থান করার পর নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে কোন বাসস্থানের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। মাদইয়ান এলাকাটি অবস্থিত ছিল আকাবা উপসাগরের তীরে আরব ও সিনাই উপদ্বীপের উপকূলে। সেখান থেকে যাত্রা করে হযরত মূসা সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে পৌছান। এ অংশের যে স্থানটিতে তিনি পৌছান বর্তমানে তাকে সিনাই পাহাড় ও মূসা পর্বত বলা হয়। কোরআন অবতীর্ণের সময় এটি তূর নামে পরিচিত ছিল। এখানে যে ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে সেটি এই পাহাড়ের পাদদেশে সংঘটিত হয়েছিল।

হযরত মূসা একটি অপরিচিত এলাকা অতিক্রম করছিলেন। এ এলাকার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ জানাশোনা ছিল না। তাই তিনি নিজের পরিবারের লোকদের বললেন, আমি সামনের দিকে গিয়ে একটু জেনে আসি আগুন জ্বলছে কোন্ জনপদে, সামনের দিকে পথ কোথায় কোথায় গিয়েছে এবং কাছাকাছি কোন্ কোন্ জনপদ আছে। তবুও যদি দেখা যায়, ওরাও আমাদেরই মতো চলমান মূসাফির, যাদের কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যাবে না, তাহলেও অন্ততপক্ষে ওদের কাছ থেকে কিছু অংগার তো আনা যাবে। এ থেকে আগুন জ্বালিয়ে তোমরা উত্তাপ লাভ করতে পারবে।

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যেখানে কুঞ্জবনের মধ্যে আগুন লেগেছে বলে দেখেছিলেন সে স্থানটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম খৃষ্টান বাদশাহ কনস্টানটাইন ৩৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঠিক যে জায়গায় এ ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এর দু'শো বছর পরে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এখানে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। কনষ্টান্টাইনের গীর্জাকেও এর অন্তরভুক্ত করা হয়। এ আশ্রম ও গীর্জা বর্তমানেও অক্ষুন্ন রয়েছে। এটি গ্রীক খৃষ্টীয় গীর্জার পাদ্‌রী সমাজের দখলে রয়েছে।

সুরা কাসাসে বলা হয়েছে, আওয়াজ আসছিল একটি বৃক্ষ থেকে, এ থেকে ঘটনাটির যে দৃশ্য সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এই যে, উপত্যকার এক কিনারে আগুনের মতো লেগে গিয়েছিল কিন্তু কিছু জ্বলছিল না এবং ধোঁয়াও উড়ছিল না। আর এ আগুনের মধ্যে একটি সবুজ শ্যামল গাছ দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে সহসা এ আওয়াজ আসতে থাকে।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে এ ধরনের অদ্ভুত ব্যাপার ঘটা চিরাচরিত ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন হেরা গিরি-গুহায় একান্ত নির্জনে সহসা একজন ফেরেশতা আসেন। তিনি তাঁর কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে থাকেন। হযরত মূসার ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটে। এক ব্যক্তি সফরকালে এক জায়গায় অবস্থান করছেন। দূর থেকে আগুন দেখে পথের সন্ধান নিতে বা আগুন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আসেন। আকস্মাৎ সকল প্রকার আন্দাজ অনুমানের উর্ধে অবস্থানকারী স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁকে সম্বোধন করেন।

এ অবস্থায় 'পাক-পবিত্র আল্লাহ' বলার মাধ্যমে আসলে হযরত মূসাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে যে, বিভ্রান্ত চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েই এ ঘটনাটি ঘটছে। অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ গাছের ওপর বসে আছেন অথবা এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এসেছেন কিংবা তাঁর একচ্ছত্র নূর তোমাদের দৃষ্টি সীমায় বাঁধা পড়েছে বা কারো মুখে প্রবিষ্ট কোন জিহ্বা নড়াচড়া করে এখানে কথা বলছে। বরং এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থেকে সেই সত্তা নিজেই তোমার সাথে কথা বলছেন।

এভাবেই হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে নবী নির্বাচিত করা হলো। ঘটনাটা আকস্মিক হলেও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সেই আহ্বান শুনে ভয় পাননি, কারণ নবী ও রাসূলগণ তাদের বুদ্ধির বিকাশের পর হতেই পৃথিবীর রব এবং ইলাহ্ সম্পর্কে যে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্থ, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি যে আলো দেখে আগুন মনে করে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তা আগুন ছিল না। সে আলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিচ্ছুরিত অপার্থিব আলো।

তিনি যে আহ্বান শুনলেন, সে আহ্বান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ফেরেশতা করেছিল না স্বয়ং আল্লাহ তাকে আহ্বান করেছিল? কোরআনের ভাষ্য হতে জানা যায় যে, মহান আল্লাহ স্বয়ং তাঁর কুদরতী ব্যবস্থার মাধ্যমে আহ্বান করেছিলেন। কোরআনের বর্ণনার ভেতেরই এ কথা স্পষ্ট। সুতরাং এ সম্পর্কে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করা ঈমানের পরিচয় নয়।

সামান্য কিছুক্ষণ পূর্বেও যিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ এবং পশুর রাখাল, আর এই মুহূর্ত হতে সেই ব্যক্তি হয়ে গেল সে সময়ের সে এলাকার সমস্ত মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং পথপ্রদর্শক, মানুষের ভেতরে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ ব্যক্তি। অসহায় দুঃখী মানুষের একমাত্র মুক্তিদাতা। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর আহ্বান শুনে ভয় না পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করেছিলেন, কেননা আল্লাহর সন্ধানেই তিনি এতদিন ছিলেন। তিনি যাকে পেতে চান, সেই প্রেমিক আজ স্বেচ্ছায় তাকে আহ্বান করছেন–এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ! পবিত্র কোরআনে এর পরের ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَمَاتِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يمُوْسٰى-قَالَ هِىَ عَصَاىَ-اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا.اِلٰى اٰخِرِالاٰيَةُ

আর হে মূসা! এ তোমার হাতে এটা কি? মূসা জবাব দিল, 'এ আমার লাঠি। এর ওপর ভর দিয়ে আমি চলি, নিজের ছাগলগুলোর জন্য এর সাহায্য পাতা পাড়ি এবং এর সাহায্যে আরো অনেক কাজ করি।' বললেন, 'একে ছুঁড়ে দাও হে মূসা!' সে ছুঁড়ে দিল এবং অকস্মাৎ সেটা হয়ে গেলো একটা সাপ, যা দৌড়াচ্ছিল। বললেন, 'ধরে ফেলো ওটা এবং ভয় করো না, আমি ওকে আবার ঠিক তেমনটিই করে দেবো যেমনটি সে আগে ছিল। আর তোমার হাতটি একটু বগলের মধ্যে রাখো, তা কোন প্রকার ক্লেশ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। এ জন্য যে, আমি তোমাকে নিজের বৃহৎ নিদর্শনগুলো দেখাবো। এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।' (সূরা ত্ব-হা-১৭-২৪)

মহান আল্লাহর জ্ঞান লাভ করার বা জানার জন্য এ প্রশ্ন ছিল না। বরং আল্লাহ জানতেন হযরত মূসার হাতে লাঠি আছে। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এ ছিল যে, তাঁর হাতে যে লাঠি আছে অন্য কিছু নয় এ ব্যাপারে যেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম নিশ্চিত হয়ে যান এবং এরপর দেখেন আল্লাহর কুদরতের খেলা কিভাবে শুরু হয়।

যদিও জবাবে শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, হে আল্লাহ ! এটা একটা লাঠি। কিন্তু হযরত মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তা তাঁর সে সময়কার মানসিক অবস্থার একটা চমৎকার ছবি তুলে ধরেছে। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন কোন বড় ব্যক্তির সাথে বা তাঁর কাংখিত ব্যক্তির সাথে কথা বলার সুযোগ পায় তখন নিজের কথা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে, যাতে তার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

হাত বগলে রাখতে বললেন এবং জানিয়ে দিলেন সূর্যের আলোর মতো আলো হবে কিন্তু এর ফলে তোমার কোন কষ্ট হবে না।

দীর্ঘ দিনের পরিচিত লাঠি, যা দিয়ে তিনি নিজের পশুপালকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং বৃক্ষের পাতা পেড়ে আহার করান। এই লাঠি তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন আর সাথে সাথে তা একটা বিশাল সাপের আকার ধারণ করে সাপের মতই মোচড় দিতে থাকলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। পবিত্র কোরআন বলছে তিনি পেছনের দিকে এমন শক্তিতে দৌড় দিয়েছিলেন যে, পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখার মত তার সাহস ছিল না যে, তাঁর সেই লাঠিটা সাপের মতই আচরণ করছে না স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই মুজিযা প্রদানের ঘটনা মহান আল্লাহ সূরা কাসাসে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ-فَلَمَّا رَاٰهَاتَهْتَزُّكَاَنَّهَاجَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا.اِلَى اٰخِرِالاٰيَةُ

আর (হুকুম দেয়া হলো) ছুঁড়ে দাও তোমার লাঠিটি। যখনই মূসা দেখলো লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই সে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং একবার ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, 'হে মূসা! ফিরে এসো এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার হাত বগলে রাখো উজ্জল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই। এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো। এ দু'টি উজ্জল নিদর্শন তোমার রব-এর পক্ষ থেকে ফেরাউন ও তার সভাসদদের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান।' (সূরা কাসাস-৩১-৩২)

এ মু'জিযা দু'টি তখন হযরত মূসাকে দেখানোর কারণ হচ্ছে, প্রথমত যাতে তাঁর মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সত্তা বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, অধিপতি, শাসক ও পরিচালক তিনিই তাঁর সাথে কথা বলছেন। দ্বিতীয়ত এ মু'জিযাগুলো দেখে তিনি এ মর্মে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে, তাঁকে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার–Established Government ফেরাউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে শূন্য হাতে তার মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচন্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন। আর সে অস্ত্র কোন মানুষের বানানো নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী মহান আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা এই অস্ত্র।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বলা হলো, ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো–অর্থাৎ যে দায়িত্ব তোমাকে প্রদান করা হলো, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন কোন ভয়াবহ মুহূর্ত এসে উপস্থিত হবে, যার ফলে তোমার মনে ভীতির সঞ্চার হয় তখন নিজের বাহু চেপে ধরো। এর ফলে তোমার মন শক্তিশালী হবে এবং ভীতি ও আশংকার কোন রেশই তোমার মধ্যে থাকবে না।

বাহু বা হাত বলতে সম্ভবত ডান হাত বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণভাবে হাত বললে ডান হাতই বুঝানো হয়। চেপে ধরা দু'রকম হতে পারে। এক, হাত পার্শ্বদেশের সাথে লাগিয়ে চাপ দেয়া। দুই, এক হাতকে অন্য হাতের বগলের মধ্যে রেখে চাপ দেয়া। এখানে প্রথম অবস্থাটি

প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি অনুভব করতে পারবে না যে, এ ব্যক্তি মনের ভয় দূর করার জন্য কোন বিশেষ কাজ করছে।

হযরত মূসাকে যেহেতু একটি জালেম সরকারের মোকাবিলা করার জন্য কোন সৈন্য সামন্ত ও পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই পাঠানো হচ্ছিলো তাই তাঁকে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়। বারবার এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল যাতে একজন মহান দৃঢ়চেতা নবীও আতংকমুক্ত থাকতে পারতেন না। মহান আল্লাহ বলেন, এ ধরনের কোন অবস্থা দেখা দিলে তুমি স্রেফ এ কাজটি করো, ফেরাউন তার সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করেও তোমার মনের জোর শিথিল করতে পারবে না।

এ নিদর্শনগুলো নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং আল্লাহর রাসূল হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে ও তার রাষ্ট্রীয় প্রশাসকবৃন্দকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও দাসত্বের দিকে আহবান জানাও। তাই এখানে তাঁর নিযুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বলা হয়নি। তবে কোরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ত্বা-হা ও সূরা নাযি'আতে বলা হয়েছে, 'ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।' সূরা আশ্ শূ'আরায় বলা হয়েছে, 'যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন, যাও জালিম জাতির কাছে, ফেরাউনের জাতির কাছে।' মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ-

তাদেরকে সে সময়ের কথা শুনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, 'জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও-ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে-তারা কি ভয় করে না? (শুআরা-১০-১১)

এ বর্ণনাভংগী ফেরাউনের সম্প্রদায়ের চরম নির্যাতনের কথা প্রকাশ করছে। 'জালেম সম্প্রদায়' হিসেবে তাদেরকে পরিচিত করানো হচ্ছে। যেন তাদের আসল নামই হচ্ছে জালেম সম্প্রদায় এবং ফেরাউনের সম্প্রদায় হচ্ছে তার তরজমা ও ব্যাখ্যা।

অর্থাৎ হে মূসা! দেখো কেমন অদ্ভুত ব্যাপার, এরা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে দুনিয়ায় জুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং ওপরে আল্লাহ আছেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এ ভয় তাদের নেই। জানা যায় যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমত এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে একাকী যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি ছিল, তিনি বাকপটু নন এবং অনর্গল ও দ্রুত কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি হযরত হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে নবী বানিয়ে তার সাথে পাঠানোর জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানান। কারণ হযরত হারুণ অত্যন্ত বাকপটু, প্রয়োজনে তিনি হযরত মূসাকে সমর্থন দেবেন এবং তাঁর বক্তব্যকে সত্য প্রমাণ করে তাঁর হাত শক্তিশালী করবেন।

এই আয়াতে শুধু হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে ফেরআউনের যাবার আদেশের কথা বলা হয়েছিল, এ কাহিনী শুনানোর উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই আয়াত অবতীর্ণ করেননি। এই আয়াতের মাধ্যমে সে যুগের ইসলাম বিরোধী এবং বর্তমান যুগ হতে যারা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের বিরোধিতা করবে সেই ইসলাম বিরোধিদেরকে শিক্ষা দান করাই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য।

প্রথমত হযরত মূসাকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব অবস্থার মুখোমুখি ছিলেন তার তুলনায় ছিল অনেক বেশী কঠিন। হযরত মূসা ছিলেন একটি দাস জাতির সদস্য। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এ জাতিকে মারাত্মকভাবে

দাবিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে বিশ্বনবী ছিলেন কুরাইশ সম্প্রদায়ের সদস্য। তাঁর বংশ ও পরিবার কুরাইশদের অন্যান্য বংশ ও পরিবারের সাথে পুরোপুরি সমান মর্যাদায় অবস্থান করছিল। হযরত মূসা নিজেই সেই ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং একটা হত্যা অভিযোগে দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর তাঁকে আবার সেই ক্ষমতাদর্পী শাসকের দরবারে গিয়ে দাঁড়ানোর আদেশ দেয়া হয়েছিল, যার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। বিশ্বনবী এ ধরনের কোন নাজুক অবস্থার মুখোমুখি হননি। তাছাড়া ফেরাউনের সাম্রাজ্য ছিল সে সময় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য (Super power)। তার সাথে কুরাইশদের শক্তির কোন তুলনাই ছিল না। এ সত্ত্বেও ফেরাউন হযরত মূসার কোন ক্ষতিই করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে আল্লাহ ইসলামী আন্দোলন বিরোধিদের এ শিক্ষা দিতে চান যে, আল্লাহ যার পৃষ্ঠপোষক থাকেন তার সাথে মোকাবিলা করে কেউ জিততে পারে না। ফেরাউনই যখন মূসার মোকাবিলায় কিছুই করতে পারেনি তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোকাবেলায় তোমাদের জয় লাভের কথা কল্পনাই করা যায় না।

দ্বিতীয় হযরত মূসার মাধ্যমে ফেরাউনকে যেসব নিদর্শন দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কী হতে পারে? তারপর হাজার হাজার লোকের সমাবেশে ফেরাউনেরই চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে যাদুকরদের সাথে মোকাবিলা করে একথা প্রমাণও করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়। যেসব যাদুশিল্প বিশেষজ্ঞগণ ফেরাউনের নিজের সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং যাদেরকে ফেরাউন নিজেই ডেকেছিল, তারা নিজেরাই এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে যে, হযরত মূসার লাঠি যে অজগরে পরিণত হয়েছিল, সে ব্যাপারটি ছিল যথার্থ ও অকৃত্রিম এবং শুধুমাত্র আল্লাহর মু'জিযা, যাদু নয়। কিন্তু এ ব্যাপারেও যারা হঠকারিতায় লিপ্ত ছিল তারা নবীর সত্যতা স্বীকার করেনি। এখন তোমরা কেমন করে এ কথা বলতে পারো যে, তোমাদের ঈমান প্রকৃতপক্ষে কোন ইন্দ্রিয়ানুভূত মু'জিযা ও বস্তুগত নিদর্শন দেখার ওপর নির্ভরশীল নয়?

জাতীয় ও বংশগত স্বার্থ, জাহেলী বিদ্বেষ ও স্বার্থ পূজার উর্ধ্বে উঠে মানুষ খোলা মনে হক ও বাতিলের পার্থক্য অনুধাবন করে অসত্য কথা পরিহার করে সত্য ও সঠিক কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলে এ কিতাবে, এ কিতাব উপস্থাপনকারীর জীবনে এবং আল্লাহর বিশাল বিশ্ব-জগতে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সর্বক্ষণ যেসব নিদর্শন দেখতে পারে তাই তার জন্য যথেষ্ট হয়। নয়তো এমন একজন হঠকারী ব্যক্তি যে সত্যের সন্ধান করে না এবং প্রবৃত্তির স্বার্থ পূজায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যে তার স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোন সত্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, সে যতই নিদর্শন দেখুক না কেন তার সামনে আকাশ ও পৃথিবী উল্টে দিলেও সে ঈমান আনবে না।

তৃতীয়ত এ হঠকারিতার যে পরিণাম ফেরাউন দেখেছে তা এমন কোন পরিণাম নয় যা দেখার জন্য অন্য লোকেরা উন্মাদ হয়ে গেছে। নিজের চোখে আল্লাহর শক্তি মত্তার নিদর্শন দেখে নেবার পর যে তা মানে না সে এমনি ধরনের পরিণতিরই সম্মুখীন হয়। এখন তোমরা কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে এর স্বাদ আস্বাদন করা পছন্দ করছো? হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের ইতিহাস সূরা নাম্‌ল-এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

يٰمُوْسٰى اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–وَاَلْقِ عَصَاكَ–فَلَمَّا رَاٰهَا...اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

হে মূসা! এ আর কিছু নয়, স্বয়ং আমি আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী এবং তুমি তোমার লাঠিটি একটু ছুঁড়ে দাও। যখনই মূসা দেখলো লাঠি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং পেছন দিকে ফিরেও দেখলো না। হে মূসা! ভয় পেয়ো না, আমার সামনে রাসূলরা ভয় পায় না। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ভুল-ক্রটি করে বসে। তারপর যদি সে দুষ্কৃতির পরে সুকৃতি দিয়ে (নিজের কাজ) পরিবর্তিত করে নেয় তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর তোমার হাতটি একটু তোমার বক্ষস্থলের মধ্যে প্রবেশ করাও তো, তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই। এ (দু'টি নিদর্শন) ন'টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ফেরাউন ও তার জাতির কাছে (নিয়ে যাবার জন্য) তারা বড়ই বদকার। (সূরা নাম্ল-৯-১২)

এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, অপরাধকারীও যদি তাওবা করে নিজের নীতি সংশোধন করে নেয় এবং খারাপ কাজের জায়গায় ভালো কাজ করতে থাকে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য উপেক্ষা ও ক্ষমা করার দরজা খোলাই আছে। প্রসংগক্রমে একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে সতর্ক করা এবং অন্যদিকে সুসংবাদ দেয়াও। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অজ্ঞতাবশত একজন কিবতীকে হত্যা করে মিশর থেকে বের হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এই বলে, হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমাকে মাফ করে দাও।

আল্লাহ সংগে সংগেই তাঁকে মাফ করে দিয়েছিলেন। এখানে সেই ক্ষমার সুসংবাদ তাঁকে দেয়া হয়। অর্থাৎ এ ভাষণের মর্ম যেন এই দাঁড়ালো, হে মূসা! আমার সামনে তোমার ভয় পাওয়ার একটি কারণ তো অবশ্যই ছিল। কারণ তুমি একটি ভুল করেছিলে। কিন্তু তুমি যখন সেই দুষ্কৃতিকে সুকৃতিতে পরিবর্তিত করেছো। তখন আমার কাছে তোমার জন্য মাগফিরাত ও রহমত ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন আমি তোমাকে কোন শাস্তি দেবার জন্য ডেকে পাঠাইনি বরং বড় বড় মু'জিযা সহকারে তোমাকে এখন আমি একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদনে পাঠাবো।

উল্লেখিত আয়াতে ন'টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে মূসাকে আমি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ধরনের নয়টি নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সূরা আ'রাফে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–লাঠি, যা অজগর হয়ে যেতো। হাত, যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যের মতো ঝিকমিক করতো। যাদুকরদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাজিত করা। হযরত মূসার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া। বন্যা ও ঝড়। পংগপাল। সমস্ত শস্য গুদামে শস্যকীট এবং মানুষ-পশু নির্বিশেষে সবার গায়ে উকুন। ব্যাংয়ের আধিক্য ও রক্ত।

মহান আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিলেন। তারপর তাঁকে আদেশ করলেন, এবার যাও দায়িত্ব পালন করো। যে দায়িত্ব হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে দেয়া হলো, এ দায়িত্ব পালন কোন সহজ বিষয় ছিল না। যেখানে তাঁকে গিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারি পরোওয়ানা ঝুলছিল। তারপরেও বড় কথা ছিল, তাঁকে প্রেরণ করা হচ্ছিল একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে।

সমকালীন পৃথিবীতে সে সরকার ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমরাস্ত্রে সজ্জিত। বিশাল একটা অনুগত সেনাবাহিনী ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। এমন ধরণের একটা সরকারের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে একা যেতে বলছেন সংগ্রাম করার জন্য। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যেতে অস্বীকার করলেন না। তিনি এ কথাও বললেন না যে, আমি

একা একটা সরকারকে কিভাবে মোকাবেলা করবো ? আমার সাথে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র এবং বিশাল সেনাবাহিনী দেয়া হোক।

এ সমস্ত কোন কথাই তিনি বললেন না। কারণ তিনি জানতেন, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে ময়দানে আন্দোলনে নামিয়ে দিয়ে নীরব থাকেন না। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন। তিনি শুধু নিজের একটা দুর্বলতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা হলো-

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ-وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ-وَاحْلُلْ عُقْدَةً...اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

মূসা বললো, 'হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার জন্য নিজের পরিবার থেকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার হাত মজবুত করো এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দাও, যাতে আমরা খুব বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং খুব বেশী করে তোমার চর্চা করি। তুমি সব সময় আমাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক।' বললেন, 'হে মূসা! তুমি যা চেয়েছো তা তোমাকে দেওয়া হলো। আমি আর একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলাম। সে সময়ের কথা মনে করো যখন আমি তোমার মা'কে ইশারা করেছিলাম, এমন ইশারা যা ওহীর মাধ্যমে করা হয়, এই মর্মে যে, এ শিশুকে সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও এবং আমার শত্রু ও এ শিশুর শত্রু একে তুলে নেবে। আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

স্মরণ করো, যখন তোমার বোন চলছিল, তারপর গিয়ে বললো, 'আমি কি তোমাদের তার সন্ধান দেবো যে এ শিশুকে ভালোভাবে লালন করবে?' এভাবে আমি তোমাকে আবার তোমার মায়ের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি, যাতে তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়। এবং (এটাও স্মরণ করো) তুমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলে, আমি তোমাকে এ ফাঁদ থেকে বের করেছি এবং তোমাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছি, আর তুমি মাদ্ইয়ানবাসীদের মধ্যে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলে। তারপর এখন তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছো হে মূসা! আমি তোমাকে নিজের জন্য তৈরি করে নিয়েছি। যাও, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ এবং দেখো আমার স্মরণে ভুল করো না। যাও, তোমরা দু'জন ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।'

উভয়েই বললো, 'হে আমাদের রব! আমাদের ভয় হয়, সে আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে অথবা আমাদের ওপর চড়াও হবে।' বললেন, 'ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি। যাও তার কাছে এবং বলো, আমরা তোমার রবের প্রেরিত, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি তোমার রবের নিদর্শন এবং শান্তি তার জন্য যে সঠিক পথ অনুসরণ করে। আমাদের ওহীর সাহায্যে জানানো হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।' (সূরা ত্বা-হা-২৫-৪৮)

আল্লাহর যমীনে যারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করে, তাদের ব্যাপারে এটা আল্লাহর স্পষ্ট ওয়াদা, 'ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি

এবং সমস্ত কিছু দেখছি ও শুনছি।' ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তোমাদের সাথে কি আচরণ করছে আমি তা দেখছি এবং তোমাদের সাথে আমি রয়েছি। অতএব ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান করে বাতিল শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে থাকো।

হযরত মূসা মহান আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন, হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও-অর্থাৎ আমার মনে এ মহান দায়িত্বভার বহন করার মতো শক্তি সৃষ্টি করে দাও। আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দাও। যেহেতু হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে একটি অনেক বড় কাজের দায়িত্ব সোপর্দ করা হচ্ছিল যা করার জন্য দুরন্ত সাহসের প্রয়োজন তাই তিনি দোয়া করেন, আমাকে এমন ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম, সহনশীলতা, নির্ভীকতা ও দুর্জয় সংকল্প দান করো যা এ কাজের জন্য প্রয়োজন।

আল্লাহর কোরআনের শব্দাবলী থেকে আমরা যে কথা বুঝতে পারি তা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজের মধ্যে বাগ্মীতার অভাব দেখছিলেন। ফলে তাঁর মনে আশংকা জেগেছিল যে, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যদি তাঁর কখনো বক্তৃতা দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় (এ পর্যন্ত যার কোন প্রয়োজন তাঁর দেখা দেয়নি) তাহলে তাঁর স্বভাবসুলভ সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ। আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও যাতে আমি নিজের কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝাতে পারি। এ বিষয়েই ফেরাউন একবার তাঁকে খোঁটা দিয়ে বলেছিল, 'এ ব্যক্তি তো নিজের কথাই সঠিকভাবে বলতে পারে না।' এ দূর্বলতা অনুভব করেই হযরত মূসা নিজের ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসাবে চান। কোরআনের বর্ণনায় আরো জানা যায় যে, হযরত মূসার এ দুর্বলতা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি বেশ জোরদার ভাষণ দিতে শুরু করছিলেন। কোরআনে তাঁর পরবর্তীকালের যেসব ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে তা উন্নত পর্যায়ের শাব্দিক অলংকার ও বাকপটুতার সাক্ষ্য দেয়।

জিভে জড়তা আছে এমন একজন তোতলা ব্যক্তিকে আল্লাহ নিজের রাসূল নিযুক্ত করবেন, একথা স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি বিরোধী। রাসূলরা সব সময় এমন ধরনের লোক হয়েছেন যারা চেহারা, সুরত, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার দিক দিয়ে হয়েছেন সর্বোত্তম, যাদের ভেতর বাইরের প্রতিটি দিক অন্তর ও দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। কোন রাসূলকে এমন কোন দোষ সহকারে পাঠানো হয়নি এবং পাঠানো যেতে পারতো না যে কারণে তিনি লোকদের মধ্যে হাস্যাস্পদ হন অথবা লোকেরা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

আল্লাহ হযরত মূসাকে তাঁর জন্ম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তার প্রতি যতগুলো অনুগ্রহ করা হয়েছিল, এক এক করে তার সবক'টি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত মূসাকে এ অনুভূতি দান করা যে, এখন যে কাজে তোমাকে নিযুক্ত করা হচ্ছে এ কাজের জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ কাজের জন্যই আজ পর্যন্ত বিশেষ সরকারী তত্ত্বাবধানে তুমি প্রতিপালিত হয়ে এসেছো।

ইসলামের দাওয়াত কিভাবে দিতে হবে তা বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ হযরত মূসাকে বললেন, ফেরাউনের সাথে কোমলভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।

মানুষ দু'ভাবে সঠিক পথে আসে। সে নিজে বিচার-বিশ্লেষন করে বুঝে-শুনে ও উপদেশবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে অথবা অশুভ পরিণামের ভয়ে সোজা পথ অবলম্বন করে। মহান আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকগুলো কিভাবে দাওয়াতী কাজ করবে। আর এই দাওয়াতী কাজ শুধু মুখ দিয়ে নয়, তার সমস্ত চরিত্র

দিয়ে করতে হবে। হাসি মুখে থাকতে হবে এবং প্রতিটি কথা হাসি মুখে বলতে হবে। প্রতিপক্ষ যতই মেজাজ খারাপ হবার মতো কথা বলুক না কেন, তার প্রতিটি কথার উত্তর বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে হাসি মুখে কোমল কণ্ঠে দিতে হবে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, হাসি মুখে কথা বলা সাদকার সমান সওয়াব। দ্বীনি আন্দোলনের সাথে জড়িত লোকদের ঐসব আচরণ ত্যাগ করতে হবে, যে আচরণের কারণে মানুষ দ্বীনি আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে যখন মহান আল্লাহ একটা জালিম সরকারের সামনে যেতে আদেশ দিলেন, তখন তিনি তাঁর দ্বারা যে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ঘটেছিল এবং এ কারণে তিনি অভিযুক্ত ছিলেন, এ কথা আল্লাহকে বললেন। মহান আল্লাহ তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, কোন চিন্তা নেই, আমি তোমাদের সাথে আছি। এ ঘটনা সূরা আশ্ শু'আরায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ-وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلاَ....اِلَى اخِرِالاية

সে বললো, 'হে আমার রব! আমার ভয় হয় তারা আমাকে মিথ্যা বলবে, আমার বক্ষ সংকুচিত হচ্ছে এবং আমার জিহ্বা সঞ্চালিত হচ্ছে না। আপনি হারুনের প্রতি রিসালাত পাঠান। আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটি অভিযোগও আছে। তাই আমার আশংকা হয় তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।' আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, 'কক্ষনো না, তোমরা দু'জন যাও আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে, আমি তোমাদের সাথে সবকিছু শুনতে থাকবো। ফেরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বলো, রাব্বুল আলামীন আমাদের পাঠিয়েছেন যাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও সে জন্য।' (সূরা আশ্ শু'আরা- ১২-১৭)

সূরা কাসাসের ২ রুকূতে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত মূসা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে একজন ইসরাঈলীর সাথে ঝগড়া করতে দেখে একটি ঘুষি মেরেছিলেন। এতে সে মারা গিয়েছিল। তারপর হযরত মূসা যখন জানতে পারলেন, এ ঘটনার খবর ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পেরেছে এবং তারা প্রতিশোধ নেবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে তখন তিনি দেশ ছেড়ে মাদইয়ানের দিকে চলে গেলেন। সেখানে আট-দশ বছর অবস্থান করার পর যখন তাঁকে আদেশ দেয়া হলো তুমি রিসালাতের বার্তা নিয়ে সেই ফেরাউনের দরবারে চলে যাও, যার ওখানে আগে থেকেই তোমার বিরুদ্ধে হত্যার মামলা ঝুলছে, তখন যথার্থই হযরত মূসা আশংকা করলেন, বার্তা শুনানোর সুযোগ আসার আগেই তাঁরা তাকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করবে।

হযরত মূসা ও হারুনের দাওয়াতের দু'টি অংশ ছিল। একটি ছিল ফেরাউনকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহবান করা। সমস্ত নবী ও রাসূলদের দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এটিই। দ্বিতীয়টি ছিল বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের গোলামীর বন্ধন মুক্ত করা। এটি ছিল বিশেষভাবে কেবলমাত্র তাঁদের দু'জনেরই ওপরে আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্ব। আল্লাহর কোরআনে কোথাও শুধুমাত্র প্রথম অংশটির উল্লেখ করা হয়েছে যেমন আলোচ্য সূরা নাযি'আতে, আবার কোথাও শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটির।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম নিবেদন করলেন-

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ...اِلَى اخِرِالاية

হে আমার প্রভু! আমি যে তাদের একজন লোককে হত্যা করে ফেলেছি, ভয় হচ্ছে, তারা

আমাকে মেরে ফেলবে। আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশি বাকপটু, তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন দেয়, আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে।' বললেন, তোমার ভাইয়ের সাহায্যে আমি তোমার শক্তি বৃদ্ধি করবো এবং তোমাদের দু'জনকে এমনই প্রতিপত্তি দান করবো যে, তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনগুলোর জোরে তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে।' (সূরা কাসাস- ৩৩-৩৫)

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কথার অর্থ এটা ছিল না যে, এই ভয়ে আমি সেখানে যেতে চাইনা। বরং অর্থ ছিল, আপনার পক্ষ থেকে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা উচিত যার ফলে আমার সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই কোন প্রকার কথা-বার্তা ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার আগেই তারা যেন আমাকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার না করে। কারণ এ অবস্থায় তো আমাকে যে উদ্দেশ্যে এ অভিযানে সেখানে পাঠানো হচ্ছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কোরআনের বর্ণনা থেকে একথা স্বতফূর্তভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত মূসার এ আবেদনের উদ্দেশ্য মোটেই এরূপ ছিল না যে, তিনি ভয়ে নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণ এবং ফেরাউনের কাছে যেতে অস্বীকার করতে চাচ্ছিলেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর আদেশে একটা শক্তিশালী সরকারের দরবারে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম। তাঁর নিজের যে দুর্বলতা ছিল, তা দূর করার জন্য তিনি যে আবেদন করেছিলেন, মহান আল্লাহ সে দূর্বলতা দূর করেছিলেন। তিনি ফেরাউনকে মহান আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার জন্য কিভাবে আহ্বান করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বর্ণনা করছে-

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ..اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةُ

আমি মূসাকে আমার আয়াত ও নিদর্শনাদি সহকারে ফেরাউন ও এই জাতির নেতাদের কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারাও আমার আয়াত ও নিদর্শনাদির প্রতি জুলুম করেছে। এখন দেখ, এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছে! মূসা বললো, 'হে ফেরাউন! আমি বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছি।' আমার পদ মর্যদাই এই যে, আল্লাহ্র নামে আমি প্রকৃত সত্য ছাড়া অন্য কোন কথাই বলবো না। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের রব-এর তরফ হতে সুস্পষ্ট নিয়োগ-প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। (সূরা আরাফ- ১০৩-১০৫)

এখানে যে কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে, একটি বিশেষ কথা বুঝানোই এর লক্ষ্য। তা এই যে, যে জাতি আল্লাহ্র পয়গাম লাভ করার পরে তাকে প্রত্যাখ্যান করে, সেই জাতিকে ধ্বংস করা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মক্কার কাফির কুরাইশদেরকে তথা পরবর্তী কালের ইসলাম বিরোধিদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে হক ও বাতিলের মধ্যে শক্তির যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়, তা চিরদিন নিতান্ত সংখ্যাল্পতা নিয়েই শুরু হয়েছে। সমগ্র জাতি একদিকে আর দ্বীনি আন্দোলন তথা মহাসত্যের আহ্বান অন্য দিকে বরং সত্য কথা এই যে, গোটা দুনিয়া অন্য দিকে; আর মহাসত্য অন্য দিকে; কোন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম ও বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই তা বাতিলের মোকাবেলায় মস্তক উন্নত করে তুলেছে, বাতিলের সাথে লড়াই-সংগ্রাম করেছে। অথচ বাতিলের পশ্চাতে

চিরদিন রয়েছে বড় বড় জাতি ও রাষ্ট্রের কার্যকর পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু তারপরও শেষ পর্যন্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা মহাসত্য জয়ী হয়েছে।

এই ইতিহাসের মাধ্যমে এই কথাও তাদেরকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করা হয় এবং যেসব উপায়ে তার দাওয়াত ও আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করা হয়, শেষ পর্যন্ত সেসব কিছুরই উল্টা ফল ফলে-সত্য বিরোধিদেরই ক্ষতি সাধিত হয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধান অমান্যকারীদের ধ্বংস করার চূড়ান্ত ফয়সালা করার পূর্বে তাদেরকে নানাভাবে দীর্ঘ সময় ও অবকাশ দিয়ে থাকেন, যেন তারা ইতিমধ্যেই নিজেদেরকে শোধরাতে এবং সত্যের পথ গ্রহণ করতে পারে। এরপর যখন কোন হুঁশিয়ারী, কোন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা এবং কোন উজ্জ্বল নিদর্শনও তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে না, তখন আল্লাহ তাদেরকে কঠিন ও কঠোর শাস্তি দান করেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা ঈমান এনেছিল এবং বর্তমানে যারা দ্বীনি আন্দোলন করছে, তাদেরকে এই কাহিনী হতে দ্বিবিধ শিক্ষা দান করা হয়েছে। প্রথম শিক্ষা এই যে, সংখ্যাল্পতা, দুর্বলতা এবং সত্য-বিরোধিদের বিপুলতা ও শক্তির দাপট দেখে তারা যেন একটুও ঘাবড়িয়ে না যায় এবং আল্লাহ্র সাহায্য নাযিল হতে বিলম্ব দেখে যেন তারা নিরাশ বা হতাশ হয়ে না পড়ে।

আর দ্বিতীয় শিক্ষা এই দেয়া হয়েছে যে, ঈমান গ্রহণের পর যেসব লোক ইয়াহুদীদের ন্যায় কার্যকলাপ করে, তারা সেই ইয়াহুদীদের মতই আল্লাহ্র অভিশাপে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

বনী-ইসরাঈলীদের সামনে তাদের নিজেদের মর্মান্তিক শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস পেশ করে বাতিল নীতি অনুসরণের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে, যিনি অতীতের সব নবী-পয়গাম্বরের প্রচারিত দ্বীন-ইসলামকে সমস্ত আবর্জনা ও আবিলতা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে তার আসল ও প্রকৃত রূপ পৃথিবীর সামনে নতুন করে পেশ করেছেন।

কোরআনে বর্ণিত 'আয়াত ও নিদর্শনাদির প্রতি জুলুম করেছে' কথাটির অর্থ হলো, সেটাকে মেনে নেয়নি; বরং সেটাকে যাদুকরের কথা মনে করে প্রত্যাখ্যান করতেই চেষ্টা করেছে। কোন উচ্চমানের কাব্যকে 'বাজে' বলে অবিহিত করা এবং এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কেবল সেই কাব্যেরই অপমান নয়, বরং তাতে মূল কাব্য ও কাব্য প্রতিভার প্রতিও জুলুমমূলক আচরণ হয় তাতে সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে যেসব নিদর্শন ও আয়াত নিজেই অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তা স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং যা জাদু শক্তির দ্বারা দেখানো সম্ভব বলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না-বরং যেসব বিষয়ে স্বয়ং সুদক্ষ জাদুকররাই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এসব তাদের জাদুকরি ক্ষমতার উর্ধ্বের জিনিস, সেগুলোকে 'জাদু' বলে আখ্যা দেয়া-কেবল সেইগুলোর ওপরই জুলুম নয়, বরং সত্য ও সততা এবং সুস্থ বিচার-বুদ্ধির প্রতিও এক বিরাট জুলুম।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দুইটি বিষয়ের দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। একটি বিষয় এই যে, আল্লাহ্র বন্দেগী তথা ইসলাম কবুল করে আল্লাহর গোলাম হয়ে যাও। আর দ্বিতীয় এই যে, বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে-যারা পূর্ব থেকেই মুসলিম ছিল তাদেরকে ক্ষমতার শৃংখল ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দাও। আল্লাহর কোরআনে এই দুইটি দাওয়াতের কথা কোথাও একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে আর কোথাও স্থান ও পরিপ্রেক্ষিত অনুপাতে একটি বিষয়ের উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন ফেরাউনের দরবারে গিয়েছিলেন মহাসত্যের দাওয়াত দিতে, তখন সে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের শিশুকালের ঘটনা উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, তুমি একজন অকৃতজ্ঞ মানুষ। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর কথার উচিত জবাবই শুধু দান করেননি, তাদেরকে জালিম হিসাবে প্রমাণ করেছেন। এ সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা হলো-

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ.....اِلَى اخِرِالاية

ফেরাউন বললো, 'আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে প্রতিপালন করিনি যখন ছোট্ট শিশুটি ছিলে? তুমি নিজের জীবনের বেশ ক'টি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছো এবং তারপর তুমি যে কর্মটি করেছো তাতো করেছোই, তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ।' মূসা জবাব দিল, 'সে সময় অজ্ঞতার মধ্যে আমি সে কাজ করেছিলাম। তারপর তোমাদের ভয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার রব আমাকে আদেশ দান করলেন এবং আমাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। আর তোমার অনুগ্রহের কথা যা তুমি আমার প্রতি দেখিয়েছো, তার আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছিলে।' (সূরা আশ্ শু'আরা-১৮-২২)

উল্লেখিত আয়াত থেকে হযরত মূসা যে ফেরাউনের গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন, এ ফেরাউন যে সে ব্যক্তি নয়, এ চিন্তার প্রতি সমর্থন মেলে। বরং এ ফেরাউন ছিল তার পুত্র। এ যদি সে ফেরাউন হতো, তাহলে বলতো, আমি তোকে লালন-পালন করেছিলাম। কিন্তু এ বলছে, আমাদের এখানে তুমি ছিলে। আমরা তোমাকে লালন-পালন করেছিলাম।

হযরত মূসা ক্ষমতাসীন ফেরাউনের কথার জবাবে যা বলেছিলেন, তা কোরআনের ভাষায়, 'ওয়া আনা মিনাদ্বআল্লিন' অর্থাৎ 'আমি তখন গোমরাহীর মধ্যে অবস্থান করছিলাম।' অথবা 'আমি সে সময় এ কাজ করেছিলাম পথভ্রষ্ট থাকা অবস্থায়।' এই আরবী 'দ্বলালাত' শব্দটি অবশ্যই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতারই সমার্থক। বরং আরবী ভাষায় এ শব্দটি অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, ভুল, ভ্রান্তি, বিস্মৃতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা কাসাসে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এখানে আরবী 'দ্বলালাত' শব্দটিকে অজ্ঞতা অর্থে গ্রহণ করাই বেশী সঠিক হবে। কারণ নবীর প্রসঙ্গে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আর নবীগণ পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ্ হতে পারেন না, নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে তাঁরা 'অজ্ঞ' থাকতে পারেন। হযরত মূসা সেই কিবতীকে একজন ইসরাঈলীর ওপর জুলুম করতে দেখে শুধুমাত্র একটি ঘুষি মেরেছিলেন। সবাই জানে, ঘুষিতে সাধারণত মানুষ মরে না। আর তিনি হত্যা করার উদ্দেশ্যেও ঘুঁষি মারেননি। ঘটনাক্রমে এতেই সে মরে গিয়েছিল। তাই সঠিক ঘটনা এই ছিল যে, এটি ইচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না বরং ছিল ভুলক্রমে হত্যা। হত্যা নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু ইচ্ছা করে হত্যা করার সংকল্প করে হত্যা করা হয়নি। হত্যা করার জন্য যেসব অস্ত্র বা উপায় ও কৌশল ব্যবহার করা হয় অথবা যেগুলোর সাহায্যে হত্যাকার্য সংঘটিত হতে পারে তেমন কোন অস্ত্র, উপায় বা কৌশলও ব্যবহার করা হয়নি।

হযরত মূসা বললেন, 'এরপর আমার রব আমাকে 'হুকুম' দান করলেন-অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নবুওয়াতের পরোয়ানা। 'হুকুম' অর্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হয় আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে কর্তৃত্ব করার অনুমতিও (Authority) হয়। এরই ভিত্তিতে তিনি ক্ষমতা সহকারে কথা বলেন।

হযরত মূসা বললেন, 'তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছিলে'–অর্থাৎ তোমরা যদি বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম-নিপীড়ন না চালাতে তাহলে আমি প্রতিপালিত হবার জন্য তোমাদের গৃহে কেন আসতাম? তোমাদের জুলুমের কারণেই তো আমার মা আমাকে ঝুড়িতে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। নয়তো আমার লালন-পালনের জন্য কি আমার নিজের বাড়ি ছিল না? তাই এ লালন-পালনের জন্য অনুগৃহীত করার খোঁটা দোয়া তোমার মুখে শোভা পায় না।

আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন মিশরের সরকার প্রধানকে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালেন, তখন সরকার প্রধান ফেরাউন কিন্তু এ প্রশ্ন করেনি যে, তোমাদের আল্লাহ কে ? সে প্রশ্ন করেছিল, তোমাদের রব কে ? অর্থাৎ এমন কোন শক্তি আছে যে, যার আইন কানুন বিধান তোমরা অনুসরণ করছো ? কারণ দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যে আইন কানুনের প্রয়োজন হয়, সে আইন কানুন তথা যাবতীয় বিধান তো রচনা করি আমি। আমিই তো রব। মহান আল্লাহ এই কাহিনী বিশ্বনবীর মাধ্যমে মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসেই তারা আল্লাহর বিধান ত্যাগ করে নিজের বানানো তথা মানুষের বানানো আইন কানুন দেশের বুকে জারী করে। এরাও ঐ ফেরাউনের মতই। হযরত মূসাকে ফেরাউন যে প্রশ্ন করেছিল, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى-قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ اِلَى اخِرِ الاية

ফেরাউন বললো, 'আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দু'জনের রব কে হে মূসা?' মূসা জবাব দিল, 'আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন।' ফেরাউন বললো, 'আর পূর্ববর্তী বংশধর যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের তাহলে কি অবস্থা ছিল?' মূসা বললো, 'সে জ্ঞান আমার রবের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না।' (সূরা ত্বা-হা-৪৯-৫২)

দু'ভাইয়ের মধ্যে যেহেতু মূল নবী ছিলেন হযরত মূসা এবং দাওয়াত দেয়ার তিনিই ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তাই ফেরাউন তাঁকেই সম্বোধন করে। আর হতে পারে তাঁকে সম্বোধন করার তার আরেকটি কারণও থাকতে পারে। তার উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, সে হযরত হারুনের বাকপটুতা ও উন্নত বাগ্মীতার মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না এবং বাগ্মীতার ক্ষেত্রে হযরত মূসার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। বর্তমানকালের ইসলাম বিরোধিদের মধ্যেও এ ধরনের হীনমন্যতা বিরাজমান। তারা দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের মধ্যে যারা কম জ্ঞানসম্পন্ন তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় কিন্তু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে যারা পারদর্শী বলে পরিচিত, তাদের সাথে কথা বলতেই এরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ফেরাউনের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা দু'জন আবার কাকে রব বানিয়ে নিয়েছো, মিশর ও মিশরবাসীদের রব তো আমিই। আলোচ্য সূরায় তার এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 'হে মিশরবাসীরা! আমি তোমাদের প্রধানতম রব।' সূরা যুখরুফে উল্লেখ করা হয়েছে, ফেরাউন দরবারের সমস্ত লোকদের সম্বোধন করে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! মিশরের রাজত্বের মালিক কি আমি নই? আর এ নদীগুলো কি আমার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না?' সূরা কাসাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে নিজের সভাসদদের সামনে এভাবে হুংকার দিয়ে বলেছিল, 'হে জাতীয় নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! কিছু ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমরাত নির্মাণ করো। আমি ওপরে

উঠে একবার দেখি তো এই মূসা কাকে ইলাহ্ বানাচ্ছে।' সূরা শূ'আরায় বর্ণনা এসেছে, সে হযরত মূসাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ বানিয়েছো তাহলে মনে রেখো, তোমাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবো।'

এর অর্থ এ নয় যে, ফেরাউন তার জাতির একমাত্র মাবুদ ছিল এবং সেখানে তার ছাড়া আর কারো পূজা হতো না। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, ফেরাউন নিজেকে সূর্য দেবতার অবতার হিসেবে বাদশাহের দাবীদার বলতো। তাছাড়া মিশরের ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, বহু দেবী ও দেবতার পূজা-উপাসানা করা ছিল এ জাতির ধর্ম। তাই 'একমাত্র পূজনীয়' হবার দাবী ফেরাউনের ছিল না। বরং সে কার্যত মিশরের এবং আদর্শগতভাবে সমগ্র মানব জাতির রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের দাবীদার ছিল। সে একথা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, অন্য কোন সত্তা তার ওপর কর্তৃত্ব করবে, তার প্রতিনিধি এসে তাকে হুকুম দেবে এবং তার কাছে এ হুকুমের আনুগত্য করার দাবী জানাবে। তার আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণে কোন কোন লোকের ধারণা হয়েছে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো এবং নিজে ইলাহ ও উপাস্য হবার দাবীদার ছিল। কিন্তু এ কথা কোরআন থেকে প্রমাণিত যে, সে উর্ধ্বজগতে অন্য কারো শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করতো। আল্লাহর কোরআনে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সে অস্বীকার করতো না। তবে তার রাজনৈতিক প্রভুত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করবে এবং আল্লাহর কোন রাসূল এসে তার ওপর হুকুম চালাবে, এটা মেনে নিতে সে প্রস্তুত ছিল না।

হযরত মূসা ও হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম বলেছিলেন, আমরা সকল অর্থে একমাত্র তাঁকেই রব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। প্রতিপালক, প্রভূ, মালিক, শাসক এ ধরনের সব অর্থেই আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও রব বলে স্বীকার করি না। আমরা খন্ডিতভাবে আল্লাহকে রব হিসাবে গ্রহণ করিনি বরং জীবনের প্রতিটি বিভাগেই আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকৃতি দান করেছি ও তাঁর আদেশ পালন করছি।

হযরত মূসা জবাব দিলেন, 'আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন'–অর্থাৎ পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস তাঁরই নির্মাণ কৌশলে নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসকে তিনিই আকার-আকৃতি, গঠনশৈলী, যোগ্যতা, গুণ ও বিশেষত্ব দান করেছেন। পৃথিবীতে কাজ করার জন্য হাতের যে গঠনাকৃতির প্রয়োজন ছিল তা তিনি তাকে দিয়েছেন। পায়ের জন্য যে সর্বাধিক উপযুক্ত গঠনাকৃতির দরকার তা তাকে দিয়েছেন। মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ, বাতাস, পানি, আলো, প্রত্যেককে তিনি এমন বিশেষ আকৃতি দান করেছেন যা এ বিশ্ব-জাহানে তার নিজের অংশের কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিসকে কেবল তার বিশেষ আকৃতি দান করেই এমনিভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনিই সবাইকে পথও দেখিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যাকে তিনি নিজের গঠনাকৃতিকে কাজে লাগানোর এবং নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুর্ণ করার পদ্ধতি শেখাননি। কানকে শুনা ও চোখকে দেখা তিনিই শিখিয়েছেন। মাছকে সাঁতার কাটার ও পাখিকে উড়ার শিক্ষা তিনিই দিয়েছেন। গাছকে ফুল ও ফল দেয়ার ও মাটিকে উদ্ভিদ উৎপাদন করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছেন। মোটকথা তিনি সারা বিশ্ব-জাহান এবং তার সমস্ত জিনিসের শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন বরং তাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকও।

এই অতুলনীয় ব্যাপক অর্থবহুল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম শুধু এ কথাই বলেননি যে, তাঁর রব কে? বরং এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি রব কেন এবং কেন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে রব বলে মেনে নেয়া যেতে পারে না। দাবীর সাথে সাথে তার যুক্তি-প্রমাণও এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্যে এসে গেছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যখন ফেরাউন ও তার প্রত্যেকটি প্রজা তার নিজের বিশেষ অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর অনুগৃহীত এবং যখন তাদের একজনেরও শ্বাসযন্ত্র, পাকস্থলী ও হৃদযন্ত্র আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নিজের কাজ করে না যাওয়া পর্যন্ত সে এক মুহূর্তের জন্যও জীবিত থাকতে পারে না তখন ফেরাউনের নিজেকে লোকদের রব্ব বলে দাবী করা এবং লোকদের কার্যত তাকে নিজেদের রব বলে মেনে নেয়া একটা নির্বুদ্ধিতা ও বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আবার এ ছোট্ট বাক্যে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ইশারায় রেসালাতের যুক্তিও পেশ করেছেন, ফেরাউন এই রেসালাত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল। হযরত মূসার যুক্তির মধ্যে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের পথনির্দেশক এবং যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে পথ নির্দেশনা দিচ্ছেন, তাঁর পথনির্দেশনা দেয়ার বিশ্বজনীন দায়িত্বের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের সচেতন জীবনের জন্যও পথনির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। আর পশু-পাখীর জন্য যে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী, মানুষের সচেতন জীবনের জন্য সে ধরনের পথনির্দেশনা উপযোগী হতে পারে না। এর সবচেয়ে মানানসই পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, একজন সচেতন মানুষ তাঁর পক্ষ থেকে মানুষদের পথ দেখানোর জন্য নিযুক্ত হবেন এবং তিনি মানুষদের বুদ্ধি ও চেতনার প্রতি আবেদন জানিয়ে তাদেরকে সঠিক-সোজা পথপ্রদর্শন করবেন।

হযরত মূসাকে ফেরাউন বললো, 'আর পূর্ববর্তী বংশধর যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের তাহলে কি অবস্থা ছিল'–অর্থাৎ ব্যাপার যদি এটাই হয়ে থাকে যে, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তাকে পৃথিবীতে কাজ করার পথের সন্ধান দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন রব্ব নেই, তাহলে আমাদের সবার বাপ দাদারা, যারা বংশ পরম্পরায় ভিন্ন প্রভূ ও ইলাহর বন্দেগী করে চলে এসেছে তোমাদের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান কোথায় হবে? তারা সবাই কি পথভ্রান্ত ছিল? তারা সবাই কি আযাবের উপযোগী ছিল? তাদের সবার কি বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিল?

কথাগুলো ছিল আল্লাহর রাসূল হযরত মূসার যুক্তির জবাবে জালিম ফেরাউনের জবাব। হতে পারে সে মুর্খতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এ ধরনের জবাব দিয়েছে। আবার কপটতার কারণেও এ জবাব দিতে পারে। তাছাড়া এ উভয় কারণই এ জবাবের পিছনে সক্রিয় থাকতে পারে। অর্থাৎ সে নিজেও এ কথায় রাগান্বিত হয়েছে যে, মূসার আদর্শের কারণে আমাদের সমস্ত বুদ্ধিজীবী আর পূর্বপুরুষগণ যে পথভ্রষ্ট ছিল তা মেনে নিতে হবে আবার সাথে সাথে নিজের সভাসদ ও সাধারণ মিশরবাসীদের মনে হযরত মূসার দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করাও এর উদ্দশ্য হতে পারে। সত্যপন্থীদের সত্য প্রচারের বিরুদ্ধে এ অস্ত্রটি সুদূর অতীত কাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। মুর্খদের কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য এটা বড়ই প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে যে সময় কোরআনের এ আয়াতগুলো নাযিল হয় সে সময় মক্কায় আল্লাহর নবীর দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সবচাইতে বেশি এ অস্ত্রটিকেও কাজে লাগানো হয়েছিল। তাই হযরত মূসার মোকাবেলায় ফেরাউনের এ কূটচালের উল্লেখ যথার্থই ছিল।

জালিমের কথার জবাবে হযরত মূছা বললেন, 'সেজ্ঞান আমার রবের কাছে লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। আমার রব ভুলও করেন না, বিস্মৃতও হন না'–এ কথাগুলো হযরত মূছার সে সময় প্রদত্ত একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ জবাব। এ থেকে ইসলামের দাওয়াত প্রচার কৌশল সম্পর্কে ভালো শিক্ষা লাভ করা যায়। ওপরের বর্ণনা অনুসারে ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো। যদি হযরত মূছা বলতেন, 'হ্যাঁ–তোমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আর পূর্বপুরুষগণ সবাই মুর্খ ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে, তাহলে এটা সত্য কথনের বিরাট আদর্শ হলেও এ জবাব হযরত মূছার পরিবর্তে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। তাই তিনি পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সহকারে এমন জবাব দেন যা ছিল একদিকে যথার্থ সত্য এবং অন্যদিকে ফেরাউনের বিষ দাঁতও উপড়ে ফেলতে সক্ষম। তিনি বলেন, তারা যে ধরনেরই থাক না কেন, নিজেদের কাজ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। তাদের কার্যাবলী এবং কাজের পেছনে নিহিত অন্তরের ইচ্ছাসমূহ জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আমি কোন সিদ্ধান্ত দিই কেমন করে? তাদের সমস্ত রেকর্ড আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও তার কারণসমূহের খবর আল্লাহই জানেন। কোন জিনিস আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে থাকেনি এবং তাঁর স্মৃতি থেকেও কোন জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আল্লাহই জানেন তাদের সাথে কি ব্যবহার করতে হবে। তাদের ভূমিকা কি ছিল এবং তাদের পরিণাম কি হবে, তোমার ও আমার এ কথা চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের চিন্তা করা উচিত আমাদের ভূমিকা কি এবং আমরা কোন্ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হবো।

এই ঘটনা পবিত্র কোরআনের সূরা শু'আরায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

قَالَ فِرْعَوْنَ وَمَارَبُّ الْعٰلَمِيْنَ–قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.اِلَى اخِرِالاية

ফেরাউন বললো, 'রাব্বুল আলামীন আবার কে?' মূসা জবাব দিল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রব এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে যা কিছু আছে তাদেরও রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হও।' ফেরাউন তার আশপাশের লোকদের বললো, 'তোমরা শুনছো তো?' মূসা বললো, 'তোমাদেরও রব এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও রব যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।' ফেরাউন (উপস্থিত লোকদের) বললো, 'তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এ রাসূল সাহেবটি তো দেখছি একেবারেই পাগল।' মূসা বললো, 'পূর্ব ও পশ্চিম এবং যা কিছু তার মাঝখানে আছে সবার রব, যদি তোমরা কিছু বুদ্ধি-জ্ঞানের অধিকারী হতে।' ফেরাউন বললো, 'যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে মেনে নাও, তাহলে কারাগারে যারা পচে মরছে তোমাকেও তাদের দলে ভিড়িয়ে দেবো।' (সূরা শু'আরা-২৩-২৯)

রব সম্পর্কিত এ প্রশ্নটি করা হয় হযরত মূসার উক্তির ওপর ভিত্তি করে। তিনি বলেন, আমি রব্বুল আলামীনের তথা সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক, প্রভু ও শাসকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি এবং এ জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দেবে। এটি ছিল সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, হযরত মূসা যাঁর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার তিনি সারা বিশ্ব-জাহানের সকল সৃষ্টির ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনের অধিকারী এবং তিনি ফেরাউনকে নিজের অনুগত গণ্য করে তার শাসন কর্তৃত্বের পরিসরে একজন উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে কেবল হস্তক্ষেপই করছেন না বরং তার নামে এ ফরমানও

পাঠাচ্ছেন যে, তোমার প্রজাদের একটি অংশকে আমার মনোনীত প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করো, যাতে সে তাদেরকে তোমার রাষ্ট্রসীমার বাইরে বের করে আনতে পারে। এ কথায় ফেরাউন জিজ্ঞেস করছে, এ সারা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসনকর্তাটি কে? যিনি মিশরের বাদশাহকে তার প্রজাকূলের অন্তরভুক্ত সামান্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে এ ফরমান পাঠাচ্ছেন?

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফেরাউনকে জানিয়ে দিলেন, আমি পৃথিবীতে বসবাসকারী কোন সৃষ্টি ও ধ্বংসশীল শাসন কর্তৃত্বের দাবীদারের পক্ষ থেকে আসিনি রবং এসেছি আকাশ ও পৃথিবীর মালিকের পক্ষ থেকে। যদি তোমরা বিশ্বাস করো এ বিশ্ব-জাহানের কোন স্রষ্টা-মালিক ও শাসনকর্তা আছেন তাহলে বিশ্ববাসীর রব কে একথা বুঝা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবার কথা নয়।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফেরাউনের সভাসদদেরকে সম্বোধন করে এ ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ফেরাউন বলেছিল, তোমরা শুনছো? হযরত মূসা তাদেরকে বলেন, আমি এমন সব মিথ্যা রবের প্রবক্তা নই যারা আজ আছে, কাল ছিল না এবং কাল ছিল কিন্তু আজ নেই। তোমাদের এ ফেরাউন যে আজ তোমাদের সবার রবে পরিণত হয়েছে সে কাল ছিল না এবং কাল তোমাদের বাপ-দাদারা যেসব ফেরাউনকে রবে পরিণত করেছিল তারা আজ নেই। আমি কেবলমাত্র সেই রবের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও শাসনাধিকার স্বীকার করি যিনি আজও তোমাদের এবং এই ফেরাউনের রব এবং পূর্বে তোমাদের ও এর যে বাপ-দাদারা চলে গেছেন তাদের সবারও রব ছিলেন।

হযরত মূসার মুখে রব সম্পর্কে বর্ণনা শুনে ফেরাউন তাঁকে পাগল বলেছিল। মূসা আলাইহিস্ সালামের কথার অর্থ ছিল, আমাকে পাগল গণ্য করা হচ্ছে। কিন্তু আপনারা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহলে নিজেরাই ভেবে দেখুন, প্রকৃতপক্ষে কি এ বেচারা ফেরাউন যে পৃথিবীর সামান্য একটু ভূ-খণ্ডের বাদশাহ হয়ে বসেছে সে রব অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক এবং মিশরসহ পূর্ব ও পশ্চিম দ্বারা পরিব্যাপ্ত প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক যিনি তিনি রব? আমি তো তাঁরই শাসন কর্তৃত্ব মানি এবং তাঁরই পক্ষ থেকে এ হুকুম তাঁর এক বান্দার কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

এই কথোপকথনটি অনুধাবন করতে হলে এ বিষয়টি সামনে থাকতে হবে যে, আজকের মতো প্রাচীন যুগেও 'উপাস্য'-এর ধারণা কেবলমাত্র ধর্মীয় অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ উপাস্য শুধুমাত্র পূজা, আরাধনা, মানত ও নযরানা লাভের অধিকারী। তার অতি প্রাকৃতিক প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের কারণে মানুষ নিজের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য প্রার্থনা করবে, এ মর্যাদাও তার আছে।

কিন্তু কোন উপাস্য আইনগত ও রাজনৈতিক দিক দিয়েও প্রাধান্য বিস্তার করার এবং পার্থিব বিষয়াদিতে তার ইচ্ছা মতো যে কোন হুকুম দেবে আর তার বিধি-নিষেধকে উচ্চতর আইন হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার সামনে মানুষকে মাথা নত করতে হবে। এ কথা পৃথিবীর ভুয়া শাসনকর্তারা আগেও কখনো মেনে নেয়নি এবং আজো মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা সব সময় একথা বলে এসেছে, আমরা পূর্ণ স্বাধীন অথবা ধর্মনিরপেক্ষ। কোন উপাস্যের আমাদের রাজনীতিতে ও আইনে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এটিই ছিল পার্থিব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যসমূহের সাথে নবী রাসূল ও তাঁদের অনুসারী সংস্কারকদের সংঘাতের আসল কারণ। বর্তমানেও দ্বীনি আন্দোলনের সাথে যে সংঘাত বিশ্বময় চলছে, তার কারণও এটাই।

নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীরা দেশ ও সমাজের কর্তৃত্বশীলদের কাছ থেকে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করেছেন আর তাদের প্রতিপক্ষ এর জবাবে কেবলমাত্র নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের দাবী পেশ করতে থেকেছে অথবা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করেছে। প্রতিপক্ষকে তারা মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক বলে চিত্রিত করেছে। শুধু তাই নয়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তারা অপরাধী ও বিদ্রোহী বলে গণ্য করেছে, যারা আইন ও রাজনীতির ময়দানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে।

এই ব্যাখ্যা থেকে ফেরাউনের কথার সঠিক মর্ম ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। যদি কেবলমাত্র পুজা-অর্চনা ও নযরানা-মানত পেশ করার ব্যাপার হতো, তাহলে হযরত মূসা অন্য দেবতাদের বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকেই এসবের অধিকারী মনে করেন-এটা ফেরাউনের কাছে কোন আলোচনার বিষয়ই হতো না। যদি কেবলমাত্র এ অর্থেই মূসা আলাইহিস সালাম তাকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদমুখী হবার দাওয়াত দিতেন তাহলে তার ক্রোধোন্মত্ত হবার কোন কারণই ছিল না। বড় জোর সে যদি কিছু করতো তাহলে নিজের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করতো অথবা হযরত মূসাকে বলতো, আমার ধর্মের পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক করে আগে বিজয়ী হও তারপর তোমার ধর্ম গ্রহণ করবো কিনা বিবেচনা করা যাবে।

কিন্তু যে জিনিসটি তাঁকে ক্রোধোন্মত্ত করে দিয়েছে সেটি ছিল এই যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে এমনভাবে একটি রাজনৈতিক হুকুম পৌছিয়ে দিয়েছেন যেন সে একজন অধীনস্থ শাসক এবং একজন উর্ধতন শাসনকর্তার দূত এসে তার কাছে এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য করার দাবী করছেন। এ অর্থে সে নিজের ওপর কোন রাজনৈতিক ও আইনগত প্রাধান্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং তার কোন প্রজা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উর্ধতন শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেবে, এটাও সে বরদাশত করতে পারতো না। তাই সে প্রথমে চ্যালেঞ্জ করলো 'রাব্বুল আলামীনের' পরিভাষাকে। কারণ হযরত মূসার পক্ষ থেকে যে বার্তা নিয়ে আসা হয়েছিল তার মধ্যে শুধুমাত্র ধর্মীয় উপাসনার নয় বরং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভাবধারা সুস্পষ্ট ছিল। তারপর হযরত মূসা যখন বারবার ব্যাখ্যা করে বললেন, তিনি যে রাব্বুল আলামীনের বার্তা এনেছেন তিনি কে? তখন সে পরিষ্কার হুমকি দিল, মিসর দেশে তুমি যদি আমার ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌম কর্তৃত্বের নাম উচ্চারণ করো তাহলে তোমাকে জেলখানার ভাত খেতে হবে।

এই বিষয়টি বর্তমানেও করা হচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীতে শাসকদল আল্লাহকে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানাকায় গ্রহণ করতে রাজী আছে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে তারা কোন ক্রমেই রাজী নয়। এর নাম তারা দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ভাবেই তারা ফেরাউনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আল্লাহর নবীর প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে জালিম ফেরাউন হুমকি প্রদান করলো, তুমি যদি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে আইন দাতা, বিধান দাতা তথা রব হিসাবে স্বীকৃতি দান করো, আমাকে যদি রব হিসাবে মেনে না নাও, তাহলে তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এ পর্যায়ে একান্ত বাধ্য হয়েই বললেন, নবী হিসাবে মহান আল্লাহ আমাকে নিদর্শন দান করেছেন। সে নিদর্শন তো প্রমাণ করবে যে, নবী

হিসাবে-মানুষের পথপ্রদর্শক হিসাবে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কোরআন বলছে-

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ-قَالَ فَاْتِبِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ ...اِلَى اخِرِالاية

মূসা বললো, 'আমি যদি তোমার সামনে একটি সুস্পষ্ট জিনিষ আনি তবুও?' ফেরাউন বললো, 'বেশ, তুমি আনো যদি তুমি সত্যবাদী হও।' (তার মুখ থেকে একথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠিটি ছুড়ে মারলো। তৎক্ষণাৎ সেটি হলো একটি সাক্ষাত অজগর। তারপর সে নিজের হাত (বগলের ভেতর থেকে) টেনে বের করলো এবং তা সকল প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে চক্‌মক্ করছিল। (সূরা শু'আরা-৩০-৩৩)

যখনই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বগল থেকে হাত বের করলেন তখনই অকস্মাৎ সমগ্র পরিবেশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং অনুভূত হতে লাগলো যেন সূর্য উদিত হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরায়ে আরাফে এই ঘটনা এভাবে মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন-

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ-

ফেরাউন বললো, 'তুমি যদি কোন চিহ্ন-নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো এবং তোমার এই দাবীতে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তা পেশ করো।' (সূরা আরাফ-১০৬)

কোরআন বলছে, হযরত মূসা তার নিজের লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং সহসাই তা এক জীবন্ত অজগরে পরিণত হলো। তারপর তিনি নিজের হাত বগলে প্রবেশ করিয়ে হাত টেনে বের করলেন আর সব দৃষ্টিমান লোকের সম্মুখে তা ঝকমক করতে লাগলো।

এই দু'টি নিদর্শন হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই কথা প্রমাণ করা যে, তিনি বিশ্ব-ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা ও সার্বভৌম আল্লাহ্র প্রতিনিধি। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, নবী-পয়গাম্বরগণ যখনই নিজদেরকে রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ হিসাবে পেশ করেছেন, তখনই লোকেরা তাঁদের কাছে দাবি জানিয়েছে যে, 'তুমি যদি সত্যই রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হয়ে থাকো, তাহলে তোমার হাতে প্রাকৃতিক নিয়মের সাধারণ ক্রিয়াশীলতার বিপরীত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়া উচিত। তার মাধ্যমে এই কথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হবে যে, তোমার সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ নিজেই সরাসরি হস্তক্ষেপের সাহায্যে এই ঘটনা সংঘটিত করিয়েছেন।'

এই দাবীর জওয়াব স্বরূপ নবী-রাসূলগণ যেসব নিদর্শন দেখিয়েছেন, কোরআনের পরিভাষায় সেই গুলোকেই বলা হয়েছে 'আয়াত' আর ইসলামী চিন্তাবিদগণ নিজেদের পরিভাষায় এইগুলোকেই 'মু'জিযাহ' বলে অভিহিত করেছেন।

ইতিহাসে দেখা যায়, মিশরে যে জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সাধিত হয়েছিল, সে বিপ্লবের ফলে বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে কিবতীগণ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিয়ে বনী ইসরাঈলীদের ওপরে নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাচ্ছিল। হযরত মূসা ছিলেন যেহেতু বনী ইসরাঈলী সন্তান, এ কারনে ফেরাউন তার জাতিকে হযরত মূসার আহ্বান হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য বলেছিল যে, এই ব্যক্তি এ দেশ দখল করার জন্য এসেছে এবং কিবতীদেরকে সে এদেশ থেকে বের করে দেবে। তার এ কথা বলার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। এ সম্পর্কে সূরা ত্ব-হা-য় বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى-قَالَ اَجِئْتَنَا.....اِلَى اخِرِالاية

আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখালাম কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করতে থাকলো এবং মেনে নিল না। বলতে লাগলো, 'হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছো যে, নিজের যাদুর জোরে আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দেবে? বেশ, আমরাও তোমার মোকাবিলায় অনুরূপ যাদু আনছি, ঠিক করো কবে এবং কোথায় মোকাবিলা করবে, আমরাও এ চুক্তির অন্যথা করবো না, তুমিও না। খোলা ময়দানের সামনে এসে যাও।'

মূসা বললো, 'উৎসবের দিন নির্ধারিত হলো এবং পূর্বাহ্নে লোকদেরকে জড়ো করা হবে।' ফেরাউন পেছনে ফিরে নিজের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করলো এবং তারপর মোকাবিলায় এসে গেলো। মূসা (যথা সময় প্রতিপক্ষ দলকে সম্বোধন করে) বললো, 'দুর্ভাগ্য পীড়িতরা! আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না, অন্যথায় তিনি কঠিন আযাব দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবেন। যে-ই মিথ্যা রটনা করেছে সে-ই ব্যর্থ হয়েছে।'

একথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেলো এবং তারা চুপিচুপি পরামর্শ করতে লাগলো শেষে কিছু লোক বললো 'এরা দু'জন তো নিছক যাদুকর, নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা এবং তোমাদের আদর্শ জীবন যাপন পদ্ধতি ধ্বংস করে দেয়াই এদের উদ্দেশ্য। আজ নিজেদের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করে নাও এবং একজোট হয়ে ময়দানে এসো। ব্যস, জেনে রাখো, আজকে যে প্রাধান্য লাভ করবে সেই জিতে গেছে।' যাদুকররা বললো, 'হে মূসা! তুমি নিক্ষেপ করবে, না কি আমারই আগে নিক্ষেপ করবো?' মূসা বললো, 'না, তোমরাই নিক্ষেপ করো।'

অকস্মাৎ তাদের যাদুর প্রভাবে তাদের দড়ি-দড়া ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে বলে মূসার মনে হতে লাগলো এবং মূসার মনে ভীতির সঞ্চার হলো–আমি বললাম, 'ভয় পেয়ো না, তুমিই প্রাধান্য লাভ করবে। ছুঁড়ে দাও তোমার হাতে যা কিছু আছে, এখনই এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, এরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে এতো যাদুকরের প্রতারণা এবং যাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন কখনো সফল হতে পারে না। (সূরা ত্বা-হা-৫৬-৬৯)

আমি ফেরাউনকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখালাম–এ কথার অর্থ হলো, পৃথিবী ও প্রাণী জগতের যুক্তি-প্রমাণসমূহের নিদর্শনাবলী এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে প্রদত্ত যাবতীয় মু'জিযাও। ফেরাউনকে বুঝানোর জন্য হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে একের পর এক যেসব মু'জিযা দেখানো হয়েছিল সেগুলোও কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাদু বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে লাঠি ও সাদা হাতকে। সূরা আ'রাফ ও সূরা শু'আরায় বিস্তারিতভাবে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা প্রথম সাক্ষাতের সময় প্রকাশ্য দরবারে এ কথা পেশ করেছিলেন। এ মু'জিযা দেখে ফেরাউন যেরকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তা কেবলমাত্র তার এ একটি বাক্য থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে যে, 'তোমার যাদুর জোরে তুমি আমাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে দিতে চাও।' কোন্ যাদুকর যাদুর জোরে কোন দেশ জয় করে নিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বে কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি এবং পরবর্তীকালেও ঘটতে দেখা যায়নি।

ফেরাউনের নিজের দেশে শত শত যাদুকর ছিল, যারা যাদুর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেয়ার জন্য হাত পাততো। এ জন্য ফেরাউনের একদিকে হযরত মূসাকে যাদুকর বলা এবং অন্যদিকে তিনি তার রাজ্য ছিনিয়ে নিতে চান বলে আশংকা প্রকাশ করা তার স্পষ্ট দিশেহারা হয়ে যাবার আলামত পেশ করে। আসলে হযরত মূসার ন্যায়সংগত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এবং

মু'জিযাগুলো দেখে সে বুঝতে পেরেছিল যে, শুধুমাত্র তার সভাসদরাই নয় বরং তার সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকল প্রজাই এ থেকে প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। তাই সে মিথ্যা, প্রতারণা ও হিংসার পথে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা শুরু করলো এবং প্রতিটি যুগে দাম্ভিক স্বৈরশাসকরা এই নীতিই গ্রহণ করে থাকে।

সে বললো, এসব মু'জিযা নয়, যাদু এবং আমার রাজ্যের প্রত্যেক যাদুকরই এভাবে লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখাতে পারে। সে বললো, 'হে জনতা! ভেবে দেখো, এ ব্যক্তি তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী গণ্য করছে।' সে আরো বললো, 'হে জনতা! সাবধান হয়ে যাও, এ ব্যক্তি নবী-রাসূল কিছুই নয়, এ আসলে ক্ষমতালোভী। এ ব্যক্তি ইউসুফের যামানার মতো আবার বনী ইসরাঈলকে এখানে শাসন কর্তৃত্বে বসিয়ে দিতে এবং কিবৃতীদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়।' এসব অস্ত্র ব্যবহার করে ফেরাউন সত্যের দাওয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছিল। এ যুগেও যেমন বলা হয়ে থাকে যে, মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করে দেশের উন্নতির চাকাকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়। এসব কথা বলে ইসলাম বিরোধী শক্তি দেশের জনগণের কাছে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে একটি প্রগতি বিরোধী আন্দোলন হিসাবে চিত্রিত করতে চায়।

জালিম শাসক ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, একবার যাদুকরদের লাঠি ও দড়ি-দড়ার সাহায্যে সাপ বানিয়ে প্রদর্শন করি তাহলে মূসার মু'জিযার যে প্রভাব জনগণের ওপর পড়েছে তা তিরোহিত হয়ে যাবে। হযরত মূসাও মনে-প্রাণে এটাই চাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ জন্য কোন পৃথক দিন ও স্থান নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। উৎসবের দিন কাছেই এসে গেছে। সারা দেশের লোক এদিন রাজধানীতে চলে আসবে। সেদিন যেখানে জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই ময়দানেই এই প্রতিযোগিতা হবে। সমগ্র জাতিই এ প্রতিযোগিতা দেখবে। আর সময়টাও এমন হতে হবে যখন দিনের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, যাতে কারো সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করার কোন অবকাশই না থাকে।

ফেরাউন ও তার সভাসদদের দৃষ্টিতে এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। তারা এর ফায়সালার সাথে নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা জড়িত মনে করছিল। সারা দেশে লোক পাঠানো হলো। যেখানে যে অভিজ্ঞ-পারদর্শী যাদুকর পাওয়া যায় তাকেই সংগে করে নিয়ে আসার হুকুম দেয়া হলো। এভাবে জনগণকে উপস্থিত করার জন্যও বিশেষভাবে প্রেরণা দান করা হলো। যেন জাতির অধিকাংশ লোক একত্র হয় এবং তারা স্বচক্ষে যাদুর তেলেসমাতি দেখে মূসার লাঠির ভয় ও প্রভাব থেকে নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখতে পারে। তারপর প্রকাশ্যে বলা হতে লাগলো, আমাদের আদর্শ এখন যাদুকরদের কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে। তারা বিজয়ী হলে আমাদের আদর্শ এবং প্রভাব টিকে থাকবে, নয়তো মূসার ইসলামী আদর্শ গোটা জাতির ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে।

এ ক্ষেত্রে এই সত্যটিও সামনে থাকা দরকার যে, মিশরের রাজ পরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর আর্দশ ও ধর্ম জনগণের ধর্ম ও আর্দশ থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। শাসক ও শাসিতের দেবতা ও মন্দির পৃথক ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানও এক ধরনের ছিল না। আর মৃত্যুপরের জীবনের ব্যাপারেও মিশরে যার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি, উভয়ের কার্যকর পদ্ধতি ও আদর্শিক পরিণামে অনেক বড় পার্থক্য দেখা যেতো। তাছাড়া মিশরে ইতিপূর্বে যে ধর্মীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তার ফলে সেখানের জনগণের মধ্যে এমন একাধিক উপদল সৃষ্টি হয়েছিল যারা মুশরিকী আদর্শের তুলনায় একটি তাওহীদী আদর্শকে প্রাধান্য দিচ্ছিল।

যেমন বনী ইসরাঈল এবং তাদের স্বধর্মীয় লোকেরা। এরা জনসংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ ছিল। এছাড়াও রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতায় ফেরাউন আমিনোফিস বা আখ্নাতুন যে ধর্ম বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন তার প্রভাব তখন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এ বিপ্লবের মাধ্যমে সমস্ত উপাস্যদেরকে উৎখাত করে একমাত্র একক উপাস্য 'অতুন'কে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছিল। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্টশক্তির জোরেই এ বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল তবুও সে তার কিছু না কিছু প্রভাব রেখে গিয়েছিল। এসব অবস্থা সামনে রাখলে সে সময়ে ফেরাউনের মনে যে ভীতি ও আশংকা জাগছিল তা পুরোপুরি অনুধাবন করা যায়।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যে সম্বোধনের কথা উল্লেখিত আয়াতে করা হয়েছে, এই সম্বোধন মিসরের জনগণের প্রতি ছিল না। কারণ হযরত মূসা মু'জিযা দেখাচ্ছেন না যাদু দেখাচ্ছেন-তখনো পর্যন্ত জনগণ এ ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেনি। সুতরাং এ সম্বোধন ছিল ফেরাউন ও তার সভাসদদের প্রতি, কারণ তারাই তাঁকে যাদুকর হিসাবে চিত্রিত করছিল।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বলেছিলেন, দুর্ভাগ্য পীড়িতরা! আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না–অর্থাৎ এ মু'জিযাকে যাদু এবং আল্লাহর নবীকে যাদুকর হিসাবে চিত্রিত করো না।

পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কথা শুনে তাঁর প্রতিপক্ষের ভেতরে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা গোপনে পরামর্শ করছিল। এ থেকে জানা যায়, এরা মনে মনে নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতা অনুভব করছিল। এরা জানতো, হযরত মূসা যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয়। এরা প্রথম থেকেই দ্বিধান্বিত মনোভাব ও ভীতি সহকারে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তারপর যখন নির্ধারিত সময়ে হযরত মূসা তাদেরকে উচ্চস্বরে আহবান জানিয়ে সতর্ক করে দিলেন তখন অকস্মাৎ তাদের দৃঢ় সংকল্প কেঁপে উঠলো। সম্ভবত তারা এ বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকবে যে, এত বড় উৎসবে, যেখানে দেশের অধিকাংশ জনগণ একত্রিত হয়েছে সেখানে উন্মুক্ত ময়দানে দিনের উজ্জ্বল আলোকে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে কি না। যদি এখানে আমরা পরাজিত হই এবং সবার সামনে যাদু ও মু'জিযার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

'এরা দু'জন তো নিছক যাদুকর, নিজেদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা এবং তোমাদের আদর্শ জীবন-যাপন পদ্ধতি ধ্বংস করে দেয়াই এদের উদ্দেশ্য'–এই কথা যারা বলেছিল নিশ্চয়ই তারা ফেরাউনের দলের চরমপন্থী গ্রুপ, যারা যে কোন উপায়ে হযরত মূসার বিরোধিতা করছিল এবং স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। ইতিহাস পর্যালোচনায় মনে হয়, দুরদর্শী, অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকেরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইতস্তত করছিল। কিন্তু চরমপন্থী আবেগমুখর লোকেরা হয়তো বলেছিল, অনর্থক দূরের চিন্তা ত্যাগ করো এবং মন স্থির করে প্রতিযোগিতায় নেমে যাও।

দু'টি বিষয় ছিল তাদের মূল প্রতিপাদ্য। এক, যদি যাদুকররাও মূসার মতো লাঠিকে সাপ বানিয়ে দেখিয়ে দেয় তাহলে সাধারণ জনসমাবেশে মূসা যে যাদুকর তা প্রমাণ হয়ে যাবে। দুই, তারা হিংসার আগুন জ্বালিয়ে শাসক শ্রেণীর মনে অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। তাদেরকে এই মর্মে ভয় দেখাচ্ছিল যে, মূসার বিজয় দেশের কর্তৃত্ব ক্ষমতা তোমাদের হস্তচ্যুত হওয়া এবং তোমাদের আদর্শ ও জীবন-যাপন পদ্ধতির অপমৃত্যুর নামান্তর। তারা দেশের প্রভাবশালী শ্রেণীকে ভয় দেখাচ্ছিল এই বলে যে, মূসা যদি দেশের কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে

তাহলে তোমাদের এ শিল্প, চারুকলা, সুন্দর ও মোহময় সংস্কৃতি এবং তোমাদের নারী স্বাধীনতা তথা এমন সবকিছু যেগুলো ছাড়া জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগই করা যায় না, একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর তো শুরু হবে নিছক 'মৌলবাদীদের পশ্চাৎমুখী শাসন' যা সহ্য করার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো।

আজ নিজেদের সমস্ত কলাকৌশল একত্র করে নাও এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে ময়দানে এসো-অর্থাৎ এদের মোকাবিলায় সংযুক্ত মোর্চা গঠন করো। এ সময় যদি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং প্রতিযোগিতার চরম মুহূর্তে সাধারণ জনতার সামনে তোমাদের ভেতরের দ্বন্দ্ব প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে সেই মুহূর্তেই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে এবং জনগণ মনে করতে থাকবে তোমাদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই নিশ্চিত নও বরং সন্দেহ আর সংশয়ে দোলায়িত চিত্তে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছো।

কোরআনের ইতিহাস বর্ণনার ধরণ দেখে অনুমান করা যায় যে, যখনই হযরত মূসার মুখ থেকে 'নিক্ষেপ করো' শব্দ বের হয়েছে তখনই যাদুকররা অকস্মাৎ নিজেদের লাঠিসোটা ও দড়ি-দড়াগুলো তাঁর দিকে ছুড়ে দিয়েছে এবং হঠাৎ-ই তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে যেন শত সহস্র সাপ মোচড় দিতে দিতে তাঁর দিকে দৌড়ে চলে আসছে।

মহান আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বললেন, 'ছুঁড়ে দাও তোমার হাতে যা কিছু আছে, এখনই এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে'-এ কথার অর্থ এটা হতে পারে, মু'জিযার মাধ্যমে যে অজগর সৃষ্টি হয়েছিল তা ফেরাউনের যাদুকরদের যেসব লাঠি ও দড়িদড়া সাপের মতো দেখাচ্ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

একথা স্পষ্ট যে, তাদের মিথ্যা ও কৃত্রিমতা তাদের লাঠি ও দড়িদড়া ছিল না বরং তা ছিল তাদের যাদু, যার বদৌলতে সেগুলোকে সাপের মতো দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং হযরত মূসার লাঠি-অজগরটি যেদিকেই গিয়েছে সেদিকেই যাদুকরদের ছুড়ে দেয়া লাঠি ও দড়িগুলো-যা সাপের মত দেখাচ্ছিলো তার প্রভাব নষ্ট করে এমনভাবে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে যার ফলে প্রত্যেকটি লাঠি ও দড়ি ছুড়ে দেয়ার জায়গাতেই অবিকৃত অবস্থাতেই পড়েছিল এবং জনগণ দেখছিল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তার মোকাবেলায় মানুষের বানানো যাদু কিভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের সূরা আশ্ শু'আরাতেও এ কাহিনী মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। এই সূরায় সে ইতিহাস এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ-يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ............

ফেরাউন তার চারপাশে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে বললো, 'এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ যাদুকর। নিজের যাদুর জোরে সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন বলো তোমরা কী হুকুম দিচ্ছো?' তারা বললো, 'তাকে ও তার ভাইকে আটক করো এবং শহরে শহরে সংবাদদাতা পাঠাও। তারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে তোমার কাছে নিয়ে আসুক।' তাই একদিন নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। এবং লোকদের বলা হলো, 'তোমরাও কি সমাবেশে যাবে? হয়তো আমরা যাদুকরদের আদর্শের অনুসরণের ওপরই বহাল থাকবো, যদি তারা বিজয়ী হয়।' যখন যাদুকররা ময়দানে এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, 'আমরা কি পুরস্কার পাবো, যদি আমরা বিজয়ী হই?' সে বললো, 'হ্যাঁ, আর তোমরা তো সে সময় নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।'

মূসা বললো, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।' তারা তখনই নিজেদের দড়ি-দড়া ও লাঠিসোটা নিক্ষেপ করলো এবং বললো, 'ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হবো।' তারপর মূসা নিজের লাঠিটি নিক্ষেপ করলো। আকস্মাৎ সে তাদের কৃত্রিম কীর্তিগুলো গ্রাস করতে থাকলো। (সূরা শু'আরা-৩৪-৪৫)

মু'জিযা দু'টির শ্রেষ্ঠত্ব এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। মাত্র এক মুহূর্ত আগে নিজের এক সাধারণ প্রজাকে দরবারের মধ্যে রেসালাতের কথাবার্তা ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির দাবী করতে দেখে ফেরাউন তাঁকে পাগল ঠাউরিয়েছিল। কারণ তার দৃষ্টিতে একটি গোলাম জাতির কোন ব্যক্তির পক্ষে তার মতো পরাক্রমশালী শাসকের সামনে এ ধরনের দুঃসাহস করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা। এ কারণে সে এই বলে ধমক দিচ্ছিল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা, বিধানদাতা হিসেবে মেনে নাও, তাহলে তোমাকে কারাগারে বন্দী করবো। আর এখন মাত্র এক মুহূর্ত পরে এ নিদর্শনগুলো দেখার সাথে সাথেই তার মধ্যে এমন ভীতির সঞ্চার হলো যে, নিজের শাসন ক্ষমতা ও রাজ্য হারানোর ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়লো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রকাশ্য দরবারে নিজের অধস্তন কর্মচারীদের সামনে সে যে কেমন অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে চলেছে সে অনুভূতিই সে হারিয়ে ফেললো।

বনী ইসরাঈলের মতো একটি নির্যাতিত-নিপীড়িত জাতির দু'টি লোক যুগের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সরকার প্রধানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের সাথে সমরাস্ত্রে সজ্জিত কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। তারা যে জাতির মুক্তি দাবী করছিলেন সে জাতির মধ্যে কোন সক্রিয়তা ও প্রাণশক্তি ছিল না এবং দেশের কোথাও সে জাতির পক্ষ থেকে বিদ্রোহের সমান্যতম লক্ষণও ছিল না। দেশের বাইরের অন্য কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিও তাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না। এ অবস্থায় শুধুমাত্র একটি লাঠিকে সর্পে পরিণত হতে এবং একটি হাতকে ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করতে দেখে অকস্মাৎ সরকার প্রধানের এই বলে চিৎকার করে ওঠা যে, 'এ দু'টি সহায়-সম্বলহীন লোক আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে এবং সমগ্র শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাবে এবং তারা যাদুর প্রভাবে আমার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিবে'-একথার কী অর্থ হতে পারে? এর একমাত্র অর্থ তো এটাই যে, ফেরাউন ও স্বৈর শাসনের সহযোগিরা মহাসত্যের মোকাবেলায় ভয়ে ত্রাসে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল এবং তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছিল। ফলে তারা পাগলের মতই প্রলাপ বকছিল।

প্রতিটি যুগেই দ্বীনি আন্দোলন যখন ময়দানে প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করেছে, সে জোয়ারের মোকাবেলায় মিথ্যে শক্তি এভাবে প্রলাপ বকতে বকতেই আল্লাহর যমীন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যাদুবলে পৃথিবীর কোন দেশে কোন রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়নি, কোন দেশ বিজিত হয়নি, কোন যুদ্ধে জয়ও হয়নি। যাদুকররা তো তার নিজের দেশেই ছিল এবং তারা বড় বড় তেলেসমাতি দেখাতে পারতো। কিন্তু যাদুকররা স্বয়ং অবগত ছিল, ভেল্কিবাজীর খেলা দেখিয়ে পুরস্কার নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন শক্তি ও কৃতিত্ব নেই।

ফেরাউন তার পরামর্শ দাতাদের কাছে আবেদন করেছিল, মুসার সাথে কিভাবে মোকাবেলা করা যায়-তার এ কথায় বুঝা যায় যে, সে অতিমাত্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সে নিজেকে আইনদাতা, বিধানদাতা, উপাস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল এবং এদের সবাইকে করে রেখেছিল নিজের গোলাম। কিন্তু এখন স্বয়ং উপাস্য সাহেব আল্লাহর রাসূলের সামনে ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে তার নিজের কৃত্রিম বান্দাদের কাছেই পরামর্শের আবেদন জানিয়ে মিনতি করছে, আমার মাথা মূসা এলোমেলো করে দিয়েছে, আমার বুদ্ধি এখন বিকল হয়ে গিয়েছে, তোমরাই বলো আমি এখন কিভাবে এ বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

আল্লাহর কোরআনের সূরা ত্ব-হা-য় বলা হয়েছে, কিবতীদের জাতীয় ঈদের দিনকে এ প্রতিদ্বন্দ্বীতার দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উৎসব ও মেলা উপলক্ষে আগত সমস্ত লোকেরা এ বিরাট প্রতিযোগিতা দেখতে পাবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। এ জন্য সময় নির্ধারিত করা হয়েছিল সূর্য আকাশে উঠে চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে সবার চোখের সামনে উভয় পক্ষের শক্তির প্রদর্শনী হবে এবং আলোর অভাবে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবার অবকাশ থাকবে না।

যে সময়ে এই প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তখন ফেরাউনের পক্ষ হতে শুধুমাত্র ঘোষনা ও বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করা হয়নি বরং জনগণকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার জন্য ময়দানে হাজির করার উদ্দেশ্যে লোকও নিয়োগ করা হয়। এ থেকে জানা যায়, প্রকাশ্য দরবারে হযরত মূসা যেসব মু'জিযা দেখিয়েছিলেন সেগুলোর খবর সাধারণ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশের লোকেরা এতে প্রভাবিত হতে চলেছে বলে ফেরাউনের মনে আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই সে চাচ্ছিল বেশি বেশি জনসমাগম হোক এবং লোকেরা দেখে যাক যে লাঠির সাপে পরিণত হওয়া কোন বড় কথা নয়, আমাদের দেশের প্রত্যেক যাদুকরও ভেল্কিবাজী দেখাতে পারে।

ফেরাউন ও তার মন্ত্রণাদাতারা বলেছিল, 'হয়তো আমরা যাদুকরদের আদর্শের অনুসরণের ওপরই বহাল থাকবো, যদি তারা বিজয়ী হয়'–তাদের বলা একথাগুলো কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের এই কথাই প্রমাণ করছে যে, ফেরাউনের দরবারের যেসব লোক হযরত মূসার মু'জিযা দেখেছিল এবং দরবারের বাইরের যেসব লোকের কাছে এর নির্ভরযোগ্য সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল, নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ও আদর্শের ওপর তাদের বিশ্বাসের ভিত নড়ে যাচ্ছিল এবং এখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে কাজ করেছেন তাদের যাদুকররাও কোনক্রমে তা করিয়ে দেখিয়ে দিক, এরই ওপর তাদের ধর্মের ও আদর্শের ওপর টিকে থাকা নির্ভর করছিল। ফেরাউন ও তার রাজ্যের কর্মকর্তাগণ একে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর মোকাবিলা মনে করছিল। তাদের প্রেরিত লোকেরা সাধারণ মানুষের মগজে এ চিন্তা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করছিল যে, যাদুকররা যদি সফল হয়, তাহলে মূসার ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার হাত থেকে আমরা বেঁচে যাবো, অন্যথায় আমাদের ধর্ম ও আদর্শের অপমৃত্যু ঘটবে।

কোরআন বলছে, 'যখন যাদুকররা ময়দানে এলো, তারা ফেরাউনকে বললো, 'আমরা কি পুরস্কার পাবো, যদি আমরা বিজয়ী হই'–এই কথাগুলো ছিল ফেরাউনের যাদুকরদের। এরাই এসেছিল হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মোকাবেলায় ফেরাউনের শাসন এবং আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য। আর এরাই ছিল বাতিল আদর্শের রক্ষক এবং এই ছিল বাতিল আদর্শের রক্ষকদের অবস্থা। মূসা আলাইহিস সালামের হামলা থেকে তারা নিজেদের আদর্শকে বাঁচাতে চাচ্ছিল। এ জন্য চূড়ান্ত মোকাবেলার সময় তাদের মধ্যে যে লোভের সঞ্চার হয়েছিল তা ছিল এই যে, তারা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পারলে সরকার বাহাদুর থেকে কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে। তারা তাদের সরকার ফেরাউন এবং তাদের ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার উদ্দেশ্যে আসেনি এবং মনে হয় এসবের প্রতি তাদের মনে কোন শ্রদ্ধাও ছিল না।

ফেরাউন তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে, তোমরা তো সে সময় নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে–আর এ ছিল সমকালীন বাদশাহর পক্ষ থেকে ধর্ম ও জাতির সেবকদেরকে প্রদান করার মতো সবচেয়ে বড় ইনাম। অর্থাৎ কেবল টাকা পয়সাই পাওয়া যাবে না, দরবারে আসনও পাওয়া যাবে। এভাবে ফেরাউন ও তার যাদুকররা প্রথম পর্যায়েই নবী ও যাদুকরের

বিরাট নৈতিক পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। একদিকে ছিল উন্নত মনোবল। বনী ইসরাঈলের মতো একটি নিগৃহীত জাতির এক ব্যক্তি দশ বছর যাবত নরহত্যার অভিযোগে আত্মগোপন করে থাকার পর ফেরাউনের দরবারে দৃঢ়পদে বুক টান করে এসে দাঁড়াচ্ছেন। নির্ভীক কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে পাঠিয়েছেন, বনী ইসরাঈলকে আমার হাতে সৌপর্দ করে দাও। এরপর ফেরাউনের সাথে মুখোমুখি বিতর্ক করতে তিনি সামান্যতম সংকোচ অনুভব করছেন না। তার হুমকি ধমকিকে তিলমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

অনদিকে ফেরাউনের দলবলের হীন মনোবলের প্রকাশ। বাপ-দাদার ভ্রান্তধর্ম আর বাতিল আদর্শকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যাদুকরদেরকে ফেরাউনের দরবারেই ডেকে পাঠানো হচ্ছে। এরপরও হাত জোড় করে তারা বলছে, জনাব! কিছু ইনাম তো মিলবে? আর জবাবে অর্থ পুরস্কার ছাড়াও রাজ নৈকট্যও লাভ করা যাবে শুনে খুশীতে বাগবাগ। নবী কোন্ প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁর মোকাবেলায় যাদুকররা কেমন ধরনের লোক, এ দু'টি বিপরীত চরিত্র আপনা আপনি একথা প্রকাশ করে দিচ্ছে। কোন ব্যক্তি নির্লজ্জতার সকল সীমালংঘন না করলে নবীকে যাদুকর বলার দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

আল্লাহর নবী হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে সমকালিন ইসলাম বিরোধী শক্তি পরাজিত করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের কৌশল মহান আল্লাহ এমনভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন যে, তাদের শতাব্দী ব্যাপী অর্জিত যাদুবিদ্যা মুহূর্তের মধ্যে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ এই কাহিনী সুরা আরাফে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ-يُرِيْدُ.....اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةْ

এটা দেখে ফেরাউন জাতির নেতাগণ পরস্পরের কাছে বললো, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি বড় সুবিজ্ঞ যাদুকর। তোমাদেরকে সে তোমাদের জমি-জায়গা হতে বেদখল করতে চায়। এখন কি বলবে বলো! পরে তারা সবাই ফেরাউনকে পরামর্শ দিল যে, তাকে এবং তাঁর ভাইকে অপেক্ষায় ফেলে রাখো। এই সময়ের মধ্যে সব শহরে-নগরে প্রচারক ও সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও। সমস্ত দক্ষ যাদুকরকে এখানে নিয়ে আসবে। এই (পরিকল্পনা) অনুযায়ী যাদুকররা ফেরাউনের কাছে এলো। তারা বললো জয়ী হলে আমরা এর পুরস্কার ও পারিশ্রমিক পাবো তো? ফেরাউন জওয়াব দিল, হ্যাঁ আর তোমরাই হবে দরবারের নিকটতম ব্যক্তি। তারপর তারা মূসাকে বললো, তুমি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করবো?

মূসা বললো, তোমরা-ই নিক্ষেপ করো। তারা যে যাদুর 'বান' ছাড়লো, তা লোকদের দৃষ্টিকে যাদু করলো ও তাদের হৃদয়কে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল। এক কথায়, তারা খুব সাংঘাতিক যাদু দেখালো। আমি মুসাকে বললাম, তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। সেটা নিক্ষিপ্ত হয়েই সহসা তাদের এই মিথ্যা 'তেলেসমাত'কে গিলে ফেলতে লাগলো।

এইভাবে যা হক ছিল, তাই হক প্রমাণিত হলো। আর তারা যা কিছু বানিয়ে রেখেছিল, তা সবই বাতিল হয়ে গেল। ফেরাউন এবং তার সঙ্গীরা মোকাবেলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হওয়ার পরিবর্তে) লাঞ্ছিত হলো। (সূরা আরাফ-১০৯-১১৯)

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে। ফেরাউন তখনকার সিরিয়া হতে লিবিয়া পর্যন্ত এবং রোম সাগরের বেলাভূমি হতে আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিরাট সাম্রাজ্যের একমাত্র সম্রাটই শুধু নয় উপাস্য দেবতাও ছিল। এই ধরনের ক্ষমতা সম্পন্ন এক সম্রাটের দরবারে গোলাম জাতির এক সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি যদি সহসা উঠে দাঁড়ায়, তাতে এত বড় সাম্রাজ্যের উপর কি বিপদ ঘনীভূত হয়ে

আসতে পারে আর এই এক ব্যক্তিই বা কি করে মিশর সরকারের আসন টলিয়ে দিতে পারে? শাসক-শ্রেণীর লোকজনসহ গোটা রাজ পরিবারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মসনদ হতে কি করে বেদখল করতে পারে? তাছাড়া এই ব্যক্তি তো কেবলমাত্র নবুওয়াতের ও বনী-ইসরাঈলের মুক্তির দাবিই পেশ করেছিলেন। কেবল এইটুকু কথায়ই কোন রাষ্ট্র বিপ্লবের বিপদ ঘনীভূত হতে পারে কি করে? তিনি তো কোন প্রকার রাষ্ট্র-সম্পর্কিত কথাই তুলেননি, তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে এই আতংক জাগ্রত হলো কেন?

এই প্রশ্নের জওয়াব হলো, হযরত মূসার নবুওয়াতের দাবীর মধ্যেই এর কারণ অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপকভাবে নিহিত ছিল। কেননা তাঁর এই নবুওয়াতের দাবীর অর্থ ছিল এই যে, তিনি সম-সাময়িক জীবন ব্যবস্থাকে সমগ্রিকভাবে পরিবর্তন করতে চান, তাতে অবশ্যই রাজনৈতিক ব্যবস্থাও শামিল রয়েছে। আর নিজেকে রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধিরূপে পেশ করার অনিবার্য অর্থই হচ্ছে এই যে, তিনি মানুষের কাছে স্থায়ী ও নিরংকুশ আনুগত্যের দাবী করছেন। কেননা রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি কখনো অপর কারো অনুগত ও প্রজা-সাধারণ হয়ে থাকার জন্য আসেন না-আসেন অনুগত্য লাভের জন্য তথা নেতা হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে কোন কাফির বাদশাহের শাসনাধিকার মেনে নেয়া তাঁর নবী বা রাসূল হবারও পরিপন্থী। এই কারণেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মুখে নবী ও রাসূল হবার দাবী শুনেই ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গের সম্মুখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক বিপ্লবের আশংকা দেখা দিয়েছিল।

'সমস্ত দক্ষ যাদুকরদের এখানে নিয়ে আসবে'-ফেরাউনের দরবারী লোকদের এই কথা থেকে পরিষ্কার মনে হয় যে, আল্লাহর নিদর্শন ও যাদুর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, সেই সম্পর্কে তাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা বর্তমান ছিল। আল্লাহর নিদর্শনের মাধ্যমে যথার্থ পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভব আর যাদু শুধু দৃষ্টিশক্তি আর মনকেই বিভ্রান্ত করে বস্তুর মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটায় মাত্র, এই কথা তারা জানতো। এই কারণেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াতের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা বললো, এই ব্যক্তি যাদুকর। অর্থাৎ লাঠি প্রকৃতই সাপ হয়ে যায়নি; অতএব এই মুজিযাকে আল্লাহর নিদর্শন বলে মেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই; বরং আমাদের কাছে এই মুজিযাকে সাপ বলে মনে হয়েছিল মাত্র, যেমন যাদুকরেরা করে থাকে। এরপর তারা পরামর্শ দিল যে, সারা দেশের যাদুকরদের একত্রিত করে তাদের মাধ্যমেও লাঠি ও রশিকে সাপে পরিবর্তন করে লোকদের দেখাতে হবে। তাহলে সাধারণ মানুষের মনে নবীর মুজিযা দেখতে পাওয়ায় যে ভয়-বিহ্বলতার উদ্ভব হয়েছে তা সম্পূর্ণ দূর না হলেও অন্তত তারা সন্দেহ-সংশয়ে পড়ে যাবে।

যাদুকররা যেসব লাঠি ও রশি নিক্ষেপ করেছিল হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের লাঠি তা সব গিলে ফেলেছিল এবং তা একটি অজগরে পরিণত হয়ে দৃশ্যমান হয়েছিল, এই কথা মনে করা ঠিক হবে না। কোরআন শুধু এইটুকুই বলে যে, লাঠি সাপ হয়ে তাদের সৃষ্ট ধোঁকার তেলেসমাতিকে গিলে ফেলতে শুরু করেছিল। এর পরিষ্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই সাপ যে যে দিকে ছুটে গিয়েছে সেই-সেই দিকেই যাদুর ক্রিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছিলো। যে যাদুর জোরে লাঠি ও রশি সাপের মতই হামাগুড়ি দিচ্ছিলো, তার প্রতারণা মিলিয়ে যাচ্ছিলো। আর এর একটি আবর্তনে যাদুকরদের প্রতিটি লাঠি লাঠি হিসাবেই এবং প্রতিটি রশি রশি হিসাবেই প্রতিভাত হয়ে উঠলো। যাদুর তেলেসমাতি খতম হয়ে গেল।

স্বৈরাচারী শাসক তার প্রতিপক্ষকে পদে পদে লাঞ্ছিত করতে চায়। এ কারণে সে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বৈরাচারী ফেরাউনও এই ধরনের ষড়যন্ত্র করেছিল আল্লাহর নবী হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে। মহান আল্লাহ তার সে ষড়যন্ত্র গোটা জাতির সামনে কিভাবে বানচাল করে দিয়েছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে-

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ-قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ...اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةِ

আর যাদুকরদের অবস্থা এই হলো যে, কোন কিছু যেন ভেতর হতেই তাদের মাথাকে সেজদায় নোয়ায়ে দিল। তারা বলতে লাগলো, আমরা রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম, যাঁকে মূসা ও হারুন উভয়ই মানে। ফেরাউন বললো, তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনলে আমার অনুমতি গ্রহণের পূর্বেই? নিশ্চয়ই এটা কোন ষড়যন্ত্র ছিল, যা তোমরা এই রাজধানীতে বসে করেছো-এই উদ্দেশ্যে যে, এর মালিকদেরকে ক্ষমতা হতে বিচ্যুত করে দিবে। আচ্ছা, এখনই এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে ফেলবো এবং অতপর তোমাদেরকে শুলে চড়াবো।

তাঁরা জওয়াব দিলো, যা হয় হোক, আমাদেরকে তো আমাদের আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। তুমি যে কারণে আমাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও, তা এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, আমাদের রব্ব-এর সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ যখন আমাদের সম্মুখে আসলো, তখন আমরা তা গ্রহণ করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের গুণদান করো আর আমাদেরকে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত। (আরাফ-১২০-১২৬)

এভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও সভাসদদের অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রকে তাদেরই বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছেন। তারা সমগ্র দেশের সুবিজ্ঞ যাদুকরদের ডেকে প্রকাশ্য ময়দানে নামিয়ে দিয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা যেন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যাদুকর হবার কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে, অন্ততঃ তারা যেন এই ব্যাপারে একটা সন্দেহে পড়ে যায়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মোকাবেলায় পরাজয় বরণের পর তাদের নিজেদের ডাকা দক্ষ যাদুকররাই এক বাক্যে সিদ্ধান্ত ঘোষনা করলো যে, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম যা কিছু পেশ করেছেন তা আর যাই হোক এর মোকাবেলায় কোন যাদুকরের যাদু কোন ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম নয়। যাদু কি জিনিস তা স্বয়ং যাদুকরদের অপেক্ষা ভালো আর কে জানতে পারে? অতএব এই যাদুকররাই যখন বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিক্ষা-নিরীক্ষার পর সাক্ষ্য দিল যে, এটা যাদু নয়, তখন ফেরাউন এবং তার মন্ত্রণাদাতাদের পক্ষে দেশবাসীকে এই কথা বুঝানো যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম একজন যাদুকর ছাড়া আর কিছুই নয়-তাদের এ কথা একেবারে অসম্ভব-অচল হয়ে গেল।

ফেরাউন অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে দেখে শেষ পর্যন্ত একটি অভিনব কৌশল প্রয়োগ করেছিল। এ সমস্ত ঘটনাকে অর্থাৎ তার নিয়োগকৃত যাদুকরদের পরাজয়ের ঘটনাকে সে মূসা আলাইহিস্ সালাম এবং যাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে ঘোষনা করেছিল, বর্তমানে যেমন স্বৈরাচারী শাসক কোন আন্দোলন ঠেকাতে ব্যর্থ হলে করে এবং কোন ষড়যন্ত্রকারী দল নির্বাচনে পরাজিত হলে করে থাকে। পরে যাদুকরদের শারীরিক যন্ত্রণাদান ও হত্যা করার ধমক দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রক্রিয়ায় সে তার আরোপিত অভিযোগের সত্যতা তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবে যেমন বর্তমান কালে কোন কোন দেশে পুলিশ কোনো নির্দোষ মানুষকে নির্যাতনের মাধ্যমে মিথ্যা স্বীকৃতি আদায় করে।

কিন্তু এই কৌশলও ফেরাউনেরই বিরুদ্ধে গেল। যাদুকররা নিজদেরকে সব রকমের দণ্ড গ্রহণের জন্য পেশ করে দিল। এতে এই কথা প্রমাণিত হলো যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে সত্য বলে মেনে নেয়ার এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার পশ্চাতে কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব নেই; বরং তারা প্রকৃত সত্যকে জানতে ও চিনতে পেরেই তাঁকে মেনে নিয়েছে। তারপর ফেরাউন সত্য ও সততার নামে প্রবঞ্চনার যে গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল তা সব পরিত্যাগ করে সোজাসুজি অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করা ছাড়া তার আর কোনই উপায় থাকলো না। প্রতিটি যুগেই স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী ফেরাউনের মতই এই ভূমিকা গ্রহণ করছে। প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য প্রথমে তারা নানা কৌশল প্রয়োগ করে ব্যর্থ হয়ে মরণ কামড় হিসাবে নির্যাতনের পথ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু সত্যের প্রতি ঈমান এতবড় যাদুকরদের চরিত্রে সহসা কেমন করে বিপ্লব সৃষ্টি করলো, তা বাস্তবিকই প্রণিধান যোগ্য। কিছুক্ষণ পূর্বেও তারা অত্যন্ত নীচতা ও হীনতার পরিচয় দিয়েছিল। এমনকি তাদের বাপ-দাদার ভ্রষ্টধর্ম ও বাতিল আদর্শের সংরক্ষণ ও সাহায্যের জন্য মোকাবেলার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েই তারা ফেরাউনকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আমরা যদি আমাদের আদর্শকে মূসার আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারি, তাহলে সরকার আমাদেরকে পুরস্কার দেবেন তো? আর এখন ঈমানের মহান নে'মাত লাভ করতে পেরে তারা এতদূর সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ় সাহসী হয়ে পড়লো যে, কিছুক্ষণ পূর্বে যে শাসকের সামনে তারা অর্থ লোভে নত হয়ে পড়েছিল, বর্তমানে সেই শাসকের সমস্ত দাপট ও প্রতাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করছিল এবং তার সব রকম দৈহিক শাস্তিও অকাতরে ভোগ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু যে সত্যকে তারা লাভ করেছিল তা মুহূর্তের তরেও ত্যাগ করতে রাযী হলো না।

এই ঘটনা মহান আল্লাহ মানুষকে শিক্ষাদান করার জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে মানব জাতির সামনে পেশ করেছেন। দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের জন্য এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রচুর উপকরণ রয়েছে বলে কোরআনে কয়েক স্থানে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ত্বা-হা-য় বলা হচ্ছে-

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى..اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةْ

শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত যাদুকর সিজদাবনত হয়ে গেলো এবং তারা বলে উঠলো, 'আমরা মেনে নিলাম হারুন ও মূসার রবকে।' ফেরাউন বললো, 'তোমরা ঈমান আনলে, আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগেই? দেখছি, এ তোমাদের গুরু, এ-ই তোমাদের যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিল। এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটাচ্ছি এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শুলবিদ্ধ করছি এরপর তোমরা জানতে পারবে আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি বেশী কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী।" (অর্থাৎ আমি না মূসা, কে তোমাদের বেশী কঠিন শাস্তি দিতে পারে!) যাদুকররা জবাব দিল, 'সেই সত্তার কসম! যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, উজ্জ্বল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না। তুমি যা কিছু করতে চাও করো। তুমি বড় জোর এ দুনিয়ার জীবনের ফায়সালা করতে পারো আমরা তো আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো মাফ করে দেন এবং এ যাদু বৃত্তিকেও ক্ষমা করে দেন, যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছিলে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই স্থায়িত্ব লাভকারী।' প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে নিজের রবের সামনে হাযির হবে তার জন্য

আছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে না জীবিত থাকবে, না মরবে। আর যারা তার সামনে মুমিন হিসেবে সৎকাজ করে হাযির হবে তাদের জন্য রয়েছে সুমহান মর্যাদা, চির হরিৎ উদ্যান, যার পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে পুরস্কার সেই ব্যক্তির যে পবিত্রতা অবলম্বন করে। (ত্বা-হা-৭০-৭৬)

যাদুকরদের মনের অবস্থার একটা সুন্দর চিত্র এই আয়াতসমূহে ফুটে উঠেছে। মূসার লাঠির কৃতিত্ব দেখার সাথে সাথেই তারা বিশ্বাস করেছে যে, এটি নিশ্চিতভাবেই মু'জিযা, যাদু কোনক্রমেই নয়। তাই তারা হঠাৎ স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়, যেন কেউ তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে।

'আমরা মেনে নিলাম হারুন ও মূসার রবকে'–যাদুকরদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবার পরে তারা এ কথা বলেছিল। তাদের এ কথার মানে হচ্ছে, সেখানে সবাই জানতো কিসের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। সমগ্র জনসমাবেশে একজনও এ ভুল ধারণা পোষন করতো না যে, মূসার ও যাদুকরদের কলাকৌশলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে এবং কার কৌশল শক্তিশালী সেটিই এখন দেখার বিষয়। সবাই জানতো, একদিকে মূসা নিজেকে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর নবী হিসেবে পেশ করছেন এবং নিজের নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ দাবী করছেন যে, তাঁর লাঠি অলৌকিকভাবে অজগরে পরিণত হয়। অন্যদিকে যাদুকরদেরকে জনসমক্ষে আহবান করে ফেরাউন এ কথা প্রমাণ করতে চায় যে, লাঠির অজগরে পরিণত হওয়া অলৌকিক কর্ম নয় বরং নিছক যাদুর তেলেসমাতি। অন্য কথায়, সেখানে ফেরাউন ও যাদুকর এবং সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সমগ্র দর্শকমণ্ডলী মু'জিযা ও যাদুর পার্থক্য অবগত ছিল।

কাজেই সেখানে এ মর্মে পরীক্ষা চলছিল যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদুর পর্যায়ভুক্ত, না রব্বুল আলামীনের অসীম ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতার সাহায্যে যে মু'জিযা দেখানো যেতে পারে না তার পর্যায়ভুক্ত? এ কারণে যাদুকররা নিজেদের যাদুকে পরাভূত হতে দেখে এ কথা বলেনি, 'আমরা মেনে নিলাম, মূসা আমাদের চাইতে বড় যাদুকর।' বরং সংঙ্গে সংগেই তাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, মূসা যথার্থই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্য পয়গম্বর। তারা চিৎকার করে বলে উঠেছে, আমরা সে আল্লাহকে মেনে নিয়েছি, যার পয়গম্বর হিসেবে মূসা ও হারুন এসেছেন।

এ থেকে সাধারণ জনসমাবেশে এ পরাজয়ের কি প্রভাব পড়ে থাকবে এবং সারা দেশবাসী এর মাধ্যমে কি সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকবে তা অনুমান করা যেতে পারে। ফেরাউন দেশের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রীয় মেলায় এ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছিল এ আশায় যে, মিশরের সব এলাকা থেকে আগত লোকেরা স্বচক্ষে দেখে নেবে লাঠি দিয়ে সাপ বানানো মূসার একার কোন অভিনব কৃতিত্ব নয়, প্রত্যেক যাদুকরই এটা করতে পারে। ফলে মূসার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। কিন্তু তার এ কৌশলের ফাঁদে সে নিজেই আটকে গেছে এবং গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আগত লোকদের সামনে যাদুকররাই এক যোগে এ কথার সত্যতা প্রকাশ করেছে যে, মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়, তা হচ্ছে মু'জিযা। কেবলমাত্র আল্লাহর নবীগণই এ মু'জিযা দেখাতে পারেন।

সূরা আরাফে ফেরাউনের বলা কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'এটি একটি ষড়যন্ত্র, তোমরা রাজধানীতে বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে তার মালিকদেরকে হটিয়ে দেবার জন্য এ ষড়যন্ত্র করেছো।'

সূরা ত্বা-হা-য় তার বলা কথাটির বিস্তারিত বর্ণনা আবার এভাবে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে শুধু পারস্পরিক যোগ-সাজশ আছে তাই নয় বরং মনে হচ্ছে এ মূসা তোমাদের দলের নেতা। তোমরা মু'জিযার কাছে পরাজিত হওনি বরং নিজেদের নেতার যাদুর পাতানো খেলার কাছে পরাজিত হয়েছো। বুঝা যাচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে এ মর্মে পরামর্শ করে এসেছো যে, নিজেদের নেতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং তাকে তার নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে এখানে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূচনা করবে।

শুলবিদ্ধ করার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল এমন যে, একটি লম্বা কড়িকাঠ মাটিতে গেড়ে দেয়া হতো। অথবা পুরাতন গাছের গুড়ি একাজে ব্যবহৃত হতো। এর মাথার ওপর একটি তখতা আড়াআড়িভাবে বেঁধে দেয়া হতো। অপরাধীকে ওপরে উঠিয়ে তার দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে তখ্তার গায়ে পেরেক মেরে আটকে দেয়া হতো। এভাবে অপরাধী তখতার সাথে ঝুলতে থাকতো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করতো। লোকদের শিক্ষালাভের জন্য শুলিদন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে এভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হতো।

ফেরাউন যাদুকরদেরকে ভয়াবহতম শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ থেকে এ স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাচ্ছিল যে, সত্যি তাদের ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে গোপন যোগসাজশ ছিল এবং তারা তাঁর সাথে মিলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। কিন্তু যাদুকরদের দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল নিষ্ঠা তার কূটচাল ব্যর্থ করে দিল। তারা এ ভয়ংকর শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে প্রস্তুত হয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে এ কথা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, নিছক হেরে যাওয়া খেলায় জয়লাভ করার জন্য একটি নির্লজ্জ রাজনৈতিক চাল হিসেবে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য এই যে, তারা সাচ্চা দিলে মূসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের প্রতি ঈমান এনেছে।

যাদুকররা জবাব দিল, 'সেই সত্তার ক্বসম! যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, উজ্জ্বল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাওয়ার পরও আমরা (সত্যের ওপর) তোমাকে প্রাধান্য দেবো, এটা কখনো হতে পারে না'-এ আয়াতের আরেকটি অর্থ এও হতে পারে, 'আমাদের সামনে যে সব উজ্জ্বল নিদর্শন এসে গেছে এবং যে সত্তা আমাদের সৃষ্টি করেছে তার মোকাবেলায় আমরা কোনক্রমেই তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না।'

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক যে মু'জিযা প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা দেখে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ যাদুকররা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, তাদের অর্জিত জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিলো যে, এই ব্যক্তি ফেরাউনের কথা অনুযায়ী মোটেও যাদুকর নয়, এই ব্যক্তি এসেছেন মহান আল্লাহর পক্ষ হতে। এ কারণেই তখন সমস্ত যাদুকর স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদাবনত হয়ে পড়লো এবং বলে উঠলো, 'মেনে নিলাম আমরা রব্বুল আলামীনকে-মূসা ও হারুনের রবকে।'

ফেরাউন বললো, 'তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমি তোমাদের অনুমতি দেবার আগে! নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। বেশ, এখনই তোমরা জানবে। আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করাবো এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবো।' তারা জবাব দিল, 'কোন্ পরোয়া নেই, আমরা নিজেদের রবের কাছে পৌঁছে যাবো। আর আমরা আশা করি আমাদের রব আমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন, কেননা, সবার আগে আমরা ঈমান এনেছি।' (সূরা আশ্ শু'আরা-৪৬-৫১)

এটা হযরত মূসার মোকাবেলায় তাদের পক্ষ থেকে নিছক পরাজয়ের স্বীকৃতি ছিল না। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, কেউ বলতো, আরে ছেড়ে দাও, একজন বড় যাদুকর ছোট

যাদুকরদেরকে হারিয়ে দিয়েছে। বরং তাদের সিজদানত হয়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনা যেন প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে হাজার হাজার মিশরবাসীর সামনে এ কথার স্বীকৃতি ও ঘোষনা দিয়ে দেয়া যে, মূসা যা কিছু এনেছেন তা আমাদের যাদু শিল্পের অন্তরগত নয়, এ কাজ তো একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতেই হতে পারে।

এখানে যেহেতু বক্তব্য পরম্পরার সাথে সম্পর্ক রেখে কেবলমাত্র এতটুকু দেখানো উদ্দেশ্য যে, কোন জেদী ও হঠকারী ব্যক্তি একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখার এবং তার মু'জিযা হবার সপক্ষে স্বয়ং যাদুকরদের সাক্ষ্য শুনার পরও কিভাবে তাকে যাদু আখ্যা দিয়ে যেতে থাকে, তাই ফেরাউনের শুধুমাত্র এতটুকু উক্তি এখানে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু সূরা আ'রাফে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'এ একটি ষড়যন্ত্র, যা তোমরা সবাই মিলে এ রাজধানী নগরে তৈরি করেছো, যাতে এর মালিকদেরকে কর্তৃত্ব থেকে বেদখল করে দাও।'

এভাবে ফেরাউন সাধারণ জনতাকে একথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে যে, যাদুকরদের এ ঈমান মু'জিযার কারণে নয় বরং এটি নিছক একটি যোগ-সাজশ। এখানে আসার আগে মূসার সাথে এদের এ মর্মে সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল যে, এখানে এসে এরা মূসার মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করে নেবে এবং এর ফলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধিত হবে তার সুফল এরা উভয় গোষ্ঠী মিলে ভোগ করবে।

যাদুকররা আসলে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যোগ-সার্জশ করে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, নিজের এ অভিমতকে সফল করে তোলার জন্য ফেরাউন শুলবিদ্ধ করার ভয়ংকর হুমকি দিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে এরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য ষড়যন্ত্র স্বীকার করে নেবে এবং এর ফলে পরাজিত হবার সাথে সাথে তাদের সিজদাবনত হয়ে ঈমান আনার ফলে দেশের জনগণের ওপর যে নাটকীয় প্রভাব পড়েছিল তা নির্মূল হয়ে যাবে। এই জনগণ স্বয়ং ফেরাউনের আমন্ত্রণে এ চূড়ান্ত মোকাবেলা উপভোগ করার জন্য সমবেত হয়েছিল। তার প্রেরিত লোকেরাই তাদেরকে এ ধারণা দিয়েছিল যে, মিশরীয় জাতির ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন আদর্শ এখন এ যাদুকরদের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল রয়েছে। এরা সফলকাম হলে জাতি তার পূর্বপুরুষের আদর্শ ও ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে, অন্যথায় মূসার আন্দোলন যে প্লাবন সৃষ্টি করবে, তা তাদের আদর্শ ও তাদের শাসক ফেরাউনের রাজত্বকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

ফেরাউনের হুমকি শুনে ঈমান আনয়নকারী যাদুকররা নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, 'কোন পরোয়া নেই, আমরা নিজেদের রবের কাছে পৌছে যাবো'-অর্থাৎ আমাদেরকে একদিন তো আমাদের রবের কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। এখন যদি তুমি আমাদের হত্যা করো, তাহলে এর পরে যেদিনটি আসার ছিল সেটি আজ এসে যাবে, এর বেশী আর কিছু হবে না। এ অবস্থায় ভয় পাওয়ার প্রশ্ন কেন উঠবে? বরং উলটো আমাদের তো মাগফেরাত পাওয়ার ও গোনাহ মাফের আশা আছে। কারণ আজ এখানে সত্য প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই আমরা তা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে এক মুহূর্তও দেরী করিনি এবং এই বিশাল সমাবেশে আমরাই প্রথমে অগ্রবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি।

ফেরাউন ঢেঁড়া পিটিয়ে যে জনগোষ্ঠীকে সমবেত করেছিল তাদের সবার সামনে যাদুকরদের নির্ভীক জবাব দু'টি কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে। প্রথমতঃ ফেরাউন একজন মহা মিথ্যুক, হঠকারী ও প্রতারক। সে নিজে ফায়সালা করার জন্য যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল তাতে মূসা আলাইহিস সালামের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বিজয়কে সোজাভাবে মেনে নেয়ার পরিবর্তে এখন সে

সহসা একটি মিথ্যা ষড়যন্ত্রের গল্প ফেঁদে বসেছে এবং হত্যা ও শাস্তির হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক তার স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করছে। এ গল্প যদি সামান্যও সত্য হতো, তাহলে যাদুকররা হাত-পা কাটার ও শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দেয়ার জন্য এত হন্যে হয়ে যেতো না। এ ধরনের কোন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যদি কোন রাজত্ব লাভের লোভ থেকে থাকতো, তাহলে এখন তো আর তার কোন অবাকাশ নেই। কারণ রাজত্ব এখন যাদের ভাগ্যে আছে তারাই তা ভোগ করবে, এ ভাগ্যাহতরা তো এখন শুধুমাত্র নিহত হওয়া ও শাস্তি লাভ করার জন্য রয়ে গেছে। এ ভয়াবহ বিপদ মাথায় নিয়েও এ যাদুকরদের নিজেদের ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা পরিষ্কারভাবে এ কথা প্রমাণ করে যে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বরং এ ক্ষেত্রে সত্য কথা হচ্ছে, যাদুকররা নিজেদের যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হবার কারণে যথার্থই জানতে পেরেছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম যা কিছু দেখিয়েছেন তা কোনক্রমেই যাদু নয় বরং প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুদরতের প্রকাশ।

দ্বিতীয়তঃ এ সময় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার জনতার সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটি ছিল এই যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথেই এ যাদুকরদের চরিত্রে কেমন নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে তাদের অবস্থা ছিল, তারা পূর্বপুরুষদের আদর্শ ও ধর্মকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল এবং এ জন্য ফেরাউনের সামনে হাত জোড় করে ইনাম চাইছিল। আর এখন মুহূর্তের মধ্যে তাদের হিম্মত ও সংকল্পের বলিষ্ঠতা এমনি উন্নত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যার ফলে সেই ফেরাউন তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল, তার সমগ্র রাজশক্তিকে তারা হেয় প্রতিপন্ন করেছিল এবং নিজেদের ঈমানের খাতিরে মৃত্যু ও নিকৃষ্টতম শারীরিক শাস্তি বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এ নাজুক মনস্তাত্বিক পরিবেশে মিশরীয়দের মুশরিকী ধর্মের লাঞ্ছনা এবং মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রচারিত সত্য দ্বীনের বলিষ্ঠ প্রচারণা সম্ভবত এর চাইতে বেশী আর হতে পারতো না।

বিশাল জনসমাবেশে ফেরাউনের নিযুক্ত যাদুকররা যখন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম তাদের মতো কোন ভেল্কি দেখাচ্ছেন না। তিনি যা বলছেন এবং দেখাচ্ছেন তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেখাচ্ছেন। তখন তারা নিজেদেরকে আর স্থির রাখতে পারেনি। ফেরাউন তাদেরকে নির্মমভাবে শাস্তি দিয়ে হত্যা করবে, এ কথা জেনেও তারা মহাসত্যের প্রতি অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি দান করেছিল এবং নির্মম শাস্তি বরণ করে আল্লাহর জান্নাত লাভ করেছিল।

তাদের এই প্রতিযোগিতা শুরুর পূর্বেই তাদের ভেতরে এই কথাবার্তা হয়েছিল যে, যাদুকররা যদি আজ ব্যর্থ হয় তাহলে তারাই শুধু ব্যর্থ হবে না। গোটা জাতিই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং চারদিকে মুসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক প্রচারিত ইসলামী আদর্শ ছড়িয়ে পড়বে। এর প্রভাব গোটা জাতির ওপরে পড়বে। ফেরাউনের সমস্ত ক্ষমতা মুখ থুবড়ে পড়বে। আল্লাহর নবীর প্রতি যাদুকররা যখন ঈমান এনেছিল তখন বনী ইসরাঈলীদের ভেতরে অনেকেই তাঁর প্রতি ঈমান এনে ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করেছিল। এমন লোকদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য যারা মনের দিক দিয়ে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দান করতো, কিন্তু ফেরাউনের ভয়ে তারা মুখে স্বীকৃতি দিত না। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা ইউনুসের ৮৩ থেকে ৮৭ আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন।

যাদুর ভেলকি চালে ফেরাউন ব্যর্থ হবার পরে সে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল যে, তার হাত হতে কখন যেন দেশের ক্ষমতা হারিয়ে যায়। এ অবস্থায় স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী যে মাতালের মতই আচরণ করতে থাকে, ফেরাউনও সেই ধরণের আচরণ করছিল এবং পাগলের প্রলাপ বকছিল। একবার সে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে কারাগারে আবদ্ধ করার কথা বলতো, আবার কখনো বলতো আমি তাকে হত্যা করবো। আসলে সে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে কিছু করতে সাংঘাতিকভাবে ভয় পাচ্ছিল। কোরআনের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ-......اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةُ

একদিন ফেরাউন তার সভাসদদের বললো, আমাকে ছাড়ো, আমি এ মূসাকে হত্যা করবো। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।' মূসা বললো, যেসব অহংকারী হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান পোষন করে না, তাদের প্রত্যেকের মোকাবেলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। (সূরা মু'মিন-২৬-২৭)

'আমাকে ছাড়ো, আমি এ মূসাকে হত্যা করবো'-এ কথার দ্বারা ফেরাউন এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে যেন কিছু লোক তাকে বিরত রেখেছে আর সেই কারণে সে মূসা আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করছে না। তারা যদি বাধা না দিতো তাহলে বহু পূর্বেই সে তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাইরের কোন শক্তিই তাকে বাধা দিচ্ছিলো না, তার মনের ভীতিই তাকে আল্লাহর রাসূলের গায়ে হাত তোলা থেকে বিরত রেখেছিলো।

সভাসদদেরকে ফেরাউন বলেছিল, 'আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে'-ফেরাউনের এ কথার অর্থ হলো, আমি তার পক্ষ থেকে বিপ্লবের আশংকা করছি। আর সে যদি বিপ্লব করতে নাও পারে তাহলে এতটুকু বিপদাশঙ্কা অন্তত অবশ্যই আছে যে, তার কর্ম-তৎপরতার ফলে দেশে অবশ্যই বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই সে মৃত্যুদন্ড লাভের মতো কোন অপরাধ না করলেও শুধু দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার (Maintenance of publice order) খাতিরে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। সে ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তা আইন শৃঙ্খলার জন্য সত্যিই বিপজ্জনক কিনা তা দেখার দরকার নেই। সে জন্য শুধু "হিজ ম্যাজেষ্টি"র সন্তুষ্টিই যথেষ্ট। মহামান্য সরকার যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, এ লোকটি বিপজ্জনক তাহলে মেনে নিতে হবে, সে সত্যিই বিপজ্জনক এবং সে জন্য শিরোচ্ছেদের উপযুক্ত।

এই ধরনের আইনের অস্তিত্ব শুধু ফেরাউনের শাসনামলেই ছিল না। বর্তমানেও বিভিন্ন দেশে রয়েছে এবং প্রয়োজনে নতুনভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে। নিজেদের অন্যায় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কেউ যেন কোন প্রতিবাদ করতে না পারে, প্রতিপক্ষকে কারাগারে আবদ্ধ করার জন্য এ ধরনের আইনের প্রয়োজন স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর কাছে চিরকালই পছন্দের ছিল, বর্তমানেও আছে।

দ্বীন পরিবর্তন করে দেবে-ফেরাউনের বলা এ কথাটির অর্থও ভালভাবে বুঝতে হবে-যার আশঙ্কায় ফেরাউন হয়রত মূসা আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করতে চাচ্ছিলো। এখানে দ্বীন অর্থ শাসন ব্যবস্থা। তাই ফেরাউনের কথার অর্থ হলো, 'ফেরাউন ও তার বংশের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ধর্ম, রাজনীতি, সভ্যতা ও অর্থনীতির যে ব্যবস্থা মিশরে চলছিলো তা ছিল তৎকালে ঐ দেশের 'দ্বীন'।' আর ফেরাউন হযরত মূসার আন্দোলনের কারণে এ দ্বীন পাল্টে

যাওয়ার আশঙ্কা করছিলো। কিন্তু প্রত্যেক যুগের কুচক্রী ও ধূরন্ধর শাসকদের মত সে-ও এ কথা বলছে না যে, আমার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। তাই আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই। বরং পরিস্থিতিকে সে এভাবে পেশ করছে যে, হে জনগণ, বিপদ আমার নয়, তোমাদের। কারণ মূসার আন্দোলন যদি সফল হয়, তাহলে তোমাদের দ্বীন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। নিজের জন্য আমার চিন্তা নেই। আমি তোমাদের চিন্তায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, আমার ক্ষমতার ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত হলে তোমাদের কি হবে। তাই যে জালেমের কারণে তোমাদের ওপর থেকে এ ছত্রছায়া উঠে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। কারণ সে দেশ ও জাতি উভয়ের শত্রু।

প্রতিপক্ষের হুমকি শুনে আল্লাহর রাসূল হযরত মুছা বলেছিলেন, 'তাদের প্রত্যেকের মোকাবেলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি'–এখানে দু'টি সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ দু'টি সম্ভাবনার কোনটিকেই অগ্রাধিকার দেয়ার কোন ইংগিত এখানে নেই। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, হযরত মূসা নিজেই সে সময় দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাকে ও তার সভাসদদের উদ্দেশ্য করে তখনই সবার সামনে প্রকাশ্যে উল্লেখিত জবাব দেন।

অপর সম্ভাবনাটি হচ্ছে, ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের অনুপস্থিতিতে তার সরকারের দায়িত্বশীর লোকদের কোন মজলিসে এ কথা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে তার এ আলোচনার খবর কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক পৌছিয়ে দেয়, আর তা শুনে তিনি তাঁর অনুসারীদের এ কথা বলেন যে, তাদের প্রত্যেকের মোকাবেলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি'। এ দু'টি অবস্থার যেটিই বাস্তবে ঘটে থাকুক না কেন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কথায় স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে যে, ফেরাউনের হুমকি তাঁর মনে সামান্যতম ভীতিও সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে জালিমের হুমকির জবাব তার মুখের ওপরেই দিয়ে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ কোন জাতির ওপরে অকারণে কোন আযাব নাজিল করেননা। আল্লাহর আযাব বলতে কি ধরনের আযাব আসতে পারে এ সম্পর্কে বর্তমান মানুষের ভেতরে ভুল ধারণা রয়েছে। বড় ধরনের কোন ঝড়, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প ইত্যাদী সম্পর্কে বর্তমানে বলা হয় যে, এসব হলো প্রকৃতির খেয়াল বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতপক্ষে এসব হলো আল্লাহর আযাব। এই ধরনের আযাব এসে থাকে মানুষের অবাধ্যতার কারণে। মানুষ যখন অতিমাত্রায় আল্লাহর বিধানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে, তখন মহান আল্লাহ এ ধরনের আযাব অবতীর্ণ করে মানুষকে সতর্ক করে দেন যে, সময় থাকতে সোজা পথে এসে যাও, নতুবা এর চেয়ে বড় ধরনের আযাবে তোমরা পড়বে।

সে সময়ে মিশরে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকেও আল্লাহ নানা ধরনের আযাব দিয়ে সোজা পথে আসার সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই হতভাগা জাতি আল্লাহর আযাবের কোন পরোয়া করেনি। কি ধরনের আযাব তাদের ওপরে এসেছিল, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঘোষনা করছে–

وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ...اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

আমি ফেরাউনের লোকজনকে ক্রমাগত কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলের উৎপাদন

ঘাটতির মধ্যে নিমজ্জিত রাখলাম, এই উদ্দেশ্যে যে, সম্ভবত তাদের চেতনা ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন ভাল সময় আসতো তখন বলতো, এ ধরনের হওয়াই আমাদের অধিকার। আর যখন অসময় দেখা দিত, তখন মূসা এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিজেদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে গণ্য করতো। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের মন্দ ভাগ্যের কারণ তো আল্লাহ্র কাছেই নিহিত ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল জ্ঞানশূন্য। তারা মূসাকে বললো, তুমি আমাদেরকে যাদু প্রভাবিত করার জন্য যত নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা তোমার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের ওপর তুফান পাঠালাম, ফড়িং ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম, ব্যাঙের উপদ্রব বাড়িয়ে দিলাম আর রক্তপাত করালাম। এই নিদর্শনসমূহ আলাদা আলাদা করে দেখালাম; কিন্তু তারা অংহকারে মেতেই রইলো। প্রকৃতপক্ষে তারা বড় অপরাধ প্রবণ লোক ছিল।

যখন তাদের ওপর কোন বালা-মুসীবত নাযিল হতো তখন তারা বলতো, 'হে মূসা! তোমাকে তোমার রব্ব-এর কাছ হতে যে পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে তার বদৌলতে তুমি আমাদের জন্য দো'আ করো। এবার যদি তুমি আমাদের ওপর হতে এই বিপদ দূর করে দিতে পারো, তাহলে আমরা তোমার কথা মেনে নেবো এবং বনী-ইসরাঈলীদেরকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেব।' কিন্তু আমি যখন তাদের ওপর হতে আযাব একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তকার জন্য-যে পর্যন্ত তারা অবশ্যই পৌছাতো-সরিয়ে নিতাম, তখনই সহসাই তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো। তখন আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল এবং সেই ব্যাপারে তারা একবারেই বেপরোয়া হয়ে গিয়াছিল। (সূরা আ'রাফ-১৩০-১৩৬)

ফেরাউনের দরবারের লোকেরা যে জিনিসকে নিঃসন্দেহে জানতো যে, তা কোন যাদুর ফল নয়, সেই জিনিসকেও তারা যাদু বলে অবিহিত করতো। এটা নিশ্চিতই হঠকারিতা ও অতিশয় বাড়াবাড়ি। একটি বিরাট দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়া এবং জমিনে কয়েক বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে কম ফসল হওয়া যে কোন যাদুর ফল নয়, তা কোন নির্বোধ ব্যক্তিও বুঝতে পারে। এই কারণেই কোরআন বলেছে, 'আমার নির্দশনসমূহ যখন তাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তখন তারা বললো যে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। অথচ তাদের হৃদয় ভেতর থেকে নিশ্চিতরূপেই একে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। কিন্তু তারা নিছক জুলুম ও আল্লাহ্দ্রোহিতার কারণেই তাকে অস্বীকার করলো।

'তুফান' বলতে সম্ভবত বৃষ্টিজনিত তুফানকে বুঝানো হয়েছে, যাতে শিলাও বর্ষিত হয়েছিল। অন্যান্য জিনিসের তুফান হতে পারে। 'তুফান পাঠালাম, ফড়িং ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়িয়ে দিলাম'–আয়াতে ব্যবহৃত মূল শব্দ হয়েছে, 'কুমাল'। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে উকুন, ছোট মাছি, ছোট ফড়িং, মশা, ঘুণ ও নানা প্রকারের পোকা-মাকড়। সম্ভবত উকুন ও মাছি একই সময় লোকদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়েছিল এবং ফসলের স্তূপে ঘুণ ধরে গিয়েছিল। এই ঘটনা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আলোচনা করেছেন। সূরা নম্ল-এ বর্ণনা করা হয়েছে–

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ...اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

কিন্তু যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে এসে গেলো তখন তারা বললো, এতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্যের সাথে সেই নিদর্শনগুলো অস্বীকার

করলো অথচ তাদের মন মগজ সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এখন এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল দেখে নাও। (সূরা নম্‌ল-১৩-১৪)

কোরআনের অন্যান্য স্থানে বলা হয়েছে যে, যখন মূসা আলাইহিস সালামের ঘোষণা অনুযায়ী মিশরের ওপর কোন সাধারণ বালা-মুসীবত নাযিল হতো তখন ফেরাউন হযরত মূসাকে বলতো, আপনার আল্লাহর কাছে দোয়া করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন তারপর আপনি যা বলবেন তা মেনে নেবো। কিন্তু যখন সে বিপদ সরে যেতো তখন ফেরাউন আবার তার আগের হঠকারিতায় ফিরে যেতো।

তাছাড়া এমনিতেও একটি দেশের সমগ্র এলাকা দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও ঘূর্ণি কবলিত হওয়া, সারা দেশের ওপর পংগপাল ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ব্যাং ও শস্যকীটের আক্রমন কোন যাদুকরের তেলেসমাতি হতে পারে বলে কোনক্রমেই ধারণা করা যেতে পারে না। এগুলো এমন প্রকাশ্য মু'জিযা ছিল যেগুলো দেখে একজন নিরেট বোকাও বুঝতে পারতো যে, নবীর কথায় এ ধরনের দেশব্যাপী বালা-মুসীবতের আগমন এবং আবার তাঁর কথায় তাদের চলে যাওয়া একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই হস্তক্ষেপের ফল হতে পারে। এ কারণে হযরত মূসা ফেরাউনকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, 'তুমি খুব ভালো করেই জানো, এ নির্দশনগুলো পৃথিবী ও আকাশের মালিক ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি।' (বনী ইসরাইল, ১০২)

কিন্তু যে কারণে ফেরাউন ও তার জাতির নেতৃস্থানীয়রা জেনে বুঝে সেগুলো অস্বীকার করতো, তা এই ছিল, 'আমরা কি আমাদের মতই দু'জন লোকের কথা মেনে নেবো, অথচ তাদের জাতি আমাদের গোলাম?' (আল মু'মিনূন, ৪৭)

মানুষের ওপরে যখন এ ধরনের আযাব আসে তখন মানুষ তওবা করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, হে আল্লাহ ! এই আযাব তুমি উঠিয়ে নাও, আমরা সত্য পথ তথা ইসলামের পথে চলবো। তারপর যখন আল্লাহ সে আযাব উঠিয়ে নেন, তখন এই সব মানুষ পুনরায় সেই পথেই চলতে থাকে, যে পথ আল্লাহর অপছন্দনীয়। ফেরাউন ও তার অনুসারীগণও এমনই ভূমিকা গ্রহণ করতো। এভাবে সে নিজেকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا-وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ...اِلٰى اٰخِرِالْاٰيَةِ

আমি তাদেরকে একের পর এক এমন সব নিদর্শন দেখাতে থাকলাম যা আগেরটার চেয়ে বড় হতো। আমি তাদেরকে আযাবের মধ্যে লিপ্ত করলাম যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে বিরত থাকে। প্রত্যেক আযাবের সময় তারা বলতো, হে যাদুকর! তোমার রবের পক্ষ থেকে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছো তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য তাঁর কাছে দোয়া করো। আমরা অবশ্যই সঠিক পথে এসে যাবো। কিন্তু আমি যেই মাত্র তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দিতাম তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।(সূরা যুখরুফ-৪৮-৫০)

নিদর্শন বলতে বুঝানো হয়েছে সেই নিদর্শনসমূহকে যা আল্লাহ পরবর্তীকালে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদের দেখিয়েছিলেন। নির্দশনগুলো ছিল, জন সমুক্ষে যাদুকরদের সাথে আল্লাহর নবীর মোকাবিলা হয় এবং তারা পরাজিত হয়ে ঈমান আনে। হযরত মূসার ভবিষ্যত বাণী অনুসারে মিশর দেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয় এবং হযরত মূসার দোয়ার কারণেই তা দূরীভূত হয়। তাঁর ভবিষ্যত বাণীর পর গোটা দেশে ভয়াবহ বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি,

বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ বর্ষণসহ প্রবল ঝড়, তুফান আসে যা জনপদ ও কৃষি ক্ষেত্রে ধ্বংস করে ফেলে। এ বিপদও তাঁর দোয়াতেই কেটে যায়। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গোটা দেশে পঙ্গপালের ভয়ানক আক্রমণ হয় এবং এ বিপদও ততক্ষণ পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি যতক্ষন না তিনি তা দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করেছেন। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী গোটা দেশে উকুন ও কীটাণু ছড়িয়ে পড়ে যার কারণে একদিকে মানুষ ও জীবজন্তু মারাত্মক কষ্টে পড়ে, অপর দিকে খাদ্য শস্যের গুদাম ধ্বংস হয়ে যায়। এ আযাব কেবল তখনই দূরীভূত হয় যখন কাকুতি-মিনতি করে হযরত মূসার দ্বারা দোয়া করানো হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পূর্ব-সতর্ক বাণী অনুসারে গোটা দেশের আনাচে কানাচে ব্যাঙের সয়লাব আসে যার ফলে গোটা জনপদের প্রায় দমবদ্ধ হওয়ার মত অবস্থা হয়। আল্লাহর এই সৈনিকরাও হযরত মূসার দোয়া ছাড়া ফিরে যায়নি।

ঠিক তার ঘোষণা মোতাবেক রক্তের আযাব দেখা দেয়। যার ফলে সমস্ত নদীনালা, কূপ, ঝর্ণাসমূহ, দিঘী এবং হাউজের পানি রক্তে পরিণত হয়, মাছ মরে যায়, সর্বত্র পানির আধারে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় এবং পুরো এক সপ্তাহ পর্যন্ত মিশরের মানুষ পরিস্কার পানির জন্য তড়পাতে থাকে। এ বিপদও কেবল তখনই কেটে যায় যখন তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হযরত মূসাকে দিয়ে দোয়া করানো হয়।

ফেরাউন ও তার জাতির নেতাদের হঠকারিতার মাত্রা পরিমাপ করা যায় এভাবে যে, যখন তারা আল্লাহর আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মূসাকে দিয়ে দোয়া করাতে চাইতো তখনও তারা তাঁকে নবী বলে সম্বোধন না করে যাদুকর বলেই সম্বোধন করতো। অথচ যাদুর তাৎপর্য তারা জানতো না, তা নয়। তাছাড়া এ কথাও তাদের কাছে গোপন ছিল না যে, এসব অদ্ভুত কর্মকাণ্ড কোন প্রকার যাদুর সাহায্যে সংঘটিত হতে পারে না। একজন যাদুকর বড় জোর যা করতে পারে তা হচ্ছে, একটি সীমিত পরিসরে যেসব মানুষ তার সামনে বর্তমান থাকে সে তাদের মন-মস্তিষ্কের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে তারা মনে করতে থাকে, পানি রক্তে পরিণত হয়েছে, অথবা ব্যাঙ উপচে পড়ছে কিংবা পঙ্গপালের ঝাঁক ক্রমে এগিয়ে আসছে। এই সীমিত পরিসরের মধ্যেও পানি বাস্তবিকই রক্তে পরিণত হবে না। বরং ঐ পরিসর থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই পানি–পানিতে পরিণত হবে। বাস্তবে কোন ব্যাঙ সৃষ্টি হবে না। যদি সেটিকে ধরে ঐ গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে তা ব্যাঙের বদলে হবে শুধু বাতাস।

পঙ্গপালের ঝাঁকও হবে শুধু মনের কল্পনা। তা কোন ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করতে পারবে না। এখন কথা হলো, একটা গোটা দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়া, কিংবা সমগ্র দেশের নদী-নালা. ঝর্ণা এবং কূপসমূহ রক্তে পরিপূর্ণ হওয়া অথবা হাজার হাজার মাইল এলাকা জুড়ে পঙ্গপালের আক্রমন হওয়া এবং লাখ লাখ একর জমির ফসল ধ্বংস করা। আজ পর্যন্ত কখনো কোন যাদুকর এ কাজ করতে সক্ষম হয়নি এবং যাদুর জোরে কখনো তা সম্ভবও নয়। কোন রাজা-বাদশাহর কাছে এমন কোন যাদুকর থাকলে তার সেনাবাহিনী রাখার এবং যুদ্ধের বিপদাপদ সহ্য করার প্রয়োজনই হতো না। যাদুর জোরেই সে গোটা দুনিয়াকে পদানত করতে পারতো। যাদুকরদের এমন শক্তি থাকলে তারা কি রাজা-বাদশাহদের অধীনে চাকরি করতো? তারা নিজেরাই কি বাদশাহ হয়ে বসতো না?

এখানে প্রশ্ন হলো, আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফেরাউন ও তার সভাসদরা হযরত মূসার কাছে যখন দোয়ার জন্য আবদেন করতো তখনো তারা তাঁকে 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন

করতো কি করে? বিপদের সময় সাহায্য প্রার্থনাকারী তো তোষামোদ করে থাকে, নিন্দাবাদ নয়। এর জবাব হলো, তাদের কাছে যাদু ছিল একটি মিথ্যা জিনিস। আর এ কারণেই তারা হযরত মূসার বিরুদ্ধে যাদুর অভিযোগ আরোপ করে তাঁকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করতো।

আবার প্রশ্ন জাগে, দোয়ার জন্য আবেদন জানানোর সময়ও যখন তারা প্রকাশ্যে হযরত মূসার অমর্যাদা করতো তখন তিনি তাদের আবেদন গ্রহণই বা করতেন কেন? এর জবাব হচ্ছে, হযরত মূসার লক্ষ্য ছিল আল্লাহর নির্দেশে ঐ সব লোকদের কাছে 'ইতমামে হুজ্জত' বা যুক্তি-প্রমাণের চূড়ান্ত করা। আযাব দূরীভূত করার জন্য তাঁর কাছে তাদের দোয়ার আবেদন করাই প্রমাণ করছিলো যে, আযাব কেন আসছে কোথা থেকে আসছে এবং কে তা দূর করতে পারে মনে মনে তারা তা উপলব্ধি করেছিলো।

কিন্তু এত কিছুর পরও যখন তারা হঠকারিতা করে তাঁকে যাদুকর বলতো এবং আযাব দূর হবার পর সঠিক পথ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো তখন মূলত তারা আল্লাহর নবীর কোন ক্ষতি করতো না। বরং নিজেদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাকে আরো বেশি জোরালো করে তুলতো। আর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা করে দিয়েছিলেন তাদের সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন করার মাধ্যমে। তাঁকে তাদের যাদুকর বলার অর্থ এ নয় যে, তারা সত্যিই মন থেকেও বিশ্বাস করতো, তাদের ওপর যেসব আযাব আসছে তা যাদুর জোরেই আসছে। তারা মনে মনে ঠিকই উপলব্ধি করতো যে এগুলো সবই বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর নিদর্শন। কিন্তু জেনে শুনেও তা অস্বীকার করতো। সূরা নামলে এ কাথাটিই বলা হয়েছে, 'তারা মনে মনে বিশ্বাস করে ফেলেছিলো। কিন্তু জুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এসব নিদর্শন অস্বীকার করতো।'

বাতিল শক্তির দাপট দেখে অনেক সময় কোন কোন মানুষ এই ভুলে নিমজ্জিত হয় যে, কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কখনো কোনদিনই বিজয়ী হবে না। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের অবস্থার দিকে তারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই তাদের ভুল ভেঙ্গে যাবে। চরম প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে থেকেও হযরত মুসা তাঁর আন্দোলন পরিচালিত করেছেন। তাঁর এই দোয়ার মধ্য দিয়েই তা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। সূরায়ে ইউনুসে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً...اِلَى اٰخِرِالاٰيَةِ

মূসা দোয়া করলো, 'হে আমাদের পরোয়ারদেগার! তুমি ফেরাউন ও তার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছো। হে রব! এটা কি এই জন্য যে, তারা লোকদেরকে তোমার পথ হতে গুমরাহ করে অন্য দিকে নিয়ে যাবে? হে রব! এদের ধন-ঐশ্বর্য ধ্বংস করে দাও এবং তাদের মনের উপর এমন 'মোহর' মেরে দাও, যেন তারা ঈমান আনতে না পারে-যতক্ষণ না পীড়াদায়ক আযাব দেখতে পায়। আল্লাহ তা'আলা জওয়াবে বললেন, 'তোমাদের দু'জনেরই দোয়া কবুল করা হয়েছে। দৃঢ় মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না।' (ইউনুস-৮৮-৮৯)

অর্থাৎ জাঁক-জমকও সাজ-সজ্জা, সভ্যতা-সংস্কৃতির যে চাকচিক্যের কারণে পৃথিবীতে মানুষ তাদের ও তাদের অনুসৃত নিয়ম-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং প্রতিটি ব্যক্তিই তাদের মত হতে চায়। হে আমাদের রব! তুমি ফেরাউন ও তার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-মাল দিয়া ধন্য করেছো। হে রব! এটা কি এই জন্য যে, তারা লোকদেরকে তোমার পথ হতে গুমরাহ করে অন্য দিকে নিয়ে যাবে–অর্থাৎ উপায়-উপাদানের যে প্রাচুর্যের

কারণে তারা নিজেদের কর্ম কৌশলকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পায় আর যা না থাকার কারণে দ্বীনি আন্দোলনের লোকেরা নিজেদের কর্ম-কৌশলকে কার্যকর করতে অসমর্থ থেকে যায়।

ধারণা করা যায়, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মিশরে অবস্থানের একেবারে শেষকালে এই দোয়া করেছিলেন; তখন বলেছিলেন, যখন বারবার আল্লাহর নিদর্শন দেখে নেয়া ও দ্বীনের প্রমাণ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গ সত্য দ্বীনের শত্রুতায় চরম হঠকারিতার সাথে অটল হয়ে বসেছিল। এই ধরনের অবস্থায় নবী যে বদ দোয়া করেন, তা ঠিক তাই হয়, যা কুফরী নীতিতে অবিচল লোকদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন। অর্থাৎ এরপর ঈমান আনার আর কোন সুযোগই আল্লাহ তা'আলা কাউকে দেন না।

হযরত মূসার দোয়ার জবাবে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, 'দৃঢ় মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে'-অর্থাৎ যারা প্রকৃত ব্যাপার জানেনা, আল্লাহ তা'আলার কল্যাণ ব্যবস্থার নিগূঢ় তত্ত্বও বুঝতে পারেনা, তারা বাতিল আদর্শের শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে এবং হকপন্থীদের অসহায় অবস্থা দেখে ধারণা করে যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলাই চান যে, ইসলাম বিরোধী লোকেরাই দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী হয়ে থাকুক আর স্বয়ং আল্লাহই হকপন্থীদেরকে কোনরূপ সাহায্য-সহায়তা করতে ইচ্ছুক নন। এরপর দ্বীনি আন্দোলনের স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তই করে বসে যে, আসলে সত্য দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করাই অর্থহীন। এখন বরং সামান্য কিছু দ্বীনদারী-যা কুফর ও কাফিরী রাজত্বের অধীনেও চলতে পারে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারী লোকদেরকে এই ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকার জন্য তাকীদ করছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলছেন, এই চরম অসুবিধা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই কাজ করে যাও অপরিসীম ধৈর্য সহকারে। এই ধরনের অবস্থায় সাধারণত জাহিল ও অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের মনে যেসব ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, তোমাদের যেন তা কখনও না হয়।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিথ্যা শক্তির ধ্বজাধারীরা সত্য কবুল করলো না। সব কিছুর শেষে তিনি নির্যাতিত বনী ইসরাঈলীদের সাথে নিয়ে মিশর ত্যাগ করার জন্য আল্লাহর আদেশে প্রস্তুত হয়েছিলেন। বনী ইসরাঈলের জনবসতি মিশরের কোন এক জায়গায় একসাথে ছিল না বরং দেশের সমস্ত শহরে ও পল্লীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বিশেষ করে মামফিস থেকে রাম্‌সিস পর্যন্ত এলাকায় তাদের বৃহত্তর অংশ বসবাস করতো। এ এলাকা জুমান নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং হযরত মূসাকে যখন হুকুম দেয়া হয়েছিল যে, তোমাকে এবার বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে বের হয়ে যেতে হবে, তখন সম্ভবত তিনি দেশের সমস্ত বনী ইসরাঈলী বসতিতে সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে হিজরত করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য হয়তো একটি রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সে রাতে প্রত্যেক জনপদের মুহাজিরদের বের হয়ে পড়তে হবে। কি অবস্থার ভেতর দিয়ে বনী ইসরাঈলীরা মহান আল্লাহর রহমতের ছায়ায় ফেরাউনের অত্যাচার হতে মুক্তি লাভ করেছিল এবং সাগর পাড়ি দিয়েছিল মহান আল্লাহ তা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। সূরা ত্ব-হা-য় বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا..اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةُ

আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম যে, এবার রাতারাতি আমার বান্দাদের নিয়ে বের হয়ে পড়ো এবং তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনা সড়ক বানিয়ে নাও। কেউ তোমাদের কিছু নেয় কিনা সে ব্যাপারে একটুও ভয় করো না এবং (সাগরের মাঝখান দিয়ে পার হতে গিয়ে) শংকিত হয়ো না। পেছন থেকে ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে পৌছলো এবং তৎক্ষণাৎ সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো যেমন ছেয়ে যাওয়া সমীচীন ছিল। ফেরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কোন সঠিক পথ দেখায়নি। (সূরা ত্বা-হা-৭৭-৭৯)

এ সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ রাতে সমস্ত ইসরাঈলী ও অইসরাঈলী মুসলমানদের (যাদের জন্য ব্যাপক অর্থবোধক "আমার বান্দাদের' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) মিশরের সকল এলাকা থেকে হিজরত করে বের হয়ে পড়ার কথা ছিল। তারা সবাই একটি পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়ে একটি কাফেলার আকারে রওয়ানা হলো। এ সময় সুয়েজ খালের অস্তিত্ব ছিল না। লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটাই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সে এলাকার সকল পথেই চিল সেনানিবাস। ফলে সেখান দিয়ে নিরাপদে অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না। তাই হযরত মূসা লোহিত সাগরের পথ ধরলেন। সম্ভবত তাঁর পরিকল্পনা ছিল, সাগরের তীর ধরে এগিয়ে সিনাই উপদ্বীপের দিকে চলে যাবেন। কিন্তু সেদিক থেকে ফেরাউন একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ঠিক এমন সময় পৌছে গেলো যখন এ কাফেলা সবেমাত্র সাগরের তীরে উপস্থিত হয়েছিল। সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, মুহাজিরদের কাফেলা ফেরাউনের সেনা দল ও সমুদ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও হয়ে গিয়েছে, ঠিক এমনি সময় মহান আল্লাহ হযরত মূসাকে হুকুম দিলেন, 'সমূদ্রের ওপর তোমার লাঠি মারো।'

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'তখনই সাগর ফেটে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা একটি বড় পর্বত শৃংগের মতো দাঁড়িয়ে গেলো।'

আর মাঝখান দিয়ে শুধু কাফেলার পার হয়ে যাবার পথ তৈরি হয়ে গেলো না বরং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মাঝখানের এ অংশ পায়ে চলা প্রশস্ত পথের আকার ধারণ করলো। এটি সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য মু'জিযার বর্ণনা। এ থেকে যারা একথা বলে থাকেন যে, ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাবে বা জোয়ার ভাটার ফলে সমুদ্রের পানি সরে গিয়েছিল তাদের কথার গলদ সহজেই ধরা পড়ে। কারণ, এভাবে যে পানি সরে যায় তা দু'দিকে পর্বত শৃংগের মতো খাড়া হয়ে থাকে না এবং মাঝখানের পানি বিহীন অংশ শুকিয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে যায় না।

সূরা শূ'আরায় বলা হয়েছে, মুহাজিরদের সাগর অতিক্রম করার পর পরই ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ সমুদ্রের বুকে তৈরি হওয়া এ পথে নেমে পড়লো। কোরআনে আরো বলা হয়েছে, সমুদ্র তাকে ও তার সেনাদেরকে ডুবিয়ে মারলো। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল সমুদ্রের অন্য তীর থেকে ফেরাউন ও তার সেনাদলকে ডুবে যেতে দেখছিল।

অন্যদিকে সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, ডুবে যাবার সময় ফেরাউন চিৎকার করে উঠলো, 'আমি মেনে নিয়েছি যে আর কোন ইলাহ নেই সেই ইলাহ ছাড়া যাঁর প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমিও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।' কিন্তু এ শেষ মুহূর্তের ঈমান গৃহীত হয়নি এবং জবাব দেয়া হলো, 'এখন ঈমান আনছো? আর ইতিপূর্বে এমন অবস্থা ছিল যে, নাফরামানীতেই ডুবে ছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেই চলছিলে। বেশ আজ আমি তোমার লাশটাকে রক্ষা করছি, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।'

এই ইতিহাস শোনানোর মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে এবং যে জাতি ইসলাম বিমুখ নেতাদের অনুসরণ করে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে এই মর্মে যে, তোমাদের সরদার ও নেতারাও তোমাদের সে একই পথে নিয়ে যাচ্ছে যেপথে ফেরাউন তার জাতিকে নিয়ে যাচ্ছিল। এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নাও যে, এটা কোন সঠিক পথ নির্দেশন ছিল না।

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর জাতি যে সময় গোপনে হিজরত করে মিশর ত্যাগ করছিল, সে সময় ফেরাউন তার সঙ্গী সাথীসহ বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করেছিল। মহান আল্লাহ হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর জাতিকে কিভাবে রক্ষা করলেন এবং জালিম শাহি ফেরাউন ও তার দলবলের কিভাবে সলিল সমাধি ঘটালেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ-فَلَمَّاتَرَاءَالْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى.اِلٰى اٰخِرِالاٰيَةُ

সকাল হতেই তারা এদের পিছু নিয়ে বের হয়ে পড়লো। দু'দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথীরা চিৎকার করে উঠলো, 'আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম।' মূসা বললো, 'কক্ষনো না, আমার সাথে আছেন আমার রব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন।' আমি মূসাকে অহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, 'মারো তোমার লাঠি সাগরের বুকে।' সহসাই সাগর দীর্ণ হয়ে গেলো এবং তার প্রত্যেকটি টুকরা হয়ে গেলো এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো। সে জায়গায়ই আমি দ্বিতীয় দলটিকেও নিকটে আনলাম। মূসা ও তার সমস্ত লোককে যারা তার সংগে ছিল আমি উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। এ ঘটনার মধ্যে আছে একটি নিদর্শন কিন্তু এদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তোমার রব পরাক্রমশালীও আবার দয়াময়ও। (সূরা শু'আরা-৬০-৬৮)

হযরত মূসার লাঠির আঘাতে সমুদ্রে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। এ কাজটি একদিকে বনী ইসরাঈলের সমগ্র কাফেলাটির সাগর অতিক্রম করার জন্য করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে এর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সমস্ত সৈন্য সামন্তকে ডুবিয়ে দেয়া। এ থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, লাঠির আঘাতে পানি বিশাল উঁচু পাহাড়ের আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং এতটা সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল, যতটা সময় লেগেছিল লক্ষ লক্ষ বনী ইসরাঈল তার মধ্যে দিয়ে সাগর অতিক্রম করতে। তারপর ফেরাউনের সমগ্র সেনাবাহিনী তার মাঝখানে পৌছে গিয়েছিল। এ কথা সুস্পষ্ট যে, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে যে ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয় তা যতই তীব্র ও বেগবান হোক না কেন তার প্রভাবে কখনো সাগরের পানি এভাবে বিশাল পাহাড়ের মতো এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। সূরা ত্বা-হা-এ বলা হয়েছে, 'তাদের জন্য সমুদ্রের বুকে শুকনো পথ তৈরি করে দাও।'

এর অর্থ দাঁড়ায়, সাগরের ওপর লাঠির আঘাত করার কারণে কেবল সাগরের পানি ফাঁক হয়ে গিয়ে দু'দিকে পাহাড় সমান উঁচু হয়ে যায়নি বরং মাঝখানে যে পথ বের হয় তা শুকনো খটখটেও হয়ে যায় এবং কোথায় এমন কোন কাদা থাকেনি যার ওপর দিয়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয়। এ সংগে সূরা দু'খানের ২৪ আয়াতও প্রণিধানযোগ্য যেখানে আল্লাহ হযরত মূসাকে নির্দেশ দেন, সমুদ্র অতিক্রম করার পর 'তাকে এ অবস্থার ওপরই ছেড়ে দাও, ফেরাউনের সেনাদল এখানে নিমজ্জিত হবে।'

এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা সমুদ্রের অপর পারে উঠে যদি সমুদ্রের ওপর লাঠির আঘাত করতেন, তাহলে উভয় দিকে খাড়া পানির দেয়াল ভেংগে পড়তো এবং সাগর সমান

হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন, যাতে ফেরাউনের সেনাদল এ পথে নেমে আসে এবং তারপর পানি দু'দিক থেকে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। এটি একটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন মু'জিযার বর্ণনা। যারা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের আওতায় এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাদের চিন্তার গলদ এ থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন, 'এ ঘটনার মধ্যে আছে একটি নিদর্শন কিন্তু এদের অধিকাংশ মান্যকারী নয়'-অর্থাৎ হঠকারী লোকেরা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ দেখেও কিভাবে ঈমান আনতে অস্বীকার করে যেতে থাকে এবং তারপর এ হঠকারিতার ফল কেমন ভয়াবহ হয়। ফেরাউন ও তার জাতির সমস্ত নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার সেনার চোখে এমন পট্টি বাঁধা ছিল যে, বছরের পর বছর ধরে যেসব নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়ে আসা হয়েছে সেগুলো তারা উপেক্ষা করে এসেছে, সবশেষে পানিতে ডুবে যাবার সময়ও তারা একথা বুঝলো না যে, সমুদ্র ঐ কাফেলার জন্য ফাঁক হয়ে গেছে, পানি পাহাড়ের মতো দু'দিকে খাড়া হয়ে আছে এবং মাঝখানে শুকনা রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও তাদের জ্ঞানোদয় হলো না যে, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে এবং এহেন শক্তির সাথে তারা লড়াই করতে যাচ্ছে। তাদের চেতনা জাগ্রত হলো এমন এক সময় যখন পানি দু'দিক থেকে তাদেরকে চেপে ধরেছিল এবং তারা আল্লাহ গযবের মধ্যে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। সে সময় ফেরাউন চিৎকার করে উঠলো-

قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'আমি ঈমান আনলাম এই এই মর্মে যে, বনী ইসরাঈল যে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।' (ইউনুস ৯০ আয়াত)

অন্যদিকে ঈমানদারদের জন্যও এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। সেটি হচ্ছে, জুলুম ও তার শক্তিগুলো বাহ্যত যতই সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিক না কেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য, সহায়তায় দ্বীনি আন্দোলন এভাবেই বিজয়ী হয় এবং মিথ্যার শির এভাবেই নত হয়ে যায়। ইসলামকে যারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদেরকে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, অন্ধকার যতো গভীর হয়, রাতের আঁধার যতো বেশী হবে সূর্যের আগমন ততো দ্রুত হয়। সুতরাং জুলুমের অন্ধকার দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। কেননা অন্ধকারের পরেই রয়েছে আলোর পথ।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি ফেরাউনের লাশ রেখে দিয়েছি, কিয়ামত পর্যন্ত এই ঘটনা জীবন্ত সাক্ষী হয়ে থাকবে, যে শক্তি আমার বিধানের সাথে অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে, যারা দ্বীনি আন্দোলনের সাথে এমন বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা পালন করবে, তাদের শেষ পরিণতি তোমরা দেখে নাও। পৃথিবীতে যারা ছোট ছোট ফেরাউন গজাবে, তাদের পরিণতিও এমনই হবে। কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, মানুষ ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করেনা।

যে মিশরের বুকে এই ঘটনা ঘটেছিল, যে মিশরেই ফেরাউনের লাশ রক্ষিত রয়েছে, সেই মিশরের বুকেই ইসলামের সাথে চরম ধৃষ্টতামূলক আচরণ করা হয়েছে। শাসক গোষ্ঠী ইসলামকে সহ্য করতে প্রস্তুত হচ্ছে না। ইসলামকে যারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ময়দানে কাজ করছে, তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে আবদ্ধ করা হচ্ছে। তাদের ওপরে অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে। ফাঁসির রশি তাদের কণ্ঠে পরিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের জালিমদের লক্ষ্য করেই মহান আল্লাহ বলেছেন, যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি চরম গাফিলতির আচরণ দেখাচ্ছে। আল্লাহ বলেন-

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَفَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ.....اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةِ

আর আমি বনী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে নিলাম! ঐদিকে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পেছনে ছুটে চললো; শেষ পর্যন্ত ফেরাউন যখন ডুবে যেতে লাগলো, তখন বলে উঠলো, 'আমি মানছি যে, প্রকৃত ইলাহ তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যার প্রতি বনী-ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। (জওয়াব দেওয়া হলো) 'এখন ঈমান আনছো, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করবো, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপদেশ লাভের প্রতীক হয়ে থাকো। যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি চরম গাফিলতির আচরণ দেখাচ্ছে। (সূরা ইউনুস-৯০-৯২)

সীনা উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে ফিরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। স্থানটি এখনও বর্তমান রয়েছে। বর্তমানে এই স্থানকে বলা হয় 'ফেরাউন পর্বত'। এই পর্বতের কাছে একটি উষ্ণ কূপ রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই কুপকে 'ফেরাউনের হাম্মাম' বা 'ফেরাউনের স্নানাগার' বলে। এই কুপ আবু যনীমা নামক স্থান হতে কয়েক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা নির্দিষ্টভাবে বলে যে, এখানেই ফেরাউনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল। সাগরে ডুবে মরা ফেরাউন যদি সেই 'মুনফাতা' ফেরাউনই হয়ে থাকে, যাকে 'মূসার ফেরাউন' বলা হয়েছে, তা হলে তার লাশ বর্তমানে কায়রো'র যাদুঘরে রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটন ইলিয়ট স্মীথ এই মমি'র ওপর থেকে যখন আচ্ছাদন খুলে ফেলেছিলেন, তখন সেই লাশের ওপর লবনের একটা পুরু স্তর জমে থাকতে দেখা গিয়েছিল। লাশের ওপর লবনের স্তর লবনাক্ত পানিতে ডুবে মরার এক বাস্তব প্রমাণ।

আলোচ্য সূরার ২৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার তথা তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত অস্বীকার করার পরিণামে ফেরাউন ও তার অনুসারীরা পৃথিবী ও আখিরাতের আযাবে নিপতিত হলো। পৃথিবীতে তারা যে শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল, তা ছিল সাগরে নিমজ্জিত হওয়া। পরকালে তারা কি ধরনের আযাবের সম্মুখীন হয়েছে, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন–

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا-وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّعَةُ اَدْخِلُوْا..اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةِ

আর ফেরাউনের অনুসারীরাই জঘন্য আযাবের চক্রে নিপতিত হয়েছে। জাহান্নামের আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো। (সূরা মু'মিন-৪৬)

অনেকগুলো সহীহ হাদীসে কবরের আযাব নামক বরযখের আযাবের যে উল্লেখ রয়েছে এ আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় আযাবের দু'টি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করছেন। একটি হচ্ছে কম মাত্রার আযাব যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ফেরাউনের অনুসারীদের দেয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় দোযখের আগুনের সামনে পেশ করা হয় আর ঐ আগুন দেখে তারা সর্বক্ষণ আতংকিত হয়ে কাটায় এই ভেবে যে, এ দোযখেই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। এরপর কিয়ামত সংঘটিত হলে তাদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত ভয়ঙ্কর এবং সত্যিকার আযাব দেয়া হবে।

ডুবে মরার সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরকে যে আযাবের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দেখানো হবে ব্যাপারটি শুধু ফেরাউন ও ফেরাউনের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, আপরাধীদের জন্য যে জঘন্য পরিণাম অপেক্ষা করছে, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সবাই সে দৃশ্য দেখতে পায় আর সমস্ত সৎকর্মশীল লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে শুভ পরিণাম প্রস্তুত করে রেখেছেন তার সুন্দর দৃশ্যও তাদেরকে দেখানো হয়। বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তিই ইন্তিকাল করে তাকেই সকাল ও সন্ধায় তার শেষ বাসস্থান দেখানো হতে থাকে। জান্নাতী ও দোযখী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ যে জায়গা দান করবেন, এটা সেই জায়গা।'

২৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের এই ইতিহাসের মধ্যে তাদের জন্য শিক্ষয়ণীয় বিষয় রয়েছে, যারা আল্লাহকে ভয় করে। সেই পরিণতিকে তারা ভয় করে, তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করে ফেরাউন যে নির্মম পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মহান আল্লাহ এই ইতিহাস অবতীর্ণ করে তাদেরকে সতর্ক করেছেন, যারা সে সময় দ্বীনি আন্দোলনের সাথে বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা পালন করছিল।

ফেরাউনের ইতিহাস বর্তমানের ঐসব শাসককে সতর্ক করে দিচ্ছে, যারা আল্লাহর প্রভুত্বের পরিবর্তে নিজেদের প্রভুত্ব গোটা জাতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে। মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা আইন-কানুন দেশের বুকে জারী না করে নিজেদের বানানো বিধান দেশের বুকে জারী করেছে। গোটা জাতিকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করার পরিবর্তে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছে। নিজেদের প্রভুত্ব আর বানানো আইন-বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে দ্বীনি আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, এ কারণে যেসব শাসক গোষ্ঠী ও প্রভুত্বকামী রাজনৈতিক দলসমূহ দ্বীনি আন্দোলনের প্রতি ফেরাউনের মতই আচরণ করতে থাকে, আল্লাহর কোরআন ফেরাউনের ইতিহাস বর্ণনা করে তাদেরকে সতর্ক করছে, তোমাদের মত যুগের ফেরাউনদের পরিণতিও ঐ ফেরাউনের থেকে ব্যতিক্রম হবে না, যে আল্লাহর রাসূল হযরত মূসার কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

২৭ থেকে ৩৩ নম্বর আয়াতে কিয়ামত অস্বীকারকারী ও সন্দেহ পোষণকারীদের লক্ষ্য করে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মত মত সাধারণ রক্ত মাংসে গঠিত মানুষ সৃষ্টি করা কঠিন না ঐ উর্ধ্বজগৎ-আকাশমন্ডলে যেখানে অসংখ্য অদৃশ্য স্তরসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, ভাসমান পাথরের সাম্রাজ্য রয়েছে, বরফের সাম্রাজ্য রয়েছে, তোমাদের কল্পনারও অতীত বিশালাকারের গ্রহ-উপগ্রহ, ছায়াপথ, কোয়াসার, নিহারিকাপূঞ্জ, ব্লাকহোল, অগণিত সৌরজগৎ ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে, আকাশকে আমি ছাদ হিসাবে নির্মাণ করেছি, সমস্ত সৃষ্টিতে সমতা রক্ষা করেছি, রাত ও দিনের আগমন ঘটাচ্ছি, যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ ও ব্যবহার যোগ্য করেছি এবং তার ভেতর থেকে পানি ও উদ্ভিদ বের করে আনছি, তোমাদেরকে নিয়ে যমীন যেন হেলে না যায় এ জন্য পাহাড় সৃষ্টি করেছি, তোমাদের এবং তোমাদের পশুদের খাদ্য দান করছি-এসব সৃষ্টি করা কঠিন কাজ ? অবশ্যই তোমাদের তুলনায় এসব সৃষ্টি করা

অত্যন্ত কঠিন। তোমাদের দৃষ্টিতে এসব কঠিন কাজ যখন আমি অত্যন্ত সহজভাবে সৃষ্টি করেছি, তখন তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কেন কঠিন বলে ধারণা করছো ?

তোমরা এক সময় এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে তারপর তোমাদের দেহের যাবতীয় কিছু এই মাটির সাথে মিশে যাবে, তারপর মাটি, বায়ু, পানি ও আগুনের সাথে মিশ্রিত দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ একত্রিত করে পুনরায় আবার এই দেহ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা কি করে সম্ভব হবে, এ কথা তোমরা কেন ভাবছো ? আকাশ জগতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিয়ে একবার চিন্তা করে দেখো, সেসব জটিল ও কঠিন বিষয় সৃষ্টি করেছি আমি এবং তোমাদেরকেও মৃত্যুর পরে পুনরায় আকার আকৃতি দান করে সৃষ্টি করা আমার পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়।

(ঊর্ধ্ব জগতের জটিল সৃষ্টি, সৃষ্টির সমতা স্থাপন, রাত ও দিনের আগমন, যমীনকে বিস্তীর্ণকরণ এবং তার ভেতর থেকে পানি ও উদ্ভিদ বের করা, যমীনে পাহাড় স্থাপন ও মানুষ আর পশুর জন্য জীবিকা ইত্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'তিনিই রব যিনি অসীম অনুগ্রহশীল' শিরোণাম থেকে 'সুরক্ষিত আকাশ জগৎ' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

৩৪ থেকে ৩৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে, নির্ধারিত দিনে যখন সেই মহাদুর্ঘটনা সংঘটিত হবে অর্থাৎ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন মানুষ তার যাবতীয় কৃত কর্মের কথা স্মরণ করবে। এই পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুই করেছে, তার প্রত্যেকটি কর্মের কথা মানুষের মানস পটে ভেসে উঠবে। একে একে তার মনে হতে থাকবে, নবী-রাসূল, আলেম-ওলামা, দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকরা পৃথিবীতে বারবার এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, এই পৃথিবীতে পথ মাত্র দুটো। একটি শয়তান কর্তৃক প্রদর্শিত ভ্রান্তির পথ-ধ্বংসের পথ আরেকটি হলো সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ। পৃথিবীতে লালসা তাড়িত হয়ে তারা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ ত্যাগ করে শয়তান কর্তৃক প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করে ধ্বংসের গহ্বরে আজ নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে। কোথায় কোনদিন কোন অবস্থায় সে আল্লাহর অপছন্দনীয় অন্যায়মূলক কর্মকান্ড করেছিল, মনের পর্দায় সব ভেসে উঠবে।

ভেসে উঠবে, কিভাবে সে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাজপথে হাত উঁচু করে মিছিল করেছে, শ্লোগান দিয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষাঙ্গনে, শ্রমিক অঙ্গনে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে, বিচারালয়ে, আইন প্রনয়ণের ক্ষেত্রে কিভাবে সে মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধানের পক্ষে কাজ করেছে, তা সবই সেদিন মনে পড়তে থাকবে।

মানুষ এই পৃথিবীতে তখনই আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করে, অন্যায়-অবিচার করে, অপরের প্রতি জুলুম করে, অপরের হক নষ্ট করে, মিথ্যা ও জালিয়াতের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে, মহাসত্যের বিরোধিতা করতে থাকে, যখন আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, আখিরাতের জবাবদিহির প্রতি সন্দেহ পোষণ করে, আখিরাতের তুলনায় এই পৃথিবীর জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর লোক সরাসরি আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করেই এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ, সম্মান, শ্রদ্ধা, পদ অর্জন করার চেষ্টা করে, কেউ আবার ধর্মের আলখেল্লা গায়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে ধোকা দিয়েই তা করে থাকে। বাতিল শক্তি এসব ধর্মীয় লেবাছে আবৃত ব্যক্তিদের সামনে অর্থ আর সম্পদের ভান্ডার খুলে দেয়। তারা অর্থের লোভে দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে থাকে। ফলে

সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। এসব লোকদের চোখের সামনে সেদিন জাহান্নাম উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তারা চাক্ষুষ করে নিজেদের নিকৃষ্ট পরিণতি।

৪০ থেকে ৪১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে পৃথিবীতে করে যাওয়া সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে-এই অনুভূতি যাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল এবং ঐ কথা স্মরণে রেখে যারা পৃথিবীতে যাবতীয় অন্যায়মূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত থেকেছে, তাদের ঠিকানা হবে আল্লাহর জান্নাত।

কিয়ামত সংঘটিত হবার পর সমস্ত মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে এবং তাদের বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। কিন্তু তাদের বিচার হবে কিসের ভিত্তিতে ? সেই ভিত্তির কথাই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে উল্লেখিত কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে দুটো আচরণ আবহমান কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। একশ্রেণীর মানুষের আচরণ এমন হয়ে থাকে যে, সে তার প্রতিপালক আল্লাহ ও পথপ্রদর্শক নবী-রাসূলদের দেখানো পথ ত্যাগ করে শয়তানের দেখানো পথ অনুসরণ করে থাকে এবং যে কোন উপায়ে হালাল-হারামের সীমা বিবেচনায় না এনে সম্ভব-অসম্ভব যে কোন পন্থায় নিজের যাবতীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে থাকে। অর্থ-সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় এরা মরিয়া হয়ে ওঠে। অর্থ-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে তারা এমন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে থাকে যে, এ ক্ষেত্রে তার প্রতিবেশী, সমাজ, দেশ ও জাতি কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যথা থাকে না।

তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পথ উন্মোচন করতে গিয়ে জাতীয় চরিত্র কতটা নিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়, সন্ত্রাস কিভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে, মানুষের সুষ্ঠু চিন্তা-চেতনা কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, মানুষের প্রতি স্বাভাবিক মায়া-মমতা, সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধ কিভাবে বিলীন হয়ে যায়, মানুষ কিভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এসব দিক সে বিবেচনায় না এনে, নিজের হীন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পথ উন্মুক্ত করতে থাকে। নিজের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব দল, সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অনুসারীদের হাতে অস্ত্র উঠিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করে। অবৈধ অর্থের বন্যা বইয়ে দিয়ে যুব সমাজকে বিপথগামী করে। এসবই তারা করে পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, কিন্তু এই চিন্তা তারা করে না, তাদের এসব আচরণের কারণে সমাজ কিভাবে কলুষিত হচ্ছে। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের চিন্তা এদেরকে দিশাহারা করে দেয়। এরা ভুলে যায় তাদের এসব কর্মকান্ডের জবাব একদিন মহান আল্লাহর দরবারে দিতে হবে।

অপর শ্রেণীর মানুষের আরেকটি আচরণ এমন হয়ে থাকে যে, পৃথিবীতে জীবন-যাপন করতে গিয়ে প্রত্যেক পদে তারা এ কথা স্মরণে রাখে যে, 'তাদের প্রতিটি কর্মকান্ডের জন্য আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।' এই অনুভূতি তাদের ভেতরে জাগ্রত থাকে। যখন তারা অন্যের সম্পর্কে বা অন্যের সাথে কথা বলে, তখনও তারা কথার প্রতিটি শব্দ ঐ চেতনা হৃদয়ে শানিত রেখেই কথা বলে যে, তাদের কথার প্রতিটি শব্দের জন্য আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে।

যারা মুমিন, মুত্তাকী তারাও মানবীয় দুর্বলতা উর্ধ্বের কোন সৃষ্টি নয়। এদের ভেতরেও যাবতীয় কামনা-বাসনা বিদ্যমান। কিন্তু তারা নিজেদের কামনা-বাসনা, চাহিদা সমস্ত কিছুকে কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণে রেখে নিয়ন্ত্রণ করে। এরাও অবৈধ পথ অবলম্বন করে পৃথিবীতে

নিজের নেতৃত্ব, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সম্পদের পাহাড় গড়তে পারে, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারে, পৃথিবীর লোভ-লালসা এদেরকেও হাতছানি দেয় কিন্তু তারা এসব থেকে এ জন্যই বিরত থাকে যে, এসব কিছু করে তারা কিভাবে সেদিন মহান আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবে ? আল্লাহর সামনে তারা কি জবাব দিবে ? এই চিন্তা আর চেতনাই তাদেরকে পৃথিবীতে জুলুমমূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত রেখেছে আর এদের জন্যই মহান আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন তাঁর জান্নাত।

ওপরে মানুষের দুই ধরনের আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির চেতনা যাদের হৃদয়ে নেই, এই পৃথিবীতে তারা যে আচরণ করে থাকে, তাদের সেই আচরণই তাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে আর আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির চেতনা যাদের হৃদয়ে জাগ্রত রয়েছে এবং সেই চেতনা অনুযায়ী যারা পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করেছে, তাদেরই সেই চেতনাই পরকালে আল্লাহর জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। এই দুই ধরনের আচরণের মধ্যে মানুষ কোন ধরনের আচরণ করেছে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে সেটাই হবে চূড়ান্ত ফায়সালার ভিত্তি ও মানদন্ড। মহান আল্লাহ এই মানদন্ডের ভিত্তিতেই সেদিন বিচার করবেন, কোন ব্যক্তি নিজের মনের অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে হেফাজত করেছে আর কোন ব্যক্তি তা করতে ব্যর্থ হয়ে পৃথিবীতে আল্লাহর অপছন্দনীয় পন্থায় জীবন পরিচালিত করেছে।

৪২ আয়াত থেকে ৪৫ আয়াত পর্যন্ত মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর কিয়ামত সম্পর্কে সেই সন্দেহমূলক প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্পর্কে তারা আল্লাহর রাসূলকে বলতো, আপনি যে কিয়ামতের কথা বলছেন, সেই দিনক্ষণ কখন এসে উপস্থিত হবে–যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে ? মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে বলতে বলছেন, আপনি বলে দিন যে, কবে তা সংঘটিত হবে-সেই জ্ঞান আল্লাহর কাছে এবং আমি তো শুধুমাত্র সাবধানকারী সেই লোকদের জন্য, যারা কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহি করতে হবে, এই ভয় অন্তরে পোষণ করে।

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর প্রশ্নের ধরন দেখে যেন মনে হয়, তারা প্রকৃত অর্থেই জানতে আগ্রহী, কোনদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। কিয়ামত কোন বছরে, কোন মাসে এবং কোন তারিখে সংঘটিত হবে, এ কথা বলে দিলেও তারা সত্য সত্যই তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করতো, বিষয়টি এমনও নয়। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রাসূল আর তাঁর অনুসারীদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা। এই জন্য তারা বলতো–

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ–

লোকেরা বলে, তোমরা যদি প্রকৃতই সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? (সূরা মূল্‌ক-২৫)

কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে–এই প্রতিশ্রুতি রাসূল দিচ্ছেন আর তারা বলছে, তুমি যদি আসলেই সত্যবাদী হও, তাহলে তার দিন তারিখ আমাদেরকে বলে দাও। আসলে তারা কিয়ামতের সাম্ভাব্যতাকে কল্পনার বিষয়, অলীক ও বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত মনে করতো এবং কিয়ামতকে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করার একটা বাহানা হিসাবেই কিয়ামতের দিন তারিখ সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। এরা ধারণা করতো যে, এই লোকটি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আমরা যে ধরনের

জুলুম অত্যাচার করছি, তাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছি, সে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে, তার প্রতি বাধার সৃষ্টি করছি, আমরা যেন এ ধরনের বাধার সৃষ্টি না করি, এই জন্য লোকটি আমাদেরকে কিয়ামতের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য তারা রাসূলকে বিদ্রূপ করে বলতো, তুমি কিয়ামতের যে প্রতিশ্রুতির কথা আমাদেরকে শুনাচ্ছো, তোমার সেই প্রতিশ্রুতি কবে কোনদিন বাস্তবায়িত হবে, তা আমাদেরকে শুনিয়ে দাও। এদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলতে বললেন–

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ-وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ-

আপনি বলে দিন, এই বিষয়ের জ্ঞান তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। আমি তো শুধু সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র। (সূরা মূল্‌ক-২৬)

রাসূলকে বলতে বলা হলো, কিয়ামত কবে কোন দিন সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কিত জ্ঞান মহান আল্লাহর কাছে রয়েছে। আমার দায়িত্ব হলো সেই দিন সম্পর্কে সাবধান করা। আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি যে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং সে দিনটিকে তোমরা ভয় করো। যেদিন তোমাদের সমস্ত কর্মকান্ডের জবাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। আমার এই সাবধান বাণী শুনে তোমরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও, তাহলে এতে তোমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, আমার রাসূল হলেন কিয়ামতের বিষয়ে সাবধানকারী মাত্র। কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে সেটা জানি একমাত্র আমি। আর আমার রাসূলের সাবধান বাণী শুনে কেবল তারাই কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে, যারা আমাকে ভয় করে। আমাকে যারা ভয় করে না, তারাও রাসূলের সাবধান বাণী শুনবে, কিন্তু তারা নিজেদেরকে সংশোধন করবে না, ফলে তাদের কোন লাভও হবে না।

এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই প্রায় দেশেই জালিম লোকদের অস্তিত্ব বর্তমান। তারা অন্যায়ভাবে অন্য জাতির ওপরে জুলুম করে যাচ্ছে। নিজ জাতির প্রতি অন্যায়-অবিচার করছে। দেশ ও জাতির সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করছে। ব্যভিচারী, মদ্যপ, ছিন্‌তাইকারী, সন্ত্রাসী, আত্মসাতকারী সবাই কিয়ামতের কথা শুনছে, কিন্তু নিজেদেরকে সংশোধন না করে যার যার কর্মকান্ড নিশ্চিন্তে লিপ্ত রয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো, এদের হৃদয়ে আল্লাহর কোন ভয় নেই। যদি ভয় থাকতো, তাহলে কিয়ামতের কথা শোনার পর গর্হিত কর্ম থেকে নিজেদেরকে তারা বিরত রাখতো।

এই সূরার ৪৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যারা কিয়ামত অস্বীকার করতো বা কিয়ামতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করতো, কিয়ামত সংঘটিত হবার পরে তাদেরকে যখন পুনরায় জীবিত করা হবে, তখন তারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ধারণা করবে যে, আমরা পৃথিবীতে বা মৃত্যুর পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতি অল্প সময় অতিবাহিত করেছি।

পৃথিবীর জীবনে যারা মহান আল্লাহ দেয়া বিধান অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করেনি, কিয়ামতের দিনের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে ভয়ে তাদের দেহের রক্ত শুকিয়ে যাবে। এদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا..اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

সেদিন যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং আমি অপরাধিদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে আনবো

যে, তাদের চোখ (আতঙ্কে) দৃষ্টি হয়ে যাবে। তারা পরস্পর চুপিচুপি বলাবলি করবে, পৃথিবীতে বড়জোর তোমরা দশটা দিন অতিবাহিত করেছো। (সূরা ত্ব-হা-১০২-১০৩)

অপরাধিদের সেদিন ভয়ে আতঙ্কে রক্ত শুকিয়ে যাবে এবং তাদের অবস্থা এমন হয়ে যাবে যেন তাদের শরীরে এক বিন্দুও রক্ত নেই। তারা এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত হবে যে, ভয়ে তাদের চোখের মনি স্থির হয়ে যাবে। 'এরা একে অপরকে গোপনে বলতে থাকবে-মৃত্যুর পর থেকে তোমরা এ পর্যন্ত খুবই সামান্য সময় অতিবাহিত করেছো'–আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন লোকজন নিজেদের পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে অনুমান করে নেবে যে, তা ছিল অত্যন্ত অল্প এবং মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে সময়কাল অতিবাহিত হয়ে থাকবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করবেন–

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَسِنِيْنَ-قَالُوْالَبِثْنَايَوْمًا.اِلَى اخِرِالاية

আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত দিন ছিলে? জবাব দেবে, একদিন বা দিনের এক অংশ থেকেছি, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিন। (সূরা মু'মিনূন-১১২-১১৩)

কিয়ামতের প্রতি অবিশ্বাসীদের সামনে পরকালের অনন্ত জীবন থাকবে আর অপরদিকে তারা ফেলে আসা নিজেদের পার্থিব জীবনের ওপর দৃষ্টিপাত করবে। তখন তারা ভবিষ্যতের তুলনায় নিজেদের এই ছেড়ে আসা অতীতকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন মনে করবে এবং তারা অনুমান করতে পারবে যে, তারা নিজেদের অতীত জীবনের অতিতুচ্ছ স্বাদ ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পরকালের এই অনন্ত ভবিষ্যতকে বিনষ্ট করে কতই না নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَثُوْاالاَّسَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ....اِلَى اخِرِالاية

(আজ এই লোকজন পৃথিবীর চাকচিক্যময় জীবন নিয়ে মশগুল হয়ে রয়েছে) আর যেদিন আল্লাহ এদেরকে একত্রিত করবেন তখন (এই পৃথিবীর জীবনই তাদের কাছে মনে হবে) যেন ক্ষণিকের জন্য তারা পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্য অবস্থান করেছিল। (তখন প্রমাণিত হবে যে) প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই লোকেরা যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ সম্ভাবনাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। আসলে তারা কখনই সত্য ও সঠিক পথে ছিল না। (সূরা ইউনুস-৪৫)

কিয়ামতের দিন হযরত আদম আলাহিস্ সালাম থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ মানুষটি পর্যন্ত পুনর্জীবন লাভ করে আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে কবর থেকে উঠে আসবে। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মুমিন ছিল তার মুখেও আল্লাহর প্রশংসা উচ্চারিত হবে আর যে ব্যক্তি কাফির ছিল তার মুখেও আল্লাহর প্রশংসা উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উঠবে এটা তো স্বাভাবিক। কারণ পৃথিবীতে সে ব্যক্তি জীবন পরিচালিত করতে গিয়ে প্রত্যেক পদে একমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করেছে। তার জীবনের লক্ষ্যই ছিল কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা সুতরাং তার মুখে আল্লাহর প্রশংসা উচ্চারিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ করেছিল, আল্লাহকে বিশ্বাস করতো না, তার মুখে কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রশংসা উচ্চারিত হবে কেন?

এর জবাব হচ্ছে, প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিতেই সৃষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহর দাসত্ব করার চেতনা প্রবিষ্ট করা হয়েছে। মানুষ একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্ব করবে, এটাই তার জন্মগত

প্রকৃতি। পৃথিবীতে শয়তানের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে গিয়ে তার আসল প্রকৃতির ওপরে আবরণ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিয়ামতের দিন শয়তানের কোন ধোকা-প্রতারণা চলবে না এ কারণে মানুষ তার আসল প্রকৃতি নিয়ে উত্থিত হবে এবং সেদিন তার আসল প্রকৃতি স্বভাবগতভাবেই আল্লাহর প্রশংসা উচ্চারণ করতে করতে উঠবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيلاً–

যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে করতে তাঁর ডাকের জবাবে বের হয়ে আসবে এবং তখন তেমাদের এই ধারণা হবে যে, তোমরা অল্প কিছুক্ষণ মাত্র এ অবস্থায় কাটিয়েছো। (সূরা বনী ইসরাঈল-৫২)

পৃথিবীতে মৃতুকাল থেকে নিয়ে কিয়ামতের দিনে উত্থান পর্যন্ত এই সময়কাল মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না। তারা মনে করবে, আমরা সামান্য একটু সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার মধ্যে হঠাৎ কিয়ামতের এই ধ্বংস লীলা আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুর সময় থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কত শত সহস্র শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাবে, তারপরেও তারা ধারণা করবে যে, আমরা এই মাত্র ঘুমিয়েছিলাম আর সামান্য সময় পরেই আমাদেরকে জাগিয়ে দেয়া হলো। এই অপরাধীরা পৃথিবীর জীবনেও সত্য অনুধাবন করতে পারতো না, মিথ্যা মতবাদ-মতাদর্শ আঁক্‌ড়ে ধরে থাকতো, মানুষের বানানো মিথ্যা আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ বিরোধী চরিত্রহারা নেতানেত্রীর পেছনে ছুটে বেড়াতো-বড় বড় ডিগ্রী নিয়েও সত্য অনুধাবন করতে পারতো না। কিয়ামতের দিনও এরা সত্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে বলবে, আমরা কিছু সময় মাত্র ঘুমিয়ে ছিলাম আর কিয়ামতের হট্টগোল আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ–مَالَبِثُوْاغَيْرَسَاعَةٍ.اِلَى اخِرِالاية

আর যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন অপরাধীরা শপথ করে বলবে, আমরা মৃতাবস্থায় এক ঘন্টার বেশী সময় পড়ে থাকিনি। এভাবে তারা পৃথিবীতেও প্রতারিত হয়েছে। আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, আল্লাহর কিতাবের বক্তব্য অনুযায়ী তোমরা তো পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত পড়ে থেকেছো এবং আজ সে পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না। (সূরা রুম-৫৫-৫৬)

ঈমানদারগণ পৃথিবীতেও প্রতারিত হয়নি। তারা সত্য চিনেছিল এবং এ কারণেই সে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে, আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে সংগ্রাম করেছে। আর যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন না করে ভিন্ন আন্দোলন করেছে, মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, ইসলামকে মসজিদ, মাদ্রাসায় আর খানকায় আবদ্ধ রাখার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন করেছে, ইসলামকে মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়েছে, কিয়ামতের ময়দানে সময়ের ব্যাপারে তারা যখন ভুল কথা বলবে যে, আমরা সামান্য সময় অতিবাহিত করেছি, তখন কোরআনের অনুসারীরা পৃথিবীতে তাদের সামনে যেমন সত্য উপস্থাপন করতো, সেদিনও তাদের সামনে সত্য উপস্থাপন করে বলবে–'আসলে তোমরা ভুল কথা বলছো। পৃথিবীতে তোমাদের সামনে যখন আমরা আল্লাহর কোরআন থেকে বলেছি যে, কিয়ামত হবে, অতএব

নিজেদেরকে সংশোধন করো, আল্লাহকে ভয় করো, এসো আমাদের সাথে-ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করো, তোমরা আমাদেরকে মিথ্যা মনে করেছো, আমাদেরকে পশ্চাৎপদ, মৌলবাদী, মধ্যযুগীয়, সাম্প্রদায়িক বলেছো, কিয়ামতের বিষয়টিকে উপহাস করেছো, আজ সেই কিয়ামতের দিন। আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, তোমরা আমাদের এই কথা বিশ্বাস করনি, আজ সেই পুনরুত্থানের দিন। তোমরা আজ পুনর্জীবন লাভ করেছো। সময়ের ব্যাপারে তোমরা যে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে, তার প্রকৃত সত্য হলো-তোমরা মৃত্যুবরণ করার পরে এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, অথচ তোমরা মনে করছো যে, খুবই অল্প সময় অতিবাহিত হয়েছে।' মহান আল্লাহ বলেন-

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ...اِلٰى اٰخِرِالاٰيَةُ

তারপর একটি শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রব-এর সামনে উপস্থিত হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে। ভীত হয়ে বলবে, আরে কে আমাদেরকে আমাদের নিদমহল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো? (সূরা ইয়াছিন-৫১-৫২)

আল্লাহর কোরআনের এসব সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় পৃথিবীর জীবন ও আলমে বরযখের জীবন অর্থাৎ-মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত-এই উভয় জীবনকে তারা খুবই সমান্য সময় মনে করবে। পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে তারা এ জন্য এ কথা বলবে যে, নিজেদের আশা-আকাংখা ও কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় একটি নতুন চিরন্তন জীবনে যখন তাদের দৃষ্টি মেলতে হবে এবং যখন তারা দেখবে এই জীবনের জন্য তারা কিছুই পূঁজি হিসাবে আনেনি, তখন চরম আক্ষেপ ও হতাশার সাথে তারা নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখবে এবং ক্ষোভে হতাশায় বলতে থাকবে, কি ভুলটাই না আমরা করেছি! অত্যন্ত অল্প সময়ের আনন্দ আর ভোগ বিলাসের লালসায় নিমজ্জিত হয়ে আমরা এই অনন্ত কালের সুখের জীবন হারালাম! আমরা নিজেরাই নিজেদের চরম সর্বনাশ করেছি।

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের দিনের উত্থান সময়ের জীবনকাল-এই দীর্ঘ সময় তাদের কাছে অতি সামান্য বলে মনে হবে। কারণ আদালাতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে, এই বিষয়টিকে তারা অসম্ভব বলে মনে করতো এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তারা তাদের জীবন পরিচালিত করতো। এভাবেই তারা পৃথিবীর মূল্যবান সময় অবহেলা করে অতিবাহিত করেছে। আর এখন তারা চোখ মেলেই সামনে দেখতে পাবে দ্বিতীয় জীবনে সূচনা। এই জীবনের সূচনাতেই এক মহাপ্রলয়ংকরী শব্দের সাথে সাথেই তারা দেখতে পাবে, তারা এগিয়ে যাচ্ছে আল্লাহর আদালতের দিকে।

কোরআন ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিয়ামত সংক্রান্ত আগাম সংবাদ দিচ্ছেন তা অবশ্যই আসবে, অনিবার্যরূপে সংঘটিত হবে। এ অমোঘ ঘটনা থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। এ যুক্তিটির বিশ্লেষণ এই যে, যে মহাশক্তিমান সত্তা পৃথিবীর ওপর এই বিস্ময়কর ব্যবস্থা সংস্থাপন করেছেন, কিয়ামত সৃষ্টি করতে সেই মহাশক্তি কিছুমাত্র অক্ষম ও অসমর্থ হতে পারেন না। এতে একটি সুস্পষ্ট নিপুণতা, কর্মকুশলতা ও যৌক্তিকতা পরিদৃশ্যমান। পরকাল যে অবশ্যই হবে এবং হওয়া যে একান্তই অনিবার্য তা এরই অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করছে।

কারণ সুবিজ্ঞানী ও কুশলী সত্তার কোন কাজই অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। পরকাল সংঘটিত না হলে এই গোটা বিশ্বলোকরূপী কারখানাটি নিতান্তই অর্থহীন ও তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। পরকালে অবিশ্বাসী মক্কার ইসলামী বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলের কাছে দাবী জানাতো, তুমি যে কিয়ামতের কথা বলে আমাদেরকে ভয় দেখাও, তা আমাদেরকে এনে দেখাও। তাহলে আমরা এর বাস্তবতা মেনে নেবো। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত কোন খেল তামাশার বিষয় নয়। কোন অর্বাচিন তা দেখানোর আবদার করলেই তৎক্ষণাৎ তা ঘটিয়ে দেখানো হবে, বিষয় এমন নয়।

মূলতঃ কিয়ামত সমস্ত মানব জাতি এবং প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের সব মামলা মুকদ্দমার চূড়ান্ত বিচারের দিন। এর জন্য আল্লাহ একটি বিশেষ দিনক্ষণ বহু পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তা সেই পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ই সংঘটিত হবে আর যখন সংঘটিত হবে, তখন তা এমন ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হয়ে আসবে যে, আজ যারা বিদ্রুপ করে তা দেখার জন্য আবদার করছে, তখন তারা দিশেহারা হয়ে যাবে। তারা যে নবীর দেয়া আগাম সংবাদকে তাচ্ছিল্য সহকারে মিথ্যা মনে করে উড়িয়ে দিচ্ছে, কিয়ামতের দিন সে নবীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই তাদের মামলার ফায়সালা করা হবে। তারা নিজেরাই নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন কেমন করে সুসম্পন্ন করেছে, তা সেদিন নিজের চোখেই দেখবে।

আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, মানুষের নিজের ইতিহাস, তাদের নিজেদের জন্ম এবং যে জমির ওপর তারা জীবন যাপন করছে তার নির্মাণ প্রক্রিয়া অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কিয়ামত হওয়া এবং পরকালীন জীবন সংঘটিত হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি কুশলতার অনিবার্য দাবিও সেটাই। মানবীয় ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যে জাতিই পরকালের জীবন অস্বীকার করেছে, তারা শেষ পর্যন্ত চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে পৌঁছেছে। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পরকাল এক মহাসত্য। কারো জীবন ধারা ও আচার আচরণ এর সাথে সাংঘর্ষিক হলে এর অনিবার্য পরিণতি হবে সেই অন্ধের ন্যায় যে সম্মুখ দিক থেকে দ্রুত বেগে আগমনকারী গাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে।

এর আরো একটি তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশাল সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক আইনেরই রাজত্ব নয়। সেই সাথে একটি নৈতিক বিধানও পুরাপুরিভাবে কার্যকর হয়ে আছে আর এই আইনের কারণেই এই পৃথিবীর জীবনে এই কার্যফল প্রদান রীতিটি পূর্ণাঙ্গভাবে সংঘটিত হয়না। এ কারণে বিশ্বলোকে বিরাজমান নৈতিক বিধানের অনিবার্য দাবি হলো, এমন একটা সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন তা পুরাপুরিভাবে কার্যকর হবে।

যেসব ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিফল এই পৃথিবীতে পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হয়নি, দেয়া সম্ভবপর হয়নি, তা সে সময় পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যারা এখানে কৃত অপরাধের শাস্তি লাভ থেকে কোন না কোন ভাবে রক্ষা পেয়েছে, গোপনে অপরাধ করেছে, কোন মানুষ জানতে পারেনি, তারা সবাই সেখানে উপযুক্ত শাস্তি লাভ করবে আর এ জন্যেই এখানে মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর আরেকটি জীবন হওয়া একান্তই অপরিহার্য।

এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম যেভাবে সংঘটিত হয়, তা একটু গভীর ও সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা বিবেচনা করলে এ কথা অস্বীকার করা কারো পক্ষে সম্ভব নয় যে, যে আল্লাহ একটি নগণ্য ও

সামান্য শুক্র বিন্দু থেকে একটি পূর্ণাবয়ব মানবদেহ সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহর পক্ষে সেই মানবদেহটিকে পুনরায় বানানো কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়। মানুষ যে যমীনে গোটা জীবন অতিবাহিত করে, মৃত্যুর পর মানব দেহের অংশসমূহ সেই যমীন ত্যাগ করে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে পারে না। এর প্রতিটি অংশ প্রতিটি বিন্দু এই পৃথিবীতেই বর্তমান থাকে। এই যমীনের সম্পদ ও উপকরণ থেকেই তা গড়ে ওঠে, লালিত পালিত ও স্ফীত-সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এরপর তা এই যমীনের ভান্ডারে সঞ্চিত হয়ে যায়।

যে আল্লাহ প্রথমে একে এই যমীনের ভান্ডার থেকে বের করে এনেছিলেন, তা এখানে সঞ্চিত হওয়ার পর পুনরায় তাকে বের করে আনা সেই আল্লাহর পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়। আল্লাহর অসাধারণ শক্তি সামর্থের পক্ষে এটা যে কিছুমাত্র কঠিন নয়, তা তাঁর কুদরাত সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায়। সেই আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে যে কাজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রয়োগের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা মানুষ যথাযথভাবে ব্যবহার করেছে, না ভুলভাবে ও ভুল পথে ব্যবহার করেছে, তার সম্পূর্ণ হিসেব গ্রহণ ও যাচাই করা আল্লাহর কর্মকুশলতা ও যৌক্তিকতার দৃষ্টিতে একান্তই অপরিহার্য। এই হিসেব নিকেশ না নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসংগত বিবেচিত হতে পারে না।

সূরা আ'বাসা

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৮০

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতে 'আ'বাসা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কোরআন ও হাদীসের গবেষকগণ এই সূরার অবতীর্ণকাল সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এ সূরা মক্কায় দাওয়াতী কাজের সূচনা লগ্নে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার পরে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত করার জন্য তখন তিনি মানুষের ভেতরে দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন। তাঁর দাওয়াতে বেশ কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু যাঁরা ইসলাম কবুল করলেন, তাদের মধ্যে হাতে গোনা সমাজের প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব দু'একজন ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সমাজের সাধারণ শ্রেণীই ছিল সর্বাধিক এবং সমাজে তাদের তেমন কোন প্রভাব ছিল না।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, যে সমাজে আল্লাহর রাসূল ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সে সমাজ ও পরিবেশ ছিল ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কোনক্রমেই ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ইসলামের বিপরীতমুখী সে সমাজের সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারাই ইসলাম কবুল করেছিল, প্রথম দিকে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হলো। সে সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির ধারণা ছিল, ইসলাম তেমন একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না এবং অচিরেই তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি যখন তাদের চিন্তার বিপরীত দেখলো, তখন তারা ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপরে শারীরিক নির্যাতন শুরু করলো। তৎকালীন সমাজের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে লাগলো।

অনুসারীগণ নির্যাতিত হচ্ছে দেখে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং অনুসারীদের নিরাপত্তা দেয়া-এ দুটো বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তিনি প্রচেষ্টা শুরু করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি চিন্তা করলেন, সমাজের প্রভাবশালী লোকজন ইসলাম কবুল করলে গোটা সমাজে এর বিরাট প্রভাব পড়বে এবং এ কারণে ইসলাম যেমন দ্রুত প্রসার লাভ করবে তেমনি যারা ইসলাম গ্রহণ করছে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে। এই লক্ষ্য অর্জনের আশায় আল্লাহর রাসূল তৎকালীন সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মনে বড় আশা-যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতো, তাহলে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম হতো।

আল্লাহর রাসূল এই আশায় কুরাইশ নেতা আবু জেহেল, রাবিয়ার দুই পুত্র উতবা, শাইবা, উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা এবং আল্লাহর রাসূলের আপন চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কাছে এক মজলিসে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে এদের সাথে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কথা বলছিলেন। তাঁর মনে বড় আশা, এসব নেতৃবৃন্দ ইসলাম কবুল করলে বর্তমানে মক্কায় ইসলামের যে দুর্দিন অতিবাহত হচ্ছে, যে কঠিন অবস্থার মোকাবেলা তাঁকে ও ইসলাম গ্রহণকারীদের করতে হচ্ছে, এই চরম অবস্থার অবসান ঘটবে। দ্বীনি আন্দোলনকে তার মঞ্জিলে মকসুদে পৌছানোর জন্য বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে এই বাতিল নেতৃবৃন্দ তাদের ধন-সম্পদ এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-ক্ষমতা ও দাপট দিয়ে দ্বীনি আন্দোলনের গতি পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, প্রবল

বাধা সৃষ্টি করে সমাজের সাধারণ জনগণকে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিমজ্জিত রেখেছে, অপরদিকে এমন ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল তারা বিছিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলামী আদর্শ যেন কোনক্রমেই তার স্বরূপে বিকশিত হতে না পারে।

কোন মানুষের পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে প্রকাশে বা গোপনে ইসলামের কথা বলার সুযোগ না হয়, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের গতি যেন রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মক্কার ইসলাম বিরোধী এসব নেতৃবৃন্দ মক্কার বাইরে প্রভাব বিস্তার করে তাদের পরিচিতজন, আত্মীয়-স্বজন এবং ঘনিষ্ঠজনেদরকে সতর্ক দিয়েছিল, তারা যেন কোনক্রমেই দ্বীনি আন্দোলনের সংস্পর্শে না আসে আর এ ব্যাপারে তারা গোত্রীয় সংহতিকে ব্যবহার করেছিল। কারণ তৎকালীন আরবে গোত্রীয় বন্ধন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, ন্যায় হোক আর অন্যায় হোক, বিষয়টি স্বগোত্রের হলে যে কোন মূল্যে বা যে কোন অবস্থায় তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা দিতেই হবে আর এটাই ছিল আরব সমাজের অন্যতম নীতি।

এই প্রতিকুল পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল মক্কার নেতৃবৃন্দকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও ব্যগ্রতা সহকারে তাদের সামনে ইসলামের সুমহান আদর্শ উপস্থাপন করছিলেন। ঠিক সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে একজন দরিদ্র ও অন্ধ ব্যক্তি রাসূলের ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতার মাঝেই অত্যন্ত আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে নিজের অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন।'

বর্তমান মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন এবং তিনি কতটা ব্যস্ত-আর এই ব্যস্ততাও তাঁর নিজের কোন স্বার্থে নয়-এসব কথা যে ঐ অন্ধ ব্যক্তির একেবারে অজানা ছিল, তা নয়। অবস্থায় রাসূলকে বার বার ডেকে কিছু বলতে চাওয়ায় রাসূলের বাক্যালাপে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিলো। কথার মাঝে কথা বলায় তাঁর কথার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁর কথার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যতা হালকা হয়ে যাচ্ছিলো। এ জন্য আল্লাহর রাসূল অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর মনের এই অসন্তুষ্টি তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারকে রেখাপাত করেছিল-স্বভাবতই সে দৃশ্য সেই অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়নি, কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মনের ও চেহারার অবস্থা দেখলেন।

ইতিহাসে সেই অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তির এভাকে পরিচিতি দেয়া হয়েছে যে, তিনি ইবনে উম্মে মাকতুম নামে পরিচিত ছিলেন। সাবিকুনাল আউয়ালিন-অর্থাৎ প্রথমে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নবুওয়াতের প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রকৃত নাম ছিল আমর অথবা আব্দুল্লাহ অথবা হাছিন। কিন্তু তিনি আপন মায়ের উপাধি সংযোগে ইবনে উম্মে মাকতুম নামেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কায়েস ইবনে যায়েদাহ্ এবং মায়ের নাম ছিল আতিকা। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরার আপন মামা ছিলেন। এই সম্পর্কে হযরত উম্মে মাকতুম ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরার আপন মামাত ভাই। আবার কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরার ফুফাত ভাই। যাই হোক, তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের পরিবারের ঘনিষ্ঠজন। আল্লাহর রাসূলের এই অন্ধ সাহাবী সূরা আবাসা অবতীর্ণ হবার পূর্বে না পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ সম্পর্কে

ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ বিরাজমান। তবে সমস্ত ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি সাবিকুনাল আউয়ালিন তথা প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন-এতে কোন দ্বিমত নেই।

তবে সূরা আবাসা অবতীর্ণ হবার পূর্বে অথবা পরে যখনই তিনি ইসলাম কবুল করুন না কেন, যে প্রেক্ষাপটে তিনি সূরা আবাসা অবতীর্ণ হয়েছে, সে সময়ে যে তাঁর মন ইসলামের প্রতি চরমভাবে আকৃষ্ট ছিল এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নেই। কারণ তাঁর মন ইসলামী আদর্শের জন্য এতটাই ব্যগ্র হয়েছিল যে, তিনি রাসূলের চরম ব্যস্ততা উপেক্ষা করে বারবার তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। ইতিহাসের যেসব সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার কোনটিতে বলা হয়েছে এই সময়ে তিনি ইসলামের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে দরবারের রেসালাতে আগমন করেছিলেন। তিরমিজী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, হযরত উম্মে মাকতুম এসে আল্লাহর রাসূলকে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহি আরশিদ্‌নি' অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল ! আমাকে সত্য ও সঠিক পথ দেখিয়ে দিন।

ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন-তিনি রাসূলের কাছে কোরআনের একটি আয়াতের মর্ম জানতে এসে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহি আল্লামানি মিম্মা আল্লামাকাল্লাহ্' অর্থাৎ 'হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিন।' সুতরাং গবেষকদের এসব বর্ণনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ সময়ে ইবনে মাকতুম তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই সত্য পথ লাভের একমাত্র মাধ্যম বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি এ সময়ে পার্থিব কোন স্বার্থের কারণে এসে আল্লাহর রাসূলের ব্যস্ততার মাঝেই কথা বলে রাসূলের কথার ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন করেননি, বরং তিনি হেদায়াত লাভ ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই এমনটি করেছিলেন। আর এ সময়ে রাসূল যাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছিলেন, ইতিহাসে তাদের নামের যে তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে করে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে একমাত্র রাসূলের আপন চাচা ব্যতীত অন্য সকলেই ছিল ইসলামী আন্দোলনের মারাত্মক শত্রু।

এ কথাও ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই ঘটনা যে সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, সে সময় পর্যন্ত ইসলামের ঐসব শত্রুদের সাথে আল্লাহর রাসূলের সম্পর্কের তেমন অবনতি ঘটেনি, যতটা অবনতি ঘটলে তাদের সাথে সামাজিক মেলমেশার পথরুদ্ধ হয়ে যায়। ইতিহাসের এসব দিক সামনে রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই সূরা ইসলামী আন্দোলনের শিশু অবস্থায় এবং মক্কায় প্রাথমিক দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল, এতে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

এ সূরা যেভাবে শুরু হয়েছে তা পাঠ করলে যেন মনে হয়, একজন দরিদ্র ও জন্মান্ধ কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির তুলনায় আল্লাহর রাসূল তৎকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছিলেন, এটা স্বয়ং আল্লাহর অপছন্দ হলো এবং তিনি এ কারণে তাঁর রাসূলকে সাবধান করছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় শুধু এটা নয়, মহান আল্লাহর কাছে এবং তাঁর ফেরেশ্তাদের কাছে কোন শ্রেণীর মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সর্বাধিক, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কোন শ্রেণীর নাগরিকদেরকে অধিক সম্মান ও মর্যদা প্রদান করবে, এই বিষয়টিই আলোচ্য সূরায় মানব জাতিকে অবগত করা হয়েছে।

মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ। আবার নবী রাসূলদের মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তাঁকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এত অধিক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন যে, অন্য কোন নবীর যেখানে পৌঁছানোর সৌভাগ্য হয়নি অর্থাৎ আল্লাহর আরশে–সেখানে তাঁকে ডেকে নিয়ে সম্মানীত করা হয়েছে। সেখানে কোন ধরনের মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেছেন। সমস্ত নবী-রাসূলদেরকে নাম ধরে আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু তাঁকে কখনো 'হে মুহাম্মাদ' বলে আহ্বান করা হয়নি বরং আহ্বান করা হয়েছে, নবী, রাসূল বা অন্যান্য গুণবাচক শব্দের মাধ্যমে। কদাচিৎ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কোন অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হলে আল্লাহ তাঁকে এভাবে ধমক দিয়ে বলেননি যে, 'কেন তুমি এ কাজ করলে?' বরং বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, কেন তুমি এমনটি করলে?'

যেমন সূরা তওবার ৪৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য অজুহাত পেশ করলো আর আল্লাহর রাসূল তা মেনে নিয়ে তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন। বিষয়টি আল্লাহ পছন্দ করলেন না এবং সাথে সাথে তাঁর প্রিয় রাসূলকে ধমকও দিলেন না, যেমন করে কোন মনিব তার অধিনস্থকে ধমক দেয়। রাসূলের কাছে কৈফিয়তও চাইলেন না, বরং মমতা আর পরম স্নেহবিজড়িত ভাষায় বললেন, 'আ'ফাল্লাহু আ'নকা' অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, কেন আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন?

অর্থাৎ এমন ভদ্রোচিত ভঙ্গিতে করুণা বিগলিত শব্দসমূহের মাধ্যমে তিনি তাঁর রাসূলকে তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়টি অবগত করলেন, যে কোন পাঠকই তা পাঠ করার সাথে সাথেই অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, রাসূলের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ রাসূলের জানার পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়ে তারপর তাঁকে অবগত করা হচ্ছে যে, আপনার দ্বারা যে কাজটি সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল আমার অপছন্দনীয়। ঠিক আলোচ্য সূরাটির শুরুটাও সেই ভঙ্গিতেই উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো। কারণ তাঁর সামনে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে হাজির হলো।'

অর্থাৎ কথাটি এমনভাবে পরিবেশিত হয়নি যে, নবী লোকটিকে দেখে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং অনাগ্রহের সাথে মুখ ফিরিয়ে নিলো।' এভাবে যদি বলা হতো তাহলে সরাসরি নবীকে অভিযুক্ত করে সম্বোধন করা হতো। কিন্তু তা না করে তৃতীয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যে পদ্ধতিতে বলা হয়, ঠিক তেমনিভাবে বলা হয়েছে। সরাসরি বললে নবীর মনে একটা বেদনা সৃষ্টি হতো পারতো, মহান আল্লাহ এটা পছন্দ করেননি যে, তাঁর নবী অন্তরে বেদনা অনুভব করুক। এ জন্য অসন্তুষ্টি ও তিরস্কারের যাবতীয় ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গি এড়িয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর অপছন্দের বিষয়টি নবীর কাছে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, হে নবী ! আপনি অবগত রয়েছেন কি, হয়ত সেই অন্ধ ব্যক্তি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে আমার নৈকট্য লাভ করবে এবং সেটা তার জন্য কল্যাণকর হতো।

যে ব্যক্তি কল্যাণ লাভ করার উদগ্র কামনা নিয়ে আপনার কাছে এলো, অথচ কি আশ্চর্য আপনি তার প্রতি অমনোযোগী রইলেন! যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের কালিমা দূর করে সেখানে

মহাসত্যের আলো প্রজ্জ্বলিত করতে চরম আগ্রহী হয়ে আপনার কাছে ছুটে এলো-তার দৃষ্টিশক্তি নেই, অথচ সে পথ হাতড়ে অতিকষ্টে আপনার কাছে পৌঁছেছিল সত্যের আলোয় আলোকিত হবার উদগ্র কামনা নিয়ে, তার প্রতি আপনি গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দিলেন ঐসব লোকদের প্রতি, যারা ইসলামী আন্দোলনের চরম দুশমন! যারা মুখের ফুঁ দিয়ে আমার দ্বীনের প্রদীপ নির্বাপিত করার লক্ষ্যে সাম্ভাব্য যাবতীয় পথ অনুসন্ধান করে, তাদের প্রতি আপনি আগ্রহ পোষণ করলেন, আর এই লোকগুলোর কারণেই আপনি ঐ লোকটির প্রতি অনাগ্রহী হলেন, যে লোকটি মহাসত্যের পেয়ালা পান করার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল?

যারা আপনার দাওয়াত কবুল করতে আগ্রহী নয়, দৃষ্টি থাকার পরেও যাদের চোখে মহাসত্য উদ্ভাসিত হয় না, অন্তর যাদের কালিমা লিপ্ত, পৃথিবীর জীবনকেই যারা একমাত্র সত্য বলে বিবেচনা করে, যাদের কাছে পবিত্রতার কোন গুরুত্ব নেই, অপবিত্রতার মধ্যে ডুবে থাকতে যারা আগ্রহী, তারা যদি আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, এতে আপনার ক্ষতি কি? তাদের অপরাধের কারণে তো আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। আপনার কর্তব্য ছিল মহাসত্য তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া, আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন, এখন তাদেরকে সেই অবস্থার ওপরে ছেড়ে দিন, যে অবস্থায় তারা রয়েছে। ঐসব ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলে এবং তাদের কারণে ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত হবে, এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ আমার দ্বীন কারো মুখাপেক্ষী নয়, আমি এমন আলো আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি, সে আলো নিজের পথ নিজেই করে নেবে। আপনি শুধু আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব আমার নির্দেশিত পথে পালন করে যান। আমার দ্বীনের প্রতি কেউ সমর্থন করুক আর না-ই করুক, এতে আমার দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।

এ সূরায় ঐ লোকদের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশিত হয়েছে, যারা নিজেদেরকে সমাজ ও দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করে, নিজেদেরকে এলিট শ্রেণী মনে করে। ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত আর প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সাধারণ মানুষদেরকে যারা মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেয় না, তাদেরকে যাবতীয় অধিকার বঞ্চিত বলে ধারণা করে, অহঙ্কারের আবরণে যাদের দৃষ্টি অন্ধ, সত্য যাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এসব লোকদের প্রতি চরম ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজ-দেশে তাদের কামনার সাথে সামঞ্জস্যশীল সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার ঘটায় এবং মহাসত্যের প্রচার-প্রসারে বাধার সৃষ্টি করে। এ কথা চিরসত্য যে, সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকজন যে আদর্শ অনুসরণ করে, সমাজের নীচু শ্রেণীর মধ্যে তা এমনিতেই প্রসার লাভ করে থাকে। আর জন্যই যারা নতুন কোন আদর্শ প্রচার করে, তারা এ প্রচেষ্টা চালায় যে, সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকজন এই নতুন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হোক, তাহলে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তৎকালীন সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করতেন, ঐ লোকগুলো যদি কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হতো, তাহলে আল্লাহর দ্বীন অতি সহজেই বিজয়ী হতো। ইসলাম প্রচারের শুরুতে তিনি যে কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, তার সবটুকুই নিবেদিত ছিল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে। এর ভেতরে এমন কোন দিক ছিল না, যার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ শ্রেণীর লোকদের প্রতি সামান্যতম অবহেলা প্রদর্শন করা হতো। তবুও আন্দোলনের শুরুতে কর্মনীতি ও পদ্ধতির মধ্যে যেটুকু দুর্বলতা বিদ্যমান ছিল, সেই দুর্বলতার প্রতি এই সূরায় অঙ্গুলী সংকেত করে তা দূর করা হয়েছে। সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছিলো,

যেখানে ব্যক্তি স্বার্থের নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে একজন দরিদ্র আর অন্ধ লোকের প্রতি অমনোযোগ প্রকাশ পেলো, এটাও দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত করে তা দূর করে দেয়া হলো।

কারণ এ কথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়া হলো, মহান আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে ব্যক্তি সত্যানুসন্ধিৎসু এবং মহাসত্যের আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করে। সে ব্যক্তি অন্ধ বা দৃষ্টিমান হোক অথবা ধনী বা গরীব হোক, এতে তার ইসলাম প্রদত্ত মর্যাদার কোন তারতম্য হবে না। দ্বীনি আন্দোলন তাদের কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে, যারা সত্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। হতে পারে সে ব্যক্তি সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন, অক্ষম-দুর্বল, হতদরিদ্র। আর যারা বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করেছে, অতুল বৈভবের অধিকারী, অর্থের পাহাড় গড়ে তার উচ্চ শিখরে বসে রয়েছে, সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে যারা অতুলনীয় কিন্তু সত্য বিমুখ, তার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে চেনা ও জানার সামান্যতম আগ্রহ অন্তরে নেই, ইসলামকে মৌলবাদ, সেকেলে, মধ্যযুগীয় বলে উপহাস করে, মহান আল্লাহর মাছির একটা তুচ্ছ পাখার যে গুরুত্ব রয়েছে, এসব লোকদের তা নেই। দ্বীনি আন্দোলনের দৃষ্টিতে এসব লোকদের কোনই গুরুত্ব নেই।

আবু জেহেল, রাবিয়ার দুই পুত্র উতবা, শাইবা, উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা প্রমুখদের অঢেল ধন-সম্পদ ছিল, কারো দেহে কোন ক্রটি ছিল না, দৈহিক সৌন্দর্য ছিল, প্রখর দৃষ্টিশক্তি ছিল। সমাজে তারা উঁচু শ্রেণী হিসাবে সম্মান-মর্যাদা ভোগ করতো। তাদের ইশারায় বিশাল বাহিনী যে কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তো। সব দিক দিয়েই তারা পূর্ণ ছিল–ছিল না কেবল সত্যকে দেখার মতো স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি আর মহাসত্যকে গ্রহণ করার মতো সত্যানুসন্ধিৎসু মন-মস্তিষ্ক। আর জন্মান্ধ ইবনে মাকতুম! তৎকালীন সমাজের উঁচু শ্রেণীর তুলনায় তাঁর কিছু না থাকলেও এমন সম্পদ তাঁর ছিল, যার মাধ্যমে তিনি মহাসত্য গ্রহণ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে চিরদিনে জন্য অতুলনীয় সম্মান আর মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

ইতিহাস কথা বলে, পারস্যের বাতিল শক্তি যখন ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দিল তখন দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পারস্য শক্তিকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী পারস্য সীমান্তে প্রেরণ করলেন। এই বাহিনীতে আল্লাহর রাসূলের জন্মান্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শামিল ছিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকা রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'হয় ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখবো আর না হয় শাহাদাত বরণ করবো।'

তিন দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হলো। পারস্যে ইসলামের বিজয় কেতন স্বগৌরবে উড়তে থাকলো। যুদ্ধের ময়দানে শহীদদের লাশ দাফন করার সময় দেখা গেল, ইবনে মাকতুমের দেহ রক্ত রঞ্জিত। ইসলাম বিরোধী শক্তির তরবারীর আঘাতে তার গোটা দেহ ক্ষত-বিক্ষত। শাহাদাতের শারাবান তহুরা তিনি পান করেছেন, দেহ স্পন্দনহীন কিন্তু ইসলামের পতাকা তিনি রক্তাক্ত বুকে আঁক্‌ড়ে ধরে আছেন। তাওহীদের পতাকা বুকে জড়িয়েই তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। মাতৃগর্ভ থেকে এই সুন্দর শ্যামল বসুন্ধরায় তিনি দৃষ্টিশক্তি নিয়ে আসতে পারেননি। সক্ষম হননি তিনি প্রকৃতির অপরূপ মনোমুগ্ধকর হৃদয়গ্রাহী চিত্তাকর্ষক নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করতে। বঞ্চিত ছিলেন তিনি পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটা দর্শনে। তিমিরাবৃত যামীনির ভ্রমর কৃষ্ণ সূচিভেদ্য

আরণ ভেদ করে তরুণ তপন উদিত হয়ে তার কিরণচ্ছটা দুর্বঘাসে পতিত শিশির বিন্দুগুলোকে কিভাবে মুক্তার মতই ঝলমলিয়ে তোলে–এ দৃশ্য প্রাণভরে অবলোকন করার পার্থিব সৌভাগ্য যদিও তাঁর হয়নি। কিন্তু তিনি এমন এক আলোর সন্ধান লাভ করেছিলেন, যে আলো তাঁর অন্ধ দৃষ্টিকে পদ্মলোচনে পরিণত করেছিল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অবদান–তাঁর হৃদয় পদ্মলোচনের প্রভাময় আলোকচ্ছটা শুভ্র মেঘমালা অতিক্রম করে ঐ দূর নীলিমা ভেদ করে এমন এক জান্নাতী জগতে পৌঁছেছিল, যেখান থেকে তিনি লাভ করেছিলেন মহাসত্যের সন্ধান। পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু সৌন্দর্য দর্শনে তিনি বঞ্চিত থাকলেও ইসলামের অন্তর্নিহিত অপরূপ চিরস্থায়ী সৌন্দর্য রাশি তিনি প্রাণভরে দর্শন করেছেন। এ কারণেই আল্লাহর পথে প্রাণ দেয়ায় অন্ধত্ব তাঁর জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। অন্তরের সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি দিয়ে শাহাদাতের জান্নাতী মাধুরীময় রূপের দ্যুতি তাঁকে জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে পথপ্রদর্শন করেছে। পার্থিব যাবতীয় সমস্যাকে যারা গুরুত্বহীন মনে করে শুধুমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা। সুতরাং যেসব অহঙ্কারী দাম্ভিক ব্যক্তিরা মনে করে যে, দ্বীনি আন্দোলন তাদের সাহায্য-সহযোগিতার ওপরে নির্ভরশীল, এই আন্দোলন তাদের মুখাপেক্ষী, তারা শামিল না হলে বা সাহায্য সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিলে এই আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে, ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তাদের কাছে সাহায্যের জন্য যাওয়া ইসলামকে অপমান করার শামিল।

এই সূরার ১৭ আয়াত থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঐসব লোকদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমরা অস্তিত্বহীন ছিলে, সেখান থেকে তোমাদেরকে আমি অস্তিত্ব দান করেছি। এই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আমি অসংখ্য নেয়ামত দিয়েছি। তোমাদের পশু সম্পদকে টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আমিই করেছি। অথচ তোমরা আমার দেয়া বিধানের মোকাবেলায় বিদ্রোহ করে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে অবৈধ পথে সুখের উপকরণ যোগাড়ে ব্যস্ত রয়েছো। যাদের জন্য এসব করছো, কিয়ামতের দিনে মহাবিপদ অবলোকন করে সেই আপনজনদের কাছ থেকে ছুটে পালাতে থাকবে। সেদিন তোমার নিজের কথা ব্যতীত আর কারো কথা মনেও থাকবে না। পৃথিবীতে যারা আমার বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, সেদিন তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল থাকবে। আর তোমরা যারা আমার বিধানের বিপরীত জীবন পরিচালিত করেছো, তোমাদের চেহারা থাকবে অন্ধকারে আবৃত। সেদিন তোমাদের চেহারাই তোমাদের আল্লাহর বিধান বিরোধী হওয়ার পরিচিতি তুলে ধরবে।

সূরা আ'বাসা-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-৪২-রুকু-২

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ (১) اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى (২) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ (৩) اَوْ

يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى (৪) اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى (৫) فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى (৬)

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى (৭) وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى (৮) وَهُوَ يَخْشٰى (৯)

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى (১০) كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (১১) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ (১২) فِيْ

صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (১৩) مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (১৪) بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ (১৫) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (১৬)

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ (১৭) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ (১৮) مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهٗ

فَقَدَّرَهٗ (১৯) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ (২০) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ (২১) ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ

(২২) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ (২৩) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ (২৪) اَنَّا

صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا (২৫) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا (২৬) فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا (২৭) وَّ

عِنَبًا وَّقَضْبًا (২৮) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا (২৯) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا (৩০) وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا (৩১)

مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ (৩২) فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ (৩৩) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ

مِنْ اَخِيْهِ (৩৪) وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ (৩৫) وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ (৩৬) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ

يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ (৩৭) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (৩৮) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (৩৯)

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (৪০) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (৪১) اُولٰٓئِكَ هُمُ

الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (৪২)

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে

রুকু–১

(১) সে (নবী) ভ্রুকুঞ্চিত করলো, (বিরক্ত হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, (২) এ জন্যে যে, তাঁর সামনে একজন অন্ধ ব্যক্তি এসে হাজির হলো। (৩) তুমি কি জানতে হয়তো সে ব্যক্তিটি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিতো। (৪) (কিংবা) সে এটা স্মরণ করতো এবং তা তার জন্যে হয়তো উপকারীও (প্রমাণীত) হতো। (৫) (অপরদিকে) যে ব্যক্তিটি (হেদায়াতের প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখালো, (৬) তুমি তার প্রতিই (বেশী) মনোযোগ প্রদান করলে! (৭) (অথচ) তোমার ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি যে, তুমি তাকে শুধরে দেবে। (৮) যে ব্যক্তিটি (পরিশুদ্ধির জন্যে) তোমার কাছে দৌড়ে আসলো, (৯) যে ব্যক্তিটি আল্লাহকে ভয় করলো, (১০) তুমি তার থেকেই বিরক্ত হলে! (১১) দেখো, এ (কোরআন) হচ্ছে একটি উপদেশ, (১২) যে চাইবে সেই এটি স্মরণ করবে।

(১৩) যা সম্মানিত পুস্তকসমূহে (সংরক্ষিত) আছে, (১৪) উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও সমধিক পবিত্র। (১৫) এটি সংরক্ষিত (আছে) মর্যাদাবান লোকদের হাতে, (১৬) (তারা) মহান ও পুত চরিত্র সম্পন্ন, (১৭) মানুষের প্রতি অভিসম্পাত! সে তাকেই অস্বীকার করলো। (১৮) (সে কি চেয়ে দেখে না?) আল্লাহ তা'য়ালা কোন্ বস্তু থেকে তাকে পয়দা করেছেন––(১৯) তিনি তাকে একবিন্দু শুক্র থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তার (দেহে সব কিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (২০) তার জন্যে (এখানে) চলার পথসমূহকে আসান করে দিয়েছেন। (২১) (এক পর্যায়ে) তিনি তাকে মৃত্যু দিলেন, তার দেহকে (দীর্ঘকাল ধরে) কবরে রাখার ব্যবস্থা করলেন। (২২) অতপর তিনি যখন চাইবেন তাকে কবর থেকে পুনরায় উঠিয়ে আনবেন।

(২৩) হ্যাঁ, তাকে যা বলা হয়েছে তা সে (কোনদিনই) পালন করেনি, (২৪) মানুষকে তার আহারের দিকেও একবার তাকিয়ে দেখা দরকার। (২৫) আমি (শুকনো ভূমিতে এক সময়) প্রচুর পরিমাণ পানি ঢেলেছি, (২৬) এরপর (সে) যমীনকে বিদীর্ণ করেছি, (২৭) (অতপর) তাতে উৎপন্ন করেছি শস্যদানা, (২৮) আঙ্গুরের থোকা ও রকমারী শাকসবজি, (২৯) (আরো উৎপাদন করেছি) যয়তুন ও খেজুর (সহ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল,) (৩০) শ্যামল ঘন বাগান, (৩১) (রয়েছে) ফলমূল ও ঘাস। (৩২) (এ সবই করা হয়েছে) তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের (জীবিকা নির্বাহের) জন্যে, (৩৩) অতপর যখন (একদিন) বিকট আওয়াজ আসবে,

(৩৪) সেদিন মানুষ তার নিজ ভাইদের কাছ থকে পালাতে থাকবে, (৩৫) (পালাতে থাকবে) তার নিজের মা থেকে নিজের বাপ থেকে, (৩৬) সহধর্মী সহধর্মীনী থেকে–এমন কি তার ছেলেমেয়েদের থেকেও (সেদিন সে পালাতে থাকবে)। (৩৭) তারা (সেদিন) তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কারো কথাই ভাববে না। (৩৮) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা সেদিন উজ্জ্বল হয়ে যাবে। (৩৯) মুখগুলো (তাদের) খুশীতে ভরে উঠবে। (৪০) (অপরদিকে) কিছু সংখ্যক চেহারা হবে (কুৎসিত), তার ওপর (যেন) ধূলাবালি পড়ে থাকবে, (৪১) মলিনতায় তা (সম্পূর্ণ) ছেয়ে যাবে। (৪২) এই লোকগুলোই হচ্ছে (কিতাবের) অস্বীকারকারী এবং এরাই হচ্ছে পাপীষ্ঠ।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার ১ থেকে ১০ নম্বর আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য এই সূরার 'শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়' ভালোভাবে পাঠ করতে হবে। মক্কার ভাগ্য-নির্ধারক বলে যারা নিজেদেরকে মনে করতো এসব নেতৃবৃন্দের কাছে আল্লাহর রাসূল ইসলামের দাওয়াত পেশ করছেন। তাঁর মনে বড় আশা, এসব লোকজন যদি আল্লাহর দ্বীনের পতাকা তলে সমবেত হয়, তাহলে মহাসত্য বিজয়ী হবার পথ সুগম হয়ে যাবে এবং আল্লাহর যমীন শির্ক মুক্ত হবে। সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে সমস্ত কিছুর গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর গোলামী করবে। এই আশা আল্লাহর রাসূল মনে মনে পোষণ করছেন এবং এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ব্যস্ত রয়েছেন। এমন সময় তাঁর কাছে অন্ধ এবং দরিদ্র ব্যক্তি হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে বারবার তাঁর কাছে দ্বীনকে জানার জন্য প্রশ্ন করছেন। এতে করে রাসূলের আলোচনার ধারা ব্যহত হচ্ছে।

এই আগন্তুক যেহেতু রাসূলের সহধর্মিনীর সম্পর্কে ভাই ছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি আল্লাহর রাসূলেরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতেন। সেই চরম ব্যস্ততার মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল হয়ত এ কথাও মনে করে থাকতে পারেন যে, তিনি যেহেতু পরিবারের একজন সেহেতু তাঁর প্রশ্নের জবাব পরে দিলেও চলবে। আর উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সবাইকে একত্রে পাওয়াও সব সময় সম্ভব হয় না। এখন এদেরকে যখন একত্রে পাওয়া গিয়েছে, অতএব সময়ের সদ্ব্যবহার করে নেয়া উচিত। পরে ঐ ব্যক্তি যা জানতে আগ্রহী, তা তাকে জানানো যাবে। এই চিন্তা করেও আল্লাহর রাসূল সে মুহূর্তে হয়তো তাঁর প্রশ্নের প্রতি মনোযোগ দেননি।

অথবা এমনও হতে পারে যে, সে মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল মনে করেছিলেন, এ সময়ে যে লোকগুলোকে আমি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছি, তাদের মধ্য থেকে একজন লোকও যদি আমার দাওয়াতে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়, তাহলে দাওয়াতী কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হবে এবং মক্কার মজলুম মুসলমানরা নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। আর ইবনে মাকতুম একজন অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তি, সমাজে তাঁর তেমন কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। তাঁর এই অক্ষমতা আর দুর্বলতার কারণেই তিনি দ্বীনি আন্দোলনে ততটা অবদান রাখতে সক্ষম হবেন না, যতটা এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে কোন একজন রাখতে সক্ষম। সুতরাং এ সময়ে ঐ অন্ধ ব্যক্তির তুলনায় এই লোকগুলোর সাথে আলোচনার ধারাবাহিকতা অব্যহত রাখা প্রয়োজন। এই চিন্তা করেও হয়ত তিনি সেই মুহূর্তে ঐ অন্ধ ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব দান থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন।

কিন্তু রাসূলের এই আচরণ মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হলো না। সূরা আ'বাসা অবতীর্ণ করে তিনি রাসূলকে জানিয়ে দিলেন, ঐ অন্ধ লোকটির সাথে তাঁর আচরণ গ্রহণীয় নয়। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট করে দেয়া হলো যে, সাধারণ মানুষ যদি কোন ব্যক্তিকে একেবারে তুচ্ছ মনে করে, আর সে ব্যক্তি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়, কুফরীর অন্ধকার পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করার জন্য পাগলপারা হয়ে ওঠে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মর্যাদাবান। এই ধরনের ব্যক্তিদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। আর যারা নিজেদেরকে সমাজের উঁচুস্তরের লোক বলে ধারণা করে এবং সত্যের প্রতি বিমুখ হয়, এমন ধরনের লোকদের আল্লাহর কাছে কোনই গুরুত্ব নেই। ঐ ব্যক্তিই মহান আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত, যে ব্যক্তি কোরআনের রঙে রঙিন হবার জন্য সমস্ত বন্ধন ছিন্ন

করে দু'বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসে, আল্লাহকে যে ব্যক্তি সর্বাধিক ভয় করে, তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। মহান আল্লাহ্ এই বিষয়টি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য স্থায়ী মূলনীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

ঐ অন্ধ ব্যক্তি রাসূলের কাছ থেকে সে মুহূর্তে তাঁর প্রশ্নের জবাব না পেয়ে বাড়িতে চলে গেলেন। অপরদিকে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে সূরা আ'বাসা অবতীর্ণ করলেন। জিবারঈল আমীন সূরা আ'বাসা আবৃত্তি করছেন, আল্লাহর রাসূল নীরবে আবৃত্তি শুনছেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর কোরআন রাসূলের স্মৃতির পাতায় লিপিবদ্ধ করছেন। হযরত জিবরাঈল যখন এই সূরার ১০ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছালেন, তখন দেখা গেলো রাসূলের চেহারা মোবারকে অস্থিরতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অহী গ্রহণ করেই তিনি দ্রুত চলে গেলেন হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের বাড়িতে। আল্লাহর নবী তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে এসে নিজের পবিত্র চাদর মোবারক নিজ হাতে বিছিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সম্মান আর শ্রদ্ধার সাথে বসালেন।

এভাবে করে তাঁর আসন দরবারে রেসালাতে চিরস্থায়ী হয়ে গেলো। আল্লাহর রাসূল তাঁর এই অন্ধ সাহাবীকে অন্যান্য সাহাবীদেরকে দেখিয়ে বলতেন, 'এই ব্যক্তিকে তোমরা মারহাবা বলো, কেননা তাঁর কারণেই স্বয়ং আল্লাহ্ আমাকে উপদেশ দিয়েছেন।' শুধু রাসূলই নয়, রাসূলের গোটা পরিবার এবং অন্যান্য সাহাবীদের কাছে সেই অন্ধ সাহাবীর সম্মান ও মর্যাদা বেড়ে গেলো। রাসূল তাঁকে দেখলেই তাঁর প্রয়োজনের কথা জানতে চাইতেন, তিনি তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেই আল্লাহর রাসূল তা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করতেন। তিনি নবীর বাড়িতে এলেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা মধু আর লেবু দিয়ে তাঁর মেহমানদারী করতেন। স্বয়ং রাসূল তাঁকে হযরত বিলালের সাথে মুয়াজ্জিনুর রাসূল নির্বাচিত করলেন। রমজান মাসে তাঁরই আযান শুনে লোকজন আহার ত্যাগ করতেন। আল্লাহর রাসূল মদীনার বাইরে গমন করলে মদীনায় তাঁর স্থলে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে যেতেন। হযরত ইবনে মাকতুমকে স্বয়ং রাসূল মদীনার বাইরে যাবার সময় নিজের স্থলাভিষিক্ত ও নামাজের ইমাম নিয়োগ করে যেতেন। হাফিজ ইবনে আব্দুল বার বলেন, এভাবে তাঁকে আল্লাহর রাসূল তেরবার তাঁরই প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। হযরত ওমরের শাসনামলে তাঁর জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং অন্ধত্বের কারণে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একজন খাদেম পেয়েছিলেন।

সমাজের অক্ষম, দুর্বল আর গুরুত্বহীন ব্যক্তি যদি সত্য গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয় এবং সত্য প্রচারকারী যদি তার প্রতি কোন গুরুত্ব দিল না এ কারণে যে, তার মত দুর্বল ব্যক্তি কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হলে আন্দোলনের তেমন লাভ-ক্ষতি নেই। অপরদিকে সমাজের উঁচু তলার ব্যক্তিবর্গ-যারা সত্য বিমুখ, তাদের একজনকেও যদি দ্বীনি আন্দোলনে শামিল করা যায় তাহলে আন্দোলনে গতি সঞ্চার হবে-এটা মনে করে তার পেছনে অযথা সময় ব্যয় করতে থাকা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

এ সূরার ১১ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট বলে দেয়া হলো যে, এটা কোনক্রমেই ঠিক নয়। কক্ষণই এমন করা ঠিক নয়। যারা আল্লাহ, রাসূল, পরকাল সমস্ত কিছু ভুলে এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে লিপ্ত রয়েছে, মৃত্যুর পরে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির বিষয়টিকে যারা গুরুত্বহীন ও অসম্ভব বলে মনে করে, তাদের প্রতি ঐ লোকগুলোর তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেয়া

যাবে না, যারা সত্য গ্রহণে ব্যকুল। ইসলাম এমন কোন ঠুনকো আদর্শের নাম নয় যে, যারা তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, তাদের দরজায় ভিখারীর মতো দ্বীনি আন্দোলন গিয়ে দন্ডায়মান হবে। আর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মী-যারা অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে, সময় কোরবান করছে, প্রয়োজনে নিজের প্রিয় প্রাণটাও দিয়ে দিচ্ছে, তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশী। সুতরাং এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ দুনিয়া পুজারিদের সামনে গিয়ে ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করানোর জন্য ধর্ণা দিতে থাকবে, এটাও ঠিক নয়।

বিষয়টি এমনও নয় যে, তারা ইসলামের দাওয়াত পায়নি। ইসলামের দাওয়াত তারা পেয়েছে। চোখের সামনে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের সর্বোন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি দেখছে, অন্য লোকদের তুলনায় দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখছে। তারপরও তারা দ্বীনি আন্দোলনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছে, পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়ে তা অনুসরণ করছে।

তারপর ১২ থেকে ১৬ নং আয়াতসমূহে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কোরআন হচ্ছে একটি উপদেশ এবং যে আগ্রহী হবে, সে ব্যক্তি এই কোরআন থেকে হেদায়াত লাভ করবে। এটা সম্মানিত পুস্তকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এবং পবিত্র। এটা সংরক্ষিত থাকে মর্যাদাবান লোকদের হাতে এবং সেসব লোক মহান ও পূতঃ চরিত্র সম্পন্ন। এই কোরআন মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শন করার জন্য যথেষ্ট। মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তা এই কিতাবে পরিবেশন করা হয়েছে। এই কিতাবকে বুঝার জন্য সহজ করা হয়েছে। কোন ধরনের বাতুলতা এই কিতাবকে স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। সমস্ত দিক থেকে এই কিতাব পবিত্র।

(বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'আল কোরআন পরিচিতি' শিরোণাম থেকে 'মদীনায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের বৈশিষ্ট্য' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

সুতরাং এমন ধরনের একটি মহান কিতাব সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সত্য পথপ্রদর্শন করার লক্ষ্যে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকার পরও যারা সত্য গ্রহণ করতে অনাগ্রহী, অবহেলা প্রদর্শন করে, সময় ক্ষেপণ করে, দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদেরকে কথা বলার সময় দিতে গড়িমসি করে, তাদেরকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কেন বার বার যেতে হবে? প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেছে অথবা কোন কারণে তার নাম দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতির আসন সে দখল করেছে, সরকারের উচ্চপদে আসীন রয়েছে, প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছে, এসব কারণে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ইসলামকে 'অনগ্রসর আদর্শ' দ্বীনি আন্দোলনকে 'মৌলবাদীদের দল' বলে সত্যকে উপেক্ষা করছে, কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সামান্য একটু সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এরা মনে করে এদের প্রতি এক বিরাট করুণা করেছি।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর কিতাবের আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী দল এদের মুখাপেক্ষী নয়-বরং তারাই আল্লাহর কিতাবের মুখাপেক্ষী। তারা যদি নিজেদের কল্যাণ কামনা করে, পৃথিবীর বুকে নিজেদের সমাজ ও দেশকে কল্যাণমুখী করতে চায়, নিজেদের সন্তান-সন্তুতি, আত্মীয়-স্বজন সর্বোপরি দেশের জনগণের কল্যাণ কামনা করে, তাদেরকে নিরাপদ দেখতে চায়, সর্বস্তরে শান্তি ও স্বস্তি চায়, পরকালে কল্যাণ চায় তাহলে তারাই ইসলামী আদর্শ

বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলনে শামিল হবে। সুতরাং চোখের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হতে দেখেও যারা সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না, তাদের পেছনে অযথা ছুটাছুটি করে মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। এক ব্যক্তি আল্লাহর কোরআনের আদর্শ গ্রহণ করতে অনিহা প্রকাশ করছে আর দ্বীনি আন্দোলনের লোকজন কোরআনের আদর্শ নিয়ে তার দরজায় করাঘাত করছে। আল্লাহর কোরআন এমন কোন ঠুনকো মর্যাদার জিনিস নয় যে, এভাবে তাকে অপমান করা হবে। সামনে এমন এক সময় আসবে যখন কোরআনের প্রতি অবহেলাকারীর দল সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহর আযাবে তারা গ্রেফতার হয়ে পড়বে।

এই সূরার ১৭ আয়াত থেকে ৩২ আয়াত পর্যন্ত সত্য অস্বীকারকারী লোকদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে তাদের প্রতি যারা অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে সত্য অস্বীকার করে। ইসলামী জীবন বিধানের পরিবর্তে মানুষের বানানো ভোগবাদী আদর্শ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক-তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে ঐ আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি তাদেরকেই শুধু সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টি করেছেন গোটা জাহানের দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সমস্ত কিছু। কারণ এই লোকগুলো মহাসত্যের বাহকদেরকে ঘৃনার চোখে দেখে থাকে, তারা ধারণা করে ইসলামী আদর্শের অনুসারী লোকগুলো পশ্চাৎপদ এবং এরা দেশ ও জাতিকে পেছনের দিকে পরিচালিত করতে চায়। দেশের উন্নতি আর প্রগতির চাকাকে এরা পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়। এসব অমূলক চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হয়ে এরা আল্লাহর সৈনিকদের তুলনায় নিজেদেরকে মর্যাদাবান মনে করে। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা অভিশাপের পাত্র।

১৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহর বিধানের প্রতি অবহেলাকারী লোকগুলোর প্রতি অভিশাপ দিতে গিয়ে 'ইনসান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই 'ইনসান' শব্দ দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে বুঝানো হয়নি। বলা হয়েছে সেইসব মানুষদের কথা, যারা মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ, আল্লাহর দেয়া যাবতীয় নেয়ামত ভোগ করার পরেও যারা তাঁর দাসত্ব করতে অনাগ্রহী, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে যারা ঘৃণার দৃষ্টিতে, অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। যেমন সূরা হামীম সাজদার ৪৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'লা ইয়াছ্আমুল ইনছানু মিন দুআ'য়িল খাইরি' অর্থাৎ কল্যাণ চেয়ে দোয়া করতে মানুষ কখনো ক্লান্ত হয় না'–এই আয়াতেও যে 'মানুষ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাও নিঃসন্দেহে সমস্ত মানুষের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে ঐসব লোকদের কথা, যারা কোন অকল্যাণের মুখোমুখী হলেই হতাশ হয়ে পড়ে বারবার কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে। আর যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভ করে, তখন ক্ষণপূর্বে যে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিল, সে আল্লাহর প্রশংসা করতে ভুলে যায়। বলে, আমি এসব নিজের যোগ্যতার কারণে লাভ করেছি।

সূরা আশ শূরার ৪৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষের অবস্থা হলো এমন যে, তারা যখন আল্লাহর রহমতে অনেক কিছু লাভ করে তখন সে অহঙ্কারী হয়ে ওঠে। আল্লাহকে ভুলে যায়। আর নিজের কৃতকর্মের কারণে যখন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখনও সে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে বলতে থাকে, আল্লাহ্ আমার ওপর এই বিপদ চাপিয়ে দিয়েছে।' এসব আয়াতে যে 'মানুষ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে ঐসব মানুষদেরকে, যারা আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করে না। সুতরাং আয়াতে বর্ণিত, 'মানুষের প্রতি অভিসম্পাত!' কথাগুলো প্রাসঙ্গিক লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমস্ত মানুষ এখানে বুঝাবে না। যারা মহান আল্লাহর নে'মাত ভোগ করছে অথচ আল্লাহর বিধান অস্বীকার

করছে, আল্লাহর বিধানের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করছে, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার কোনই চেষ্টা করছে না, এসব লোক আল্লাহর দরবারে অকৃতজ্ঞ হিসাবে বিবেচিত এবং তারাই আল্লাহর অভিশাপের উপযুক্ত।

এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর অগণিত নে'মাত ভোগ করার পরও যারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করতে চায় না, মানুষের এই অবস্থাকে আল্লাহর কোরআন স্পষ্ট কুফ্‌রী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় নানা ধরনের আদর্শ, মতবাদ, মতাদর্শ তুলে ধরছে-ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানী করে আল্লাহর বিধান মসজিদের চার দেয়ালে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে। আল্লাহর বিধানের সাথে এমন আচরণ করার পূর্বে সেসব মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, তার অস্তিত্ব কোথায় ছিল। সে কি অবস্থায় পৃথিবীতে আগমন করেছে। যখন সে পৃথিবীতে আগমন করলো, তখন সে কতই না অসহায় ছিল। আল্লাহ বলেন, সে ছিল এমন শুক্রবিন্দু যার মধ্যে শুধুমাত্র একটি প্রাথমিক জীবন বা কীট। আমি আমার অধিকাংশ সৃষ্টিকে তার সেবায় নিযুক্ত করে তাকে ক্রমশঃ উন্নতি দান করেছি। তাকে চলাফেরার ও পানাহার করার যোগ্যতা দান করেছি। জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি-চেতনা দান করেছি। তাকে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন করার ক্ষমতা দিয়েছি। তার ভেতরে এমন সব ক্ষমতা দিয়েছি, যা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই।

সে আমার পক্ষ থেকে এতকিছু লাভ করার পরও আমার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। আমার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস পায়, আমার বিধানকে হেয়-প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে আমার দেয়া লেখনী শক্তি ব্যবহার করে, আমার বিধানকে প্রতিষ্ঠিত হতে না দেয়ার জন্য আমারই দেয়া, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ব্যবহার করে, আমার বিধান প্রতিষ্ঠাকামী দ্বীনি আন্দোলনকে আমার যমীন থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে। মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভ করে আমার দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, এ কথাকে অস্বীকার করে। আল্লাহর কোরআন বলছে-

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ...اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে? এখন সে আমার ওপর উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। বলে, এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে? (সূরা ইয়াছিন-৭৭-৭৮)

এ সূরার ১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি তাকে একবিন্দু শুক্র থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি তার দেহে সব কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।' মাতৃগর্ভে ভ্রূণ স্থাপিত হবার পরে যখন তা মানব শিশুর মতো গড়ে উঠতে থাকে, তখনই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নিয়তি নির্ধারণ করে দেন। পৃথিবীতে আগমন করে সে এই নিয়তির বাইরে যেতে পারে না। পৃথিবীতে কোন ভূ-খন্ডে সে আগমন করবে, কোথায় কোন পরিবেশে সে ভূমিষ্ঠ হবে, কে তাকে লালিত-পালিত করবে, কোন বংশে আগমন করবে, ধনীর ঘরে বিলাস বৈভবের মধ্যে না গরীবের ঘরে দরিদ্রতার মধ্যে লালিত-পালিত হবে।

সে পুরুষ হিসাবে পৃথিবীতে দায়িত্ব পালন করবে না নারী হিসাবে, তার চেহারা কুৎসিত হবে না সুন্দর হবে, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যশীল হবে না সামঞ্জস্যহীন হবে, পৃথিবীতে স্বাস্থ্যবান হবে না স্বাস্থ্যহীন রোগা হবে, কন্ঠস্বর মিষ্টি মধুর হবে না কর্কশ শ্রুতিকটু হবে, সে কতটা মেধাশক্তির অধিকারী হবে, তার মানসিক যোগ্যতা কতটা প্রখর হবে, তার

ব্যক্তিত্ব কেমন হবে, তার দেহের অভ্যন্তরের রক্তবাহী নালী, হার্ট, কিডনী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, অস্থি, স্নায়ুসমূহ, মগজ ইত্যাদি কতদিন সচল থাকবে, পৃথিবীর আলো-বাতাসে সে আসবে না গর্ভেই মৃত্যুবরণ করবে, অথবা পৃথিবীর আলো-বাতাসের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করবে, পৃথিবীতে আসার পরে সে কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে, কতদিন সে পৃথিবীতে অবস্থান করবে এসব কিছুই মাতৃগর্ভেই মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে দেন।

এটাই হলো মানুষের প্রকৃত অবস্থা আর এই মানুষ পৃথিবীতে আসার পরে তার জীবন ধারণের জন্যে যেসব উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলোও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জুটিয়ে দিয়েছেন। তার দেহে ও মস্তিষ্কে যত যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, পৃথিবীর বস্তু নিচয়কে তার নিয়ন্ত্রণাধীন না করলে মানুষ যাবতীয় যোগ্যতা কোথায় ব্যবহার করতো? কি করে সে নিজেকে পশুর তুলনায় বুদ্ধিমান বলে প্রমাণ করতো? এরপর এই মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা এই অবকাশও দিয়েছেন যে, সে স্বয়ং তার সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করলে, তার বিধানের সাথে বিদ্রোহ করলে স্রষ্টার দেয়া উপকরণগুলো তার সাথে বিদ্রোহ করছে না। পৃথিবীর ভেতরের ও বাইরের জিনিসসমূহও যেন এই মানুষ ব্যাবাহর করতে সক্ষম হয়, এ যোগ্যতাও তাকে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীতে তার জীবন পরিচালিত করার পথ অত্যন্ত সহজ করা হয়েছে। আবার পরকালের মুক্তির পথও প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন আল্লাহর সাথে নাফরমানী করার সাথে সাথে বা তাঁর বিধান অমান্য করার পরিণতিতে স্বয়ং আল্লাহ যদি তাঁরই দেয়া যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতাসমূহের লাগাম টেনে ধরতেন, তাহলে এই অসহায় মানুষের পক্ষে কোন কিছুই করা সম্ভব হতো না।

এই অসহায় মানুষ সম্পর্কে স্বয়ং তার স্রষ্টা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই যে, তা সামান্যতম পরিবর্তন করতে পারে। এই মানুষ তার জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে সম্পূর্ণ অক্ষম। সে যেমন তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী উন্নত দেশে, ধনীর দুলাল হিসাবে, সুন্দর চেহারা আর দেহের বলিষ্ঠ গঠন নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে না, তেমনি পারে না নিজের ইচ্ছানুসারে মৃত্যুকে বরণ করতে। কোথায় কখন কি অবস্থায়, দুর্ঘটনার মাধ্যমে, রোগভোগ করে, অথবা কোন ঘাতকের হাতে, অথবা হিংস্র পশুর আক্রমণে মৃত্যুবরণ করবে, এটাও নিয়ন্ত্রণ করছেন ঐ মহাশক্তিশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এভাবে স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সামান্যতম মূল্য নেই। যেমন পৃথিবীতে আসার ব্যাপারে তার কোন স্বাধীনতা ছিল না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসাও করা হয়নি যে, 'বান্দা বলো, তুমি কোথাও কোন পরিবেশে যেতে চাও।' সে পৃথিবীতে আসবে কি আসবে না, এ ব্যাপারেও তার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির কোন মূল্য ছিল না। সে যদি পৃথিবীতে আসতে অনাগ্রহ প্রকাশ করতো, তবুও তাকে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে পৃথিবীতে আসতেই হতো। মৃত্যুর ব্যাপারেও তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। সবকিছুই সংঘটিত হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে।

ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরে তার আত্মাকে কোথায় রাখা হবে, সেটাও নির্ভর করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার ওপরে। আবার কিয়ামতের ময়দানে তাকে পুনর্জীবন দান করে উঠানো হবে ঐ আল্লাহরই ইচ্ছাতেই। এখানেও তার স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির কোন মূল্য দেয়া হবে না এবং হাশরের ময়দানে উঠার ব্যাপারে তাকে কোন প্রশ্নই করা হবে না। তাকে এ প্রশ্ন করা হবে না, তুমি হাশরের ময়দানে উঠবে না যে কবরে অবস্থান করছো, সেখানেই থাকবে? অর্থাৎ মানুষের জীবনে তার জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে মৃত্যুর পরে সর্বত্র সে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছারই

মুখাপেক্ষী। সে যখন দেখছে তার জীবন চক্রাকারে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছারই ওপর নির্ভরশীল, তাহলে সে কেমন করে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে অহঙ্কার করে সেই আল্লাহরই দেয়া বিধানের প্রতি অবহেলা করতে পারে? কি করে সে ঐ করুণাময় মহাশক্তিশালী আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করতে পারে? কি করে সে মহাসত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে?

২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'কোনো সন্দেহ নেই যে, তাকে যা বলা হয়েছে তা সে কোনদিনই পালন করেনি।' এই আয়াতে বিশেষভাবে ঐসব লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা মহান আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। আবার সমষ্টিগতভাবে নবী ও রাসূল ব্যতীত সমস্ত মানুষের কথাও বলা হয়েছে যে, এরা কেউ-ই তাদের মহান রব-আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে অনুসরণ করেনি। অবশ্যই তারা তারা কোন না কোন ভুল করেছে এবং করছে। আল্লাহর আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেনি। অকৃতজ্ঞ বান্দাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, এ কথা তারা স্মরণেই স্থান দেয়না, কিভাবে তার সৃষ্টির সূচনা করা হয়েছে, কিভাবে সে মায়ের গর্ভে কোন মহাশক্তির ছত্রছায়ায় বর্ধিত হয়েছে, কার অনুগ্রহে সে পৃথিবীতে আগমন করেছে, কে তাকে যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে।

সে তার সৃষ্টিকর্তার আদেশ অনুসরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। যিনি তাকে একবিন্দু পানির ফোটা থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি দান করেছেন, তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন। এখন সে পরকালের জন্য কোন পূঁজিও যোগাড় করেনি এবং এ চিন্তাও মনে স্থান দিচ্ছে না যে, তাকে আল্লাহর দরবারে হিসাব দেয়ার জন্য দন্ডায়মান হতে হবে। মানুষ তাঁর রব্ব-মহান আল্লাহর দাসত্ব করবে, এই প্রবণতা সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে দেয়া হয়েছে, অথচ সে এই প্রবণতার অনুগামী না হয়ে তার বিপরীত প্রবণতারই বিকাশ ঘটিয়েছে। তার জন্মগত প্রবণতাকে সঠিক পথে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে কিতাব অবর্তণ করা হয়েছে, কিন্তু তারা সে কিতাবের অনুসরণ করে তাদের জন্মগত প্রবণতাকে সঠিক পথে প্রবাহিত না করে সেই কিতাবের বিরোধিতা করছে। তার স্বাভাবিক কর্তব্য ছিল, জন্মগতভাবে তার ভেতরে যে প্রবণতা প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং সেই প্রবণতাকে নির্ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা আঁকড়ে ধরে থাকা, সেই বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করা। সেই কর্তব্য তারা পালন না করে আমার নিদের্শের বিরোধিতা করছে, আমার নির্দেশ দেশের বুকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে যে দ্বীনি আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনের সাথেও শত্রুতা পোষণ করছে।

আমি তাদের জন্য এই পৃথিবীতে যে খাদ্য দান করেছি, সে খাদ্য সম্পর্কে তারা চিন্তা করলেও দেখতে পাবে, প্রতিটি খাদ্যকণার পেছনে আমার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কার্যকর রয়েছে। আমার ব্যবস্থাপনা কার্যকর না থাকলে কোন মানুষের এ ক্ষমতা হতো না যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে। সঠিক পরিমাপে পানি বর্ষণ করে তাদেরই কল্যাণে এই পৃথিবীকে সজিব রেখেছি। সঠিক মাপে পানি বর্ষণ না করলে এই পৃথিবী তাদের জন্য বসবাসের উপযোগী হতো না। তাদের জন্য মাটিতে পরিচালনযোগ্য করেছি, এটা না করলে তাদের পক্ষে এই মাটিকে ব্যবহার করে কোন খাদ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হতো না। এই মাটির বুক দীর্ণ করে তাদের ও তাদের পশুসম্পদের জন্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তাদেরকে যে পশুসম্পদ দান করেছি, তা থেকে তারা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। খাদ্য হিসাবে গোস্ত, চর্বি, দুধ, মাখন পাচ্ছে। চামড়া ও হাড় নানা কাজে ব্যবহার করছে। পশুর মাধ্যমে বোঝা বহন

করাচ্ছে। এসব ব্যবস্থা আমি করেছি, এখন সে আমার যাবতীয় নেয়ামত ভোগ করে আমাকে অস্বীকার করছে। আমার পাঠানো নবী-রাসূলদের সাথে বিরোধিতা করছে। আমার বিধান অমান্য করছে এবং আমার বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকগুলোকে আমার যমীন থেকেই উৎখাত করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করছে।

তারা নিজেদের কার্যাবলীর মাধ্যমে নিজেরাই আমার অভিশাপ ও আযাবের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। আযাব আর অভিশাপের পথেই এরা পা বাড়িয়ে দেয়। এদের প্রতিটি পদক্ষেপ অকৃতজ্ঞতামূলক। এদের আচরণ, কথা-বার্তা, সামাজিকতা, লেন-দেন সবই আমার বিধানের বিপরীত পদ্ধতিতে করে নাফরমান হিসাবে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরেছে। সুতরাং এরা অভিশাপ আর আযাব ব্যতীত অন্য কিছু আমার কাছ থেকে লাভ করতে পারে না।

(এ সূরার ১৭ থেকে ৩২ আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'সমস্ত প্রশংসা ঐ রব-এর' শিরোণাম থেকে তিনিই প্রাণীসমূহকে জীবন ধারণের শিক্ষা দিয়েছেন' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

(এ সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর যখন বিকট আওয়াজ আসবে।' এই আয়াতে কিয়ামতের সর্বশেষ সাইরেন ধ্বনির কথা বলা হয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা সূরা নাযিয়াত ও সূরা নাবায় করে এসেছি। **৩৩ থেকে ৪২ নম্বর** আয়াতসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'যিনি বিচার দিবসের মালিক' শিরোণাম থেকে বিচার দিবসে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবে না' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

এখানে আমরা ৩৪ থেকে ৩৭ আয়াত পর্যন্ত সামান্য আলোকপাত করবো। এসব আয়াতে কিয়ামতের দিনের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সেদিন মানুষরা তার নিজ ভাইদের কাছ থকে পালাতে থাকবে, পালাতে থাকবে তার নিজের মা থেকে নিজের বাপ থেকে, সহধর্মী সহধর্মীনী থেকে–এমন কি তার ছেলেমেয়েদের থেকেও সেদিন সে পালাতে থাকবে। তারা তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কারো কথাই ভাববে না।

এই পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, পরম আপনজন যখন কোন মারাত্মক অপরাধ করে গ্রেফতার হয় তখন তাকে শাস্তি থেকে মুক্ত রাখার জন্য মানুষ সাম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা-তদবীর করে। আপন সন্তানকে কেউ হত্যা করতে উদ্যত হলে মাতা-পিতা করুণ স্বরে কাকুতী-মিনতি করে বলতে থাকে, 'আমাকে হত্যা করো, তবুও আমার সন্তানকে জীবিত থাকতে দাও।' অর্থাৎ নিজের যাবতীয় ধন-সম্পদ এমনকি প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে হলেও পরম আপনজনকে হেফাজত করার চেষ্টা করে থাকে। অসীম মায়া-মমতার কারণেই মানুষ এ ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা মানুষের এই মমতাভরা প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেবে। শাস্তির ভয়াবহতা আর বিভিষীকাময় অবস্থা দেখে, মানুষ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা ব্যতীত অন্য কারো কথা চেতনায় আনবে না বা আনার মতো পরিস্থিতি থাকবে না।

বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাতা-পিতা তার সন্তানের কাছ থেকে, সন্তান তার মাতা-পিতার কাছ থেকে, ভাই তার আপন ভাইয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। এই ভয়ে তারা দূরে সরে যেতে থাকবে, পৃথিবীতে এরা সামান্য কোন অসুবিধায় নিপতিত হলে সে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, সে নিজেই নিজেকে উপস্থিত বিপদ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম নয়, অন্যকে সে কিভাবে সাহায্য করবে? তারপর এ

ভয়েও সেদিন দূরে সরে যেতে থাকবে, পৃথিবীতে সে ব্যক্তি তার অধিনস্থদেরকে ঐ পথে পরিচালিত করেনি, যে পথে চললে আজকের এই মহাবিপদ থেকে তারা মুক্ত থাকতে সক্ষম হতো। এ জন্য তার অধীনস্থরা আজকের এই মহাবিপদ দেখে তাকেই অভিযুক্ত করতে পারে, 'তুমি ছিলে আমার পরিচালক, আমাদের অভিভাবক, আমাদের নেতা, আল্লাহর বিধান অনুসারে তুমি আমাদেরকে পরিচালিত করোনি, নিজের মনগড়া বিধান বা মানুষের বানানো আদর্শ অনুসারে আমাদেরকে পরিচালিত করেছো আর সে কারণেই আজ আমরা চরম বিপদে নিপতিত হয়েছি, আমাদের আজকের এই অবস্থার জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী।'

এই অভিযোগে অভিযুক্ত হবার ভয়েও মানুষ তার আপনজন, সন্তান-সন্ততি, অধীনস্থদের কাছ থেকে সেদিন দূরে পালাতে থাকবে। পৃথিবীতে যারা আমলে সালেহ্ ও দ্বীনি আন্দোলন করেছে, অথচ সে তার আপন আত্মীয়দেরকে, সন্তান-সন্ততিকে, অধীনস্থদেরকে দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াত পর্যন্ত দেয়নি, এসব লোকদেরকেও সেদিন দাওয়াত বঞ্চিত লোকজন অভিযুক্ত করবে, 'তুমি একাই দ্বীনি আন্দোলন করে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করেছো, অথচ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন না করলে কিয়ামতের ময়দানে এই অবস্থায় আমরা নিপতিত হবো, এ সম্পর্কে তুমি আমাদেরকে সতর্ক করোনি। আজকের এই বিপদের জন্য তুমিও কম দায়ী নও।' এই অভিযোগ যেন শুনতে না হয়, এ ভয়েও মানুষ আপনজন ও পরিচিত মহল থেকে পালাতে থাকবে।

সেদিনের ভয়াবহ অবস্থার কারণে মানুষ ভীত-শঙ্কিত, বিস্মিত, হতভম্ভ হয়ে দিশাহারা হয়ে কাতর-উদ্বিগ্ন হয়ে যাবে। ভয়ানক দৃশ্যাবলী অবলোকন করে তাদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন–

فَاِذَابَرِقَ الْبَصَرُ-وَخَسَفَ الْقَمَرُ-وَجُمِعَ الشَّمْسُ.....اِلَى اخِرِالاَيَةُ

মানুষের দৃষ্টিশক্তি যখন প্রস্তুরীভূত হয়ে যাবে এবং চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে এবং চাঁদ ও সূর্যকে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হবে। তখন এই মানুষই বলবে, কোথায় পালাবো?(কিয়ামাহ্-৭-১০)

কিয়ামতের দিনের সেই চরম মহূর্তে মানুষ নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবে, এই চেতনা ব্যতীত অন্য কোন অনুভূতি তার থাকবে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا-

যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে। (সূরা আন্ নাহ্ল-১১১)

পৃথিবীতে মানুষের বানানো আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো কিয়ামতের ময়দানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। সেখানে পারস্পরিক স্নেহ-মায়া, মমতা, প্রীতি-ভালোবাসা, সহযোগিতা, আত্মীয়তা এবং আকীদা-বিশ্বাস, কামনা-বাসনার শুধুমাত্র এমন ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে যা পৃথিবীতে এক আল্লাহর দাসত্ব ও সৎকর্মশীলতা এবং আল্লাহ ভীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথ ও মতের সাথে জড়িত যাবতীয় সম্পর্ক সেখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সমস্ত ভালোবাসা সেখানে শত্রুতায় পরিণত হবে। সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ঘৃণায় পর্যবসিত হবে, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, পীর-মুরীদ–যারা আল্লার অপছন্দনীয় পথে চলতো, তারা একে অন্যের ওপর অভিশাপ দিতে থাকবে এবং

প্রত্যেকে নিজের ভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে বলতে থাকবে, 'এই জালিমদের অনুসরণ করতে গিয়েই আজ আমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।' আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا-

কিয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার এবং পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত করবে। (সূরা আনকাবুত-২৫)

পৃথিবীতে অবস্থানকালীন যাবতীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক, যোগাযোগ কিয়ামতের ময়দানে সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। দল, বাহিনী, বংশ, গোত্র, পরিবার ও গোষ্ঠী হিসাবে সেখানে মানুষদের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি একান্তই ব্যক্তিগতভাবে সেখানে উপস্থিত হবে এবং নিজের হিসাব নিজেকেই পেশ করতে হবে। এ কারণে পৃথিবীতে এমন করা উচিত নয় যে, কোন আপনজনের খাতিরে আল্লাহর অপছন্দনীয় কর্মে নিজেকে জড়িত করা। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যে নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী দলসমূহ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণ করে। তারপর তারা ক্ষমতা যন্ত্র ব্যবহার করে জাতির ওপরে তাদের দলীয় আদর্শ চাপিয়ে দেয়। নির্বাচনে এমন ব্যক্তি প্রার্থী হলেন, যার দলীয় আদর্শ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, সে দল ক্ষমতায় আরোহণ করলে ইসলামের বিপরীত আইন-কানুন দেশে চালু করবে। অথবা ক্ষমতায় গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করবে বা ইসলামকে মসজিদ, মাদ্রাসায় বন্দী করবে। নির্বাচনের সময় এই ধরনের দলের প্রার্থী যদি নিজের পিতা, ভাই, সন্তান বা যে কোন নিকটাত্মীয় হোক না কেন, তাকে কোনক্রমেই সমর্থন বা ভোট দেয়া যাবে না। যারা দেবে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা জালিম হিসাবে গণ্য করেছেন। আল্লাহ বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ..اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পিতা ও ভাইকেও আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। তোমাদের যে ব্যক্তিই এই ধরনের লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে-ই জালিম হবে। (সূরা তওবা-২৩)

পিতা বা সন্তান অথবা ভাই-বোন ধর্মনিরপেক্ষতা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে, ঐসব মতবাদে বিশ্বাসী দল করে, জাতীয় নির্বাচনে বা যে কোন প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনে তাদেরকে সমর্থন দেয়া, তাদেরকে ভোট দেয়ার স্পষ্ট অর্থ ইসলামের বিপরীত মতামতের প্রতি রায় দেয়ার শামিল। কিয়ামতের দিন এরা কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ বলেন- لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ-يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমাদের কোন কাজে আসবে, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি। (সূরা মুমতাহিনা-৩)

ইসলামের বিপরীত মতবাদ মতাদর্শে বিশ্বাসী আপন আত্মীয়-স্বজনকে যারা সমর্থন করবে, কিয়ামতের দিন তারা কেউ-ই পাশে থাকবে না। তারা কেউ আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হয়ে এ কথা বলার সাহস পাবে না যে, আমাদের পিতা, আমার সন্তান, আমার ভাই আমাদের জন্যই এই গুনাহ করেছিল, অতএব তার শাস্তি আমাদেরকেও দেয়া হোক। সেদিন তো প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে নিয়ে বিপন্ন ও ব্যস্ত হয়ে থাকবে। নিজের কর্মের পরিণতি থেকে বাঁচার চিন্তাই প্রত্যেকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে থাকবে। অন্য কারো অপরাধের শাস্তি নিজের

মাথায় তুলে নেয়া তো সুদূর পরাহত ব্যাপার, নিজের প্রাণাধিক সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন, পিতা-মাতা তথা সমস্ত আপনজনদেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, সবাইকে বিনিময় হিসাবে দিয়ে হলেও নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَايَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا-يُّبَصَّرُوْنَهُمْ-يَوَدُّالْمُجْرِمُ...اِلَى اٰخِرِالاٰيَةُ

তখন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুরও খবর নিতে চাইবে না। অথচ তারা একজন আরেকজনকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। সেদিন অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে মুক্তিগণ হিসাবে তার সন্তানদের দিতে পারলেও তা করতে চাইবে, দিতে চাইবে নিজের স্ত্রী ও নিজের ভাইকেও, নিজের পরিবারভুক্ত এমন আপনজনদেরকে, যারা তাকে জীবনভর আশ্রয় দিয়েছিলো। সম্ভব হলে ভূ-মন্ডলের সবকিছুই দিতে চাইবে তারপরও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইবে। (সূরা মায়ারিজ-১০-১৪)

সেখানে এমন হবে না যে, কেউ কারো পরিণতি দেখতে পাচ্ছে না বলে তার অবস্থা কি, তা জিজ্ঞাসা করার কোন সুযোগ থাকবে না-বিষয়টি এমন নয়, বরং প্রত্যেকের পরিণতি কি হচ্ছে, তা সবাই প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। কিন্তু প্রত্যেকেই তার নিজের সঙ্কটজনক অবস্থা নিয়ে কঠিনভাবে ব্যতিব্যস্ত থাকবে, যার ফলে পরম আপনজনদের কার কি অবস্থা, তা জানার মনোভাব থাকবে না। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে কিয়ামতের ময়দানে মানুষ বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠবে। কিন্তু কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার মতো চেতনা কারোই থাকবে না। এমন ভয়ানক অবস্থার অবতারণা ঘটবে সেদিন। এ জন্যই বলা হয়েছে, সেদিন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে পালাবে। এরা তো সেসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে একজনের সাথে আরেকজনের রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, কিন্তু এসব সম্পর্ক সেদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করে মন এতই ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে, ভয়ে এতই বিহ্বল হয়ে যাবে যে, সে আশেপাশের সমস্ত কিছু থেকে অমনোযোগী হয়ে পড়বে। কিয়ামতের কঠিন দিনে লোমহর্ষক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মন ও আত্মার ওপরে ভয় ও শঙ্কার যে আবরণ পড়ে যাবে, ফলে পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু থেকে সে উদাসীন থাকবে। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছে তাদের চেহারা সেদিন আনন্দে উজ্জ্বল থাকবে। আর যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি, কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে, তাদের চেহারা আত্মগ্লানী, আফসোস ও দুঃখের কালিমায় আচ্ছন্ন থাকবে। সেদিন এদের চেহারাই বলে দিবে যে, এরা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করছিল এবং দুষ্কৃতিতে নিমজ্জিত ছিল।

সূরা আত-তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৮১

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে 'কুভ্ভিরাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ শব্দকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এই সূরার আলোচিত বিষয় এ কথা স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, এ সূরা মক্কায় ইসলামী কার্যক্রমের সূচনাকালে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষদেরকে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন প্রথম দিকে বিরোধী গোষ্ঠী রাসূলের কার্যক্রমকে বানচাল করার জন্য শারীরিক নির্যাতনের পরিবর্তে অন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিল, তার মধ্যে এটাও ছিল যে, আল্লাহর রাসূলকে তারা পাগল (নাউযুবিল্লাহ) হিসাবে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তাদের এসব উদ্যোগের যুক্তিপূর্ণ জবাব এ সূরায় দেয়া হয়েছে। আর এ ধরনের অবস্থা মক্কায় প্রাথমিক দিকে সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সূরাকে দু'ভাগে ভাগ করে এর বিষয়বস্তু আলোচনা করা যেতে পারে। ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয় হলো, তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত। এই সূরার ১ থেকে ১৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত ঐ মৌলিক তিনটি বিষয়ের একটি 'আখিরাতের' প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, বর্তমানে মানব জাতি সূর্যকে যে অবস্থায় দেখছে এবং এর আলো ও উত্তাপ ভোগ করছে, একদিন ঐ সূর্যকে আলোহীন করে দেয়া হবে। তামার পাত যেভাবে গুটানো পেঁচানো হয়ে থাকে, তেমনিভাবে সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। মহান আল্লাহ যে অদৃশ্য শক্তি সৃষ্টি করেছেন, সেই শক্তির কারণে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত গতিতে যার যার কর্ম সম্পাদান করছে। আল্লাহ তা'য়ালা সেই অদৃশ্য শক্তিকে অকার্যকর করে দেবেন।

ফলে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকাপুঞ্জ, ছায়াপথ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় পতিত হয়ে একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে। এতে করে সমস্ত কিছু ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যে শক্তির কারণে পৃথিবীর বুকে সুবিশাল পাহাড়-পর্বত সুদৃঢ় রয়েছে, সেই শক্তিকে অকার্যকর করে দেয়া হবে। ফলে পাহাড়সমূহ মহাশূন্যে তুলার মতই উড়তে থাকবে এবং একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে। এ সময় মানুষ তার পরম প্রিয়জন এবং মূল্যবান বস্তুর কথা ভুলে যাবে। অরণ্যে বিচরণশীল প্রাণীসমূহ ভয়ে আতঙ্কে ছুটাছুটি করতে থাকবে। বাঘের নিত্য দিনের খাদ্য হরিণ, ছাগল, গরু ইত্যাদি, যা সে অত্যন্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে শিকার করে–এসব প্রাণী তার পেটের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করবে, লোমহর্ষক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার কারণে বাঘ তা স্পর্শ করতেও ভুলে যাবে।

গোটা পৃথিবীতে সেদিন অকল্পনীয় কম্পন সৃষ্টি হবে। একটার পরে আরেকটা কম্পনের ঢেউ আসতে থাকবে। ফলে পৃথিবীর মাটি দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ভূগর্ভে অবস্থিত খনিজ পদার্থসমূহ তীব্রবেগে বেরিয়ে আসবে। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত লাভা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আলোড়িত হচ্ছে, প্রচন্ড কম্পনের ফলে সে লাভা সেদিন উদগীরণ হতে থাকবে। পৃথিবীর বুকে প্রবাহমান মহাসমুদ্রগুলো উদ্বেলিত-উচ্ছসিত হতে থাকবে। এসব সমুদ্রের পানি নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে সমুদ্রের তলদেশ ফেটে অগ্নি উদগীরণ হবে। এভাবে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার

পরে মৃত্তিকা গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া মানুষের দেহকণাগুলো একত্রিত করে তার ভেতরে পুনরায় আত্মা প্রবিষ্ট করিয়ে তাকে হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির জন্য দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে।

মানুষ এই পৃথিবীতে যা কিছু করছে, তা রেকর্ড করা হচ্ছে। এই রেকর্ড সেদিন উন্মুক্ত করা হবে। মানুষ অবলোকন করতে থাকবে পৃথিবীতে করে যাওয়া তার কর্মসমূহ। কৃত অপরাধ সম্পর্কে মানুষ সেদিন জিজ্ঞাসিত হবে। সে সময় মানুষ উর্ধ্বজগতে বর্তমানের মতো কোন আবরণ দেখতে পাবে না। সমস্ত আবরণ তার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অপসারণ করা হবে। পৃথিবীতে অবস্থান কালে মানুষের সামনে নবী ও রাসূল এবং আল্লাহর কিতাব যেসব অদৃশ্য বিষয়সমূহের সংবাদ দিয়েছেন, তা মানুষ সেদিন প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন মানুষ জানতে পারবে, সে কি ধরনের কর্ম করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল। এসব বিষয় এ সূরার প্রথম ভাগে আলোচনা করে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে, মানুষ যেন মহাসত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন না করে। আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে মহাসত্য অবতীর্ণ করেছেন, মানুষ যেন তা অনুসরণ করে।

এরপর ২২ আয়াত থেকে ২৯ আয়াত পর্যন্ত রেসালাতের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মক্কায় যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালামকে নবী ও রাসূল বলে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছিল এবং তাকে পাগল বিশেষণে বিশেষিত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছিলো, তাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, এই ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে তার জীবনের এক সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছেন, তিনি যে পাগল নন এ কথা তোমরা ভালোভাবেই অবগত রয়েছো। তাঁর প্রতি আমার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তিনি তোমাদের সামনে যা পেশ করছেন, তা আমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহী। সুতরাং তাঁর কথায় শয়তানের কোন স্পর্শ যেমন নেই, তেমনি তা মস্তিষ্ক বিকৃত কোন পাগলের কথাও নয়।

আমার পক্ষে যিনি ওহী বহন করে আমার নবীর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁকে তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম স্বয়ং মহাকাশের শূণ্যমার্গে দিবালোকের আলোয় স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তোমাদের সামনে যা কিছু পেশ করছেন, তা গ্রহণ না করে তোমরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো কোন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছো? তিনি যা কিছু পেশ করছেন তা গোটা পৃথিবীর মানব জাতির জন্য পথনির্দেশক। যে ব্যক্তি সত্য পথ লাভ করতে আগ্রহী, তাকে আমার নবীর প্রতি প্রদত্ত ওহী পথপ্রদর্শন করে থাকে।

সূরা তাকভীর–মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আয়াত-২৯-রুকু-১

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
۝٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا الْبِحَارُ
سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَيِّ
ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا
الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ۝١٤
فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي
الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
۝٢٢ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝٢٣ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ
بِضَنِينٍ ۝٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَجِيمٍ ۝٢٥ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝٢٦
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَٰلَمِينَ ۝٢٧ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝٢٨
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَٰلَمِينَ ۝٢٩

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে--

রুকু–১

(১) যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে, (২) তারাগুলো যখন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্বতমালাকে (নিজ নিজ স্থান থেকে) সরিয়ে দেয়া হবে, (৪) যখন দশমাসের গর্ভবতী উটনীকে (নিজের অবস্থার ওপর) ছেড়ে দেয়া হবে, (৫) যখন হিংস্র জন্তুগুলোকে (এক

জায়গায়) জড়ো করা হবে, (৬) যখন সাগরসমূহে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে, (৭) যখন (কবর থেকে উত্থিত) প্রাণসমূহকে (তাদের নিজ নিজ) দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে। (৮) যখন (নির্মমভাবে) গেড়ে ফেলা সদ্য প্রসূত মেয়েটি জিজ্ঞাসিত হবে-(৯) কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো!

(১০) যখন (আমলের) নথিপত্র তার সামনে খুলে ধরা হবে, (১১) যখন আসমানকে খুলে ফেলা হবে। (১২) যখন জাহান্নাম আগুন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হবে, (১৩) যখন জান্নাতকে মানুষের কাছে নিয়ে আসা হবে, (১৪) প্রত্যেকটি ব্যক্তিই (তখন) জানতে পারবে-সে কি নিয়ে (আজ) হাযির হয়েছে। (১৫) শপথ, সে সব তারকাপুঞ্জের যা পেছনে সরে যায়, (১৬) (যেতে যেতে) যা অদৃশ্য হয়ে যায়, (১৭) শপথ রাতের যখন তা নিঃশেষ হয়ে যায়। (১৮) (শপথ) সকাল বেলার যা দিনের আলোয় (আপন) নিশ্বাস নেয়। (১৯) এই (কোরআন) হচ্ছে একজন সম্মানিত বাহকের বাণী। (২০) (তিনি) বড়ো শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে তার অবস্থান (মর্যাদাপূর্ণ)। (২১) যেখানে তাকে মান্য করা হয় (অতপর) তিনি সেখানে গভীর আস্থাভাজনও।

(২২) তোমাদের সাথী (কিন্তু) পাগল নয়, (২৩) তিনি উজ্জ্বল আলোয় তাকে (নিজের চোখে) দেখেছেন। (২৪) অদৃশ্য জগতের (কথা জানানোর ব্যাপারে) তিনি কখনো কার্পণ্য করেন না, (২৫) এটা কোনো শয়তানের কথা নয়। (২৬) অতএব তোমরা (এর থেকে মুখ ফিরিয়ে) কোন্ দিকে যাচ্ছো? (২৭) এটা সৃষ্টিকুলের জন্যে এক উপদেশ বৈ কিছুই নয়। (২৮) যারা সঠিক পথ বাছাই করে এটি শুধু তাদের জন্যেই উপদেশ। (২৯) (আসলে) তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না, হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা-যিনি জগৎসমূহের রব।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

১ এবং ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে, যখন তারাগুলোকে নিস্প্রভ করে দেয়া হবে।' সূর্যকে কিভাবে গুটিয়ে ফেলা হবে, এটা জানার জন্য সর্বপ্রথমে সূর্যের পরিচয় সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা নিতে হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে সূর্য হলো মিল্কিওয় গ্যালাক্সির ২০ হাজার কোটি তারকার মধ্যে একটি মাঝারি মানের তারকা হলো সূর্য এবং এটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই সৌরজগৎ। সৌরজগতে যতো বস্তু আছে তার ৯৯ দশমিক ৮৫ ভাগই রয়েছে সূর্যের দখলে। সৌরজগতের ভেতরের দিকের গ্রহগুলোকে বলা হয় ইনার প্লানেট এবং তুলনামূলকভাবে এরা আয়তনে ছোট। সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র সূর্যের প্রভাব বলয় বিশাল এবং এই প্রভাব বলয়ভুক্ত অঞ্চলকে বলা হয়ে থাকে হেলিওস্ফেয়ার। আর এর সীমান্ত রেখাকে বলা হয় হোলিওপজ। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে সূর্য থেকে হোলিওপজ-এর দুরত্ব ১শ' এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা জ্যোতির্বিদ্যা একক। ১ এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট সমান ১৫ কোটি কিলোমিটার বা ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। অর্থাৎ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকেই এক জ্যোতির্বিদ্যা একক বলা হয়।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কয়েকটি সর্পিল বাহু রয়েছে। তেমনই একটি বাহুতে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান। সৌরজগৎ অবস্থান করছে মিল্কিওয়ের নিরক্ষীয় তল থেকে ২০ আলোকবর্ষ ওপরের দিকে। আর গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে সৌরজগতের দুরত্ব ২৮ হাজার আলোকবর্ষ। সূর্য আকাশের বুকে জ্বলন্ত এক অগ্নিকুন্ড। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভেতরে দান করেছেন বিপুল শক্তি, বিশাল আয়তন আর তীব্র গতি। এ কারণে সূর্য লাভ করেছে এক মহাদানবীয় মর্যাদা। এই সূর্য ভয়ঙ্কর উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে আর

সেই অগ্নিস্নানে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে বিশাল একটি জগৎ বিকাশ আর সমৃদ্ধির বিস্ময়কর সোপানে। আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে সূর্য তাপের কারণেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু সজীব রয়েছে। সূর্য মানেই জীবন ও সৃষ্টির উৎস। সূর্যহীনতায় এই সমৃদ্ধজগৎ পরিণত হবে প্রাণের স্পন্দনহীন এক মহাঅন্ধকার জগতে।

মহাজগতের বিচারে সূর্য এক অতি তুচ্ছ একটি তারকা। কারণ এর থেকে কয়েক কোটি গুণ বিশালাকৃতির সূর্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অন্যান্য গ্যালাক্সির ভেতরে এবং বর্তমান দৃশ্যমান সূর্যের মতো তিনকোটি সূর্যকে ঐসব সূর্য চুষে খেয়ে হজম করার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য যে শক্তি ব্যয় করা হয়েছে, বর্তমান সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরতে প্রতি সেকেন্ডে সেই শক্তি ব্যয় করে থাকে। শুধু তাই নয়, এই জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকার জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছে 'স্পাইকোল'। এই গ্যাস প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। এই স্পাইকোল গ্যাস যদি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করত, তবে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত। কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে যে গ্যাস বের হচ্ছে-কোন এক অদৃশ্য শক্তি ষাট হাজার মাইল বেগে সে গ্যাসকে আবার সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেন সৃষ্টিজগৎ কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সৌর জগতের মোট ভরের ৯৯. ৮৫ শতাংশই সূর্যের। সূর্যের ভর হলো আমাদের পৃথিবীর ভরের ৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৮ শ' গুণ। আর সূর্যের ব্যাস হলো পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার কিলোমিটার। সূর্য পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৫৮০০ ডিগ্রি কেলভিন এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১ কোটি ৫৬ লক্ষ কেলভিন। বিশাল সৌরজগতের মোট ভরের ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশের বেশি ভর হচ্ছে সূর্যের। সূর্যের মোট ভরের ৭৫ শতাংশ হলো হাইড্রোজেন এবং বাকি ২৫ শতাংশ হিলিয়াম। সূর্যের মোট অণুর সংখ্যা হিসাব করলে এর ৯২ দশমিক ১ শতাংশ হলো হিলায়াম। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়া আরেকটু ভারী পদার্থের পরিমাণ সূর্যে দশমিক ১ শতাংশ। সূর্য অবিরত মিল্কিওয়ের কেন্দ্রকে যেমন প্রদক্ষিণ করে চলেছে তেমনি নিজেও অবিরাম নিজ অক্ষে লাটিমের মতোই ঘুরছে।

প্রতি সেকেন্ডে সূর্য থেকে ৩৮৬ বিলিয়ন মেগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। এই পরিমাণ হাইড্রোজেন পুড়ে উৎপন্ন হয় ৬৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন হিলিয়াম এবং গামা-রে-এর আকারে ৫০ লক্ষ টন শক্তি। উৎপাদিত এই শক্তি কেন্দ্র ছেড়ে যতই বাইরে দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে ততই সেই শক্তি মহান আল্লাহর কুদরতি ব্যবস্থার কারণে শোষিত হতে থাকে এবং তা থেকে বিকীর্ণ তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। সূর্যের বাইরের দিককে বা পৃষ্ঠদেশকে বলা ফটোস্ফিয়ার। এই এলাকার তাপমাত্রা ৫ হাজার ৮ শ' কেলভিন। গ্যালাক্সি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০, ০০০ আলোকবর্ষ দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সূর্য ছায়াপথের নিজস্ব সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৫৬ মাইল বেগে ধাবিত হচ্ছে। সূর্যের এই প্রচন্ড গতিই তাকে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সূর্য তার সমস্ত হাইড্রোজেন জ্বালানি এক সময় শেষ করে ফেলবে এবং ক্রমশঃ তা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সূর্যের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে। এক সময় তার গতি থাকবে না, তেজ থাকবে না, তখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে গেলেই সূর্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে লাল দানবে (Red giant)। নক্ষত্রের বিলয় প্রক্রিয়ায় এই লাল দানবের অভ্যন্তরে জ্বালানি সংকট, অভিকর্ষ বলের প্রভাব তখন কার্যকর হবে ধ্বংস পতন

ঘটিয়ে। এই ধ্বংস পতনের কেন্দ্রবিন্দুতে চাপজনিত কারণে পরিণামে সৃষ্টি হবে একটি সাদা বামন। শীতল, অনুজ্জ্বল, নির্জীব ও অত্যধিক ঘনত্বসম্পন্ন সূর্য সাদা বামনাকৃতি লাভ করবে, তখন তা মহাজাগতিক উচ্ছিষ্টে পরিণত হবে এবং তখনই সূর্য চিরতরে হারিয়ে যাবে মানুষের দৃষ্টির বাইরে।

এই অবস্থার দিকেই নির্দেশ করে আল্লাহর কোরআন বলছে, সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে অর্থাৎ সূর্যকে এমন অবস্থায় উপনীত করা হবে যে, তার আলো ও উত্তাপ বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সূর্যে আলো এবং উত্তাপ থাকবে না ফলে এই পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দনও থাকবে না, কোন উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে না, নদী-সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে মেঘমালায় পরিণত হবে না, বৃষ্টি বর্ষণও হবে না। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত সৃষ্টির অন্তিম দশা ঘনিয়ে আসবে। সূর্যের মতই অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র, নিহারিকা পুঞ্জের অভ্যন্তরে যে জ্বালানি শক্তি রয়েছে এবং যার কারণে তা উজ্জ্বল দেখায়, এসব জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এক সময় তা অন্ধকারের বিবরে হারিয়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে বর্তমানে যে যার অবস্থানে রয়েছে। সেদিন মাধ্যাকর্ষন শক্তিকে অকার্যকর করে দেয়া হবে। তখন সমস্ত কিছুই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে। এই অবস্থার কথা অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য সূরার ১ ও ২ নম্বর আয়াতে।

এ সূরার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন পর্বতমালাকে আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয়া হবে।' অর্থাৎ বর্তমানে পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বতগুলো যেমন রয়েছে তেমন থাকবে না। মহান আল্লাহ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে এসব পাহাড়কে যমীনের বুকে স্থির রেখেছেন। যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকবে না, তখন তা আর স্থিতাবস্থায় থাকবে না। সমস্ত কিছু টলটলায়মান হয়ে যাবে। পাহড়গুলো নিজ অবস্থান থেকে উৎপাটিত হয়ে ওজনহারা অবস্থায় শূন্যে ভেসে বেড়াতে থাকবে। একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ বেধে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

(পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'তিনিই পর্বতসমূহ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন' এবং 'তিনিই পাহাড়গুলো গ্রাফীর ন্যায় গেঢ়ে দিয়েছেন' শিরোণাম দেখুন।)

৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন দশমাসের গর্ভবতী উটনীকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে।' এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কোরআনে কোন বিষয় বুঝানোর ব্যাপারে জটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। সহজবোধ্য ভাষায় এবং বোধগম্য উপমার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাহ্দেরকে কোরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো বুঝিয়েছেন। কিয়ামতের দিন মানুষ কতটা হতবিহ্বল হয়ে যাবে, কতটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে, তার উপমা দিতে গিয়ে গর্ভবতী উটনীর কথা বলা হয়েছে। যে সময় কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, সে সময়ে আরবে বর্তমান কালের মতো যান-বাহন ছিল না। উট ছিল তাদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান বাহন।

আর যে উটনী আসন্ন প্রসবা, সে উটনীর থেকে মূল্যবান সম্পদ তাদের কাছে আর সে সময়ে অন্য কিছু ছিল না। কারণ একদিকে যাতায়াতের বাহন হিসাবে এই উটকে ব্যবহার করা যায়। অপরদিকে সে বাচ্চা দিয়ে তার পশুসম্পদ বৃদ্ধি করবে। এরপর সে উটনী প্রচুর পরিমাণে দুধ দেবে। এ সময় সেই উটনীও দেখতে অত্যন্ত সুশ্রী হয়। তখন উটনীকে বিক্রি করলেও অন্য সময়ের তুলনায় অধিক মূল্য পাওয়া যায়। সবদিক থেকেই তখন আসন্ন প্রসবা উটটি তাদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতো। এ সময়ে তারা সেই উটনীর প্রতি

সজাগ দৃষ্টি রাখতো যেন তা হারিয়ে না যায়, কোনভাবে যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা আঘাত না পায়। কোনভাবেই যেন এর খাদ্যে ঘাটতি না হয়, সেদিকেও তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। গর্ভবতী উটনীর আসন্ন প্রসবকালে উটনীর মলিক যদি তার প্রতি অবহেলা বা অযত্ন করতো, তাহলে লোকজন বুঝতো, উটনীর মালিক লোকটি এমন মারাত্মক বিপদে নিপতিত যে, সে তার এই মূল্যবান সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিতেও ভুলে গিয়েছে।

এ জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন লোকদের কাছে মহামূল্যবান গর্ভবতী উটনীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ এতটাই দিশেহারা ও সম্বিতহীন হয়ে পড়বে যে, তার পরম প্রিয় বস্তু এবং মহামূল্যবান সম্পদ যা যেখানে যে অবস্থায় ছিল, তা সেখানে রেখেই আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। একমাত্র নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে রক্ষা করার কথা মানুষের চেতনা থেকেই মুছে যাবে। তার চোখের সামনেই পরম প্রিয়জন আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ছুটতে থাকবে, প্রাণ প্রিয় সম্পদসমূহ ধ্বংস হতে থাকবে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার মতো অবসর কারো থাকবে না। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সূরা আ'বাসার ৩৪ থেকে ৩৭ নম্বর আয়াতের তাফসীর পড়ুন)

৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন হিংস্রজন্তু গুলোকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে।' কিয়ামতের দিন এমন মারাত্মক আতঙ্ক বিরাজ করতে থাকবে, যার চিত্র ৫ নম্বর আয়াতে অঙ্কন করা হয়েছে। পৃথিবীতে এ দৃশ্য প্রায় প্রতিটি দেশেই ঘটে থাকে। প্রচন্ড ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, প্লাবন ইত্যাদি দুর্যোগের সময় প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে একই স্থানে হরিণ আর বাঘ আশ্রয় নিয়ে থাকে। বাঘ হরিণকে ধরে খাবে, কিন্তু ভয়াবহ বিপদের কারণে বাঘের ভেতরে তখন সে ইচ্ছাশক্তি সক্রিয় থাকে না। প্রবল বন্যার সময় দেখা গিয়েছে, একই গাছে মানুষ আর বিষাক্ত সাপ প্রাণ বাঁচানোর জন্য আশ্রয় নিয়েছে, অথচ নাগালের মধ্যে থাকার পরও সাপ দংশন করছে না। একই গাছে শিয়াল আর মুরগী অবস্থান করছে, মুরগীকে ধরে খেতে হবে, সেই অনুভূতি শিয়ালের থাকে না। এই দৃশ্য মহান আল্লাহ্ ভয়াবহ বন্যার সময় বা অন্য কোন দুর্যোগের সময় দেখিয়ে মানুষকে সেদিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেন যে, পৃথিবীর সাধারণ বিপদই যদি শিয়াল আর মুরগীকে একত্র করে দেয়, কিয়ামতের কঠিন দিনের অবস্থা কি দাঁড়াবে!

অরণ্য ভূমিতে দেখা যায়, বাঘ, সিংহ, হায়েনা, হিংস্র কুকুর দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়। বনের অন্য প্রাণীর জন্যে এরা মূর্তিমান আতঙ্ক। এরা আসছে-অনুভব করলেই অন্যান্য প্রাণী প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সর্বশক্তিতে নিরাপদ স্থানের দিকে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু সেই ভয়াবহ দিনে এরা বর্তমানের স্বাভাবিক অবস্থার কথা ভুলে যাবে। বাঘের এ চেতনা থাকবে না যে হরিণ বা ছাগলকে ধরতে হবে। হরিণ বা ছাগলের এই চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যাবে যে, তাকে বাঘ ধরতে পারে। ভয়ে আতঙ্কে হিংস্রতা ভুলে এরা সব একত্রিত হয়ে যাবে। কেউ কারো দিকে দৃষ্টি দেয়ার মতো অবসর পাবে না। জ্ঞান বিবেক বুদ্ধিহীন জঙ্গলের বাকশক্তিহীন প্রাণীর অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে মানুষের কি অবস্থা হবে!

৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন সাগরসমূহে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।' কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, সাগর, মহাসাগর, নদী-সমুদ্রগুলো সেদিন দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেয়া হবে।' কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী জুড়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এক মহাকম্পন সৃষ্টি করা হবে। সেই কম্পনের ফলে নদী, সাগর ও সমুদ্রের তলদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পানির নাম-নিশানা কোথাও অবশিষ্ট থাকবে না। সেদিন পানিপূর্ণ নদী, সাগর ও অগাধ জলধী সমুদ্রে

আগুন জ্বলতে থাকবে। পানিতে আগুন ধরে যাবে-এই কথাটি অতীতের লোকদের কাছে অজ্ঞাত ছিল এবং বর্তমানে কিছু লোকজনদের কাছে দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। কিন্তু যারা পানির মূল উপাদান সম্পর্কে অবগত রয়েছে, তাদের কাছে বিষয়টি মোটেও আশ্চর্যজনক নয়।

আল্লাহ তা'য়ালা পানির ভেতরে দুটো মৌল উপাদান দিয়েছেন। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দুটো গ্যাসের মিশ্রণ হলো পানি। হাইড্রোজেন হলো দাহ্য এবং এই গ্যাস স্বয়ং জ্বলে। আর অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে। এই পানি অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ হলেও এই পানিই আগুনকে নিভিয়ে দেয়। বর্তমান বিজ্ঞানের হিরণ্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীতে মানুষ ডিস এ্যান্টিনার মাধ্যমে দেখে থাকে, মহাসাগরের অতল তলদেশে ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি রয়েছে। সেখান থেকে উত্তপ্ত লাভা নির্গত হচ্ছে। কিয়ামতের দিন প্রচন্ড কম্পনের কারণে নদী, সাগর ও সমুদ্রগুল্যের তলদেশ ফেটে চৌচির হয়ে সমস্ত পানি এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছবে যেখানে প্রতি মুহূর্তে এক কঠিন উত্তপ্ত লাভা আলোড়িত হচ্ছে।

সাগর, মহাসাগর ও সমুদ্রের তলদেশের এই স্তরে পানি পৌছে পানির দুটো মৌল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিভক্ত হয়ে যাবে। অক্সিজেন প্রজ্জ্বালক আর হাইড্রোজেন উৎক্ষেপক। তখন এভাবে বিশ্লেষিত হওয়া এবং অগ্নি উদগীরণ হওয়ার এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে ফলে সর্বত্র দাবানলের মতো আগুন ছড়িয়ে পড়বে। এভাবেই সমুদ্রের পানিতে আগুন জ্বলতে থাকবে। সমুদ্রের পানিতে কিভাবে আগুন জ্বলে, তা যদি কেউ দেখতে চায়, তাহলে সমুদ্র তটে যেসব আগ্নেয়গিরি রয়েছে এবং যেসব সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, সেখানে গিয়ে দেখতে পারে, পানি কিভাবে আগুনে পরিণত হচ্ছে।

৭ নম্বর আয়াত থেকে আখিরাতের ঐ দৃশ্য অঙ্কন করা হয়েছে, যখন সমস্ত মৃত মানুষের আত্মাকে যার যার দেহে প্রবিষ্ট করিয়ে বিচারের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। মৃত্যুর পূর্বে এই পৃথিবীতে মানুষ যেমন দেহ আর আত্মার সমন্বয়ে জীবিত মানুষ ছিল, আদালাতে আখিরাতেও তাকে তেমনি দেহ আর আত্মার সমন্বয়ে জীবিত মানুষ হিসাবেই উপস্থিত করা হবে।

৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন নির্মমভাবে গেড়ে ফেলা সদ্য প্রসূত মেয়েটি জিজ্ঞাসিত হবে-কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো!' এ কথা সর্বজন বিদিত যে, যে যুগে আল্লাহর কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, যে যুগে কন্যা সন্তান ছিল অসম্মান ও অমর্যাদার প্রতীক। এ জন্য কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে তারা নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করতো। গর্ভবতী মায়ের প্রসব বেদনা শুরু হলে তাকে একটি গর্তের কিনারায় বসানো হতো অথবা তার পাশেই একটি গর্ত খনন করা হতো। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সবার মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতো আর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে তাকে জীবিত অবস্থায় গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হতো।

কোন সময় কন্যা সন্তানকে ছয় অথবা সাত বছর পর্যন্ত জীবিত রাখা হতো। এরপর কন্যা শিশুর মা'কে তার পিতা বলতো, 'মেয়েটিকে গোসল করিয়ে নতুন পোষাক পরিয়ে দাও। ওকে নিয়ে আমি বেড়াতে যাবো।' পিতা পূর্বেই নির্জন কোন মরুপ্রান্তরে গভীর একটি গর্ত খনন করে রাখতো অথবা কোন পাহাড়ের গুহা নির্দিষ্ট করে আসতো। তারপর শিশু মেয়েটিকে নিয়ে সেই গর্তের কাছে অথবা গুহার কাছে নিয়ে যেতো এবং মেয়েকে পিতা বলতো, দেখতো মা! গর্ত কতটা গভীর! পিতার কথায় সরল বিশ্বাসে শিশু মেয়েটি গর্তের কিনারায় গিয়ে উঁকি

দিয়ে গর্তের গভীরতা দেখার চেষ্টা করতো। ঠিক তখনি নিষ্ঠুর পিতা পেছন থেকে মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে গর্তে নিক্ষেপ করতো। তারপর মেয়েটির মরণ আর্তনাদ উপেক্ষা করে পিতা মাটি চাপা দিতো অথবা পাথর মেরে তাকে হত্যা করতো।

আবার কোন কোন পরিবারে কন্যা সন্তানকে ঐ বয়স পর্যন্ত জীবিত রাখা হতো, যতক্ষণ মেয়েটি উট বা ছাগল চরানোর উপযুক্ত বয়সে উপনীত না হতো। এই বয়স পর্যন্ত তার ওপরে নির্যাতন চলতো এবং তাকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে পরিবারে রাখা হতো। তারপর একদিন অত্যন্ত গরম পোষাক-যা পশম দিয়ে বানানো, সেই পোষাক পরিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমিতে উটের রাখাল হিসাবে পাঠিয়ে দিতো। পশমী পোষাকে আবৃতা কিশোরী মেয়েটি মরুভূমির প্রচন্ড উত্তাপে মারা পড়তো, অথবা কোন বন্য জানোয়ারের খোরাকে পরিণত হতো, অথবা নরপশুদের ধর্ষণের শিকারে পরিণত হয়ে প্রাণত্যাগ করতো।

ক্ষেত্র বিশেষে কোন মেয়েকে জীবিত রাখলেও তার জীবনটাকে পৃথিবীর জাহান্নাম বানিয়ে রাখা হতো। প্রতি পদে পদে মেয়েটি উপেক্ষা আর নির্যাতনের শিকার হতো। তার বিয়ের পরে যদি স্বামী মারা যেতো, তখন মেয়েটির অভিভাবক এসে নিজের শরীরের পোষাক মেয়েটির শরীরের ওপরে নিক্ষেপ করতো এই পোষাক নিক্ষেপ করার অর্থ এটাই ছিল যে, এই মেয়েটি অন্য কাউকে বিয়ে করার অধিকার রাখে না। কখনো মেয়েটির ইচ্ছার কোন মূল্য না দিয়ে সেই অভিভাবকই মেয়েটিকে ভোগের পাত্রী বানাতো বা বিয়ে করতো। অথবা পুনরায় বিয়ে না দিয়ে মেয়েটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার ওপরে নির্যাতন চালানো হতো।

কোন কোন ক্ষেত্রে এভাবে নারীকে তালাক দেয়া হতো যে, যে ব্যক্তি তালাক দিলো তার অনুমতি ব্যতীত বা তার নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সেই নারী অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। কন্যা সন্তানকে হত্যাকারী এমন অনেক পিতাই আল্লাহর রাসূলের হাতে হাত দিয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং তাদের অতীতের নিষ্ঠুর কর্মের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন। কারো মুখে আল্লাহর রাসূল এ ধরনের কাহিনী শুনে স্বয়ং কেঁদেছেন। সাহাবী অনুতাপের স্বরে জানতে চেয়েছেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অজ্ঞতার কারণে আমি এমন নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটিয়েছি, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন তো!' আল্লাহর রাসূল অশ্রু সজল নয়নে অনুতাপের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে যাওয়া সাহাবীকে সুসংবাদ শুনিয়েছেন, 'অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা যা কিছুই করেছো, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

কন্যা সন্তানকে হত্যা করার বিষয়টি মহান আল্লাহর কাছে কতটা ঘৃণার তা এই সূরার ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যারা কন্যা শিশু হত্যাকারী কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, কেন তোমরা শিশুটিকে হত্যা করেছিলে? বরং বলা হয়েছে, ঐ নিহত শিশুটিকেই জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল?

কন্যা শিশু হত্যাকারী মাতা-পিতা এতটাই ঘৃণার পাত্র হিসাবে আল্লাহর কাছে বিবেচিত হবে যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে প্রশ্ন করতেই ঘৃণাবোধ করবেন, এ নিষ্পাপ অসহায় শিশুটির কাছেই মমতাভরে জানতে চাওয়া হবে, কেন তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল। তখন সেই শিশু কিয়ামতের ময়দানে অগণিত মানুষের সামনেই হত্যাকারী মাতা-পিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বলবে, কিভাবে তার প্রতি নির্যাতন করা হতো। কোন নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। কিভাবে তাকে জীবন্ত মাটি চাপা দেয়া হতো। মানুষ কতটা পশুস্তরে অবতরণ করলে আপন সন্তানকে হত্যা করতে পারে, তা কল্পনা করলেও শরীর শিউরে ওঠে।

যে অমানবিক কর্মকান্ড তারা করে যাচ্ছিলো আর আল্লাহর রাসূল তাদেরকে সেই নৃশংস কর্ম থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ নরপশুর দল, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের কথার প্রতি কর্ণপাত না করে, তাদের মুক্তিকামী মানুষটির প্রতি দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধিই করে যাচ্ছিলো। পৈশাচিক পদ্ধতিতে হত্যা করা হতো কন্যা সন্তানকে এবং নারীকে যাবতীয় মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। তদানীন্তন পৃথিবীতে এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল না। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তাদের সামনে বিষয়টি উত্থাপন করে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে যে, কন্যা শিশু অকারণে নিহত হচ্ছে এবং নারী শুধু-সৃষ্টিগতভাবে নারী হবার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে। এই পৃথিবীতে তারা কোন বিচার পাচ্ছে না এবং তাদের করুণ আর্তচিৎকার শোনার মতোও কেউ নেই। এ জন্যেও মৃত্যুর পরে আরেকটি জগতের প্রয়োজন, যেখানে তারা সুষ্ঠু বিচার লাভ করবে এবং এটাই ন্যায় ও ইনসাফের দাবী।

মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবনের প্রয়োজনীয়তা এ জন্যেও যে, জালিম তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জুলুমমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখলো এবং একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো, মজলুম কোন বিচার পেলো না। কিন্তু বিবেকের দাবী অনুসারে এটাই ইনসাফ ছিল যে, জালিম যেন তার কর্মের বিনিময় লাভ করে এবং মজলুম যেন ন্যায় বিচার পায়। পৃথিবীতে যখন এটা সম্ভব নয় তখন মৃত্যুর পরে আরেকটি আদালতের প্রয়োজন, যেখান থেকে ন্যায় বিচার লাভ করা যাবে এবং জালিম তার কর্মের উপযুক্ত বিনিময় লাভ করবে।

উল্লেখিত আয়াত থেকে আরেকটি দিক স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নির্যাতিত নারীকে একমাত্র ইসলামই তার উপযুক্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। যে কন্যা শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে, যাকে নির্যাতন করা হয়েছে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে স্বয়ং ঐ মেয়ের মুখ থেকেই সমস্ত কাহিনী শোনা হবে এবং অপরাধী উপযুক্ত শাস্তি লাভ করবে। বিষয়টি এ সূরার মাধ্যমে মানব জাতির সামনে উত্থাপন করে মহান আল্লাহ নারীর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে পুরুষদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কন্যা সন্তানকে সে সমাজে বোঝা মনে করা হতো এবং বর্তমানেও একশ্রেণীর মানুষের ভেতরে এই ধরনের ঘৃণ্য প্রবণতা দেখা যায়। পুত্র সন্তান বড় হয়ে সংসারের বোঝা নিজ কাঁধে বহন করবে, সংসারের সাহায্যকারী হিসাবে কাজে আসবে, যোদ্ধা হিসাবে সে যুদ্ধ করবে ইত্যাদি কারণে পুত্র সন্তান ছিল সম্মান, মর্যাদা ও কামনার পাত্র। কিন্তু কন্যা সন্তান ছিল অপাংক্তেয়।

কেউ কন্যা সন্তানের পিতা হবে, এ কথা কল্পনা করলেও তাদের মুখমন্ডলে বিষাদের ছায়া নেমে আসতো। কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করতে হবে এবং তারপর তাকে বিয়ে দিতে, আরেকজন এসে তার মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে, এটা তারা একটা অর্থহীন বিষয় বলে মনে করতো এবং বিষয়টি তাদের কাছে ছিল একটি বোঝা বিশেষ। আরেকটি বিষয় সে সমাজের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ছিল, যিনি অধিক পুত্র সন্তানের অধিকারী, তিনিই হবেন সমাজের নেতা। বিশেষ করে যুদ্ধকালে পুত্র সন্তানদেরকে যোদ্ধা হিসাবে কাজে লাগানো যেতো। অপরদিকে কন্যা সন্তান যুদ্ধকালে কোন কাজেই আসতো না বরং তাদেরকে রক্ষা করার জন্য পুরুষদেরকে অধিক শক্তি ব্যয় করতে হতো।

কারণ এক গোত্রের সাথে যখন আরেক গোত্রের যুদ্ধ শুরু হতো এবং সে যুদ্ধ বংশ পরম্পরায় কয়েক শতাব্দীকাল ব্যাপী চলতো। তখন প্রতিপক্ষ আক্রমণ করে যাবতীয় সম্পদের সাথে মেয়েদেরও নিয়ে যেতো এবং তাদেরকে দাসী হিসাবে অন্যত্র বিক্রি করে দিতো অথবা

নিজেরাই দাসী বানিয়ে রাখতো। এসব নানা কারণে কন্যা সন্তান ছিল তাদের কাছে অভিশাপের মতো। এ জন্য কন্যা সন্তানকে তারা হত্যা করতো এবং নারীর কোন সম্মান ও মর্যাদা তারা দিতো না। শুধু তাই নয়, একমাত্র ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন আদর্শ বা ধর্মই নারীকে সামান্যতম মর্যাদা দেয়নি। হিন্দু ধর্ম নারীর কোন সম্মান ও মর্যাদাই প্রদান করেনি। সতীদাহের মত নির্মম নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথা হিন্দু ধর্মেরই আবিষ্কার । পুরুষ একাধিক বিয়ে বা স্ত্রী বিয়োগের পরে পুনরায় বিয়ে করার অধিকার লাভ করবে, কিন্তু নারীর সে অধিকার নেই। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে নারীকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অমানবিক ব্যবস্থা চালু ছিল হিন্দু ধর্মে। কোন নারী যদি সৌভাগ্য ক্রমে স্বামীর জ্বলন্ত চিতা থেকে বেঁচে যেত, তাহলে তাকে পদে পদে এমনভাবে তিরস্কার কার হত যে, সে নারীর পক্ষে বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই উত্তম বিবেচিত হত।

হিন্দু ধর্মে একটা পুরুষ একই সাথে দশজন নারীকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারে। রাজা দশরথের তিনজন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের ছিল পাঁচজন, পাঁন্ডুর ছিল দুইজন, অর্জুনের ছিল তিনজন স্ত্রী। এদের মধ্যে তালাক প্রথা নেই। ফলে যথেচ্ছা অত্যাচার করলেও মুক্তির কোন বিধান নেই। স্বামী হলো নারীর দেবতা। অতএব দেবতা কোন পাপ করতে পারেনা। দিনরাতের এমন কোন মুহুর্ত নেই যে মুহূর্তে নারী স্বাধীন থাকতে পারে। সমস্ত ক্ষমতা স্বামীর অধিকারে থাকবে। নারী স্বাধীন হবার যোগ্য নয়। নারী তার জীবনে তার ইচ্ছে মত কাজ করতে পারবে না। পিতা তার কন্যাকে যার সাথে বিয়ে দেবেন, সে যেমনই হোক না কেন-তার সাথেই তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পরে তাকে আজীবন নিষ্ঠুর বৈধব্য ব্রত পালন করতে হবে। নারীর সখ আহ্লাদ বলে কোন কিছু থাকতে পারে না।

শয্যাপ্রিয়তা, অলঙ্কারাসক্তি, ব্যভিচারের ইচ্ছা, আত্মগর্ব, অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মিথ্যা বলা এবং যে কোন পুরুষ দেখলেই তার সাথে দেহ মিলনের ইচ্ছা নারীর স্বভাবের অন্তরগত। কোন ধরনের পরামর্শ নারীর সাথে করা যাবেনা, পরামর্শ করার সময় নারীকে কাছেও রাখা যাবেনা। এই পৃথিবীতে পুরুষ পাপ করলে পরজন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। নারী জাতি হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। নারী দাস সম্প্রদায়ভুক্ত।

কোন মানুষকে যদি এক হাজারটা মুখ দিয়ে হাজার বছর জীবিত রাখা হয় আর সে যদি তার এক হাজারটা মুখ দিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে নারীর দোষ বর্ণনা করে, তবুও নারীর দোষ বলে শেষ করতে পারবে না। ধন-সম্পদে নারীর কোন অধিকার নেই। ঋণে ডুবে থাকা ব্যক্তি পর জন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা গ্রহণের কোন অধিকার নারীর নেই।

উল্লেখিত সমস্ত কথাগুলো হিন্দু ধর্মের। নারীর সম্মান ও মর্যাদা তারা কেমন করে কিভাবে দিয়েছে ঐ কথাগুলো পড়লেই উপলব্ধি করা যায়। অহিংসা পরম ধর্ম-এটা হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। যে কোন প্রাণী হত্যা করা বৌদ্ধ ধর্মে নিষিদ্ধ। সেই ধর্ম নারী সম্পর্কে বলছে-নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী। নারীর সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা তাদের প্রতি কোন অনুরাগ রেখোনা। তাদের সাথে কোন ধরনের কোন কথা বলবে না। পুরুষদের জন্যে নারী ভয়ংকর বিপদ স্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গীদ্বারা পুরুষের বিশ্বাস নামক সম্পদ লুটে নেয়। নারী একটা ছলনা বৈ কিছুই নয়। নারী থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। নারীর সাথে একত্রে থাকা অপেক্ষা বাঘের মুখে তার খাদ্য হিসাবে যাওয়া বা ঘাতকের তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেওয়া অতি উত্তম।

বৌদ্ধ ধর্মের উপখ্যানে এ ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, উরুবিল্ব গোত্রপতির মেয়ে মারা গেলে একদিন স্বয়ং বুদ্ধ তার কবর খুলে মেয়েটার কাফনের কাপড় নিয়ে গেলেন এবং তা দিয়ে জামা বানিয়ে ব্যবহার করলেন। (সেন্ট হিলার-বুদ্ধ এন্ড হিজ রিলিজিয়ান-পৃঃ-৫০)

নারী সম্পর্কে উল্লেখিত কথাগুলো বৌদ্ধ ধর্মের। এ কথাগুলো পাঠ করলে অনুধাবন করতে কষ্ট হয়না, এই ধর্ম নারী জাতিকে কি ধরনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। ইহুদী ধর্মেও নারীর কোন মর্যাদা নেই। নারী সম্পর্কে এই ধর্মের বক্তব্য হলো-নারী পাপের প্রসবন। কোন ভালো কাজ করার কোন যোগ্যতা নারীর নেই। এ কারণে সে সম্মান পেতে পারে না। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভোগ করার জন্যে। নারী জাতি সৃষ্টির আদি থেকেই পাপের উস্কানি দিয়ে আসছে। নারীকে কোন ধরনের সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা যাবে না। কোন নারীর স্বামীর সাথে যদি অন্য পুরুষের ঝগড়া শুরু হয়, আর নারী যদি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ায়, এটা তাঁর ক্ষমাহীন অপরাধ। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে নারীর উভয় হাত কেটে দিতে হবে। নারীকে যে কোন সময় যে কোন কারণে বা কোন কারণ ব্যতীতই তালাক দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি পুরুষের এই বলে দোয়া করা উচিত যে, হে স্রষ্টা ! তুমি আমাকে যে নারী না করে পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছো, এ কারণে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ওপরে উল্লেখিত কথাগুলো পাঠ করার পরে আর ব্যাখ্যার দাবী রাখে না যে, ইহুদী ধর্ম নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখে। এই ইহুদীদের মধ্যেই শিশু কন্যাদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা চালু ছিল। পারসিক ধর্ম নেতার নাম যরথুষ্ট্র। তার প্রবর্তিত ধর্মেও নারীর কোন মর্যাদা রাখা হয়নি। এমন সব বিধান রাখা হয়েছে নারীর জন্য, যা চরম অমানবিক। যরথুষ্ট্র নারী সম্পর্কে বলেছেন, যে নারীর সন্তান নেই সে নারী পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যেতে পারবে না। সুতরাং নারী যেন অন্য কারো সন্তান গর্ভে ধারণ বা পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে। নারীর মাসিক হলে এই ধর্মে তাকে চরমভাবে ঘৃণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন পুষ্পবতী নারী যেন সূর্য না দেখে এবং কোন পুরুষের সাথে কথাও না বলে। আগুনের দিকে সে যেন না তাকায়। পানিতে অবতরণ না করে। অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সাথে একত্রে শয়ন না করে। কোন খাদ্য যেন স্পর্শ না করে। কোন পাত্র ধরতে হলে যেন হাতে কাপড় জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুবতী নারী এই সমস্ত আদেশ অমান্য করলে তার জন্য বেহেশত হারাম হয়ে যাবে। ঋতুকাল নারীর একটি পাপ কাল। বছরে তার জন্য একটি মাস নির্ধারিত রয়েছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য।

সন্তান প্রসবকারিণী নারীর দুর্ভোগের শেষ ছিল না। সন্তান প্রসবের পরে নারী এমনই অপবিত্রা হয়ে যেত যে, সে নারী ঘরের বাইরে আসতে পারবে না। এমন কি বারান্দায় পর্যন্ত আসা যাবে না। মাটিতে পা রাখলে মাটি পর্যন্ত অপবিত্র হয়ে যেত, কোন কাঠের পাত্র নারী স্পর্শ করতে পারবে না। এ ধরনের নানা বন্ধনে নারীকে বেঁধে রেখেছে এই ধর্ম। নারী তার স্বামীর দাস বৈ আর কিছুই নয়। এখানে নারীর জীবন তার কাছে এক ঘৃণ্য বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত ঈসার আগমনের পঁচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরথুষ্ট্রের যুগ। এই ধর্মে যৌনাচার লাগামহীন। ফলে যারা নিজেদের যৌবনকে কানায় কানায় উপভোগ করতে চাইতো তারা সে যুগে দলে দলে এই ধর্মে প্রবেশ করেছিল। সম্রাট কায়খসরু, গস্টাসপ ও কায়কোবাদের মত প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এই ধর্ম গ্রহণ করার ফলে এই মতবাদ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট পারভেজও এই মতবাদ গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মকে বলা হয় মওজুসিয়াত। যৌনাচারের কোন বাঁধাধরা আইন ছিল না বলে সম্রাট পারভেজ তার ভোগের জন্যে বহু সংখ্যক নারীকে বিয়ে করেছিলেন। যৌনক্রিয়া করার ক্ষেত্রে কোন বাছ-বিচার নেই। যে কোন সময় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক বা হত্যা করার অধিকার রাখে এই ধর্মে। নিজের স্ত্রীকে প্রয়োজনে অন্য কারো ভোগের জন্য দেয়া কোন পাপের বিষয় নয়। নারীকে যে কোন সময় বিক্রি করে দেয়া যায়।

সতিন পুত্র সৎ মা'কে ভোগ করতে পারে। এই ধর্মের আরেক ধর্মীয় নেতা মযুকের মতানুসারে, ধন-সম্পদ ও নারী হলো সমস্ত পাপের মূল উৎস। নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পদ হতে পারে না। নারী হলো জাতীয় সম্পদ। সুতরাং একা কেউ কোন নারীকে ভোগ করতে পারবে না। উঠিয়ে দেয়া হলো বিয়ে প্রথা। ধর্মনেতা মযুকের এই যৌনাচারের নীতির সাথে ভারতের ভগবান রজনীশের যৌননীতির হুব-হু মিল দেখতে পাওয়া যায়। পারস্য সম্রাট শাহ কাবাদ এই ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তিনি সাম্রাজ্য ব্যাপী এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের প্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলেন। ফলে যে কোন লোক প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজপরিবারের নারীদেরকে ভোগ করতে পারতো। সম্রাট নিজেও যে কোন লোকের স্ত্রীকে ভোগ করতে পারতো।

খৃষ্ট ধর্মে নারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। নারী মানুষ কিনা বা নারীর আত্মা বলে কিছু আছে কিনা, তাই নিয়েই এ ধর্ম সন্দেহ পোষণ করে। নারী হলো সমস্ত পাপের প্রতীক, নারীর রক্ত অপবিত্র, নারী হলো ছলনার কন্যা, নারী থেকে দূরে থাকো, নারী শয়তানের শক্তি, নারী অজগর সাপের মতো রক্ত পিপাসু! নারীর ভেতর বীষ আছে, চরিত্র ধ্বংসের মূল শক্তি হলো নারী, নারী হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নারীর স্বভাব বিচ্ছুর মতো কামড়ানো, শয়তানের ডান বাহু হলো নারী, পুরুষের অধীনে থাকবে নারী, নারীর কোন স্বাধীন সত্তা নেই, নারী যদি কোন পুরুষের শরীর স্পর্শ করে তাহলে সেই পুরুষের সমস্ত পুণ্য কর্ম বরবাদ হয়ে যাবে, নারী যদি কোন ভুল করে তবে তা ক্ষমার অযোগ্য, পৃথিবীর কোন কিছুর ওপরে নারীর কোন অধিকার নেই, নারীর মধ্যে কোন মানবীয় গুণাবলী নেই, তাদের মধ্যে কোন চেতনা নেই, তারা মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি পর্যায়ের এক বিশেষ প্রাণী। নারীরা আদৌ মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল, ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তারা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিল, নারীরা মানুষ বটে, তবে পুরুষের সেবা করার জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

বর্তমানেও তথাকথিত সভ্য মানুষের মন থেকে নারী সম্পর্কে আপত্তিকর ধারণা বিদায় নেয়নি। নারীমুক্তির নামে নারীকে কৌশলে নির্যাতন করা হচ্ছে। ইতিহাসের দু'টো পর্যায়ে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। একবার অন্ধকারাচ্ছন্ন মুর্খতার যুগে। আরেকবার হচ্ছে এই আধুনিক যুগে। অন্ধকার যুগে নারীর ওপরে চলতো বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন আর আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার নামে, নারী মুক্তির নামে নারীদেরকে তাদের স্বীয় মান সম্মান ও উচ্চ আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। ইসলামী বিপ্লব পূর্ব ইরানে নারী সম্পর্কে প্রবাদ প্রচলিত ছিল, নারী হলো এক আপদ তবে কোন পুরুষ এই আপদহীন নয়।

আজও আর্জেন্টিনায় প্রচলিত আছে, একটি ভালো দরজার যেমন কাঠ দরকার তেমনি নারীর জন্য কাষ্ঠদণ্ড প্রয়োজন। অর্থাৎ নারীকে পশুর ন্যায় পিটানোর জন্য লাঠি একান্ত প্রয়োজন। ভারতে প্রবাদ বাক্য আছে, নারী হলো নরকের প্রধান প্রবেশ পথ। আমেরিকায় প্রবাদ প্রচলিত, যেখানেই নারী সেখানেই সমস্যা। জার্মানীতে বলা হয়, যখনই কোন নারী মারা যায় তখনই পৃথিবীর সমস্যা কিছুটা কমে যায়। ফ্রান্সে বলা হয়, নারী হলো পুরুষের সাবান বিশেষ। আয়ারল্যাণ্ডে বলা হয়, নারী শয়তানকেও প্রতারিত করে। রাশিয়ায় বলা হয়, মুরগীর বাচ্চা যেমন মুরগী চিনতে পারে না তেমনি নারীকে চিনতে পারে না কোন পুরুষ। নারীর হৃদয় অন্ধকার জঙ্গলের মতো।

অস্ট্রেলিয়ায় পশুর পাশাপাশি নারীকে দিয়ে বোঝাবহন করা হতো। খাদ্যের অভাব দেখা দিলে নারীকে হত্যা করে ভক্ষণ করা হতো। ১৯১৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় নারীগণ কোন প্রকার সম্পদের অধিকারী হয়নি। ১৯০৭ সন পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডেও ঐ একই অবস্থা ছিল নারীর ক্ষেত্রে। বৃটেনে ১৮৭০ সনে ও জার্মানে ১৯০০ সনের পূর্ব পর্যন্ত নারীর কোন অধিকার ছিল না। অথচ ইসলাম পৃথিবীতে আগমন করেই নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরুষের তুলনায় তাকে তিনগুণ বেশী অধিকার প্রদান করেছে।

মানব জাতির অর্ধেক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো নারী। তাকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে মানব সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু পৃথিবীর অন্য সমস্ত আদর্শ ও ধর্ম নারীর কোনরূপ মর্যাদা যে প্রদান করেনি তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তথাকথিত বর্তমান মুসলিম সমাজ নারীকে কিরূপ মর্যাদা দান করছে, তা দেখে এ ধারনা করা বোকামী যে, ইসলাম বোধহয় নারীকে এমন মর্যাদাই দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসে যেমন আকাশ–পাতাল ব্যবধান রয়েছে তেমনি ব্যবধান রয়েছে নারীকে মুসলমানদের দেয়া অধিকারে ও ইসলামের দেয়া অধিকারে।

ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। প্রাচীন আরবে কন্যা সন্তানের হাত চুম্বন করা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হতো, বিশ্বনবী স্বয়ং সে ব্যবস্থা উৎখাত করলেন। কন্যার হাত তিনি চুম্বন করতেন। তাকে প্রশ্ন করলেন এক সাহাবী, আমার নিকট কার হক বেশী এবং সবচেয়ে সম্মানীত কে? উত্তরে মহানবী বললেন, তোমার গর্ভধারিণী মা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, তারপর? জবাব এলো, তোমার মা। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করা হলো, তিনবারই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার মা। সুতরাং ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থায়, সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের তুলনায় নারীর মর্যাদা যে কত বেশী তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দ্বারা প্রমাণিত। কন্যা সন্তান হত্যার নির্মম নিষ্ঠুর প্রথা ইসলামই উৎখাত করেছে।

নারীকে সম্পদের উত্তারাধিকারী বানিয়েছে ইসলাম। নারীর নিকট থেকে অর্থাৎ হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়, যে সন্ধির ওপরে নির্ভর করছিল ইসলামী আদর্শ পৃথিবীতে টিকে থাকবে কিনা। এমনি এক সংকটকালে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পরামর্শ বাস্তবায়ন করেছিলেন। নারীর নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণের রীতি চালু করে নারীকে জাতীয় ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ দান করেছে ইসলাম, নারী ও পুরুষের মধ্যে সুকৃতি ও তার প্রতিদানে কোন পার্থক্য নেই-এ কথা ঘোষণা করেছে ইসলাম।

মায়ের সন্তুষ্টির ওপরে সন্তানের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্ত-এ কথা ঘোষণা করে ইসলাম পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে নারীর নিকট ঋণী করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর দৈহিক কর্ম ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে কর্ম করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। কন্যা সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে তাকে সুপাত্রে বিয়ে দিলে জান্নাত পাবে পিতা-এ কথা ইসলামই বলেছে। নারী জন্মসূত্রে পিতা-মাতার সম্পদ-সম্পত্তিতে ভাইয়ের অর্ধেকের অংশীদার, বৈবাহিক সূত্রে স্বামীর সম্পদে আট ভাগের এক ভাগ অংশীদার করেছে ইসলাম। তারপরেও তাকে বিবাহ লগ্নে ইসলাম দেন মোহরের ব্যবস্থা করে রিজার্ভ ফাণ্ড দান করেছে। বিয়ের সময় নারী যা পাবে তা দিয়ে সে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে। সে ইচ্ছা না করলে তার এ সম্পদে কেউ হাত দিতে পারবেনা।

ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছে মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং সমাজের একজন সম্মানীতা সদস্যা হিসেবে। নারীকে কেউ ব্যভিচারের অপবাদ যদি দেয় তাহলে অপবাদদাতার জন্য শারীরিক শাস্তি নির্ধারণ করেছে ইসলাম। কেউ যদি নারীর ঘরে উঁকি দিয়ে নারীর গোপনীয়তা দেখার চেষ্টা করে তাহলে তার চোখের শাস্তি ইসলামই নির্ধারণ করেছে। পৃথিবীতে নারীর কোনরূপ মর্যাদা ছিলনা, কোন ধর্মই তাকে মর্যাদা দেয়নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নারীকে করেছে ভোগের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীকে গণ্য করেছে জাতীয় সম্পদ রূপে। অর্থাৎ যে কেউ নারীর যৌবন ভোগ করার অধিকারী। যে সময় কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে তো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। কন্যা সন্তান ছিল অকল্যাণ ও অগৌরবের প্রতীক। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে শুনলে পিতার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে, 'সে সমাজের কাউকে তার কন্যা-সন্তান জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে সারাদিন তার মুখ কালো হয়ে থাকত। সে ক্ষুব্ধ হত এবং মনে মনে দুঃখ অনুভব করত। এ সুসংবাদের লজ্জার দরুন সে অন্য লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে চলতো। সে চিন্তা করতো, অপমান সহ্য করে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবে, না তাকে মাটির তলায় প্রোথিত করে ফেলবে! কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত তার গ্রহণ করতো!'

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যে লোকের কোন কন্যা-সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার ওপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত দান করবেন। তিনি আরো ঘোষণা করলেন, 'প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব করায় মায়ের সৌভাগ্য নিহিত আছে।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'যে ব্যক্তি দু'টো কন্যা সন্তানকে বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে সে ব্যক্তি ও আমি জান্নাতে এমনভাবে অবস্থান করবো যেমনভাবে হাতের আঙ্গুল পাশাপাশি অবস্থান করে।'

কোন আদর্শ কোন ধর্ম নারীকে সম্পদে অধিকার দেয়নি। নারীর প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞার কারণে ভারতে নারীগণ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। চীনেও একই অবস্থা। সম্পদে কন্যার অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে, 'আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের বিশেষ অর্থনৈতিক বিধান দিচ্ছেন। তিনি আদেশ করেছেন, একজন পুরুষ দু'জন মেয়েলোকের সমান অংশ পাবে। কেবল মেয়ে-সন্তান দু'জন কিংবা ততোধিক হলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি মাত্র একজন কন্যা হয়, তাহলে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।'

ইসলাম ছেলেদেরকে উপার্জনে যেমন বাধ্য করেছে কন্যাদেরকে তা করেনি। ইসলাম বলেছে, কন্যাকে লালন-পালন, তার যাবতীয় খরচ বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে বহন করবে পিতা। পিতার অবর্তমানে করবে পরিবারের অভিভাবক। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে, তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তাদের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করবে, তাদেরকে বিয়ে দিয়ে আত্মনির্ভরশীলা করে দেবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাত লাভ করবে। এক ব্যক্তি জানতে চাইলো কন্যার সংখ্যা বেশি কম হলেও কি সে ব্যক্তি জান্নাত পাবে? আল্লাহর রাসূল বললেন, হ্যাঁ, সেও জান্নাত পাবে।

কোন কন্যা যদি বিধবা হয়ে বা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা হয়ে পিতা বা ভাইয়ের কাছে ফেরৎ আসে, তাকে লালন পালন করতেও ইসলাম উৎসাহিত করেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক

বর্তমান এই বিংশ শতাব্দীতে যারা সভ্যতার দাবীদার, তারাও শুধু ছেলেই কামনা করেন, কন্যা কামনা করেন না। শুধু তাই নয়, বার বার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে বলে স্ত্রীর ওপরে চলে অত্যাচার। স্ত্রীকে তালাক দিতেও দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান তো বলছে পুত্র সন্তান হোক বা কন্যা সন্তানই হোক-জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা নেই। পুরুষের নিকট হতেই নারীর গর্ভে কন্যা বা পুত্র সন্তান প্রবেশ করে।

কন্যা সন্তানের অধিকারী কে হবে আর কে পুত্র সন্তানের অধিকারী হবে এ ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর কুদরতী হাতে। মুসলিম পরিবারে কন্যা অথবা পুত্র সন্তান যা-ই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, মুসলিম পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মুসলিম পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম মোটেও অমর্যাদাকর নয় বরং কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক। কোন মুসলিম মাতাপিতা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে আনন্দ প্রকাশ করবে আর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মুখ কালো করবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না। মুসলিম মাতাপিতার কাছে পুত্র কন্যা সমান। এদের মধ্যে কোন ব্যবধান তারা করেননা। কারণ এ ধরনের ব্যবধান করা বা পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দান করা ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে। পুত্র হোক বা কন্যা হোক, এক সন্তানের উপরে আরেক সন্তানকে প্রাধান্য দান করা বড় ধরনের গোনাহ। অবশ্য শরিয়ত সম্মত কারণে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

তথাকথিত কিছু মুসলিম পরিবার রয়েছে, যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে পরিবারে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্তান সুন্দর বা কুৎসিত, কন্যা বা পুত্র হবে এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের ব্যাপারে কামনা বাসনা যা-ই থাক, সেই কামনা বাসনা অনুযায়ী আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয় না। কাকে কন্যা দান করলে তার কল্যাণ হবে। অথবা অকল্যাণ হবে, আর কাকে পুত্র দান করলে কল্যাণ অথবা অকল্যাণ হবে এটা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। মুসলিম মাতাপিতা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুত্র বা কন্যা কামনা করে দোয়া করতে পারেন। কিন্তু দোয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটা ঠিক নয়। বান্দার জন্যে যেটা কল্যাণের আল্লাহ তাই করেন। কারো কোন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে আল্লাহ বাধ্য নন। আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা কারো নেই। মহান আল্লাহর যা ইচ্ছে তাই তিনি করেন। আল্লাহ বলেন-

يَخْلُقُ مَايَشَاءُ-يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًاوَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ........اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা বানিয়ে দেন। নিসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিশালী।' (সূরা শূরা-৪৯-৫০)

কে সন্তানের মাতাপিতা হবে আর কে হবে না-কে পুত্র সন্তান লাভ করবে আর কে কন্যা সন্তান লাভ করবে-এ ব্যাপারে মানুষের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে মানুষ অত্যন্ত অসহায়। এ ব্যাপারে (Medical Science) মেডিকেল সাইন্সেরও কোন ক্ষমতা নেই। যতবড় পীর সাহেবই হোকনা কেন, তার পানি পড়ায় বা তাবিজ কবজও পুত্রের ক্ষেত্রে কন্যা আর কন্যার ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। এটা যদি সম্ভব হতো তা হলে পীর সাহেব নিজেই নিজের চাহিদা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিতেন।

আল্লাহ যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তার অমুক বান্দাকে তিনি কোন সন্তান দেবেন না এ ক্ষেত্রে কোন ডাক্তার পীর ফকির মাজারের ক্ষমতা নেই সন্তান দেয়া। এ ধারণা যদি কারো অন্তরে

থেকে থাকে তা হলে তার পক্ষে মুসলিম থাকা অসম্ভব। মানুষের ভাণ্ডারে এমন কোন জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে জানতে পারবে, 'পুত্র সন্তান তার জন্যে উপকার বয়ে আনবে' অথবা 'কন্যা সন্তান তার জন্যে ক্ষতিকর হবে।' এ জ্ঞান কোন মানুষের নেই। আল্লাহর ফায়সালা থাকলে, পুত্র হোক বা কন্যা হোক যে কোন সন্তানই কল্যাণকর হতে পারে অথবা অকল্যাণকরও হতে পারে। সন্তান আল্লাহর দান। কন্যাও তারই দান এবং পুত্রও। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর দানের মূল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মু'মিনের পক্ষে শোভা পায় না। আল্লাহই ভালো জানেন, কাকে কোন্ নিয়ামত দিতে হবে এবং তিনিই নিজের জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মু'মিনের কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট এক ব্যক্তি বসেছিল। লোকটির কয়েকটি মেয়েছিল। সে বললো, হায়! এসব মেয়ে যদি মরে যেতে তাহ'লে কতই না ভালো হতো। আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ কথা শুনে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে তাকে বললেন, 'তুমি কি তাদের রিযিক দাও।'

কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করা অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং ছিলেন কন্যা সন্তানের পিতা, কন্যা সন্তান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যখন কারো গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা এসে বলেন, হে গৃহের বাসিন্দারা। তোমাদের ওপর সালাম। ফেরেশতারা ভূমিষ্ঠ কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার ওপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ। যা একটি দুর্বল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।

বিশ্বনবী বলেছেন, 'কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা। কন্যারা অত্যন্ত মুহাব্বাতওয়ালী এবং কল্যাণ ও খায়ের বরকতের হয়। যার কোন কন্য সন্তান থাকবে, সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসঙ্গে থাকব।

শুধু নিজের কন্যা সন্তানই নয় নিজের বোনের ব্যাপারেও একই কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে, তাদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্যে জান্নাত নির্দিষ্ট হয়েছে।

বিয়ের পরে কারো বোন বা মেয়ে যদি স্বামীর বাড়ি থেকে ফেরৎ আসতে বাধ্য হয়, সেই মেয়ে বা বোনের ব্যাপারে খরচ করাকে বলা হয়েছে সর্বোত্তম দান। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'তোমাকে সর্বোত্তম দানের কথা বলব কি? তা হল, তোমার কন্যাকে যদি বিয়ের পর তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তখন তার জন্যে উপার্জন করার তুমি ছাড়া কেউ না থাকে, তাহলে তখন তার প্রতি তোমার কর্তব্য হবে অতীব উত্তম সাদকা।'

আল্লাহর রাসূল বলেন, 'যে ব্যক্তি দু'কন্যা প্রতিপালন করলো। এমনকি তারা দু'জন উভয়ে বালেগ এবং জওয়ান হয়ে গেল। কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে সে এবং আমি এ দু'আঙ্গুলের মত এক সাথে হবো এবং তিনি নিজের আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে দেখালেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে। সে তিন মেয়েকেই নিজের অভিভাবকত্বে রেখেছে। তাদের প্রয়োজনাবলী পূরণ করেছে এবং তাদের প্রতি রহম করেছে। তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। কোন গোত্রের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু' কন্যা হয়। রাসূল জবাব দিলেন, যদি দু' কন্যা হয় তাহলেও এ সওয়াব পাওয়া যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মন্তব্য করেছেন, মানুষ যদি আল্লাহর রাসূলকে একটি মাত্র কন্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করতো, তাহলে তিনি এক মাত্র কন্যার ব্যাপারেও সুসংবাদ প্রদান করতেন।

হাদীস শরীফে আরেকটি আকর্ষণীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একজন গরীব মহিলা তার দু'টি কন্যাসহ আমার নিকট এলো। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। সে দুটি খেজুর তার দু' মেয়েকে দিল এবং অবশিষ্ট খেজুরটি দু'ভাগে ভাগ করে দু' কন্যাকে দিয়ে দিল। এ কাজ আমার খুব ভালো লাগলো। আমি তার এ কাজের কথা আল্লাহর রাসূলের নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এ দু' কন্যা প্রতিপালনের বদৌলতে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন।

কন্যা সন্তানের পিতামাতার হাতেই তাদের জান্নাত। তারা যদি পুরোপুরি কন্যা সন্তানের হক আদায় করেন, তাহলে নিশ্চিত জান্নাত লাভ করবেন। আর হক আদায় না করলে নিজেরাই দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন। কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক। পৃথিবীর কোন আদর্শ বা তথাকথিত ধর্ম কন্যাকে কোনই মর্যাদা দেয়নি। কন্যা শয়তানের সঙ্গী, কন্যা সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রতীক, কন্যা নরকের দরোজা, কন্যা মানুষের মধ্যে গণ্য নয় ইত্যাদী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আল্লাহর নাজিল করা জীবন বিধান একমাত্র ইসলামই বলেছে, কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক।

১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আমলের নথিপত্র তার সামনে খুলে ধরা হবে।' অর্থাৎ সে পৃথিবীর জীবনে যা করেছে, তার রেকর্ড সামনে পেশ করা হবে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সূরা নাবার ২৯ নম্বর আয়াতে তাফসীর পড়ুন।)

১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আসমানকে খুলে ফেলা হবে।' অর্থাৎ বর্তমানে মানুষ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পায় চন্দ্র, সূর্য মেঘমালা ইত্যাদি। এসবের উর্ধ্বে যা কিছু রয়েছে তার কিছুটা চোখে পড়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু এসব তো সামান্য বিষয়, এরচেয়ে এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে মহাশূন্যে-যা মানুষের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে। মহান আল্লাহ যে ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার একবিন্দুও মানুষ জানে না। সেদিন মানুষের চোখের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে। তখন মানুষ সমস্ত কিছুই অবলোকন করতে পারবে। আকাশ নামক যে পর্দা দিয়ে যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে, সেদিন এই আড়াল রাখা হবে না এবং তার কোন প্রয়োজনীয়তাও থাকবে না।

১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন জাহান্নামকে আগুন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হবে, যখন জান্নাতকে মানুষের কাছে নিয়ে আসা হবে। প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তখন জানতে পারবে সে কি নিয়ে হাযির হয়েছে।' অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবার পরে হাশরের ময়দানে আদালতে আখিরাতে সমস্ত মানুষের বিচারপর্ব অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। এই অবস্থায় একদিকে চির শান্তির জায়গা আল্লাহর জান্নাত যাবতীয় নে'মাতসহ মানুষের দৃষ্টি গোচরে আনা হবে এবং

অপরদিকে কঠিন আযাবের স্থান জাহান্নামকেও মানুষের দৃষ্টি সীমানার মধ্যে নিয়ে আসা হবে। পৃথিবীতে যারা আমলে সালেহ্ করেনি, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেনি, এই আন্দোলনের সাথে শত্রুতা করেছে, তারা দেখতে পাবে, বিচারপর্ব শেষেই তাদের স্থান হবে ঐ জাহান্নামে। যে জাহান্নামকে তারা কঠিন শাস্তির যাবতীয় উপকরণসহ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। অথচ এই জাহান্নাম সম্পর্কে তারা পৃথিবীতে কতই না উদাসীন ছিল। ইসলামের কথা যারা বলেছে এবং ইসলামের কাজ যারা করেছে, তারা এই জাহান্নামের শাস্তির কথা বারবার শুনিয়েছে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি। যে বিষয়টিকে তারা বিশ্বাস করেনি এবং উপহাস করেছে, সেই বিষয়টিই আজ তারা বাস্তবে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারতো আমলে সালেহ্ তারা তা করেনি, বরং পৃথিবীতে যারা করতো তারা তাদেরকে শত্রু মনে করেছে। এখানে তারা ঐসব কাজই পৃথিবী থেকে নিয়ে এসেছে, যেসব কাজ তাদেরকে আজ জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। অপরাধীরা দেখতে পাবে, পৃথিবীতে থাকতে তারা কিভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করেছে, দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় বানোয়াট কাহিনী, মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে, কিভাবে অপরকে ঠকিয়েছে, কিভাবে প্রতারণা করেছে এবং অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে যা কিছু করেছে, তা সবই সেখানে উপস্থিত দেখতে পাবে।

অপরদিকে আল্লাহর জান্নাতকে সমস্ত নে'মাতসহ মানুষ দেখতে পাবে। পৃথিবীতে যারা আমলে সালেহ্ ও দ্বীনি আন্দোলন করেছে, এই আন্দোলনকে সাহায্য করেছে, এর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে, এর পেছনে অর্থ ব্যয় করেছে, আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে আল্লাহর জান্নাত দেখে। তারা দেখবে, এই জান্নাতের ওয়াদা-ই তাদের সাথে করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ইসলামকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বীনি আন্দোলন করলে, আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিলে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিলে, নিজের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করলে, আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাত দান করবেন। ঐ তো সেই জান্নাত-যা অসংখ্য নেয়ামতসহ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঐ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহর এই সম্মানিত ও মর্যাদাবান বান্দাহ্রাও তাদের সেই সব আমল সেখানে উপস্থিত দেখতে পাবে, যেসব আমলের বিনিময়ে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছে। তারা দেখতে পাবে, কবে কোনদিন পরনের কাপড় না কিনে, এক ওয়াক্ত কম খেয়ে, রোগাক্রান্ত অবস্থায় ওষুধ না কিনে, ছেলে-মেয়েকে খেলনা কিনে না দিয়ে সেই অর্থ ইকামতে দ্বীনের কাজে ব্যয় করেছিল। কবে কোন দিন দ্বীনি আন্দোলনের প্রয়োজনে সময় দিতে গিয়ে স্কুল-কলেজের লেখা-পড়া ঠিক মতো করতে পারেনি। আন্দোলনের ময়দানে সময় দিতে গিয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় কাজে সময় দিতে পারেনি। নিজের প্রয়োজনপূরণ না করে দ্বীনি ভাইয়ের প্রয়োজনপূরণ করেছে, এসব কিছুই আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন তার সেই প্রিয় বান্দাহ্দের সামনে উপস্থিত করে বলবেন, 'বান্দাহ্! তুমি যা কিছুই করেছিলে তা শুধুমাত্র আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। আমি তোমার এসব কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তার বিনিময়ে আজ তোমাকে আমি জান্নাত দান করলাম।'

অপরাধীরা এসব দৃশ্য দেখবে আর আফসোস করতে থাকবে। তারা বলবে, আমরাও যদি পৃথিবীতে ওদের মতোই আমলে সালেহ্ ও ইকামতে দ্বীনের কাজ করতাম, আল্লাহর বিধান অনুসারে পৃথিবীতে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতাম, মানুষের বানানো বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজনীতি না করতাম, ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন নেতা-নেত্রীদের আনুগত্য না করতাম তাহলে ঐ জান্নাত আমরাও লাভ করতাম।

১৫ থেকে ২৫ নম্বর আয়াত থেকে এই সূরার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে যারা তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করছিল, তাদের সামনে কিয়ামতের বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ যে সত্যই নবী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি যা পেশ করছেন, তা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা বাণী, তার সত্যতা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

শপথ করা হয়েছে তারকাপুঞ্জের, যা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে এবং এই অবস্থায় তারকা কোন সময় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে আবার অদৃশ্যও হয়ে যায়। গ্যালাক্সি একটির কাছ থেকে আরেকটি অকল্পনীয় গতিতে এক অজানা গন্তব্যে ছুটে যাচ্ছে এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর তা আর দেখা যাচ্ছে না। রাত বিদায় নিচ্ছে এবং প্রভাতকালের আগমন ঘটছে। প্রভাতের আগমনের অর্থই হচ্ছে দিনের সূচনা হওয়া। পৃথিবীতে কোন প্রাণী তার জীবনের সূচনা করে প্রথম শ্বাস গ্রহণ করে। প্রভাতকালের সূচনার অর্থও হলো দিনের যাত্রা শুরু। এসব বিষয়ের শপথ এ জন্যই করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের সামনে যা কিছুই পেশ করছেন, তা আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা বাণী। এই বাণী তিনি রাতের অন্ধকারে কোন নিভৃত স্থানে বসে রচনা করেননি। তিনি যাঁর মাধ্যমে বাণী লাভ করে থাকেন, তাঁকে তিনি দিনের আলোয় বিশাল আকাশের শূন্যমার্গে নিজ চোখে অবলোকন করেছেন।

আমি আমার প্রধান ফেরেশ্তা জিবরাঈলের মাধ্যমে বাণী প্রের্ণ করেছি। আমার কাছে তিনি উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং আমার পক্ষ থেকে প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী। আমার সৃষ্টি সমস্ত ফেরেশ্তা তাঁর নেতৃত্বাধীন কর্মরত রয়েছে। তিনিই তোমাদের জন্য নির্বাচিত নবীর কাছে আমার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ করে থাকেন। আর আমি যাকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করেছি, তিনি তোমাদের সাথী। তোমাদের মধ্যেই তিনি তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সোনালী দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য জীবন বিধান প্রেরণ করেছি, সেই বিধান তোমরা অনুসরণ করবে না বলেই তোমরা তাঁকে পাগল নামে আখ্যায়িত করছো, কিন্তু তিনি যে পাগল নন এ কথা তোমাদের থেকে ভালো আর কে জানে।

যে কথাগুলো এই সূরার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সেই কথাগুলোই আরো বিস্তারিতভাবে সূরা আন্-নাজম-এ বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَالنَّجْمِ اِذَاهَوٰى-مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوٰى-وَمَايَنْطِقُ عَنِ....اِلٰى اٰخِرِالاٰيَةُ

শপথ তারকারাজির যখন তা অস্তমিত হলো। তোমাদের সাথী না পথভ্রষ্ট হয়েছে, না বিভ্রান্ত। সে নিজের মনের ইচ্ছায় কথা বলে না। এটা তো একটা ওহী, যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়। তাকে এক মহাশক্তিধর শিক্ষা দিয়েছে, যে বড়ই কুশলী। সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যখন সে উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিল। পরে কাছে এলো এবং ওপরে শূন্যে ঝুলে থাকলো।

এমনকি কি, দুই ধনুকের সমান অথবা তা থেকে কিছুটা কম দুরত্ব থেকে গেল। তখন সে আল্লাহর বান্দাহকে ওহী পৌছালো যে ওহীই তাকে পৌছানোর ছিল। দৃষ্টি যা কিছু দেখলো, হৃদয় তাতে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি। এখন তোমরা কি সেই ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া করো যা সে নিজের চোখে দেখেছে। আর একবার সে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে তাকে দেখেছে। (সূরা আন্ নাজম-১-১৪)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূল, ওহী ও জিবরাঈল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তারকারাজির শপথ করেছেন। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, অন্ধকার রাতে তারকার ঝাপসা এবং অস্পষ্ট আলোকে কোন বস্তুর আকার আকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যায় না। এই তারকা যখন অস্তমিত হয়ে যায় রাতের ঘন অন্ধকার বিদায় গ্রহণ করে, তারপর পূর্বাশার প্রান্তে নবারুণের আগমনী বার্তা ঘোষিত হয়। ক্রমশঃ তরুণ তপন উদিত হতে থাকে এবং তার প্রভাময় আলোয় দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সূর্য কিরণে প্রতিটি বস্তুর পরিচিতি স্পষ্ট হয়ে যায়। আমি যাকে সারা বিশ্বের মানবতার মুক্তির দুত হিসাবে প্রেরণ করেছি, সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনটাও তোমাদের কাছে অস্ত যাওয়া তারকার পরে উদিত সূর্যের মতই। তাঁর জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশও তোমাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা ঝাপ্‌সা নয়।

অন্ধকার নিশীথে দৃশ্যমান অস্পষ্ট আলোর অধিকারী তারকারাজি রাতের শেষে ক্রমশঃ অস্ত যেতে থাকে, এক সময় তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়। তিমিরাচ্ছন্ন রজনীর ঘন অন্ধকার ভেদ করে পূর্ব গগনে তরুণ তপন উদিত হয়ে তার কিরণচ্ছটা দুর্বাঘাসে পতিত নিশীথ শিশিরের ওপরে ছড়িয়ে দেয়, শিশির বিন্দুগুলো মুক্তার মতই ঝলমল করতে থাকে। ঠিক আমার নবীর জীবনটাও তোমাদের কাছে ঝলমলে। তিনি কোন বংশের লোক, কার সন্তান, কোথায় তিনি লালিত-পালিত হলেন এসব দিক তোমাদের কাছে দিবালোকের মতই স্পষ্ট। তিনি কিভাবে আহার করেন, কিভাবে ঘুমান, তার রুচিবোধ, কথার ধরন, লজ্জাশীলতা, সততা, আমানতদারী, তাঁর চরিত্রের অপূর্ব গুণাবলী এসবই তোমাদের জানা এবং জানো বলেই তোমরা তোমাদের সমাজের ভেতরে তাঁকে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছো।

এ কথাও তোমরা জানো যে, তোমাদের বর্তমান সমাজের অবস্থা কি এবং তোমরা কোন পথ ও মত অনুসরণ করছো। তোমাদের সমাজ যেসব খারাপ গুণাবলীর ভেতরে নিমজ্জিত তা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি, কোন অন্যায় তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি, কোন পংকিলতার ধারে কাছেও তিনি কখনো যাননি। তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সচেতনতা সম্পর্কে তোমরা অবগত আছো। চরিত্রের যতগুলো মহৎ দিক থাকলে একজন মানুষকে 'আল আমিন' উপাধিতে ভূষিত করা যায়, সেই উপাধিতে তোমরাই তাঁকে ভূষিত করেছো। কারণ তিনি তোমাদের সমাজেরই একজন-তিনি তোমাদের অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কোন অভিযোগ উত্থাপন করলে সেই অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় কিনা, এই রায় দেয়ার জন্য তোমরাই যথেষ্ট। তাঁর গোটা জীবন ও ব্যক্তিত্ব তোমাদের সামনে আকাশের ঐ সূর্যের মতই স্পষ্ট।

সুতরাং তিনি পাগল, পথভ্রষ্ট অথবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন কিনা এই বিচার তো তোমরাই করতে পারো। কারণ তিনি তোমাদের সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছেন, তোমাদের মাঝেই তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছে, কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়েছে, তারুণ্য আর যৌবন কাল অতিবাহিত করে বর্তমানে প্রৌঢ়ত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। সাধারণত মানুষ যখন তারুণ্যে

উপনীত হয় এবং যৌবনের সিঁড়িতে পদার্পন করে, তখন তার ভেতরে এক ধরনের চঞ্চলতা অনুভূত হয়। কারো কারো ভেতরে এই চঞ্চলতা প্রবল বন্যার বেগেই প্রবাহিত হয়ে নৈতিকতার সর্বশেষ সীমা লংঘন করে। তারুণ্য আর যৌবনের এই চঞ্চলতা কম আর বেশী প্রতিটি মানুষের ভেতরেই বিদ্যমান থাকে এবং তা পর্দার আড়ালে অন্য মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কিছুটা হলেও প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

তোমরা স্বয়ং সাক্ষী, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কোন একটি অধ্যায়েও সীমা লংঘনমূলক কোন চঞ্চলতা প্রকাশিত হয়নি। তিনি সত্য আর ন্যায়ের পরিপন্থী কোন কর্মকান্ডে কখনো নিজেকে ক্ষণিকের জন্যও নিয়োজিত করেননি। এই ধরনের একজন ব্যক্তিত্ব হঠাৎ করেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বেন, সত্য আর ন্যায়ের বিপরীতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করবেন, এমন কথা তোমরা কল্পনা করলে কিভাবে?

একজন মানুষকে পাগল, বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট তখনই তোমরা বলতে পারো, যে ব্যক্তিকে তোমরা চেনো না। যার জীবনের প্রতিটি দিক ছিল তোমাদের কাছে অজ্ঞাত। যিনি কোন অপরিচিত স্থান থেকে হঠাৎ আগমন করে কোনদিন না শোনা কথাবার্তা শুনিয়ে আবার কোন অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে পড়েন। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের বলা উক্তিসমূহ প্রযোজ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তোমাদের চির পরিচিত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তোমাদের বলা উক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

তিনি তাঁর জীবনের সুদীর্ঘকালের ঐ মুহূর্তটি পর্যন্ত তোমাদের কাছে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হতেন, যে মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজেকে নবী হিসাবে দাবী করেননি, তোমাদেরকে এক আল্লাহর গোলামী করার কথা বলেননি, আখিরাতের কথা বলেননি। যখনই তিনি দাবী করলেন, আমাকে তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। আমার কাছে মহান আল্লাহর প্রধান ফেরেশ্তা ওহী নিয়ে আগমন করছেন, আমার প্রতি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে, তখনই তোমরা তাঁর প্রতি অর্থহীন, অর্বাচিন ও অযৌক্তিক অভিযোগ আরোপ করা শুরু করলে। কারণ, তিনি যা কিছুই তোমাদের সামনে পেশ করছেন, তা তোমাদের কামনা-বাসনার বিপরীত, তাঁর কথা মেনে নিলে তোমরা যে অপরাধে লিপ্ত রয়েছো, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। অপরাধ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে না বলেই তোমরা তাঁর প্রতি অসত্য অভিযোগ আরোপ করছো, তাঁর প্রতি নির্দয় মন্তব্য করছো।

নবুওয়াতের পূর্বে দীর্ঘ ৪০ বছরের জীবনে তিনি এমন কোন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেননি এবং তা থেকে এমন তথ্য ও তত্ত্বও তিনি জানার সুযোগ পাননি, যার কারণে হঠাৎ করে নবুওয়াতের দাবির সাথে সাথে তাঁর মুখ থেকে জ্ঞানের এই প্রসবণ নির্গত হতে পারে। যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, উন্নত নিয়ম-নীতির কথা তাঁর মুখ থেকে বের হচ্ছে, ইতিপূর্বে তাঁর ভেতরে এসব বিষয়ে কোন আগ্রহ- উৎসাহ দেখা যায়নি বা এ পর্যায়ের কোন কথাও তাঁকে বলতে শোনা যায়নি। এমনকি এই পূর্ণ ৪০টি বছরে তাঁর সবচেয়ে কাছের বন্ধু, আপন আত্মীয় তাঁর কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে ও গতি-বিধিতে এমন কোন পূর্বাভাষ বা ভাবধারাই লক্ষ্য করেননি, যার কারণে ৪০ বছর বয়সে উপনীত হয়েই তিনি হঠাৎ নবুওয়াতের দাবি করতে পারেন। আল্লাহর বাণী হিসাবে তিনি এখন যা পেশ করছেন, তা যে তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত কোন বাণী নয়, বরং তাঁর কাছে বস্তুজগতের বাইরে থেকে আসা বাণী এটাই তার অব্যর্থ–অকাট্য প্রমাণ।

কারণ মানবীয় মস্তিষ্ক নিজের জীবনকালের কোন এক পর্যায়েও এমন কোন জিনিস পেশ করতে পারে না, যার উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন পূর্ববর্তী পর্যায়সমূহেও দেখতে পাওয়া যায়নি। এ কারণেই মক্কার ইসলাম বিরোধিদের মধ্যে যারা চতুর ছিল, তারা অনুভব করতে পারলো যে, কোরআনকে মুহাম্মাদের স্বকপোলকল্পিত বলা একান্তই একটা অর্থহীন অপবাদ, তখন তারা প্রচার করতে লাগলো যে, অন্য কোন ব্যক্তি মুহাম্মাদকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়।

তাদের এই অপবাদ পূর্বের অপবাদের তুলনায় আরো ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হলো। কারণ মক্কা বা গোটা আরব অথবা গোটা পৃথিবীতে এমন কোন যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অস্তিত্ব ছিল না, যার দিকে ইশারা করে বলা যেতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি এমন একটি ছন্দবদ্ধ বিজ্ঞানময় কোরআন রচনা করতে সক্ষম এবং তিনিই তাঁকে এই কোরআন শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন।

সুতরাং তিনি যা কিছুই পেশ করছেন, তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই পেশ করছেন। এ ব্যাপারে তিনি যেমন বিভ্রান্ত নন ঠিক তেমনি পথভ্রষ্টও নন। কারণ তাঁর জীবনে এটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, দীর্ঘ এই বয়স পর্যন্ত তিনি মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা বা এই ধরনের অন্যান্য নৈতিক কদর্যতার কোন স্পর্শ তাঁর চরিত্রে ঘটেনি। গোটা সমাজে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যে ৪০ বছরকাল একত্রে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন বিষয় রাসূলের চরিত্রে ছিল বলে দাবি করতে পারে। পক্ষান্তরে যেসব লোক তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তারাই তাঁকে একজন সত্যবাদী, সত্যাদর্শী, নিষ্কলুষ ও সমস্ত দিক দিয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসাবেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে দেখতে পেয়েছে।

আলোচ্য সূরা তাকভীর এবং সূরা নাজম-এ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল সম্পর্কে এমন কথা বলেননি যে, 'তোমাদের নবী বা রাসূল অথবা আমি যাকে তোমাদের জন্য নবী হিসাবে নির্বাচিত করেছি, তিনি পাগল নন।' বরং তিনি বলেছেন, 'সাহিবুকুম' অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গী ও সাথী। কোরআনের আয়াতের এই বর্ণনা ভঙ্গীই ঐসব লোকদের যাবতীয় যুক্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল যারা আল্লাহর রাসূলকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং পাগল বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। কারণ মানুষ তার সঙ্গী-সাথী সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে থাকে। সঙ্গী-সাথী যদি পথভ্রান্ত হন, পথহারা হন, বিভ্রান্ত হন বা পাগল হন, তাকে কোন গুরুত্বই দেয়া হয় না বরং সে হয় উপহাসের পাত্র। এ ধরনের ব্যক্তির ওপরে কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয় না বা তাকে বিশ্বাসও করা যায় না।

তিনি তোমাদের সাথী অর্থাৎ সর্বজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং সবচেয়ে সত্যবাদী, আমানতদার, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, সচেতন, ন্যায় ও সত্যের অনুসারী, ইনসাফকারী বলেই তোমরা তাঁর কাছে তোমাদের মূল্যবান দ্রব্যসমূহ গচ্ছিত রাখো। কা'বা ঘরে পাথর স্থাপন করা নিয়ে যে বিবাদে তোমরা জড়িয়ে পড়েছিলে, সেই বিবাদের মীমাংসাকারী হিসাবে তাঁকেই তোমরা নির্বাচিত করেছিলে এবং তাঁর দেয়া রায় অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছিলে। তাঁকেই তোমরা আল আমীন উপাধি দিয়েছো। নিশ্চয়ই তোমরা কোন উন্মাদ, পথহারা বা বিভ্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে এসব করোনি।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বিশেষণে তারা বিশেষিত করার চেষ্টা করেছিল, 'সাহিবুকুম-অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গী বা সাথী'-কোরআনের এই একটি মাত্র শব্দই তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের মহান চরিত্রই দ্বীনি আন্দোলন

বিরোধিদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র সেদিন ব্যর্থ করে দিয়েছিল। যে অভিযোগসমূহ তারা রাসূলের বিরুদ্ধে উত্থাপন করতো, তা সবই স্বয়ং অভিযোগকারীদের দিকেই ফেরৎ আসতো। এর একমাত্র কারণ ছিল আল্লাহর রাসূলের অনুপম চরিত্র। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিরোধী নেতারা রাসূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতো আর সমাজের সাধারণ মানুষ রাসূলকে সেসব অভিযোগ থেকে মুক্ত অবস্থায় দেখতে পেতো। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল।

বর্তমানেও যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করছে, এসব অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা অনুপম চরিত্র দিয়ে প্রমাণ করতে হতে। দ্বীনি আন্দোলনের আত্ম নিবেদিত লোকগুলো সন্ত্রাসী, দেশ ও সমাজে এরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, এই অভিযোগ বর্তমানে করা হচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী কোরআনের সৈনিকদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চলছে। এসবের মোকাবিলা করতে হবে অনুপম চরিত্র দিয়ে। নিজেদেরকে এমনভাবে সর্বত্র উপস্থাপন করতে হবে, যেন সাধারণ মানুষ অনুভব করতে পারে, কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ যারা করে, তারাই হলো সবচেয়ে ন্যায়-পরায়ণ এবং শান্তিকামী মানুষ।

বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে থেকে আমি যাকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করেছি, তাঁর কাছে আমার পক্ষ থেকে আমার নিযুক্ত করা ফেরেশ্‌তা ওহী অবতীর্ণ করছে। তোমাদের সাথী তাঁকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দেখার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। দিনের আলো যেখান থেকে প্রস্ফুটিত হয়, তিনি আকাশের সেই উজ্জ্বল দিগন্তে তাঁকে তাঁর প্রকৃতরূপে দেখেছেন। তাঁর দেখার মধ্যে কোন ভুল বা অস্বচ্ছতা ছিল না। দেখার ব্যাপারে বা অনুভব করার ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি ও মন প্রতারিত হয়ে থাকে। কিন্তু তোমাদের সাথী তাঁকে এমনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, এ ব্যাপারে না তাঁর দৃষ্টি প্রতারিত হয়েছে আর না তাঁর মন প্রতারিত হয়েছে। তিনি যা দেখেছেন, তা সত্য দেখেছেন।

আল্লাহর রাসূল প্রধান ফেরেশ্‌তা হযরত জিবারঈল আলাইহিস্ সালামকে ঐ আকৃতিতে দুই বার দেখেছেন, যে আকৃতিতে মহান আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। সাধারণতঃ তিনি আল্লাহর রাসূলের সামনে আসতেন মানুষের আকৃতি ধারণ করে। কিন্তু নবুওয়াতের সূচনায় যেদিন প্রথম তিনি আল্লাহর আদেশে রাসূলের সামনে এলেন, তখন তিনি আকাশের পূর্ব তোরণ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এ অবস্থায় সমস্ত দিকচক্রবাল তাঁর দ্বারায় পরিব্যপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল বলেন, আমি তাঁকে তাঁর সেই আসল আকৃতিতে-যে আকৃতিতে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন-দুই বার ছাড়া আর কখনো দেখিনি। এই দুই বার আমি তাঁকে আকাশ মন্ডল থেকে অবতরণকারী অবস্থায় দেখেছি। তখন তাঁর বিশাল সত্তা পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের মধ্যকার সমস্ত শূন্যলোক পরিব্যপ্ত হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আমি মিরাজের সময় যখন তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে কাছে দেখেছিলাম তখন তাঁর ৬০০ শত ডানা ছিল।

আরবী ভাষায় কুল গাছকে 'সিদ্‌রা' বলা হয় এবং 'মুন্‌তাহা' শব্দের অর্থ হলো 'সর্বশেষ বিন্দু।' অর্থাৎ পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, এটা হলো সেই কুল কাছ, যা সর্বশেষ বিন্দুতে বা শেষ সীমানায় অবস্থিত। আল্লাহর কোরআনের তাফসীরকারগণ বলেন, এটা হলো সেই সীমানা যেখানে সমস্ত জগতের জ্ঞান নিঃশেষ ও পরিসমাপ্ত। এর ওপারে যা কিছুই রয়েছে সে বিষয়ে

মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। এটা এমন একটি স্থান, যার ওপারে কোন সৃষ্টির জ্ঞান বা বোধশক্তি পৌছাতে সক্ষম নয়। আল্লাহর ফেরেশ্তারা এই সীমানা অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখেন না।

আল্লাহর রাসূল সর্বপ্রথম যেদিন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে অবলোকন করলেন, তখন তিনি পূর্ব আকাশের সেই দিগন্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসূল ইতিপূর্বে কোনদিন না দেখা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য অবাক-বিস্ময়ে পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছেন। আল্লাহর প্রধান ফেরেশ্তা তাঁর পূর্ণ আকৃতিতে ক্রমশঃ রাসূলের দিকে এগিয়ে আসছেন। এভাবে আসতে আসতে শেষের খুব কাছে এসে তিনি মহাশূন্যে অবস্থান করতে থাকলেন। কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, এ সময় রাসূল এবং জিব্রাঈলের মাঝে মাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিল। মহান আল্লাহ তাঁর এই প্রধান ফেরেশ্তার গুণাবলী সম্পর্কে কোরআনে বলেছেন, তাঁকে প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আমানতদার। রাসূলকে দেয়ার জন্য যে ওহী তাঁর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, তিনি তা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে দিয়ে থাকেন।

হযরত জিব্রাঈল ওহী নিয়ে রাসূলের কাছে আগমন করেন, এ জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তি তাঁকে গালি দিতো এবং শত্রু মনে করতো। সূরা বাকারায় আল্লাহ এ সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, জিব্রাঈলকে যারা শত্রু মনে করে এবং তাঁর সাথে যারা শত্রুতা করে, প্রকারান্তরে তারা আল্লাহর সাথেই শত্রুতা করে থাকে। কারণ জিব্রাঈল আমারই নির্দেশে ওহী অবতীর্ণ করে থাকে। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্য জগতের যেসব দৃশ্য দেখিয়েছেন, মানুষের কল্যাণে যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, এসবের সামান্য একটি বিষয়ও রাসূল গোপন রাখেন না। সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি মানুষের সামনে বর্ণনা করে থাকেন। সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দিয়ে থাকেন। মানুষের কাছে সত্য পৌছানোর ব্যাপারে তিনি মোটেও কৃপণ নন।

অদৃশ্য জগৎ ও কোরআনের ব্যাখা তিনি নিজস্ব কল্পনাশক্তির মাধ্যমে দেন না। এসব ব্যাপারে তিনি হলেন সরকারী ব্যাখ্যাদাতা-অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবগত হয়ে থাকেন। তিনি যা কিছুই বলেন, তা শয়তানের প্রভাব মুক্ত। তাঁর কোন কথা অভিশপ্ত শয়তানের বাণী হতে পারে না। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'কোরআন শয়তান কর্তৃক অবতীর্ণ হতে পারে না' শিরোণাম দেখুন।)

২৬ থেকে ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, বিষয়টি তোমাদের কাছে পরিষ্কার যে, তোমাদের মধ্যে যিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলেন, তিনি কোন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব পথভ্রান্ত হতে পারেন না, বিভ্রান্ত হতে পারেন না, তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে না, তিনি মিথ্যা বলেন না, কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন না। এসব বিষয়ে তোমরাই স্বয়ং সাক্ষী। সুতরাং তিনি যা কিছু আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে পেশ করছেন, তা অনুসরণ না করে তোমরা কোন ধ্বংস গহ্বরের দিকে ধাবিত হচ্ছো? আমি আমার রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তা গোটা পৃথিবীর মানবতার জন্য কল্যাণকর জীবন বিধান। (কোরআনের বিস্তারিত পরিচয় জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আল কোরআন পরিচিতি' শিরোণাম থেকে 'মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা সঠিক পথ বাছাই করে এটি শুধু তাদের জন্যে উপদেশ।' এর অর্থ হলো মহান আল্লাহ্ যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন তা সব থেকে অধিক কল্যাণকর এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কল্যাণ মানবতা লাভ করবে তখনই যখন তা অনুসরণ করা হবে। কোন ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী বা কোন রাষ্ট্র তখনই এই কোরআন থেকে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে, যখন তারা নিজেরাই সত্য গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'কোরআনই সিরাতুল মুস্তাকিম' শিরোণাম থেকে 'কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের শর্ত' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

২৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আসলে তোমরা তো কিছুই চাইতে পারো না, হ্যাঁ চাইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা-যিনি জগৎসমূহের রব।' অর্থাৎ মানুষ যা কিছুই কামনা করুক না কেন, তা সে লাভ করতে সক্ষম নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাইবেন। মানুষ ইচ্ছা করলেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না, মানুষের চাওয়ার সাথে আল্লাহর পরিকল্পনার সামঞ্জস্য থাকতে হবে। একই কথা বলা হয়েছে সূরা আদ্ দাহারের ৩০ নম্বর আয়াতে। বলা হয়েছে, 'আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ চাইবেন।'

আল্লাহর এই কোরআন অবশ্যই হেদায়াতের গ্রন্থ, এই গ্রন্থ থেকে মহাকল্যাণ লাভ করা যায়। এখন যার ইচ্ছা সে এই কোরআনের বিধান অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতে পারে এবং মানুষের উচিতও এটাই যে, সে এই বিধান অনুসরণ করবে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ কল্যাণ লাভের প্রত্যাশা করলেই সে তা লাভ করতে পারে না। আল্লাহ যদি না চান তাহলে মানুষের চাওয়ায় কোন কিছুই ঘটে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর চাওয়াও অন্ধ ও অযৌক্তিকভাবে হয় না। আল্লাহ যা কিছু চান তা তিনি নিজের অসীম জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকৌশলের ভিত্তিতেই চান। তিনি তাঁর সীমাহীন জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকৌশলের ভিত্তিতে তাঁর যে বান্দাকে রহমত লাভের অধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করেন, তাঁকেই রহমত দিয়ে থাকেন। আর যাকে তিনি সীমা লংঘনকারী স্বৈরাচারী জালিম হিসাবে দেখতে পান, তার জন্য লোমহর্ষক শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন।

একটি কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, একজন মানুষ হেদায়াত লাভ করার প্রবল আশা পোষণ করলো, তার সেই আশা-ই তাকে হেদায়াত লাভে ধন্য করবে না। সেই সাথে তাকে অবশ্যই আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত হতে হবে। যে ব্যক্তি মহাসত্যের সন্ধান করে ফিরছে, সত্য গ্রহণ করার জন্য যার হৃদয় লালায়িত, মহান আল্লাহ্ তাঁর অন্তরের অবস্থা অনুভব করেন এবং তার জন্য সত্য গ্রহণের সমস্ত পথ উন্মুক্ত করে দেন। আর যে ব্যক্তির অন্তর সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, মিথ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকাতেই যার তৃপ্তি, তার জন্য সেই পথই তিনি প্রশস্ত করে দেন।

বান্দার কোন কাজই এককভাবে তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না; বান্দার প্রতিটি কাজ তখনই সফল হতে পারে, যখন আল্লাহর ইচ্ছা আর বান্দার ইচ্ছা একাকার হয়ে যায়, তখনই বান্দাহ্ সফল হয়। এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল বিধায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিষয়টি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে অসংখ্য মানুষ তার নিজের পথভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্ব মহান আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলে থাকে যে, আল্লাহ চাইলেই তো আমরা সত্য পথের পথিক হতাম, তিনি চাননি বলেই তো আমরা সত্য পথ অনুসরণ করতে পারিনি।

মূল বিষয় হলো, মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে যদি স্বাধীন করে দেয়া হতো, অর্থাৎ মানুষ যা ইচ্ছা করবে তাই ঘটবে, তাহলে এই পৃথিবীতে নিয়ম-শৃঙ্খলা বলে কিছুই থাকতো না। গোটা পৃথিবী মানুষ বাসের অনুপোযোগী হয়ে যেতো। গোটা সৃষ্টিজগতকে মহান আল্লাহ যে নিয়মের অধীনে পরিচালিত করছেন, তার সবকিছুই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। সৃষ্টির প্রয়োজনে আল্লাহ সূর্য তাপ অথবা বৃষ্টি দিয়ে থাকেন। মানুষ ইচ্ছা করলো, এই মুহূর্ত থেকে সূর্য আর তাপ দেবে না এবং বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে যাক। মানুষের এই ইচ্ছা যদি বাস্তবায়ন করার কোন ব্যবস্থা তার হাতে থাকতো, তাহলে গোটা সৃষ্টিজগৎ মহাক্ষতির সম্মুখীন হতো। এ জন্য সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী যে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা শুধুমাত্র এই জন্য যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও চাওয়াটাই সমস্ত সৃষ্টির ইচ্ছা ও চাওয়ার ওপরে প্রভাবশালী ও বিজয়ী।

সমস্ত সৃষ্টির ইচ্ছাসমূহের কার্যকারিতা মূলত কেবলমাত্র মহান রব-আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা কর্তৃক একচ্ছত্রভাবে-নিরঙ্কুশভাবে নিয়ন্ত্রিত। মানুষ তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ঠিক তখনি সফল হয়, যখন মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্কে সেই কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে সুযোগ দিয়ে থাকেন। সত্যপথ আর মিথ্যাপথ অনুসরণের বিষয়টির পেছনেও ঠিক এই সূত্রই সক্রিয় রয়েছে। কেউ সত্যপথ অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হলো আর অমনি সে সত্য পথের পথিক হয়ে গেল, বিষয়টি এমন নয়। এর পেছনে আল্লাহর ইচ্ছা ও রহমত থাকতে হবে। মানুষ সত্যপথ অনুসরণ করবে এই ইচ্ছা সে পোষণ করলো, আল্লাহ সেই মানুষটির ইচ্ছাপূরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখনই সে মানুষ সত্যপথের পথিক হতে সক্ষম হবে।

অনুরূপভাবে একজন মানুষ ভ্রান্তপথের পথিক হবে এই ইচ্ছা সে পোষণ করলো, আল্লাহ সে মানুষের মনের অবস্থা দেখে তাকে ভ্রান্তপথে চলার সুযোগ করে দিলে তবেই সে ভ্রান্তপথের পথিক হতে পারবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ এভাবে সুযোগ দিয়ে থাকেন যে, একজন মানুষ তার চিন্তাশক্তি ও প্রতিভাকে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত করবে, এটা করার পথে আল্লাহ তা'য়ালা তার ইচ্ছাশক্তি, প্রতিভা ও চিন্তাশক্তি বিকল করে দেন না। আল্লাহর যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা কার্যকর থাকার কারণে একজন মানুষ পৃথিবীতে জীবিত থাকে, সেই ব্যবস্থাপনা সেই মুহূর্তে অকার্যকর করে দেন না।

এভাবে আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ভ্রান্তপথের পথিকের জন্যেও সক্রিয় থাকে। সত্যপথের যারা পথিক হতে আগ্রহী, তাদের জন্যেও অনুরূপ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সক্রিয় থাকে। সত্যপথের পথিক হবার জন্য মহান আল্লাহর রহমত একান্ত জরুরী। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রহমতের অমর্যাদা হবে, এমন স্থানে রহমতও দেন না। আল্লাহর রহমতের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেই রহমত লাভ করা যায়। তাঁর রহমত লাভ করতে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে কতকগুলো শর্তপূরণ করতে হবে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আল্লাহর রহমত লাভের আবশ্যক শর্তাবলী' শিরোণাম পড়ুন।)

সূরা আল-ইনফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৮২

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতে 'ইনফাত্বারাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ শব্দকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরার আলোচিত বিষয়ও এ কথা স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, এ সূরা মক্কায় নবুয়াতের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার জন্য সর্বপ্রথমে মানুষের চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটানোর প্রয়োজন। মানুষের মানসজগৎ যখন মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে, মনের জগতে আল্লাহর ভয় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিধানের সার্বিক দিক অনুসরণ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। এ জন্য আমরা দেখতে পাই, মক্কায় অবতীর্ণ অধিকাংশ সূরাসমূহে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। মানুষকে বুঝানো হয়েছে, এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে, যখন সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে আল্লাহর আদালতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে এবং মানুষ আল্লাহর আদালতে যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে বাধ্য হবে। এ জন্য কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য মানুষের সামনে বারবার পেশ করে চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য সূরাতেও কিয়ামতের দৃশ্য অঙ্কন করে মানুষকে আল্লাহর ভয়ে ভীত করার প্রচেষ্টা অধিক লক্ষ্যনীয়।

ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয় হলো, তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত। মানুষকে মহান আল্লাহর গোলামীর দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিষয়ই সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুও আখিরাত। এই আখিরাতের চিত্র এই সূরার এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, যদি কোন ব্যক্তি কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনকে নিজ চোখে দেখতে চায়, সে ব্যক্তি যেন সূরা আত্ তাকভীর, আল ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়।

রাসূলের এই কথার অর্থ হলো, এসব সূরায় কিয়ামতের সেই ভয়ানক দৃশ্য এমন ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে, লোমহর্ষক সেই দৃশ্যের বর্ণনা পাঠ করলে মনে হবে, শিউরে ওঠার মতো সেসব দৃশ্য চোখের সামনেই ঘটছে। কিয়ামতের দিন বর্তমানে পরিদৃশ্যমান ফাটলহীন বিশাল আকাশমন্ডলী কিভাবে দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, উজ্জ্বল আলো বিকিরণরত তারকামন্ডলী কিভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, অগাধ জলধী সমুদ্রগুলোর পানি কিভাবে নিশেষিত হয়ে তার তলদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, এগুলোর ভয়াল চিত্র অঙ্কন করে বলা হয়েছে, এসব সংঘটিত হবার পর পরই পৃথিবীর প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে শেষ মানুষটির কবর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। পুনর্জীবন লাভ করে সমস্ত মানবমন্ডলী আল্লাহর আদালতে দন্ডায়মান হবে। তাদের সামনে সেই আমলনামা পেশ করা হবে, পৃথিবীতে অবস্থান কালে তারা যা করেছিল।

বলা হয়েছে, মানুষের পূর্ব ও পরের যাবতীয় কৃতকর্ম সে জানতে পারবে। মানুষ জীবিত থাকতে যেসব কর্ম করেছে, তার যাবতীয় বিবরণ সে দেখতে পাবে এবং তার মৃত্যুর পরের কর্মও সে দেখতে পাবে। মৃত্যুর পরের কর্ম হলো সেই সব কর্ম, যা সে জীবিত কালে শুরু করেছিল এবং তার মৃত্যুর পরেও সে কর্মের ধারাবাহিকতা চলছিল। এসব বিষয় মানুষের

সামনে উত্থাপন করেই তাকে সতর্ক করা হয়েছে, হে মানুষ! কোন শক্তি তোমাকে প্রতারণায় নিমজ্জিত করে রেখেছে, যে কারণে তুমি তোমার রব-এর গোলামী করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছো? অথচ ঐ রব-ই অনুগ্রহ করে তোমাকে সুন্দর কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন। তোমার দেহে যেখানে যেটা প্রয়োজন এবং পৃথিবীতে তোমার জীবন ধারণ করার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশী দেননি।

তুমি এসব দেখে মনে করছো যে, আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করে এসব দান করেছেন। তুমি যা মনে করছো তা অবশ্যই ঠিক, আমি অসীম করুণা করে এসব দান করেছি। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে শুধু আমার দয়ার দিকটিই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, আমি যে সবচেয়ে বড় ইনসাফকারী, সেদিকটি কি তোমার চোখে ধরা পড়েনি? আমি যে সবচেয়ে বড় সুবিচারকারী তা কি তুমি বুঝো না? আমার দেয়া যাবতীয় নে'মাত ভোগ করে সীমা লংঘনমূলক নীতি অবলম্বন করবে, আর আমি এসবের কোন সুবিচার করবো না, কোন শাস্তি বা পুরস্কার দেবো না, এ কথা কেমন করে ভাবলে? আমি যেমন দয়ালু, তেমনি ইনসাফকারীও। অন্যায়কারীকে শাস্তি দেয়াও আমার দয়ারই অন্তরভুক্ত।

সুতরাং যে কারণে তুমি প্রতারিত হয়ে আমার দাসত্ব করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছো, সেই প্রতারণা থেকে নিজেকে মুক্ত করো। তুমি সাবধান হয়ে যাও, কারণ তোমার যাবতীয় কর্মের রেকর্ড রাখা হচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল লেখকরা তোমার যাবতীয় কর্ম আর গতিবিধি লিপিবদ্ধ করছে। অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সেদিন তোমাদের কর্মের রেকর্ড তোমাদের সামনে পেশ করা হবে এবং তারই ভিত্তিতে তোমরা শাস্তি লাভ করবে অথবা পুরস্কৃত হবে। যারা পৃথিবীতে আমাকে রব হিসাবে গ্রহণ করে আমার দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, তারা আমার জান্নাতের অগণিত নে'মাতের অধিকারী হবে। আর যারা আমার দেয়া বিধানের বিরোধিতা করেছে, অনুসরণ করেনি, তারা জাহান্নামের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে। সেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না। মনে রেখো, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর ইখতিয়ারে সংরক্ষিত থাকবে।

সূরা ইনফিতার-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-১৯-রুকু-১

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۝ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ ثُمَّ مَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) যখন আসমান ফেটে পড়বে, (২) যখন (আসমানের) তারাগুলো ঝরে পড়বে, (৩) যখন সাগরকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) যখন কবরগুলোকে উপড়ে ফেলা হবে, (৫) (তখন) প্রতিটি মানুষই জেনে যাবে যে, (এখানকার জন্যে) সে কি পাঠিয়েছে এবং কি সে পেছনে ফেলে এসেছে! (৬) হে মানুষরা, কোন্ জিনিসটি তোমাদের মহামহিম মালিকের ব্যাপারে ধোকায় ফেলে রাখলো? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে সোজা করে দাঁড় করিয়েছেন এবং তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, (৮) তিনি যেভাবেই চেয়েছেন সেই আঙ্গিকেই তোমাকে গঠন করেছেন।

(৯) কিন্তু (এ কি!) তোমরা শেষ বিচারের দিনটিকেই অস্বীকার করছো। (১০) অথচ তোমাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত (করা) আছে, (১১) এরা (হচ্ছে) সম্মানিত লেখক, (১২) যারা জানে তোমরা যা কিছু করছো। (১৩) নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা (সেদিন আল্লাহর)

অসীম নে'মাতে (পরমানন্দে) থাকবে। (১৪) আর পাপী-তাপীরা অবশ্যই থাকবে জাহান্নামে। (১৫) বিচারের দিনে তারা (সবাই ঠিক মতোই) সেখানে পৌঁছে যাবে। (১৬) সেখান থেকে তারা আর কোনো দিনই পালিয়ে থাকতে পারবে না। (১৭) তুমি কি জানো শেষ বিচারের দিনটি কি? (১৮) হ্যাঁ, (সত্যিই) যদি তোমরা সেই বিচারের দিনটির কথা জানতে! (১৯) যেদিন কোনো মানুষই একজন আরেকজনের কাজে আসবে না, চূড়ান্ত ফায়সালার ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার হাতে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে, 'যখন আসমান ফেটে পড়বে, যখন আসমানের তারাগুলো ঝরে পড়বে,।' আকাশ কিভাবে ফেটে যাবে, বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে অনুভব করা যেতে পারে। একটি বেলুনের মধ্যে গ্যাস বা বাতাস পাম্প করতে থাকলে বেলুনটি ফুলতে থাকে। বেলুনটি কখন ফেটে যাবে তা নির্ভর করে ঐ বেলুনের বাতাস ধারণ ক্ষমতা কতটুকু বা বেলুনটি কতটা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। বিস্তৃতি লাভের অধিক বা ধারণ ক্ষমতার অধিক হলেই বেলুনটি ফেটে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, এই পৃথিবী ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করছে। যে কথা বিজ্ঞানীরা মাত্র কিছুদিন পূর্বে মানব জাতিকে অবহিত করলো, সেই কথাটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে ১৪০০ শত বছর পূর্বে জানিয়ে দিয়েছেন–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ-

আকাশমন্ডলকে আমি নিজস্ব শক্তিবলে সৃষ্টি করেছি আর একে আমি সম্প্রসারণ করছি। (সূরা যারিয়াত-৪৭)

এই আয়াতে ব্যবহৃত 'মুছিউন' শব্দের অর্থ, বিশালতা ও বিস্তৃতি দানকারী, ধনীগণ, বিত্তশালীগণ, প্রচন্ড ক্ষমতাধর, শক্তির নিরিখে কোন কিছুর সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটানো ইত্যাদি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এখানে আকাশমন্ডলের প্রসঙ্গে উক্ত শব্দের অর্থ দাঁড়াবে বিস্তৃতি ও বিশালতা দানকারী। সুতরাং এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে বর্তমানেও সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং অনন্ত কাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। যখন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয়। মহাবিশ্বে যদি সম্প্রসারণ গতি না থাকতো, তাহলে মহাবিশ্বের কোন বস্তুরই বিকাশ ঘটতো না এবং যে গতিতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে গতি সামান্য কম বা বেশী হলে মহাবিপর্যয় ঘটতো, মহাবিশ্বের কোন অস্তিত্বই থাকতো না।

মহাবিশ্ব কি নিয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর মানুষের জানা নেই। বিজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করে যতটুকু জানতে পেরেছেন, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, আমরা খালি চোখে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের যে অবস্থা দেখতে পাই, এর থেকে কয়েক শত কোটিগুণ বিশাল হলো এই মহাবিশ্ব। মানুষ ধারণা করতো রাতের দৃশ্য অসীম আকাশই হলো মহাবিশ্ব জগৎ। কিন্তু মাত্র কিছুদিন পূর্বে বিজ্ঞানীগণ দেখতে পেলেন, দৃশ্য জগতের অগণিত অযুত নক্ষত্রমালা শুধুমাত্র একটি গ্যালাক্সি যা পৃথিবীর ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ দৃশ্যমান মহাবিশ্বের মানে হলো দৃশ্যমান নিকটতম প্রতিবেশী, যা আমাদের থেকে প্রায় ২২ লক্ষ আলোক বর্ষ দূরের আর বিপুল বিরাট জগৎ, নক্ষত্র ধারণ ক্ষমতায় যা ছায়াপথের তিনগুণ এবং বিশাল জগতটিও লক্ষ কোটি আলোক বর্ষ দূর-দূরান্তে অবস্থিত একশত কোটির

মধ্যে একটি সামান্য গ্যালাক্সি মাত্র। এই আলোক বর্ষের হিসাবটি কি! আমাদের জানা আছে যে. আলো প্রতি মুহূর্তে ১, ৮৬, ০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তথা আলো প্রতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সুতরাং আলোর এক মিনিটে অতিক্রমযোগ্য দূরত্ব হলো তার ৬০ গুণ। তাহলে ঘন্টায় বৃদ্ধি পায় আরো ৬০ গুণ। দিনে বৃদ্ধি পায় আরো ২৪ গুণ। বছরে বৃদ্ধি পায় ৩৬৫, ২৫ গুণ। যার দূরত্বের দৈর্ঘ্য হলো কমবেশী ৫, ৮৬৯, ৭১৩, ৬০০, ০০০ মাইল। এর নাম হলো আলোক বর্ষ আর এই হিসাবে পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে রয়েছে তার ব্যাস হলো ১০০, ০০০ গুণ বা ৫৮৬, ৯৭১, ৩৬০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইল–যা ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য। এটা হলো সেই গ্যালাক্সির মাপ বলেছেন বিজ্ঞানীরা, যে গ্যালাক্সিতে এই পৃথিবী অবস্থান করছে। আর এর থেকে কয়েক কোটি গুণে বড় গ্যালাক্সি রয়েছে উর্ধ্ব আকাশে এবং এ ধরনের অতিকায় গ্যালাক্সির সংখ্যা যে কত কোটি, তা বিজ্ঞানীরা আজো জানে না।

আর এসব গ্যালাক্সি একটির থেকে আরেকটি ১৬০, ০০০ থেকে ১০, ০০০, ০০০, ০০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থান করছে এবং যার যার দূরত্ব ঠিক রেখে প্রতি সেকেন্ডে আলোর গতিতে ধাবিত হচ্ছে। এই পৃথিবী যে গ্যালাক্সি গুচ্ছে অবস্থান করছে বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে এই গ্যালাক্সির সংখ্যা হলো মাত্র ২০টি। আর এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যেসব বিশাল গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছেন, সেসব গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের মহাশূন্যতার মহাসমুদ্রে এক একটি বিশাল জগৎ, যে জগৎ সম্পর্কে মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। এসব গ্যালাক্সি বিপুল বিস্তৃতি নিয়ে ব্যাপ্ত রয়েছে। এসব গ্যালাক্সির সামনে আমাদের দৃশ্যমান এই বিশাল জগৎ ক্ষুদ্র একটি বালু কণার সমানও নয়। পৃথিবীর ছায়াপথ বা মিল্কীওয়ে এক অতি সাধারণ দীন হীন গ্যালাক্সি, অনন্ত ঐ মহাবিশ্বে যার কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই।

বর্তমানের বিজ্ঞানীরা এই পৃথিবী থেকে উর্ধ্ব আকাশের মাত্র ১০, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের কোয়াসারকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ ১০, ০০০ মিলিয়ন আলোক বছর দূরত্বের ওপারে ঐ মহাশূন্যে আরো কত বিশাল জগৎ যে রয়েছে, এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণাই নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এতদিন মানুষ যাকে বিশ্বজগৎ বলে মনে করেছে, এই বিশ্বজগতের সমান এবং এর থেকে কয়েক কোটি গুণে বিশাল জগতের সংখ্যা ঐ মহাশূন্যে ১০০ কোটির বেশী। তারা বলছেন, ঐ এক একটি জগতের মধ্যে রয়েছে কল্পনার অতীত অগণিত বিশাল ছায়াপথ, এসব ছায়াপথে রয়েছে অকল্পনীয় সংখ্যক সূর্য, তারকা, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি।

এসব কিছুই সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই পৃথিবী এবং গ্যালাক্সি কেন্দ্রের মাঝে অবস্থিত বাহু প্রতি মুহূর্তে ৫৩ কিলোমিটার বেগে এবং বিপরীত বাহু প্রতি সেকেন্ডে ১৩৫ কিলোমিটার বেগে সম্প্রসারিত হচ্ছে। একই পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে ২০০০ আলোক বর্ষ ব্যাসের গ্যালাক্সি কেন্দ্রও প্রতি সেকেন্ডে ৪০ কিলোমিটার গতিতে। আর এই সম্প্রসারণ নীতি গ্যালাক্সির ভেতরে, বাইরে ও গ্যালাক্সিসমূহের মধ্যে সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। একটি গ্যালাক্সি থেকে আরেকটি গ্যালাক্সির দূরত্ব শত কোটি আলোক বর্ষ এবং এই দূরত্বের মাঝে রয়েছে আরো অগণিত বস্তু। কোন কোন গ্যালাক্সি আলোর গতিতে এক অজানা পথে সৃষ্টির শুরু থেকেই ছুটে চলেছে। মানুষ বিজ্ঞানীরা ১১, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষের ওপারে কোন গ্যালাক্সি চলে গেলে আর দেখতে পান না।

এর পরিষ্কার অর্থ হলো, প্রতি মুহূর্তে কত শতকোটি গ্যালাক্সি কোথায় কোন দূর অজানায় হারিয়ে যাচ্ছে, তার সন্ধান একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। ১১, ০০০ মিলিয়ন দূরের গ্যালাক্সির সন্ধান বিজ্ঞানীদের জানা নেই এবং এই দূরত্বের পরে আর কি রয়েছে, তাও তাদের জানা নেই। আর এসবের কত ওপরে যে আকাশ রয়েছে, তা বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। সুতরাং আকাশ সম্পর্কে তারা কিভাবে ধারণা দেবে! মহাকাশের এতকিছু নিয়ে গোটা মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এ অবস্থায় যখন তা শেষ সীমানায় পৌঁছে যাবে, তখন ঐ মহাকাশ বেলুনের মতই ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ছোট্ট একটি কথায় এই মহাবিশ্বের আকৃতি তুলনা করা যায় এভাবে যে, বিজ্ঞানীগণ এই পৃথিবী ও পৃথিবী থেকে মহাশূন্যের দিকে ১১, ০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরের যে মহাবিশ্বের সন্ধান পেয়েছেন, তা গোটা বিশ্বের সমস্ত বালু কণার তুলনায় একটি মাত্র বালুকণার সমান। সমস্ত কিছুই এক অবিশ্বাস্য গতিতে এক অজানা পথে কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন, আকাশমন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে–সেদিকেই মহাবিশ্ব ধাবমান। অথচ এই একই কথা মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনে জানিয়েছেন।

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন তারকাসমূহ এলোমেলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। কিভাবে তা পড়বে, বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে তীব্র গতিতে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। এই আকর্ষণী শক্তিকে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন বা মহাকর্ষীয় শক্তি (Gravitational Force)। সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ সূর্যের আকর্ষণে আবর্তিত হয়ে থাকে আবার উপগ্রহগুলো গ্রহের আকর্ষণে আবর্তিত হয়। গ্রহাণুপুঞ্জ সূর্যের চারদিকে দলবদ্ধভাবে পরিক্রমণ করে। এভাবে একক গ্যালাক্সি গুচ্ছ গ্যালাক্সির আকর্ষণে আবর্তিত হয়। এভাবে করে প্রতিটি বস্তুই একে অপরের সাথে মিলিত হতে আগ্রহী। পক্ষান্তরে এই মিলন ঘটতে না পারার কারণ হলো অর্থাৎ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি (Force of Expansion.) এবং এই গতির ফলেই পরস্পরের মধ্যে Space সৃষ্টি হয় ও দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সম্প্রসারণ গতি একদিন হরণ করবেন। বিজ্ঞানীগণও বলছেন, সম্প্রসারণ গতি ক্রমান্বয়ে থেমে যাবে। তখন মহাকর্ষীয় আকর্ষণে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি গুচ্ছ, নক্ষত্রপুঞ্জ পরস্পরের কাছে ছুটে আসবে তাদের অকল্পনীয় গতি নিয়ে। ফলে একটির সাথে আরেকটির মহাসংঘর্ষ ঘটবে। তখন সমস্ত নক্ষত্রগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে। মহাকর্ষ শক্তি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ স্তব্ধ করে দেবে মহাজাগতিক পদার্থের ঘনত্ব সৃষ্টি করে। মহাজাগতিক পদার্থের ঘনত্ব এক সময় এত অধিক বৃদ্ধি লাভ করবে যে, তখন মহাকর্ষ শাক্তি অধিক পরিমাণে শক্তিশালী হবে। ফলে মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করে মহাসংকোচের দিকে নিয়ে যাবে। এই অবস্থাকে বিজ্ঞানীগণ বলেছেন Big Crunch.

অর্থাৎ আল্লাহর কোরআনের সূরা দুখানে যেমন বলা হয়েছে, আদিতে সমস্ত কিছুই একটি বিন্দুতে ধূমায়িত ছিল এবং আল্লাহ তা'য়ালা তা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করেছেন, তেমনি Big Crunch-এর মাধ্যমে পুনরায় মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে এসে বিস্ফোরিত হবে। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, মহাকাশে নতুন নতুন নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার ইত্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই কারণে মহাজাগতিক গড় ঘনত্ব প্রভাবিত হচ্ছে। আবার মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর

ভেতর ১০ কোটি Neutrino রয়েছে। এর পরিমাণও বিশাল ভরে সমৃদ্ধ এবং তাদের মোট ওজন মহাবিশ্ব closed করার জন্য যথেষ্ট।

এ ছাড়া বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক ধূলি (Cosmic Dust) মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি করছে। যেমন প্রতি বছর ১০ হাজার টন ধূলি কণা শুধু পৃথিবী গ্রহে পতিত হয়। এরপরে মহাকাশে রয়েছে কৃষ্ণ বিবর (Black Hole)। বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাকর্ষের আকর্ষণে নক্ষত্রগুলো পরস্পরের কাছাকাছি হলেই সংঘর্ষ হয় তখন Black Hole-এর সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, গ্যালাক্সি গুচ্ছ, নক্ষত্রমন্ডলী তীব্র আকর্ষের কারণে একে অপরের দিকে আলোর গতিতে ছুটে আসতে থাকবে। তখন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটবে এবং তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে।

আলোচ্য সূরার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন সমুদ্রসমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে। কিভাবে তা ঘটবে, সূরা তাকভীরের তাফসীরে তা আমরা বর্ণনা করেছি। এই সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং **চতুর্থ ও পঞ্চম** আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সেদিন সমস্ত মৃত মানুষদেরকে পুনরায় জীবিত করে আদালতে আখিরাতে একত্রিত করা হবে। তখন সমস্ত মানুষই জানতে পারবে, মৃত্যুর পূর্বে সে পৃথিবীতে কি ধরনের কর্ম করেছিল আর তার কর্মের ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া (Chain Reaction) মৃত্যুর পরও কিভাবে চলছিল।

৫ নম্বর আয়াতে 'মা কাদ্দামাত' ও 'আখ্খারাত' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে। 'মা কাদ্দামাত' বলতে ঐসব কাজকে বুঝানো হয় যা মানুষ পৃথিবীতে অবস্থানকালে করেছে। জীবিত থাকা অবস্থায় মানুষ যা কিছুই করছে, তা সবই তার আমলনামায় রেকর্ড করা হচ্ছে। মানুষ পৃথিবীতে যা কিছুই করুক না কেন, তা আখিরাতের জীবনের পূঁজি হিসাবে চলে যাচ্ছে। আখিরাতের ময়দানে সে তার প্রেরণ করা পূঁজি লাভ করবে। আমলনামায় দেখা যাবে সে কি ধরনের পূঁজি প্রেরণ করেছে এবং সেই পূঁজি তাকে আল্লাহর জান্নাত লাভের যোগ্য করেছে না জাহান্নাম লাভের যোগ্য করেছে। সেদিন এসব বিষয় তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আর 'আখ্খারাত' বলতে সেই ধরনের কাজকে বুঝানো হয়েছে, যে কাজসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী। মানুষের দ্বারা একটি ক্রিয়া সংঘটিত হলো এবং সেই মানুষটি মারা গেল, কিন্তু তার দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া চলতেই থাকলো। একজন ঈমানদার মানুষ এমন একটি বস্তু আবিষ্কার করলো, যা দ্বারা মানবতা উপকৃত হয়। লোকটি ভালো কাজ করলো, এই বিষয়টি তার জীবিত কালেই তৎক্ষণাত আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হলো। মৃত্যুর সাথে সাথে তার আবিষ্কার করার ক্ষমতা লোপ পেলো। কিন্তু তার আবিষ্কার দিয়ে মানবতা দীর্ঘকাল ব্যাপী উপকৃত হতে থাকলো, এর সওয়াবও সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমলনামায় জমা হতে থাকবে।

ঠিক একই ভাবে কোন ব্যক্তি সাধারণ মানুষের কাছে কোরআনের দাওয়াত পৌছানোর লক্ষ্যে কোরআনের তাফসীর লেখলো, আল্লাহর দেয়া বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করে করলো, মসজিদ, মাদ্রাসা বা এমন কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করলো, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করার উৎসাহ-উদ্দিপনা লাভ করবে, এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করলো, যা দেখে মানুষ আল্লাহর গোলামীর দিকে ফিরে আসবে, জনকল্যাণমূলক কোন কাজ করলো, যার মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে, এমন কোন নতুন প্রথার উদ্ভাবন

করলো, যার মাধ্যমে মানুষ কোরআনের জ্ঞানার্জন করতে পারে, এমন সংগঠন-দল প্রতিষ্ঠিত করলো, যে সংগঠন বা দল সমাজ ও দেশের বুকে কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করবে। স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে এমনভাবে গড়লো, যারা কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করবে। এসব কাজ বা কাজের সূচনা করে যারা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, এই সমস্ত কাজের বিনিময় তারা মৃত্যুর পরেও লাভ করতে থাকবে। মৃত্যুর পরেও তাদের আমলনামায় তাদের করে যাওয়া বা সূচনা করা কাজের রেকর্ড সংরক্ষিত হবে। কিয়ামতের দিন ঈমানদার লোকগুলো ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে যাবতীয় ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে এবং আমলনামায় তাদের করে আসা বা সূচনা করা কাজের সওয়াব এসে ক্রমাগতভাবে জমা হয়েছে, তা দেখে তাদের প্রশান্তির মাত্রা আরো বৃদ্ধি লাভ করবে।

অপরদিকে যারা এমন মতবাদ মতাদর্শ আবিষ্কার করলো, যে মতবাদ মতাদর্শ মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন করে দেয়, দেশ ও জাতিকে সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করে, এমন ধরনের রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত করলো বা তার সূচনা করে গেল, যে দল দেশ ও জাতির ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ালো, যে দল দ্বীনি আন্দোলনকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করলো, যে দল মানুষকে আল্লাহর গোলাম না বানিয়ে দলের নেতা-নেত্রীর গোলাম বানালো, এমন গ্রন্থ বা কবিতা রচনা করলো, যার মাধ্যমে মানুষ সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হতে থাকলো, এমন চলচ্চিত্র নির্মাণ করলো যা দেখে মানুষ চরিত্রহারা হলো, অসত্য ভাষণ বা মিথ্যা কথা বললো, যে কারণে সমাজ, দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হলো, এমন পদ্ধতি ও প্রথার প্রচলন করলো, ফলে জাতিয় অর্থের অপচয় ঘটতে থাকলো। এসব কাজ বা কাজের সূচনা করে যারা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো, মৃত্যুর পরেও তাদের আমলনামায় তাদের করে যাওয়া কাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রেকর্ড হতে থাকবে। কিয়ামতের দিন লোমহর্ষক ও ভয়ানক দৃশ্য দেখে অপরাধী লোকগুলোর হৃদয় ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে থাকবে এবং তাদের চেহারা ক্লান্ত শ্রান্ত ধূলি মলিন দেখা যাবে। যখন আমলনামায় তাদের করে আসা বা সূচনা করে যাওয়া পাপসমূহ এসে জমা হয়েছে দেখতে পাবে, তখন তাদের মানসিক অশান্তি আর ভয়ের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করবে।

মানুষের এসব কাজ সম্পর্কেই আলোচ্য সূরার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের কৃতকর্মসমূহ জানতে পারবে।

৬ নম্বর আয়াতে মানুষের অকৃতজ্ঞতামূলক আচরণের কারণে যুগপৎ বিস্ময় ও প্রশ্ন করে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমাকে তোমার সেই রব-এর ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে?'

এই আয়াতে ঐসব মানুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যারা মহান আল্লাহর গোলামী করতে প্রস্তুত নয় বা গোলামী করছে না। তাদেরই বলা হচ্ছে, এমন কোন্ বিষয় তোমার সেই মহান সম্মানিত প্রতিপালকের গোলামী করা থেকে তোমাকে বিরত রেখেছে? আয়াতে এভাবে সম্মোধন করা হয়েছে, 'হে মানুষ।' এই শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই মানুষকে মহান আল্লাহ যখন সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ফেরেশ্তারা মানুষ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই মানুষ কি ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং কতটা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তা ফেরেশ্তাদেরকে অনুগ্রহ করে অবগত করেছিলেন। আল্লাহর আদেশে ফেরেশ্তারা মানুষের সামনে অবনত হয়েছিলেন।

এই মানুষকে মহান আল্লাহ্ অনুপম সৌন্দর্যমূলক কাঠামোয় সৃষ্টি করে তার প্রকৃতিতে আল্লাহর গোলামী করার ভাবধারা প্রবিষ্ট করিয়েছেন। তার ভেতরে এমন সব অপূর্ব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যার কারণে সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সম্মান ও মর্যাদার উচ্চস্তরে তাকে আসীন করা হয়েছে। তার ভেতরে জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি দিয়েছেন। সমস্ত সৃষ্টি থেকে তাকে পৃথক করা হয়েছে। মানুষের রূহ্–যার ভেতরে রয়েছে মহান আল্লাহর বিধানের প্রবণতা, এই প্রবণতা দিয়েই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আত্মার বিকাশ ও ইবাদাত' শিরোণাম পড়ুন।)

এই মানুষ তার আসল প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গিয়ে মিথ্যা শক্তির দাসত্ব করতে থাকে। এই জন্য উক্ত আয়াতে 'হে মানুষ' বলে সম্বোধন করে তার মনুষত্ববোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষের প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সে কে এবং কি তার পরিচয়, সমগ্র সৃষ্টির ভেতরে তার অবস্থান কোথায়, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, তুমি তোমার রব্ব-এর গোলামী করার ব্যাপারে কেন্ প্রতারিত হচ্ছো? কেন তুমি তোমার প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার আসন থেকে নেমে গিয়ে ধোঁকা ও প্রতারণার জালে নিজেকে আবদ্ধ করছো? যিনি তোমাকে মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন আর আল্লাহর গোলামী করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে, এই বিষয়টি কেন অনুভব করতে সক্ষম হচ্ছো না?

উল্লেখিত আয়াতে 'রাব্বিকাল কারিম' অর্থাৎ মহাসম্মানিত রব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন সৃষ্টির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণকারী। সুতরাং সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। (রব শব্দের অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'সমস্ত প্রশংসা ঐ রব-এর' শিরোণাম ও 'সুরক্ষিত আকাশ জগৎ' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

৭ ও ৮ নম্বর আয়াতে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যিনি তোমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ করে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, তোমার দেহে যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন, সেখানে সেটাই দিয়েছেন। তোমার দেহের প্রতিটি সংগঠনে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। কিভাবে করেছি, তুমি লক্ষ্য করে দেখো। তোমার হাতের দিকে লক্ষ্য করো, এই হাতটির মধ্যে আমি ২৭ টি অস্থি এবং ১৯ টি শিরাতন্ত্রীসহ মোট ৬ টি জোড়া দিয়েছি। এই জোড়াগুলো না থাকলে হাত কার্য উপযোগী হতো না। এই হাতকে কোনভাবেই সংকোচন ও সম্প্রসারণ করা যেতো না। এটা হাতো একটি লাঠি-যা দিয়ে মানুষ কোন কাজ করতে সক্ষম হতো না।

বিজ্ঞানীগণ এই হাতের গঠন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, মানব হস্ত এক তুলনাহীন বিস্ময় এবং এটা অত্যন্ত দ্রুত সংকোচনও করা যায়, সম্প্রসারণও করা যায়। সহজে কাজে নিয়োজিত করার ব্যাপারে এই হাতের মতো কোন যন্ত্র নির্মাণ করা একেবারেই অসম্ভব। হৃদপিন্ড ব্যতীত জীবিত মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। এই হৃদপিন্ড একটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের সমান। হৃদপিন্ড এবং রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান কাজ হচ্ছে শরীরের ৭৫-১০০ ট্রিলিয়ন কোষে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং পুষ্টি পৌছে দেয়া। এটা একটি ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের মাংসপেশী বা হৃদপেশী নামে পরিচিত এবং আকারে দেখতে একটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো। মানবদেহে হৃদপিন্ডের অবস্থান বুকের বাম দিকের ওপরের অংশে। ৪ টি প্রকোষ্ঠের মধ্যে ডান দিকে দুটো এবং বাম দিকে দুটো। ডান দিকের

প্রকোষ্ঠগুলো হচ্ছে ডান অলিন্দ ও ডান নিলয় এবং বাম দিকের প্রকোষ্ঠগুলো হচ্ছে বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়। এই হৃদপিন্ডের ডান অলিন্দ একটি বড় শিরা দিয়ে শরীরের দূষিত রক্ত অর্থাৎ যে রক্তে অক্সিজেন কম এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বেশী, তা গ্রহণ করে এবং রক্ত ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এরপর ডান নিলয় থেকে সেই রক্ত ফুসফুসে প্রেরণ করে। এভাবে করে ফুসফুসের মধ্যে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দেয়। ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে বাম নিলয়ে যায়। এরপর বাম নিলয় থেকে মহাধমনী ও তার শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে শীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়।

হৃদপিন্ডের প্রবেশ এবং বহিঃদ্বারের মধ্যে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের সংযোগ স্থলে ভালব রয়েছে যা রক্ত সঞ্চালনের সময় বিপরীত দিকের রক্তের প্রবাহ বন্ধ করে। প্রতিবার হৃদপিন্ডের সংকোচন বা হৃদস্পন্দনের ফলে রক্ত ডান নিলয় থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে। বিশুদ্ধ হওয়ার পর রক্ত বাম নিলয় থেকে মহাধমনী এবং শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে দেহের প্রতিটি কোষে সঞ্চালিত হয়। এই হৃদপিন্ড প্রতি মিনিটে ৭২ বার বা প্রতিদিন ১ লক্ষ বার সংকোচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। এভাবে শরীরের ৫ থেকে ৬ লিটার পরিমাণ রক্ত অবিরাম হৃদপিন্ডের মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে থাকে, যা প্রতি মুহূর্তে সংকুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রায় ৫,০০০ গ্যালন রক্ত পাম্প করে থাকে। কি কারণে হৃদপিন্ড অবিরাম এভাবে পাম্প করে রক্ত পরিশুদ্ধ করে মানুষকে সচল রেখেছে, বিজ্ঞানীরা এর কোন কিনারা খুঁজে যখন পায়নি, তখন তারা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে যে. এক অদৃশ্য শক্তিই এটাকে সচল রেখেছেন-যার নাম আল্লাহ।

হৃদপিন্ডের ডান অলিন্দে অবস্থিত সাইনো এট্রিয়াল নোড বা এস, এ, নোড এই অবিরাম হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে এ জন্য এটাকে বলে শরীরের পেস্ মেকার (Body's pace maker)। মহাধমনী এবং এর শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান ও অক্সিজেনসহ রক্ত শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। ধমনীগুলো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অতিসুক্ষ্ম ধমনী বা কৌশিকনালীতে পরিণত হয়। কৌশিকনালী শিরা ও ধমনীর সংযোগ স্থল দিয়ে পুনরায় শিরার মাধ্যমে হৃদপিন্ডে ফিরে আসে এবং এভাবে চক্রটি অবিরামভাবে চলতে থাকে। বিজ্ঞানীগণ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের প্রতিটি চক্রে ধমনী ও শিরার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা দিয়ে ৬০ হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করে।

একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে ৬ থেকে ১০ পাউন্ড রক্তের ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। এই রক্তে আবার লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অনুচক্রিকা অর্থাৎ তিন ধরনের কণিকা দেয়া হয়েছে। মানব দেহে অক্সিজেন সরবরাহকারী লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ ২৫০০ কোটি। রোগ প্রতিরোধকারী শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা হলো ২৫০ কোটি এবং এরা জীবিত থাকে মাত্র ১২ ঘন্টা। রক্তের সবচেয়ে ছোট কণিকা অনুচক্রিকা, এই কণিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। মানুষ চলতে ফিরতে বা কোন কাজ করতে গেলে দেহ কেটে ছিঁড়ে যাবে, রক্তপাত হবে। এই রক্তপাত বন্ধ না হলে মানুষ তৎক্ষণাত মারা পড়বে। এ জন্য রক্ত জমাট বেঁধে তা যেন বন্ধ হয়, সেই জন্য রক্তে অনুচক্রিকা দিয়েছেন। এই রক্ত ঘন্টায় ৭ মাইল বেগে চলাচলা করে। এর কম হলে বা বেশী হলেই মানব জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

সাধারণত মানুষ তার পছন্দের খাদ্য সামনে পেলে কোন হিসাব না করেই খেতে থাকে। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে মানুষের দেহে যেমন অতিরিক্ত চর্বির সৃষ্টি হয় তেমনি রক্ত প্রবাহিত হয় যেসব ধমনী দিয়ে তার অভ্যন্তরেও চর্বি জমা হতে থাকে। ধমনীর অভ্যন্তরে চর্বি

জমা হয়ে একটি স্তুপ বা প্লাক তৈরী করে এবং এই প্লাক ক্রমশঃ আকারে বড় হতে থাকে। এর ফলে ধমনীর অভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চালনের পথ সরু হয়ে যায় বা ধমনী অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়, রক্ত চলাচল করতে পারে না। এভাবে যখন ধমনীর মধ্যস্থিত পেশী কোষগুলোও চর্বি দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায় তখন ধমনীগাত্র শক্ত হয়ে ধমনী তার স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলে। ফলে রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে মানব দেহে যখন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন ব্লাড প্রেসার, হৃদরোগ এবং স্ট্রোক হয় অথবা হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। যখন করোনারী ধমনী চর্বির কারণে বন্ধ হয়ে যায় তখন হৃদরোগ হয়, ফলে এ্যানজাইনা প্যাকটোরিজ বা বুকে ব্যথা হয়।

মস্তিষ্কের কোন অংশে রক্ত সরবরাহ হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হলে স্ট্রোক হয়। মস্তিষ্কের কোষগুলোর নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্সিজেনযুক্ত রক্তের সরবরাহ প্রয়োজন হয়। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ বন্ধ মাথা আর কাজ করতে পারে না এবং মানুষ মারা যায়। মস্তিষ্কের কোষগুলো মানুষের অনুভূতি এবং চলাফেরা, চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্নায়ূর কোষগুলো যখন কাজ করতে পারে না তখন শরীরের যেসব কাজকর্ম তারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, সেগুলোর কাজও বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা হলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, মারাও যেতে পারে। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী কোন একটি শিরার মধ্যে চর্বির দানা যখন আট্‌কে যাবে, তখনই স্ট্রোক করবে। এ জন্য মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা পরিমিত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতে বলেছেন যেন দেহে বা ধমনীতে অতিরিক্ত চর্বি জমা না হয়।

একই ভাবে করোনারী শিরার মধ্যে চর্বি বেশী হলেই হার্ট এ্যাটাক হবে। কিডনীতে যে ধমনী রয়েছে, তার ভেতরে চর্বি জমা হলে কিডনীর সমস্যা দেখা দেবে। মানুষের কানের ভেতরের অংশে প্রায় ৪ হাজার সুক্ষ্ম ও জটিল বাঁকা যন্ত্রের সমষ্টি রয়েছে। এর প্রত্যেকটি যন্ত্র ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে ধারাবাহিকভাবে একই সাথে গ্রথিত রয়েছে। এর এক একটি যন্ত্র যে কোন শব্দ তা মৃদু অস্পষ্ট হোক বা শক্তিশালী শব্দ হোক, মস্তিষ্কে পৌছে দেয়। কোন একটিতে জটিলতা সৃষ্টি হলেই মানুষের শোনার অসুবিধা সৃষ্টি হয়। মানুষের এই চোখে আল্লাহ তা'য়ালা ১৩ কোটি আলো বিকিরণকারী যন্ত্র দিয়েছেন। মানুষ যা দেখে তা এসব যন্ত্র মস্তিষ্কে পৌছে দেয়। মানুষ চোখ দিয়ে যা দেখে তা প্রথম চিত্রে নেগেটিভ থাকে। পরে মস্তিষ্ক এটাকে পজেটিভ করে দেয় তখন মানুষ বস্তুটিকে সোজা দেখতে পায়।

এই চোখের গঠন আল্লাহ তা'য়ালা এমনভাবে করেছেন যে, চোখের ওপরে কপালের সাথের হাড়টিকে একটু উঁচু করেছেন যেন কোন জিনিস এসে হঠাৎ করে চোখে আঘাত করতে না পারে। কোন জিনিস এসে চোখে আঘাত করতে গেলেই তা চক্ষু কোটরের হাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এভাবে চোখ আঘাত থেকে রক্ষা পায়। কোন ক্ষুদে বস্তু চোখে পড়তে গেলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা চোখে ভ্রুর ব্যবস্থা করেছেন যেন এই চোখ সূর্যের প্রখর আলো থেকে হেফাজত থাকে। চোখে পানির ব্যবস্থা করেছেন যেন এই পানি চোখকে ধুয়ে প্রতি মুহূর্তে পরিষ্কার করে দেয় এবং মানুষ স্বচ্ছভাবে দেখতে পায়। মানুষের জিহ্বায় রুচিবোধের জন্য ৯ হাজার সেল কোষ, যার প্রতিটি সেল একাধিক স্নায়ুতন্ত্রীর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষ প্রতিটি বস্তুর স্বাদ ভিন্ন ভিন্নভাবে অনুভব করতে পারে।

একজন মানুষের দেহে যতগুলো স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে, এগুলো একত্রিত করে জোড়া দিলে এতটা লম্বা হবে যে, তা দিয়ে এই বিশাল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা যাবে। এই স্নায়ুগুলো যে কোন অনুভূতি এত দ্রুত মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় যে, এর সংকেত প্রেরণের গতি সেকেন্ডে ১০০ মিটার। একটি শিশু যখন মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসে তখন তার দেহে হাড় থাকে ৩০৫ টি। তারপর পরিণত বয়সে এই হাড়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৬ টি। শিশু অবস্থায় তার যে পরিমাণ হাড়ের প্রয়োজন রয়েছে, আল্লাহ তাই দিয়েছেন। পরিণত বয়সে ঐ পরিমাণ হাড় থাকলে একজন মানুষের পক্ষে চলাফেরা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা সে হাড়ের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়ে ২০৬ টিতে পৌঁছে দেন। আর মানবদেহে সবচেয়ে ছোট্ট হাড় হলো কানের ভেতরের স্টেপস হাড়। মানুষের প্রতিটি পায়ে ২৬ টি, প্রতি হাতে ২৭ টি, মাথার খুলিতে ২৯ টি, আর বুকের পাঁজরে রয়েছে ১৩ জোড়া হাড়।

মানুষের দেহে রয়েছে ৬৫০ টি পেশী অথচ কোন কাজ করার জন্য মাত্র ২০০ পেশীর প্রয়োজন। কোন কারণে একটি নষ্ট হয়ে গেলে অতিরিক্তগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হার্ট অপারেশনের সময় মানুষের হাতে ও পায়ে যে অতিরিক্ত ধমনী রয়েছে, তা কেটে নিয়ে হার্টে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে ১৪ বিলিয়ন নার্ভসেল রয়েছে। এর মধ্যে ব্যবহৃত হয় মাত্র ৭০ লক্ষ সেল। মস্তিষ্কের মেমরি সেল প্রতিটি সেকেন্ডে ১০ টি নতুন তথ্যকে স্থান করে দিয়ে থাকে। মানুষের দেহে মোট গিরার পরিমাণ রয়েছে ১০০ টি। এই গিরা না থাকলে মানব দেহ কোন দিকেই বাঁকানো যেতো না। মানব দেহে প্রতিদিন ২০০ বিলিয়ন নতুন লোহিত রক্ত কণিকা উৎপন্ন হচ্ছে। একজন মানুষের দেহে চামড়া রয়েছে ২০ বর্গফুট। এই চামড়ার ওপরে রয়েছে ১ কোটি লোম কূপ। দেহের অনুভূতির জন্য ৪০ লক্ষ বহির্মুখী সেল দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

মানব দেহকে সচল রাখার জন্য দেহে যে পরিমাণ ফসফরাস আল্লাহ দিয়েছেন তা দিয়ে ২২০০ শত দিয়াশলাই বানানো যাবে। এই দেহকে কার্য উপযোগী রাখার জন্য যে চর্বি দেয়া হয়েছে, তা দিয়ে বড় মাপের ৭ টি কেক, ১ টি কাপড় কাচার সাবান ও ৭৬ টি মোমবাতি বানানো যাবে এবং পানি দেয়া হয়েছে ১০ গ্যালন। এই মানুষ শ্বাস নিঃশ্বাসের জন্য যে পরিমাণ বাতাস ব্যবহার করে, তা দিয়ে ৩৫ লক্ষ বেলুন ফুলানো যাবে। মানব দেহে যে পরিমাণ আয়রণ দেয়া হয়েছে, তা দিয়ে ২ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা একটি পেরেক বানানো যাবে। এই দেহে যে পরিমাণ চুন রয়েছে, তা দিয়ে একটি ঘরকে অনায়াসে চুনকাম করা যেতে পারে। দেহে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ দেয়া হয়েছে, এটা ব্যবহার করে ২৫ ওয়াটের একটি বাল্ব ৫ মিনিট জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব। মানব শরীরে যে পরিমাণ কার্বন রয়েছে তা ব্যবহার করে ৯ হাজার পেন্সিলের সীস বানানো যেতে পারে।

এসব উপাদান মানবদেহে কম বা বেশী হলেই বিপত্তি ঘটবে, মানবদেহ অচল হয়ে যাবে। মানবদেহে আল্লাহ তা'য়ালা যে কতকিছু দান করেছেন, সে সম্পর্কিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করলে বিশালাকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে। এই পৃথিবীকে মানুষের আবাসযোগ্য করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যেসব স্তর সৃষ্টি করেছেন, যার বর্ণনা আমরা সূরা ফাতিহার তাফসীরে কিঞ্চিৎ করেছি। পৃথিবীর সাধারণ একজন বৈজ্ঞানিককে পরম সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়, অথচ মানুষ বিজ্ঞানীর মাথায় বিজ্ঞানী হবার মতো জ্ঞান যিনি দান করলেন, সেই আল্লাহ কত বড় বিজ্ঞানী এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা কত বিশাল, এ সম্পর্কে মানুষের চেতনা নেই। তাঁর

সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সামান্য ধারণা মানুষকে দেয়া হয়েছে আলোচ্য সূরার ৬ নম্বর আয়াতে 'রাব্বিকাল কারিম' অর্থাৎ মহাসম্মানিত প্রতিপালক বলে।

যিনি দয়া করে, অনুগ্রহ করে মানুষকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের ব্যবস্থা করেছেন, এই পৃথিবীতে সে যেন জীবন ধারণ করতে পারে সে ব্যবস্থা করেছেন, যাবতীয় ব্যবস্থা যিনি করে যাচ্ছেন, তার দাসত্ব না করে মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে জীবন পরিচালিত করছে। আল্লাহর বিধানের বিপরীত পন্থায় যাবতীয় কাজ কর্ম করে যাচ্ছে। একটি বারের জন্যই চিন্তা করছে না, যিনি তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন,-প্রতি মুহূর্তে যিনি করুণাধারায় সিক্ত করছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, তুমি ধারণা করেছো যে, তুমি যা কিছুই লাভ করেছো, তা তোমার চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমেই লাভ করেছো।

অথবা এই ধারণা পোষণ করছো যে, তুমি যেমন খুশী তেমনভাবে নিজেকে পরিচালিত করছো। আমার দেয়া আইন-কানুনের কোন তোয়াক্কা করছো না। আমার বিধানের যখন বিরোধিতা করছো, তখন তোমার দেহ তোমার সাথে বিদ্রোহ করছে না। তোমার কান, তোমার চোখ, মুখ তথা তোমার দেহের কোন একটি অঙ্গও তোমার সাথে অসহযোগিতা করছে না। আমার বিধান অমান্য করার কারণে তোমার দেহ এবং পৃথিবীর কোন উপকরণ তোমার সাথে বিরোধিতা করছে না, এর একমাত্র কারণ হলো আমার অসীম দয়া। আমার অনুগ্রহের কারণেই তুমি যা খুশী তাই করতে সক্ষম হচ্ছো। আমাকে অস্বীকার করে বলছো, এই পৃথিবীর কোন স্রষ্টা নেই অতএব তার দেয়া বিধানেরও কোন প্রয়োজন নেই। আমরা প্রাকৃতিক কারণেই অস্তিত্ব লাভ করেছি, কোন শক্তি আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেনি। পরকাল বলে কিছুই নেই, মৃত্যুর পরে আমাদেরকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

কিন্তু মনে রেখো, আমার দয়াকে দুর্বলতা মনে করার কারণ নেই। আমি যেমন দয়ালু তেমনি কঠোর শাস্তি দাতাও। তুমি মনে করেছো, আল্লাহ অসীম দয়ালু এবং তাঁর ক্রোধকে তাঁরই রাহ্মত এসে আবৃত করে ফেলবে, অতএব অপরাধ করেও শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। তোমার এই চিন্তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের, 'রাহ্মানের রাহ্মত সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত' শিরোণাম পড়ুন।)

আল্লাহ নেই, এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছুই রয়েছে তা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, পরকাল বলে কিছুই নেই অতএব জবাবদিহিও করতে হবে না। অথবা স্রষ্টা থাকলেও থাকতে পারেন, তার দয়া অনুগ্রহেই সব কিছু চলছে, তিনি দয়ালু কাউকে গ্রেফতার করবেন না, এই ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনায় যারা নিমজ্জিত, **আলোচ্য সূরার ৯ নম্বর আয়াতে** তাদেরকে নিরাশ করে কঠোর ভাষায় বলা হচ্ছে, কখনো না। তোমরা যা ভাবছো, তা অবশ্যই সত্য নয়। এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু এবং এর ব্যবস্থাপনাই সরব কণ্ঠে ঘোষণা করছে, এর পেছনে একজন মহাবৈজ্ঞানিক স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন। এমন কি তুমি যে দেহের অধিকারী, সেই দেহের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, তোমার দেহ সত্তাই সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে ঘোষণা দিচ্ছে, তোমাকে কেউ একজন সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের মাধ্যমে।

তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাতের সমান তোমার বুকে অবস্থিত হার্ট কি বলছে দেখো, এই হার্ট-কে কোন শক্তি অবিরাম গতিতে পাম্প করে তোমার দেহের রক্তকে বিশুদ্ধ করে দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করে তোমাকে জীবিত রেখেছেন, সেই হার্ট-কেই প্রশ্ন করো,

স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা চলছে না-কেউ একজন চালাচ্ছেন। তুমি নিজে যেমন অস্তিত্ব লাভ করোনি এবং তোমার মাতা-পিতাও তোমাকে অস্তিত্ব দান করেনি। যা করেছি তার সবটাই আমি আল্লাহ করেছি। তুমি যে পৃথিবীতে বিচরণ করছো, সেই পৃথিবীতে আমি অসংখ্য জীব সৃষ্টি করেছি। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকেও তাদেরই অন্তর্গত করতে পারতাম, কিন্তু করিনি সেটাই আমার দয়া। আমি অনুগ্রহ করে তোমার দেহকে বৈজ্ঞানিক কৌশলে গড়েছি। যেখানে যে অঙ্গ প্রয়োজন তা দিয়েছি। পৃথিবীকে তোমার জন্য বাসযোগ্য করেছি।

আকাশ থেকে তোমার ওপরে যেন কোন বিপদ নেমে এসে তোমাদের জীবন প্রবাহকে স্তব্ধ করে দিতে না পারে, এ জন্যে মহাশূন্যে অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করে মহাজাগতিক অগণিত বিপদ থেকে তোমাকে হেফাজত করছি। এসব ব্যবস্থা দেখে তোমার মাথা কৃতজ্ঞতার ভারে আমার সামনে অবনমিত হওয়াই ছিল তোমার জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি আর ইনসাফের দাবী। তোমার উচিত ছিল, তোমার প্রতি যিনি সীমাহীন অনুগ্রহ করেছেন, তার বিধান যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন করা। এখন তুমি তা না করে কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা করছো. আমার বিধানের সাথে বিরোধিতা করছো।

তুমি ভাবছো, আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ভোগ করে পৃথিবীতে যা ইচ্ছা তাই করি না কেন, পরকাল বলে কিছুই নেই এবং কারো কাছে কোন জবাবদিহিও করতে হবে না। আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে শাস্তি দেয়ারও কোন ব্যবস্থা নেই এবং কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার কারণে পুরস্কার দেয়ারও কোন ব্যবস্থা থাকবে না। তোমাদের এই ধারণাই তোমাদেরকে প্রতারিত করছে। কিয়ামত যখন অনুষ্ঠিত হবে, আল্লাহর আদালতে গ্রেফতার হয়ে যাবে, তখন অনুভব করতে পারবে, তোমরা কত বড় ধোঁকায় নিমজ্জিত ছিলে।

এক শ্রেণীর ভ্রষ্ট চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, লেখক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ মানুষকে এই ধারণা দিয়ে থাকে যে, পরকাল বলে কিছুই নেই, এই পৃথিবীতেই শুরু এবং এখানেই শেষ, এই ভ্রান্ত ধারণা অনুসরণ করে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের বিপরীত জীবন পরিচালিত করছে, দৃঢ়তার সাথে তাদের ধারণা খন্ডন করে **১০ থেকে ১২ নম্বর আয়াতে** বলা হচ্ছে, তোমরা যে ভুল ধারণার অনুসরণ করছো, তা যথার্থ অর্থেই যে ভুল, সেটা তোমরা শুধু প্রত্যক্ষই করবে না, পৃথিবীতে তোমরা যা কিছুই করছো, তার পূর্ণাঙ্গ রেকর্ডও নিজের চোখে দেখতে পাবে। কারণ তোমাদের ওপরে আমি পরিদর্শক-সংরক্ষক নিযুক্ত করে রেখেছি। তারা অত্যন্ত সম্মানিত লেখক, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজই লিপিবদ্ধ করছে–রেকর্ড করছে।

তোমাকে যিনি সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, বৈজ্ঞানিক কলা কৌশলের মাধ্যমে তোমার দেহকে যিনি সচল রেখেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসম্ভারকে যিনি তোমার ব্যবহারের উপযোগী করেছেন, আকাশ জগতে যিনি তোমার কল্যাণের জন্য সুরক্ষিত ছাদ নির্মাণ করেছেন, সুউচ্চ পর্বতমালায় যিনি তোমার জন্য পথ নির্মাণ করেছেন, লবণাক্ত সাগরে যিনি তোমার জন্য সুমিষ্ট পানির ব্যবস্থা করেছেন, যাঁর অগণিত নেয়ামত তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে, যাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত তুমি একটি মুহূর্তকাল জীবিত থাকতে সক্ষম নও, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাকে এই পৃথিবীতে বল্লাহারা হরিণের মত ছেড়ে দেননি।

তোমার ওপরে তিনি পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেছেন। তারা তোমার প্রতিটি স্পন্দন লিপিবদ্ধ করছেন। তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুমি কোন উদ্দেশ্যে কোথায় পরিচালিত করছো, তোমার জিহ্বা দিয়ে কোন উদ্দেশ্যে তুমি কি কথা বলছো, তোমার চোখ দিয়ে তুমি কি

দেখছো, কাকে কোন ইশারা করছো, হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে কি কথা বুঝাতে চাইছো, পা দুটোর ওপর ভর করে তুমি তোমার দেহকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো, কোন নিভৃত স্থানে বসে কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো, সমস্ত মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চার দেয়ালে আবৃত ঘরের কোণে বসে তুমি কি ধরনের কাজে লিপ্ত রয়েছো, তা সবই আমার নিযুক্ত পরিদর্শক আমার আদেশে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করছে। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম কোন বিষয়ও ছাড় পড়ছে না। কিয়ামতের দিন আদালতে আখিরাতে তুমি তোমার নিজের কর্মলিপি নিজের চোখেই দেখতে পাবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে কত বড় ধোঁকায় তুমি নিমজ্জিত ছিলে।

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'সেদিন নেতা ও অনুসারীগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করবে' শিরোণাম পড়ুন।)

পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের গোয়েন্দা বিভাগ গঠন করে থাকে। এসব গোয়েন্দারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত থাকে। গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পেছনে বা যেসব ব্যক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করার ব্যাপারে অথবা আইন শৃঙ্খলা অবনতি ঘটানোর ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়, তাদের কার্যাবলী রেকর্ড করার উদ্দেশ্যে গোয়েন্দারা তৎপর থাকে। তারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মকান্ড তথা বিভিন্ন তৎপরতা রেকর্ড করে থাকেন। এসব গোয়েন্দারা মানুষ, তারা মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে কেউ নয়। রাষ্ট্র এদেরকে বেতন দিয়ে থাকে, অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে তারা কাজের আঞ্জাম দেন। এই গোয়েন্দারা দলীয় আনুগত্যের কারণে, ব্যক্তির প্রতি দুর্বলতার কারণে, আত্মীয়তার কারণে, অর্থের লোভে, ভয়-ভীতির কারণে, ব্যক্তিগত আক্রোসের কারণে যথাযথ রিপোর্ট না-ও করতে পারে।

অথবা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শারীরিক দুর্বলতার কারণেও অনেক কিছুই তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। মানুষ গোয়েন্দার ক্ষুধা অনুভব করে, তাকে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হয়, পরিচিত ঘনিষ্ঠজনের সাথে কথা বলতে হয়, এসব করতে গিয়ে তারা যে ব্যক্তিকে অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি অনেক সময় তার চোখে ধূলো দিয়ে হারিয়ে যায়। এ জন্য মানুষ গোয়েন্দাদের রেকর্ড করা রিপোর্ট সর্বাংশে সত্য হয় না। তাদের রিপোর্টে দুর্বলতা থাকে, ফাঁক-ফোঁকড় থেকে যায়। দেশে বিপ্লব ঘটানো হবে বা রাষ্ট্র প্রধানকে হত্যা করা হবে, কোন দিক থেকে করা হবে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রের কাছে গোয়েন্দারা রিপোর্ট করে এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারপরেও এমন দিক থেকে বিপ্লব ঘটে বা রাষ্ট্র প্রধানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করা হয়, যে সম্পর্কে গোয়েন্দা দল ঘটনা ঘটার পূর্বে কোন ধারণাই করতে পারেনি। সুতরাং মানুষ গোয়েন্দাদের রিপোর্ট সব সময় সঠিক হয় না।

এই জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নিযুক্ত পরিদর্শক-পর্যবেক্ষক, গোয়েন্দাদের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত, মর্যাদার অধিকারী। কারণ তারা যে কোন দুর্বলতার উর্ধ্বে। তাদের আহারের প্রয়োজন হয় না, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হয় না। কারো প্রতি তাদের যেমন কোন আক্রোস নেই তেমনি কোন ভালোবাসাও নেই। দুর্নীতি করার প্রবণতা তাদের প্রকৃতিতে নেই। কোন সুবিধা গ্রহণ করে কোন ব্যক্তিকে তারা ছাড় দেবেন, এসবের উর্ধ্বে তারা। যাবতীয় নৈতিক দুর্বলতা থেকে তারা মুক্ত। কোন মানুষই মুহূর্ত কালের জন্যেও তাদের দৃষ্টির আড়ালে যেতে পারে না। তাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে না। যারা আল্লাহর অবাধ্য তাদের কৃতকর্মের অধিক তারা লিপিবদ্ধ করেন না, অথবা যারা ঈমানদার তাদের করা কাজের বেশীও তারা লেখেন না। মানুষ যেখানে যায়, তারাও সে মানুষের দেহের একটি অঙ্গের মতই

লেগে থাকে। মানুষ যদি উর্ধ্ব আকাশে গমন করে অথবা পানির অতল তলদেশে চলে যায়, সেখানেও তারা সাথে থেকে তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তারা যাবতীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে বলেই তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী বলা হয়েছে।

এরপর আলোচ্য সূরার ১৩ থেকে ১৮ নম্বর আয়াতে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেদিন ঐ লোকগুলো অবশ্যই সুখে শান্তিতে থাকবে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে যারা তাদের যাবতীয় কর্ম তৎপরতা পরিচালিত করেছে। রাজনীতি করেছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি পেশ করেছে, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, তা সবই আল্লাহর বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে করেছে, সন্তান-সন্তুতিকে প্রতিপালন করেছে আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদ বানানোর লক্ষ্যে, আন্দোলন করেছে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে, কথা বলেছে, পোষাক পরিধান করেছে, পথ চলেছে, খাদ্য গ্রহণ করেছে, ঘুমিয়েছে, স্ত্রীর সাথে ব্যবহার করেছে, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়েছে-যা করেছে সবই করেছে আল্লাহর রাসূলের অনুকরণে। এসব লোকগুলো সেদিন ভয়াবহ ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যেই পরিপূর্ণ মানসিক শান্তির সাথে অবস্থান করবে। কোন ধরনের দুশ্চিন্তা তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

আর যারা পৃথিবীতে নিজের কামনা-বাসনা অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কহীন নেতা-নেত্রী, কবি, লেখক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদদের কথায় মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করেছে, দেশের সম্পদের ক্ষতি করেছে, মানুষ হত্যা করা করেছে, নেতার অনুকরণে পোষাক পরিধান করেছে, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করেছে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে, কিয়ামতের দিন এরা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে এবং সেই জাহান্নাম থেকে তারা কখনো মুক্তি পাবে না। জাহান্নামের সেই ভয়াবহ কঠিন আযাব থেকে তারা একটি মুহূর্তের জন্যেও নিষ্কৃতি পাবে না। বিচার চলাকালে তারা জাহান্নাম দেখতে পাবে, কঠিন শাস্তি দেখেও তারা তা থেকে পালাতে পারবে না এবং সেখানে প্রবেশ করার পরও কোন ধরনের আরামদায়ক সুযোগ তারা লাভ করবে না।

বিচারের দিনের গুরুত্ব ও সেদিনটি কতটা ভয়ানক ভয়াল হবে, তা মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই দুই বার বলা হয়েছে, তুমি কি জানো সেই বিচারের দিনটি কি? সেই বিচারের দিন ঐ দিন, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছুই করতে পারবে না। সেদিন সমস্ত ক্ষমতা থাকবে মহান আল্লাহর হাতে।

(এই সূরার ১৮ নম্বর আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'সেদিন আল্লাহই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন' শিরোণাম পড়ুন।)

সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৮৩

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতে 'মুতাফ্‌ফিফীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরার আলোচিত বিষয়ও এ কথা স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, এ সূরা মক্কায় আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতী কার্যক্রমের সূচনাকালে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর রাসূল মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাঁর আহ্বানে অল্প সংখ্যক মানুষ সাড়া দিচ্ছিলো। এ সময় পর্যন্ত মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী রাসূলের কার্যক্রমকে তেমন একটা গুরুত্বও দেয়নি ফলে তারা প্রবলভাবে বাধার সৃষ্টিও করেনি। তাদের ধারণা ছিল, নতুন এই আদর্শ তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজে তেমন একটা প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না এবং অচিরেই তা বিলীন হয়ে যাবে। এ কারণে তাদের বিরোধিতা মৌখিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল, মুসলমানদের ওপরে তখন পর্যন্ত শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়নি। এ সময় তারা মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো, লোক সমাজে তাদেরকে নিয়ে উপহাস করতো, এদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যসহ নানাভাবে অপমান অপদস্ত করতো। যেসব অন্যায় কর্ম মক্কার সমাজে প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে এটাও একটি ছিল যে, তারা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সততার বিপরীত কাজ করতো। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে ঠকাতো। কোন জিনিস ক্রয় করার সময় বেশী গ্রহণ করতো এবং বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে কম দিতো। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত লোকদেরকে সতর্ক করে ও মুসলমানদের প্রতি যারা অন্যায় মন্তব্য করে, তাদেরকে সতর্ক করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

এই সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে। আখিরাতের আলোচনার সাথে সাথে এই সূরায় মক্কার সমাজ জীবনের এমন একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, এমন একটি দুষ্টক্ষত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, প্রতিটি যুগে এবং দেশেই ঐ লোকগুলো সেই দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত, পরকালে জবাবদিহির অনুভূতিহীন হৃদয় যাদের। যারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই, পরকাল বলে কিছুই নেই, পৃথিবীর কোন কর্মের হিসাব মৃত্যুর পরে কারো কাছে দিতে হবে না, তারা সবাই ঐ দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত। সেই দুষ্টক্ষত হলো, অন্যকে ঠকানো, অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন করা, অন্যের প্রাপ্য যথাযথভাবে বুঝিয়ে না দেয়া, অন্যের সাথে প্রতারণা করা।

এই শ্রেণীর লোকগুলোর ধ্বংস কামনা করা হয়েছে এই সূরার প্রথম আয়াতে এবং সতর্ক করা হয়েছে এই বলে যে, তাদের এসব হীন কর্মকান্ডের জবাব কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে দিতে হবে, যখন তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে আল্লাহর আদালতের সামনে দাঁড় করানো হবে। অন্যকে ঠকানোর দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণই হলো পরকালে জবাবদিহির অনুভূতির অনুপস্থিতি। পরকালে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতি যার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে কখনো অন্যকে ঠকানো সম্ভব নয়। পরকালের প্রতি উদাসীনতা ও উপেক্ষাই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ, এই বিষয়টিই পরকালে অবিশ্বাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

মৃত্যুর পরে আদালতে আখিরাত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সবাইকে মহান আল্লাহর বিচারালয়ের সামনে উপস্থিত হতে হবে, প্রতিটি কাজের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, এই বিশ্বাস ও চেতনা

যক্ষণ মানুষের হৃদয় গহীনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সততা ও বিশ্বস্ততার মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে না এবং মানুষের পক্ষে বৈষয়িক লোভ-লালসা ত্যাগ করে অপরের অধিকার বুঝিয়ে দেয়াও সম্ভব নয়। মানুষের চরিত্রে সততা আর বিশ্বস্ততার গুণাবলী স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করতে হলে তার ভেতরে পরকাল ভীতি জাগ্রত করতে হবে। পরকালে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে, এই অনুভূতি যতক্ষণ প্রবলভাবে মানুষের ভেতরে জাগ্রত না হবে, এই চেতনা যতক্ষণ শানিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের চরিত্র থেকে অসৎ গুণাবলী কোনক্রমেই দূরিভূত হবে না। মানুষের নৈতিক চরিত্র দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, পরকাল ভিত্তিক জীবনধারা পরিচালিত করা একান্তই প্রয়োজন, এই বিষয়টি মানব চেতনায় প্রবিষ্ট করার চেষ্টা এই সূরায় লক্ষ্যণীয়।

আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, পাশাপাশি ইসলামপন্থীরা সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত হবে, সে চিত্রও তুলে ধরে ইসলাম বিরোধিদের এমন একটি 'ঘৃণ্য ব্যবহারের' নিকৃষ্ট পরিণতির বিষয় আলোচিত হয়েছে, যে ব্যবহার তারা প্রতিটি নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীদের সাথে করেছে। নবী-রাসূল ও তাঁদের সাহাবাদের অবর্তমানে যাঁরা দ্বীনি আন্দোলনের পতাকা যুগে যুগে উড্ডীন করেছে, তাদের সাথেও ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী সেই একই ব্যবহার করেছে এবং বর্তমানেও করে যাচ্ছে।

সেই ঘৃণ্য ব্যবহার হলো, আল্লাহর বিধান অনুসরণকারীদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, নানা ধরনের নিকৃষ্ট বিশেষণে তাদেরকে বিশেষিত করা, কাল্পনিক দোষে তাদেরকে অভিযুক্ত করা। পৃথিবীর বুকে ইসলামপন্থীরা নীরবে এসব অপমান আর অভিযোগ সহ্য করেছে, কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে ইসলামপন্থীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবার পর তারা সম্মান ও মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট হয়ে ইসলাম বিরোধিদের নিকৃষ্ট পরিণতি দেখতে থাকবে আর বলবে, এখন ইসলাম বিরোধিরা উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করেছে।

সূরা মুতাফফিফীন-মক্কী | بسم الله الرحمن الرحيم | আয়াত-৩৬-রুকূ-১

ويل للمطففين ﴿১﴾ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ﴿২﴾ واذا

كالوهم او وزنوهم يخسرون ﴿৩﴾ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ﴿৪﴾

ليوم عظيم ﴿৫﴾ يوم يقوم الناس لرب العلمين ﴿৬﴾ كلا ان كتب الفجار

لفي سجين ﴿৭﴾ وما ادرىك ما سجين ﴿৮﴾ كتب مرقوم ﴿৯﴾ ويل يومئذ

للمكذبين ﴿১০﴾ الذين يكذبون بيوم الدين ﴿১১﴾ وما يكذب به الا كل

معتد اثيم ﴿১২﴾ اذا تتلى عليه ايتنا قال اساطير الاولين ﴿১৩﴾ كلا بل

سكته ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴿১৪﴾ كلا انهم عن ربهم

يومئذ لمحجوبون ﴿১৫﴾ ثم انهم لصالوا الجحيم ﴿১৬﴾ ثم يقال هذا الذي

كنتم به تكذبون ﴿১৭﴾ كلا ان كتب الابرار لفي عليين ﴿১৮﴾ وما ادرىك

ما عليون ﴿১৯﴾ كتب مرقوم ﴿২০﴾ يشهده المقربون ﴿২১﴾ ان الابرار لفي

نعيم ﴿২২﴾ على الارائك ينظرون ﴿২৩﴾ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴿২৪﴾

يسقون من رحيق مختوم ﴿২৫﴾ ختمه مسك ط وفي ذلك فليتنافس

المتنافسون ﴿২৬﴾ ومزاجه من تسنيم ﴿২৭﴾ عينا يشرب بها المقربون ﴿২৮﴾

ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ﴿২৯﴾ واذا مروا

بهم يتغامزون ﴿৩০﴾ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ﴿৩১﴾ واذا

رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿۳۲﴾ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿۳۳﴾

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿۳۴﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ

يَنْظُرُوْنَ ﴿۳۵﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে

রুকু ১

(১) দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়, (২) যারা অন্য মানুষদের যখন দেয় তখন তাদের কাছ থেকে নেয়ার সময় পুরাপুরি আদায় করে নেয়। (৩) (আবার) নিজেরা যখন (অন্যের জন্য) কিছু ওজন কিংবা পরিমাপ করে তখন তাতে কিছু কম করে। (৪) এরা কি ভাবে না যে, (বিচারের জন্যে) তাদের (সবাইকে একদিন) কবর থেকে তুলে আনা হবে? (৫) (তুলে আনা হবে) এক মহান দিবসের জন্যে, (৬) সেদিন (সমগ্র) মানব সন্তান সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে এসে দাঁড়াবে, (৭) জেনে রেখো, গুনাহ্গারদের আমলনামা রয়েছে 'সিজ্জীনে' (৮) তুমি কি জানো (সে) সিজ্জীনটা কি? (৯) (এটা হচ্ছে) মুখবন্ধ (একটি) লিখিত খাতা।

(১০) (সেদিন) মিথ্যাবাদীদের জন্যে চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত, (১১) যারা শেষ বিচারের (এই) দিনটিকে অস্বীকার করেছে। (১২) (আসলে) সব সীমালংঘনকারী (পাপীষ্ঠ ব্যক্তি) ছাড়া কেউ-ই এই বিচার দিনটিকে অস্বীকার করে না। (১৩) তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হলে তারা বলে, এগুলো হচ্ছে নিছক আগের কালের গল্পগাঁথা। (১৪) কিন্তু এদের মনের ওপর এদেরই (গুনাহ্) ঝং ধরিয়ে রেখেছে। (১৫) অবশ্যই এসব পাপী ব্যক্তিদের সেদিন (তাদের) মালিক থেকে আড়াল করে রাখা হবে। (১৬) অতপর তারা জাহান্নামের (প্রজ্জ্বলিত) আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (১৭) তারপর (তাদের) বলা হবে এই হচ্ছে (সেই জাহান্নাম) যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। (১৮) হ্যাঁ, নেক লোকদের আমলনামা রক্ষিত আছে ইল্লিয়্যীনে। (১৯) তুমি কি জানো, এই 'ইল্লিয়্যীন' (এর-লোক) কারা? (২০) এটাও হচ্ছে একটি মুখবন্ধ লিখিত খাতা। (২১) আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকটতম ফেরেশ্তারাই এর তদারক করেন।

(২২) নিঃসন্দেহে নেককার লোকেরা মহান নেয়ামতে থাকবে, (২৩) এরা (তাদের) একান্ত কাছের লোকদের (আযাব) অবলোকন করবে। (২৪) এদের চেহারায় নেয়ামতের (তৃপ্তি ও) সজিবতা তুমি সহজেই চিনতে পারবে। (২৫) সিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের (সেদিন) বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে। (২৬) (পাত্রজাত করার সময়ই) কস্তুরির সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এর প্রতিযোগিতায় (বিজয়ী হবার জন্যে) প্রতিটি প্রতিযোগীরই এগিয়ে আসা উচিত। (২৭) তাতে তাসনীমের (ফল্গুধারার) মিশ্রণ থাকবে। (২৮) আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীরাই সেদিন এ থকে (শরাব) পান করতে পারবে।

(২৯) অবশ্যই তারা ভীষণ অপরাধ করেছে যারা ঈমানদারদের সাথে বিদ্রূপ করেছে। (৩০)

তারা যখন এদের পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো, তখন এরা নিজেদের মধ্যে তার ব্যাপারে পরস্পর চোখ টেপাটেপি করতো। (৩১) যখন এরা নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যেতো, তখন খুব উৎফুল্ল হয়েই সেখানে ফিরতো। (৩২) (এরা) যখন তাদের দেখতো, তখন একে অপরকে বলতো (দেখো) এরা হচ্ছে কতিপয় পথভ্রষ্ট (ব্যক্তি)। (৩৩) তাদের এই এদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি! (৩৪) (বিচারের পর) আজ ঈমানদার ব্যক্তিরাই কাফেরদের ওপর (নেমে আসা আযাব দেখে) হাসবে। (৩৫) উন্নত আসনে-আসীন হয়ে তারা (এসব) দেখতে পাবে। (৩৬) প্রত্যেকটি কাফিরকে তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় কি দেয়া হবে না?

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এই সূরার ১ থেকে ৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত প্রতারক গোষ্ঠীর ক্ষতিগ্রস্থ হবার বিষয়টি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতারক গোষ্ঠীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, তারাই প্রতারক, হীন ঠকবাজ-যারা অন্যের কাছ থেকে যখন নিজের প্রাপ্য বুঝে নেয়, তখন পুরোমাত্রায় আদায় করে নেয়। আর যখন অন্যের অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার সময় আসে, তখন তারা কম দিয়ে থাকে। অন্যকে যখন ওজন করে দেয় তখন কম দেয়, আর অন্যের কাছ থেকে যখন ওজন করে নেয় তখন বেশী নেয় অথবা সঠিক ওজন গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর লোকগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, সে বিষয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। মক্কার লোকগুলো মারাত্মক ধরনের ব্যবসায়িক দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল এবং এর অগ্রভাগে লিপ্ত ছিল মক্কার সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। কারণ তাদের হাতেই গোটা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের চাবিকাঠি আবদ্ধ ছিল এবং সেই সুবাদে তারা অতুল ঐশ্বর্য আর সম্পদের অধিকারী ছিল।

দেশে বিদেশে তাদের বাণিজ্য প্রতিনিধি দল যাতায়াত করতো, বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের মেলা অনুষ্ঠিত করতো, হজ্জের মৌসুমে যেসব লোক বিদেশ থেকে আসতো, সে সময় বাণিজ্য মেলায় তারা নানা ধরনের পণ্য ক্রয়ের চুক্তিও মক্কার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে করতো। সমাজের উঁচু স্তরের লোকগুলোই গোটা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো বিধায় গোটা সমাজ ছিল তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পুতুলমাত্র। এরা যখন ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো, তখন তারা ক্ষমতা আর আধিপত্যের কারণে বল প্রয়োগ করে নিজেদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ করতো। গুটি কয়েক দুর্নীতি পরায়ন ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যে মূল্য নির্ধারণ করে দিতো, ক্ষুদে ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারী অথবা আমদানীকারক, সেই মূল্যেই পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হতো। আর তারা যখন বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো, তখন নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে ক্রেতা ও ভোক্তাদেরকে ঐ মূল্যেই ক্রয় করতে বাধ্য করতো, যে মূল্য তারা নির্ধারণ করতো। শুধু তাই নয়, ক্রেতাকে পণ্য ওজন করে দেয়ার সময় নানা কৌশলে ঠকাতো।

এই প্রতারক ঠকবাজ লোকগুলো ছিল প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী, মুনাফাখোর পুঁজিপতি, সমাজের সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এরা অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়ন চালাতো। সে সময় একদিকে ছিল সংখ্যা লঘিষ্ঠ জালিম পুঁজিপতি আর অপরদিকে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত ও নিপীড়িত মানুষ। আল্লাহর ইসলাম সমাজের অসহায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের পক্ষ নিয়ে হাতে গোনা কয়েকজন প্রতাপশালী শোষকের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আওয়াজ তুললো। এটা সেই সময়ের কথা, যখন দ্বীনি আন্দোলনের শিশু অবস্থা। এই আন্দোলন এমন কোন শক্তির অধিকারী হয়নি, যখন কোন জুলুমের প্রতিরোধ করতে সক্ষম। নির্যাতনের মোকাবেলা করার মতো, জনবল, অর্থবল, অস্ত্রের শক্তি কোনটিই তখন ইসলামের ছিল না।

এই অসহায় অবস্থাতেও ইসলাম সততা বিরোধী শোষণমূলক কর্মকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং এর ঘৃণ্য পরিণতি সম্পর্কে শোষক গোষ্ঠীকে সতর্ক করেছে, নির্যাতনের ভয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেনি বা কোন আপোষ করেনি।

তবে কৌশল গ্রহণ করেছে। তারা পরকালকে অস্বীকার করছিল আর আল্লাহর রাসূল পরকাল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করছিলেন, তাদের দুর্নীতির প্রতিবাদ করার পাশাপাশি সেই পরকালে তাদেরকে যে মহান আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে, সে কথাও পুনরায় তদের সামনে পেশ করা হয়েছে। তাদের ভেতরে এই অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পরকালের ভয় যদি তাদের ভেতরে থাকতো তাহলে তারা কোনক্রমেই এই ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতো না। সাধারণ মানুষদেরকে বুঝানো হয়েছে, তোমাদের সমাজের নেতৃবৃন্দ, যারা তোমাদের পরিচালক, তাদের ভেতরে যদি পরকাল ভীতি থাকতো, তাহলে তাদের দ্বারা তোমরা এভাবে শোষিত হতে না। সুতরাং দেশ ও সমাজের নেতৃত্ব ঐ লোকগুলোরই হাতে থাকা উচিত, যারা পরকালকে ভয় করে আর এই ধরনের নেতৃবৃন্দই একটি শোষণহীন, দুর্নীতিমুক্ত, নিরাপত্তাপূর্ণ দেশ উপহার দিতে সক্ষম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কৌশলে এই কথাগুলো তাঁর ঐসব বান্দাহ্দেরকে বুঝিয়েছেন, যারা প্রতি নিয়ত শোষিত বঞ্চিত হচ্ছিলো।

সমাজের বলদর্পী নেতৃবৃন্দের অবৈধ কর্মকান্ড দেখে ইসলাম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো না, যে ইসলামকে তখন পর্যন্ত তারা কোন গুরুত্বই দেয়নি এবং তাদের ধারণা ছিল, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ইসলাম প্রভাব বিস্তার করতে না পেরে এক সময় হারিয়ে যাবে। তাদের দৃষ্টিতে সেই দুর্বল ইসলাম তাদের অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ করলো, বিষয়টি তাদেরকে ভাবিয়ে তুললো। তারা অনুভব করেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইসলামের কথা বলছেন, সেই ইসলাম একদিন তাদের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় শোষণমূলক ব্যবস্থা উৎখাত করবেই। বিষয়টি অনুভব করে তারা ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আর উপহাসের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। সাধারণ মানুষের কাছে মুসলমানদের গুরুত্ব হ্রাস ও তাদেরকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করার যাবতীয় প্রচেষ্টা শুরু করলো।

আলোচ্য সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে অসৎ ব্যবসায়ীদের প্রতিই শুধু সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়নি, ইসলামী বাণিজ্য নীতির প্রধান দিকগুলোও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে যে কোন জিনিস কেনাবেচা করার সময় উভয় পক্ষের কেউ-ই যেন না ঠকে, ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে এমন কোন কৌশল বা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না, যার ভেতরে অসততার নামমাত্র গন্ধও লুকায়িত রয়েছে। ইসলামের এই বিঘোষিত নীতি যেমন দেশের অভ্যন্তরে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য অন্য দেশের সাথে ব্যবসার ক্ষেত্রেও। ভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনভাবেই বাণিজ্য ঘাটতি ফেলা যাবে না এবং ভিন্ন কোন দেশ ইসলামী দেশের সাথে অসম বাণিজ্য করবে, এই সুযোগও দেয়া যাবে না। অন্য দেশ যে পরিমাণ অর্থের পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করবে, ইসলামী দেশও সে দেশের সাথে ইনসাফ করবে। তবে সাধ্যের অতিরিক্ত কিছুই করবে না। আল্লাহ বলেন-

وَاَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ-لاَنُكَلِّفُ نَفْسًاالاَّوُسْعَهَا-

আর মাপে এবং ওজনে পুরাপুরি ইনসাফ করো। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর দায়িত্বের বোঝা ততটুকুই অর্পণ করি, যতটুকু সাধ্য তার রয়েছে। (সূরা আন'আম-১৫২)

ইসলামী শরীয়াতের স্পষ্ট বাণিজ্য নীতি ঘোষিত হয়েছে এই আয়াতে। ব্যবসায়ের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ সততা ও ইনসাফের নীতি অবলম্বন করার আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। তবে অজ্ঞাতসারে

যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা, আল্লাহ তা'য়ালা সেটা ক্ষমা করে দেবেন। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে–

وَاَوْفُوْا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ.....اِلَى اخِرِ الاية

মেপে দেয়ার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেয়ার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটিই ভালো পদ্ধতি এবং পরিমাণের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।(বনী ইসরাঈল-৩৫)

ইসলামের এই বাণিজ্য নীতি পৃথিবীতেও যেমন কল্যাণ বয়ে আনে, আখিরাতেও তেমনি মুক্তির পথ সুগম করে। পৃথিবীতে এর শুভ পরিমাণের কারণ হলো এটাই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই উভয়ের প্রতি নির্ভর করে, আস্থাশীল হয়। এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অন্যদিকে আখিরাতে এর শুভ পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির ওপর।

পরিমাপে সততা অবলম্বন করতে হবে–এই নির্দেশ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রতিটি বিপণী কেন্দ্রে, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানে পরিমাপ যন্ত্রগুলোর তত্ত্বাবধান করা এবং শক্তি প্রয়োগ করে ওজনে ও মাপের ক্ষেত্রে দুর্নীতির উৎখাত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের অপকৌশল, বেঈমানী ও অধিকার হরণের পথ রুদ্ধ করে দেয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন–

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ–

সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন করো এবং পাল্লার দাঁড়ি বাঁকা করো না। (সূরা রাহ্‌মান-৯)

৪ থেকে ৬ নম্বর আয়াতে ঐ প্রতারক, শোষক, জালিম, ঠকবাজ, স্বৈরাচারী, অন্যায় আচরণকারী সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর লোকগুলো সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এদের আচার-আচরণ বড়ই বিস্ময়কর। সেই মহাদিনে–যেদিন সবাইকে পুনরায় জীবিত করা হবে, তখন বর্তমানের মতো তাদের কোন অর্থবল, জনবল, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই থাকবে না, একেবারে অসহায় অবস্থায় তাঁরই সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে, যিনি জগতসমূহের রব। তিনি সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত বিচার করবেন, প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের যাবতীয় ফিরিস্তি প্রকাশ করে দেবেন, অন্যায় কর্মের কঠোর শাস্তি দেবেন, এই চেতনা যদি তারা হৃদয়ে লালন করতো, এই বিশ্বাস যদি তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে তারা যে অবৈধ কর্মে জড়িত রয়েছে, এই কর্ম থেকে তারা বিরত থাকতো। কিন্তু তারা এমনভাবে অবৈধ কর্মে লিপ্ত রয়েছে যে, তাদের আচরণ দেখলে মনে হয়, কোনদিন তাদেরকে আদালতে আখিরাতে উপস্থিত হতে হবে না। ভ্রান্ত চেতনা মনে পোষণ করে তারা যে কর্ম অনুষ্ঠিত করছে, তা বড়ই আশ্চর্যজনক!

৭ থেকে ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, অবশ্যই অপরাধী যারা, পাপিষ্ঠ যারা, আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে যারা, তাদের আমলনামা রয়েছে সিজ্জীন নামক স্থানে। এই সিজ্জীন নামকস্থানটি যে কত ভয়ঙ্কর, তার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য পুনরায় বলা হয়েছে, সেই সিজ্জীন সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে কি?

আরবী ভাষায় বন্দীশালা, কারাগার বা কয়েদখানাকে এক বচনে সিজ্জীন বলা হয় এবং বহু বচনে সুজুন বলা হয়। ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে কারাগারে আবদ্ধ থাকে অপরাধী লোকজন। কারাগারে যারা আবদ্ধ থাকে, তারা কোন্ ধরনের অপরাধ করে কারাগারে বন্দী হয়েছে, তার একটা রেকর্ডসহ অপরাধীর অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণমূলক একটি ফাইল থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে তারাই হলো অপরাধী, যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না। এই শ্রেণীর লোকদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের যে নথিপত্র, ফাইল, যে খাতায় তা লিপিবদ্ধ

করা হয়, সেটা অপরাধীদের জন্য নির্মিত কারাগারের দফতরভুক্ত রয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত অমান্যকারীরা, দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতাকারীরা মৃত্যুর পরে আল্লাহর কারাগার-সিজ্জীনে আবদ্ধ থাকবে, সেই সাথে তাদের আমলনামাও সেখানে সংরক্ষণ করা হবে। সেটা এমনি একটি ফাইল, যার ভেতরে কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো যাবে না।

এই আমলনামা ঐ দিন তাদের সামনে মেলে ধরা হবে, যেদিনের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে পৃথিবীতে তারা অন্যায় কর্মে লিপ্ত ছিল। তারা সেই আমলনামায় দেখতে পাবে, কোন দিন কোন্ অবস্থায় তারা আখিরাতের ভীতি শূন্য হৃদয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে অন্যের অধিকার হরণ করেছিল। কৌশলে কিভাবে আরেকজনকে ফাঁকি দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। কিভাবে সে সাধারণ মানুষকে শোষণ করতো, শোষণমূলক কর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য কোন্ কোন্ পদ্ধতি সে দেশ ও সমাজের বুকে চালু করেছিল।

এসব কর্মকান্ডের যাবতীয় রেকর্ড অপরাধীর সাথে কয়েদখানায় রক্ষিত থাকবে। পৃথিবীর আদালতগুলোয় সৎ মানুষের রেকর্ড আর অসৎ মানুষের রেকর্ড সংরক্ষণ করার জন্য একত্রে একই আলামারিতে বা একই স্থানে রাখা হয়। সন্দেহমূলকভাবে কোন সৎ মানুষকে বন্দী করা হলে তাদের জন্য পৃথক কোন কারাগারের ব্যবস্থা নেই। অপরাধীদের সাথে, অবাঞ্চিত পরিবেশে তাদেরকে অবস্থান করতে বাধ্য করা হয়। সৎ মানুষের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। কিন্তু মহান আল্লাহর ব্যবস্থা ইনসাফ ভিত্তিক। তিনি সৎ আর অসৎ মানুষ অর্থাৎ তাঁর অনুগত বান্দাহ্ আর অবাধ্য বান্দাহ্র আমলনামা একত্রে রাখার ব্যবস্থা করেননি। উভয়ের জন্য যেমন পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি তাদের ফাইলও পৃথক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

১০ থেকে ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন অপরাধীরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে, জাহান্নামে যাবে–যারা পরকালকে অস্বীকার করেছে। মৃত্যুর পরে আল্লাহর আদালতে কোন ধরনের জবাবদিহি করতে হবে না, এই ধারণা পোষণ করে যারা পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করেছে, কোন প্রকার ভীতি শূন্য মনে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছে, অপরের অধিকার ক্ষুন্ন করেছে, ওজনে কম দিয়েছে, সর্বোপরি আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করেছে, এসব লোক অবশ্যই সেদিন জাহান্নামে যাবে।

আর পরকালকে অস্বীকার করে কারা, কোন শ্রেণীর লোকজন পরকাল সম্পর্কে, আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের পরিচয় ও গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে **১২ থেকে ১৩ নম্বর** আয়াতে। এই লোকগুলোর প্রধান পরিচয় হলো, এরা পৃথিবীতে কোন কাজই বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে করতে পারে না। সীমালংঘন করাই যাদের রীতি। আর এদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, এদের সামনে যখন পরকাল সম্পর্কিত কোরআনের বর্ণনা পেশ করা হয়, তখন এরা উপহাস করে বলে থাকে যে, এসব হলো রূপকথার কাহিনী।

সৎলোকদের নীতি হলো, তারা ইসলাম নির্দেশিত মধ্যপন্থা অনুসরণ করে। কথাবার্তায়, আচার, আচরণে, হাঁটা-চলায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, অর্থব্যয়ে তথা জীবনের সমস্ত দিকেই এরা রুচিবোধের পরিচয় দেয়, একটা সীমার মধ্যে অবস্থান করে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে। কারণ এদের চেনতার জগতে পরকাল সম্পর্কিত অনুভূতি জাগ্রত থাকে যে, তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব মহান আল্লাহর আদালতে দিতে হবে। আর সীমালংঘনকরা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাদের কথাবার্তায়, পোষাকে, হাঁটায়, ব্যবহারে দাম্ভিকতা, অহংঙ্কার আর বেপরোয়া ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এরা কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে না। কারণ এরা পরকালের ভীতি শূন্য হৃদয়ের অধিকারী।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন কথা এসব লোকদের সামনে বলা হলে তার কোন গুরুত্বই এরা দেয় না। আল্লাহর বিধানের প্রতি এরা তাচ্ছিল্য মনোভাব পোষণ করে। মৃত্যুর পরের জীবনে শাস্তি ও পুরস্কার, কিয়ামতের ধ্বংসযজ্ঞ, আদালতে আখিরাতে বিচার ফায়সালা সম্পর্কে এদেরকে সতর্ক করা হলে, এসব পাপী ও অপরাধপ্রবণ, সীমালংঘনকারী লোকগুলো মন্তব্য করে, এসব হলো অর্থহীন প্রলাপ মাত্র-সেকালের লোক কাহিনী। এসব কাহিনীর কোন ভিত্তি নেই। এই পৃথিবীর জীবনই হলো আসল জীবন এবং এটাই প্রথম ও শেষ জীবন। আখিরাতের জীবনের কোন ভিত্তি নেই।

এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারাই পৃথিবীতে বিশৃংখলা ঘটেছে এবং ঘটে আসছে। পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেশে দেশে যেসব রক্তক্ষয়ী ঘটনার অবতারণা ঘটেছে, নির্মম গণহত্যা চলেছে, অগণিত মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছে, ঐসব লোকগুলোর দ্বারায়-পরকালের প্রতি যাদের রয়েছে অবিশ্বাস। সমাজে অশান্তি, বিশৃংখলা, সন্ত্রাস তারাই সৃষ্টি করে থাকে, আখিরাতে আল্লাহর বিচারালয় সম্পর্কে যারা উদাসীন। এই জন্যই মহান আল্লাহ আলোচ্য সূরায় ১২ নম্বর আয়াতে বলেছেন, আসলে কিয়ামতের দিনটিকে সীমালংঘনকারী পাপী লোক ব্যতীত আর কেউ মিথ্যা মনে করে না। পাপের প্রতি আসক্তি ও সীমালংঘনের প্রবণতা মানুষকে আদালতে আখিরাতের প্রতি অগ্রসর করায়।

মৃত্যুর পরে আখিরাতের জীবন সম্পর্কে যারা সন্দিহান, যারা চূড়ান্ত বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করে, মৃত্যুর পরের ঘটনাবলীকে যারা অমূলক ও ভিত্তিহীন মনে করে, তাদের সম্পর্কে **১৪ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, অবশ্যই তাদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের তাদের হৃদয় শুভ্রতা হারিয়েছে, হৃদয়ের ওপরে মরিচা জমা হয়েছে, এ কারণেই মহাসত্য সেখানে বার বার ঠোকর খেয়ে ফিরে আসছে। পাপ কাজের কলুষতা আর মলিনতা হৃদয়ের ওপরে আবর্জনা স্তুপিকৃত করেছে, ফলে সত্য সেখানে প্রবেশ করছে না। এদের চেতনার জগতে পাপ আর সীমালংঘনমূলক কর্মকান্ড কৃষ্ণকালো ঘন পর্দায় আবৃত করেছে, সেই আবরণ ভেদ করে সত্য এদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে সক্ষম হচ্ছে না। এদের চোখের সামনে সত্যের আলো প্রজ্জ্বলিত রয়েছে, কিন্তু সে আলোয় এরা পথের সন্ধান পাচ্ছে না, এ কারণেই তারা বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করছে।

সৎ কাজ মানুষের মনকে আনন্দ আর তৃপ্তি দান করে, পাপ কাজ মানুষের মনকে কলুষিত করে। পাপ কাজের ধারাই এমনি যে, এই কাজ যারা ক্রমাগত করতে থাকে, পাপ কাজে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে, তখন পাপের প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। পাপ কর্ম গোটা চেতনার জগৎকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। পাপের কাজকে আর পাপ বলে অনুভূত হয় না। একই কথা বলা হয়েছে হাদীস শরীফে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ যখন কোন পাপের কাজ করে, তখন তার হৃদয়ের ওপরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সেই মানুষ যখন (অনুতপ্ত হয়ে) তওবা করে, তখন সেই কালো দাগ মুছে যায়। কিন্তু সেই মানুষ যদি ক্রমাগত পাপের কাজ করতেই থাকে, তাহলে তার গোটা হৃদয়ই কালো হয়ে যায়।

অর্থাৎ হৃদয়ের ওপরে একটির পর আরেকটি কালো দাগ পড়তে পড়তে গোটা হৃদয় জগৎকেই কালো রঙে রঙিন করে ফেলে। হৃদয়ের এই কালো রঙকেই আলোচ্য সূরার ১৪ নম্বর আয়াতে 'মরিচা' বলা হয়েছে। পাপের অন্ধকার পুরের অধিবাসীরা মহাসত্যের আলোর মধ্যে নিজেদের মৃত্যু বিভিষীকা দেখতে পায়, এ জন্যই তারা পরকালের ঘটনাবলীকে কল্প-কাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়। **১৫ থেকে ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে**, পাপী লোকগুলো তাদের পাপ কর্মের কারণে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর যাবতীয় নে'মাত থেকে বঞ্চিত থাকবে। এরা আল্লাহর

করুণা থেকে আড়ালে অবস্থান করবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বলা হবে, এটা সেই জাহান্নাম–যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

এই জাহান্নামের ভয় যখন তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে, তখন তোমরা জাহান্নাম সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছো, মনে করেছো মৃত্যুর পরে কোন জীবন নেই, আখিরাতে বিচার বলতে কিছুই হবে না, জাহান্নামের শাস্তি একটি অলিক কল্পনা, এখন সেই কল্পনার জিনিস কতটা বাস্তব এবং এর যন্ত্রণা কত কঠিন, তা অনুভব করো।

ইসলামের বিপরীত মত ও পথে বিশ্বাসী লোকগুলো ইসলামপন্থীদেরকে হীন মনে করে থাকে এবং নিজেদেরকে উঁচু মর্যাদার বলে ধারণা করে। মক্কার গুটি কয়েক মুসলমান হৃদয়ে আখিরাতের চেতনা হৃদয়ে জাগ্রত রেখে জীবন পরিচালিত করতো। অপরদিকে ইসলাম বিরোধী পরকালে অবিশ্বাসী লোকগুলো মুসলমানদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিলো করতো। তাদের ধারণা খন্ডন করে এই সূরার ১৮ থেকে ২১ আয়াতে বলা হচ্ছে, অবশ্যই না। যে লোকগুলো সম্পর্কে তোমরা তাচ্ছিলো ভাব প্রদর্শন করছো, তারাই সৎ লোক। তারাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাদের আমলনামা সেখানেই রয়েছে, যেখানে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী লোকদের আমলনামা রাখা হয়।

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর আমলনামা 'সিজ্জীন' নামক স্থানে রাখার কথা বলা হয়েছে এবং এই 'সিজ্জীন' শব্দটি নিম্নতা নির্দেশক। আর আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের আমলনামা যেখানে রাখা হবে, সে স্থানের নাম বলা হয়েছে 'ইল্লিয়্যীন।' এই শব্দটি উচ্চতা অর্থবোধক এবং আরবী ভাষায় ওপর তলার অধিবাসীদেরকে ইল্লিয়্যীন বলা হয়। অর্থাৎ উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী লোকদের আবাসস্থল ইল্লিয়্যীন। এই স্থানটি এমন সব নে'মাতে পরিপূর্ণ, যা সম্পর্কে কোন মানুষ কখনো কল্পনাও করতে পারে না। এই স্থানটির সম্মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে, ঐ 'উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতর' তথা 'ইল্লিয়্যীন' সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কি?

সেখানে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের আমলনামা সংরক্ষিত রয়েছে, যা দেখছে এবং সংরক্ষণ করছে মহান আল্লাহর অতি কাছের ফেরেশ্তারা। আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ যারা তাদের কর্মলিপি এতই সুন্দর এবং সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব, যা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেশ্তাদের দেখার মতোই জিনিস। ঐ আমলনামায় শুধুমাত্র আল্লাহর গোলামীর বিবরণই লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই আমলনামার যারা অধিকারী, তাদের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, তারা অফুরন্ত নে'মাতের মধ্যে অবস্থান করবে। উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হয়ে তারা জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করবে। জান্নাতের অফুরন্ত প্রাচুর্য ও সুখ-সমৃদ্ধির ভেতরে অবস্থান করে তারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অতুলনীয় আনন্দ ও প্রফুল্লতার মধে নিমজ্জিত থাকবে এবং তাদের মুখমন্ডল ও বাহ্যিক অবয়ব থেকে আনন্দের জ্যোতি ঠিক্‌রে বের হবে। তাদের মুখমন্ডল দেখেই অনুভব করা যাবে যে, তারা সীমাহীন প্রাচুর্যতার মধ্যে অবস্থান করছে।

আল্লাহর এসব অনুগত বান্দাহ্গণ জান্নাতে এমন সব নে'মাত ভোগ করবে, মানুষের মন যা কল্পনা করতে পারে, জান্নাতের এসব নে'মাত তার অনেক উর্ধ্বের জিনিস। জান্নাতীদেরকে সর্বোৎকৃষ্ট পানীয় পান করতে দেয়া হবে। যে পাত্রে সেই পানীয় রক্ষিত রয়েছে, সে পাত্রের মুখ বন্ধ করা রয়েছে এমন সুগন্ধিযুক্ত মিশ্‌ক দিয়ে, যা হৃদয়-মন উৎফুল্লকারী সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দেবে। সেই পানীয়ের সাথে তাসনীম নামক ঝর্ণা থেকে মিশ্রণ ঘটানো হবে। এই নে'মাত পান করবে মহান আল্লাহর অনুগত ও ঘনিষ্ঠ বান্দাহ্গণ।

ঈমানদারকে জান্নাতে মিশ্‌কের সিল-মারা পানীয় পাত্র পরিবেশন করা হবে, এই বর্ণনা দিয়েই তাগিদ করা হয়েছে, 'যেসব লোক অন্য লোকদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায়, তারা যেন এই জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে।' তারপরে পুনরায় সেই পানীয়ের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাতে তাসনীম মিশ্রিত করা হবে।

পৃথিবীতে একশ্রেণীর মানুষ অপরকে ঠকিয়ে, প্রতারণা করে, দুর্নীতি করে, অবৈধ পথে মানুষকে শোষণ করে সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা করে থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির চিন্তা মনে প্রশয় দেয় না, আখিরাতকেই অস্বীকার করে, আল্লাহর ভয়হীন চিত্তে একের পর এক অন্যায় কাজ করে হৃদয়কে পাপের কালো আবরণে ঢেকে দেয়, এরা প্রতিযোগিতা করে পৃথিবীর তুচ্ছ সম্পদের জন্য। এরা একে অপরে প্রতিযোগিতা করে যেন আরেকজনের তুলনায় নিজে অধিক সম্পদের অধিকারী হতে পারে। এই তুচ্ছ সম্পদ অর্জন করার জন্য যে কোন ধরনের গর্হিত পথ এরা অবলম্বন করে থাকে। অথচ এসব সম্পদ একদিন তার কোনই কাজে আসবে না। সমস্ত কিছু ছেড়ে তাকে একদিন মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। সেই অনন্ত জীবনে সুখ অর্জন করার জন্যই মানুষের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

২২ থেকে ২৮ আয়াতে জান্নাতের নে'মাতের বর্ণনা দিয়ে সেদিকে মানুষে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, তোমরা যারা পৃথিবীতে সম্পদের স্তুপ গড়ার লক্ষ্যে ওজনে কম দিয়ে, ব্যবসার ক্ষেত্রে শঠতা আর ধূর্ততার পদ্ধতি গ্রহণ করে অবৈধ পথে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা করে থাকো, তা একেবারেই নগণ্য। এসব নগণ্য বস্তু অর্জন করার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা ত্যাগ করে সেই মহান নে'মাত অর্জন করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা করো, যে নে'মাত সম্পর্কে কল্পনা করার মতো কল্পনা শক্তিও মানুষের নেই। বিলাস সামগ্রী ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের যাবতীয় উপকরণ সম্পর্কে মানুষের কল্পনা শক্তি যতদূর পৌঁছতে সক্ষম, আল্লাহর জান্নাতের এসব উপকরণ তার থেকে অনেক উচ্চ পর্যায়ের। এগুলো অর্জন করার জন্য মানুষকে প্রতিযোগিতা করতে বলা হয়েছে। আর এগুলো অর্জন করা যায় দ্বীনি আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহর গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করলে।

আলোচ্য সূরার শেষের ২৯ থেকে ৩২ আয়াত পর্যন্ত এমন এক শ্রেণীর লোকদের ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাদের অস্তিত্ব এবং ঘৃণ্য কার্যকলাপ প্রতিটি নবী ও রাসূলের যুগে সক্রিয় ছিল, তাঁদের অবর্তমানেও অতীতকালের প্রতিটি যুগে ছিল এবং বর্তমানেও রয়েছে অত্যন্ত হিংস্ররূপে।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই সূরা যখন যে পরিবেশে অবতীর্ণ হয়েছিল তখন পরিবেশ ছিল জাহিলিয়াতের পর্দায় আবৃত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলিয়াতের সেই ঘোর কৃষ্ণকালো অন্ধকারে মহাসত্যের আলো প্রজ্জ্বলিত করলেন। সেই আলোয় আলোকিত হবার জন্য আল্লাহর কিছু বান্দাহ্ ছুটে এসেছিল। আর জাহিলিয়াতের ধ্বজাধারীরা তাওহীদের সেই আলোর মধ্যে নিজেদের মৃত্যুর বিভিষীকা দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। এই আলো যেন অত্যন্ত দ্রুত নির্বাপিত হয়, সেই চেষ্টায় তারা ছিল সক্রিয়। আল্লাহর রাসূলের সংস্পর্শে এসে যাঁরা মহান ইসলাম কবুল করে নিজেকে ধন্য করেছিল, এই লোকগুলো হয়ে পড়েছিল সমাজের শোষক ও অন্যায়কারীদের চক্ষুশূল।

তারা ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের কটুক্তি করতো এবং যাঁরা ইসলাম কবুল করেছিলেন, সমাজে তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। মুসলমানদেরকে দেখলেই তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস করতো। লোক সমাজের মুসলমানদের যেন কোন গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা না থাকে, মানুষ যেন

এদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে, সে লক্ষ্যে তারা লোক সমাবেশে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত অপমানিত করতো। রাসূলের অনুসারীদের দেখলেই ঘৃণ্য জাহিলিয়াতের অন্ধ পূজারীরা কটাক্ষ করতো, ছোট করার উদ্দেশ্যে আপত্তিকর ইশারা-ইংগিত করতো। এই ধরনের অপরাধমূলক কর্ম করে তারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতো এবং কে কতজন মুসলমানকে অপমান করতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চলতো।

প্রচলিত জাহিলিয়াতের মাথায় পদাঘাত করে অন্ধকারের গুহা থেকে যেসব মানুষ বেরিয়ে এসে তাওহীদের আলোয় নিজেদেরকে আলোকিত করেছিলেন, মানব রচিত মতবাদের ধ্বজাধারীরা তাদেরকে বলতো এরা সব বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আদর্শের অনুসারীগণ ছিলেন, বিভ্রান্ত আর পথভ্রষ্ট। সুতরাং এই বিভ্রান্ত লোকগুলোর প্রাপ্যই হলো লাঞ্ছনা আর অপমান, এদেরকে অপমান করাটা অত্যন্ত মহৎ কাজ, অতএব এই মহৎ কাজ যে যত বেশী করতে পারবে, সে ততই সার্থক হবে। এটাই ছিল সে যুগের জাহিলদের চিন্তা-চেতনা। দ্বীনি আন্দোলনের শত্রুদের এই ঘৃণ্য ব্যবহার সম্পর্কেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য সূরার ২৯ থেকে ৩২ আয়াতে বলেছেন।

সেই যুগে জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত জাহিলরা দ্বীনি আন্দোলনের লোকদেরকে বিদ্রূপ করার ক্ষেত্রে যেসব ভাষা ব্যবহার করতো, তা আধুনিক জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত জাহিলদের ব্যবহার করা ভাষার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। আধুনিক জাহিলরা ইসলামপন্থীদেরকে সাধারণ মানুষের কাছে হীন, নগণ্য ও সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত করার লক্ষ্যে শব্দকোষ থেকে যেমন বিদ্রূপাত্মক ও ঘৃণ্য শব্দ চয়ন করছে, তেমনি তারা নিত্য নতুন শব্দও তৈরী করছে। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকদের সাথে আচরণে জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত জাহিল লোকদের ভূমিকা সর্বকালে ও সকল পরিবেশে এক অভিন্ন প্রকৃতির। সে যুগেও তারা যেমন ছিল বন্য হয়েনার মতোই হিংস্র, বর্তমানেও তাদের আচরণ অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে।

সে যুগে প্রচার-প্রপাগান্ডার যেসব হাতিয়ার হাতের কাছে মৌজুদ ছিল, তা সবই কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ইসলামের শত্রুরা ব্যবহার করেছে। সে যুগের তুলনায় বর্তমানে প্রচারের আধুনিক উপায়-উপকরণ তৈরী করা হয়েছে। রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকাসহ অসংখ্য উপকরণের মাধ্যেমে মুহূর্তে একটি বিষয় বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ বর্তমানে আবিষ্কার করা হয়েছে। একটি অসত্য বিষয় সমস্ত প্রচার উপকরণে একযোগে বার বার প্রচার করে সাধারণ মানুষের কাছে তা সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ রয়েছে। আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রচার উপকরণ একযোগে ব্যবহার করছে।

ইসলামপন্থীদেরকে সেকেলে, অযোগ্য, অথর্ব, সমাজের বোঝা, মানব জাতির অকল্যাণের প্রতীক, পশ্চাৎপদ, প্রগতি বিরোধী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, হিংস্র, সন্ত্রাসী, রক্তপিপাসু ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করছে। পত্র-পত্রিকায় এদের বিরুদ্ধে প্রতিদিনই অসংখ্য নিবন্ধ লেখা হচ্ছে, এদের বিরুদ্ধে অসংখ্য বই প্রতিদিনই প্রকাশিত হচ্ছে। রেডিও, টিভিতে এসব সৎলোকদের বিরুদ্ধে ধারাবিবরণী প্রচার করা হচ্ছে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মিছিল-মিটিং, ছবি, কার্টুন ও মানববন্ধনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আল্লাহর এই অনুগত বান্দাহ্দেরকে ঘৃণা ও উপহাসের পাত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। নিজেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়ে ইসলামপন্থীদেরকে দায়ী করছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যে লোকগুলো নিজেরা পূতঃ পবিত্র চরিত্রের, দেশ ও সমাজ থেকে শোষণ, নির্যাতন, সন্ত্রাস, অশান্তি, অন্যায়, অবিচার, অকল্যাণ উৎখাত করে গোটা মানবমন্ডলীর কল্যাণ সাধন করার লক্ষ্যে জীবনের সমস্ত কিছুই বিলিয়ে দিচ্ছে, তাদেরকেই

আপত্তিকর বিশেষণে বিশেষিত করছে তারাই, যাদের আপাদমস্তক পাপ আর অপরাধের নোংরামিতে কলুষিত, সন্ত্রাস আর নির্মম রক্তপাতে যারা অভ্যস্ত, অশান্তি আর উচ্ছৃংখলতার যারা জনক, যারা মানবতার নির্মম নিষ্ঠুর চাবুক, রক্তপাত আর সন্ত্রাস জিইয়ে রেখে যারা নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করছে। নিয়তির নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস, এসব নরপশুদের হাতেই রয়েছে বর্তমান পৃথিবীর নেতৃত্ব আর শাসন দন্ড। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে যাদের পায়ের নীচে মানবতা লাঞ্ছিত হচ্ছে, তারাই নিজেদেরকে মানবতার মুক্তিদাতা হিসাবে দাবী করে। নিহত মানবতার শবদেহের ওপরে দাঁড়িয়ে তারা যে কি আচরণ করছে, সে চেতনা তাদের নেই। তাদের এই আচরণ ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের এমন শোচনীয় ও মর্মান্তিক শূন্যাবস্থা যে, এই পর্যায়ে উপনীত হয়ে বিবেক আর মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অপমৃত্যু ঘটেছে। এই লোকগুলো সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَاِذَاقِيْلَ لَهُمْ لاَتُفْسِدُوْافِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ-

তাদেরকে যখনই বলা হয়েছে, 'তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না' তখনই তারা বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র। (সূরা বাকারা-১১)

অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করার মশাল যে ব্যক্তি হাতে ধরে রয়েছে, সেই ব্যক্তিই চিৎকার করে দাবী করেছে, আমরা তো অশান্তির আগুন নির্বাপিত করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি। প্রতিটি যুগের জালিম আর স্বৈরাচারী গোষ্ঠী, আল্লাহর দ্বীনের দুশমনরা অভিন্ন সুরে কথা বলেছে।

দ্বীনি আন্দোলনের শত্রু, মানবতার দুশমনদের এই ঘৃণ্য আচরণের প্রতি উচ্চ মার্গের বিদ্রূপাত্মক শব্দ প্রয়োগ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য **সূরার ৩৩ থেকে ৩৬ নম্বর** আয়াতে বলেন, ইসলামপন্থীদেরকে বিভ্রান্ত বলার এরা কে? এদের প্রতি তো ইসলামপন্থীদের কল্যাণ অকল্যাণ দেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীর বুকে এরা আমার বিধান অনুসরণকারীদের প্রতি বিদ্রূপ করছে, কিন্তু আখিরাতের দিনে আমার অনুগত বান্দাহ্রা সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হয়ে অপরাধিদের দুর্দশা অবলোকন করে হাসবে আর বলবে, এরা এদের কর্মের উপযুক্ত ফল ভোগ করছে।

পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী ও সন্দেহ পোষণকারীদের দৃষ্টিতে ইসলামপন্থীরা কান্ডজ্ঞানহীন বোকা। এরা যদি বিভ্রান্ত আর বোকাই না হবে, তাহলে পৃথিবীর এই ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে তারা কেমন অস্বচ্ছল রসকসহীন জীবন-যাপন করে। যেখানে হাত বাড়ালেই জীবন ও যৌবনকে ভোগের সাগরে ডুবিয়ে দেয়া যায়, অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়া যায়, সেখানে আখিরাতের কাল্পনিক ভয়ে এরা নিজেদেরকে সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখছে, সুতরাং এদের চেয়ে বোকা আর বিভ্রান্ত লোক কেউ হতে পারে না। কাল্পনিক জান্নাতের আশায় আর অস্তিত্বহীন জাহান্নামের ভয়ে এরা নির্যাতন, নিষ্পেষণ, উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অকাতরে সহ্য করছে। এসব আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃতপক্ষে পাপাসক্ত নির্লজ্জ মানুষের অপরাধমূলক কর্ম, নির্দয় মন্তব্য আর কুকথার কোন সীমা থাকে না। কোন কথা বলতেও তারা যেমন লজ্জাবোধ করে না তেমনি নোংরা কোন কাজ করতেও তাদের বিবেক লজ্জিত হবার পরিবর্তে তৃপ্তি লাভ করে। আর এই পশুস্তরের লোকগুলোই জাতির উৎকৃষ্ট সন্তান দ্বীনি আন্দোলনের লোকদের সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এরা হলো বোকা আর বিভ্রান্ত। এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, এসব পশুপ্রবৃত্তির লোকগুলোকে ঈমানদারদের অভিভাবক নিয়োগ করা হয়নি, তাদের রক্ষক ও প্রহরী করে পাঠানো হয়নি যে, তারা ইসলামপন্থীদের সম্মান-মর্যাদা নিরুপণ করবে, তাদের অবস্থার

মূল্যায়ন করবে, এই দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়নি। যারা দ্বীনি আন্দোলন করে, তারা মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, প্রগতি বিরোধী, বিভ্রান্ত-বিপথগামী অথবা সুপথগামী, এই রায় দেয়ার অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে?

কিয়ামতের ময়দানে বিদ্রূপকারী লোকগুলোকে যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমতের আড়ালে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার সাথে কঠিন পীড়াদায়ক স্থান জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং এভাবেই তারা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, এটা সেই স্থান, পৃথিবীতে যাকে তোমরা অস্বীকার করতে। যে জাহান্নামকে তোমরা অস্তিত্বহীন কল্পনার এক স্থান মনে করতে এবং পৃথিবীতে এই স্থানকে ভয় করে যারা সৎ ভাবে জীবন-যাপন করেছে, অবৈধ ভোগ-বিলাস থেকে নিজেদেরকে যারা বিরত রেখেছে, তাদেরকে তোমরা বোকা-বিভ্রান্ত বলেছো। এখন দেখো, তোমাদের ভাষায় যারা ছিল বোকা আর বিভ্রান্ত, তারা সীমাহীন ভোগ-বিলাসে উচ্চ মর্যাদার সাথে অবস্থান করছে।

আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকে নির্যাতন করা, লাঞ্ছিত করা, অপমান করা, অকারণে দোষী সাব্যস্ত করা, কাল্পনিক অভিযোগে অভিযুক্ত করা, আপত্তিকর বিশেষণে বিশেষিত করা, হেয় প্রতিপন্ন করাকে ইসলামের বিপরীত আদর্শের অনুসারীরা অত্যন্ত মহৎ কাজ, ভালো কাজ বা সওয়াবের কাজ বলে বিবেচনা করে থাকে। সে যুগে ইসলামের শত্রুরা তাই করতো। বর্তমান যুগের জাহিলরা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে বলে, এরা মানবতার দুশ্মন, এদেরকে প্রতিহত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অর্থাৎ ইসলামকে প্রতিহত করাই হলো তাদের দৃষ্টিতে সওয়াবের কাজ।

আল্লাহর জান্নাতে অবস্থান করে মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্রা যখন দেখতে থাকবে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করতো, তাদেরকে যারা লাঞ্ছিত অপমনিত করতো, নির্যাতন করতো, তারা জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করছে। তখন তারাও ওদের শাস্তি ভোগের দৃশ্য মন্তব্য করবে, ইসলাম বিরোধিরাও আজ তাদের কর্মের সওয়াব পাচ্ছে–অর্থাৎ যেমন কর্ম তারা করেছে, তেমনই বিনিময় তারা আজ ভোগ করছে।

এই সূরার শেষের কয়েকটি আয়াতে কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্ম নিবেদিত লোকদেরকে চরম ধৈর্য্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়–কন্টকাকীর্ণ। এই পথ বড়ই বন্ধুর–কন্টকসজ্জিত। কাঁটা বিছানো পথ অতিক্রম করে মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। কাঁটার আঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে গোটা দেহ। তারপরও চলার গতিতে কোন শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না। ধৈর্য্যের সর্বশেষ স্তরে নিজেকে পৌঁছাতে হবে। ইসলাম বিরোধিদের ছুড়ে দেয়া যাবতীয় আবর্জনা অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে দেহ থেকে পরিষ্কার করে সামনের দিকে ধাবিত হতে হবে। তবেই আসবে সাফল্য, তাহলেই এই সূরায় বর্ণিত আল্লাহর জান্নাতের স্বাদ অস্বাদন করা যাবে, মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করা যাবে।

সূরা আল-ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৮৪

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে 'ইনশাক্কাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার পরপরই যেসব সূরা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, এই সূরাটিও তার অন্যতম। আল্লাহর রাসূল মানুষদেরকে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তখন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতি শারীরিক নির্যাতন শুরু করেনি। মানসিক নির্যাতনের মধ্যেই তাদের বিরোধিতা সীমাবদ্ধ ছিল। কোরআন ও রাসূলকে তারা প্রত্যাখ্যান করছিল এবং পরকালীন জীবনকে তারা অবিশ্বাস্য মনে করে উপহাস করছিল। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মৃত্যুর পরের জীবনের বাস্তবতা তাদের সামনে পেশ করছিলেন।

এই সূরার প্রধান আলোচিত বিষয়ও মৃত্যুর পরের জীবন। প্রথম কয়েকটি আয়াতে কিয়ামতের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন পরিদৃশ্যমান আকাশের অবস্থান এমন থাকবে না। আল্লাহর আদেশে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। বর্তমানে গোটা পৃথিবীর যমীন যেমন রয়েছে, তেমন থাকবে না। পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, জঙ্গল ইত্যাদি কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না, সমস্ত কিছু একাকার করে দিয়ে যমীনকে সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। মানুষ মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে এবং তাদের কর্মের যাবতীয় প্রমাণাদি মাটির অভ্যন্তরে সংরক্ষিত হচ্ছে, সেদিন এই মাটি সব উদগীরণ করে দিয়ে তার গর্ভ শূন্য করে দেবে। সেদিন মহান আল্লাহর আদেশেই আকাশ ও যমীন তার করণীয় ভূমিকা পালন করবে।

এরপর বলা হয়েছে, মানুষ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, চেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, পরকালীন জীবনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারা তীব্র গতিতে ধাবিত হচ্ছে আদালতে আখিরাতের দিকে। কারণ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, মৃত্যুর দিকে সতত ধাবমান সত্তার নামই হলো জীবন। এই জীবন একবারই লাভ করা যায় এবং তা ক্রমশঃ শেষের দিকেই এগিয়ে যায়। পৃথিবীর এই জীবনের শেষের খুব কাছেই আদালত আখিরাত। মানুষের অস্বীকার আর অস্বীকৃতি যতই প্রবল হোক না কেন, তার অস্বীকৃতি তাকে আখিরাতে উপস্থিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এভাবে সমস্ত মানুষ যখন আখিরাতের ময়দানে উপস্থিত হবে, তখন কর্মানুসারে এসব মানুষকে দুই দলে বিভক্ত করা হবে। এক দলের কর্মলিপি প্রদান করা হবে তাদের ডান হাতে এবং তাদেরকে কোন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ ব্যতীতই ক্ষমা করা হবে। আল্লাহর রহমত লাভ করেছে, এ জন্য তখন তারা পরিচিতজনদের কাছে আনন্দ প্রকাশ করবে। অপর দলের কর্মলিপি তাদের পেছনের দিক থেকে ঘৃণাভরে সামনে নিক্ষেপ করা হবে। এই লোকগুলো তখন আপন কর্মলিপি অবলোকন করে মৃত্যু কামনা করবে। কিন্তু মৃত্যুর অস্তিত্ব তখন না থাকার কারণে তাদেরকে জাহান্নামে যেতেই হবে, ভোগ করতে হবে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি। কারণ পৃথিবীতে তারা পরকালের এই জীবনকে কল্পনার বিষয় মনে করে কোন গুরুত্ব দেয়নি। মৃত্যুর পরে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, এই বিষয়টিকে তারা অস্বীকার করেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড অবলোকন করছিলেন। সেদিন

এমন কোন কারণ ঘটবে না, যে কারণে এই লোকগুলোকে দন্ডভোগ থেকে মুক্তি দেয়া হবে। পশ্চিম আকাশে সূর্যের অস্তমিত হওয়া এবং রাতের অবসানে পূর্বাকাশে সূর্যের উদিত হওয়া, দিবাবসানে রাতের আগমনের কারণে মানুষ ও পশুগুলো যার যার আশ্রয় স্থলে ফিরে আসে, চাঁদ প্রথমে যে আকারে থাকে ক্রমশঃ সে আকার পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণ বৃত্তের আকারণ করে, এসব বিষয় যেমন চিরন্তন সত্য, এর ভেতরে যেমন সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না, তেমনি মৃত্যুর পরের জীবনও চিরন্তন সত্য।

আল্লাহর কোরআন তাদেরকে আল্লাহর গোলামীর দিকেই আহ্বান জানায়, তাদের উচিত হলো, কোরআনের আহ্বান শুনে নিজেদেরকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করা। অথচ তারা যেটা উচিত তা না করে, যেটা অনুচিত তাই করছে, কোরআনকে তারা অস্বীকার করছে। এসব লোকদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। আর যারা কোরআনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোরআনের বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, আল্লাহর গোলামী করেছে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অফুরন্ত শুভ প্রতিফল।

❁

সূরা ইনশিকাক-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-২৫-রুকু-১

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (১) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (২) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (৩)
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (৪) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (৫) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (৬) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (৭)
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (৮) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (৯) وَأَمَّا
مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (১০) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (১১) وَيَصْلَى
سَعِيرًا (১২) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (১৩) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (১৪) بَلَى
إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (১৫) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (১৬) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (১৭)
وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (১৮) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (১৯) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (২০)
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (২১) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (২২)
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (২৩) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (২৪) إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (২৫)

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) যখন আসমান ফেটে যাবে, (২) সে তো (মূলত) তার মালিকের আদেশটুকুই পালন করবে, (আর) এটিই তার করা উচিত। (৩) যখন এই ভূমন্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে। (৪) (মুহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তাকে ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে, (৫) সেও তার সৃষ্টিকর্তার আদেশটুকুই পালন করবে (আর) এটাই তার করা উচিত। (৬) হে মানুষ! কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, অতপর তুমি তাঁর সামনা সামনি হবে।

(৭) তোমাদের মধ্যে যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, (৮) তার হিসাব একান্ত সহজভাবেই গ্রহণ করা হবে। (৯) সে খুশীতে নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাবে। (১০) যার আমলনামা তার পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, (১১) সে তখন মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে, (১২) (ডাকতে ডাকতেই) সে জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে। (১৩) (অথচ দুনিয়ায়) সে নিজ পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দে আত্মহারা ছিলো, (১৪) কখনো সে (একথা) চিন্তা করেনি যে, তাকে একদিন তার মালিকের মুখোমুখি হতে হবে। (১৫) হ্যাঁ, (অবশেষে) তাই (হলো)। তার মালিক (কিন্তু) তার সব কয়টি কার্যকলাপকেই (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে) দেখছিলেন। (১৬) শপথ সন্ধ্যাকালীন রক্তিম আভার, (১৭) শপথ রাতের ও এর ভেতর যতো কিছুর সমাবেশ ঘটে-তার, (১৮) শপথ (ওই) চাঁদটির, যখন তা (ধীরে ধীরে) পুর্ণাংগ চাঁদে পরিণত হয়ে যায়। (১৯) তোমাদেরকে অবশ্যই (দুনিয়ার) একটি স্তর অতিক্রম করে (মৃত্যুর আরেকটি) স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। (২০) এদের হয়েছে কি? এরা কেন মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনে না, (২১) আর এই কোরআন যখন এদের সামনে পড়া হয়, তখন কেন এরা মালিকের সামনে সেজদাবনত হয় না? (২২) এই অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা (মহাগ্রন্থকে) মিথ্যা বানায়।

(২৩) আল্লাহ তা'য়ালা ভালো করেই জানেন এরা (এদের) আমলনামায় কি কি জিনিস জমা করে রেখেছে। (২৪) হে নবী তাদের সবাইকে তুমি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। (২৫) তবে হ্যাঁ, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এই সূরার প্রথম আয়াতে কিয়ামতের দিনের ভয়ানক অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সেদিন আকাশমন্ডলী দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। পৃথিবীর অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বহাল রাখার জন্য মহাশূন্যে যেসব স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে, এসব স্তরের অস্তিত্ব সেদিন থাকবে না। **দ্বিতীয় আয়াতে** বলা হয়েছে, ঐ আকাশজগৎ সেদিন তার রব্ব-এর, তার মালিকের আদেশ পালন করবে এবং তার পক্ষে তার মালিকের আদেশই পালন করা কর্তব্য। এই কর্তব্য সেদিন আকাশ পালন করবে।

তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের 'হাম্‌দ' শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লাহর কোরআনের বিভিন্ন আয়াত আমরা উদ্ধৃত করেছি। সেসব আয়াতে বলা হয়েছে, সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুই মহান আল্লাহর অনুগত এবং তারা একটি মুহূর্তও অলসভাবে অতিবাহিত করে না। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত তারা মহান আল্লাহর প্রশংসা করছে, আল্লাহর আদেশের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দিয়েছে। আকাশ তার মনিবের প্রতি অনুগত এবং মনিবের আদেশ পালনে বিনয়াবনত। কারণ আপন মনিবের প্রতি এটাই তার একান্ত কর্তব্য এবং সেই কর্তব্যই আকাশ সেদিন বিনয়ের সাথে পালন করবে মাত্র। আলোচ্য সূরার **৩ থেকে ৫ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং সেই মুহূর্তে এই যমীন তার গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা বাইরে উদগীরণ করে দিয়ে একেবারে শূন্য হয়ে যাবে। যমীনও সেদিন তার মালিকের আদেশ পালন করবে মাত্র এবং সেটাই তার করা উচিত। অর্থাৎ ও আকাশ ও যমীনের প্রতি যে আদেশ দেয়া হবে, সেদিন তারা তাই পালন করবে। মহান আল্লাহর গোলাম হিসাবে, গোলামের যা কাজ, গোলামের যে ভূমিকা পালন করা উচিত, সেদিন তারা সেই ভূমিকাই পালন করবে।

সৃষ্টির আদিতে সমস্ত কিছুই ছিল ধোঁয়ার আকারে এবং এই আকাশ ও যমীন একত্রিত ছিল। আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে-

وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا-قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ-

সমস্ত কিছুই ধোঁয়ার আকারে ছিল। তিনি আকাশ ও যমীনকে বললেন, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তোমরা অস্তিত্ব ধারণ করো। উভয়ে বললো, আমরা অনুগতদের মতই অস্তিত্ব গ্রহণ করলাম। (সূরা হামীম আস্-সাজদা-১১)

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا-

আল্লাহর বিধান অমান্যকারীরা কি দেখে না, এই আকাশ ও যমীন সবকিছুই মিলিত অবস্থায় ছিল পরে আমি এগুলোকে পৃথক করে দিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া-৩০)

কোরআনের আয়াতের এই সূত্র ধরেই বিজ্ঞানীরা বলছেন, সৃষ্টির আদিতে সমস্ত কিছুই গ্যাসের পিন্ড ছিল এবং একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সমস্ত কিছুই পৃথক হয়ে পদার্থ গঠিত হলো তার বর্তমান পৃথিবীতে যা কিছুই আমরা দেখছি, তা সৃষ্টি হলো। জড়বাদী বিজ্ঞানীরা এখানে আল্লাহকে এড়িয়ে গিয়েছেন। তারা বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ/শক্তি একটি বিন্দুতে সংকোচিত ছিল। বিজ্ঞানীরা এই অবস্থাকে সিংগুলারিটি (Singularity) বলে থাকেন। সম্ভবত একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে (Big Bang)। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের হার থেকে তারা এর বয়স নির্ধারণ করেছেন ১০, ০০০ মিলিয়ন বছর। অর্থাৎ প্রায় ১০, ০০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে একটি বিগ্ ব্যাঙ থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। সেই বিগ্ ব্যাঙ-মহাবিস্ফোরণ কিভাবে এবং কার আদেশে ঘটলো, তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন।

কোরআনের দৃষ্টিতে বিষয়টি এ রকম যে, মহান আল্লাহ যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, এসব সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি একটি নক্সা বা মডেল সৃষ্টি করেছেন। আদিতে তিনি যখন সমস্ত কিছুকে ধোঁয়া বা গ্যাসের আকারে রেখেছিলেন, সেটির প্রতিই তিনি আদেশ দিলেন, এই মডেল অনুসারে সমস্ত কিছুই আকৃতি ধারণ করো এবং তারা তাদের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ বিনয়াবনত চিত্তে পালন করলো। আমরা এখানে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করেই এ কথা বলতে চাই যে, সৃষ্টির শুরুতেও যেমন আকাশ ও যমীন মহান আল্লাহর আদেশ তৎক্ষণাত পালন করে উভয়ে যার যার উপকরণসহ পৃথক আকৃতি ধারণ করেছে, বর্তমান সময় পর্যন্তও তাঁরই আদেশ অনুসরণ করছে এবং যেটা তার করা উচিত, কিয়ামতের দিনও সেই আল্লাহরই আদেশ পালন করবে এবং যেটা তার করা উচিত।

আলোচ্য সূরায় বলা হয়েছে সেদিন যমীন সম্প্রসারিত করা হবে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বলছেন, পৃথিবীর এক মেরু থেকে আরেক মেরুর দূরত্ব ৭ হাজার ৮শ' ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭শ' ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। আর বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব ৭ হাজার ৮শ' ৯৯ দশমিক ৮৩ মাইল বা ১২ হাজার ৭শ' ১৩ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার। এই পৃথিবীর আয়তন ১৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫১ হাজার বর্গমাইল বা ৫১ কোটি ১ লক্ষ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভূ-ভাগ হলো ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ৫৯ হাজার মাইল বা ১৪ কোটি ৮৩ লক্ষ কিলোমিটার। এই পরিমাণ পৃথিবী পৃষ্ঠের মোট আয়তনের প্রায় ৩০ শতাংশ। আর পৃথিবীর পানির অংশের আয়তন ১৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯২ হাজার মাইল বা ৩৬ কোটি ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের ৭০ শতাংশই পানি।

বাইরে থেকে দেখলে পৃথিবীকে একটি নিরেট গোলক বলেই মনে হয়। কিন্তু আসলে পৃথিবীর ভূ-স্তর অনেকটা পেঁয়াজের মতো কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। ভূ-স্তরের ওপরের অংশ থেকে ৪০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হয় ক্রাষ্ট। এটি হলো পৃথিবীর খোলশ। ক্রাষ্ট অঞ্চলটির পুরুত্ব অঞ্চলভেদে কম বা বেশী হয়ে থাকে। সমুদ্রের নিচে ক্রাষ্টের পুরুত্ব বেশ কম হয়। আবার মহাদেশীয় ভূ-খন্ড অঞ্চলে এর পুরুত্ব অনেক বেশি হতে দেখা যায়। পৃথিবীর ইনার কোর এবং ক্রাষ্ট অঞ্চলটি কঠিন। তবে আউটার কোর এবং ম্যান্টল স্তরটি অর্ধগলিত পদার্থে গঠিত। ফলে ওই অঞ্চলটি অনেকটা প্লাষ্টিকের মতো। পৃথিবীর ভরের বেশির ভাগটাই ম্যান্টল স্তরের অবদান। অবশিষ্ট ভরের বেশির ভাগটাই দখল করে রয়েছে কোর অঞ্চলটি। কোর অঞ্চলটির মূল উপাদান হলো হলো বা লোহা ও নিকেলের সমন্বয়। তবে অন্যান্য আরো কিছু হালকা ধরনের উপাদানও সেখানে থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন। (ক্রাষ্ট, ইনার কোর, আউটার কোর ও ম্যান্টল ইত্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'তিনিই যমীনকে গালিচা হিসাবে বিছিয়েছেন' শিরোণাম দেখুন।)

পৃথিবীর কোর অঞ্চলের কেন্দ্রের তাপমাত্রা ৭৫০০ কেলভিনের মতো। অর্থাৎ সূর্য পৃষ্ঠের চেয়েও পৃথিবীর কোর কেন্দ্রের তাপমাত্রা বেশি। লোয়ার ম্যান্টল অঞ্চলটি গঠিত মূলতঃ সিলিকন, ম্যাগনেশিয়াম এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে। সেই সাথে রয়েছে কিছু লোহা, ক্যালসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম। আপার ম্যান্টলের উপাদান হলো লোহা ও ম্যাগনেশিয়ামের সিলিকেট, সেই সাথে রয়েছে ক্যালশিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম। পৃথিবীর ভরের বেশির ভাগটাই লোহা। এর পরিমাণ শতকরা ৩৪ দশমিক ৬ ভাগ। সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীর ঘনত্বই সবেচেয়ে বেশি। এই ঘনত্বের পরিমাণ প্রতি গ্রাম ঘন সেন্টিমিটারে ৫ দশমিক ৫১৫ গ্রাম।

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের তুলনায় পৃথিবীর গঠন কাঠামোটি একেবারে ভিন্ন। পৃথিবীর ক্রাষ্ট অঞ্চলটি কয়েকটি পৃথক কঠিন টুকরায় বিভক্ত। এই টুকরোগুলোকে বলা হয় প্লেট। গোটা বিশ্বের সাগর-মহাসাগর ও মহাদেশগুলো এই প্লেটের ওপর অবস্থান করছে এবং এই প্লেটগুলো স্থির নয়। এরা নিচের উত্তপ্ত এবং অর্ধগলিত ম্যান্টল স্তরের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। যে তত্ত্বের সাহায্যে পৃথিবীর এই কাঠামোকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে বলা হয় প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবী পৃষ্ঠে খুবই ধীরলয়ে হলে নিরবচ্ছিন্নভাবে দুটো ঘটনা ঘটে চলেছে। একটি হলো ভূ-স্তরের বিস্তার এবং অন্যটি সংকোচন। যখন দুটো প্লেট একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তখন সেই ফাঁকা অঞ্চল পূরণ করতে নিচের স্তরের বিস্তার ঘটে। আর এর সংকোচনের ঘটনাটি ঘটে, যখন দুটো প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এর ফলে একটি প্লেটের ক্রাষ্ট অন্য প্লেটের নিচে প্রবেশ করে।

এরই ফলে সেই সংযোগ স্থলে সৃষ্টি হয় পার্বত্য রেঞ্জ। যেমন হিমালয়, রকি, আন্দিজ এবং আল্পস রেঞ্জ। পৃথিবীর যতো ভুকম্পন জোন বা অঞ্চল রয়েছে, তাদের সিংহভাগের অবস্থানই প্লেট বাউন্ডারি বা সীমান্ত অঞ্চলে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এক সময় পৃথিবীর সমস্ত ভূ-ভাগই এক সাথে জোড়া ছিল এবং সেই ভূ-খন্ডের নাম দেয়া হয়েছে প্যানজিয়া। তারপর সময়ের ব্যবধানে এই প্লেটগুলো ভেঙে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং পৃথিবীতে বর্তমানে ৮টি বড়ো প্লেট রয়েছে। সুতরাং এই পৃথিবীর ভূ-ভাগ সমতল নয়। পাহাড়, পর্বত, টিলায় পরিপূর্ণ। রয়েছে সাগর-মহাসাগর, নদী-নালা, ডোবা-খানাখন্দ ইত্যাদি। বিশাল একালাকা জুড়ে রয়েছে বনভূমি।

সেদিন এই যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে–অর্থাৎ কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। বুল ড্রেজার দিয়ে যেমন সমস্ত কিছুই সমান করা হয়, আল্লাহর আদেশে সেদিন সমস্ত কিছুই সমান করে দেয়া হবে। মহাকম্পনের ফলে সেদিন সমস্ত কিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গোটা ভূ-মন্ডলকে একটি বিশাল প্রান্তরে পরিণত করা হবে এবং সেই প্রান্তরে সমস্ত মানব জাতি পুনর্জীবন লাভ করে দন্ডায়মান হবে। এই প্রান্তরের নামই হলো হাশরের ময়দান, সূরা ত্বাহা-এর ১০৬ থেকে ১০৭ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ সেদিন একে এক ধূসর প্রান্তর বানিয়ে দেবেন। সেখানে তুমি কোন বক্রতা বা ভাঁজ দেখতে পাবে না।' তাফসীরে ইবনে জারীর ও মুসনাদে আহ্মাদের এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'হাশরের যমীন হবে সম্পূর্ণ এক নতুন যমীন। তার রং হবে রৌপ্যের মত সাদা। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও সাদা যমীনের বুকে মানব জাতি পুনরুত্থিত হবে। আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেন, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দস্তরখানার মতই বিছিয়ে দেয়া হবে।

ভূ-গর্ভের অভ্যন্তরে যেসব প্রাণী রয়েছে, খনিজ পদার্থ রয়েছে, যুগে যুগে ভূমিকম্পের সময় পৃথিবীর ওপরি ভাগের যেসব বনজভূমি, পর্বত, অট্টালিকা ভূ-গর্ভের নিচে চলে গিয়েছে, তা সবই সেদিন যমীন উদগীরণ করে দিবে। মানুষ এই পৃথিবীতে যখন যা করছে, তা সবই তার আশেপাশের বস্তুর ওপরে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং এসবের কোন ধ্বংস নেই। অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি কর্মের সাক্ষ্য যমীনেই সংরক্ষিত হচ্ছে। যমীন সেদিন এসব সাক্ষ্যও প্রকাশ করে দেবে। এভাবেই যমীন সেদিন শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে।

আকাশ ও যমীন কর্তব্য পালন করবে, এ কথা বলে মানুষের এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলা হয়েছে যে, তোমার প্রকৃতিতে মহান আল্লাহর দাসত্ব করার যে স্বভাব নিহিত রয়েছে, সেই স্বভাবকে জাগিয়ে তোলো এবং আল্লাহর গোলামী করো, আল্লাহর গোলামী করাই তোমার উচিত। তাঁর গোলামী করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তোমার উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা।

৬ নম্বর আয়াতে মানবমন্ডলীকে ডেকে বলা হচ্ছে, এই পৃথিবীতে তোমরা যা কিছুই করছো তার পেছনে রয়েছে কঠোর শ্রম। এই শ্রম তোমরা দিয়ে যাচ্ছো পৃথিবীর জীবনে সাফল্য লাভ করার লক্ষ্যে। চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ বা যে কোন পেশাই গ্রহণ করো না কেন, সব কিছুর পেছনেই কঠোর শ্রমের প্রয়োজন। পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে সামান্য সুখ-শান্তি, স্বস্তি লাভের জন্য তোমরা কঠোর শ্রম দিতে দ্বিধাবোধ করছো না। অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে দূরাকাশের মহাশূন্যে নিজেদেরকে নিয়ে যাচ্ছো, সাগর-মহাসাগর, তথা অগাধ জলধীর অতলদেশে চলে যাচ্ছো, পাহাড়ের বিপদ সঙ্কুল গুহায় প্রবেশ করছো, গভীর অরণ্যে হিংস্র পশুর ভয় উপেক্ষা করে সেখানে প্রবেশ করছো, মাটির অসংখ্য স্তর অতিক্রম করে অন্ধকার কূপে পৌছে যাচ্ছো, আগ্নেয় গিরি জ্বালামুখে প্রবেশ করছো। অথচ এসব স্থান অত্যন্ত বিপজ্জনক, সেখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে আসার নিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু অর্থ-সম্পদ আর যশ-খ্যাতির নেশায় তোমরা অবলীলায় যে কোন বন্ধুর পথে পা বাড়িয়ে দিচ্ছো।

তোমাদের দেহের যে নির্ধারিত জীবকোষ, স্নায়ূবিক শক্তি, দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চলনশক্তি, বাকশক্তি, মস্তিষ্ক পরিচালনা করার শক্তি, অনুভূতি শক্তি, স্মৃতি শক্তি ইত্যাদি দান করা হয়েছে, এসবই তোমরা কঠোর শ্রমের মাধ্যমে নিঃশেষে ক্ষয় করে জীবন কালের শেষের খুব কাছে পৌছে যাচ্ছো। অথচ এসব তোমাদেরকে দান করা হয়েছিলো, এগুলো তোমরা আপন প্রভুর গোলামী করার মাধ্যমে নিঃশেষ করবে। কিন্তু তোমরা তা না করে আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে এসব ক্ষয় করছো।

তোমাদের ভেতরে এই চেতনা নেই যে তোমরা ক্রমশঃ সেই দিনটির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছো, যে দিনটিতে তোমরা আপন প্রভু, নিজ মনিবের সামনে উপস্থিত হবে এবং তোমাদের যাবতীয় কাজের হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে। এই পৃথিবীর জীবনে তোমাদেরকে যদি ১০০ বছর হায়াত দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে যে মুহূর্তে মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর পরিবেশে ভূমিষ্ঠ হলে, সেই মুহূর্ত থেকেই নির্ধারিত ১০০ বছর কমতে থাকলো। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, মাস, বর্ষ, কাল অতিবাহিত হয়ে এক সময় ১০০ শত বছর যখনই পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই, যে শক্তি তোমাকে আর এক মুহূর্ত এই পৃথিবীতে ধরে রাখবে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, মৃত্যুর দিকে সতত ধাবমান একটি সত্তা তুমি। মৃত্যুর পরে তোমাকে দ্বিতীয় জীবনে প্রবেশ করতেই হবে এবং এটাই তোমার বাস্তব অবস্থা। অথচ এই অবস্থাকে তুমি উপেক্ষা করছো। উদাসীনতা প্রদর্শন করছো সেই জীবনের প্রতি, যে জীবনে তোমাকে তোমার প্রতিটি কাজের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে।

এখন তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, সেই জীবনের জন্য তুমি কি উপকরণ যোগাড় করেছো। এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে একটু সুখ-শান্তি, স্বস্তি আর নিবিড় গৃহকোণের আশায় নিজেকে কঠোর শ্রমে নিয়োজিত করেছো, চরম বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যাচ্ছো, অথচ অনন্তকালের জীবনের সুখ-শান্তির জন্য কিছুই যদি নিয়ে যেতে না পারো, তাহলে পৃথিবীতে দেয়া তোমার কঠোর শ্রম সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তোমার মনিবের সামনে যখন তুমি দাঁড়াবে, তখন কি জবাব দেবে? তিনি যখন প্রশ্ন করবেন, তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম আমার দাসত্ব করার লক্ষ্যে, তুমি কি সেই লক্ষ্যে কাজ করেছো? এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোন প্রস্তুতি কি তুমি গ্রহণ করেছো?

৭ থেকে ১৫ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, এই পৃথিবীতে তুমি যে কঠোর শ্রম দিতে দিতে আপন প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর দিনটির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলে, অর্থাৎ তোমার জীবনের নির্ধারিত সময় সীমা তুমি অতিক্রম করছিলে, এই সময়ে তুমি যা কিছুই করছিলে তা তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হচ্ছিলো। সেদিন তোমার আমলনামাই সাক্ষ্য দেবে, তোমার যাবতীয় শ্রম তোমার আপন প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা নিজ প্রভুর পছন্দনীয় পথে ব্যয় করেছিলে কিনা। পৃথিবীতে আগমন করে তুমি তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের জীবন পারিচালিত করবে যে আদর্শ অনুসারে, সেই আদর্শ তিনি তাঁর নবী-রাসূলের মাধ্যমে তোমাকে দিয়েছেন। পৃথিবীর জীবনে যাবতীয় শ্রম তুমি যদি সেই আদর্শ অনুসারে ব্যয় করে থাকো, তাহলে মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জীবনে তুমি যখন আপন মনিবের সামনে দাঁড়াবে, তখন তোমার সেই আমলনামা তোমার ডান হাতে পরিবেশন করা হবে। তোমার কাছ থেকে তোমার যাবতীয় কাজের হিসাব অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। তুমি যখন দেখবে, পৃথিবীতে যে কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার জীবন অতিবাহিত করেছো, তা সার্থক হয়েছে-সফলতা অর্জন করেছে। তখন তোমার খুশির কোন সীমা থাকবে না। তোমার পরিচিত ও ঘনিষ্ঠজনদের কাছে গিয়ে এই বলে আনন্দ প্রকাশ করবে যে, এই মহাবিপদের দিনে আমাকে আমার প্রভু ক্ষমা করেছেন।

আর তোমার আমলনামা যদি এই সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে তুমি কঠোর শ্রম ব্যয় করেছো বটে, কিন্তু তা আপন প্রভুর প্রেরিত আদর্শ অনুসারে নয়, নিজের ইচ্ছানুসারে বা অন্য কারো নির্দেশিত পথে। তখন তোমার সেই আমলনামা প্রদানের পর্ব, লজ্জা আর অবমাননাকর পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শেষ হবে। এমনভাবে তোমাকে তোমার আপন কর্মলিপি প্রদান করা হবে, যেন অগণিত মানুষের মধ্যে তুমি লজ্জিত ও অপমানিত হও। নিজের কর্মলিপি দেখে তুমি

নিজের নিকৃষ্ট পরিণতি অনুভব করে মৃত্যুকে ডাকবে, মনে করবে এই মুহূর্তে যদি তোমার মৃত্যু ঘটতো, তাহলে নিকৃষ্ট পরিণতি তোমাকে ভোগ করতে হতো না। কিন্তু তখন মৃত্যুর অস্তিত্ব থাকবে না, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে তোমাকে প্রবেশ করতেই হবে।

কারণ পৃথিবীর জীবনে তুমি যখন সাফল্য লাভের আশায় কঠোর শ্রম ব্যয় করছিলে, তখন তোমার ভেতরে এই চেতনা ছিল না, একদিন তোমাকেই আপন প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে যাবতীয় কাজের হিসাব দিতে হবে। বিষয়টিকে তুমি অস্বীকার করেছো, অবিশ্বাস করেছো। অবিশ্বাস আর অস্বীকৃতিকে ভিত্তি করেই তুমি পৃথিবীতে সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনদের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, তাদের সুখ-শান্তি, স্বস্তি লাভের জন্য, বিলাস-ব্যসনের জন্য অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করেছো, অপরের অধিকার ক্ষুন্ন করেছো, অবৈধ পথে অর্থোপার্জন করেছো। সমাজ, দেশ ও জাতির ক্ষতি করেছো। এসব করতে গিয়ে তোমার ভেতরে এই চেতনা জাগ্রত হয়নি যে, তুমি যা করছো তা আপন প্রভুর অপছন্দীয় কাজ-আর তিনি যাবতীয় কিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন। সেদিন তুমি অনুভব করবে, পৃথিবীতে ব্যয় করা তোমার কঠোর শ্রম, যে শ্রমের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার জীবনকাল পূর্ণ করেছিলে, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে, তুমি সকল দিক থেকেই ব্যর্থ হয়েছো।

যাদের আমলনামা ডান দিক থেকে বা ডান হাতে দেয়া হবে অর্থাৎ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাদের কর্মলিপি দেয়া হবে, তাদের হিসাব অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। অপরদিকে আল্লাহর বিদ্রোহী বান্দাহ্দের হিসাব অত্যন্ত কড়াভাবে গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি কিভাবে ঘটবে, তা কোরআন ও হাদীসে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সূরা রা'দ-এর ১৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা আপন রব-এর আনুগত্য করেনি তারা যদি পৃথিবীর সমগ্র সম্পদের মালিক হয়ে বসে এবং ঐ পরিমাণ আরো সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়, তাহলেও তারা আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে মুক্তি পাবার জন্য এসব কিছুই বিনিময় হিসাবে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এরা সেই সব লোক যাদের কাছ থেকে অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে আর তাদের পরিণতি জাহান্নাম, এটা অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা।'

পৃথিবীতে যারা পরকাল অবিশ্বাস করেছে, পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে এবং আল্লাহ ভীতি শূন্য হৃদয়ে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করেছে, নিজেরা আল্লাহর বিধানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে এবং অন্যকেও সে বিধান অনুসরণ করতে বাধার সৃষ্টি করেছে, দ্বীনি আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছে, এসব লোকদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা কোনক্রমেই ক্ষমা করবেন না। এরা ছোটখাটো যে অপরাধ করবে, সেগুলোরও হিসাব গ্রহণ করা হবে, অথচ আল্লাহ্ হলেন মহান-তিনি তাঁর অনুগত বান্দাহ্র ছোটখাটো ভুলভ্রান্তির দিকে দৃষ্টি দেবেন না। হিসাব গ্রহণ করার সময় এদের সাথে সামান্যতম করুণার চিহ্নও প্রকাশ পাবে না। চরম ক্রোধ কম্পিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালা হিসাব গ্রহণ শেষে তাদের জন্য নির্ধারিত ঠিকানা জাহান্নামে প্রেরণ করবেন।

অপরদিকে পৃথিবীতে যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধান অনুসরণ করেছে, এই বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করেছে, নিজে আল্লাহর অনুগত থেকেছে এবং অপরকেও অনুগত করার চেষ্টা করেছে, জীবনের প্রতিটি পদে পরকালের জবাবদিহির কথা চিন্তা করেছে, তাদের হিসাব অত্যন্ত সহজভাবে, করুণা সিক্ত পদ্ধতিতে, ক্ষমা সুন্দর-অনুকম্পার দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হবে। যারা রাহ্মানের বান্দাহ্, তাদেরই হিসাব অতন্ত সহজভাবে গ্রহণ করা হবে।

(রাহ্মানের বান্দাহ্দের পরিচয় জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'কোরআনে রাহ্মানের বান্দাদের পরিচয়' শিরোণাম দেখুন।)

যাদের হিসাব করুণা সিক্ত পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে, তারা হলো ঐসব লোক, যারা নিজেদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সচল রাখার লক্ষ্যে এরা নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদ অকাতরে সংগঠনে দান করে, সময় দান করে, প্রয়োজনে নিজের মূল্যবান জীবনটাও দিয়ে দেয়। এই লোকগুলোর বিস্তারিত গুণাবলী আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা তাওবার ১১১ আয়াত থেকে ১১২ আয়াতে বর্ণনা করেছেন। মানুষ হিসাবে অসতর্ক মুহূর্তে এরাও অপরাধ করে বসে, কিন্তু সাথে সাথে তারা তওবা করে আর বার বার তওবা করা এসব লোকদের একটি স্থায়ী গুণ। অপরাধমূলক কর্ম সংঘটিত হবার সাথে সাথে সে সতর্ক সজাগ হয়ে ওঠে। সে অনুভব করতে পারে যে, নিতান্ত অবচেতনভাবে সে তার প্রভুর পছন্দের বিপরীত কাজ করেছে। এ জন্য তার লজ্জার অনুভূতি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার মনে অনুতাপ সৃষ্টি হয়। এই লজ্জা আর অনুতাপ সহকারে সে আল্লাহর কাছে তওবা করে, বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আর এসব লোকদের দ্বারা যেসব অপরাধ পৃথিবীতে সংঘটিত হয়, পৃথিবীতেই এদেরকে নানা কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। এসব লোকদের সৎকাজের বিনিময়ে তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের সামগ্রিক কর্মপন্থার কল্যাণময়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের অনেক অপরাধও হিসাবে ধরা হবে না। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আল্লাহর রাসূলের কাছে বললেন, 'আমার কাছে আল্লাহর কোরআনের সবচেয়ে ভীতি প্রদর্শনমূলক আয়াত হলো সেটা, যে আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোন ধরনের গুনাহ্ করবে, তাকে সেই জন্য শাস্তি দেয়া হবে।'

জবাবে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'হে আয়েশা! তুমি কি জানো না আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ পৃথিবীতে যে কষ্ট পেয়ে থাকে, কোন কাঁটাও যদি তার দেহে বিদ্ধ হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে তার কোন না কোন গুনাহের শাস্তি হিসাবে গণ্য করে পৃথিবীতেই তার হিসাব পরিষ্কার করে দেন। তবে আখিরাতে যার হিসাবের কড়াকড়ি করা হবে, সে-ই শাস্তি পাবে।' হযরত আয়েশা বললেন, আল্লাহ যে বলেছেন, 'যাকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার কাছ থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে'–এ কথার অর্থ কি? আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এর অর্থ হলো, আল্লাহর দরবারে প্রত্যেকের ভালো-মন্দের আমলনামা অবশ্যই পেশ করা হবে। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, মনে রেখো, সে মারা পড়বে।'

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে একবার নামাজে এই দোয়া করতে শুনেছি যে, 'হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ করে গ্রহণ করো।' নামাজ শেষে আমি তাঁর ঐ দোয়ার তাৎপর্য জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'সহজ হিসাব' কথাটির অর্থ হলো, বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। হে আয়েশা! সেদিন যার কাছ থেকে হিসাব বুঝে নেয়া হবে, জানবে সে-ই বিপদে পড়লো।' সূরা আহ্কাফের ১৬ আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অনুগত বান্দাহ্দের সম্পর্কে বলেন, 'এই ধরনের মানুষের কাছ থেকে তাদের উত্তম কাজসমূহ আমি গ্রহণ করে থাকি, তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করে দেই।'

আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের অপরাধও আমলমানায় লিপিবদ্ধ থাকবে এবং আল্লাহ তা দেখবেন। তিনি এটাও দেখবেন, এই অপরাধ করার পর পরই তাঁর এই গোলাম কতটা

অনুতপ্ত হয়েছিল, লজ্জিত হয়েছিল এবং সেজ্দায় নিপতিত হয়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। মহান আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার এসব অপরাধের কথা অগণিত লোকদের মাঝে প্রকাশ করে দিয়ে তাদেরকে লজ্জিত করবেন না। এসব লোক পৃথিবীতে কতটা ভালো কাজ করেছে আখিরাতে সেই অনুপাতে তাদের সম্মান ও মর্যাদা নিরুপণ করা হবে। তবে তাদের পদস্খলন, দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গ্রেফতার করা হবে না। এটা ঠিক তেমনি যেমন কোন মহৎ হৃদয়, উদার ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মনিব তার অনুগত ও বিশ্বস্ত চাকরকে ছোট ছোট সেবা ও খেদমতের নিরিখে মূল্যায়ন করে না বরং তার এমন কোন কাজের বিচারে মূল্যায়ন করে যে ক্ষেত্রে সে বড় কোন কৃতিত্ব দেখিয়েছে অথবা জীবনপাত ও বিশ্বস্ততার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে। এ রকম চাকরের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে সে তার সমস্ত সেবাকে খাটো করে দেখানোর মতো আচরণ করে না।

মহান আল্লাহও তাঁর অনুগত বান্দাহ্দের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরণ করবেন। অনুগত বান্দার ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তির দিকে তিনি দৃষ্টি দেবেন না। কোন কোন হাদীসে দেখা যায়, আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাহ্দের অসতর্ক মুহূর্তে করা গুনাহের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেবেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাহ্কে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন, 'তোমার অপরাধ সম্পর্কে আমি জানি তবুও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।' এই কথাটি আল্লাহ এমন পরিবেশে বলবেন যে, ভয়ে আতঙ্কে বান্দার কলিজা মুখ দিয়ে বের হয়ে আসার উপক্রম হবে। যাদের হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে, সে বান্দাহ্কে বিশেষ পর্দায় আবৃত করা হবে, যেন সে অন্যদের সামনে লজ্জিত না হয়। তারপর তার আমলনামা তার সামনে তুলে ধরে স্বয়ং আল্লাহ বলবেন, 'হে বান্দাহ্! এই দেখো, তুমি অমুক অমুক দিনে, অমুক স্থানে এসব অপরাধ সংঘটিত করেছিলে।' পর্দায় আবৃত অবস্থায় একাকী আল্লাহ্ যখন বান্দাহ্কে তার অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন, তখন সে বান্দার অবস্থা কি দাঁড়াবে, তা কি কল্পনা করা যায়?

১৬ থেকে ১৮ আয়াতে শপথ করা হয়েছে এভাবে যে, 'শপথ সন্ধ্যাকালীন রক্তিম আভার, শপথ রাতের ও এর ভেতর যতো কিছুর সমাবেশ ঘটে–তার, শপথ ওই চাঁদটির যখন তা ধীরে ধীরে পুর্ণাংগ চাঁদে পরিণত হয়ে যায়।' এসবের শপথ করে মানব জীবনের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যে বিষয়টির প্রতি মানুষ উদাসীনতা প্রদর্শন করে আসছে। আর শপথও করা হয়েছে এমন সব বিষয়ের যে, শপথ করে যে কথা বলা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়সমূহ। শপথ করা হয়েছে সন্ধ্যাকালীন রক্তিম আভার। দিনের পরে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসা এবং তখন দিনের আলোয় চারদিকে এলোমেলো অবস্থায় মানুষ ও জীব-জানোয়ারের ছড়িয়ে থাকার অবসান ঘটে। তারপর চাঁদ প্রথম যে অবস্থায় উদিত হয় এবং পরে তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়। যে কয়েকটি বিষয়ে শপথ করা হলো, এগুলো স্পষ্টই এ কথাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এই মহাবিশ্বের বুকে অপরিবর্তনীয় বলতে কিছুই নেই। সমস্ত কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতি নিয়ত।

এসবের শপথ করে ১৯ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, অবশ্যই তোমাদেরকে একটির পর আরেকটি স্তর অতিক্রম করে যেতে হচ্ছে। এভাবে স্তর অতিক্রম করতে করতে সেই মূল স্তরে গিয়ে উপনীত হবে, যেখানে তোমাদের কর্মই নির্ধারণ করবে, এখন কোন স্তর তোমাদের প্রাপ্য। তোমরা যে কর্ম করছো, সেই কর্মানুসারে সেদিন চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণ করা হবে। তোমাদের কর্মই সেদিন তোমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার স্তরে উপনীত করবে, অথবা ঘৃণা, অপমান আর লাঞ্ছনার স্তরে পৌছে দেবে।

সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমস্ত কিছুই প্রতিটি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে, বিবর্তিত হচ্ছে, কোথাও অগ্রগতি হচ্ছে কোথাও বা হচ্ছে অধঃগতি। সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত নিয়মে কার্যকর রয়েছে। এসব নিয়ম শুধু বস্তু জগতেই কার্যকর নয়, সৃষ্টির সেরা মানব জাতির ওপরেও কার্যকর রয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তাকে শিশু নামে অভিহিত করা হয়। বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে সেই শিশু কৈশোরে পদার্পণ করে। সময়ের ব্যবধানে ঐ কৈশোর কাল অতিক্রম করে মানুষ তারুণ্যে পৌঁছে যায়। তারুণ্য থেকে এই মানুষ যৌবনের সোনালী আভায় বিকশিত হয়। দিন মাস বর্ষ কালের গন্ডি পাড়ি দিয়ে মানুষ প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হয়। তারপর ক্রমশ এগিয়ে যায় বয়সের শেষ প্রান্তে।

মানুষ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়। মানুষের এই যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তন থেকে একটি মানুষ পুনরায় আর পূর্বের অবস্থায় কখনও ফিরে আসতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ মানুষ শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে উপনীত হলে সেখান থেকে পুনরায় শৈশবে ফিরে আসতে পারে না। তারুণ্য থেকে তার পক্ষে সম্ভব হয় না কৈশোরে ফিরে আসা। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ অবস্থা থেকে কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না যৌবনের সেই সোনালী দিনগুলোয় প্রত্যাবর্তন করা। সুতরাং মানুষের জীবনে কোন অবিচলতা নেই। শৈশব থেকে কৈশোরে, সেখান থেকে তারুণ্যে-যৌবনে, তারপর বার্ধক্যে, সেখান থেকে মৃত্যু, তারপর আলমে বারযাখ, সেখান থেকে পুনরুজ্জীবন লাভ, তারপর পরকালীন জীবনে প্রবেশ, সেখানে আল্লাহর আদালতে হিসাব দেয়া এবং শাস্তি বা পুরস্কার লাভ। এসব স্তর অবশ্যই মানুষকে অতিক্রম করে মূল স্তরে উপনীত হবে।

২০ ও ২১ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে, এসব মানুষের কি হয়েছে যে এরা কেন সেই আল্লাহর দাসত্ব করছে না, যে আল্লাহ তার ওপরে এসব স্তর অতিক্রম করার অমোঘ নিয়ম কার্যকর করেছেন? তাঁর আমোঘ আদেশে চন্দ্র, সূর্য, তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্রমালা যার যার কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে, রাত ও দিনের আবর্তন-বিবর্তন হচ্ছে, সকাল সন্ধ্যায়–সন্ধ্যা সকালে হারিয়ে যাচ্ছে, এভাবে করে প্রতিটি বস্তুই এক স্তর অতিক্রম করে পরের স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নিয়মে মানব জীবনও স্তর থেকে স্তরান্তরিত হচ্ছে, যে আল্লাহ এসব করছেন, মানুষ কেন সে আল্লাহর গোলামী করছে না? অসংখ্য নিদর্শনাবলী তার দেহ থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে প্রকাশিত হচ্ছে, এসব দেখেও কেন সে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করছে না?

সেই আল্লাহ তাদের জন্য জীবন বিধান হিসাবে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, সেই কোরআনের দাওয়াত এরা কেন গ্রহণ করছে না? কেন তারা কোরআনের রঙে নিজেদেরকে রঙিন করছে না? যে কোরআন তার আপন প্রভুর সৃষ্টি বৈচিত্র সম্পর্কে তাকে অবহিত করছে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অবগত করছে, তার নিজের দেহ কাঠামো ও সৃষ্টি সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে, কিভাবে সে এই পৃথিবীতে প্রতি পলে পলে তাঁর আপন মনিবের অনুগ্রহ লাভ করছে সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করছে, অবশেষে তার শেষ পরিণতি সম্পর্কেও জানিয়ে দিচ্ছে, তাকে সত্য আর মিথ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্য জানিয়ে দিচ্ছে, সেই কোরআন শুনে কেন সে তার নিজ প্রভুর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ছে না?

(এই সূরার ২১ নম্বর আয়াত পাঠ করে ও শুনে অবশ্যই সেজ্দা করতে হবে, স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম সেজ্দা করেছেন।)

২২ আয়াত থেকে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত বলা হচ্ছে, তাদের উচিত ছিল অসংখ্য নিদর্শনাবলী অবলোকন করে তার নিজ মনিবের প্রতি ঈমান এনে তাঁরই দেয়া বিধান অনুসরণ করে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করা এবং এটাই ছিল তাদের একান্ত কর্তব্য, অথচ তারা তাদের কর্তব্য পালন না করে নিজের মালিকের প্রতি বিদ্রোহ করেছে, মালিককে অস্বীকার করছে। যিনি অনুগ্রহ করে তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁর মাধ্যমে সত্য সঠিক সহজ সরল পথপ্রদর্শন করেছেন, কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, সেই রাসূল ও কোরআনের প্রতি তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে। তাদের এই আচরণ যেমন ধৃষ্টতামূলক তেমনি বিস্ময়কর।

যিনি তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যে পৃথিবী তার বাসস্থল-সেটাকে আবাসযোগ্য করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তার অধীন করে দিয়েছেন, সমস্ত নেয়ামত ভোগ করার অধিকার দিয়েছেন, তাকে সত্য পথপ্রদর্শন করার লক্ষ্যে রাসূল এবং কোরআন প্রেরণ করেছেন, সেই মনিবকে অস্বীকার করা চরম ধৃষ্টটা বৈ আর কিছু নয়।

যে মনিবের অনুগ্রহ ব্যতীত এই পৃথিবীতে এক মুহূর্তকাল টিকে থাকা সম্ভব নয়, সেই মনিব আদেশ করার সাথে সাথে তার দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুহূর্তে অচল হয়ে যাবে, এ কথা জেনে বুঝেও যারা মনিবের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছে, তাদের এই আচরণ বিস্ময়করও বটে।

অথচ এরা যা কিছুই করছে, তার মালিক সব কিছুই অবলোকন করছেন এবং তাদের আমলনামায় এসব সংরক্ষিত হচ্ছে। নিজ মালিকের বিরুদ্ধে কথা বলতে এদের জিহ্বায় এরা জড়তাবোধ করছে না, মালিকের দেয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এরা মালিকের বিধানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, মালিকের বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যারা আন্দোলন করছে, তাদের বিরুদ্ধে এরা ষড়যন্ত্র করছে, এরা নিজেদের কার্যাবলীর মাধ্যমে যা কিছুই নিজেদের আমলনামায় সঞ্চয় করছে, সে সম্পর্কে তাদের মালিক অবগত রয়েছেন।

আপাদমস্তক নোংরামীতে নিমজ্জিত এসব লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য রাসূলকে বলা হচ্ছে, আপনি এদেরকে পীড়াদায়ক শস্তির 'সুসংবাদ' দিন। শাস্তি দেয়ার ব্যাপারটি কোন সুসংবাদের বিষয় নয়। তবুও বলা হয়েছে এদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। আসলে বিষয়টি এরকম হতে পারে যে, কোন অপরাধী যখন গ্রেফতার হয়, তখন এদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, 'এতদিন যা খুশী তাই করেছে, এবার বাছাধন বুঝবে মজা'। এখানে 'মজা' অর্থে শাস্তি বুঝানো হয়েছে। তেমনি আল্লাহর বিদ্রোহী বান্দাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, পৃথিবীর জীবনে ক্ষণিকের স্বাধীনতা পেয়ে যা খুশী তাই তোমরা করছো। যখন জীবনের নানা স্তর অতিক্রম করে শেষ স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন আসল মজা টের পাবে। অর্থাৎ চরম কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

এরপর সেই সব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেছে আপন প্রভুর বিধান অনুসরণ করে, পৃথিবীর জীবনের প্রতি স্তরকে আপন প্রভুর রঙে রঞ্জিত করেছে, মহান মালিকের বিধান অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে গিয়ে তারা ধন-সম্পদ, সময় কোরবানী দিয়েছে এবং প্রয়োজনে নিজের প্রাণটিও অকাতরে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছে, তাদের জন্য তাদের প্রভু প্রস্তুত করে রেখেছেন অফুরন্ত শুভ প্রতিফল এবং অকল্পনীয় পুরস্কার। জীবনের সর্বশেষ স্তরে তারা এসব পুরস্কার লাভ করবে তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে।

*

সূরা আল-বুরুজ

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৮৫

শানে নুযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে যে 'বুরুজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, একেই এ সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরার আলোচিত বিষয় থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মক্কায় দাওয়াতী কার্যক্রম এমন একটি বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যখন ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়েছিল যে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস, অপমান আর লাঞ্ছিত করে ইসলামী আদর্শের গতি রোধ করা যাবে না। এই আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় শোষণমূলক ও অন্যায় পদ্ধতি উৎখাত করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হবেই। তখন তারা প্রতিরোধের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছিল। দ্বীনি আন্দোলনে যারা শামিল হয়েছিল এবং হচ্ছিলেন, তাদের ওপরে শারীরিক নির্যাতনসহ শুরু করেছিল। নির্যাতনের মাত্রা ক্রমশঃ তারা বৃদ্ধিই করে চলেছিল যেন সাধারণ মানুষ ইসলাম থেকে দূরে থাকে এবং যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তারাও যেন ইসলামী আদর্শ ত্যাগ করে পূর্বের আদর্শে প্রত্যাবর্তন করে। ঠিক এই পরিবেশে মক্কায় এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ সূরায় আকাশমন্ডলীর সুদৃঢ় গ্যালাক্সিসমূহের এবং কিয়ামতের দিনের শপথ করে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণকারীদের প্রতি নির্যাতন করেছে, তারা অবশ্যই নির্মম পরিণতির সম্মুখিন হবে। ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর দৃষ্টি সেই ইতিহাসের দিকে আকর্ষণ করা হয়েছে, যে নির্মম নিষ্ঠুর ইতিহাস রচনা করেছিল তাদের পূর্বসুরীরা। আল্লাহর বিধানের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিল, পৃথিবীর সমস্ত শক্তির দাসত্বের জিঞ্জির গলদেশ থেকে ছিন্ন করে এক আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে জীবন পরিচালনার শপথ গ্রহণ করেছিল, শুধুমাত্র এই অপরাধে সেই লোকগুলোকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল।

ইতিহাসের এই নির্মম ঘটনা উল্লেখ করে মক্কার ইসলাম বিরোধিদেরকে বলা হয়েছে, যারা সেদিন আপন প্রভুর প্রতি অনুগত লোকদেরকে লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছিল, তারা পৃথিবীর সত্য অনুসারীদের পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ধিক্কার আর অভিশাপই পেতে থাকবে এবং শেষ বিচারে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর যারা কঠিন নির্যাতনের মোকাবেলা করে আল্লাহর গোলামী করার ব্যাপারে অবিচল ছিল, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে হাসি মুখে স্বাগত জানিয়েছে, তবুও ঈমান থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হয়নি, তারা কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের অনুসারীদেরকে অনুপ্রেরণা যোগাবে, মহাসত্যের বাহকরা তাদের প্রশংসা করবে এবং শেষ বিচারে তাদের জন্য মহাপুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে।

এই ইতিহাস উপস্থাপন করে একদিকে ইসলাম বিরোধিদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, অপরদিকে মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, তারাও যেন কোন অবস্থাতেই ইসলামী আদর্শ ত্যাগ না করে। যে আদর্শ গ্রহণ করার কারণে জালিম গোষ্ঠী তাদের ওপরে জুলুম করছে, সে আদর্শ যিনি প্রেরণ করেছেন–সেই আল্লাহ গোটা সৃষ্টি জগতের মালিক, তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্তায় স্ব-প্রশংসিত। তাঁর জ্ঞানের অগোচোরে কিছুই নেই। তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং সেই রাসূলের অনুসরণ যারা করছে, তাদের ওপরে যারা নির্যাতন করছে–তিনি তাদেরকেও দেখছেন এবং যারা মহাসত্য অনুসরণ করার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে, তিনি তাদের

অবস্থাও অবলোকন করছেন। জাহিলরা সহ্যের সীমা যখন অতিক্রম করবে, তখন তিনি তাদেরকে এমন শক্তভাবে ধরবেন, এমন কঠিন শাস্তি তাদেরকে দেবেন, যে অবস্থা থেকে তারা কোনক্রমেই মুক্তি পাবে না।

যারা বর্তমানে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরোধিতা করছে, ইসলামপন্থীদের ওপরে নির্যাতন করছে, তারা তাদের কর্মের বিনিময়ে অবশ্যই জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে। আর যারা চরম নির্যাতনের মোকাবেলায় ইসলামী আদর্শে অটল-অবিচল থাকবে, তারাও অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এটাই তাদের সাফল্য।

পৃথিবীতে যারা ক্ষমতার দম্ভে আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহ করেছে, সত্যপন্থীদের ওপরে নির্যাতন করেছে, তাদের কর্তব্য ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। ইতিহাস তাদেরকে বলে দেবে ঐসব নরপতিদের কথা, যাদের তুলনায় এদের শক্তি নিতান্তই অপ্রতুল। ঐসব আল্লাহ বিরোধী নরপতিরা-শাসকগোষ্ঠী বিশাল ভূ-খন্ডের ওপরে ক্ষমতাবান ছিল। তাদের ছিল অসংখ্য জনবল, অগণিত মারণাস্ত্র, রাজকোষে ছিল বিপুল অর্থ। কিন্তু তাদের এসব শক্তি তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি, আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা স্বমূলে ধ্বংস হয়েছে, ইতিহাসের আস্তাকুড়োয় তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তোমরা যারা আল্লাহর রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের ওপরে নির্যাতন চালাচ্ছো, আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করছো, তোমাদের উচিত সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কারণ প্রবল ক্ষমতাধর আল্লাহ তা'য়ালার অমোঘ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, সীমা যখনই অতিক্রম করবে, তখনই দাম্ভিক ফেরাউন আর নমরুদের মতই তোমাদেরকেও গ্রেফতার করা হবে।

তোমরা যে কোরআনকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়ার লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ করছো, ষড়যন্ত্র করছো, কোরআনকে মিথ্যার আবরণে আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করছো, তোমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ এই কোরআন মানব রচিত নয় যে তা মুছে দেয়া যাবে। এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে জগৎসমূহের রব-এর পক্ষ থেকে এবং তিনিই এর সংরক্ষক। এটা এমন একস্থানে অঙ্কিত রয়েছে যে, তা পরিবর্তন করার শক্তি কেউ রাখে না।

সূরা আল-বুরুজ-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-২২-রুকু-১

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ

اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ﴿٥﴾ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ﴿٦﴾ وَّهُمْ

عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا

بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٨﴾ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ

يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿١٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ

الْكَبِيْرُ ﴿١١﴾ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ

الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾ هَلْ اَتٰىكَ

حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾

وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে––

রুকু ১

(১) শপথ (বিশালাকায়) গম্বুজ বিশিষ্ট আকাশের, (২) শপথ সেই দিনের যার আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে। (৩) শপথ (সেই প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষীর, (শপথ সেই ভয়াবহ দৃশ্যের) যা (এদের সামনে) পেশ করা হবে। (৪) (মোমেনদের জন্যে) গর্ত খোড়ার (লোকদের) ওপর অভিসম্পাত। (৫) আগুনের কুন্ডলী যাতে জ্বালানী দেয়া হয়েছিল। (৬) (অভিসম্পাত তাদের ওপরও) যারা তার পাশে বসা ছিল। (৭) এই লোকেরা যা করছিল এরা তা প্রত্যক্ষ করছিল। (৮) তারা এই (ঈমানদার) দের কাছ থেকে এছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ

করেনি যে তারা এক পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো। (৯) (ঈমান এনেছিলো) এমন এক সত্বার ওপর যার জন্যে নিবেদিত আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা (তাদের) সব কয়টি কাজের ওপরই স্বাক্ষী।

(১০) যারা মোমেন নর-নারীদের অত্যাচার করেছে এবং (এ কাজ থেকে) কখনো তারা তাওবা করেনি তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের (কঠোর) আযাব। তাদের জন্যে আরো রয়েছে (আগুনে) জ্বলে-পুড়ে যাওয়ার শাস্তি। (১১) (অপরদিকে) যারা আল্লাহ তা'য়ালার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে অবশ্যই আমি এমন জান্নাতের বাগান বানিয়ে রেখেছি, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেটাই হবে (সেদিনের) সবচেয়ে বড় সাফল্য।

(১২) তোমার মালিকের পাকড়াও হবে ভীষণ শক্ত। (১৩) তিনি (তোমাদের বানানো) শুরু করেছেন তিনিই (আবার তোমাদের জীবন) ফিরিয়ে দেবেন। (১৪) তিনি ক্ষমাশীল (সৃষ্টিকে) তিনি ভালোবাসেন। (১৫) তিনি সম্মানিত আরশের একচ্ছত্র অধিপতি। (১৬) তিনি যা চান-তাই করেন, (ক্ষমতায়) বলিয়ান হয়েই করেন। (১৭) তোমার কাছে কি (কতিপয় বিদ্রোহী) সেনাদলের কথা পৌঁছেছে? (১৮) (এ ছিল) ফেরাউন ও সামুদ (এর বাহিনী) (১৯) এরা কোনোদিনই (সত্যকে) বিশ্বাস করেনি, (তারা) মিথ্যার মাঝে (লিপ্ত) ছিল। (২০) (অথচ) আল্লাহ এদের (সম্মুখ) ও পেছন থেকেই ঘিরে রেখেছেন। (২১) কোরআন (হচ্ছে উন্নত ও) মহা মর্যাদাসম্পন্ন (একটি গ্রন্থ)। (২২) একটি (মহান) ফলকে (এটা) সংরক্ষিত আছে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এ সূরার প্রথম আয়াতে শপথ করা হয়েছে দুর্গময় আকাশমন্ডলের এবং এখানে 'বুরুজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী অভিধানে এই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে, দুর্গ, গম্বুজ, ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি। প্রাচীন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন, আকাশমন্ডলের প্রকান্ড গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ। অনেকে বুরুজ বলতে মহাশূন্যের ঐ সমস্ত সুদৃঢ় স্তরসমূহকে বুঝিয়েছেন, যেসব স্তর সুদৃঢ় দুর্গের মতই শক্তিশালী, যা ভেদ করে মহাজাগতিক রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট রে, ক্ষতিকর রশ্মিসমূহ, এসটিরয়েড বেল্ট থেকে ছুটে আসা বিশালাকৃতির পাথর এবং অগ্নিময় মিসাইলের গতিরোধ করে। এসবের মারাত্মক ক্ষতি থেকে পৃথিবীবাসীকে নিরাপদ রাখে। প্রকৃত অর্থ মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

২ থেকে ৩ আয়াতে শপথ করা হয়েছে কিয়ামতের দিনের এবং সেই দিন যারা প্রত্যক্ষ করবে তাদের এবং সেই ভয়াবহ দৃশ্যের, সেদিন যে লোমহর্ষক দৃশ্যের অবতারণা করা হবে। এসব বিষয়ের শপথ করে **৪ থেকে ৭ আয়াতে** পৃথিবীর ইতিহাসে সংঘটিত নির্মম নিষ্ঠুর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সেই নৃশংস ঘটনার স্রষ্টাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা অবশ্যই আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়েছে, আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপরে বর্ষিত হয়েছে, তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়েছে, যারা বিশাল এবং গভীর গর্ত খনন করে তার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে ছিল। সেই আগুনের কুন্ডে একের পর এক সেই লোকগুলো নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে নিক্ষেপ করেছিল, যাঁরা আল্লাহকে আপন রব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মহান আল্লাহর আইন-বিধান ব্যতীত যারা অন্য কোন আইন-কানুন অনুসরণ করতে প্রস্তুত ছিল না, সেই লোকগুলোকে আগুনের কুন্ডে নির্দয়ভাবে নিক্ষেপ করেছিল।

দেশ ও সমাজের সবচেয়ে সৎলোকগুলোকে জালিমের দল আগুনে নিক্ষেপ করছিল, ঈমানদার লোকগুলো আগুনের প্রচন্ড উত্তাপে জ্বলে পুড়ে করুণ আর্তচিৎকার করতে করতে নিঃশেষে ভস্মে পরিণত হচ্ছিলো আর এসব নিষ্ঠুর দৃশ্য এক শ্রেণীর লোক অগ্নিকুন্ডের চারদিকে সমবেত হয়ে কৌতুক সহকারে অবলোকন করছিল। এরাও আল্লাহর গযবের পাত্র এবং এসব দর্শকদের প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ। নিশ্চিতভাবেই এরা ধ্বংস হয়েছে। কারণ, এরা ছিল নিষ্ঠুর নির্যাতনের নীরব দর্শক, নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে এরা কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। জালিমরা যা করেছে, এরা অবলীলাক্রমে তার প্রতিই সমর্থন দিয়েছে, অথবা নীরব থেকেছে। কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলেনি।

পৃথিবীতে যারা নিজেরা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেছে এবং অপরকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ ও সমাজকে যারা যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতন, অকল্যাণ, অনিয়ম, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার মুক্ত করার চেষ্টা করেছে এবং এই আন্দোলনে অন্যকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, প্রতিটি দেশে এবং যুগেই দেশ, সমাজ ও জাতির এই কল্যাণকামী লোকদের ওপরে চলেছে নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং এখনো চলছে। এসব লোকদেরকে সমাজে অবাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাদের সম্মান-মর্যাদায় বার বার আঘাত দেয়া হয়েছে। কাল্পনিক অভিযোগে এদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এদের সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ক্ষুধা-পিপাসায় কষ্ট দেয়া হয়েছে।

কখনো তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সেখানে তাদের ওপরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। হিংস্র কুকুর তাদের দেহের গোস্ত খুবলে তুলে নিয়েছে। কারাগারের ভেতরে তাদের ওপরে অনুষ্ঠিত হয়েছে অমানবিক নির্যাতন। কখনো তাদেরকে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কখনো তাদেরকে ধরে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী এসব লোকদের ধরে বন্য পশুর মতই খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। গাছের ডালে ঝুলিয়ে তাদের পা থেকে একটু একটু করে কেটে দিনের পর দিন নির্মম-নিষ্ঠুর অসহনীয় যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহর অনুগত এসব লোকদেরকে একত্রিত করে তাদের ওপরে উড়ন্ত যান থেকে মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করে তাদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

গর্ত খনন করে সেই গর্তে এসব লোকদের দিয়েই কাঁটা বিছিয়ে মৃত্যু শয্যা রচনা করতে বাধ্য করেছে জালিমরা। নিজ হাতে বিছানো কন্টক শয্যার ওপরে তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। সমস্ত মানবাধিকার থেকে এদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এভাবে নির্যাতনের যাবতীয় নিষ্ঠুর পদ্ধতি আল্লাহর এসব অনুগত বান্দাদের ওপরে প্রতিটি যুগেই প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। গোটা পৃথিবী এই ধরনের অমানবিক নির্যাতনের দৃশ্য সেই অতীত যুগ থেকেই করুণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে আসছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব ঘটনা স্বৈরাচারী জালিম শাসক গোষ্ঠী যখন ঘটিয়েছে, তখন দেশের জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশ তা আনন্দ চিত্তে উপভোগ করেছে। তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে, ইসলামপন্থীদের পক্ষাবলম্বন করে কোন ধরনের প্রতিরোধ তারা জালিমদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেনি। এই ধরনের ন্যাক্কার জনক কাপুরুষোচিত ভূমিকা যে জাতি পালন করেছে, সেই জাতিও আল্লাহর অভিশাপ আর গযবের পাত্রে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে সেই জাতি ভিন্ন জাতির গোলামী করতে বাধ্য হয়েছে। নানা ধরনের প্রাকৃতিক

গযব, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শস্যহানী, মহামারী, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়েছে। এমন ধরনের জালিম শাসক এদের ঘাড়ের ওপরে জেঁকে বসেছে, যাদের অত্যাচারে জাতীয় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। দেশের বুকে অন্যায়, অত্যাচার, খুন-ধর্ষন, ছিন্তাই, রাহাজানি, সন্ত্রাস ইত্যাদির প্রাবল্যে জাতীয় জীবন শান্তি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। আল্লাহর বিধানের প্রতি উদাসীনতা আর ইসলামপন্থীদের ওপরে অনুষ্ঠিত নির্যাতনের সময় নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালনের কারণেই আল্লাহর অভিশাপে জাতীয় জীবন এভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আলোচ্য সূরায় আগুনের কুন্ডে নিক্ষেপ করে ঈমানদারদেরকে শহীদ করার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বেও যেমন পৃথিবী অসংখ্যবার অবলোকন করেছে, কোরআন অবতীর্ণ হবার পরেও বর্তমান সময় পর্যন্তও দেখে আসছে। মুসলিম ও তিরমিজী শরীফে এই ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন বাদশাহের দরবারে একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হবার পরে সে বাদশাহের কাছে একদিন আবেদন করলো, আমার কাছ থেকে যাদুবিদ্যা আয়ত্ব করার লক্ষ্যে একজন যুবককে নিযুক্ত করুন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন যুবককে নিযুক্ত করা হলো। সে যুবক যাদুবিদ্যা শেখার জন্য যাদুকরের কাছে যে পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো, সে পথের ধারে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী বাস করতেন।

উক্ত যুবক সেই লোকটির সাথে পরিচিত হয়ে তার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আল্লাহর গোলামী করার ক্ষেত্রে যুবকটি এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, তার স্পর্শে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করতো এবং দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিও ভালো হয়ে যেতো। বাদশাহের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলো যে, তার নিযুক্ত যুবক এক আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর বিধান সে অনুসরণ করছে। বাদশাহ প্রথমে ঐ লোকটিকে হত্যা করলো, যে লোকটির মাধ্যমে উক্ত যুবক আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়েছিল। তারপর সেই যুবককে হত্যা করতে উদ্যত হলো এবং হত্যাকান্ডের দৃশ্য দেখার জন্য অগণিত জনতা জমায়েত হয়েছিল। একটির পরে আরেকটি অস্ত্র যুবকের প্রতি নিক্ষেপ করা হলো, কিন্তু কোন একটি অস্ত্রও যুবকের দেহ স্পর্শ করলো না। অবশেষে হত্যা প্রচেষ্টাকারীদের উদ্দেশ্যে যুবক বললো, তোমরা যারা আমাকে হত্যা করতে চাও, তারা আমার দিকে লক্ষ্য করে, 'এই যুবকের রব-এর নামে' কথাটি মুখে উচ্চারণ করে অস্ত্র ছুঁড়ে দাও। তাহলে আমাকে হত্যা করতে পারবে।

বাদশাহের নির্দেশে তার নিযুক্ত জল্লাদ তাই করলো। এবারে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র যুবকের দেহ ভেদ করলো এবং যুবক শহীদ হয়ে গেল। উপস্থিত জনতার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলা যে, তাদের বাদশাহ প্রকৃত রব নয়, প্রকৃত রব হলেন তিনি, যাঁকে এই যুবক রব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং তাঁর বিধান অনুসরণ করতো। আর সেই অপরাধেই এই যুবককে বাদশাহ হত্যা করলো। উপস্থিত জনতা এটা উপলব্ধি করে চিৎকার করে স্বীকৃতি দিল যে, এই যুবকের রব্ব-এর প্রতি আমরা ঈমান আনলাম এবং সেই রব-এর বিধানই অনুসরণ করবো।

বাদশাহের যারা মন্ত্রণাদাতা ছিল, তারা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে বাদশাহকে বললো, আপনি নিজেকে রব-হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এই যুবককে হত্যা করলেন, এখন তো

পরিস্থিতি ভিন্ন আকার ধারণ করলো। অগণিত জনতা এখন ঐ যুবকের রব-কে রব হিসাবে স্বীকৃতি দিল। লোকজন আপনাকে আর রব হিসাবে গ্রহণ না করে ঐ যুবকের রব-কেই রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করবে। জালিম শাসক এই অবস্থা দেখে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ঐ লোকগুলোকে গ্রেফতার করার আদেশ দিল, যারা মহান আল্লাহকে একমাত্র রব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারপর বিশাল এক গর্ত খনন করার আদেশ দেয়া হলো এবং গর্ত খনন করা হলে তার ভেতরে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হলো। আগুনের কুন্ডের পাশে ঐ লোকদের এনে বলা হলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে বাদশাহকে রব হিসাবে স্বীকৃতি না দিলে এই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, তাদের সবাইকে একে একে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে শহীদ করা হলো। জালিম শাসক গোষ্ঠী এই নির্মম ঘটনা ঘটালো আর দেশের জনগণের মধ্যে যারা শাসক গোষ্ঠীর সমর্থক ছিল, তারা এই নিষ্ঠুর দৃশ্য স্বকৌতুকে অবলোকন করলো।

যে যুবককে নিয়ে হাদীসের এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, ঐ যুবকের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন জাগে যে, যুবক কেন নিজের মৃত্যুবাণ শত্রুদের হাতে তুলে দিল? এটা তো আত্মহত্যার শামিল এবং আত্মহত্যাকারী জাহান্নামে যাবে। এই প্রশ্নের উত্তর হলো, ঐ ঈমানদার যুবক আত্মহত্যা করেনি বরং সে শহীদ হয়েছে। কারণ যুবক এটা অনুভব করেছিল, স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী তাকে কোনভাবেই জীবিত রাখবে না। আর মহান আল্লাহরও অভিপ্রায় ছিল, তিনিই যে প্রকৃত রব- তা সমবেত জনতা উপলব্ধি করুক। আল্লাহর অনুগত সেই যুবকের ইচ্ছা ছিল, মহান আল্লাহই যে আসল রব্ব, এ কথা তার দেশবাসী উপলব্ধি করুক। এই জন্যে সে তার হত্যাকারীকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তুমি আমার রব-এর নাম উচ্চারণ করে আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করো, সে অস্ত্র আমাকে বিদ্ধ করবে। ঘটলোও তাই। যুবকের উদ্দেশ্য ছিল, তার মৃত্যু যদি গোটা জাতির হেদায়েতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তার মৃত্যু যদি একজন লোককেও আল্লাহর গোলামে পরিণত করে, তাহলে তাই হোক। যুবকের উদ্দেশ্য কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল, হাদীসের ঘটনা তার সাক্ষী।

সুতরাং কোন ঝুঁকি গ্রহণ করলে, চরম ত্যাগ স্বীকার করলে যদি তার ফলাফল কল্যাণ বয়ে আনে, নিজের জীবন বিপন্ন করলে যদি কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক ধাপ অগ্রসর হয়, মানুষ আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসে, ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়, তাহলে সেই ঝুঁকি গ্রহণ করতে-সেই ত্যাগ দ্বীনি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে হাসি মুখে করতে হবে। যেভাবে ঐ যুবক ঝুঁকি গ্রহণ করেছিল এবং সমবেত জনতা ইসলামের প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠেছিল।

আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করে ঈমানদারকে হত্যার ঘটনা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালার একটি বর্ণনা থেকেও জানা যায়। ইবনে জরীরে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকটি ঘটনা ইবনে হিশাম, মুজামুল বুলদান, ইবনে খালদুন ও তাবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাসে এই ধরনের লোমহর্ষক বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

অতীতে আল্লাহর বিধান যারা অনুসরণ, বর্তমানে যারা অনুসরণ করছে, তাদের ওপরে কেন নির্যাতন করা হয়েছে এবং হচ্ছে, এর কারণও সেই আল্লাহই এই সূরার ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছেন, যে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার কারণে তাঁর অনুগত বান্দাহ্রা নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে।

আল্লাহ বলেন, তারা এই ঈমানদারদের কাছ থেকে এছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি যে তারা এক পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো। ঈমান এনেছিলো এমন এক সত্ত্বার ওপর যার জন্যে নিবেদিত আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব।

নির্যাতনের কারণ ছিল একটিই আর তাহলো, এই লোকগুলো একমাত্র আল্লাহকেই নিজের আইনদাতা, বিধানদাতা, মালিক, মুনিব, প্রতিপালক, রিজিকদাতা, রোগ থেকে আরোগ্যকারী, মনের বাসনা পূরণকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, আনন্দ দানকারী, সন্তানদাতা, সম্পদদাতা, সম্মানদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এরা বিশ্বাস করেছিল, ঐ আল্লাহই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এই মহাবিশ্বকে সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করছেন, তাঁর আদেশে একদিন এই মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, মৃত মানুষগুলো পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে জবাবদিহি করার জন্য উঠে দাঁড়াবে। তাঁরই আদেশে মানুষ রোগাক্রান্ত হয় এবং তাঁরই আদেশে মানুষ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে। তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনিই একমাত্র শক্তিশালী সত্ত্বা, তাঁর মোকাবেলায় সমস্ত শক্তিই অস্তিত্বহীন। তিনিই মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বানান, তিনিই ধন-সম্পদ দিয়ে ধনী বানাতে পারেন, তিনিই মানুষের মনের যাবতীয় কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেন। সুতরাং একমাত্র তাঁরই আইন-কানুন এই পৃথিবীতে চলতে পারে।

তিনিই সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী, যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক তিনি। এই বিশ্বাস তারা অন্তরে লালন করতো আর এটাই ছিল তাদের অপরাধ। এই অপরাধের কারণেই তাদেরকে আগুনের কুন্ডে নিক্ষেপ করে শহীদ করা হয়েছিল। (আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি-এতটুকুন কথা মোটেই যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীসহ তাঁর ওপরে ঈমান আনতে হবে এবং সেই ঈমানই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়। আল্লাহর গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার ১, ২ ও ৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর দেখুন।)

আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীসহ তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে। তিনি একক, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করতে হবে। যাবতীয় জ্ঞান ও ধন-সম্পদের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই তাঁর বান্দার তওবা কবুলকারী এবং ক্ষমাকারী। তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর রব্ব। তিনি মানুষেরও রব। তিনি রিজিকদাতা এবং উচ্চ মর্যাদাশালী। তিনিই সর্বোত্তম স্রষ্টা এবং আকৃতি দানকারী। তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী। তিনি সৃষ্টিকর্তা, দর্শনকারী, শ্রবণকারী এবং প্রবল ক্ষমতাশালী। তিনি যেমন দয়ালু তেমনি কঠোর শাস্তিদানকারী। তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। তিনি মহান এবং অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। তিনি অনুগ্রহকারী, সুক্ষ্মদর্শী, বড়ত্ব গ্রহণকারী, আকার আকৃতি রচনাকারী এবং মানুষের বাদশাহ। তিনিই প্রশ্বস্ততা বিধানকারী, দানশীল, মানুষের বন্ধু, উত্তম প্রতিফল দানকারী, তিনি সকল দোষ-ক্রটি, দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে মুক্ত।

তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করেননা বরং সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। তিনি অপরিসীম বরকতশালী, তিনি সর্বোত্তম ওয়াদা পূরণকারী। আস্থা স্থাপনের জন্যে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই মানুষের পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী ও সর্বোত্তম রক্ষক। তিনি মানুষের দোয়া শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী, সাহায্য তাঁর কাছেই চাইতে হবে এবং ভয় তাঁকেই করতে হবে।

একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে, তাঁরই বিধান অনুসরণ করতে হবে। রোগ-ব্যাধী থেকে তিনিই নিরাময় দানকারী, বান্দাদের জন্য তিনিই উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে দেন, তিনিই সঠিক পথপ্রদর্শন করেন এবং নির্ভুল ও সঠিক পথ দেখানো তাঁরই দায়িত্ব। মহান আল্লাহর এ ধরনের অসংখ্য গুণাবলী রয়েছে, এসব গুণাবলীসহ তাঁর ওপরে ঈমান আনতে হবে এবং এই ঈমানই একজন মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করে। আল্লাহর গুণাবলীসহ যারা ঈমান এনে নিজেকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করেছে, এসব লোকদেরকে ইতিহাসের কোন একটি অধ্যায়েও ইসলাম বিরোধী শক্তি বরদাস্ত করেনি। আর ইসলাম বিরোধী শক্তিকে ধ্বসিয়ে দেয়ার জন্য এই ধরনের গুটি কয়েক গোলামই যথেষ্ট।

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে যারা নির্যাতিত হচ্ছে এবং যারা তাদের ওপরে নির্যাতন করছে, তাদের উভয় দলকেই মহান আল্লাহ দেখছেন। তাঁর বিধান অনুসরণ করার কারণে তাঁর যে গোলাম নির্যাতিত হচ্ছে, সে গোলামের অবস্থা তাঁর অগোচোরে নেই। তাঁর গোলাম যখনই সাহায্য লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, তখনই তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন। আর যারা জুলুম করছে, তাদেরকে সংশোধন হবার জন্য তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন। সময় যখন পার হয়ে যাবে, তখন এসব জালিমরা তাঁর গযাবের পাত্রে পরিণত হবে, আযাবে নিমজ্জিত হবে।

১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের প্রতি জুলুম করেছে এবং কৃতকর্মের জন্য কোন অনুতাপ তাদের ভেতরে সৃষ্টি হয়নি, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি। জাহান্নামে শাস্তি দেয়ার যতগুলো উপকরণ রয়েছে, সেসব তাদের ওপরে প্রয়োগ করা হবে এবং সেই সাথে এমন আগুনে তাদেরকে জ্বালানো হবে, যা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করবে। তবুও তারা তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ করেছে, কোরআনের বিধানের সাথে বিরোধিতা করেছে, দ্বীনি আন্দোলনের প্রতি জুলুম করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে নিরাশ করেননি। সাধারণ গোনাহের বিষয় আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ করার গোনাহ এবং কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি জুলুম করার গোনাহ, এক জিনিস নয়। উভয় গোনাহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এই ধরনের গোনাহ ক্ষমার অযোগ্য বলেই বিবেচিত হবার কথা। কিন্তু মহান আল্লাহ অসীম দয়ালু। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রোহ করে এবং পরবর্তীতে তার মনে অনুতাপ, অনুশোচনার সৃষ্টি হয় এবং সে ব্যক্তি যদি তওবা করে, তাহলে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন। এই ক্ষমার ইশারাই করা হয়েছে আলোচ্য সূরার ১০ নম্বর আয়াতে। এ জন্য আল্লাহর কোরআনে এ কথা বার বার বলা হয়েছে, কোন মানুষ যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়। কারণ তাঁর রহমত সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। তাওবাকারীকে আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত ভালোবাসেন। মানুষ যে গোনাহই করুক না কেন, সে যদি তাওবা করে সেই গোনাহ্ থেকে বিরত হয়, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।)

১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে, এই বিধানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে, সমাজ ও দেশের বুকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছে, তাদের

কর্মের পুরস্কার হিসাবে তিনি এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার নিচ সতত ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। এই জান্নাত লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর গোলামী করা। আর এটা লাভ করার অর্থই হলো বিরাট সফলতা অর্জন করা।

১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার রব-এর গ্রেফতার হবে ভীষণ শক্ত।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি সহজে বা সামান্য কোন কারণেই তাঁর কোন বান্দাহ্র প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে গ্রেফতার করেন না। নমরুদ, ফেরাউন, সাদ্দাদ এবং প্রতিটি যুগে যুগে যারা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছে, তাদেরকে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়েছেন। তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন, তাঁর এই অবাধ্য বান্দাহ্ নিজের ভুল অনুভব করে সোজা পথে ফিরে আসুক। বান্দাহ্ আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে এগোতে থাকলে তিনিও সেই বান্দাহ্কে অবকাশ দিতে থাকেন। সূরা বাকারার ১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'এদেরকে সুযোগ দেয়া হয়।' তারপর অপরাধী যখন শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন তাকে তিনি এমনভাবে গ্রেফতার করেন, সেই গ্রেফতার থেকে তার মুক্তির কোন পথ উন্মুক্ত থাকে না।

পৃথিবীর কোন শাসক যদি কাউকে গ্রেফতার করে, তার মুক্তির ব্যাপারে আশা করা যায়, এমন অনেক পথই উন্মুক্ত থাকে, যে পথ দিয়ে সে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ যদি কারো প্রতি নারাজ হয়ে যান, তার আর মুক্তির কোন পথ থাকে না। কিন্তু তিনি সহজে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতির প্রতি নারাজ হন না। একের পর এক অবকাশ-সুযোগ দিয়ে যেতেই থাকেন। এর ভেতরে তারা যদি নিজেকে শুধ্রে নেয় তো ভালো, আর যদি নিজেদেরকে সংশোধন না করে, তাহলে এমনভাবে গযব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাদের নাম নিশানা মুছে যায়। মানুষ ঘৃণাভরে সেই সব বিদ্রোহী ব্যক্তি ও জাতিকে স্মরণ করে। এটা তো পৃথিবীর অবস্থা, আর কিয়ামতের দিন যখন তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে, সেখানেও কেউ তাদের সাহায্য করার থাকবে না। জাহান্নামের কঠিন শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

অপরাধ প্রবণ লোকজন পৃথিবীতে সামান্য একটু ক্ষমতা হাতে পেয়ে নিজেকে অসীম শক্তিশালী মনে করতে থাকে। নিজের মত ও পথের বিপরীত লোকদেরকে সহ্য করতে পারে না। তাদের ওপরে নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাতে থাকে। দেশের সম্মানিত ও শান্তি প্রিয় লোকগুলোর ওপরে জুলুমের সয়লাব বইয়ে দেয়। জুলুমে অতিষ্ঠ দেশের সাধারণ মানুষের করুণ আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু জালিম গোষ্ঠীর কানে সে আর্তনাদ পৌঁছে না। তারা ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার কাজে থাকে ব্যস্ত। যথাসময়ে আল্লাহর গযব চলে আসে। অপমান আর লাঞ্ছনা দিয়ে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বিদায় করে দেন। বড় বড় জালিমদের জায়গা করে দেন সাড়ে তিন হাত মাটির তলায় অথবা কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে।

১৩ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, তোমরা যারা আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে পৃথিবীতে আমার অনুগত বান্দাহ্দের ওপরে নির্যাতন করছো, কোরআন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিত লোকদের ওপরে অত্যাচার করছো আর এ কথা মনে মনে ভাবছো যে, এসব কর্মকান্ডের কোন জবাব কারো কাছে কোনদিনই দিতে হবে না। তোমরা মনে করেছো, এই জীবনের পরে আর কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই, সুতরাং তোমাদের কৃতকর্মের বিচার করারও কেউ নেই।

তোমাদের এই ধারণা মারাত্মক ভুল। তোমরা এ কথা মনে রেখো, তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যখন অক্ষম ছিলেন না বরং অত্যন্ত পারদর্শীতার সাথে অতুলনীয় আকার-আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দ্বিতীয়বারও তোমাদেরকে সৃষ্টি করবেন এবং আপন মুনিবের সামনে তোমাদেরকে দাঁড়াতে হবে। তখন তোমরা তোমাদের যাবতীয় জুলুমের হিসাব দিতে বাধ্য থাকবে। সেদিন তোমাদের কাছ থেকে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। সুতরাং আমার অনুগত বান্দাহ্দের ওপরে জুলুম করা থেকে বিরত হও। তাওবা করে তাদের দলে শামিল হয়ে যাও, আমার দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করো এবং তা সমাজ দেশের বুকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাও। তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করা হবে। কিয়ামতের দিনে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্তদের দলে শামিল থাকবে। ইসলামপন্থীদের ওপরে জুলুম করে যে অন্যায় তোমরা করেছো, যদি তোমরা তাওবা করে ঐ ঘৃণ্য কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখো, তাহলে এ কথা স্মরণে রেখো যে, তোমার প্রভু প্রেমময়। তিনি মহান এবং আরশের অধিপতি–অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাঁর সৃষ্টি ভুল করবে আর তিনি সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবেন, এটা তাঁর নীতি নয়। তাঁর নীতি হলো ক্ষমা করা, তোমরা সেই সুযোগ গ্রহণ করো।

তিনিই মহাবিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি-তিনিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তাঁর সাথে বিদ্রোহ করতে যাওয়া, তাঁর বিধানের সাথে বিরোধিতা করা এবং তাঁর অনুগত বান্দাহ্দের প্রতি জুলুমের হাত বাড়িয়ে দেয়া চরম বোকামী বৈ আর কিছুই নয়। এই বোকামীতে নিমজ্জিত থেকে নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া তোমরা আর কিছুই করতে পারবে না। তোমরা যারা পরকালকে অস্বীকার করছো, আমার সাথে বিদ্রোহ করছো, আমার আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা লড়াই সংগ্রাম করছে তাদের সাথে জুলুমমূলক আচরণ করছো। তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আমার ইচ্ছা পূরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নও। আমি যা ইচ্ছা করি সেটাই সম্পন্ন হয়। সমগ্র মহাবিশ্বে এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি আমার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার পথে বাধা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, সে কল্পনাও করতে পারে না।

সুতরাং আমি এই পৃথিবীতে তোমাদেরকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি, যে উদ্দেশ্যে আমার সমস্ত সৃষ্টিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যে উদ্দেশ্যে আকাশে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে তোমাদেরকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাজত করছি, যে উদ্দেশ্যে তোমাদের জীবন ধারণ করার মতো যাবতীয় উপকরণ পৃথিবীতে দিয়েছি, তোমাদের উচিত আমার সেই উদ্দেশ্য সাধন করা, আমার সেই ইচ্ছার পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করা। আর আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা কেবলমাত্র আমারই গোলামী করবে, আমারই দাসত্ব করবে এবং আমার এই উদ্দেশ্য সাধন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তোমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় সফলতা।

পৃথিবীতে যারা সামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে, নশ্বর সম্পদের অধিকারী হয়ে দাপট দেখাতে থাকে। পৃথিবীটাকে নিজের হাতের মুষ্ঠিতে আবদ্ধ বলে ভাবতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এরা একের পর এক সীমা লংঘন করতে থাকে। এদের অশুভ তৎপরতার কারণে সমাজ ও দেশের পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। আল্লাহর বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত হলে এদের যাবতীয় অপতৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে, অবৈধ পথে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে, এ কারণে এরা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে নিজেদের পথের অন্তরায় মনে করে এদের ওপরে নির্যাতন শুরু করে।

মক্কার ইসলাম বিরোধি গোষ্ঠীও আল্লাহর রাসূল ও তাঁর অনুসারী–যারা দেশের বুকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৎপর ছিলেন, তাদের ওপরে ঐ কারণেই নির্মম অত্যাচার শুরু করেছিল। **আলোচ্য সূরার ১৭ থেকে ২০ নম্বর** আয়াতে এসব লোকদেরকে সেই সব লোকদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যারা তাদেরই অনুরূপ আচরণ করার কারণে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। মক্কার ঐ লোকগুলো ফেরাউন ও সামূদ জাতির ইতিহাস জানতো, তারা এ কথাও জানতো যে, কোন কারণে ফেরাউন আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়েছিল এবং কোন কারণে সামূদ জাতির ওপরে আল্লাহর ভয়াবহ গযব নেমে এসেছিল। সেই গযবে তারা কিভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মুছে গিয়েছে, এ কথা মক্কার ইসলাম বিরোধিদের জানা ছিল। তাদের জানা ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে বলা হয়েছে, সেই ফেরাউন ও সামূদ জাতির ইতিহাস তোমাদের জানা রয়েছে? যারা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছিল এবং কখনোই তারা আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়নি এবং সেই বিধানের বিপরীত পথেই অগ্রসর হচ্ছিলো।

সূরা আন নাযিয়াতের ১৫ নম্বর আয়াতে আমরা ফেরাউনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখানে সামূদ জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। সামূদের পরিচয় সম্পর্কে কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, সামূদ ইবনে আমের ইবনে এরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ আলায়হিস্ সালাম। আবার কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, সামূদ ইবনে আ'দ ইবনে আওস ইবনে এরাম ইবনে সাম ইবনে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম। তাফসীরে রুহুল মাআনীতে দেখা যায়, ইমাম সালবী (রাহঃ) এই দ্বিতীয় অভিমতকে সমর্থন করেন। সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে দেখা যায়, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের সন্তান সাম-এর বংশধর হলো সামূদ। হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের সময় আল্লাহর যে আযাব এসে আ'দ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে ঈমানদারকে হেফাজত করেছিলেন।

তাদের থেকে পরবর্তীতে যে জনগোষ্ঠী বিস্তার লাভ করেছিল, তাদেরকে ইতিহাসে দ্বিতীয় আ'দ নামে পরিচিত করা হয়েছে। এদেরই ভেতরের কোন শাখা বা গোটা জনগোষ্ঠীকে সামূদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইতিহাসে এ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা হলো আরবে বায়েদাহ্ বা বিধ্বস্ত আরবী বংশ। এই সামূদ জাতি পৃথিবীর কোন এলাকায় বিস্তার লাভ করেছিল, এ সম্পর্কে গবেষক এবং ঐতিহাসিকদের মতামত হলো, আরবের হিজর নামক এলাকায় এরা বসতী স্থাপন করেছিল।

সামূদ জাতি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর ভেতরে দ্বিতীয় জাতি যা আ'দ জাতির পরে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিমান ও নামকরা ছিল। কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে এই জাতি সংক্রান্ত কাহিনী গল্পাকারে আরববাসীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সে যুগের সাহিত্যে, কবিতায় এবং আরবদের কথাবার্তায় এই জাতি সম্পর্কে নানা কথার উল্লেখ দেখা যায়। অসরিয়া প্রস্তর লিপি, গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবীদগণও এই জাতির কথা উল্লেখ করে থাকে।

হযরত ঈসার আগমনের কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত এই জাতির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতো। রোমের ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, এই সামূদ জাতির লোকজন রোমের সৈন্য বাহিনীতে কর্মরত ছিল এবং তাদের শত্রু নাবতিউ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এই জাতির বসতী ছিল

উত্তর-পশ্চিম আরবের সেই এলাকায় যা বর্তমান সময় পর্যন্ত আল্ হিজর নামে পরিচিত। বর্তমানে মদীনা ও তাবুকের মধ্যে রেলপথে 'মাদায়েন সালেহ' নামক একটি ষ্টেশন রয়েছে। এই ষ্টেশনের এলাকা ও তার আশেপাশের এলাকা ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রস্থল। প্রাচীনকালে এই এলাকাকে হিজর বলা হত। বর্তমান সময় পর্যন্ত সেখানে কয়েক সহস্র একর জমির ওপর সেই পাথুরে কোঠাবাড়িগুলো অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা সামূদ জাতি পাহাড় খোদাই করে নির্মাণ করেছিল। এই প্রাণ স্পন্দনহীন নির্বাক কোলাহল মুক্ত নগরী দেখে অনুমান করা হয় যে, ইতিহাসের গর্ভে নিমজ্জিত সেই সময়ে সামূদ জাতির জনসংখ্যা খুব কম করে হলেও চার পাঁচ লাখের কম ছিল না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালিত করছিলেন, তখন আরবের ব্যবসায়ী কাফেলা এই সামূদ জাতির প্রাচীন নিদর্শনসমূহ অতিক্রম করে চলে যেতো।

পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ এই সামূদ জাতি সম্পর্কে দ্বিধা বিভক্ত। তাদের একদল মনে করে, এই জাতি ছিল ইহুদীদের একটি অংশ। এরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ না করে এখানেই তাদের বসতী স্থাপন করেছিল। তাদের এই বর্ণনা পবিত্র কোরআনের বর্ণনার বিপরীত। কেননা সমস্ত ইতিহাস ও পবিত্র কোরআন হতে জানা যায় যে, হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মিসর হতে বের হবার পূর্বেই সামূদ জাতি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পবিত্র কোরআন বলছে, যখন হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামকে তাঁর জাতি ও ফেরাউন অবিশ্বাস করেছিল তখন ফেরাউনের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন ঈমানদার লোক নিজের জাতিকে এই কথা বলেছিল যে, আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছো তোমরা। তোমাদের পূর্বেও হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতি তাঁর সাথে এই ধরনের অবাধ্যতা প্রদর্শন করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আ'দ জাতি ও সামূদ জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের পরবর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমাদের পরিণতিও যেন তেমনই না হয়।

সামূদ জাতির প্রতি আল্লাহর গযব যে স্থানে আগমন করেছিল, আল্লাহর রাসূল তাবুক অভিযানের সময় উক্ত স্থান সাহাবাদেরকে দেখিয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত ঐ জাতির পরিণাম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার কথা জানিয়ে বললেন, এই এলাকা হচ্ছে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস প্রাপ্ত এক জাতির বসতী। অতএব এখান থেকে যতদ্রুত সম্ভব অগ্রসর হয়ে যাও। এটা ভ্রমণের উপযোগী স্থান নয়। এটা হলো কাঁন্নার স্থান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজর নামক এলাকা অতিক্রম করার সময় বললেন, যারা নিজেদের ওপর জুলুম নির্যাতন করেছে তাদের আবাসস্থানে তোমরা প্রবেশ করো না। তাদের ওপরে যা আপতিত হয়েছে তা যেন তোমাদের ওপর আপতিত না হয়। তবে কাঁন্নাকাটি করতে করতে এ এলাকাটি অতিক্রম করো। তারপর তিনি চাদর দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে নিলেন এবং অতিদ্রুত সেই উপত্যকাটি অীতক্রম করলেন।

কোরআন হাদীসের বর্ণনা ও গবেষণা লব্ধজ্ঞান হতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই সামূদ জাতি হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের আগমনের অনেক পূর্বে এই পৃথিবীতে বিচরণশীল ছিল। তাদের ধর্ম বিশ্বাস এবং আদর্শ আ'দ জাতির অনুরূপই ছিল। আ'দ জাতি যেমন মূর্তি পূজা করতো এবং তাদের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি ছিল আল্লাহর বিধানের বিপরীত, সমাজ ও দেশের নেতৃবৃন্দের রচনা করা আইন-কানুন তারা অনুসরণ করতো, সামূদ জাতির অবস্থাও

ছিল অনুরূপ। তাদেরকে এই বাতিল পথ থেকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করার জন্যই তাদের মধ্য থেকেই হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

তিনি দেশের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষদেরকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করার আহ্বান জানালেন। এই সামূদ জাতি তৎকালিন যুগে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় সমস্ত দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল। ক্ষমতার দম্ভে তারা আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করলো। হযরত সালেহ তাদেরকে বার বার বুঝাতে থাকলেন, কিন্তু মিথ্যার অনুসারীরা তাঁর কোন যুক্তিই গ্রাহ্য করলো না। অবশেষে তারা দাবী করলো যে, তুমি যদি সত্যই নবী হয়ে থাকো, তাহলে পাথরের পাহাড় থেকে উট বের করে দেখাও। তাদের দাবী অনুযায়ী আল্লাহর নবী মুজিজা হিসাবে উট বের করে দেখালেন। কিন্তু তৎকালীন সমাজের আল্লাহ বিরোধী নেতৃবৃন্দ ষড়যন্ত্র করে সে উটকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। জাতির অধিকাংশ লোকজন তাদের নেতৃবৃন্দের এই ঘৃণ্য কাজের প্রতি সমর্থন দিল।

এভাবে করে তারা সীমা লংঘন করে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত পাত্রে পরিণত হলো। আল্লাহর নবী তাদেরকে পুনরায় সাবধান করলেন এবং আল্লাহর গোলামীর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা তাদের অন্যায় কাজে অটল অবিচল রইলো। এরপর সেসব লোকদের ওপরে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হলো। আল্লাহর কোরআনের বেশ কয়েক স্থানে ঐ জাতির ধ্বংসের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামের আহবানে যারা সাড়া দেয়নি এবং তাঁর সাথে যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের ধ্বংসের চিত্র পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েক জায়গায় মহান আল্লাহ তুলে ধরেছেন। সূরা হিজ্‌র-এ বলা হয়েছে,–

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ–وَاٰتَيْنٰهُمْ.....اِلَى اٰخِرِالْاٰيَةُ

আর দেখো, হিজ্‌রের লোকজন রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল, আমি আমার নিদর্শনসমূহ তাদেরকে দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকলো। তারা পাহাড় কেটে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতো যেন তারা সুরক্ষিত থাকে। (কিন্তু তাদের দেহের শক্তি আর সুরক্ষিত বাড়ি-ঘর তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি) কিন্তু একদিন ভোরে এক ভয়ংকর ও বিকট ধ্বনি এসে তাদেরকে গ্রেফতার করেছিল। (এবং সবাই নিজের বাড়িতেই ধ্বংস হয়েছিল) আর তারা নিজেদের চেষ্টা তদবীর দ্বারা যা কিছুই উপার্জন করেছিল তা তাদের কোনই কাজে এলো না। (সূরা হিজ্‌র-৮০-৮৪)

সামূদ জাতি ভেবেছিল, পাহাড় কেটে আমরা যে বিশাল আকারের অট্টালিকা নির্মাণ করেছি, স্বাভাবিক মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন ধরনের বিপর্যয় আমাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন–

وَفِى ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ–فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ...اِلَى اٰخِرِالْاٰيَةُ

এবং (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) সামুদ জাতির ঘটনায়, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগ করতে থাকো। কিন্তু এই সতর্ক সংকেতের পরও তারা তাদের আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী আচরণ করছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের ওপর তাদের চোখের সামনেই দেখতে দেখতেই হঠাৎ করে আযাব এসে গ্রাস করলো। তারপর তাদের উঠারও কোন শক্তি ছিল না এবং আত্মরক্ষা করারও কোন শক্তি ছিল না। (যারিয়াহ-৪৩-৫৪)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ-اِنَّااَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةًوَّاحِدَةً......اِلَى اخِرِالاية

তারপর দেখো, আমার আযাব কত ভয়াবহ ছিল এবং আমার সাবধানবাণী ছিল কত ভয়াবহ। আমি তাদের ওপর শুধুমাত্র একটা শব্দ ছেড়েছি, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল পালার মতই ভুষি হয়ে গেল। (সূরা কামার-৩০-৩১)

কোরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই জাতিকে অনেক ওপরে উঠিয়ে জমিনের ওপরে আছাড় দিয়ে ফেলা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন-

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌبِالْقَارِعَةِ-فَاَمَّاثَمُوْدُفَاُهْلِكُوْابِالطَّغِيَةِ....اِلَى اخِرِالاية

সামুদ ও আ'দ সেই আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহাবিপদকে অবিশ্বাস করেছে। তারপর যারা সামুদ জাতি ছিল, তাদেরকে আমি উর্ধ্বে উঠিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি। (সূরা হাক্কাহ্-৪-৬)

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে ফেরাউন, নমরুদ, আ'দ ও সামুদ জাতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। শুধু তারাই নয়, অতীতে যেসব জাতি আল্লাহর বিধানের সাথে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে, তারপর তারা কিভাবে আল্লাহ্‌র গযবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেসব ইতিহাস আল্লাহ্ মানুষকে শুনাচ্ছেন। মানুষ যেন এসব ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মহাধ্বংস থেকে নিজেদেরকে হেফাজত করে।

আলোচ্য সূরার ১৭ আয়াতে ফেরাউন ও সামূদ জাতির উল্লেখ করতে গিয়ে 'জুনুদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবীতে চরম শক্তিশালী কোন বাহিনীকে জুনুদ বলা হয়। এই শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'য়ালা মক্কার ইসলাম বিরোধিদেরকে এ কথাই বুঝিয়েছেন, ইতিপূর্বে আমার বিধানের সাথে যারা বিরোধিতা করেছে, তারা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অকল্পনীয় শক্তির অধিকারী এবং অপরাজিত। তাদের তুলনায় তোমাদের শক্তি মাকড়শার জালের মতই ভঙ্গুর। মানুষের দৃষ্টিতে সেই অপরাজিত শক্তি আমার শক্তির সামনে তুচ্ছ তৃণখন্ডের মতই উড়ে গিয়েছে। এমন লাঞ্ছিতাবস্থায় তারা ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন তোমরা যারা আমার রাসূলের সাথে, আমার অনুগত বান্দাহ্দের সাথে বিরোধিতা করছো, তাদের ওপরে নির্যাতন চালাচ্ছো, এই ঘৃণ্য আচরণ থেকে যদি তোমরা বিরত না হও, তাহলে তোমাদের ওপরেও আমার গযব নেমে আসবে।

কারণ আমার অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে। আমার শক্তি তোমাদের চেতনার অতীত থেকে তোমাদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে রয়েছে, যা থেকে তোমরা কোনক্রমেই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না, যেমন পারেনি ফেরাউন আর সামূদ জাতির বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ ও তাদের সমর্থক জনতা। তোমরা যে মুক্ত বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছো, তার ঘনত্ব আমি যদি একটু বৃদ্ধি করে দেই, তাহলেই তোমাদের দাপট মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। যে পানি পান করে জীবন ধারণ করছো, সেই পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি করে দিতে পারি। যে যমীনের ওপর দাঁড়িয়ে দম্ভ করছো, পায়ের নিচের সেই যমীনকে কাঁপিয়ে দিতে পারি।

মুহূর্তের ভেতরে সাগরের পানিকে উচ্ছ্বসিত করে প্রবল বন্যা অথবা জলোচ্ছ্বাস দিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারি। বাতাসের স্বাভাবিক গতি বৃদ্ধি করে প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি করতে পারি। আকাশ থেকে মারণাস্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর রশ্মি ছড়িয়ে দিতে পারি। মহাশূন্যে ভাসমান পাথরের সাম্রাজ্য

থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষাতে পারি। আগুনের গোলাক তোমাদের দিকে ছুড়ে দিতে পারি। এ ধরনের অসংখ্য উপকরণ রয়েছে, যে উপকরণের মধ্যে তোমরা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছো, তা দিয়েই তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি।

শেষের আয়াত দুটোয় বলা হয়েছে, যে কোরআনের আহ্বানকে তোমরা স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে কোরআনের বাহক ও তাঁর অনুসারীদের ওপরে জুলুম করছো, সেই কোরআনের আহ্বানকে তোমরা কোনভাবেই স্তব্ধ করতে সক্ষম হবে না। এই কোরআন অত্যন্ত উন্নত ও মহামর্যাদা সম্পন্ন একটি গ্রন্থ। এটা সংরক্ষিত হয়েছে একটি মহান ফলকে। সুতরাং এই কোরআনের বাণীকে তোমরা কোনক্রমেই স্তব্ধ করতে পারবে না। এর ভেতরে কোন বিকৃতিও আনতে পারবে না। এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারবে না। এই কোরআন যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

কোরআনের আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তোমরা কোরআনের অনুসারীদের ওপর যতই জুলুম অত্যাচার করো না কেন, এমন কোন শক্তি নেই যে, কোরআনের আন্দোলনকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে পারে। বরং যারা এই কোরআনের মোকাবেলা করতে আসবে, পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে তারাই মুছে যাবে। অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধানের সাথে অশোভন আচরণ করেছে, তারা কতটা নিকৃষ্ট পরিণতি ভোগ করেছে। সুতরাং উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এই কোরআনের আহ্বানের সাথে বিরোধিতা না করে, এর দাওয়াত কবুল করে নিজেদেরকে ধন্য করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে কল্যাণ আর সফলতা।

সূরা আত-তারেক

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৮৬

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ– এই সূরার প্রথম আয়াতে 'ত্বারিক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা থেকেই এই সূরার নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরাটি রাসূলের মক্কী জীবনে কোন পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে এই সূরার বক্তব্য মক্কী জীবনে প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অনুরূপ। কোরআনের গবেষকগণ বলেন, এই সূরা মক্কার জীবনে সে সময় অবতীর্ণ হয়েছিল, ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী যখন দ্বীনি আন্দোলনের গতিরোধ করার লক্ষ্যে তাদের যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করেছিল।

এই সূরার প্রথমে বিশাল আকাশের নক্ষত্রমন্ডলীর শপথ করে বলা হয়েছে, এই মহাবিশ্বের বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন একটি বস্তুও বৈজ্ঞানিক সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া কোনক্রমেই নিজের স্থানে অবিচল থাকতে বা আবর্তিত হতে পারে ন। এরপরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, তোমরা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো। অনস্তিত্ব থেকে তোমাদেরকে অস্তিত্বে আনা হয়েছে এমন এক বিন্দু পানি থেকে, যা সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়। চোখে দেখা যায় না, এমন শুক্রকীট থেকে তোমাদের বর্তমান আকৃতি দান করা হয়েছে। যে আল্লাহ এভাবে তোদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহই তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে ন। মৃত্যুর পরের জীবনে মানুষকে এই জন্যই পুনরায় সৃষ্টি করা হবে, পৃথিবীতে মানুষ যেসব কর্ম করছে এবং যেসব বিষয় মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে, তা তাদেরকে অবগত করার লক্ষ্যে। মানুষ সেদিন তার কর্মানুসারে ফল ভোগ করবে। সেদিন মানুষ নিজের শক্তিতে যেমন মুক্তি পাবে না, তেমনি অন্য কেউ-ই তাকে সাহায্যও করতে সক্ষম হবে না।

যে আকাশ জগতে মেঘ সঞ্চিত হয়ে এক সময় তা বৃষ্টির আকারে পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, সেই আকাশমন্ডলের এবং বৃষ্টিপাতের পরে যে মাটি ভেদ করে উদ্ভিদ বেরিয়ে আসে, সেই যমীনের শপথ করে বলা হয়েছে, কোরআন যা কিছুই বর্ণনা করছে, তা এক অমোঘ সত্য, আল্লাহর কোরআন কর্তৃক পরিবেশিত ভাষণ উপেক্ষা করার মতো নয় বা গুরুত্বহীন কোন কথা নয়। কোরআনের বক্তব্য নিয়ে তোমরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছো, পক্ষান্তরে এটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার মতো কোন বক্তব্য নয়। তোমরা যারা এই কোরআনের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করছো, আমার পরিকল্পনার মোকাবেলায় তোমাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। এরপর রাসূল ও তাঁর অনুসারীদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার সাথে সাথে ইসলাম বিরোধী লোকদেরকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, হে নবী! যারা আমার কোরআনের সাথে বিরোধিতা করছে, তাদেরকে কিছুটা সুযোগ দিন। এরা যা করছে তা করতে দিন। দ্বীনি আন্দোলনের দিকে ছুড়ে দেয়া এদের অস্ত্র এদের দিকেই সময়ের ব্যবধানে ফিরে এসে এদেরকেই আঘাত করবে এবং আপনার প্রচেষ্টা বিজয় হবে। ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে থাকুন।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে––

রুকু ১

(১) শপথ আসমানের, শপথ রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশকারী (তারকা)র। (২) তুমি কি জানো সে আত্মপ্রকাশকারী কে? (৩) এ হচ্ছে (একটি) উজ্জ্বল তারকা। (৪) (যমীনের) প্রত্যেকটি প্রাণীই (এমন যে) তার ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। (৫) মানুষ যেন দেখে, তাকে কোন্ জিনিস দিয়ে বানানো হয়েছে, (৬) বানানো হয়েছে সবেগে স্খলিত (এক ফোটা) পানি থেকে, (৭) যা বের হয়ে আসে (মানুষের) পিঠের (মেরুদন্ড) ও বুকের (পাঁজরের) মাঝখান দিয়ে।

(৮) (এভাবে যাকে তিনি বের করে আনতে পেরেছেন) তিনি অবশ্যই তাকে পুনরায় (জীবন) ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন। (৯) সেদিন (তার) যাবতীয় গোপন বিষয় যাচাই বাছাই করা হবে। (১০)(যে আযাব থেকে বাঁচার) তার কোনো শক্তিই থাকবে না, থাকবে না তার কোনো সাহায্যকারীও। (১১) বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের শপথ, (১২) (বৃষ্টি অভাবে) ফেটে যাওয়া যমীনের শপথ, (১৩) অবশ্যই তা হচ্ছে (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী (এক চূড়ান্ত) কথা। (১৪) তা কোনো অর্থহীন প্রলাপ নয়, (১৫) এরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। (১৬) আমিও (এদের ব্যাপারে) একটি কৌশল অবলম্বন করছি। (১৭) অতএব তুমি (আমার সে কৌশল দেখার জন্যে) কিছুদিন এই কাফিরদের অবকাশ দিয়ে রাখো।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

১ থেকে ৪ আয়াতে আকাশ এবং আকাশের তারকা, যা রাতে পরিদৃষ্ট হয়, সেই উজ্জ্বল তারকার শপথ করে বলা হচ্ছে, সৃষ্টি জগতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ওপরে কোন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই। অর্থাৎ মহাবিশ্বে এমন কোন সৃষ্টি নেই, এমন কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই, যে বস্তু স্বয়ং নিজের শক্তি ব্যবহার করে যার যার স্থানে টিকে রয়েছে অথবা পরিচালিত হচ্ছে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে প্রতিপালন করছেন। কোথায় কোন্ সৃষ্টির কি প্রয়োজন, তাকে কিভাবে রাখতে হবে এবং কোন উপকরণ দিয়ে সজ্জিত করতে হবে, তা তিনি স্বয়ং করছেন। কোন জিনিসই যেমন নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি তেমনি তা অভিভাবকহীন নয়। সমস্ত কিছুর অভিভাবক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনিই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে নিজের ব্যবস্থাপনা দিয়ে পরিচালিত করছেন। আল্লাহ বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا-وَلَئِنْ زَالَتَانْ..اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

নিশ্চয়ই আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন, যেন একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। যদি বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই যে, সে শক্তি তা ধরে রাখবে। অবশ্যই আল্লাহ অসীম ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতের-৪১)

অর্থাৎ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছুই রয়েছে, তার সমস্ত কিছুই নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির অধীন। এই পৃথিবী থেকে সূর্যের আকৃতি অনেকগুণ বড়। বিজ্ঞানীগণ বলে থাকেন যে, এই সূর্য পৃথিবী থেকে তের লক্ষগুণ বড়। এই সূর্য থেকে আকাশের তারকাগুলো আরো অনেক বড়। এই তারকা থেকেও বহুগুণে বড় হলো ব্লাকহোল। এই ব্লাকহোল যে কতটা বড়, তা বিজ্ঞানীগণ নির্ধারণ করতে বর্তমান সময় পর্যন্তও সক্ষম হননি। এসব বিশাল আকৃতির গ্রহ-উপগ্রহগুলো একটির সাথে আরেকটি এমনভাবে অবস্থান করছে যে, একটির পথ অন্যটি অতিক্রম করে না। আল্লাহ পাক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

মুসলিম বিজ্ঞানী আল বেরুণী ১১ শতকে Gravitation and centrifugal force সম্পর্কিত তত্ত্বের নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন সর্বপ্রথম (Law of Gravitation) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে মানব জাতিকে অবহিত করলেন। পক্ষান্তরে স্যার আইজ্যাক নিউটনের জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনে ঘোষণা করালেন- اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا-

তিনি আল্লাহ যিনি স্তম্ভ ব্যতীত আকাশ মন্ডলীকে সুউচ্চ করেছেন তোমরা তো তা দেখতে পারছো।

নিরক্ষর সেই নবীর মুখ থেকে মহান আল্লাহ বিজ্ঞানের এই কথাগুলো ঘোষণা করালেন-

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ...اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্যকে। তারকাসমূহ সেই আল্লাহরই বিধানের প্রতি আনুগত্য করছে। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। (সূরা নাহল-১২)

অথচ তিনি পৃথিবীর কোন বিজ্ঞানাগারে শিক্ষাগ্রহণ করেননি। তিনি মহাবিজ্ঞানী স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়েই সৌর জগতের চন্দ্র, সূর্য, যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ, তারকারাজি, নক্ষত্রপুঞ্জে শৃংখলা দান করেছেন। এগুলো কখনও আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে অগ্রসর হতে পারে না।

এই মহাবিশ্বের প্রত্যেক বস্তু একে অপরকে সজোরে আকর্ষণ করে। যে শক্তি এভাবে আকর্ষণ করে তার নাম হলো মহাকর্ষ শক্তি (Gravitation energy)। এ আকর্ষণ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে বস্তুর ওজনের গুণফলের উপর এবং পরোক্ষভাবে বস্তুর দূরত্বের বর্গের উপর নির্ভর করে। দুটো বস্তুর মধ্যে যে বস্তুটির ওজন বেশী সেটি কম ওজনের বস্তুকে আকর্ষণ করে। এভাবে বস্তুর সাথে বস্তুর দূরত্ব কম হলে আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি লাভ করে এবং দূরত্ব বেশী হলে আকর্ষণ শক্তি হ্রাস পায়। ঐ বিশাল মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে একটা ব্যালেন্স পজিশনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখেছেন যে, গ্রহ–নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষীয় আকর্ষণে পরস্পর পরস্পরের কাছে আসতে প্রবলভাবে আগ্রহী। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ আরেকটি শক্তি সৃষ্টি করেছেন, যার নাম হলো সম্প্রসারণ গতি। (Force of expansion) এই সম্প্রসারণ গতির কারণে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা একত্রিত হতে পারে না। যদি একত্রিত হবার সুযোগ থাকতো তাহলে মুহূর্তে একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ লেগে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। মহান আল্লাহ এভাবে মহাশূন্যে অদৃশ্য স্তম্ভ (Invigible pillar) সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا–

তিনি স্তম্ভ ব্যতিত নভোমন্ডলকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তোমরা তো তা দেখছো। (লোকমান-১০)

মহাশূন্যে নক্ষত্রগুলোর অবিরাম ঘূর্ণনের ফলে তাদের কক্ষীয় গতি থেকে উত্থিত হয় প্রচন্ড এক শক্তি–যার নাম হলো কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centrifugal force)। এ শক্তি বস্তুর ওজনের গুণফলের আনুপাতিক এবং বিপরীতভাবে বস্তু থেকে আরেক বস্তুর পৃথক হয়ে থাকার দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক। এ কারণে নক্ষত্রগুলো খসে পড়ে না, একটির সাথে আরেকটির কোন সংঘর্ষ ঘটে না।

বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, সূর্য একটি নক্ষত্র এবং তা পৃথিবী থেকে তের লক্ষগুণ বড়। এই সূর্যের মতো তিন কোটি সূর্যকে সম্পূর্ণ উদরস্থ করতে পারে, এমন অসংখ্য তারকা মহান আল্লাহ গ্যালাক্সির ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। এই সূর্য হলো সেই সূর্য, পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব গোষ্ঠী যতটা এ্যানার্জি ব্যয় করেছে, সূর্য তার চারদিকে প্রতি সেকেন্ডে সেই এ্যানার্জি ব্যয় করছে। শুধু তাই নয়, এ জ্বলন্ত সূর্যের সম্মুখ ভাগ থেকে এক প্রকারের জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়। বিজ্ঞানীগণ ঐ গ্যাসের নামকরণ করেছেন, 'স্পাইকুলস'। প্রতি সেকেন্ডে এই গ্যাস ষাট হাজার মাইল বেগে নির্গত হচ্ছে। এই গ্যাস যদি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে সক্ষম হতো, তাহলে মুহূর্তে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে নিঃশেষে ভস্মে পরিণত হতো। প্রচন্ড ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস যে তীব্র গতিতে সূর্য থেকে নির্গত হচ্ছে, সেই একই গতিতে ঐ গ্যাস পুনরায় সূর্যের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থা মহান আল্লাহ এ জন্য করেছেন যে, তাঁর কোন সৃষ্টি যেন কোনক্রমেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। সূর্যের এই স্পাইকুল গ্যাস মহান আল্লাহ পাকের নির্দেশেই সূর্য থেকে বেরিয়ে এসে আবার সূর্যের দিকেই প্রত্যাবর্তন করছে, যেন সৃষ্টি জগৎ কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। আল্লাহ বলেন–

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ– আমি আমার সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী নই।

বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এই পৃথিবী থেকে সূর্য যতটা দুরত্বে অবস্থান করছে, সেখান থেকে

কয়েক ডিগ্রী যদি ওপরে উঠে যায়, তাহলে মুহূর্তে গোটা পৃথিবী প্রচন্ড ঠান্ডায় জমে বরফে পরিণত হয়ে যাবে। সমস্ত প্রাণী জগৎ বরফ হয়ে যাবে। আবার সূর্য যেখানে অবস্থান করছে, সেখান থেকে যদি কয়েক ডিগ্রী নীচে নেমে আসে, গোটা পৃথিবী ও পৃথিবীর ভেতরে যা কিছু রয়েছে, মুহূর্তে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষে ভস্মে পরিণত হবে। ঐ মহাকাশে চন্দ্র যেখানে অবস্থান করছে, সেখান থেকে চন্দ্র যদি কয়েক ডিগ্রী ওপরে ওঠে যায়, তাহলে এই পৃথিবী শুষ্ক মরুপ্রান্তরে পরিণত হবে। সমস্ত প্রাণী, তরু-লতা বিলীন হয়ে যাবে। আবার এই চন্দ্র যদি কয়েক ডিগ্রী নীচে নেমে আসে, তালে পৃথিবীর সমস্ত নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, অগাধ জলধি স্ফীত হয়ে গোটা পৃথিবীর স্থলভাগকে প্লাবিত করে ফেলবে। সমস্ত পৃথিবী পানির অতল দেশে তলিয়ে যাবে।

পৃথিবী থেকে সূর্য আর চন্দ্রের এই যে সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী অবস্থান করছে, এটা সূর্য আর চন্দ্রের অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর কারণে নয়, আল্লাহ পাকের আদেশেই তারা সঠিক ও নির্দিষ্ট পরিমাপে অবস্থান করছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ-

তিনি চাঁদ, সূর্য এবং নক্ষত্র সৃষ্টি করে তাঁর আইনের অধীন করে রেখেছেন। (আরাফ-৫৪)

সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট-রে, (Ultra-violet ray) অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীর জন্য চরম ক্ষতিকর। মারাত্মক ক্ষতিকর এই 'রে' পৃথিবীতে যেন পৌঁছতে সক্ষম না হয়, এ জন্য ওজন স্তর (Green house) রয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এই ওজন স্তরে ফাটল ধরেছে। মানুষ এই পৃথিবীর পরিবেশ (Environment) দূষিত করেছে, যার ফলে সে ওজন স্তরে ফাটল ধরেছে। মানুষ আল্লাহর আদেশের বিপরীত এমন ধরনের কর্মকান্ড করেছে, যার ফলে ওজন স্তরে ভয়ঙ্কর ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

দিনের আলোয় তারকা পরিদৃষ্ট হয় না, ক্রমশঃ রাতের অন্ধকারের আবরণ পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করতে থাকে, সেই সাথে তারকামালাও পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এসব তারকামালার তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ তা'য়ালা, তিনি এদেরকে যে কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে পথেই এরা আবর্তিত হয়। এ জন্য এসবের শপথ করে আল্লাহ বলছেন, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই তার তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে। মানব দেহের দিকে দৃষ্টি দিলেই অনুভব করা যায়, এই দেহ একজন তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের ব্যতিক্রম করছে না। দেহের আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যার যার কর্ম সে করে যাচ্ছে। হার্ট কিডনীর দায়িত্ব পালন করছে না এবং ফুসফুস পাকস্থলির কাজ করছে না। এভাবে গোটা সৃষ্টি জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এসবের পেছনে এক মহান বিজ্ঞানী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এরপর ৫ থেকে ৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করছে, তাঁর রাসূলকে ও রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ কোরআনকে অস্বীকার করছে, মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব বলে ধারণা করছে, তাদের উচিত নিজের প্রতি লক্ষ্য করা। এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এ কথা তার স্বরণে থাকা উচিত, কোন বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার বর্তমান দেহের আকৃতি দান করা হয়েছে। সেটা এমন এক বস্তু ছিল, যা সবেগে পৃষ্ঠ ও বুকের অস্থিসমূহের মধ্য থেকে নির্গত হয়েছে। তার চিন্তা করা উচিত, পিতার দেহ থেকে নির্গত অসংখ্য শুক্রকীটের মধ্য থেকে একটি মাত্র শুক্রকীট এবং মাতার

গর্ভ থেকে নির্গত অগণিত ডিম্বের মধ্যে থেকে একটি ডিম্ব নির্বাচিত করে কোন বিশেষ মুহূর্তে উভয়কে মিলিত ও সংযুক্ত করে যিনি দেন তিনি কে? কে এভাবে মানুষকে মায়ের গর্ভাধারে স্থান করে দেন?

তিনি কে-যিনি মায়ের গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর থেকে মায়ের সেই অন্ধকার গর্ভে তাকে ক্রম-বিকাশ, ক্রমবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ দান করে তাকে একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত করেন, এরপর সে মানব শিশুর আকারে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আগমন করে? পৃথিবীতে আসার পূর্বেই তার মায়ের বুকে কে তার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে রেখেছিল? কে তাকে মায়ের গর্ভেই সুন্দর আকৃতি দান করেছিল? এই পৃথিবীকে কে তার জন্য বসবাসের উপযোগী করেছে? কে তাকে জীবন ধারনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ দিয়েছে? দৃষ্টির সামনে এসব কিছু দেখে তার চিন্তা করা উচিত, তার আপন প্রভুর নিজস্ব ব্যবস্থা ও সংরক্ষণ ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়।

মানুষের জন্ম একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিণতি। মানুষের জন্মের সূচনা বিন্দু হলো একটি স্ত্রী ডিম্বাণুর উর্বরতা লাভ। এই ডিম্বাণু প্রথমে নারীর ডিম্বকোষ বা ডিম্বাশয় থেকে নিজেকে পৃথক করে নেয়। পরে এই ডিম্বাণু সেই নারীর মাসিক ঋতুচক্রের মাধ্যমে ডিম্ববাহী নালী বা ফ্যালোপিয়ান টিউবের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করতে থাকে। এই ডিম্বাণুকে প্রকৃত অর্থে উর্বর করতে পারে পিতার সজীব শুক্রকীট। পুরুষের এক কিউবিক সেন্টিমিটার বীর্যে প্রায় ২৫০ কোটি শুক্রকীট থাকে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় একজন পুরুষের যে পরিমাণ বীর্যপাত ঘটে, তার পরিমাণ কয়েক কিউবিক সেন্টিমটার। পুরুষের এই শুক্রকীট তৈরী হয় অন্ডকোষে (Testicles)। পিতার বীর্যে মিশ্রিত শুক্রকীট বেরিয়ে আসার জন্য নালার মতো ব্যবস্থা রয়েছে। বীর্যের এই যাত্রাপথের আশেপাশে রয়েছে অন্যান্য গ্লান্ড বা রসস্রাবী গ্রন্থি। এসব গ্রন্থির রসও বীর্যের সাথে মিশ্রিত হয় আর এভাবেই পিতার শুক্রকীটের সংস্পর্শে এনে মাতার ডিম্বাণু উর্বর হয়ে ওঠে। এই জটিল ব্যবস্থা কার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়ে থাকে সে সম্পর্কে মানুষের চিন্তা করা উচিত। (মাতৃগর্ভে কিভাবে একটির পর আরেকটি স্তর অতিক্রম করে মানব শিশু গঠিত হয়, এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'সমস্ত প্রশংসা ঐ রব-এর' শিরোণাম দেখুন।)

মানব দেহ থেকে বীর্য বেরিয়ে আসার স্থান নির্দেশ করা হয়েছে, পিতার মেরুদন্ড বা পৃষ্ঠদেশ এবং মাতার বক্ষ পিঞ্জর। পৃথিবীতে মানুষের আসার মাধ্যম হলো মাতা-পিতা। মাতা-পিতার দৈহিক মিলনের সম্পূর্ণ কাজটি নিয়ন্ত্রণ করে মানব দেহের দুটো নার্ভস (লরশণ্র)। এই নার্ভস দুটোর মধ্যে একটির নাম হলো জেনিটোফেমোরাল (Genitofemoral) এবং অপরটির নাম হলো ইলিও ইনগুইনাল (Ilio inguinal)। এই স্নায়ু দুটো পিতার পৃষ্ঠদেশ এবং মাতার বক্ষ পিঞ্জর থেকে নির্গত হয়ে জননতন্ত্রের সাথে মিলিত হয়েছে এবং Geminal fluid এরা স্খলিত হবার ব্যাপারে প্রভাবক হিসাবে সক্রিয় থাকে। যদি কোন কারণে এই স্নায়ু দুটো বিকল হয়ে যায়, তাহলে সন্তান উৎপাদনের কোন ক্ষমতাই থাকে না। নির্গত হয় যথাক্রমে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় থেকে। Genitofemoral এবং Ilio inguinal স্নায়ু দুটো যখন প্রচন্ড প্রভাব সৃষ্টি করে তখন ঝাঁকুনী খেয়ে শুক্রাশয় (Testis) ও ডিম্বাশয় (Ovary) থেকে তরল বীর্য সবেগে নির্গত হয়। ৬ নম্বর আয়াতে 'মা-ইন দা-ফিক' বলে এই ব্যবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে।

মানব সৃষ্টির এই জটিল বিষয় উল্লেখ করে ৮ থেকে ১০ নম্বর আয়াতে মূল বিষয়ের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমাদের প্রতি আমি রাসূল প্রেরণ করেছি, তাঁর ওপরে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি। তিনি তোমাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান

জানাচ্ছেন। তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে কিয়ামতের ময়দানে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে, এই অমোঘ সত্য তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এই পৃথিবীতে তোমরা কে কি কোন উদ্দেশ্যে কাজ করছো, তা সেদিন প্রকাশ করে দেয়া হবে। এসব বিষয় তোমরা অবিশ্বাস করছো। তোমরা দাবি করছো, মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন লাভ করা সম্পূর্ণ এক অসম্ভব ব্যাপার। অথচ তোমরা তোমাদের প্রথম সৃষ্টির বিষয়টি চিন্তা করে দেখছো না, কোন জটিল প্রক্রিয়া অতিক্রম করে তোমাদেরকে পৃথিবীতে আনা হয়েছে। সেই বিষয়টি চিন্তা করলেই তো এ কথা তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, যিনি প্রথম অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করলেন, চোখে দেখতে না পাওয়া অগণিত শুক্রকীটের মধ্যে থেকে মাত্র একটি শুক্রকীটকে বেছে নিয়ে জটিল পদ্ধতি অতিক্রম করে পূর্ণাঙ্গ মানব হিসাবে পৃথিবীতে আনলেন, তিনিই পুনরায় জীবিত করে হিসাব গ্রহণ করতে পারবেন।

আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন মানুষের যাবতীয় গোপন বিষয় পরীক্ষা করে দেখা হবে। অর্থাৎ মানুষ যে কাজ করে তা প্রকাশ্যে দেখা যায়। কিন্তু সেই কাজের পেছনে মানুষের অন্তরে কোন ধরনের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে, তা দেখা যায় না। একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা কোন্ স্বার্থ উদ্ধার করার লক্ষ্যে সমাজের সেবায় নিজেকে যেন উৎসর্গ করে দেয়। মসজিদ, মাদ্রাসায় বা অন্যান্য সেবামূলক কাজে দান করে। এসব লোকদের কর্মকান্ড দেখে সাধারণ মানুষ মনে করে, লোকটি বড়ই দানশীল। এভাবে মানুষ তার মনে কোন্ উদ্দেশ্য গোপন করে যেসব কাজ করেছে, কিয়ামতের দিন প্রকাশ্য কাজের সাথে সাথে এসব গোপন উদ্দেশ্যও প্রকাশ করে দেয়া হবে। আবার এমন অনেক কাজ করা হয়, যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী। এসব কাজের প্রভাব সমাজে, দেশে তথা পৃথিবীতে কোন্ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, কোন পর্যন্ত এসব কাজের প্রভাব পৌঁছে যায় বা কতদিন এর প্রভাব বিদ্যমান থাকে, তা মানুষের কাছে অজানাই থেকে যায়।

অনেকে কাজ শেষ করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে, কিন্তু তার কাজের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যুগের পর যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু যিনি সে কাজের আঞ্জাম দিয়েছিলেন, তিনি জানতে পারেন না তার কাজের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে। এসব বিষয় কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেয়া হবে। মতবাদ, মতাদর্শ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য, নানা ধরনের প্রথা, নিয়ম-পদ্ধতি যারা আবিষ্কার করে থাকে, সমাজে ও দেশের বুকে চালু করে যায়, তাদের সামনেও সেদিন প্রকাশ করা হবে যে, তার কাজের কুফল কিভাবে এবং কতদিন যাবৎ দেশের মানুষ ভোগ করেছে। তার কারণে মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এভাবে গোপন ও প্রকাশ্য কাজ এবং মৃত্যুর পূর্বে করে যাওয়া কাজের প্রভাব প্রতিক্রিয়া যতদিন চলেছে, যত মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এসব হিসাব করে সেদিন শাস্তি দেয়া হবে।

যখন এসব লোকদেরকে গ্রেফতার করা হবে, তখন গ্রেফতারী এড়িয়ে যাবার মতো তার নিজের যেমন কোন শক্তি থাকবে না এবং আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে মুক্ত করার জন্য কোন সাহায্যকারীও সে পাবে না। পৃথিবীর যমীন যেমন অনুর্বর পড়ে থাকে, উদ্ভিদ সৃষ্টির মূল উপাদান মৃত্তিকা গর্ভে লুকায়িত থাকে। মানুষের অবস্থাও হলো ঠিক তেমনি, মানব সৃষ্টির উপাদান মহান আল্লাহ নিহিত রেখেছেন পিতার শুক্রকীটে আর মাতার ডিম্বাণুর মিলিত অবস্থার মধ্যে। বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবার পরে মাতা-পিতা মিলিত হলে মানুষ মাতৃগর্ভে আকৃতি ধারণ করে তারপর পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। মৃত্তিকা গর্ভে লুকায়িত উদ্ভিদ সৃষ্টির মূল

উপাদান লুকিয়ে ছিল মহান আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, অমনি মৃত্তিকা বক্ষ দীর্ণ করে উদ্ভিদ পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেরিয়ে এলো। মানুষের সৃষ্টির সাথে উদ্ভিদ সৃষ্টির অপূর্ব সামঞ্জস্যের কারণে মহান আল্লাহ আলোচ্য **সূরার ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতে** বলেছেন, শপথ বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশমন্ডলের এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকালীন দীর্ণবক্ষ যমীনের।

এই শপথ করে মূলতঃ মানুষকে এ কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমার নিজের অস্তিত্ব এবং সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো। তুমি কতটা অসহায়, কতটা পরমুখাপেক্ষী, বিষয়টি অনুধাবন করো। আমি অনুগ্রহ করে তোমাকে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত করেছি। আমার অনুগ্রহে তুমি মানব আকৃতি ধারণ করেছো এবং জীবনের স্পন্দন তোমার ভেতরে সক্রিয় রয়েছে। তোমাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্যই আমি তোমাদের ভেতর থেকেই তোমাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছি এবং কোরআন নাযিল করেছি। অথচ তোমরা রাসূলকে অস্বীকার করছো এবং এই কোরআনের প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে তা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছো।

মানব গোষ্ঠীর তৎকালীন যুগে এবং বর্তমানে যারা আপন প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে এ ধরনের ন্যাক্কার জনক ভূমিকা পালন করছে, তাদের সম্পর্কে **১৩ ও ১৪ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, যে কোরআন আমি আমার রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ করেছি, তা গুরুত্বহীন কোন বিষয় নয় এটা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার কোন অবকাশ নেই। এই কোরআন তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। একে আমি সত্য আর মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসাবে অবতীর্ণ করেছি। এটা তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসবে। কোন পথ অনুসরণ করলে তোমরা নিজেরদেরকে অকল্যাণ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হবে, তা এই কোরআন দেখিয়ে দেবে এবং কোন পথ অনুসরণ করলে তোমরা মানুষ হিসাবে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, তাও দেখিয়ে দেবে।

যে কোরআনের আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য তোমরা চেষ্টা করছে এবং এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো, এই কোরআন তোমাদের সৃষ্টির সঠিক ইতিহাস তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ পরিবেশন করছে, ইতিহাস সম্পর্কে তোমাদেরকে সচেতন করছে। এই মহাবিশ্ব কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তা কিভাবে কোন শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে। তোমরা পরস্পরে কিভাবে কথা বলবে, কিভাবে হাঁটবে, একে অন্যের সাথে কি আচরণ করবে তার সুন্দর পদ্ধতি জানিয়ে দিচ্ছে। তোমাদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন্ নীতিমালা অনুসারে চলবে, তা পরিবেশন করছে। ভিন্ন রাষ্টের সাথে কিসের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়বে এবং কি আচরণ করবে, তা জানিয়ে দিচ্ছে। এভাবে একে একে তোমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদের যত নীতিমালা ও আইন-কানুন প্রয়োজন হবে, তা জানিয়ে দিচ্ছে। (কোরআনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'আল কোরআন পরিচিতি' থেকে 'মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

অথচ এই কোরআনের আন্দোলনকে আমার যমীন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য তোমরা ষড়যন্ত্র করছো। আলোচ্য **সূরার ১৫ থেকে ১৭ নম্বর আয়াত** পর্যন্ত কোরআনের আন্দোলন বিরোধী অকৃতজ্ঞ লোকদের সম্পর্কে রাসূলকে বলা হচ্ছে, এসব লোক আমার বিরুদ্ধে অর্থাৎ কোরআনের আহ্বানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আমিও এসব লোকদের ব্যাপারে একটি কৌশল অবলম্বন করেছি। আমার সে পরিকল্পনা দেখার জন্য কোরআন বিরোধিদেরকে তুমি

কিছুদিন অবকাশ দাও। দেখতে থাকো, আমার পরিকল্পনার মোকাবিলায় এসব অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী লোকজনের পরিণতি কি দাঁড়ায়।

আমি আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং পৃথিবীতে প্রতিপালন করছি আর এরা আমার কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, আমার কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করছে, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাদেরকে সমাজের হেয়-প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে হীন চক্রান্ত করছে, হে রাসূল! তাদের ষড়যন্ত্র দেখে বিচলিত হবার কিছুই নেই। ওরা করছে ষড়যন্ত্র আর আমি করছি পরিকল্পনা। ওদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর বিরোধিতার মোকাবিলায় ধৈর্য অবলম্বন করুন। দেখুন কিভাবে আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় এবং ওদের নিকৃষ্ট পরিণতি কি দাঁড়ায়।

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলছেন, 'কোরআন বিরোধিদেরকে আপনি কিছুটা অবকাশ দিন এবং তারা যা করছে, তাদেরকে তা করতে দিন'–আল্লাহর বলা এই কথাটা রাসূলের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টির দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রাসূলের আকাশচুম্বী সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল কতটা পাওয়ারফুল (Powerfull) কি বিরাট শক্তি, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী যে, আল্লাহর কাছে তিনি কত উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তিনি যদি আল্লাহর কাছে সামান্য একটু আবেদন করতেন, কোরআনের প্রতি বিদ্রূপকারী, কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী লোকদেরকে এই মুহূর্তে ধ্বংস করে দিন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হয়ত তাই করতেন। তাঁর এই উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মমতার ভাষায় বলছেন, ঐ জাহিলদের আরেকটু সময় দিন, ওরা তো আপনার সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানে না। ওরা যা করছে করতে দিন, আপনি বিচলিত হবেন না। ওদেরকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমার। আমি কি করি, আপনি ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন।

দ্বীনি আন্দোলন বিরোধিরা করে ষড়যন্ত্র আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেন পরিকল্পনা আর আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার পথে বাধা সৃষ্টি করার মতো কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেক নবী-রাসূলের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, আল্লাহর পরিকল্পনার মোকাবিলায় তাদের ষড়যন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়েছে। নবী-রাসূলদের অবর্তমানে যারা দ্বীনি আন্দোলনের মশাল হাতে নিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুগেই ষড়যন্ত্র হয়েছে। ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক রূপ দেখে দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকগুলো আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ওদিকে আল্লাহও পরিকল্পনা করেছেন। সামান্য সময়ের ব্যবধানে ষড়যন্ত্রকারীদের বিছানো জাল কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, তাও কোরআনের সৈনিকরা লক্ষ্য করেছে।

আল্লাহর কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে অকল্পনীয় নিকৃষ্ট চিত্রে দেশ ও জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। মিথ্যা অপবাদের অস্ত্র এদের দিকে একের পরে এক প্রচার মাধ্যমে ছুড়ে দেয়া হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর পরিকল্পনা কোরআন বিরোধিদের যাবতীয় অস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। সময়ের ব্যবধানে জাতি অনুভব করতে সক্ষম হয়, যাবতীয় অঘটনের জন্য আল্লাহর অনুগত যে লোকগুলোকে দায়ী করা হলো, প্রকৃতপক্ষে তারা দায়ী নয়। প্রকৃত দোষী ও দায়ী ব্যক্তি তারাই, যারা অপবাদ দিয়েছে। এভাবে প্রতিটি যুগেই আল্লাহর পরিকল্পনা কোরআন বিরোধিদের ছুড়ে দেয়া অস্ত্র তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন ধৈর্য–কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠাকামী প্রতিটি ব্যক্তিকেই অসীম ধৈর্যের সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। ❐

সূরা আল-আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৮৭

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'আ'লা' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরায় আলোচিত বিষয় থেকেই স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, এই সূরা মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পর্যন্তও ওহী গ্রহণে যথাযথভাবে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেননি। সবেমাত্র নবুওয়াত লাভ করেছেন এবং আল্লাহর নির্দেশে দাওয়াতী কাজ শুরু করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাঁর আহ্বানকে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিলো। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূল তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। এই সময়ে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই সূরায় প্রথমে আলোচিত হয়েছে তাওহীদ সম্পর্কে, তারপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মমতা ও করুণাসিক্ত ভাষায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এরপর আলোচনা করা হয়েছে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে। প্রথমেই তাওহীদের বিষয়টিকে প্রাধান্য আনা হয়েছে এবং এটাই ইসলামের মূল ভিত্তি। বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের মহান রব্ব-এর নামের তাস্‌বীহ্ করো। এমন নামে তাঁকে ডেকো না বা এমন কোন নাম তাঁর ওপরে আরোপিত করো না, যে নামের মধ্য দিয়ে তাঁর কোন ধরনের দুর্বলতা প্রকাশ পায়, যে নামের ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায় এবং যে নামের সাথে অন্য কোন কিছুর তুলনা করা যায়। অর্থাৎ এমন নামে তাঁকে আহ্বান করবে না, যে নামের ভেতর দিয়ে অংশীদারিত্বের গন্ধ প্রকাশ পায় এবং তাওহীদের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

যার নামে তোমাদেরকে তাস্‌বীহ্ করতে অর্থাৎ যাঁর দাসত্ব, গোলামী, উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করতে বলা হচ্ছে, তিনিই তোমাদেরকে এবং মহাবিশ্বের যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন। তিনিই প্রতিটি সৃষ্টিতে ভারসাম্যতা স্থাপন করেছেন এবং প্রতিটি জিনিসের নিয়তি বা ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন। প্রতিটি সৃষ্টির জীবন ধারণের জন্য, কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের জন্য পথনির্দেশনা দান করেছেন। কেউ দিগভ্রান্ত হয়ে পড়বে, এমন অসহায় অবস্থায় তিনি তাঁর কোন সৃষ্টিকে নিক্ষেপ করেননি। পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে তিনি উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন এসবের ওপরে ঋতুচক্রও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক ঋতুতে উদ্ভিদ সবীজতা লাভ করে এবং আরেক ঋতুতে সবীজতা হারিয়ে ফেলে। এর ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর বিস্ময়কর কর্ম-কৌশল প্রকাশ করেন।

এরপর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আপনার ওপরে যে ওহী অবতীর্ণ করা হচ্ছে, তা মুখস্থ করার ব্যাপারে আপনি অস্থিরতা প্রকাশ করবেন না। ওহী আপনার মানসপটে অঙ্কিত করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। ওহীর এই মণিমুক্তাগুলো আপনার ভেতরে একটির পর একটি সজ্জিত করার দায়িত্ব আমার। আপনার ভেতরে ওহীর প্রতিটি শব্দ স্মরণ রাখা ও সংরক্ষিত রাখা আপনার নিজস্ব কোন যোগ্যতার ব্যাপার নয়। এটা একান্তই আপনার প্রতি আমার অনুগ্রহ। আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে তা ভুলিয়ে দেয়া আমার পক্ষে এমন কোন বিষয় নয়। আর প্রতিটি মানুষকে সত্য-সঠিক পথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব

হলো আপনার ওপরে যা অবতীর্ণ হচ্ছে, যে নির্দেশ আমার পক্ষ থেকে যাচ্ছে, তা প্রচার করা।

এখন যার ইচ্ছা সে সত্য গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা তা গ্রহণ না করে এড়িয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথ পরিহার করে সত্যপথ অবলম্বন করতে আগ্রহী, তাকে আপনি সত্য পথপ্রদর্শন করুন। যার ভেতরে পথভ্রষ্টতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা রয়েছে, সে ব্যক্তি এই মহাসত্য অবশ্যই গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি মিথ্যার অন্ধকারে নিজেকে নিমজ্জিত রাখতে চায়, সে হলো চরম এক হতভাগা ব্যক্তি। তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিন, তার নিকৃষ্ট পরিণতি সে নিজেই ভোগ করবে।

এরপর বলা হয়েছে, কল্যাণ তো লাভ করবে তারাই, যারা মিথ্যের আবর্জনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পবিত্রতা অর্জন করেছে, পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির গোলামী থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামীর পথ অবলম্বন করেছেন এবং সে যে আল্লাহর গোলাম তার প্রমাণ হিসাবে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপে আপন প্রভুর নাম স্মরণ করে থাকে, তাঁকে সেজ্‌দা করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের এই অবস্থা যে, তারা আখিরাতের জীবনের মোকাবেলায় পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কিন্তু এই চেতনা এদের ভেতরে নেই, এই পৃথিবীর জীবন হলো স্বল্প সময়ের আর আখিরাতের জীবন অনন্তকালের। আর সেই জীবনে কল্যাণ লাভ করার মধ্যেই সফলতা নিহিত রয়েছে।

এই মহাসত্য কথাটি কোন নতুন কথা নয়। যে আখিরাতের জীবনের কথা তুমি এদেরকে বলছো এবং এরা তা অস্বীকার করছে, এই কথাটি কোন নতুন কথা নয়। নবী হিসাবে শুধু তুমিই আখিরাতের বিষয় মানুষের সামনে বলছো না। তোমার পূর্বে যেসব নবী-রাসূল গত হয়েছেন, তাঁরা সবাই আখিরাতের জীবনের দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। আখিরাতের জীবনের সফলতাই প্রকৃত সফলতা-এ কথা শুধু কোরআনেই নয়, ইতোপূর্বে আমি তা ইবরাহীম ও মুসার প্রতি যেসব কিতাব বা সহীফা অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতেও উল্লেখ ছিল। পরম সত্য সেই আখিরাতের জীবনের কথা সেসব কিতাবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা আ'লা-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-১৯-রুকু-১

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ① الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ② وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ③
وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ④ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ⑤ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ⑥
اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ⑦ وَنُيَسِّرُكَ
لِلْيُسْرٰى ⑧ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ⑨ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ⑩
وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ⑪ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ⑫ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ
فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ⑬ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ⑭ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ⑮
بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ⑯ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ⑰ اِنَّ هٰذَا لَفِى
الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ⑱ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ⑲

বাংলা অনুবাদ

করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) (হে নবী!) তোমার মহান প্রতিপালকের নামে তাস্‌বীহ করো, (২) যিনি (সৃষ্টিকুলকে) তৈরী করেছেন, (তাকে) সুবিন্যস্ত করেছেন, (৩) তিনি (সব কিছুর) পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, অতপর তিনি (সবাইকে তাদের নিজ নিজ) পথ বাতলে দিয়েছেন। (৪) তিনি (যমীন) থেকে চারা গাছ বের করে এনেছেন। (৫) অতপর তিনিই তাকে আবর্জনায় পরিণত করেন। (৬) আমি (যে ওহী পাঠাবো) তা আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, অতপর তুমি আর (তা) ভুলবে না। (৭) অবশ্য আল্লাহ পাক যদি চান (তা ভিন্ন কথা), তিনি প্রকাশ্য বিষয় জানেন, (জানেন) গোপন বিষয়ও। (৮) আমি তোমার জন্যে সহজ পদ্ধতিগুলোর সুযোগ করে দেবো। (৯) কাজেই তুমি (তাদের আল্লাহ্ তা'য়ালার কথা) স্মরণ করাতে থাকো-যদি তা তাদের জন্যে উপকারী হয়!

(১০) যে ব্যক্তি (আল্লাহ্ তা'য়ালাকে) ভয় করবে, সে (অবশ্যই এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর পাপী ব্যক্তি তাকে এড়িয়ে যাবে। (১২) অচিরেই সে বিশালাকায় আগুনে গিয়ে পড়বে। (১৩) সেখানে সে মরবে না, (আবার বাঁচার মতো করে) সে বাঁচবেও না। (১৪) যে ব্যক্তি (হেদায়েতের আলোকে) নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই

সফলকাম হয়েছে। (১৫) সে নিজের মালিকের নাম স্মরণ করলো অতপর নামাজ আদায় করলো। (১৬) তোমরা তো (হামেশাই) দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এসেছো। (১৭) (অথচ) আখিরাতের জীবনই হচ্ছে স্থায়ী ও উৎকৃষ্ট। (১৮) আগের (নবীদের) কিতাবসমূহে এসব কথা (মজুদ) আছে–(১৯) উল্লেখ আছে (তা) ইবরাহীম ও মূসার কিতাব সমূহেও।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে ইসলামের অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমার মহান রব-এর নামের তাস্‌বীহ করো। (আলোচ্য আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'হাম্‌দ ও তাস্‌বীহ্ শুধু আল্লাহর জন্য' শিরোণাম থেকে 'আল্লাহ–আল ইলাহ্' শিরোণাম পর্যন্ত পড়ুন।)

মহান আল্লাহকে এমন নামে ডাকতে হবে, যে নামটি একমাত্র তাঁর জন্যেই শোভনীয় এবং প্রযোজ্য। এমন কোন নামে কোনক্রমেই তাঁকে ডাকা উচিত নয়, যা অর্থ ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে তাঁর জন্য উপযুক্ত নয়। যেসব নামের ভেতর দিয়ে এ কথা প্রকাশ পায় যে, তিনি দুর্বলতার উর্ধ্বে নন, তাঁর কোন অংশীদার রয়েছে অথবা তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন, তাকে কেউ জন্ম দিয়েছে, তিনি কারো নির্দেশ শুনে থাকেন। এ ধরনের কোন নামে তাঁকে ডাকা যাবে না। তাঁকে ঐসব নামেই আহ্বান করতে হবে, ঐসব নামেই তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে, যেসব নাম তিনি স্বয়ং তাঁর কোরআনে উল্লেখ করেছেন। তাফসীরে সাঈদী–সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত তাফসীর করেছি।

সৃষ্টির জন্য যেসব নাম রয়েছে, সেসব নামেও তাঁকে ডাকে যাবে না। অথবা আল্লাহর যেসব নাম রয়েছে, সেসব নামেও আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে ডাকা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালার অনেকগুলো গুণবাচক নামের মধ্যে একটি নাম রয়েছে, 'খা-লিক' এই খালিক নামে কোন মানুষকে ডাকা যাবে না। কারণ খালিক শব্দের অর্থ হলো, 'স্রষ্টা' সুতরাং কোন মানুষ তো স্রষ্টা হতে পারে না, সে তো সৃষ্টি। সে হতে পারে 'আব্দুল খালিক' অর্থাৎ স্রষ্টার গোলাম। এভাবে কোন মানুষকে রাহ্‌মান, রাহীম, মালিক, হাকিম, কারীম, আলিম, শাকুর, রব ইত্যাদি ধরনের কোন নামেই মানুষকে ডাকা যাবে না–এটা হারাম। জেনে বুঝে কেউ যদি আল্লাহর কোন গুণবাচক নামে মানুষকে ডাকে, তাহলে সে মারাত্মক গোনাহ্‌গার হবে। আল্লাহর এসব গুণবাচক নামের পূর্বে 'আব্দুল' অর্থাৎ চাকর বা গোলাম শব্দটি যুক্ত করে ডাকতে হবে। বড় নামে ডাকতে অসুবিধা হলে এমন ছোট নাম রাখতে হবে, যে নামের মধ্য দিয়ে আল্লাহর গোলামীর অর্থ বা ভালো কোন অর্থ প্রকাশ পায়, সেই নামে ডাকতে হবে।

মহান আল্লাহর নাম সম্মান-মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করতে হবে। আল্লাহর পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে হবে এমন সচেতনতার সাথে, যেন কোনক্রমেই অসম্মান ও বেয়াদবির কোন নিদর্শন প্রকাশ না পায়। অথচ অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এই যে, তারা তাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের এবং নেতা-নেত্রীদের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করে, কিন্তু মহান মালিক–আল্লাহর নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে সে শ্রদ্ধার কোন প্রকাশ থাকে না। বিদ্রূপ করে বা এমন কোন ভঙ্গিতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যার ভেতর দিয়ে অমর্যাদা প্রকাশ পায়। আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন কাজ বা পাপের কোন কাজ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করা আল্লাহর প্রতি বিদ্রূপ করার শামিল। কোন ব্যক্তি যদি এ কথা জানে যে, অমুক

ব্যক্তির সম্মুখে মহান আল্লাহর নামে কোন কথা বললে, সে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহ সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে, তাহলে সে ব্যক্তির সম্মুখে মহান আল্লাহ সম্পর্কে কোন কথা না বলাই উত্তম।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করার সময় সিজ্‌দায় গিয়ে এই সূরার প্রথম আয়াতের ভিত্তিতে আদেশ দিয়েছিলেন, 'ছুব্‌হানা রাব্বি ইয়াল্ আ'লা' পড়ার জন্য। আর রুকু সিজ্‌দায় গিয়ে সূরা ওয়াকিয়ার শেষ আয়াতের ভিত্তিতে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ছুব্‌হানা রাব্বি ইয়াল্ আ'যিম।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং তিনিই সমস্ত কিছুর ওপরে বিজয়ী। যাবতীয় বস্তুর ওপরে তিনি শক্তিশালী এবং সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। এ জন্য আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে মানব মন্ডলীকে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের আপন প্রভু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাস্‌বীহ্ করে।

কেন রাব্বুল আলামীনের তাস্‌বীহ্ করতে হবে, তাঁকে সিজ্‌দা দিতে হবে, একমাত্র তাঁরই বিধান অনুসরণ করতে হবে, এ প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। মানুষ অন্ধের মতো কোন শক্তির সামনে মাথানত করবে, তাকে ভয় করবে, তাকে সম্মান-মর্যাদা দেবে, মহান আল্লাহ এটা চাননি। এ জন্য তিনি তাঁর প্রশংসা ও তাঁকে সিজদা করার আদেশ দেয়ার সাথে সাথে কেন এসব করতে হবে, সে কারণগুলোও একে একে ব্যাখ্যা করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, এই জন্য তোমরা আমাকে ভয় করবে, একমাত্র আমাকেই সিজ্‌দা করবে, কেবলমাত্র আমারই ইবাদাত, আরাধনা, গোলামী ও দাসত্ব করবে। আলোচ্য সূরার ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা যার তাস্‌বীহ্ করবে এবং যাকে সিজ্‌দা দেবে, যাঁর আইন-বিধান অনুসরণ করবে, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। শুধু সৃষ্টিই করেননি, সুবিন্যস্ত করে অপূর্ব সুন্দর কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেই তিনি তাঁর সৃষ্টিকে পরিত্যাগ করেননি বা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন-অমনোযোগী হয়ে যাননি।

যে সৃষ্টির যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন, সেখানে তাই দিয়েছেন। প্রতিটি বস্তুর যে ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন, সে বস্তুর মধ্যে তাই দেয়া হয়েছে। জীবন ধারণের জন্য যার যে ক্ষমতা, কৌশল, বুদ্ধি ও জ্ঞান এবং চেতনা প্রয়োজন, তাকে তাই দেয়া হয়েছে। বাঘ এবং সিংহের দিকে লক্ষ্য করে দেখুন, এদের থাবা দেয়া হয়েছে এবং মুখের গঠনাকৃতি এমনভাবে করা হয়েছে, যেন তারা সহজেই শিকার ধরে আহার করতে পারে। এদের মুখের নিচে ও ওপরের দিকে দুটো করে চারটি বড় দাঁত দেয়া হয়েছে। এই দাঁত চারটি তাদের চিবানোর কাজে ব্যবহৃত হয় না। ছোটগুলো ব্যবহার করে এরা চিবিয়ে খায়। তাহলে কেন এই চারটি বড় এবং শক্ত দাঁত দেয়া হলো?

বাঘ এবং সিংহ এমন অনেক পশু ধরে আহার করে, যাদের দেহে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি। বন্য মেষ, গরু, হরিণ, ওয়াইল্ড বিষ্ট, জিরাফ, জেব্রা ইত্যাদি পশু প্রচন্ড শক্তির অধিকারী। বাঘ বা সিংহ সহজে এদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না। এ জন্য এরা এসব পশুর কণ্ঠনালীকে টার্গেট করে কাম্‌ড়ে ধরে। ঐ দাঁত চারটি এরা এমনভাবে বসিয়ে দেয় যে, শিকারের কণ্ঠনালী মুহূর্তে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় এবং ঘাড়ের হাড়ও পৃথক হয়ে যায়। শক্তিশালী বন্য মোষ অত্যন্ত দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়ে। গরু, ছাগল, মেষ, ঘোড়া, জেব্রা ইত্যাদি প্রাণী মাটিতে মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু হাতী বা জিরাফ তা পারে না। এ জন্য জিরাফের গলা লম্বা

করা হয়েছে সে তার গলা বাড়িয়ে দিয়ে গাছের ওপরের পাতা অতি সহজে আহার করে। কিন্তু পানি পান করার জন্য এরা দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে পানি পান করে।

হাতী তার মুখ মাটির সাথে ঠেকিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। শুঁড় দিয়ে মাটি থেকে বা গাছ থেকে খাদ্য জড়িয়ে ধরে মুখে দেয়। শত্রুর আক্রমণ শুঁড় দিয়েই প্রতিহত করে। পানি শুঁড় দিয়ে টেনে নিয়ে কণ্ঠনালীতে ঢেলে দেয়। পাখি তার ডানা দিয়ে উড়বে, এ জন্য পাখির ডানায় যে পালকগুলো দেয়া হয়েছে, তা দেহের পালকের তুলনায় অনেক বড়। বিভিন্ন পশুর লম্বা লেজ এবং সেই লেজের অগ্রভাগে একগুচ্ছ পশম দেয়া হয়েছে, যেন তারা এটা ব্যবহার করে মশা-মাছি তাড়াতে পারে। যেসব এলাকায় প্রচন্ড ঠান্ডা এবং বরফ জমে থাকে, সে এলাকার পশুগুলোর দেহের পশম অত্যন্ত ঘন এবং বড়। এসব পশু যেন ঠান্ডায় কষ্ট না পায় এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিপালক হিসাবে এই ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যে সৃষ্টির যেখানে যা প্রয়োজন, সেখানে তাই দিয়েছেন। অপ্রয়োজনে কাউকে কিছু দেয়া হয়নি বা প্রয়োজন ছিল অথচ তা দেয়া হয়নি, এমনও ঘটেনি। মহান আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে, তাঁকে সিজ্দা করতে হবে, একমাত্র তাঁরই আইন-কানুন অনুসরণ করতে হবে এ জন্য যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্টি সুষমভাবে করেছেন। শুধু তাই নয়, আনুপাতিকহারে সৃষ্টি করেছেন। **আলোচ্য সূরার ৩ নম্বর** আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি আনুপাতিকহারে সৃষ্টি করেছেন এবং সে সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। উদ্ভিদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, এমন কোন একটি উদ্ভিদকেও এককভাবে বছরের পর বছর ধরে বংশ বৃদ্ধি করার সুযোগ দেয়া হয়নি। বিশেষ মৌসুমে এসব উদ্ভিদ বৃদ্ধি লাভ করে আবার এমন মৌসুম শুরু হয়ে যায়, এসব উদ্ভিদ ক্রমশঃ মারা যেতে থাকে। পায়ের নিচের দুর্বা ঘাস এবং অন্যান্য লতা-গুল্ম বিশেষ মৌসুমে বৃদ্ধি লাভ করে। আবার এমন এক মৌসুম চলে আসে, এসব ঘাস এবং লতা-গুল্ম মাটির সাথে মিশে যায়। এসব উদ্ভিদকে আল্লাহ তা'য়ালা যদি এককভাবে বৃদ্ধি লাভের সুযোগ দিতেন, তাহলে অন্যান্য উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্থ হতো।

বনের হরিণকে আল্লাহ এককভাবে বংশ বৃদ্ধি করে টিকে থাকার সুযোগ দিলে অন্যান্য পশুর জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হতো। এ জন্য এদের পেছনে বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী রয়েছে, যারা এদেরকে শিকার করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবে। বাঘ, সিংহ, জলহস্তী এবং বিড়ালের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, এসব প্রাণীর পুরুষ জাতি নিজেদের স্বজাতীয় শাবকদেরকে সহ্য করতে পারে না। স্বজাতীয় শাবকগুলোকে এরা নিজেরাই হত্যা করে। শাবক কুমিরগুলোকে বড় কুমিরগুলো হত্যা করে। এক পাখির বাচ্চাকে অন্য পাখি ধরে খায়। এ্যান্টারটিকায় বরফের সাম্রাজ্য। সেখানে অসংখ্য পাখি রয়েছে এবং তারা ক্রমাগত বংশ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। এসব পাখিকে ধরে খাবার জন্য বাজ পাখি এবং সাদা শৃগাল রয়েছে। এভাবে প্রতিটি প্রাণীকে একটি বিশেষ সীমার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। এভাবে তিনি অনুপাত রক্ষা করে যাচ্ছেন তাঁর সৃষ্টিতে।

এই মহাবিশ্বের যেখানে যা সাজে তা দিয়েই সাজানো হয়েছে। মানুষ পৃথিবীর ভারসাম্য আনতে গিয়ে সমপরিমাণ বিশৃঙ্খলাই নিয়ে আসে। বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, সেই সাথে মানুষ নিজেদের বিপর্যয় ডেকে আনে। এমনি একটি বিপর্যয় ডেকে এনেছিল ইউরোপ ত্যাগী অস্ট্রেলিয়ায় নতুন বসতী স্থাপনকারীগণ। তারা যে এলাকায় বসতী স্থাপন করেছিল সেখানে ডিঙ্গো নামক এক ধরনের বন্য শুকর ব্যতীত অন্য কোন প্রজাতির স্তন্যপায়ী জানোয়ার ছিল না। নতুন বসতী স্থাপনকারী দল মনে করলো, এই এলাকায় অন্য প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী

সৃষ্টি করতে স্বয়ং স্রষ্টা ভুলে গেছেন। সুতরাং স্রষ্টার ভুল সংশোধনের জন্য তারা প্রচেষ্টা গ্রহণ করলো। ১৮৫৯ সালে থমাস অষ্টিন নামক এক ব্যক্তি ইউরোপ থেকে ১২ জোড়া খরগোস এনে সেখানের পাহাড়ী এলাকায় ছেড়ে দিল। সেখানের পরিবেশ এমন ছিল যে, অন্য কোন প্রাণী খরগোসদের ধরে খেয়ে এদের বংশবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

ফলে অতি অল্প দিনেই খরগোস এমনভাবে বংশবৃদ্ধি করে চললো, যে ঘাস আহার করে অস্ট্রেলিয়ার মেষপাল জীবন ধারণ করতো, সেসব ঘাস খরগোস খেয়ে নিঃশেষ করে দিল। এর ফলাফল হলো অত্যন্ত মারাত্মক। অত্যন্ত লাভজনক অস্ট্রেলিয়ার মেষভিত্তিক অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়লো। সরকার সচেতন হয়ে উঠলো এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে খরগোস দলকে একটি বিশেষ স্থানে আবদ্ধ রাখার জন্য ৭০০০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বেষ্টনি নির্মাণ করা হলো শুধু কুইন্স ল্যান্ডেই। সরকারের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল খরগোস বাহিনী। এরপর সরকার খরগোস নিধন কর্মসূচী গ্রহণ করলো। সরকার পুরস্কার ঘোষণা করলো, ঘরগোস নিধন করতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে। তবুও তারা চরমভাবে ব্যর্থ হলো। বিশাল এলাকা ঘাসশূণ্য মরুভূমিতে পরিণত হলো এবং মেষশিল্প চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ্ হলো। সরকার বিপুল আয় থেকে বঞ্চিত হলো। এরপর তারা মিক্সোমেটায়িস নামক এক ধরনের জীবাণু ছড়িয়ে দিয়ে খরগোসদের মধ্যে সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করার চেষ্টা করলো।

খরগোসের মড়ক শুরু হলো অপরদিকে এই ব্যবস্থাও আরেকটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি করলো। দীর্ঘদিন ধরে সে দেশের মানুষ খরগোসের গোস্তে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল বিধায় বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী খাদ্য সমস্যার সম্মুখিন হলো। হঠাৎ করে খরগোসের গোস্ত সরবরাহের বিপর্যয় অবিশ্বাস্যরকম হতাশা ও আর্থিক ব্যয়ভার বৃদ্ধি করে দিল জনজীবনে। বেকার হয়ে পড়লো এক বিপুল কর্মজীবি জনগোষ্ঠী। স্রষ্টার ভুল (!) সংশোধন করতে গিয়ে এভাবেই চরম শিক্ষা লাভ করেছিল অস্ট্রেলিয়ার জনগণ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাবিশ্বের যেখানে যে প্রাণী, উদ্ভিদ, পরিবেশ, আবহাওয়া প্রয়োজন, সেখানে তাই দিয়েছেন। মানুষ এসবের পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে নিজেরাই নতুন নতুন সমস্যা ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে।

শুধু তাই নয়, প্রতিটি সৃষ্টিকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশল, দৈহিক শক্তিও তিনি দিয়েছেন। একটি পিঁপড়ার যতটুকু শক্তি থাকলে সে পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারবে, তাকে ততটুকুই দেয়া হয়েছে। বাঘ, সিংহ এবং বিড়ালের মধ্যে যেগুলো স্ত্রীজাতি, এদের প্রসবের সময় আগত হলে এরা এমন নিভৃত স্থান নির্বাচন করে, যেখানে তার শাবক নিরাপদ থাকবে। এমনকি যে স্থানে পুরুষ বাঘ, সিংহ এবং বিড়াল বিচরণ করে না, সে এলাকায় তারা চলে যায়। কারণ তারা জানে, তাদের স্বজাতীয় পুরুষগুলো তাদের শাবকদেরকে সহ্য করতে পারবে না, হত্যা করবে। এ জন্য তারা নিভৃত স্থানে চলে যায়। এরা এদের বাচ্চাগুলোকে বেশী দিন একস্থানেও রাখে না। মুখ দিয়ে বাচ্চাগুলোকে আলতোভাবে কামড়ে ধরে বার বার স্থান পরিবর্তন করে, যেন শাবকগুলো নিরাপদ থাকে। এই বুদ্ধি ও কৌশল তাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন।

কাঠ বেড়ালী জাতীয় প্রাণীগুলোর প্রসবের সময় ঘনিয়ে এলে এরা বেশ ব্যবধানে কয়েকটি মোটা গাছে মাটি থেকে অনেক ওপরে কোঠর তৈরী করে। এর মধ্যে কোন একটি কোঠরে বাচ্চা প্রসব করে। সাপকে এই চেতনা দেয়া হয়েছে যে, গাছের কোঠরে তাদের খাদ্য রয়েছে। তারা বিভিন্ন গাছের কোঠরে কোঠরে খাদ্যের সন্ধান করতে থাকে। মা ও বাবা কাঠ বেড়ালী

একত্রে খাদ্যের সন্ধানে বের হয় না। একজন খাদ্যের সন্ধানে বের হলে আরেকজন বাচ্চা যে কোঠরে রয়েছে, তার পাশেই সতর্ক দৃষ্টিতে বসে থাকে। সাপকে চেতনা দেয়া হয়েছে গাছের কোঠরে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং কাঠ বেড়ালীকে চেতনা দেয়া হয়েছে, তোমার বাচ্চাকে সাপ খেয়ে ফেলবে, অতএব সতর্ক হও, দু'জন একত্রে কোথাও যেও না, একজন কোঠরের কাছে থেকে প্রহরা দাও। কাঠ বেড়ালী যখনই সাপের অস্তিত্ব অনুভব করে, তখনই তারা কোঠরে প্রবেশ করে একটি একটি করে বাচ্চা বের করে এনে পূর্ব থেকে তৈরী করা অন্য গাছের কোঠরে নিয়ে যায়। এভাবে তাকে বুদ্ধি ও কৌশল দেয়া হয়েছে।

আফ্রিকার হিংস্র কুকুরগুলো দৈহিক আকারে ছোট হয়। এদের একমাত্র খাদ্য টাট্‌কা গোস্ত। দু'চারটি কুকুর একত্রিত হয়ে বড় ধরনের কোন প্রাণীকে হত্যা করে তার গোস্ত এরা খেতে পারবে না। এ জন্য এদেরকে এই বুদ্ধি দেয়া হয়েছে যে, তোমরা অনেকগুলো একসাথে দলবদ্ধভাবে শিকারে বেরিয়ে পড়ো এবং এরা তাই করে। দৈহিক আকারে ছোট্ট এই কুকুর বাহিনী ওদের তুলনায় বিশাল মোষ, গরু, হরিণদলের কোন একটিকে টার্গেট করে তার পেছনে ছুটতে থাকে। প্রথমে শিকারকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে তারপর তাকে ঘিরে ধরে। এরপর প্রথমে শিকারের দেহে এমন স্থানে আক্রমণ করে, যেখানে আক্রমণ করলে শিকার অতি সহজে শক্তিহীন হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। একদল কুকুর শিকারের সামনের দিকে এমন ভঙ্গি করতে থাকে, শিকার যেন বুঝতে পারে তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং সে সামনের দিকেই দৃষ্টি রাখে। কিন্তু তারা আসলে আক্রমণ করে পেছনের দিকে। আরেকটি দল চুপিসারে পেছনের দিক থেকে এসে পশুটির স্তন অথবা অন্ডকোষ কাম্‌ড়ে বিচ্ছিন্ন করে, পশুটি মাটিতে পড়ে যায়। তখন সবাই মুহূর্তে পেটের দিকটা খেয়ে শেষ করে ফেলে। এই কৌশল প্রয়োগ করে তারা বিশাল মোষ ধরে খায়।

কুমিরের মুখের গঠনাকৃতি এমন যে, তারা খাদ্য চিবিয়ে বা ছিড়ে খেতে পারে না। এরা ছোট ছোট শিকার গিলে খায়। নদীর ভেতর দিয়ে যখন বন্য মোষ, গরু, হরিণ এপার থেকে ওপারে যেতে থাকে, তখন এরা কাম্‌ড়ে ধরে পশুটিকে কৌশলে ডুবিয়ে মারে। তারপর পশুটির দেহের কোন স্থান কাম্‌ড়ে ধরে নিজের দেহকে প্রচন্ড বেগে ঘুরাতে থাকে। এই কৌশলে শিকারের দেহ থেকে গোস্ত বিচ্ছিন্ন করে গিলে খায়। জলহস্তীর দেহে প্রচুর আবর্জনা জমে এবং এই আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য এরা নদীতে এমন স্থানে যায়, যেখানে প্রচুর মাছ রয়েছে। এসব মাছের ভেতরে গিয়ে এরা মুখ হা করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাছ এদের দেহের আবর্জনা খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়। এমনকি মুখের ভেতরে মাছ প্রবেশ করে জিহ্বা ও দাঁতের ময়লাও খেয়ে পরিষ্কার করে দেয়। নিজের দেহের আবর্জনা পরিষ্কার করার এই বুদ্ধি ও কৌশল তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

ইঁদুর যখন বাচ্চা প্রসব করে তখন এরা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। নিজের মুখটা প্রসব দ্বারের কাছাকাছি নিয়ে যায়। একটি একটি করে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হতে থাকে। ইঁদুর মুখ দিয়ে প্রতিটি বাচ্চাকে নার্সিং করে। এভাবে বাচ্চার শরীর থেকে গর্ভের আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয় ইঁদুর। এই কৌশল ও বুদ্ধি ইঁদুরকে দিয়েছেন মহান আল্লাহ আল্লাহ তা'য়ালা। মুরগী বা যে কোন পাখি ডিম দেয়ার সময় তার দেহের পেছনের অংশ ক্রমশ নিচু করে দেয়। কারণ সে জানে, তার ডিম বেশি উঁচু থেকে পড়লে ভেঙ্গে যেতে পারে। যে উদ্ভিদের মূল কান্ড অত্যন্ত কোমল, তাকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তোমরা অন্য শক্ত উদ্ভিদকে আঁক্‌ড়ে ধরে নিজেকে বিস্তার করবে। এভাবে বুদ্ধি, কৌশল, চেতনা প্রতিটি বস্তু, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে দেয়া হয়েছে।

মানুষের মধ্যেও কোনটি ভালো এবং কোনটি খারাপ, কোনটি কল্যাণকর এবং কোনটি অকল্যাণকর, এই চেতনা দান করা হয়েছে সেই সাথে পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালনার জন্য দেয়া হয়েছে কোরআনুল কারীম।

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'তিনিই প্রাণীসমূহকে জীবন ধারণের শিক্ষা দিয়েছেন' শিরোণাম এবং 'সৃষ্টিসমূহের প্রতি আল্লাহর হোদয়াত' শিরোণাম এবং সূরা আবাসার ১৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা পড়ুন।)

পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য প্রয়োজন নির্মল বায়ুর। পানির অপর নাম যেমন জীবন, তেমনি উদ্ভিদের আরেক নামও জীবন। এই উদ্ভিদ না থাকলে মানুষসহ কোন প্রাণীর পক্ষে জীবন ধারণ করা সম্ভব ছিল না। রব্ব-এর প্রশংসা করতে হবে, তাঁকে সিজ্দা দিতে হবে, একমাত্র তাঁরই গোলামী করতে হবে এবং তাঁরই দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করতে হবে এ জন্য যে, তিনি সমস্ত কিছুই সুন্দর কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিতে সমতা বিধান করছেন। প্রতিটি সৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে বুদ্ধি ও কৌশল এবং চেতনা দিয়েছেন। সেই সাথে সৃষ্টিসমূহের টিকে থাকার ব্যবস্থাও করেছেন। **আলোচ্য সূরার ৪ ও ৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমি যমীন থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি এবং এক সময় এসব উদ্ভিদকে আবর্জনায় পরিণত করি।**

এই উদ্ভিদ কিভাবে বংশ বিস্তার করে এবং তা কিভাবে প্রাণীসমূহকে সহযোগিতা করছে দেখুন। উদ্ভিদ বংশ বিস্তারের জন্য মৌলিক সহযোগিতা লাভ করে পানি, বাতাস, কীট-পতঙ্গ ও পাখির কাছ থেকে। ফুলের পরিণত পুংকেশর অগণিত পরাগরেণুকে উপযুক্ত করে রাখে। এই পরাগরেণু শুধুমাত্র সঠিকভাবে গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হলেই নিষিক্তকরণ সম্পন্ন হতে পারে এবং নিশ্চিত হতে পারে ভবিষ্যতের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা। এর জন্য প্রয়োজন অনেক কিছুর সমন্বয়ের। পুংকেশরের অগণিত পরিণত পরাগরেণু অবাধভাবে সৃষ্ট হয়ে স্বাধীনভাবে বাতাসে প্রবেশ করে। এই অগণিত পরাগরেণুর মধ্য থেকে মাত্র একটি অথবা দু'টি ফুলের গর্ভকেশরে প্রতিস্থাপিত হয়ে নিষিক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অবশিষ্টগুলো বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ অগণিত পরাগরেণু সৃষ্টি না করলে এর ভেতর থেকে মাত্র একটি নিষিক্ত হওয়ার সুগোগ লাভ করতো না।

যখন পরাগরেণু উপযুক্ত হয়ে ওঠে ঠিক সেই সময়ে গর্ভকেশর তার দেহ থেকে আঠালো পদার্থ বের করে তার অঙ্গটিকে আঠালো করতে হবে, এটা হলো প্রথম শর্ত। এখন প্রয়োজন বাতাসের। কারণ বাতাসই আশেপাশের ফুলে উড়ন্ত পরাগকে পৌঁছে দেবে। এই বাতাস সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন সূর্যকে অধিক তেজদীপ্ত করা। সূর্য অধিক তাপ বিকিরণ করতে না পারলে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বায়ু শূন্যতার সৃষ্টি হবে না। আর বায়ু শূন্যতার সৃষ্টি না হলে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহও হবে না। এসব কিছুর ব্যবস্থা করলেন মহান আল্লাহ। সূর্যকে অধিক তাপ বিকিরণ করার ক্ষমতা দেয়া হলো, ফলে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে তাপের কারণে বায়ু শূন্যতা দেখা দিল ফলে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলো।

সমুদ্রে সৃষ্টি হলো নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপটি তার প্রান্তিক প্রভাব মন্ডলে যে ধীরগতিতে বায়ুর প্রবাহ সৃষ্টি করলো, সে প্রবাহটি মানুষের জ্ঞানের অগোচরে পৃথিবী পৃষ্ঠের যাবতীয় ফুলের বহনযোগ্য পরাগরেণু উড়িয়ে নিয়ে অন্য ফুলের গর্ভকেশরে স্পর্শ ঘটায়। এভাবে স্পর্শ না ঘটালে অগণিত উদ্ভিদ বঞ্চিত থেকে যেতো গর্ভাধান থেকে আর গর্ভাধান না হলে জন্মগ্রহণ

করতো না অগণিত উদ্ভিদ। পৃথিবীর খাদ্য ভান্ডার এই উদ্ভিদের ফলন থেকে বঞ্চিত হলে প্রাণী জগতের খাদ্য মৌজুদে শূন্যতা দেখা দিতো। পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়তো। ফলে পৃথিবীতে প্রাণী টিকে থাকা এক দুরহ ব্যাপারে পরিণত হতো। যে নিম্নচাপের কথা শুনলে মানুষ ভয়ে আঁত্কে ওঠে, সেই নিম্নচাপ এভাবেই পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণী বসবাসের উপযোগী করে রেখেছে।

কার্বনডাই অক্সাইড মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুদুত। বর্তমান পৃথিবীতে বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড ও অন্যান্য দূষণ সম্পর্কে সচেতন মানুষ চরমভাবে শঙ্কিত। একদিকে চলছে বৃক্ষ নিধন অপরদিকে মরু প্রকোপের মাত্রা বৃদ্ধি বর্তমান পৃথিবীর জন্য চরম হুমকি সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে যদি বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদ-নদী না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে অক্সিজেনের যে বিপুল ঘাটতি দেখা দিতো এবং এর বিপরীতে কার্বনডাই অক্সাইড-এর যে আধিক্য দেখা দিতো তাতে প্রাণীজগতের ওপরে নেমে আসতো মৃত্যুর হিমশীতলতা। নাইট্রোজেন চক্রের কথা সবারই জানা থাকার কথা। প্রাণীজগৎ টিকে থাকার পূর্বশর্ত হলো উদ্ভিদের সক্রিয় উপস্থিতি। পানির পরই উদ্ভিদের টিকে থাকার জন্য সর্বপ্রধান উপকরণ হলো নাইট্রোজেন। প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য আমিষ উৎপাদন ও তা দিয়ে উভয়ের দেহকোষকে বৃদ্ধি ও সচল রাখাই হলো নাইট্রোজেনের কাজ। এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদ নিজে গ্রহণ করে ও পরবর্তীতে প্রাণীর শরীরে সরবরাহ করে প্রাণীজগতকে সচল সজীব রাখে।

এই উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন নাইট্রোজেন যৌগ থেকে। এই নাইট্রোজেন যৌগগুলোর অধিকাংশই মাটিতে অবস্থান করে। উদ্ভিদ নিজের প্রয়োজনে মাটি থেকে নাইট্রোজেন শোষণ করে। ২৫০ লক্ষ্যের অধিক প্রজাতির অগণিত উদ্ভিদ মাটি থেকে ক্রমাগত শোষণ করার জন্য যে বিপুল পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগের চাহিদা সৃষ্টি করে থাকে, এর জন্য যদি বার বার সৃষ্টির মাধ্যমে সেই স্বল্পতা পূরণ করে একটি সর্বকালিন নির্দিষ্ট মৌজুদ নিশ্চিত করতে সক্ষম না হতো, তাহলে অনেক পূর্বেই এই পৃথিবী থেকে জীবনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো। একান্ত প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীর রেচন প্রক্রিয়ায় নিষ্কৃত অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ, প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহের শবদেহাবশেষ ইত্যাদি থেকে নাইট্রোজেন ও তার বিভিন্ন যৌগ হিসাবে পুনরায় মাটি এবং বাতাসে ফিরে আসে।

পৃথিবীর বায়ু মন্ডলে প্রায় ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন অবস্থান করতে থাকে। বায়ু মন্ডলের নাইট্রোজেন বিদ্যুৎক্ষারণের ফলে সৃষ্টি করে নাইট্রেট যৌগ এবং এই নাইট্রেট যৌগগুলো বৃষ্টি বর্ষিত হবার সময় বৃষ্টির পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে মাটিতে নেমে আসে। এই মাটির ভেতরে রয়েছে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যারা বাতাস থেকে প্রত্যক্ষভাবে নাইট্রোজেন গ্রহণ ও বিভিন্ন যৌগে পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। মাটি এমন অনেক ধরনের পদার্থ সংরক্ষণ করে, যা মাটির নাইট্রোজেন যৌগ এবং বায়ু মন্ডলের নাইট্রোজেন–যা ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ করে থাকে, এসবকে নানা অবস্থা ও পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভিদের কৈশিক মূলের মাধ্যমে উপযোগী করে তোলে। সামগ্রিকভাবে এই গোটা প্রক্রিয়াটি যা মাটি এবং বায়ু মন্ডলীয় নাইট্রেটকে উদ্ভিদ দেহে প্রেরণ করে, তারপর উদ্ভিদ থেকে প্রাণীদেহে প্রেরণ করে, এর পরবর্তীতে উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পুনরায় মাটি এবং বায়ু মন্ডলে ফিরে এসে একটি স্থির নাইট্রোজেন মৌজুদ নিশ্চিত করে, এই প্রক্রিয়াকেই নাইট্রোজেন চক্র বলে। এই চক্র না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যেতো না।

উদ্ভিদ তার শেকড়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ খনিজ বস্তুসহ খাদ্যরস শোষণ করে পাতায় এবং অন্যান্য সবুজ অংশে পৌঁছে দেয়। সবুজ অংশের ক্লোরোফিল সূর্যের রশ্মির মাধ্যমে কার্বনডাই অক্সাইডকে গ্রহণ করা খাদ্যরসের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ে শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরী করে। এই খাদ্য সমস্ত প্রাণীর জন্য খাদ্যের মূল উৎস। কিভাবে আলোক শক্তি ক্লোরোফিলের মাধ্যমে শোধিত হয়ে রন্ধন প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখে, কিভাবে কার্বনডাই অক্সাইড ও শোষিত জলীয় উপাদান উদ্ভিদের পাতার ক্ষুদ্র কোষে মিলিত হয়ে খাদ্য তৈরী করে, বিজ্ঞান আজ পর্যন্তও এর কোন সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ায় কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করে ও অক্সিজেন গ্রহণ করে। ক্ষতিকর কার্বনডাই অক্সাইড উদ্ভিদের তথা জীবজগতের খাদ্য মৌজুদ করার প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, সে প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় সমপরিমাণ অক্সিজেন–যা জীব ও উদ্ভিদের টিকে থাকার জন্য আরেকটি মৌলিক উপাদান। এমনি এক পরস্পর নির্ভরশীল আবর্তন চক্র জীব ও উদ্ভিদের টিকে থাকার মৌলিক ভিত্তি প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে যাচ্ছে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে সঠিক অনুপাতে ও মাত্রায়, এর মধ্যে সামান্য কম বেশি হলেই পৃথিবী থেকে জীবনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো।

আবার এই উদ্ভিদকে মহান আল্লাহ বিশেষ মৌসুমে ধ্বংস করে আবর্জনায় পরিণত করেন। পক্ষান্তরে উদ্ভিদকে ধ্বংসের এই প্রক্রিয়াটিও একই সাথে ঘটে না। পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদকে একই সাথে একই মৌসুমে ধ্বংস করে আবর্জনায় পরিণত করেন না। একই সাথে, একই মৌসুমে যদি তা করা হতো, তাহলে মুহূর্তে প্রাণীজগৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এখানেও একটি বিশেষ চক্র ক্রিয়াশীল রয়েছে। একটি প্রজাতিকে ধ্বংস করছেন, অপরদিকে আরেকটি প্রজাতি জন্মগ্রহণ করছে। একটি প্রজাতি ক্রমশঃ মৃত্যুবরণ করছে, আরেকটি প্রজাতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর পরিবেশগত ভারসাম্য ঠিক রাখা হচ্ছে। প্রাণী জগতে যেন অক্সিজেনের অভাব না ঘটে এবং পৃথিবীতে কার্বনডাই অক্সাইডের আধিক্য দেখা না দেয়, এ জন্য উদ্ভিদকে আবর্জনায় পরিণত করার কাজটিও একটি চক্রের মাধ্যমে করা হচ্ছে। বিশেষ মৌসুমে উদ্ভিদকে আবর্জনায় পরিণত করা হচ্ছে, এই আবর্জনার ভেতর থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছে এমন গ্যাস, যা মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আবর্জনাই আবার সার হিসাবে যমীনের উর্বরতা বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে আরেকটি বিষয়ের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেটা হলো, মানুষ এই পৃথিবীর চাকচিক্য দেখে এই বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে পারে যে, এই পৃথিবী বোধহয় চিরস্থায়ী। এর রূপ কোনদিনই পরিবর্তন ঘটবে না। প্রকৃতপক্ষে এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। কারণ মানুষের চোখের সামনেই সে দেখছে, বসন্তের আগমনে পৃথিবীর উদ্ভিদরাজি সবুজ-শ্যামল আভায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার শীতের আগমনে উদ্ভিদের সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশেষ হয়ে যায়। মানুষের অবস্থাও ঠিক তেমনি। শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল অতিক্রম করে এক সময় সে জরাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তারপর মৃত্যুর পরের জগতের দিকে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, পা বাড়িয়ে দেয়। এই পৃথিবীর চাকচিক্যই একদিন ধূলি মলিন হয়ে যাবে। সমস্ত কিছুই ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে পরকালীন জগৎ এবং সেটা হবে অনন্তকালের জন্য। সেই অনন্ত জীবনের সুখের জন্য বর্তমান পৃথিবীর জীবনকে মহাসুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

আলোচ্য সূরার ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতে রাসূলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আপনার ওপরে যে ওহী অবতীর্ণ করা হচ্ছে, তা মুখস্থ করার ব্যাপারে আপনি অস্থিরতা প্রকাশ করবেন না। ওহী

আপনার মানসপটে অঙ্কিত করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। ওহীর এই মণিমুক্তাগুলো আপনার ভেতরে একটির পর একটি সজ্জিত করার দায়িত্ব আমার। আপনার ভেতরে ওহীর প্রতিটি শব্দ স্মরণ রাখা ও সংরক্ষিত রাখা আপনার নিজস্ব কোন যোগ্যতার ব্যাপার নয়। এটা একান্তই আপনার প্রতি আমার অনুগ্রহ। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, এই সূরা যখন অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন পর্যন্তও আল্লাহর নবী ওহী ধারণে অভ্যস্থ হননি। এ জন্য তিনি ওহী অবতীর্ণের সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের সাথে সাথে অতি দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন–যেন কোন একটি শব্দও তিনি ভুলে না যান।

রাসূল অতি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করছেন ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায়, এতে তাঁর মানসিক অস্থিরতার প্রকাশ ঘটছে, তিনি কষ্ট অনুভব করছেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর এই সামান্য কষ্টটুকুও সহ্য করতে পারলেন না। সাথে সাথে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আপনি অস্থির হবেন না, আপনি নীরবে শুনতে থাকুন–আপনার হৃদয়ে ওহী অঙ্কন করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, কোরআনের কোন একটি শব্দ ভুলে যেতে পারেন, এ জন্য আল্লাহর রাসূল বার বার তা আবৃত্তি করছিলেন। আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত জিবারঈল আলাইহিস্ সালাম ওহী শুনিয়ে শেষ করার পূর্বেই আল্লাহর রাসূল ওহীর প্রথমাংশ আবৃত্তি করতে শুরু করতেন। রাসূলের এভাবে আবৃত্তি করার উদ্দেশ্য ছিল, যেন তিনি ভুলে না যান। রাসূলের এই ব্যস্ততা দেখে মহান আল্লাহ তাঁকে জানালেন–

وَلَاتَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ....اِلٰى اٰخِرِالْاٰيَةِ

আর দেখো, কোরআন পড়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করো না যতক্ষণ না তোমার প্রতি ওহী পূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়া করতে থাকো, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বা-হা-১১৪)

সূরা আল কিয়ামাহ্-এর ১৬ আয়াত থেকে ১৯ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে, ওহী দ্রুত মুখস্থ করার ব্যাপারে আপনি আপনার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। ওহী মুখস্থ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। আপনার ওপরে যখন ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন আপনি তা নীরবে শুনতে থাকুন। শুধু ওহী মুখস্থ করানোর দায়িত্বই নয়–যখন যে ওহী আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।

এসব আয়াতে আল্লাহর রাসূলের অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদার দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রাসূল পবিত্র কোরআন স্মরণে গেঁথে নেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্র জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন করছিলেন, রাসূলকে সামান্য এই কষ্টটুকুও আল্লাহ করতে দেননি। তাঁকে জানিয়ে দিলেন, হে রাসূল! আপনার কোন কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যখন আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, আপনি মনোযোগ সহকারে তা শুধু শুনতে থাকুন। আপনার মানসপটে ওহীর প্রতিটি শব্দ একটির পরে আরেকটি গেঁথে দেয়ার দায়িত্ব আমার। শুধু তাই নয়, যে ওহী আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হচ্ছে, তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্যও আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো। সুতরাং যে রাসূলকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত করুণা আর মমতা দিয়ে সিক্ত করছেন, সেই রাসূলকে তোমরা কিভাবে মিথ্যাবাদী বলছো? সেই রাসূলের আহ্বানকে কিভাবে তোমরা উপেক্ষা করছো? সেই রাসূলের বলা কথাকে তোমরা কোন বিবেচনায় অস্বীকার করছো?

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে নিশ্চয়তা দিলেন, আপনি কখনো স্থায়ীভাবে আপনার ওপরে অবতীর্ণ করা কোরআন ভুলে যাবেন না। আপনি যেন তা ভুলে না যান, সে দায়িত্ব আমি আল্লাহ গ্রহণ করলাম। রাসূলের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালা এভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বেও রাখেনি। মানুষের জীবনে যা ঘটা স্বাভাবিক, রাসূলের ক্ষেত্রেও গোনাহ্ ব্যতীত স্বাভাবিক দুর্বলতা প্রকাশ করিয়ে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূলও মানুষ এবং মানব জাতির ভেতর থেকে রাসূল নির্বাচিত করে মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিই করা হয়েছে। বোখারী শরীফের একটি বর্ণনায় দেখা যায়, একদিন ফজরের নামাজ আদায়কালে আল্লাহর রাসূল কোরআনের একটি আয়াত বাদ দিয়েই তার পরবর্তী আয়াত পড়তে থাকলেন এবং এভাবে নামাজ শেষ করলেন। সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কায়াব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ আয়াতটি কি মনসুখ হয়ে গিয়েছে? রাসূল জবাবে বললেন, মনসুখ হয়নি–বরং আয়াতটি আমার তখন স্মরণ হয়নি।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে এ কথা জানিয়ে দিলেন, ওহী মুখস্থ করার ব্যাপারে আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন, তা আমার অজানা নয়। কারণ আমার কাছে অপ্রকাশিত কিছুই থাকে না। প্রকাশ্য বিষয়ও যেমন আমার গোচরে রয়েছে, তেমনি অপ্রকাশিত গোপন বিষয়সমূহও আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। অতএব আপনি ব্যস্ততা পরিহার করে একাগ্রচিত্তে ওহী শুনতে থাকুন। আপনি এই ওহী কখনোই ভুলবেন না।

নবুওয়াত-রেসালাতের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত এতটা অস্থির থাকতেন যে, মানুষকে কিভাবে সীরাতুল মুস্তাকিমের পথে আনবেন, এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন। তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, সমস্ত মানুষ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আল্লাহর জাহান্নামের দিকে ছুটে যাচ্ছে আর তিনি এসব মানুষের পেছন থেকে টেনে ধরছেন, যেন তারা আগুনে পড়ে না যায়। নবী-রাসূলদের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ই তাদেরকে প্রদর্শন করা হয়। জান্নাত ও জাহান্নাম তাঁদেরকে দেখানো হয়েছে। সুতরাং তিনি দেখছেন, সমস্ত মানুষ কিভাবে দ্রুত গতিতে জাহান্নামের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে আল্লাহর রাসূল ব্যাকুল হয়ে পড়বেন এটাই স্বাভাবিক।

মানুষগুলোকে তিনি জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, আর সেই মানুষগুলোই তাঁকে চরমভাবে নির্যাতিত করছে তবুও তিনি তাঁর চেষ্টা থেকে বিরত হচ্ছেন না। যে মানুষগুলো তাঁকে আঘাত করছে, তিনি সেই মানুষগুলোর নির্মম পরিণতি ভেবে পেরেশান হয়ে পড়ছেন। ভাবছেন, তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোথাও কি কোন ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে, যার কারণে এই মানুষগুলো সীরাতুল মুস্তাকিমের পথে আসছে না! অথবা কোন পদ্ধতিতে আহ্বান জানালে এই মানুষগুলো ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের এই পেরেশানীও সহ্য করতে পারলেন না।

আলোচ্য সূরার ৮ থেকে ১৩ নম্বর আয়াতে রাসূলকে জানিয়ে দিলেন, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করা সম্পর্কে পেরেশান হয়ে পড়েছেন! না, আপনি পেরেশান হবেন না। আপনাকে আমি দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি জানিয়ে দিচ্ছি। আপনার প্রতি আমার পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা হচ্ছে, তা আপনি মানুষদেরকে জানিয়ে দিন। আপনি তাদেরকে

আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকুন। আপনি তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিন, একমাত্র আল্লাহর গোলামী না করলে, তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত না করলে এই পৃথিবীতেও যেমন অশান্তির আগুনে জ্বলতে হবে, তেমনি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

আপনার এই সতর্কবাণী শুনে যার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় রয়েছে, সে অবশ্যই আপনার আহ্বানে সাড়া দেবে। সীরাতুল মুস্তাকিমের পথে ফিরে আসবে। আমার দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে। আর যারা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত, তারা যদি তাতেই নিমজ্জিত থাকতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদেরকে সেই অবস্থাতেই ছেড়ে দিন। আপনি তাদেরকে সহজ সরল পথপ্রদর্শন করেছেন, কিন্তু তারা সে পথ গ্রহণ করেনি। সুতরাং আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন যদি তারা আপাদ-মস্তক নোংরামিতে নিমজ্জিত থাকতে পছন্দ করে, তাদেরকে থাকতে দিন। আর এই অবস্থায় তারাই থাকতে পছন্দ করে, যারা সীমালংঘনকারী পাপী। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে এরা অবশ্যই সেই ভয়ানক আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা সেই ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি পাবার আশায় মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু মৃত্যু সেখানে কখনো হানা দেবে না। সেই আযাব থেকে তারা মুক্তি পেতে চাইবে, কিন্তু মুক্তি তারা কখনোই লাভ করবে না। জাহান্নামে এই অবস্থা হবে সেই সব লোকদের, পৃথিবীতে যারা ইসলামকে অস্বীকার করেছে, কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে।

দাওয়াতী কাজ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে যে পথপ্রদর্শন করেছেন, দ্বীনি আন্দোলনের সৈনিকদেরকেও সেই একই পথ অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর দেয়া বিধানই মানুষকে শান্তি দিতে পারে, শোষণমুক্ত, সমৃদ্ধিশালী, ভীতিহীন, নিরাপত্তাপূর্ণ, সন্ত্রাসমুক্ত, বিশৃঙ্খলাহীন সমাজ ও রাষ্ট্র উপহার দিতে পারে, এ কথা মানুষকে নিজেদের আচার-আচরণ, ব্যবহার, লেনদেন, চলাফেরা ইত্যাদির মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা দেখবেন, তাঁর বান্দাহ্ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বান্দাহ্র যতটুকু সুযোগ ও যোগ্যতা ছিল, তা সে দাওয়াতী কাজে ব্যয় করেছে, কোন কার্পণ্য করেনি। এরপরে আর তার পরিবারের লোকজন, প্রতিবেশী এবং পরিচিত লোকগুলো তাকে কিয়ামতের ময়দানে দায়ী করতে পারবে না যে, সে আমাদের কাছে ইকামতে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছায়নি।

আলোচ্য সূরার ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করেছে, সফলতা অর্জন করেছে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করেছে। আল্লাহর বিধানের আলোকে যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করেছে।

পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষের কাছে সফলতা ও কল্যাণ লাভ করার মানদন্ড আর ইসলামে কল্যাণ লাভ এবং সফলতা অর্জনের মানদন্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন মানুষ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপত্র লাভ করেছে, বিখ্যাত ব্যক্তি কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়েছে, তাদের হাত থেকে তার সফলতার সনদপত্র ও পুরস্কার গ্রহণ করেছে, প্রচার মাধ্যমে প্রশংসাসহ তার নাম প্রচার করা হয়েছে, সরকারের উচ্চ পদে সমাসীন হয়েছে। বিপুল পরিমাণ অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছে। সুন্দরী স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-পরিজনসহ ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন করছে সুতরাং এই ব্যক্তি তার জীবনে চরম সফলতা অর্জন করেছে। এই ধরনের সফলতা অর্জন করার লক্ষ্যেই বর্তমানে অধিকাংশ মাতা-পিতা তাদের সন্তানদের পেছনে অঢেল অর্থ ব্যয় করছে।

কিন্তু আল্লাহর কোরআন বলছে, ঐ ব্যক্তিই জীবনে সফলতা অর্জন করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর অপছন্দনীয় পথ ও মত থেকে নিজের জীবনকে মুক্ত করেছে। কুফর, শির্ক তথা আল্লাহর বিধানের বিপরীত যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, নৈতিক দর্শন ইত্যাদির মাথায় পদাঘাত করে যে ব্যক্তি আল্লাহর কোরআনের আদর্শ গ্রহণ করেছে, কোরআনের বিধান অনুসরণ করেছে, ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে আন্দোলন করেছে, এই পথে নির্যাতিত হয়েছে, এই পথে অবিচল থাকার জন্য সহায়-সম্পদহারা হয়েছে, চরম দারিদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে, কারাজীবন ভোগ করেছে, জরিমানা দিয়েছে, নাগরিকত্ব হারিয়েছে, নানা ধরনের অপবাদের মুখোমুখি হয়েছে, কোরআনের দৃষ্টিতে এই ব্যক্তিই সফলতা অর্জন করেছে বা কল্যাণ লাভ করেছে।

রাজনৈতিক জীবনে একজন ব্যক্তি যদি কোন উচ্চ পদে আসীন হতে না পারে বা তার রাজনৈতিক দর্শন মানুষ গ্রহণ না করে, তাহলে বলা হয়ে থাকে লোকটি ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজ ও দেশের বুকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন যারা করে, তারা কোন উচ্চ পদে আসীন হবে, নেতৃত্ব তাদেরকে লাভ করতেই হবে, তারা সর্বত্র প্রশংসিত হবে, সম্মান ও মর্যাদার পাত্রে পরিণত হবে এই ধরনের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। অথবা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তারা আন্দোলন করছে, সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই সফলতা নিহিত, বিষয়টি এমনও নয়। তাদের সফলতা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে তাদের কর্মতৎপরতার মধ্যে। তাদের সামর্থ ও যোগ্যতার সবটুকু যদি দ্বীনি আন্দোলনে ব্যয় করা হয়, তাহলে তারা অবশ্যই সফলতা অর্জন করলো। মনে রাখতে হবে, কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যারা করে, তাদের জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছুই নেই। এই আন্দোলনে সময় ব্যয় করার মধ্য দিয়ে যদি কারো কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে বার্ধক্যের জরা তাকে পেয়ে বসে এবং মৃত্যুবরণ করে, তবুও সে সফল হলো আর যদি শাহাদাত বরণ করে, তবুও সে সফল হলো। এসব লোকদের জীবনে ব্যর্থতা কোনই আঁচড় কাট্‌তে পারে না।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সাফল্য ও কল্যাণ শব্দটি আল্লাহর কোরআনে শুধু বৈষয়িক কল্যাণের সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ এমন চিরস্থায়ী ও চিরন্তন কল্যাণ ও সাফল্য, যার মধ্যে ক্ষতির কোন কল্পনাও করা যায় না। পৃথিবীর জীবনে এই সাফল্যের কোন প্রকাশ ঘটতেই হবে, বিষয়টি এমন নয়। এই সফলতা ও কল্যাণ লাভের অর্থ হলো, পরকালের সেই অনন্ত অসীম জীবনে পরম সুখ-শান্তি লাভ করা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলাম বিরোধী সীমালংঘনকারী লোকদেরকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করেন না। বরং তাদেরকে আত্মশুদ্ধি করার জন্য, সংশোধন হবার জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ-অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যদি এই সুযোগ-সুবিধাকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে এবং এই সুযোগে অধিক বাড়াবাড়ি করতে থাকে, দ্বীনি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করার লক্ষ্যে নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে আরো সুযোগ করে দেন, বিপুল অর্থ-সম্পদ, নাম-যশ, খ্যাতি এদেরকে দান করেন। যেন তাদের ভেতরে লুকায়িত কুৎসিত চেহারা বাইরের অবয়বে প্রকাশিত হয়। শয়তানি করার যত যোগ্যতা তার ভেতরে রয়েছে, তা যেন তারা বাস্তবে প্রয়োগ করে নিজেরাই নিজেদের কাজের মাধ্যমে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।

সফলতা অর্জন করলো এবং কল্যাণ লাভ করলো সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিজের কণ্ঠনালী থেকে গোলামীর যাবতীয় জিঞ্জির খুলে দূরে নিক্ষেপ করে একমাত্র আল্লাহর গোলাম হয়ে গেল। সে যে আল্লাহর গোলাম হলো তার প্রমাণ কি?

১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, সে আল্লাহর গোলাম হয়েছে তার প্রমাণ হলো, সে ব্যক্তি তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজে আপন প্রভু মহান আল্লাহর দেয়া পথ ও মতের অনুসন্ধান করেছে। সে ব্যক্তি নিজের জীবন পরিচালিত করেছে তাঁর প্রভুর দেয়া বিধান অনুসারে। এভাবে সে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তার রব্ব-এর কথা স্মরণে রেখেছে। সে তার রব-কে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণে রেখেছে, এর প্রমাণ সে দিয়েছে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে। কারণ আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রথম নিদর্শন হলো নামাজ। যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে সে এ কথার প্রমাণ দেয় যে, সে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আর যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না, সে এ কথারই প্রমাণ দেয়, সে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে প্রস্তুত নয়। বরং সে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথ ও মতকেই প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত।

১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা প্রকৃত সফলতা ও কল্যাণের পথ পরিহার করে পৃথিবীর জীবনকেই অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছো। এই পৃথিবীতেই সফলতা অর্জন ও কল্যাণ লাভ করার জন্য তোমাদের যাবতীয় যোগ্যতা ও সামর্থ নিয়োজিত করছো। পৃথিবীতে কোন পদ্ধতিতে এবং কোন পথ অবলম্বন করলে তোমাদের অর্থ-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি হবে, তোমাদের নাম-যশ, খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে, সেই চেষ্টাই তোমরা দিবারাত্রি অনুক্ষণ ব্যস্ত রয়েছো। অথচ পৃথিবীটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী জায়গা। এখানে যা কিছুই করবে, তা নশ্বর-ধ্বংস হয়ে যাবে, এর কোন স্থায়ীত্ব নেই। আর আখিরাতের জীবন হবে চিরস্থায়ী এবং সেই জীবনে সফলতা অর্জন করাই হলো প্রকৃত কল্যাণ লাভ করা। সুতরাং এই কল্যাণ লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো, আমার রাসূল তোমাদের সামনে যে আদর্শ পেশ করছেন, তা অনুসরণ করা। একমাত্র আমার গোলামী, দাসত্ব ও আনুগত্য-উপাসনা করা, আমার বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করা।

১৮ ও ১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কোন পথ ও মত অনুসরণ করলে, কোন আদর্শ অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালিত করলে কল্যাণ লাভ করা যাবে এবং সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড কি, তা যেমন এই কোরআনে বর্ণনা করা হচ্ছে, তেমনি তা ইতিপূর্বে যত কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তাতেও বর্ণনা করা হয়েছিল। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ওপরে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল, সেসব কিতাবেও এই মহাসত্য স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছিল। পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতের জীবনই হলো চিরস্থায়ী, পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর গোলামী করলে, আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করলে, আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন ও কল্যাণ লাভ করা যাবে, কোরআনের এ কথা কোন নতুন বিষয় নয়। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন, তারা সবাই এই একই কথা বলেছেন এবং আল্লাহর গোলামীর দিকেই মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। আখিরাতের জীবনে সফলতা ও কল্যাণ লাভের পথই মানব জাতির সামনে পেশ করে তা অনুসরণ করার দাওয়াত দিয়েছেন।

সূরা আল-গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৮৮

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'গাশিয়াহ্' শব্দটিকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল নবুওয়াত লাভ করার পরে যখন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্ম নিয়োগ করেছিলেন, তখনই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ মক্কী জীবনের প্রাথমিক দিকে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহর রাসূল বাতিল পথ ও মত ত্যাগ করে মক্কার লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, লোকজন তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো। এ সূরা যখন অবতীর্ণ হয় তখন পর্যন্ত ইসলামের বিরোধিতা মৌখিকভাবেই করা হচ্ছিলো। মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে যাচ্ছিলো।

নবুওয়াত লাভ করার পর পরই আল্লাহর রাসূল মানুষের মনে তিনটি বিষয় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন। সে তিনটি বিষয় ছিল তাওহীদ রেসালাত ও আখিরাত। মক্কার লোকগুলো এই তিনটি বিষয় কোনক্রমেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। আখিরাত ভিত্তিক জীবনধারা অনুসরণ করার উদ্দিপনা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই সূরার প্রথমেই এমন এক ভীতিকর অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেন মানুষের মনে সেই ভয়ানক দিনের চিত্র ভেসে ওঠে। প্রথমেই বলা হয়েছে, যে অপ্রতিরোধ্য বিপদ চারদিক থেকে গোটা মহাবিশ্বকে আচ্ছন্ন করবে, সেই দিন সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনা আছে কি?

সেই দিন কতক মানুষ ভয়ে আতঙ্কে এবং বিপদের ভয়ঙ্কর মূর্তি ও বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাদের চেহারা ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাবে। এই লোকগুলো জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং সেখানে তারা অবর্ণনীয় শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আরেক শ্রেণীর লোকদেরকেও সেদিন দেখা যাবে প্রাণ উচ্ছল সজীব। তাদের চেহারায় আত্মতৃপ্তি আর আনন্দের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হবে। এই লোকগুলো হবে আল্লাহর জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন থাকবে। বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে তাদেরকে আপ্যায়ন করা হবে।

কিয়ামতের ময়দানের দুটো দলের বর্ণনা শেষ করেই বলা হয়েছে, তোমরা যারা তাওহীদ ও পরকালের কথা শুনলেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকো, এসব বিষয় এড়িয়ে যাও এবং বিরোধিতা করো, তোমাদের চোখের সামনে দিবারাত্রি প্রতি মুহূর্তে যেসব সাক্ষ্যমূলক ঘটনা ঘটছে এবং রয়েছে, সেদিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না? তোমরা যে বিশাল মরুভূমি বেষ্টিত এলাকায় বসবাস করো, সেখানে তোমাদের জীবন যাত্রা নির্ভর করে একমাত্র উটের ওপরে। এই উট ব্যতীত তোমাদের জীবন সম্পূর্ণ অচল। এই উটের দিকে তোমরা লক্ষ্য করো না? উটগুলো মরুভূমিতে যেন চলতে পারে, দিনের পর দিন পানি পান না করে জীবিত থেকে তোমাদের খেদমত করতে পারে, এসব যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ উটকে দেয়া হয়েছে, এসব দিকে কি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না? এই বিষয়টি চিন্তা করলেই তো তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় তোমাদের প্রভুর কোন শরীক রয়েছে কিনা। তোমাদের রব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যে কোন শরীক নেই, এই উটের গঠনাকৃতিই তো সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তারপর তোমরা যখন এই উটের পিঠে আরোহণ করে দূর থেকে দূরান্তরে গমন করো, তখন তোমাদের মাথার ওপরে ঐ মহাশূন্যে আকাশমন্ডল দেখেও কি তোমাদের চেতনা আসে না, স্রষ্টার কোন শরীক থাকতে পারে না। এরপর তোমরা দেখতে পাও কিভাবে পাহাড়-পর্বত আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এ সম্পর্কে তোমাদের মনে কোন প্রশ্ন জাগে না? তোমরা যার ওপরে সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত বিচরণ করছো, তোমাদের পায়ের নীচের সেই যমীন সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করে দেখো না, কিভাবে আমি তা তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছি? এসব নিদর্শন কি বহু স্রষ্টার সাক্ষ্য বহন করছে না একজন মাত্র স্রষ্টার সাক্ষ্য বহন করছে? জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক প্রয়োগ করে দেখো, এসবের পেছনে বহু স্রষ্টার অস্তিত্ব বর্তমান থাকলে এসব সৃষ্টির মধ্যে অবশ্যই অসামঞ্জস্য দেখতে পেতে। স্রষ্টা একজন বলেই এসবের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান নেই।

এতসব সৃষ্টি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তোমরা দেখছো, কোন মহাশক্তিমান নিরঙ্কুশ প্রচন্ড ক্ষমতাধর বিজ্ঞানী ও সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা ব্যতীত এসব কি সৃষ্টি করা সম্ভব? এ ব্যাপারে তোমাদের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিই সমস্বরে বলে উঠবে, একজন সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসীম বুদ্ধিমত্তা ও প্রচন্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করে এসব সৃষ্টি করেছেন এবং এই সৃষ্টির ব্যাপারে অন্য কেউ অংশীদার নেই। এ কথা যদি তোমাদের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি সাক্ষ্য দেয়, তাহলে সেই স্রষ্টাকে একক রব্ব হিসাবে গ্রহণ করতে তোমাদের অসুবিধা কোথায়? তাঁকে স্রষ্টা বলে স্বীকৃতি দিচ্ছো অথচ তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছো কেন?

তোমাদের বাহন উটকে যিনি মরুভূমিতে চলাচলের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন, আকাশমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনকে বিছানার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন, তিনি কিয়ামত সংঘটিত করে সমস্ত মৃত মানুষদেরকে পুনরায় জীবিত করে তাদের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন না, এ কথা তোমরা কিভাবে কল্পনা করছো? কোন যুক্তিতে তোমরা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করছো? তোমাদের দৃষ্টিতে যা অত্যন্ত কঠিন কাজ, সেই কাজগুলোই যিনি অতি সহজে সম্পাদন করেছেন, আর মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবন দান করা তো অতি সহজ কাজ–এই সহজ কাজ সম্পাদনে তিনি অসমর্থ হবেন, এ কথা তোমরা কোন যুক্তিতে বলছো?

অখন্ডনীয় যুক্তির ভিত্তিতে তাওহীদ ও আখিরাতের বাস্তবতা ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীকে বুঝিয়ে দিয়ে সরাসরি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা যুক্তি প্রমাণে বিশ্বাসী নয়, অগণিত নিদর্শন চোখে দেখেও যারা চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো পথ চলতে আগ্রহী, তারা সত্য গ্রহণ না করলে আপনি তাদের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন না। আপনার দায়িত্ব মহাসত্য তাদের সামনে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে তুলে ধরা। আপনি আপনার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন। আপনি যে সত্য প্রচার করছেন, তা যদি কেউ গ্রহণ না করে, তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কারণ তাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে অবশ্যই উপস্থিত হতেই হবে। তাদের প্রতিটি কর্ম ও কথার হিসাব দিতে হবে এবং সেই হিসাব গ্রহণ করবো স্বয়ং আমি। এখন যারা সত্য অস্বীকার করছে, আজকের অস্বীকৃতিই সেদিন তাদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে।

সূরা গাশিয়া–মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-২৬-রুকু-১

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ

نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا

لَاغِيَةً ۝١١ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣ وَّاَكْوَابٌ

مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝١٥ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦ اَفَلَا

يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١ لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢ اِلَّا مَنْ

تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝٢٣ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝٢٤ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝٢٥

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝٢٦

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) তোমার কাছে কি (অপ্রতিরোধ্য ও চতুর্দিক) আচ্ছন্নকারী (এক বিপদের) কথা পৌঁছেছে? (২) (সে বিপদে) কিছু লোকের চেহারা হবে ভীতিকর, (৩) (হবে) ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। (৪) আগুনে (জ্বলে) এদের চেহারা (সেদিন) ঝল্সে যাবে। (৫) ফুটন্ত পানির (কুয়া) থেকে এদের পানীয় পান করানো হবে। (৬) কাঁটা বিশিষ্ট খড় ছাড়া কোনো খাবারই তাদের জন্য থাকবে না। (৭) এই (খাবার)-টি (যেমন তাকে পুষ্ট করবে না,) তেমনি (তার দ্বারা) তাদের ক্ষুধাও মিটবে না। (৮) (অপরদিকে) কিছু চেহারা থাকবে সজীব, (৯) তারা (সেদিন) তাদের

চেষ্টা-সাধনার জন্যে ভীষণ খুশী হবে। (১০) (তারা থাকবে) আলী শান জান্নাতে, (১১) সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না, (১২) তাতে (থাকবে) প্রবাহমান ঝর্ণাধারা, (১৩) এতে থাকবে সুসজ্জিত উঁচু আসন। (১৪) (পাশে সাজানো থাকবে) নানা ধরনের পানপাত্র, (১৫) (আরাম আয়েশের জন্যে থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ, (১৬) (আরো থাকবে) উৎকৃষ্ট কার্পেটের বিছানা।

(১৭) এরা কি উটনীটির দিকে তাকিয়ে দেখে না-কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে! (১৮) আকাশের দিকে (দেখে না)-কিভাবে তাকে উঁচু করে (ধরে) রাখা হয়েছে! (১৯) পাহাড়গুলোর দিকে (দেখে না)-কিভাবে যমীনের বুকে তাদের পুঁতে রাখা হয়েছে! (২০) (দেখে না) যমীনের দিকে!-কিভাবে একে সমতল করে পেতে রাখা হয়েছে! (২১) তুমি এদের (এই কথাগুলো) স্মরণ করাতে থাকে, (কেননা) তুমি তো শুধু উপদেশ দানকারী মাত্র। (২২) তোমাকে তো এদের ওপর বলপ্রয়োগকারী (কোনো দারোগা) করে পাঠানো হয়নি। (২৩) সে ব্যক্তির কথা আলাদা যে (এই হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং (যে আল্লাহকে) অস্বীকার করবে, (২৪) আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অবশ্যই বড় রকমের শাস্তি দেবেন। (২৫) অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার দিকে। (২৬) অতপর তাদের হিসাব নেবার দায়িত্ব (থাকবে সম্পূর্ণত) আমার ওপর।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

প্রথম আয়াতের বাচন ভঙ্গী এমন যে, এই ভঙ্গীতে কথা বলে শ্রোতার বিবেক বোধ ও সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করা হয়। যেমন হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে কোন ব্যক্তি যদি অন্ধকার রাতে পথ চলতে উদ্যত হয়, তখন তার পরিচিত জনরা তাকে এভাবে সতর্ক করে, 'ঐ পথে এখন গেলে বনের হিংস্র জানোয়ারেরা তোমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে খাবে, এ কথা তোমার জানা আছে কি?' অর্থাৎ পথে মারাত্মক বিপদ ঘটবে, এই চেতনাবোধ তার মধ্যে জাগ্রত করে তাকে যাত্রা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের কথা বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কথার মাধ্যমে সতর্কীকরণ, ভীতি প্রদর্শন ও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। ঠিক তেমনি আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে মানুষের চেতনাবোধকে জাগ্রত করার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়।

চলমান পৃথিবীর এই চাকচিক্য চিরস্থায়ী নয়, একদিন এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। গোটা পৃথিবী এক মহাদুর্যোগে আক্রান্ত হবে। কম্পনের পর কম্পন সৃষ্টি হয়ে সমস্ত কিছু ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। আকাশমন্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। চন্দ্র, সূর্য, তারকা মন্ডলী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে। সাগর-মহাসাগরের তলদেশ ফেটে গিয়ে আগুন নির্গত হতে থাকবে। পাহাড়গুলো মহাশূন্যে উড়তে থাকবে এবং একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটে ধূলি কণায় পরিণত হবে। এই কঠিন বিপদ একদিন চলমান পৃথিবীকে গ্রাস করবে, এ কথা তোমাদের জানা রয়েছে কি?

বর্তমান পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে হাশরের ময়দানে পরিণত করা হবে এবং সেখানে সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, তারপর একদল লোক আপন কর্মের কারণে শাস্তি লাভ করবে এবং আরেক দল লোক নিজেদের কর্মের কারণেই মহাপুরস্কার লাভ করবে। এসব ব্যাপারে তোমরা কি সজাগ রয়েছো? হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন চলতে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানে এলো একজন মহিলা সূরা গাশিয়ার প্রথম আয়াত তেলাওয়াত করছেন। অর্থাৎ 'তোমার কাছে কি অপ্রতিরোধ্য ও

চতুর্দিক আচ্ছন্নকারী এক বিপদের কথা পৌঁছেছে?' রাসূল এই আয়াত শোনার সাথে সাথে বললেন, অবশ্যই আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে।'

২ নম্বর আয়াত থেকে ১৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর বিধানের বিরোধিতাকারী লোকদের এবং আল্লাহর বিধানের অনুগত ও তা প্রতিষ্ঠাকামী লোকদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ামতের ময়দানে সেই মহাবিপদের দিনে মানুষ দুটো দলে বিভক্ত হবে। একটি দল হবে ঐ লোকগুলোর সমন্বয়ে যারা পৃথিবীতে আপন প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান অনুসরণ করেনি বরং যারা অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে এরা শত্রুতা করেছে। এরা যে প্রকৃতই অপরাধী, তা সেদিন এদের চেহারা দেখেই অনুভব করা যাবে। এদের চেহারায় থাকবে ভীতি ও আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট। দৃষ্টির সামনে মহাবিপদ দেখে তারা মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়বে এবং তাদের মানসিক অবস্থার প্রকাশ ঘটবে তাদের চেহারায়।

বিচার পর্ব শেষে এদের ঠিকানা হবে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড জাহান্নামে। আগুনে জ্বলে তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। প্রচন্ড ক্ষুধায় তারা কাতর হয়ে পড়লে তাদেরকে এমন খাদ্য খাওয়ানো হবে, যা গ্রহণ করার পরে আযাবের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এই খাদ্য তাদের কোনই উপকারে আসবে না এবং ক্ষুধারও উপশম হবে না।

অপরদিকে আরেকটি দল থাকবে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর অনুগত গোলাম ছিল, আপন মনিব আল্লাহ তা'য়ালার বিধান এরা অনুসরণ করা ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই কর্তব্য পালনে তারা কোন রকম শিথিলতা প্রদর্শন করেনি। প্রচন্ড নিপীড়ন ও নির্যাতনের মুখেও এরা আল্লাহর বিধান অনুসরণে অটল অবিচল থেকেছে। পৃথিবীতে এরা যে চেষ্টা সাধনা করেছে, তার শুভ ফল তারা সেদিন লাভ করছে, এ জন্য মানসিক দিক দিয়ে তারা পরম প্রশান্তি অনুভব করবে। মনের আনন্দ, উচ্ছ্বাস, স্বস্তি ও প্রশান্তি তাদের মনের ভেতরে লুকায়িত থাকবে না। বাহ্যিক অবয়বে তার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। অকল্পনীয় নেয়ামতে পরিপূর্ণ এবং ভোগ-বিলাসের স্থান জান্নাতে তারা অবস্থান করবে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সূরা নাবার তাফসীর দেখুন)

জান্নাতের পরিবেশ এমনি হবে যে, সেখানে শ্রুতিকটু এবং বিরক্তি উৎপাদনকারী কোন কথা তারা শুনতে পাবে না। এই পৃথিবীতে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের স্বভাব চরিত্র আর পরকালের প্রতি উদাসীন লোকদের স্বভাব চরিত্র, আচার-আচরণ ও ব্যবহারে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। উভয় দলের কথা-বার্তা, চলাফেরা, পোষাক-পরিচ্ছেদ, লেনদেন, রুচি এক ধরনের নয়। কিন্তু পৃথিবীতে যুক্তি সঙ্গত কারণেই আল্লাহর অনুগত উন্নত রুচি ও চরিত্রের অধিকারী লোকগুলোকে পরকালের প্রতি উদাসীন লোকদের সান্নিধ্যে যেতে হয়। কিন্তু ঐ লোকগুলো কথা-বার্তায় এমন শব্দ ব্যবহার করে, এমন রুচির প্রকাশ ঘটায়, এমন ধরনের ভঙ্গি প্রদর্শন করে, যা স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তিকর। আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্গণ যেসব শব্দ, রুচি ও ভঙ্গির সাথে পরিচিত নয়। মনের বিরক্তি মনেই গোপন রেখে তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে তারা বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহর জান্নাত হবে এমনই এক স্থান, যেখানে শ্রুতিকটু কোন বাক্য কেউ শ্রবণ করবে না, অরুচির কোন আচরণও কেউ দেখতে পাবে না। এমন ভঙ্গিতে কেউ কথা বলবে না, যা দেখলে মনে বিরক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এরপর তাওহীদে অবিশ্বাসী লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, তোমরা যারা বিশ্বাস করো যে, সৃষ্টি কাজে স্রষ্টা এক নন-তার অংশীদার রয়েছে এবং কিয়ামত ঘটা অসম্ভব

ব্যাপার। অথচ তোমাদের দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিগুলো তোমাদের বিশ্বাসের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। **১৭ নম্বর আয়াতে উটের** প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কি উটের দিকে তাকিয়ে দেখো না, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তাওহীদ এবং আখিরাতের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে উটের প্রসঙ্গ এ জন্য আলোচনায় আনা হয়েছে যে, কোরআন যাদের সামনে অবতীর্ণ হচ্ছিলো এবং একে যারা অস্বীকার করছিলো, তারা ছিল মক্কার অধিবাসী। উট ছিল তাদের প্রথম ও প্রধান পশু এবং এই উট ব্যতীত তাদের জীবন ছিল একেবারেই অচল। বর্তমানেও আরবের বেদুঈন গোষ্ঠীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুর্গম পথে উটকেই ব্যবহার করা হয়।

মক্কার লোকগুলো উটকে নিজেদের ও মালামাল বহনের প্রধান বাহন হিসাবে ব্যবহার করতো। উটের গোস্ত ও দুধ ছিল তাদের অন্যতম খাদ্য এবং এর পশম দিয়ে তৈরী করা হতো পোষাক আর চামড়া দিয়ে বানানো হতো তাঁবু। মরুভূমিতে তারা এই তাঁবুর নিচেই বসবাস করতো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পশুটির ভেতরে এমন কিছু অন্যন্য গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা অন্য কোন পশুর ভেতরে খুঁজে পাওয়া যায় না। দৈহিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ও বিশালাকৃতির একটি জানোয়ার অথচ স্বভাবের দিক দিয়ে তা অত্যন্ত নম্র। এই পশুটির মতো কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল এবং দুর্যোগ মোকাবেলাকারী পশু আর দ্বিতীয়টি নেই। বিরাজমান পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলায় এদের জুড়ি মেলা ভার। এই পশুটিকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ' কারণ জাহাজ নির্মাণকালে লক্ষ্য রাখা হয়, এটি যেন চলতে গিয়ে সাধারণ সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করে চলার গতি ঠিক রাখে। তেমনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মরুভূমিতে টিকে থাকার ও মরুপথে চলাচল করার যোগ্যতা এবং উপকরণ দিয়েই একে সৃষ্টি করেছেন।

মরু দুর্যোগে এরা যেন দুর্বল হয়ে না পড়ে এবং সহজে বিপদ সঙ্কুল পথ পাড়ি দিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই এদের দেহ নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য জীব-জানোয়ার যেখানে পানি ও খাদ্যের অভাবে বেঘোরে প্রাণ হারায়, উট সেখানে সবল সুস্থ থেকে মানুষকে সেবা দিতে ব্যস্ত। মাথার ওপরে সূর্য প্রখর তাপ বিকিরণ করতে থাকে, পায়ের নীচে আগুনের মতো উত্তপ্ত বালুকা, তবুও এর চলার বিরাম নেই। এর পায়ের গঠন শৈলী এমন, যা অতি সহজে পাহাড়ী বন্ধুর পথ, কর্দমাক্ত পথ ও উত্তপ্ত বালুকাময় পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম। এর দেহের চামরা এমনসব উপকরণ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যা ভেদ করে সহজে এদের দেহের ভেতরটা উত্তপ্ত করতে পারে না।

এই পশুটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এর দেহের ভেতরেই খাদ্য আর পানি মৌজুদ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। উটকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে যারা অনেক দূরের পথ পাড়ি দেয়, তারা যাত্রা শুরু করার বেশ কয়েক দিন পূর্ব থেকেই পশুটিকে প্রচুর খাদ্য আর পানি দেয়। এ সময় উটকে কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না এবং প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করার ফলে উটের দেহে বিপুল পরিমাণ চর্বি মৌজুদ হয়। চর্বির ভারে তার পিঠের কুঁজটি স্ফিত হয়ে ওঠে। কোন কোন্ সময় শুধু এই কুঁজটির ওজনই দাঁড়ায় ১০০ পাউন্ড। মরুভূমির দুর্গম পথ অতিক্রম করার সময় যখন দিনের পর দিন খাদ্য জোটে না, তখন এই পশুটি তার দেহের সঞ্চিত চর্বি ব্যয় করে নিজেকে প্রাণবন্ত ও কর্মোপযোগী রাখে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উটের পেটের ভেতরের দিকের দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো থলি সৃষ্টি করেছেন, যা দেখতে অনেকটা ফ্লাক্সের মতো। এসব ফ্লাক্সে পানি সঞ্চয় করে রাখা যায় এবং পশুটি প্রচুর পানি পান করে এসব স্থানে পানি সঞ্চয় করে রাখে। দুর্গম পথে যেখানে দিনের পর দিন পানির সন্ধান পাওয়া যায় না, সেখানে উট তার সঞ্চিত পানি ব্যবহার করে দেহে পানি সরবরাহ করে দেহকে সচল রাখে। অনন্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই প্রাণীকে যারা নিজেদের প্রধান সম্পদ বলে গণ্য করতো এবং তাদের সামনেই কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো। অথচ তারা তাওহীদ ও পরকালকে অস্বীকার করছিলো। এ জন্যই তাদেরকে তাদেরই প্রধান সম্পদ উটের শারীরিক কাঠামো ও গঠন শৈলীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। যে আল্লাহ্ এভাবে উটকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্ কি মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করে হিসাব গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন না?

এরপর তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের মাথার ওপরে ঐ আকাশ মন্ডলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, স্তম্ভ ব্যতীতই ঐ আকাশকে কিভাবে মহাশূন্যে স্থাপন করা হয়েছে। আকাশ যে কোথায় এবং কতদূরে, কোন মানুষের পক্ষে তার ঠিকানা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়, ঐ আকাশের নিচে অগণিত ছায়াপথ, গ্রহ-উপগ্রহ, নিহারিকাপুঞ্জ, পাথরের সাম্রাজ্য, ব্লাকহোল, নানা ধরনের স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদেরই কল্যাণে। এসব সৃষ্টি কাজে যদি তোমাদের কল্পনা অনুসারে কোন অংশীদারের অস্তিত্ব থাকতো, তাহলে এসবের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে অবশ্যই তোমরা কোন না কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পেতে। শুধু তাই নয়, যিনি ঐ মহাকাশের মতো জটিল কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি কি কিয়ামত ঘটাতে এবং হাশরের ময়দানে মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?

১৮ থেকে ২০ নম্বর আয়াতে আকাশ মন্ডলী, পাহাড়-পর্বত ও যমীনের দিকে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। (এসব আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'তিনিই পৃথিবীর পরিবেশ মানুষের অনুকুল করেছেন' শিরোণাম থেকে 'তিনিই পাহাড়গুলো প্রাচীর ন্যায় গেড়ে দিয়েছেন' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সৃষ্টির এমন সব নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে, যা অনুভব করার সাথে সাথে একজন মানুষের মাথা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বভাবিকভাবেই নত হয়ে আসবে। এই পৃথিবীতে মানুষ যেন বসবাস করতে সক্ষম হয়, এ জন্য পৃথিবীর পরিবেশ প্রাণীকুলের অনুকুল করে দেয়া হয়েছে। পায়ের নিচের এই যমীনকে মানুষের জন্য ফরাসের মতো বিছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা মানুষের জন্য ব্যবহার যোগ্য করেছেন। তিনিই বায়ু মন্ডলে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করেছেন এবং পানি থেকেই প্রাণের উৎপত্তি করেছেন। মাথার ওপরে মহাশূন্যমার্গে তিনিই বায়ু মন্ডল দিয়ে আবৃত করেছেন। তিনিই পাহাড়-পর্বত যমীনের বুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যাবতীয় সৃষ্টিতে ভারসাম্য দিয়েছেন। এসব জটিল কাজ যিনি আপন ক্ষমতায় সুসম্পন্ন করেছেন, তাঁকেই একমাত্র বিধানদাতা রব্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধা কোথায়? তিনিই কিয়ামত সংঘটিত করে মৃত মানুষদেরকে পুনরায় জীবিত করে হিসাব গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, তাঁর এসব জটিল সৃষ্টি দেখেও কি চৈতন্য উদয় হয়না!

বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টির জটিল তত্ত্ব ও তথ্য এবং প্রমাণাদি পেশ করার পর আলোচ্য **সূরার ২১ থেকে ২২ নম্বর আয়াতে** রাসূলকে বলা হচ্ছে, এসব নিদর্শনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে থাকুন, একটির আরেকটি যুক্তি ও প্রমাণ আপনি দিতে থাকুন। এসব নিদর্শন ও

প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে আপনি মহাসত্যের দিকে আহ্বান জানাতে থাকুন। আপনার দায়িত্বই হলো মহাসত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো এবং ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করে সত্য পথ অবলম্বন করার ব্যাপারে উপদেশ দেয়া। আপনার আহ্বানে এবং উপদেশ কারো মনে যদি প্রভাব বিস্তার না করে, তাহলে তো আপনি তাদের মনের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন না এবং মহাসত্য গ্রহণ করানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করাও আপনার দায়িত্বের অন্তর্গত নয়।

মানুষের কাছে ইসলামের প্রচার ও তা গ্রহণ করার আহ্বান জানানো ব্যতীত রাসূল এবং তাঁর অনুসারীদের জন্যে ভিন্ন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার কোন অবকাশ নেই, এ কথা আল্লাহর কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে বলা হয়েছে। একাধিক বার এ কথা বলার কারণ হলো, মানুষ আল্লাহর বিধান গ্রহণ না করে তীব্র গতিতে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে, এই চিন্তায় আল্লাহর রাসূল ব্যাকুল থাকতেন। মানুষের পরিণতির কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত পেরেশনা হয়ে পড়তেন। তাঁকে এই পেরেশানী থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তাঁকে বলছেন, আপনি ব্যাকুল হবেন না। আপনার যা দায়িত্ব ছিল তা আপনি পালন করেছেন, এখন তারা যদি সত্য গ্রহণ না করে, তাহলে তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপরেই ছেড়ে দিন। রাসূলের পরে যারা কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ময়দানে জারী রেখেছেন, তাদের ব্যাপারেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। বাস্তব সত্য দীপ্তিমান হবার পরে কেউ যদি মহাসত্যের আলোয় আলোকিত হতে আগ্রহী না হয়, তাহলে সত্য প্রচারকের আর কোন দায়িত্ব থাকে না এবং এ জন্য তার ব্যাকুল হবারও প্রয়োজন নেই।

ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে কোন মানুষকে তাওহীদের প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য করে না। যুক্তি প্রমাণ ত্যাগ করে অসংখ্য নিদর্শন নিজের চোখে দেখেও কোন মানুষ যদি এক আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী না করে, মূর্তি আর প্রকৃতি পূজার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছুক হয়, তার সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করানোর জন্য ইসলাম কখনো শক্তি প্রয়োগ করে না। ইসলামের এই অপূর্ব পরধর্ম সহিষ্ণু নীতির কারণেই পৃথিবীতে মুসলমানরা হলো সবচেয়ে পরধর্ম সহিষ্ণু জাতি। ইসলাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছে, অন্যের ধর্মের প্রতি সামান্যতম কটাক্ষ করা যাবে না। ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কোন আদর্শের উদ্ভব হয়নি, যে আদর্শের প্রভাবে মানুষের মন-মানসিকতা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। একমাত্র ইসলামই পৃথিবীর মানুষকে অন্যের আদর্শের প্রতি, ধর্মের প্রতি সহনশীল হতে শিক্ষা দিয়েছে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'মুসলমানেরা যেন অন্য ধর্মের দেব-দেবী, উপসানালয় বা ধর্মীয় প্রতীক সম্পর্কে কটাক্ষ বা কোনরূপ কটুক্তি না করে। যদি কোন মুসলমান এ ধরনের কিছু করে তাহলে তাকে কিয়ামতের ময়দানে শাস্তি পেতে হবে। মুসলমানেরা কোন অমুসলিম দেশ জয় করলে সে দেশের অমুসলিম জনগণের সাথে তাঁরা এমন আচরণ করেছেন যে, বিজিত দেশের জনগণ তাঁদের স্বজাতীয় শাসকের কাছ থেকে এতটা ভালো আচরণ লাভ করেনি। একমাত্র মুসলমানরা ব্যতীত অন্য সমস্ত জাতি যে সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত তার প্রমাণ অতীতেও যেমন তারা দিয়েছে-বর্তমানেও তারা সাম্প্রদায়িক কাপালিকদের মতো আচরণ করছে। আসমুদ্র হিমাচল রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাষী ভারতের বর্ণহিন্দুরা ভিন্ন জাতি ও তাদের ধর্মীয় স্থানসমূহ সহ্য করতে পারে না।

পাশ্চাত্যের সামাজ্যবাদী অশুভ খৃষ্টশক্তি ইউরোপের বুকে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে নারাজ। হার্জেগোভিনা-বসনিয়া-চেচনিয়া থেকে মুসলমানদের শেষ চিহ্ন মুছে দেয়ার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। মসজিদগুলো অস্ত্রের আঘাতে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম শক্তিসমূহ বর্তমান পৃথিবীতে নিজেদেরকে সবচেয়ে সভ্য বলে দাবী করে থাকে। গোটা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের শ্লোগানে তারা উচ্চকণ্ঠ। পক্ষান্তরে অতীত ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান কর্মকান্ড এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইহুদী-খৃষ্ট অপশক্তি ও তাদের দোসর জড়বাদী বর্ণহিন্দুরা পৃথিবীতে মানবাধিকার সবেচেয়ে বেশী লংঘন করেছে এবং করছে। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে বর্ণ হিন্দুদের আচরণ, মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের নির্মম অত্যাচার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নীতি, মুসলিম দেশসমূহের প্রতি খৃষ্টশক্তি কর্তৃক পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন, এ সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে যে, অমুসলিমরাই সাম্প্রদায়িক কাপালিকের ভূমিকায় শাণিত কৃপাণ হস্তে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনযজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছে।

১০৯৯ সনে খৃষ্টশক্তি জেরুজালেম দখল করে ৭০ হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশুদের একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখেনি। মুসলমানদের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে বর্শার অগ্রভাগে গেঁথে উল্লাস প্রকাশ করেছে। ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে তারা যখন শহরে প্রবেশ করেছে, তখন তাদের ঘোড়ার পা মুসলমানদের রক্তে ডুবে গিয়েছে। কবরস্থান থেকে মুসলমানদের হাড়গোড় তুলে অপমানিত করেছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে গোটা জেরুজালেম নগরী খৃষ্টানদের পৈশাচিকতায় মুসলিম শূন্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পুনরায় ১১৭৮ সনে-মাত্র ৮৮ বছর পরে মুসলমানেরা যখন জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে, তখন একজন অমুসলিমেরও কোন ক্ষতি মুসলমানরা করেনি।

মুসলিম হত্যাযজ্ঞের মহানায়ক নরঘাতক রিচার্ড-যে রিচার্ড হাজার হাজার মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-তরুণকে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল, যার সম্পর্কে তারই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক 'লেনপুল' তার বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত' বলে। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক 'গিবন' চিহ্নিত করেছেন, 'রক্ত পিপাসু' হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কক্সবার্টের ভাষায় রিচার্ড হলো, 'মানব জাতির নির্মম চাবুক'। যুদ্ধের ময়দানে এই নরঘাতকের অস্ত্র যখন ভেঙ্গে গিয়েছিল, বীরশ্রেষ্ঠ সালাহ্ উদ্দিন আইয়ুবী তখন তাকে হত্যা না করে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নরপশু রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার খৃষ্টান সাথীরা তাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। তখন মুসলিম বীর সালাহ্ উদ্দিন গোপনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে ও বর্তমানে মুসলমানরা এভাবে মানবতা প্রদর্শন করেছে-করছে, আর সেই নির্মল নিষ্কলুষ মানবতাকে নিষ্ঠুর পায়ে বার বার পদদলিত করেছে অমুসলিম শক্তি।

ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানরা যখন ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে কোন দেশ জয় করেছে, বিজিত দেশের রাস্তা-পথে অমুসলিমদের ধর্মীয় প্রতীকগুলোও প্রহরা দিয়ে সংরক্ষণ করেছে। সিংহ বীর মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টানদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করে আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করে শাসকের আসনে আসীন হলেন। অমুসলিমদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করা হয়েছিল। হঠাৎ একদিন খৃষ্টান প্রধান এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এলো। তাদের যীশু খৃষ্টের মূর্তির নাক কে যেন রাতের অন্ধকারে ভেঙ্গে দিয়েছে। পাদ্রীদের নেতৃত্বে খৃষ্টান প্রতিনিধি দল শাসক আমরের বাড়িতে সমবেত হলেন

অভিযোগ করার জন্য। তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে বসার ব্যবস্থা করলেন। বিনয়ের সাথে জানতে চাইলেন, 'এত সকালে কষ্ট স্বীকার করে আমার কাছে কেন এসেছেন ? আমাকে সংবাদ দিলে আমিই আপনাদের কাছে যেতাম।' খৃষ্টান প্রতিনিধি দল দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানালেন, 'আমাদের এলাকার জনবহুল অঞ্চলে যীশু খৃষ্টের মূর্তি স্থাপন করা ছিল। গভীর রাতে সেই মূর্তির নাক ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। আমরা ধারণা করছি, এ ধরনের দুষ্কর্ম কোন মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। আমরা এর বিচার চাই।'

আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদের অভিযোগ শুনে বললেন, 'এ ধরনের অমানবিক কর্মকান্ডের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অপর ধর্মের ক্ষতিসাধন, উপাস্য দেব-দেবীদের সম্পর্কে কটুক্তি বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তবুও আপনাদের মূর্তির ক্ষতি যখন করা হয়েছে, আপনারা অনুগ্রহ তা মেরামত করে নিন, যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে।' খৃষ্টান প্রতিনিধি দল জানালেন, ওটা মেরামত করা সম্ভব নয়। হযরত আমর তাদেরকে নতুন মূর্তি বানিয়ে নিতে বললেন এবং যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন বলে জানালেন। তারা এ প্রস্তাবেও অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, 'আমরা নাকের বদলে নাক চাই।' হযরত আমর জানতে চাইলেন, তারা কোন ব্যক্তির নাক চায়। খৃষ্টান প্রতিনিধি দল আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মুখের ওপরে স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, 'আমরা নবী মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূর্তি বানিয়ে তাঁর নাক ভেঙ্গে দিতে চাই।'

এ কথা শোনার সাথে সাথে তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী সিংহশাবক ইসলামের মর্দে মুজাহিদ হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মুখমন্ডল রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য বৈঠক ত্যাগ করে বাড়ির ভেতরে গিয়ে অজু করে ফিরে এসে জানালেন, 'আমাদের দেহে যতক্ষণ প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, ততক্ষণ আল্লাহর নবীর অবমাননা ঘটতে দেবো না। আপনারা আমার নাক কেটে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।' খৃষ্টান প্রতিনিধি দল তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। উন্মুক্ত ময়দানে অগণিত মানুষ সমবেত হয়েছিল প্রতিশোধ গ্রহণের দৃশ্য অবলোকন করার জন্য। আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক হযরত আমর সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি এই দেশের শাসনকর্তা। জনগণের জান-মাল-ইজ্জত, তাদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করেছি বলেই খৃষ্টানদের মূর্তির নাক ভাঙ্গা হয়েছে। এই শাস্তি আমাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

এ কথা বলে তিনি তাঁর নিজের সুতীক্ষ্ণ ধার তরবারী পাদ্রীর হাতে দিলেন নাক কেটে নেয়ার জন্য। পাদ্রী তরবারী হাতে নিয়ে ধার পরখ করতে লাগলো। চারদিকে যেন কবরের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে সমবেত জনতা এই দৃশ্য দেখছিল। পাদ্রী তরবারী উত্তোলন করলো হযরত আমরের নাক কাটার জন্য। এমন সময় জনতার ভীড় ঠেলে এক যুবক এগিয়ে এলো চিৎকার করতে করতে, 'নাক ভেঙ্গেছি আমি। আমার নাক কেটে নিন।' বিস্ময়ে বিমূঢ় পাদ্রী সজোরে তরবারী দূরে নিক্ষেপ করে বললেন, 'কতই না উত্তম তোমাদের নবী আর তাঁর আদর্শ। যে আদর্শ তৈরী করেছে এমন মহামানব। আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে। মূর্তির নাকের পরিবর্তে জীবিত মানুষের নাক কাটার প্রয়োজন নেই।'

অন্য জাতি ও তাদের ধর্মের ব্যাপারে এটাই হলো মুসলমানদের আদর্শ। প্রকৃত অর্থে যাঁরা ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করেন, অন্য জাতি ও তাদের ধর্মের প্রতি তাঁরা অন্তরে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ পোষণ করেন না। কারণ তাঁরা অবগত আছেন যে, বিশ্বনবী বলেছেন, 'কোন মুসলমান যদি কোন অমুসলিমের ওপরে অত্যাচার করে, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আমি নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুসলিমদের পক্ষ গ্রহণ করে মুসলমানের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবো।'

পক্ষান্তরে অমুসলিমগণ মুসলমানদের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করতে পারেননি। ভারতে গরু জবাই করার প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন বাতিল করার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মসজিদ ভেঙ্গে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। শব্দ দূষণের অজুহাতে সেখানে মাইকে আজান প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণবাদী হিন্দু নেতা সদম্ভে ঘোষণা করছেন যে, 'মুসলমানদেরকে লাথি মেরে ভারত থেকে বের করে দেয়া হোক।' ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপরে এই যে নির্যাতন, এর প্রতিবাদে কোন মুসলিম দেশে মুসলমানরা কখনো অমুসলিমদের ওপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

২৩ থেকে ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে, যুক্তি, প্রমাণ ও নিদর্শন পেশ করার পরও যারা মহাসত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করে নিজের প্রবৃত্তি ও ভ্রান্ত পথ-মত অনুসরণ করবে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে অবশ্যই সে আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাকে অবশ্যই শেষ বিচারের নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হতেই হবে এবং সত্য অস্বীকার করার শাস্তি গ্রহণ করতেই হবে। কেন সে যুক্তি-প্রমাণ অস্বীকার করেছিল এবং অসংখ্য নিদর্শন চোখের সামনে উপস্থিত দেখেও তা উপেক্ষা করেছে, এর জন্য তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এই জবাবদিহি করতে হবে তাঁরই কাছে, যিনি তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তার জন্যে এই পৃথিবীকে বসবাসের অনুকূল করে দিয়েছেন, তার জীবন ধারনের জন্যে যাবতীয় নেয়ামত দান করেছেন, তিনিই হিসাব গ্রহণ করবেন।

সূরা আল-ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৮৯

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'ফাজ্‌রি' শব্দটিকেই এই সূরার নামকরণ হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামী আন্দোলনকে চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে তাদের যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করেছিল এবং মুসলমানদের ওপরে নির্মম নির্যাতন অনুষ্ঠিত করছিল। ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের ওপরে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, তারা যেন ইসলাম ত্যাগ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত আদর্শ অনুসরণ করে। চরম অত্যাচারে মুসলমানদের জীবন যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, ঠিক তখনই এই সূরা অবতীর্ণ করে ইসলাম বিরোধিদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, তোমাদের পূর্বেও যারা পার্থিব শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে তোমাদের মতো আচরণ করেছে, ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, তারা কি ধরনের নিকৃষ্ট পরিণতি বরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

মক্কায় যারা ইসলামের সাথে বিরোধিতা করছিল, তারা পরকালের বিষয়টি কল্পনার জগতেও স্থান দিতে প্রস্তুত ছিল না, মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবন তাদের কাছে চরম এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হতো। এর মূলে যে কারণ নিহিত ছিল তাহলো, এসব লোকগুলো ছিল চরম দুর্নীতিতে নিমজ্জিত শোষক শ্রেণীর। সূরা মুতাফ্‌ফিফীনের ভূমিকা ও প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যখনই তাদেরকে বলা হতো, তোমরা যা করছো এর বিস্তারিত হিসাব মৃত্যুর পরে মহান আল্লাহর সামনে আখিরাতের ময়দানে দিতে হবে। তখন তাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হতো। কারণ পরকালকে স্বীকৃতি দিলেই তাদেরকে যাবতীয় অপকর্মের পথ পরিহার করতে হবে এবং তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা যে অবৈধ পথে অর্থের পাহাড় গড়ছে, এ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত থাকতে হবে। এ জন্য তারা কোনক্রমেই পরকালকে স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক ছিল না। সমাজের কতিপয় শোষকের এই ভ্রান্ত চেতনা সাধারণ মানুষের ভেতরেও সংক্রামিত হচ্ছিলো ফলে সাধারণ লোকগুলোও মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে নেতৃবৃন্দের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের সাথে বিরোধিতা করছিল।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও নানা ধরনের অখন্ডনীয় যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে পরকালের বাস্তবতা তাদের সামনে উত্থাপন করছিলেন। পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কে এই সূরায় বেশ কয়েকিট যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমেই এমন কতক বিষয়ের শপথ করা হয়েছে, যে বিষয়সমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, সমস্ত কিছুই কালের বিবর্তনে একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই পৃথিবীর একটি পরিণতি ঘটবে এবং সেই দিনটিই হবে কিয়ামতের দিন। যারা জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির অধিকারী, পরকালের বাস্তবতা গ্রহণ করার জন্য তাদের কাছে এসব যুক্তি প্রমাণই যথেষ্ট। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই একটি অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন এবং নিয়মই প্রমাণ করে যে, এসব কিছুর পেছনে একজন মহাবৈজ্ঞানিকের পরিকল্পনা ও সক্রিয় উপস্থিতি বর্তমান রয়েছে।

সুতরাং যাঁর পক্ষে এসব বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে এবং যিনি অকল্পনীয় কলা-কৌশলের মাধ্যমে এসব কিছু পরিচালনা করছেন, তার পক্ষে মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না, এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়? পরকাল সংঘটিত

করা সম্ভব এবং পৃথিবীর বাস্তবতাই প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরে আরেকটি জগতের একান্ত প্রয়োজন, যেখানে সুবিচার বঞ্চিত মানুষ ন্যায় ও ইনসাফ লাভ করবে, এরপর আর পরকালের পক্ষে যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। এই বিষয়টি পরকাল অবিশ্বাসীদের সামনে উত্থাপন করার পরই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ইতিহাসের দিকে। বলা হয়েছে, তোমাদের জানা সেই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, সত্য অস্বীকারকারী বিপুল শক্তির অধিকারী আ'দ জাতি, সামূদ জাতি ও ফেরাউনের কি মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে। বাড়াবাড়ির শেষ সীমায় যখন তারা উপনীত হয়েছিল, তখন মহান আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়নি। তাদেরকে নির্মম পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে।

তোমাদের জানা এই ইতিহাসই প্রামাণ করে যে, এই মহাবিশ্ব যিনি পরিচালনা করছেন, তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এখানে কে কি করছে, এ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ রয়েছেন। যখনই কোন দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় এবং জাতি জুলুমের শেষ সীমা লংঘন করেছে, তখনই তাঁর অমোঘ গ্রেফতারী পরোয়ানা এসে উপস্থিত হয়েছে। যুগের প্রতিটি অধ্যায়েই এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ঘটতেই থাকবে। এই পৃথিবীতে যাকে যতটুকু জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, সে এসব লাভ করে তা কিভাবে কোথায় প্রয়োগ করছে, এর হিসাব গ্রহণ করা এবং এর ভিত্তিতে তাকে পুরস্কৃত করা অথবা শাস্তি প্রদান করা সেই সুবিজ্ঞ কুশলী শাসকের এক অপরিবর্তনীয় সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি। সুতরাং তোমরা যারা মহাসত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছো এবং সত্যের বাহকদের ওপরে নির্যাতন করছো, তোমাদের এই বিবেক বুদ্ধিহীন কর্ম যখনই শেষ সীমা অতিক্রম করবে, তখনই তোমাদের ওপরেও সেই অমোঘ গ্রেফতারী পরোয়ানা এসে উপিস্থত হবে। এর অনথ্যা কোথায় কখনো হয়নি এবং কখনো হবেও না।

এসব কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা ও দুর্বলের সহায় সম্পদ আত্মসাৎ করার হীন প্রবণতা এবং তার নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। কোরআনের জ্ঞান বিবর্জিত কুসংস্কারে বিশ্বাসী বর্তমানের অধিকাংশ লোকদের মতো আরবের সে যুগের লোকদেরও বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি অধিক প্রিয়, তিনি তাকেই অঢেল ধন-সম্পদ দান করেন। আর তিনি যাদেরকে অপছন্দ করেন, তাদেরকে দারিদ্রতার নিষ্পেষণে জর্জরিত করেন। এ কথা তারা বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা ও স্বল্পতা-এই উভয় অবস্থার মধ্যে মানুষকে নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি দেখতে থাকেন, অঢেল ধন-ঐশ্বর্য হস্তগত হলে মানুষ কি ধরনের চরিত্র প্রকাশ করে আর দৈন্যতার মধ্যেই বা মানুষ কোন্ ধরনের আচরণ করতে থাকে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতার গর্বে গর্বিত হয়ে সে অহঙ্কারী, অত্যাচারী হয়ে ওঠে না মানবতার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটায়। আর দৈন্যতায় আক্রান্ত হয়ে আপন প্রভুকে অভিসম্পাত দিতে থাকে, এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যই তিনি কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন এবং কাউকে দৈন্যতায় নিক্ষেপ করেন।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে ধন-সম্পদের প্রতি অধিকাংশ মানুষের সীমাহীন লালসার কথা। মরু সাইমুম তাড়িত পিপার্সিত পথিকের এক অঞ্জলী পানি যেমন তৃষ্ণা বৃদ্ধিই করে, তেমনি অধিকাংশ মানুষের ধন-লিপ্সা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হতে থাকে। এদের ধন-ক্ষুধা কোনক্রমেই তৃপ্ত হয় না। এসব মানুষ ধন-সম্পদ আহরণের ব্যাপারে নৈতিকতার বা বৈধতার কোন সীমার তোয়াক্কা করে না। বৈধ বা অবৈধ যে কোন পথেই হোক না কেন, সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে,

এটাই তাদের নীতি। সমাজে বা পরিবারে যারা পিতৃহীন হয়ে পড়ে, চরম অসাহয়ত্ব তখন পিতার স্নেহবঞ্চিত ইয়াতিমদেরকে ঘিরে ধরে। এক শ্রেণীর লোক এসব ইয়াতিমদের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কৌশলে এদের সম্পদ আত্মসাৎ করে অথবা এদের প্রকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যারা দুর্বল অথবা অতি মাত্রায় সহজ সরল, তাদেরকেও অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

এ ধরনের অবৈধ কর্মে যারা জড়িত, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এভাবে যারা অপরের অধিকার ক্ষুন্ন করে, অন্যের সম্পদ ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে নিজের ধন-সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই ধরনের আচরণসম্পন্ন লোকদের কাছ থেকে পরকালে কোন হিসাব গ্রহণ করা হবে না, এ কথা কি কল্পনা করা যায়? এদের অশুভ কর্মনীতির কারণে মৃত্যুর পরের জীবনে কোন শাস্তি লাভ করবে না, এ কথা তোমরা চিন্তা করো কেমন করে? অবশ্যই মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে মহান আল্লাহর দরবারে হিসাব দিতেই হবে। আজকে যারা সেই দিনটির প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে, সেই দিনটি যখন সংঘটিত হবে এবং তোমাদের রব-এর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে, শাস্তি দেয়ার জন্যে জাহান্নামকে সর্বসম্মুকে প্রদর্শন করা হবে, তখন অস্বীকারকারীদের চেতনা জাগ্রত হবে। কিন্তু তখন বোধশক্তি জাগ্রত হলেও কোনই লাভ হবে না। অস্বীকারকারীরা আফসোস আর অনুতাপে ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু কোন কিছুই সেদিন তাদেরকে অনিবার্য শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল এবং গভীর তৃপ্তির সাথে সে আপন প্রভুর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেছে। এই বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জীবনের সমস্ত কিছু কোরবানী করেছে। চরম প্রতিকুল অবস্থাতেও আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আল্লাহর দাসত্ব করা ব্যতীত ক্ষণিকের জন্যে হলেও অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করেনি। সেদিন এসব লোকদেরকে বলা হবে, তোমরা অকুণ্ঠ চিত্তে আপন প্রভুর বিধানের প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে তা অনুসরণ করেছো। এখন সন্তুষ্ট চিত্তে এগিয়ে যাও সেই রব-কর্তৃক প্রদত্ত নে'মাত জান্নাতের দিকে, কারণ তোমাদের প্রভুও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। পৃথিবীর জীবনে তোমরা যেমন নিজের রব-এর গোলামী করেছো, তেমনি তার বিনিময় হিসাবে আজ জান্নাতে প্রবেশ করো।

সূরা ফজর-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-৩০-রুকু-১

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ
فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ۝٥ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ اِرَمَ
ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ
جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى
الْبِلَادِ ۝١١ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
۝١٣ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ
وَنَعَّمَهٗ ۵ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥ وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ
۵ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَهَانَنِ ۝١٦ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝١٧ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝١٨ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝١٩ وَّتُحِبُّوْنَ
الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝٢١ وَّجَآءَ رَبُّكَ
وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢ وَجِاىْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۵ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ
الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝٢٣ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۝٢٤
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٥ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٦ يٰٓاَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨ فَادْخُلِىْ
فِىْ عِبٰدِىْ ۝٢٩ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۝٣٠

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) ভোরের শপথ, (২) শপথ দশটি (বিশেষ) রাতের, (৩) শপথ জোড় (সৃষ্টি)-র ও বেজোড় (স্রষ্টা)-র, (৪) শপথ রাতের যখন সে সহজে বিদায় নেয়। (৫) (তোমরা বলো তো!) এর কোনটির মধ্যে বিবেকবান লোকদের জন্যে শপথ রাখা হয়নি? (৬) তুমি কি দেখোনি, তোমার মালিক আ'দ (জাতির) লোকদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন? (৭) 'এরাম' (সভ্যতা ছিলো) বড় বড় স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী, (৮) (জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে) জনপদে তার মতো কাউকেই (এর আগে) সৃষ্টি করা হয়নি। (৯) (সমৃদ্ধিশালী) জাতি ছিলো সামূদ, তারা (পাহাড়ের উপত্যকায়) পাথর কেটে (সুরম্য) অট্টালিকা খোদাই করতো। (১০) (অত্যাচারী) ফেরাউন-যে কীলকে গেঁথে (শাস্তি) প্রদানকারী (যালিম) ছিলো। (১১) এরা দেশে দেশে (আল্লাহর সাথে) বিদ্রোহ করেছে। (১২) এরা বেশী মাত্রায় (বিপর্যয় ও) অশান্তি সৃষ্টি করেছে। (১৩) অবশেষে তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর আযাবের কশাঘাত হানলেন, (১৪)(অবস্থা দেখে মনে হয়েছে যে) তোমার মালিক (এদের ধরার জন্যে বুঝি) ওঁৎ পেতে (বসে) ছিলেন।

(১৫) মানুষরা এমন হয় যে, যখন তার মালিক তাকে (অর্থ ও মর্যাদা দিয়ে) পরীক্ষায় ফেলেন এবং সম্মান দান করেন তখন সে বলে হ্যাঁ আমার মালিক আমাকে সম্মানিত করেছেন। (১৬) আবার যখন তিনি (ভিন্নভাবে) তাকে পরীক্ষা করেন (এবং এক পর্যায়ে) তার রেযেককে সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে (নাখোশ হয়ে) বলে, আমার মালিক আমাকে অপমান করেছেন। (১৭) না, (আসল কথা হচ্ছে) তোমরা ইয়াতিমদের সম্মান করো না, (১৮) মিসকীনদের খাওয়ানোর জন্যে তোমরা একে অপরকে উৎসাহ দাও না। (১৯) তোমরা মৃত ব্যক্তির (রেখে যাওয়া) ধন-সম্পদ নিজেরাই সব কুক্ষিগত করে নাও। (২০) বৈষয়িক ধন-সম্পদকে তোমরা গভীরভাবে ভালোবাসো। (২১) না, তেমনটি কখনোই (হওয়া উচিৎ) নয়, (স্মরণ করো) যেদিন এই (সাজানো) পৃথিবীটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মিশিয়ে দেয়া হবে। (২২) সেদিন তোমার মালিক স্বয়ং আবির্ভূত হবেন, আর ফেরেশ্তারা সব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। (২৩) সেদিন জাহান্নামে সামনে হাযির করা হবে, যেদিন প্রতিটি মানুষই (তার পরিণাম) বুঝতে পারবে; কিন্তু (তখন) এই বোধোদয় তার কী কাজে লাগবে?

(২৪) সেদিন এই (হতভাগ্য) ব্যক্তিরা বলবে, কতো ভালো হতো যদি (আজকের) এই জীবনের জন্যে (কিছুটা ভালো কাজ) আগে ভাগেই পাঠিয়ে দিতাম। (২৫) সেদিন আল্লাহ তা'য়ালা (এই বিদ্রোহীদের) এমন শাস্তি দেবেন, যা অন্য কেউই দিতে পারবে না, (২৬) তাঁর বাঁধনের মতো বাঁধনেও কেউ (পাপীদের) বাঁধতে পারবে না। (২৭) (অপরদিকে নেককার বান্দাহ্দের বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা, (২৮) তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাও-সন্তুষ্ট চিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে, (২৯) তোমরা আমার প্রিয় বান্দাহ্দের দলে শামিল হয়ে যাও, (৩০) (আর) আমার (অনন্ত) জান্নাতে প্রবেশ করো।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

প্রথম চারটি আয়াতে চারটি জিনিসের শপথ করে বলা হয়েছে, এরপরেও কি জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্যে আরো অধিক প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে কি?

যে ভঙ্গিতে ভাষণ শুরু হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত অস্বীকারকারী

গোষ্ঠীর সাথে উল্লেখিত বিষয় নিয়ে কথোপকথন চলছিল। আল্লাহর রাসূল অখন্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ পেশ করছিলেন উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে আর অস্বীকারকারীরা যাবাতীয় যুক্তি-প্রমাণ উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করছিলো। এ জন্য যে বিষয়ের প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছিলো সেই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়সমূহের শপথ করে বলা হলো, যারা জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির দাবীদার এবং যুক্তি প্রমাণে আস্থাশীল, এই শ্রেণীর লোকদের জন্যে আরো অধিক যুক্তি প্রমাণের কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহ এক এবং একক, তাঁর সৃষ্টি কাজে ও পরিচালনায় অন্য কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত রাসূল এবং নির্ধারিত দিনে এই মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারপর সমস্ত মৃত মানুষদেরকে পুনরায় জীবিত করে তাদের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে। এসব বিষয় যে চিরসত্য এবং দৃষ্টির সামনে গোটা প্রকৃতিই এসব চিরসত্য কথার সাক্ষ্য বহন করছে। সুতরাং চিরসত্য বিষয়গুলোর সততা নির্ণয়ের জন্যে অধিক যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

প্রথম আয়াতে শপথ করা হয়েছে 'ফজরের' অর্থাৎ দিন ও রাতের এমন একটি সময়ের, যে সময়টি প্রতিটি যুগের আল্লাহভীরু লোকদের কাছে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় মুনি-ঋষিদের কাছেও 'ফজরের' সময়টি 'ব্রহ্ম মুহূর্ত' নামে পরিচিত। রাতের আবসান ও দিবসের আগমনী মুহূর্ত নিজেকে সাধনার উচ্চমার্গে উপনীত করার মুহূর্ত। পূর্ব দিগন্তে পূর্বাশার ইশারা স্পষ্টতই জানিয়ে দেয়, রাতের অবসান ঘটছে এবং দিনের আগমন ঘটছে। তিমিরাবৃত রাতের ঘন অন্ধকারের বুক চিরে পূর্বাশার প্রান্তে অস্পষ্ট শুভ্র রশ্মি বিকীর্ণ হয়েই দিবসের সূচনা করাকেই 'ফজর' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি এভাবেই উত্থাপন করা হয়েছে যে, রাত ও দিন সৃষ্টির শুরু থেকেই একটি নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় নিয়মে আবর্তিত হচ্ছে।

এরপর শপথ করা হয়েছে দশটি রাতের। এই দশটি রাত সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, এই দশটি রাতের কথা বলে যিলহজ্জ মাসের দশটি রাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে মুফাচ্ছিরীনগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যে দশটি রাতের শপথ করা হয়েছে-নিঃসন্দেহে সে রাতগুলো অত্যন্ত বরকতপূর্ণ এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। কোন কোন গবেষক বলেছেন, দশ রাত বলতে চাঁদের অবস্থার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। চন্দ্র প্রথম যেদিন উদয় হয় সেদিন থেকে চাঁদ একটি শীর্ণ রেখা থেকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। পরবর্তী দশদিন চাঁদ পূর্ণীমার পূর্ণশশীতে পরিণত হয়ে তার কোমল কিরণ বিকিরণ করতে থাকে। শেষ দশদিন চাঁদের আকার হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে চাঁদ পুনারায় সরু রেখায় পরিণত হয়ে আলো বিকিরণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আবার চাঁদ উদিত হয়ে পুনরায় সেই পূর্বের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে। এভাবে সৃষ্টির শুরু থেকেই চাঁদও সেই একই অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীনে আবর্তিত হচ্ছে।

তৃতীয় শপথ হলো জোড় সৃষ্টির এবং বেজোড় স্রষ্টার। মহান আল্লাহ রাব্বুল পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন, তিনিই সেই সুবিজ্ঞ কৌশলী স্রষ্টা-যিনি পানি থেকে প্রাণের উৎপত্তি করেছেন এবং জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে সূরা নাবার ৮ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। আর 'বেজোড় স্রষ্টা' বলতে মুফাচ্ছিরীনগণ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেই বুঝিয়েছেন। বলা

হয়েছে, শপথ জোড় জিনিসের এবং বেজোড়-একক, অংশীদারহীন সেই মহান সত্তার যাঁর দ্বিতীয় বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই বাক্যটির মাধ্যমে তাওহীদের প্রতি সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। কারণ আরবের লোকগুলো আল্লাহকে স্বীকার করতো, সেই সাথে তাদের বিশ্বাস ছিল, ফেরেশ্তারা আল্লাহর পুত্র-কন্যা এবং তাঁর সৃষ্টি কাজের সহযোগী। তাদের এসব ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে। এখানেও তাঁর একক, বেজোড় সত্তার শপথ করা হয়েছে তাওহীদের বিষয়টি মানুষের মনে দৃঢ়মূল করে দেয়ার লক্ষ্যে।

মহাবিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি কাজের প্রতি ও চিরপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, আবহমান কাল থেকে অপরিবর্তনীয় নিয়মে সমস্ত সৃষ্টি পরিচালিত হচ্ছে। স্রষ্টার যদি কোন অংশীদার থাকতো, তাহলে এসব নিয়মে বা সৃষ্টি কাজে তোমরা অবশ্যই কোন না কোন মতানৈক্য বা পরিবর্তন দেখতে পেতে। একটি প্রতিষ্ঠানে যেমন দুইজন পরিচালক থাকলে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে এবং নিয়ম-নীতির পরিবর্তন ঘটে থাকে, এটা তোমরা দেখতে পাও। কিন্তু এই মহাবিশ্বে চির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতিতে কি কোন পরিবর্তন তোমাদের চোখে পড়েছে?

চথুর্ত শপথটি হলো, রাতের-যখন তার অবসান ঘটে বা সহজে বিদায় গ্রহণ করে। রাতের অবসান ঘটলেই দিবসের আগমন ঘটে। দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে। আর রাতকে নির্ধারণ করা হয়েছে মানুষের শান্তির বাহন হিসাবে। সৃষ্টির শুরু থেকে সেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এভাবে রাত ও দিনের আবর্তন-বিবর্তন চলছে। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কখনো হয়নি এবং চিরপ্রতিষ্ঠিত এই নিয়মই সর্বত্র তোমরা প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাচ্ছো। যে ব্যক্তিত্বকে তোমাদের জন্যে পথপ্রদর্শক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, তিনি তোমাদেরকে আমার নিয়মের অধীন একটি দিনের কথা শোনাচ্ছেন। আমার প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্তনীয় নিয়ম হলো, এই মহাবিশ্বকে একদিন ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে কিয়ামত সংঘটিত করা এবং সমস্ত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে হাশরের ময়দানে সমবেত করা।

পৃথিবীতে যাকে আমি যে যোগ্যতা ও সামর্থ দিয়েছিলাম, সেই যোগ্যতা ও সামর্থ কে কোথায় কিভাবে ব্যয় করেছে, তার হিসাব গ্রহণ করা এবং এরই ভিত্তিতে তাদেরকে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদান করা। আমিই ইনসাফ করার লক্ষ্যে এই নিয়ম সৃষ্টি করেছি এবং এই নিয়মে কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। তোমাদের চোখের সামনে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত নিয়মে যেমন কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাও না, তেমনি আমার ঐ নিয়মেও কোন পরিবর্তন হবে না। এই কথাটিই আমার রাসূল তোমাদেরকে বুঝাচ্ছেন আর তোমরা তা অস্বীকার করছো। গোটা সৃষ্টি জগতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো, সমস্ত কিছুই প্রমাণ করবে যে, এসবের ওপরে এক মহাশক্তিমান আল্লাহ তাঁর নিজস্ব শক্তি বলে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। কোথাও যুক্তিহীন, সামঞ্জস্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ও অবাঞ্ছিত কোন কাজই তাঁর দ্বারায় সংঘটিত হয়নি। তাঁর প্রতিটি কাজই একটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ওপরে ভিত্তিশীল। খেল-তামাচ্ছলে কোন কিছুই সৃষ্টি করা হয়নি।

এমনটি কখনো ঘটেনি যে, পুরাতনের বিদায় আর নতুনের আগমনী নিয়মের কারণে হঠাৎ করেই পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ একদিনে একযোগে একই সময়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে প্রাণীজগতকে মারাত্মক অক্সিজেন সঙ্কটে ফেলেছে। বরং উদ্ভিদ জগতের মৃত্যুর নিয়ম হলো একটি ক্রমশঃ মারা পড়বে আরেকটি সৃষ্টি হবে-একটি প্রজাতি নিঃশেষ হবার পূর্বেই আরেকটি

প্রজাতি তার স্থান দখল করবে। যেন পৃথিবীর প্রাণীকুলের জন্যে অক্সিজেনের কোন সঙ্কট সৃষ্টি না হয়। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কখনো ঘটেনি। মানুষ কর্তৃক ব্যবহৃত বস্তুর আবর্জনা, বর্জ্য পদার্থ এবং প্রাণীর শবদেহ মাটি ও পানি সূর্যের তাপ এবং এক শ্রেণীর ব্যাক্টেরিয়ার সহযোগিতায় পচন ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে নিজের মধ্যে মিশ্রিত করে মানুষকে দুর্গন্ধ ও দূষিত বাতাস থেকে মুক্ত রাখবে এবং এটাই চিরপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম। এই নিয়মের পরিবর্তন ঘটতে কি তোমরা কোথাও দেখেছো?

কোথাও কি এমন দেখেছো যে, মৃতদেহ পানির ভেতরে বা মাটির গর্তে অথবা ওপরে রাখা হয়েছে এবং সেটায় কোন পচন ক্রিয়া ঘটেনি? আকাশ থেকে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং নদ-নদী-সাগরের পানিকে উচ্ছ্বসিত করে বন্যার সৃষ্টি করি। তোমাদের শহর-বন্দর-নগর প্লাবিত হয়ে যায়। এই পানি কখনো স্থায়ী হয়ে তোমাদেরকে সঙ্কটে ফেলে না। আমার সৃষ্ট পানিচক্রের নিয়মে তা যথাস্থানে চলে যায়। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কখনো ঘটেনি। রাত আসার সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দিন বিদায় নিচ্ছে না, দিন আসার সময় পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রাতের অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছে না। দিনের আকাশে চাঁদ রাতরে মতই উজ্জ্বল হয়ে আলো বিকিরণ করছে। অথবা রাতের আকাশে সূর্য কিরণ দিচ্ছে। চাঁদ যেদিন ক্ষীণ রেখা নিয়ে উদিত হলো এবং তার পরের দিনেই পূর্ণিমার পূর্ণশশধরের আকার ধারণ করলো। গ্রীষ্মের ঋতু শেষ হয়েছে তবুও গ্রীষ্ম বিদায় নিচ্ছে না। এমন ধরনের কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলতা কোথাও কখনো তোমাদের দৃষ্টি গোচর হয়নি।

সমস্ত কিছুতেই একটি সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তিতা, একিট চিরপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা এবং একটি স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতা বিদ্যমান। এই মহাবিশ্বের অন্যান্য সৃষ্টি বাদ দিয়েই মানুষ যদি শুধুমাত্র দিন ও রাতের চিরপ্রতিষ্ঠিত আবর্তন ও বিবর্তন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে, এসব অখন্ডনীয় প্রমাণের ভিত্তিতে অবশ্যই অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, এই অপরিবর্তনীয় বলিষ্ঠ নিয়ম-শৃঙ্খলা অবশ্যই এক নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়ম-নীতির সাথে পৃথিবীতে তাঁরই সৃষ্ট অগণিত সৃষ্টির অকল্পনীয় কল্যাণ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত এবং তারই ওপর একান্তভাবে তাদের জীবন প্রণালী নির্ভরশীল। এমন অবস্থায় এই ধরনের মহাবিজ্ঞানী, কৌশলী এবং অসীম ক্ষমতাধর স্রষ্টার পৃথিবীতে তাঁরই নিয়ম-নীতির অধীনে জীবন-যাপনকারী কোন মানুষ যদি আখিরাতের হিসাব ও শাস্তি-পুরস্কারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তো এ কথাই মনে করে যে, স্রষ্টা অসীম ক্ষমতার অধিকারী নন। ক্ষমতাহীনতার কারণে তিনি মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে পুনরায় জীবিত করে হিসাব গ্রহণ করতে অপারগ।

এ জন্যই চারটি বিষয়ের শপথ করে এ কথা বলা হয়েছে, যারা জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী বলে নিজেদেরকে দাবী করে, পরকাল সংঘটিত হবার ব্যাপারে তাদের সামনে অন্য কোন প্রমাণ পেশ করার কোনই প্রয়োজন নেই। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার প্রকাশ ও চিরপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখেও যদি তাওহীদ এবং পরকাল অস্বীকার করে, তাহলে তাদের জন্যে আল্লাহর আযাব কর্তৃক গ্রেফতার হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ উন্মুক্ত নেই।

এই মহাবিশ্বে যাবতীয় সৃষ্টির ওপরে চিরস্থায়ী সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি চিরপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে শুধু তাই নয়। একটি নৈতিক বিধানও (Law of human affairs) তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতে কার্যকর করেছেন। শুভ কাজের উত্তম প্রতিফল লাভ এবং অশুভ বা মন্দ কাজের নিকৃষ্ট

প্রতিফল লাভ–এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সেই নৈতিক বিধানেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। সৃষ্টি জগতে স্থায়ীভাবে প্রচলিত মহান আল্লাহর এই বিধানটি প্রকৃত পক্ষেই অমোঘ এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকর রয়েছে, মানব জাতির ইতিহাসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত অগণিতবার প্রমাণিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে যে ব্যক্তি, যে দল ও গোষ্ঠী এবং যে জাতি পরকালের প্রতি উপেক্ষা, উদাসীনতা, অবহেলা বা অবিশ্বাস পোষণ করেছে, এসব ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী এবং জাতি কর্তৃক পৃথিবীতে মানব সমাজে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয়েছে–এ কথা চিরসত্য। মানব জাতির ইতিহাসও এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে।

বর্তমান পৃথিবীর অবস্থার দিকে সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, পৃথিবীর দেশে দেশে অশান্তির আগুন যারা প্রজ্জ্বলিত করেছে, আগ্রাসী নীতি যারা অবলম্বন করেছে, আগ্রাসন যারা চালিয়েছে, মানবাধিকার যারা নিষ্ঠুর পায়ে পদদলিত করছে, অন্যায়ভাবে আরেকটি দেশের ওপরে হামলা চালিয়ে দেশটিকে ধূলায় মিশিয়ে দিচ্ছে, চুরি-ডাকাতি, হত্যা-ধর্ষণ, লুটপাট, রাহাজানী, চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস যারা করছে, দেশে দেশে নৈতিক চরিত্রের বাঁধন শিথিল করে দিচ্ছে, জিনা-ব্যাভিচারের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে, এদের কারো ভেতরেই পরকালের প্রতি জবাবদিহির অনুভূতি নেই। পরকালে জবাবদিহির অনুভূতিহীন লোকগুলোর দ্বারাই দেশ ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। এই অবস্থায় যখন সীমা অতিক্রম করেছে, তখনই আল্লাহর আযাব কর্তৃক তারা গ্রেফতার হয়েছে।

মানব জাতির ইতিহাসের এই ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, পরকালের প্রতি উপেক্ষা, উদাসীনতা, অবহেলা ও অবিশ্বাসই প্রতিটি ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী ও জাতিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে এবং এটাই অবশেষে তাদেরকে নিকৃষ্ট পরিণতির মুখোমুখি করেছে। এখানে এ কথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, 'নিকৃষ্ট পরিণতি' সহসাই ঘটে না। নিকৃষ্ট পরিণতি ভোগ করার জন্যে যে বীজ বপন করা হয়, তা মহীরুহ আকারে পরিণত হতে দশক, যুগ বা শতাব্দীও পার হয়ে যায়। নিকৃষ্ট পরিণতি ভোগের বীজ যারা বপন করে, তারা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার কয়েক শতাব্দী পরেও লোকজন সেই পরিণতি ভোগ করতে বাধ্য হয়। কারণ সেই বীজ থেকে সৃষ্ট দুষ্টবৃক্ষ যারা সযত্নে বর্ধিত করেছে, তার বাতাস ভোগ করেছে, ফলভোগ তো তারাই করবে। তাদের উচিত ছিল সেই বৃক্ষকে কর্তন করে দেশ ও জাতিকে দূষণমুক্ত করা। এই দায়িত্ব যারা পালন করেনি, তাদেরকে অবশ্যই সেই নিকৃষ্ট পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে।

নৈতিক চরিত্র ধ্বংসকারী কোন গ্রন্থের রচয়িতা গ্রন্থ রচনা করার সাথে সাথেই নিকৃষ্ট পরিণতি বরণ করে না। তার ঐ গ্রন্থের যারা প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে গোটা জাতিকে চরিত্রহারা করে এবং এই ধারাবাহিকতা বছরের পর বছর চলতে থাকে, তখন এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সমাজ ও দেশে জিনা-ব্যাভিচার ও ধর্ষণের প্রসার ঘটে। সমাজ ও দেশে দেখা দেয় অস্থিরতা এবং দূরারোগ্য যৌন ব্যাধির আবির্ভাব। এই অবস্থা যারা চলতে দিয়েছে, তারাই এর নিকৃষ্ট পরিণতি বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, মূল লেখকের কিছুই হয়নি। কিন্তু ইনসাফের দাবী হলো, ঐ গ্রন্থের মূল রচয়িতার চরম দন্ডভোগ। কিন্তু সে তো পৃথিবী থেকে বহু পূর্বেই বিদায় নিয়েছে, দন্ডভোগের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সে অবস্থান করছে। আর সে জীবিত থাকলেও যে অপরাধ সে করেছে, সে অপরাধের পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিলো মৃত্যুদন্ড। গোটা জাতি ও দেশকে যে ব্যক্তি ধ্বংস করলো, সে একবার মাত্র মৃত্যুদন্ড ভোগ করবে, এটা ইনসাফ হলো না। এ জন্যই প্রয়োজন পরকালের, যেখানে তার প্রাপ্য দন্ডভোগ করতে পারবে।

সুতরাং এই পরকালকে–এই মহাসত্যকে যারা অস্বীকার করেছে, ইতিহাসে তাদের পরিণতি শুভ হয়নি, সেদিকেই **আলোচ্য সূরার ৬ থেকে ১৪ নম্বর** আয়াতসমূহে মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ইতিহাস তোমরা অবগত রয়েছো যে, আ'দ জাতি মহাসত্য অস্বীকার করে কি ধরনের নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখিন হয়েছিল। ঐ জাতির শক্তি, ধন-ঐশ্বর্যের তুলনায় তোমরা একেবারেই নিঃস্ব। তারা আকাশচুম্বী স্তম্ভ নির্মাণ করে তার ওপরে বিশাল সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করতো। দৈহিক আকৃতি ও শক্তি এবং জ্ঞান-ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে তাদের মতো ইতিপূর্বে আর কোন জাতিকে এই পৃথিবী পৃষ্ঠে সৃষ্টি করা হয়নি। এরপর সামূদ জাতি ছিল অসীম শক্তির অধিকারী। এরাও পাহাড় কেটে সুরম্য অট্টালিকা খোদাই করতো। ফেরাউনও ছিল প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী। শক্তি আর ধন-ঐশ্বর্যের দম্ভে এরা মহাসত্যকে অস্বীকার করেছে। আখিরাতকে অস্বীকার করে এরা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণ মানুষ করুণ স্বরে আর্তনাদ করেছে। তারপর যখন এরা সীমালংঘন করেছে, তখনই তোমাদের রব এদের ওপরে আযাবের কশাঘাত হেনেছেন।

সূরা নাযিয়াত ও সূরা বুরুজের তাফসীরে ফেরাউন ও সামূদ জাতির ধ্বংসের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা আ'দ জাতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করছি। পবিত্র কোরআন ব্যতীত আ'দ জাতি সম্পর্কে তেমন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস বর্ণনা কোরআন ঐটুকুই করেছে, যেটুকু শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। কোরআনের একটি আয়াত থেকে জানা যায় যে, মিম বা'দে ক্বাওমে নূহ অর্থাৎ নূহের পরের সম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক দাবী করেছেন, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে এই আ'দ জাতির উত্থান ঘটেছিল। মহাপ্লাবনের পরে সিরিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয়বার যখন মানুষের বসতি আরম্ভ হয়, তখন এই জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। দেহের আকার আকৃতিতে তারা ছিল বিশাল। ফলে তারা নিজেদেরকে দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে অতুলনীয় বলে ধারণা করতো।

আদ-ইরেম বলা হয় প্রাচীনতম আদ জাতিকে। পবিত্র কোরআন ও আরবের ইতিহাসে এই জাতিকে আদ-ই আদ্‌না বলা হয়েছে। এই আদ ও সামূদ জাতি সম্পর্কে সূরা নাজম-এ বলা হয়েছে– وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُوْلَى–وَثَمُوْدًا فَمَا أَبْقَى–

এবং সে প্রাচীন আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন এবং সামূদকে এমনভাবে নির্মূল করেছেন যে, তাদের একজনকেও জীবিত রাখেননি। (সূরা নাজম-৫০-৫১)

প্রাচীন আদ জাতিকে আদ-ইরেম এ জন্য বলা হয় যে, এরা আল্লাহর নবী হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের পৌত্র ইরেম-এর বংশধর ছিল। আল্লাহর কোরআনে এদের পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে 'যা-তুল-ইমাদ' অর্থাৎ স্তম্ভশালী হিসাবে পরিচয় দেয়া হয়েছে। কারণ এই জাতি গগন চুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করতো। পৃথিবীতে আকাশ চুম্বী পিলারের ওপরে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ সর্বপ্রথম এই জাতিই শুরু করেছিল। এ জন্য হযরত হূদ আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে বলেছিলেন–

أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ–وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ –

তোমাদের অবস্থা কেন এমন হলো যে, প্রতিটি উচ্চস্থানে একটি অর্থহীন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ

করছো এবং বিশালাকারের প্রাসাদ নির্মাণ করছো, যেন তোমাদেরকে এখানে অনন্তকাল থাকতে হবে।' (সূরা শুআরা-১২৮-১২৯)

আ'দ জাতি ছিল আরবের একটি প্রাচীনতম জাতি। এই জাতি সম্পর্কে নানা ধরণের কিংবদন্তি আরববাসীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কিশোর-বালকরা পর্যন্ত তাদের ইতিহাস জানতো। তাদের শক্তি ও প্রতাপ সেখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হত। অপরদিকে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে যাওয়াই ছিল একটি প্রবাদতুল্য বিষয়। এই খ্যাতি ও পরিচিতির জন্য আরবী ভাষায় প্রতিটি প্রাচীন বস্তুকেই আ'দী বলা হত আর প্রাচীন নিদর্শনকে বলা হত আ'দীয়াত।

যে জমির অধিকারী জীবিত থাকতো না এবং যে জমি পতিত পড়ে থাকতো, তাকে আরবীতে বলা হত আ'দীল আর্দ। প্রাচীন আরবী কাব্যে এই জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আরবে যারা বংশ বৃত্তান্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী তারা নিজেদের দেশের নিশ্চিহ্ন জাতিসমূহের মধ্য থেকে প্রথমে আ'দ জাতির কথা বর্ণনা করে থাকে।

হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, যহল ইবনে শাইবান গোত্রের একজন লোক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিল। আ'দ জাতি যে এলাকায় বাস করতো লোকটি ছিল সে এলাকার অধিবাসী। সে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে আ'দ জাতি সম্পর্কে প্রাচীনতম কাল থেকে এই এলাকার মানুষদের মধ্যে বংশানুক্রমে প্রচলিত কিস্‌সা-কাহিনী শুনিয়েছিল। পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে এই আ'দ জাতির প্রকৃত বাসস্থান ছিল আহ্‌কাফ নামক এলাকায়। এই এলাকা হিজাজ, ইয়েমেন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী আর রবউল খালীর দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় অবস্থিত।

এই এলাকা থেকেই তারা বিস্তার লাভ করেছিল। তারা ইয়েমেনের পশ্চিম উপকূল থেকে ইরাক পর্যন্ত বসতী স্থাপন করেছিল। ঐতিহাসিক বিচারে এই জাতির নাম নিশানা প্রায় পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তবুও দক্ষিণ আরবের কোন কোন স্থানে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রয়েছে, যা আ'দ জাতির ধ্বংসাবশেষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাযরামাউতের এক স্থানে হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের কবর রয়েছে বলেও অনুমান করা হয়েছে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে James R. Wellestad নামক একজন ইংরেজ, যিনি ছিলেন নৌবাহিনীর একজন অফিসার। তিনি হিস্‌নে গুরাব নামক এলাকায় একটি প্রাচীন পাথর আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই পাথরে হযরত হুদ-এর নাম লেখা ছিল। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, হযরত হুদ-এর আদেশ-উপদেশ অনুসারে যারা চলতো, এটা তাদেরই শিলালিপি।

দৈহিক শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে তারা চরমভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। এই সময় মহান আল্লাহ হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামকে তাদের ভেতরে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি নিজের জাতিকে আহ্বান জানালেন, তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো। আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী মহান আল্লাহ তোমাদের বসবাসের উপযোগী করেছেন। তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। তিনিই তোমাদের জীবন দান করেন এবং মৃত্যুদান করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত তোমাদের জন্য মুহুর্তকাল জীবিত থাকা সম্ভব নয়। তিনিই তোমাদের রব এবং ইলাহ। সুতরাং তারই দাসত্ব করো। তাঁর আইন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করো।

আ'দ জাতি হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামের কথার প্রতি কোন আগ্রহ পোষণ না করে স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে জানিয়ে দিল, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ নেই। সমস্ত সম্পদ আমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা পাহাড় কেটে বিশাল ইমারত তৈরী করতে পারি। সুতরাং সবকিছুর মালিক আমরা। আমরা যেভাবে আমাদের জীবন পরিচালনা করছি, এটাই একমাত্র সত্য পথ। দ্বিতীয় কোন পথের প্রয়োজন আমাদের নেই।

হযরত হূদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে নানাভাবে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে থাকলেন। সত্য পথে ফিরে না এলে আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করবে, হযরত নূহের জাতির মত তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা যে কর্মকান্ড করছে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক। এভাবে তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন, তোমরা বর্তমানে দৈহিক দিক দিয়ে চরম শক্তিশালী এবং বিশাল সম্পদের মালিক। এসব কিছুই দান করেছেন মহান আল্লাহ। এ কারণে তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় করো। তোমরা যা করছো, এই একই কাজ করে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের জাতি সমূলে পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস হয়েছে। তোমাদেরকে আল্লাহ এতকিছু দান করেছে, আর তোমরা তাকে ত্যাগ করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে যা খুশী তাই করছো। এই অবস্থায় আল্লাহর আযাব যে কোন মূহুর্তে তোমাদের ওপরে নাজিল হতে পারে। তোমরা অনেক সময় পেয়েছো। এখনও সময় আছে, আল্লাহর দরবারে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তওবা করো। আল্লাহ তোমাদের শক্তি সামর্থ এবং ধন-সম্পদ আরো অধিক দান করবেন। তোমরা সমস্ত দিকে উন্নতি করতে সমর্থ হবে।

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম দেখতে পেলেন তাঁর জাতি মূর্তিপূজা, নক্ষত্র পূজাসহ বিভিন্ন ধরনের জড়পদার্থের দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ। কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী অজ্ঞ জাতিকে নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। মানুষের ওপর মানুষ প্রভুত্ব করছে। গুটিকতক শক্তিশালী মানুষ–যারা দেশ ও সমাজের নেতৃত্ব নিজেদের হাতের মুঠোয় কব্জা করে রেখেছে, তারা বিভিন্ন কৌশলে গোটা জাতিকে নির্মমভাবে শোষণ করছে। কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ধর্মের নামে গোটা জাতিকে নিজেদের দাসে পরিণত করেছে। অন্যায় অত্যাচারের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে অথচ প্রতিবাদ করার কারো কোন সাহস নেই এবং মানসিকতাও নেই। মিথ্যে শক্তির পূজারীগণ সাধারণ মানুষের মন থেকে ন্যায়-অন্যায় বোধের পার্থক্য মুছে দিয়ে সমস্ত দেশবাসীকে মূঢ় জাতিতে পরিণত করেছে।

আল্লাহর নবী হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে দেশবাসীকে আহবান জানালেন, হে আমার জাতি ! একি দুর্দশা তোমাদের ! কেন তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব পরিত্যাগ করে এসব মূর্তির দাসত্ব করছো ? তোমরা যার দাসত্ব করছো তার কোন ক্ষমতা নেই। তারা না পারে নিজেদের কোন উপকার করতে আর না পারে তোমাদের কোন উপকার করতে । তোমরা যাদের আইন মেনে চলছো তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। এরা নিজেদের কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তোমাদেরও কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। তোমরা তাঁর আইন মেনে চলো, যিনি এই গোটা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবীর ভেতরে এবং বাইরে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুকে প্রতিপালন করছেন। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন অনুসরণ করোনা। তিনিই গোটা জাহানের একমাত্র প্রতিপালক। তিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। অতএব কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব করো। আমার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য আইন-কানুন অবতীর্ণ করছেন, সেই আইন অনুসরণ করো। কেবল মাত্র তাঁর সামনেই মাথানত করো, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।

ইতিহাস সাক্ষী, সেই মূঢ় জাতি হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের কোন কথায় কর্ণপাত করলো না বরং আল্লাহর নবীর দাওয়াতী কার্যক্রমের বিরোধিতা করতে শুরু করলো। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানেই আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেখানে তিন ধরনের শক্তি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। (এক) সমাজের কায়েমী ধনাঢ্য স্বার্থবাদী শক্তি। (দুই) প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ব্যবসায়ী শক্তি। (তিন) সমসাময়িক রাষ্ট্র শক্তি। আবহমান কাল ধরে এই তিন শ্রেণীর শক্তিই সর্বত্র এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে–করছে–আগামীতেও করবে।

সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তিঃ এই শক্তি দ্বীনি আন্দোলনের ভেতরে নিজেদের মৃত্যু দেখতে পায়। কেননা, গোটা সমাজে তারা এমন জাল বিস্তার করে রাখে, যার ভেতর দিয়ে সমাজকে তারা শোষণ করতে থাকে। সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ নিজেদের পকেটস্থ করার লক্ষ্যে এরা ব্যবসার নামে যে কোন উপায় অবলম্বন করে। তার এই তথাকথিত ব্যবসার কারণে দেশের কি ক্ষতি হচ্ছে, সমাজের কি ক্ষতি হচ্ছে, জাতি রসাতলে যাচ্ছে এসব দিকে দৃষ্টি দেয়ার কোন প্রয়োজন এরা বোধ করে না। সমাজের সাধারণ মানুষ যেন এদের কোনরূপ বিরোধিতা করতে না পারে–এ জন্য তারা ধর্মের নামাবলী গায়ে জড়ানো ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করে। রাষ্ট্র শক্তির হাতে থাকে প্রশাসন যন্ত্র, প্রশাসন যন্ত্র যেন কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, এ জন্য তারা রাষ্ট্র যন্ত্রের পরিচালকদেরও নিজেদের পকেটে রাখে। আল্লাহর আইন এবং আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে এদের শোষণের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে তারা দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতা করে।

প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ব্যবসায়ী শক্তি ঃ এই শক্তি ধর্মের নামে ব্যবসা করে। সাধারণ মানুষকে এরা ইসলামের মূল লক্ষ্য ও আদর্শের কোন কিছুই শিক্ষা দেয়না এবং জানতেও দেয়না। যারা জানানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তাদের সে প্রচেষ্টা যেন অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায় সে চেষ্টা করতে থাকে এরা। ইসলামের ভেতরে এরা নতুন কিছু সৃষ্টি করে সেদিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। এমন পদ্ধতির প্রবর্তন করে এরা যে, তার অবর্তমানে তারই নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা তার সন্তান গদিতে গদ্দিনশীন হয়ে সে কার্যকলাপ জারি রাখতে পারে। অর্থাৎ রাজতন্ত্র কায়েম করে বসে এরা। দেশব্যাপী হাজার হাজার শিষ্য বা মুরীদ তৈরী করে। এই শিষ্য বা মুরীদদের মনে এমন ধারণা এরা সৃষ্টি করে যে, গুরুকে যত বেশী দান দক্ষিণা, উপহার প্রদান করা যাবে, ততই আখেরাতে মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। ফলে শিষ্যদের দেয়া অর্থে ধর্ম ব্যবসায়ী এই শক্তি বিপুল অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়ে যায়। মৃত মানুষদের কবর বা মাজার সম্পর্কে এরা সাধারণ মানুষকে ধারণা দেয়, মাজারে অর্থদান করলে, কোন পশু বা দ্রব্য সামগ্রী দান করলে উদ্দেশ্য পূরণ হবে, কৃতপাপ মাফ হবে, আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে। এভাবে তারা মাজারের মাধ্যমেও বিপুল অর্থের মালিক হয়। রাষ্ট্রশক্তি এবং সমাজের স্বার্থবাদী কায়েমী শক্তির অনুকূলে কথা বলেও এরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলে এদের শোষণের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, এ কারণে এরা দ্বীনি আন্দোলনের বিরোধিতা করে।

সমসাময়িক রাষ্ট্রশক্তি ঃ উল্লেখিত দুই শক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করে রাষ্ট্রশক্তি। রাষ্ট্রযন্ত্র যাদের হাতে থাকে তারা নিজেদের অর্থ-বিত্ত-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি, বিভিন্ন উপায়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। প্রভুত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে নানা ধরনের আইন-কানুনের বেড়াজালে দেশের মানুষকে আবদ্ধ করে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দেশের সৎ

মানুষগুলোকে কোণঠাসা করে। হীনস্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী নোংরামী ও অশ্লীলতার প্রচার প্রসার বৃদ্ধি করে। নিজেদের অপকীর্তি আড়াল করার লক্ষ্যে গোটা জাতির দৃষ্টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে। দ্বীনি আন্দোলন তার লক্ষ্যে উপনীত হলে এই শক্তির সমস্ত অবৈধ পথ নিঃশেষে রুদ্ধ হয়ে পড়ে, এ কারণে এরা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে।

আর এই আন্দোলনের সূচনা কোন নবী বা তাঁর কোন অনুসারী যখনই করেছে, তাঁর প্রথম বিরোধিতা শুরু হয়েছে তাঁর নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে বা নিজের বংশের পক্ষ থেকে। নিজের অতি পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ মহলই সর্বপ্রথম বিরোধিতার সূচনা করেছে। কোন নবীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। জাতির ঐ তিনশক্তি প্রচন্ড বিরোধিতা আরম্ভ করলো এবং হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামও তাঁর জাতিকে আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কিছু মানুষ আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে এসেছিল। তাঁরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর ওপরে ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তিনটি সূরায় সাত স্থানে। আল্লাহ সেই জাতির ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, যারা ছিল যে কোন জাতির তুলনায় শক্তিশালী। তারা আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করেছিল। এ কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তারা যখন ধ্বংস হয়েছিল, তখন তাদের শক্তি তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সেই জাতির তুলনায় কোরআন নাজিল হবার যুগ পর্যন্ত মানুষ কোন দিক থেকেই শাক্তিশালী ছিল না। তারা দ্বীনি আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করে টিকে থাকতে পারেনি। এসব জাতির ইতিহাস বর্ণনা করে মহান আল্লাহ অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন। আল্লাহর বিধানের সাথে বেয়াদবি ও বিদ্রোহ করার পরিণতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সূরা আরাফে আল্লাহ্ বলেন–

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا–قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ..اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةِ

এবং আ'দ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি। সে বলেছিল, হে জাতির লোকজন ! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। এখন তোমরা কি ভ্রান্ত পথে চলা থেকে বিরত হবে না ? তারা জাতির নেতা এবং উচ্চ পর্যায়ের–যারা তাঁর আহ্বান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, তারা উত্তর দিয়েছিল, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত বলে মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবদী।

সে বলেছিল, হে আমার জাতি ! আমি নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত নই, বরং আমি গোটা জাহানের মালিক মহান আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাদের কাছে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ পৌছে দিই। আমি তোমাদের একজন এমন কল্যাণকামী যে, যার ওপর তোমরা নির্ভর করতে পারো। তোমরা কি এই জন্য অবাক হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে স্বয়ং তোমাদেরই জাতির একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের স্মারক এসেছে এই জন্য যে, সে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করবে। ভুলে যেও না, তোমাদের প্রতিপালক–নূহের সময়ের লোকদের পরে তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান করে সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং আল্লাহর কুদরতের কীর্তিকলাপ স্মরণে রেখো। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। তারা উত্তর দিল, তুমি আমাদের কাছে এই জন্য এসেছো যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবো এবং আমাদের বাপ-দাদারা যাদের দাসত্ব করেছে, তাদেরকে আমারা

পরিহার করবো ? ঠিক আছে, তুমি তাহলে সেই শাস্তি আমাদের জন্য নিয়ে এসো, যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো, যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হও। সে বললো, তোমাদের প্রতিপালকের অভিশাপ তোমাদের ওপরে পতিত হয়েছে তাঁর অসন্তোষ ও ক্রোধ নেমে এসেছে। তোমরা কি আমার সাথে সেই নামগুলোর কারণে ঝগড়া করছো, যা তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে গেছে এবং যেগুলোর পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।

ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত আমি নিজের অনুগ্রহের সাহায্যে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের বাঁচালাম এই সেই লোকদের মূলোৎপাটন করে দিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিল না। (সূরা আ'রাফ-৬৫-৭২)

হযরত নূহ-এর উল্লেখ করে হযরত হুদ তাঁর জাতিকে দুটো দিক সম্পর্কে সজাগ করতে চেয়েছিলেন। প্রথমতঃ মহান আল্লাহ নূহ-এর জাতিকে তাদের অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করার পরে তোমাদেরকে এই যমীনে উন্নত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ স্মরণে রেখো যে, তিনি তোমাদেরও ধ্বংস করে দিয়ে অন্য কোন জাতিকে এই যমীনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। কোরআনের এই বর্ণনা থেকে এ কথা জানা যায় যে, হযরত হুদ-এর জাতি আল্লাহকে অস্বীকার করতো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে এ প্রয়োজনীয়তাকেও তারা অস্বীকার করতো না। আসলে তারা হযরত হুদ-এর যে কথাটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো তাহলো, তারা একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ এবং রব হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান এসেছিল, তা তারা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। বর্তমান সমাজে যেমন নামাজ আদায় করতে হবে, রোজা পালন করতে হবে, হজ্জ আদায় করতে হবে, কালেমা পাঠ করতে হবে, এসব বিধান অস্বীকার করার মত লোক বোধহয় একেবারেই নগণ্য। এসব বিধানের প্রতি স্বীকৃতি দান করা হচ্ছে কিন্তু পবিত্র কোরআনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। নবীকে গ্রহণ করা হচ্ছে একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে। তাঁকে জাতির মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না, নবীকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। প্রতিটি নবীর যুগে সে জাতির অবস্থাও ছিল বর্তমানে আমাদেরই অনুরূপ।

বর্তমান সমাজে আল্লাহর কোন বুজর্গ ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তাঁর কবর কিছু দিনের মধ্যেই অর্থ উপার্জনের আখড়ায় পরিণত হয়। মাজার বানিয়ে তাঁর পূজা করা হয়। কবরে শায়িত ব্যক্তিকে মুক্তিদাতা, আশা আকাংখা পূরণের অধিকারী মনে করা হয়। তেমনি সে যুগেও কোন বুজর্গ ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তাঁর কবরকে পূজার আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর মূর্তি বানিয়ে তাকে পূজা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের আমলে যেসব মূর্তি ছিল হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের আমলেও তেমনি মূর্তি সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এসব মূর্তির নাম ছিল ইয়াগুছ, ওয়াদ ও সুওয়া। হাদীস শরীফ হতে জানা যায়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, তাদের একটি মূর্তির নাম ছিল সামূদ, আরেকটি মূর্তির নাম ছিল হাতার, ছাদা নামক যে মূর্তিটি ছিল তা ছিল সে সময়ে অত্যন্ত বিখ্যাত। এভাবে তারা ধর্মীয় জীবনে এমন সব শক্তির কাছে নিজেদের আশা আকাংখা পেশ করতো, যা ছিল তাওহীদের আকিদা বিশ্বাসের পরিপন্থী। রাজনৈতিক জীবনে তারা আল্লাহর দেয়া বিধান ত্যাগ করে নিজেদের মর্জ্জি অনুসারে নানা ধরনের আইন-কানুন অনুসরণ করতো।

যে আইন-কানুন গোটা সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। সমাজের বিত্তবান লোকগুলোর দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তারা কোন ধরনের বিচারের সম্মুখীন হত না। অথচ একই অপরাধের কারণে সমাজের গরীব মানুষগুলো চরম জুলুমের শিকার হত। বিশ্বনবীর যুগে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে সে সমাজের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বর্তমান সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। মুসলিম বলে যারা দাবী করে, তারা নিজেদের জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। একটা হলো ধর্মীয় জীবন আরেকটা হলো রাজনৈতিক জীবন। পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষকে এ কোন অধিকার দেয়নি, ইসলামে রাজনৈতিক জীবন বা ধর্মীয় জীবন বলতে পৃথক কিছু নেই। মানুষের গোটা জীবনই পরিচালিত হবে মহান আল্লাহর আইন দ্বারা। আ'দ জাতি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত নিজেদের মনগড়া আইন-কানুন অনুসরণ করতো। নির্দিষ্ট কোন আদর্শ বা মতবাদ তারা অনুসরণ করতো না। সমাজের বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কথাই ছিল তাদের আদর্শ ও আইন। মহান আল্লাহ হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামকে তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, সেই জাতি যেন আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে তাদের জীবন পরিচালনা করে।

আমরা আল্লাহকে একজন ইলাহ এবং রব হিসেবে গ্রহণ করেছি সত্য কথা। আমাদের ভেতরে যারা নামাজী তারা নামাজের প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকৃতি দান করছি, তুমিই একমাত্র রব এবং ইলাহ। আমরা তোমারই কাছে সাহায্য চাই। নামাজ থেকে ফারেগ হয়েই আমরা কেউ কোন পীরকে, কোন মাজারে শায়িত আল্লাহর কোন মৃত অলীকে, দেশের কোন নেতাকে নিজেদের ইলাহ এবং রব বানিয়ে নিচ্ছি। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অংশীদার বানিয়ে শির্ক করছি। নবীদের যুগের জাতিসমূহ এভাবে আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়েও নানা ইলাহ বানিয়ে নিত।

নবীগণ তাদেরকে এসব ইলাহ্-এর গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্যই আগমন করতেন, তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণ করতে বলতেন। পবিত্র কোরআন বলছে, তোমরা কাউকে বৃষ্টির, কাউকে বাতাসের, কাউকে ধন-সম্পদের, কাউকে রোগ-শোকের, কাউকে সন্তান দানের রব্ব বা ইলাহ বলে গ্রহণ করেছো। অথচ এরা কোন কিছুরই রব্ব বা ইলাহ নয়। এদের কারো কোন ক্ষমতাই নেই। সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। সুতরাং তাঁর দেয়া জীবন বিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করে তাঁরই দাস হয়ে যাও। তোমরা যাদেরকে নিজেদের রব্ব বা ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছো, তাদের কোন ক্ষমতা আছে বলে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, তাহলে কেন তোমরা তাদেরকে শক্তির উৎস বলে ধারণা করো ?

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর জাতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ কোরআনে বর্ণনা করেছেন। যে জাতি সত্য গ্রহণে অস্বীকার করবে, তাদের পরিণতিও ঐ জাতিসমূহের মতই হবে। এ সম্পর্কে অবতীর্ণকৃত একটি সূরার নামই হুদ রাখা হয়েছে। মক্কায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি দেখছি, আপনি যেন বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। হে আল্লাহর রাসুল ! এর কারণ কি ? আল্লাহর রাসূল জবাবে বলেছিলেন্, সূরা হুদ এবং এই সূরার অনুরূপ সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

আল্লাহর রাসূলের এই কথা থেকেই স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর জাতির অবস্থা দেখে তিনি মানসিক দিক থেকে এতটা অস্থির ছিলেন যে, যে কোন মুহূর্তে সেই আযাব এসে গোটা

জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। মক্কার কুরাইশরা যেভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ করছিল, হুদের জাতির অবস্থাও ছিল তেমনি। একই অবস্থা সৃষ্টি করার কারণে হুদের জাতিকে আল্লাহ ক্ষমা করেনি। কুরাইশদের যদি আল্লাহ অবকাশ না দেন ! এদের ওপরেও যদি আযাব আসে ! এই চিন্তায় আল্লাহর রাসূল প্রায় বৃদ্ধের মত হয়ে পড়েছিলেন।

কেননা, সূরা হুদের কাহিনীতে যে কথাটি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে তাহলো, আল্লাহ যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করতে চান, তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই তা করেন। সে ক্ষেত্রে কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। কাউকে সামান্য প্রশ্রয় দান করা হয়না। তখন কে কার সন্তান, কে কার আত্মীয়, এসবের দিকে লক্ষ্য করা হয়না। সে সময় আল্লাহর করুণা কেবল সেই ব্যক্তিই লাভ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান গ্রহণ করেছে। এই পথ ব্যতীত আল্লাহর গযব হতে এমন নারীও রক্ষা পায়নি, যে নারী ছিল নবীর স্ত্রী। এমন সন্তান রক্ষা পায়নি, যে ছিল কোন নবীর সন্তান। শুধু তাই নয়, সত্য আর মিথ্যার ভেতরে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয়, তখন ইসলামের প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই দাবী করে যে, স্বয়ং কোন মুমিনও যেন পিতা-সন্তান ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে গিয়ে এবং আল্লাহর ইনসাফের তরবারীর মতই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য সব সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়। এই ধরনের অবস্থায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক বা আত্মীয়তাকে একবিন্দু গুরুত্ব দান করা ইসলামের বিপ্লবী ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। মক্কা থেকে যেসব মুসলমান হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিল, তাঁরা বদরের ময়দানে, ওহুদের ময়দানে এই শিক্ষারই বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন।

মহান আল্লাহ সূরা হুদ-এ হুদ জাতির ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا–قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ....اِلٰى اٰخِرِ الاٰيَةِ

এবং আ'দ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি। সে বলেছিল, হে জাতির লোকজন ! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছো। হে আমার জাতি ! আমি এই কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না। আমার প্রতিদান তো তাঁর যিম্মায়, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি জ্ঞান বুদ্ধি আদৌ কাজে লাগাবে না ? হে আমার জাতি ! তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; তারপর তাঁর দিকেই ফিরে আসো। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দিবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তি-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। তোমরা অপরাধীদের মত মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

তারা উত্তর দিয়েছিল, হে হুদ ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসোনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহদের ত্যাগ করতে পারি না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবোও না। আমরা তো মনে করি যে, তোমার ওপর আমাদের ইলাহদের কারো অভিশাপ পতিত হয়েছে। হুদ বললো, আমি আল্লাহর প্রমাণ পেশ করছি। আর তোমরাও সাক্ষী থাকো, তোমরা এই যে আল্লাহকে ত্যাগ করে অন্যদেরকে সার্বভৌম কর্তৃত্বে অংশীদার বানিয়েছো, আমি তা থেকে মুক্ত। তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার তা করতে পারো, আমাকে কোন সুযোগ দান করো না। আমি নির্ভর করি আল্লাহর ওপরে যিনি আমার রব ও তোমাদেরও রব। কোন প্রাণী এমন নাই যে, যার মাথা তাঁর মুষ্ঠিতে নিবদ্ধ নয়। নিঃসন্দেহে আমার রব সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো তাহলে থাকতে পারো। যে পয়গামসহ আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, আমি তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের স্থলে অপর লোকদেরকে দাঁড় করাবেন। আর তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার রব্ব নিশ্চিত সব কিছুর সংরক্ষণকারী।

এরপর যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছলো, তখন আমি আমার রহমতের সাহায্যে হুদকে এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দান করলাম এবং কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে হেফাজত করলাম। এই হলো আ'দ জাতি, নিজেদের রবের আয়াতকে যারা অমান্য করেছিল, তাঁর নবী-রাসূলের কথাও তারা অমান্য করেছিল, আর সত্য জীবন ব্যবস্থার প্রত্যেক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে তারা অনুসরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতেও তাদের ওপরে অভিশাপ পতিত হলো এবং কিয়ামতের দিনও। শোন! আ'দ তাদের রবকে অস্বীকার করলো। এও জেনে রেখো যে, ধ্বংসই ছিলো হুদের জাতি আদের করুণ পরিণতি। (সূরা হুদ-৫০-৬০)

এসব আয়াতে বলা হচ্ছে, তোমরা যাদেরকে নিজেদের ইলাহ বানিয়ে রেখেছো, ইলাহ্ হবার যে গুণ থাকা প্রয়োজন, তা তাদের ভেতরে নেই। এ সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ। তোমরা যে আশা পোষণ করো, এ সমস্ত শক্তি তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেবে, তোমাদের আশা পূরণ করবে, তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করবে, তোমাদেরকে সন্তান দান করবে, এসব হলো অমূলক মিথ্যা ধারণা। তাদের যে কি হবে, তা তারা নিজেরাই জানে না। সুতরাং তাদের কাছে যেয়ে ধর্ণা না দিয়ে আল্লাহর কাছে ধর্ণা দাও।

হুদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার কথার প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়েই প্রত্যাখ্যান করছো। অথচ এ সম্পর্কে তোমরা কোন চিন্তা ভাবনা করছো না। তোমাদের যে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি রয়েছে, তা তোমরা কাজে লাগাচ্ছো না। তোমরা যদি তোমাদের বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগাও, চিন্তা ভাবনা করো, তাহলে অবশ্যই অনুভব করতে পারতে যে, যে ব্যক্তি নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই ইসলামী জীবন বিধান প্রচার করছে, এই কাজ করা যে কত কষ্টের, তবুও সে করছে। এই কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের জুলুম অত্যাচার সহ্য করছে। অথচ তাঁর পার্থিব কোন স্বার্থ নেই, তাহলে তাঁর কাছে নিশ্চিত সন্দেহাতীত বিশ্বাস ও ইয়াকিনের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি রয়েছে। মানসিক প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততার কোন কারণ বর্তমান বিদ্যমান রয়েছে।

যে কারণে সে নিজের সব ধরনের আরাম আয়েশ পরিহার করে এবং নিজের পার্থিব সুযোগ-সুবিধাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেকে এমন দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। আর এই কারণেই সে শতাব্দীকালের পুঞ্জীভূত ও জমাট-বাঁধা আকীদা-বিশ্বাস, প্রচলিত প্রথা ও জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং এ কারণেই সে পৃথিবীর বহু মানুষের শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং এমন ধরনের ব্যক্তির কথা কোন ক্রমেই মিথ্যা হতে পরে না। তাঁর কথা ও চিন্তা ভাবনা, প্রচারিত আদর্শ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করে এভাবে হেসে উড়িয়ে দেয়া বা অন্ধের মত তাঁর বিরোধিতা করা যেতে পারেনা।

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; তারপর তাঁর দিকেই ফিরে আসো। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তি-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। তোমরা অপরাধীদের মত মুখ

ফিরিয়ে থেকো না।' বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষকে বলেছিলেন যে কথা সে কথা আল্লাহ্ এভাবে কোরআনে বর্ণনা করেছেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁরই দিকে ফিরে এসো। তাহলে তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবন সামগ্রী দান করবেন।'

কোরআনের এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শুধু কিয়ামতের দিনই নয়, এই পৃথিবীতেও জাতিসমূহের উত্থান পতন সংঘটিত হয় নৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে। আল্লাহ্ এই পৃথিবীর ওপর যে প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কার্যকর করছেন, তা একান্তই নৈতিক বিধানের ওপর ভিত্তিশীল। আল্লাহর এই বিধান নৈতিক ভালো মন্দের পার্থক্যশূন্য জড়-নিয়মের অধীন নয়। কোরআনে একাধিক স্থানে বলা হয়েছে যে, একটি জাতির কাছে যখন নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছায়, তখন সে জাতির ভাগ্য সেই পয়গামের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

এই পয়গাম কবুল করলে আল্লাহ্ তার ওপরে নিজের নিয়ামত ও বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আর যদি সে ঐ পয়গামকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করে দেন। অন্য কথায় আল্লাহ্ মানুষের সাথে যে নৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে ব্যবহার করে থাকেন, এটা তারই একটি দফা মাত্র। এভাবে এর আরেকটি ধারা হলো, যে জাতি পৃথিবীর সাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতার প্রতারণায় পড়ে জুলুম ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে থাকে, একমাত্র ধ্বংসই তার পরিণাম হয়ে থাকে। আবার ঠিক সে জাতি তার নিশ্চিত ধ্বংসের পরিণতির দিকে ছুটে চলতে থাকে, সেই সময় সে যদি নিজের ভুল অনুভব করতে পেরে এবং বিদ্রোহের পথ ত্যাগ করে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তাদের জন্য শাস্তির পরিবর্তে পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে পারেন।

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের জাতি তাঁর কাছে প্রমাণ দাবী করেছিল, এই কথাই এই আয়াতে বলা হয়েছে। তারা বলেছিল, এমন কোন প্রমাণ তোমাকে পেশ করতে হবে। যা দেখে আমরা বুঝবো যে, সত্যই আল্লাহ্ তোমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছে। মূলতঃ এটাও ছিল তাদের একটা ধোকা মাত্র। কোন প্রমাণেই তারা সত্য পথে ফিরে আসতো না। কারণ, যারা নিজের বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান প্রয়োগ করে সত্য আর মিথ্যার প্রভেদ করতে রাজী নয়, তারা যে কোন প্রমাণ দেখেও বলবে না এটা স্পষ্ট যাদু–তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। জাতির লোকজন তাকে বলেছিল, আমরা যেসব শক্তিকে ইলাহ্ হিসেবে তাদের দাসত্ব করি, তুমি তাদের সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করেছো, এ কারণে তারা তোমাকে এই দুঃখ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার ভেতরে নিক্ষেপ করেছে।

তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহদের ত্যাগ করতে রাজী নই, অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো, তুমিও শুনে নাও, তুমি আমাদেরকে যতই আযাবের ভয় দেখাও আর যাই করো না কেন, আমরা কোন ক্রমেই আমাদের ইলাহকে ত্যাগ করবো না। হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে বলেছিলেন, তাহলে তোমরাও শুনে রাখো, আল্লাহ্ অত্যন্ত ন্যায় বিচার করবেন। তোমরা ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করবে না অথচ কল্যাণ লাভ করবে আর আমি সৎ পথে থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হবো, আল্লাহর নীতি এমন নয়। তোমরা তোমাদের কর্মফল অবশ্যই লাভ করবে আর আমি আমার কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে অবশ্যই লাভ করবো।

অতি সামান্য সংখ্যক মানুষই হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের আহ্বানে ইসলাম কবুল করেছিল। জাতির বৃহত্তর অংশই ছিল আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি বিদ্রোহী। হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম অবশেষে বাধ্য হয়ে তাদেরকে সতর্ক করে বলেছিলেন–

اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ–

আমি তোমাদের ওপরে এক ভীষণ দিনের আযাব আসার আশঙ্কা করছি। (সূরা শু'আরা-১৩৫)

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের অবাধ্য জাতি এতদূর পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছিল যে, আল্লাহ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে বলেছিল– فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ–

হে হুদ ! তুমি সেই আযাব নিয়ে এসো, যে আযাবের ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো। যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে নিয়ে এসো সেই আযাব। (আ'রাফ-৭০)

তিনি অনুভব করলেন, এই জাতি অবাধ্যতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সত্য পথে ফিরে আসার সমস্ত দরোজা এই জাতি স্বহস্তে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন এরা আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে। তিনি তখন তাঁর জাতিকে বললেন–

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ–

অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে গযব ও আযাব তোমাদের ওপরে এসে পড়বে। (সূরা আ'রাফ-৭১)

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আল্লাহর করুণায় তোমরা জীবিত আছো, আর সেই আল্লাহর সাথেই তোমরা বিদ্রোহ করছো। ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো। আল্লাহ তোমাদের জন্য কি ধরনের ফয়সালা করে তার অপেক্ষা করতে থাকো।

মহান আল্লাহ প্রথমে তাদের ওপরে দুর্ভিক্ষ নাজিল করলেন। একবারে গযব দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস না করে তাদেরকে অবকাশ দান করলেন যেন দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়ে তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। চরম দুর্ভিক্ষ যখন দেখা দিল তখন আ'দ জাতি ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম বুঝলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সহজ সরল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর জাতিকে অবকাশ দান করছেন এবং তিনি পুনরায় তাদেরকে বুঝালেন, এই দুর্ভিক্ষ তোমাদের ওপরে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক সংকেত হিসেবে আগমন করেছে। এখনও তোমরা সতর্ক হও। আল্লাহর কাছে তওবা করে তোমরা তাঁর দ্বীনের পথে ফিরে এসো।

আ'দ জাতি আল্লাহর নবীর কথায় কান দিল না। বরং পূর্বের তুলনায় প্রবল শক্তিতে আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করতে থাকলো। মহান আল্লাহ এবার এই অবাধ্য জাতিকে আর সুযোগ দান করলেন না। তিনি এমন আযাব অবতীর্ণ করলেন যে, আ'দ জাতি ইতিহাসের কল্পকাহিনীতে পরিণত হলো।

ঝড় শুরু হলো, প্রচন্ড ঝড়। ইতিহাসে দেখা যায়, সে ঝড় আটদিন যাবৎ প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথম দিন যখন ঝড় শুরু হলো তখন আ'দ জাতির লোকজন তাদের বাড়ি-ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ক্রমশঃ সে ঝড়ের গতি আল্লাহ বৃদ্ধি করতে থাকলেন। কোরআনের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, সে ঝড় আটদিন এবং সাত রাত পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল। প্রচন্ড ঝড়ের তান্ডব লীলায় বিশাল আকৃতির মানুষগুলো পত্র-পল্লবের মতই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্প্রাণ অসাড় হয়ে পড়েছিল।

মাত্র একদিন পূর্বে যারা তাদের দৈহিক শক্তির কারণে নিজেদেরকে অতুলনীয় ভেবে মহান আল্লাহর বিধানের সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলেছিল, কোথায় তোমার আল্লাহর আযাব,

যদি পারো তাহলে তা নিয়ে এসে আমাদেরকে দেখাও। তারা আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে মৃত পশুর মতই পড়েছিল। তাদের গোটা জনপদের অবস্থা এমন আকার ধারণ করেছিল যে, মাত্র ঘন্টা কয়েক পূর্বেও যে এখানে কোন জনপদ ছিল, কোলাহল পূর্ণ মানব বসতী ছিল, তার আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইলো না। গোটা নগরী এমনভাবে ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল যে, মানুষ বাসের কোন চিহ্ন ছিল না।

কোন কোন গবেষক অনুমান করেন যে, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হতে পাঁচ হাজার। মহান আল্লাহ নিজের অসীম কুদরতের মাধ্যমে হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীদেরকে যাবতীয় ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছিলেন। আ'দ জাতির ধ্বংসের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল দৈহিক দিক দিয়ে প্রচন্ড শক্তিশালী এবং উন্নত জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণে সমৃদ্ধ। তাদের অবস্থা এমনই করা হলো যে, পরবর্তী কালের মানুষের জন্য তারা শিক্ষনীয় ইতিহাস হয়ে রইলো।

এই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের সাথে বিরোধিতা করে কোন ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী ও জাতি যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন যেমন তারা কোন সাহায্য পায়না, তেমনি কিয়ামতের দিনও তারা কোন সাহায্য পাবে না। এই পৃথিবীতে যেমন তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই জোটে না, পরকালেও তেমনি লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই জুটবে না। আ'দ জাতির অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْافِى الْاَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ وَقَالُوْامَنْ اَشَدُّ..اِلَى اخِرِالاية

আর ছিল আ'দ সম্প্রদায়। তারা দেশের ভেতরে অনর্থক অহংকার প্রদর্শন করছিল আর বলছিল, শক্তি ও ক্ষমতায় আমাদের সমকক্ষ আর কে আছে? তারা কি দেখে না যে, যে মহান শক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতো। তারপর আমি তাদেরকে পৃথিবীর জীবনে লাঞ্ছনামূলক শাস্তির স্বাদ অস্বাদন করানোর জন্য কয়েক দিন ব্যাপী তাদের ওপরে মহাশক্তিশালী প্রবল ঝড় প্রেরণ করলাম। আর আখেরাতের পূর্ণ লাঞ্ছনাজনক শাস্তি তো অবশিষ্ট রয়ে গেল। সেখানে তারা কোন ধরনের সাহায্য লাভ করবে না। (সূরা হামীম সেজ্দাহ্-১৫-১৬)

পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় জানা যায়, আ'দ জাতির ওপরে ধ্বংস নেমে আসার পূর্বে আল্লাহর আযাব মেঘের রূপ ধারণ করে এসেছিল। গোটা আকাশ যখন ভয়ংকর মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল তখনও আল্লাহর নবী হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। এ সময় তাঁর জাতি উত্তর দিয়েছিল-

فَلَمَّارَاَوْهُ عَارِضًامُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ-قَالُوْاهٰذَاعَارِضٌ مُّمْطِرُنَا..اِلَى اخِرِالاية

পরে যখন তারা সেই আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো তখন বলাবলি করছিল, এটা সেই মেঘমালা, এই মেঘমালা আমাদেরকে সিক্ত করে দেবে। (আল্লাহ বলেন) না, এটা সেই জিনিষি যার জন্য তোমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে। (অর্থাৎ তারা তো চ্যালেঞ্জ করতো, কোথায় তোমার আযাব? পারলে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো) এটা বাতাসের ঝঞ্ঝা তুফান। এর মধ্যেই অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব চলে আসছে। তা তার আল্লাহর নির্দেশে প্রত্যেকটি জিনিষই ধ্বংস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি এমন হলো যে, তাদের

থাকার স্থানটুকু ব্যতীত (অর্থাৎ শুধু মাটি ব্যতীত) আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। বস্তুতঃ এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি। (সূরা আহ্কাফ-২৪-২৫)

আল্লাহর ইসলামের সাথে বেয়াদবি করার কারণে মহান আল্লাহ তাদের যে পরিণতি করেছিলেন, তা পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের দুর্দশা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَفِىْ عَادٍاِذْاَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ-مَاتَذَرُمِنْ شَىْءٍ اَتَتْ .اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) আ'দ জাতির ঘটনায়। আমি যখন তাদের ওপর এমন অকল্যাণময় বায়ূ-প্রবাহ প্রেরণ করলাম তা যে জিনিষের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল, তাকেই পঁচা হাড়ের মতই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (সূরা যারিয়াহ্-৪১-৪২)

মহান আল্লাহ আ'দ জাতির ঘটনার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তোমরা লক্ষ্য করো। আমার দেয়া বিধানের সাথে বিদ্রোহ করলে পরিণতি হয় অত্যন্ত অশুভ। মহান আল্লাহ বলেন–

كَذَّبَتْ عَادٌفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ-اِنَّااَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيْحًا..اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

আ'দ মিথ্যা ধারণা করে অমান্য করেছে। তাদের প্রতি আমার আযাবটা কিরকম ছিল এবং আমার সাবধান সতর্ক বাণী তা লক্ষ্য করো। আমি এক বড় ও ক্রমাগত অশুভ দিনে প্রবল ঝড়ো বাতাস তাদের ওপর প্রেরণ করেছি। তা লোকদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে নিক্ষেপ করছিল, যেন তারা মূল হতে উৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ড। সুতরাং লক্ষ্য করো কেমন ছিল আমার আযাব আর কত তীব্র ছিল আমার সাবধান সতর্ক বাণী। (সূরা ক্বামার -১৮-২১)

প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে বিশাল আকারের বৃক্ষগুলো উপড়ে অসহায়ের মতই নেতিয়ে পড়ে থাকে। অথচ ক্ষণপূর্বেও সে বৃক্ষ স্বগৌরবে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দন্ডায়মান ছিল। অহংকারী আ'দ জাতির অবস্থাও তেমনি ছিল। মহান আল্লাহ বলেন–

وَاَمَّاعَادٌفَاُهْلِكُوْابِرِيْحٍ صَرْصَرٍعَاتِيَةٍ-سَخَّرَهَاعَلَيْهِمْ سَبْعَ ....اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

আর আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝা বাতাসের আঘাতে। আল্লাহ তা'য়ালা তা ক্রমাগত সাতরাত ও আটদিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে দেখতে পেতে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে এমনভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়েছিল যেমন পুরানো শুকনো খেজুর গাছের কান্ডসমূহ পড়ে থাকে। এরপর কি তুমি দেখতে পাও, তাদের ভেতরে কেউ কি জীবিত আছে ? (সূরা হাক্কাহ-৬-৮)

যে জাতির একজনের দৈহিক শক্তি ছিল বর্তমান মানুষের কয়েক শতেরও শক্তির অধিক। যারা পাহাড় খোদাই করে নানা ধরনের কিছু সৃষ্টিতে ছিল পারদর্শী। আল্লাহর আইনের সাথে অবাধ্যতা করার কারণে পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকে চরম লাঞ্ছনা দিয়ে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। তাদের মত জাতি আল্লাহর গযবের কাছে টিকে থাকতে পারেনি। বর্তমানেও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর গযব আসছে। মানব জাতিকে এ ধরনের গযব দিয়ে মহান আল্লাহ সংশোধন করতে চান। অথচ এই নির্বোধ মানুষ এই সমস্ত গযবকে 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' 'প্রকৃতির খেয়াল' ইত্যাদী নাম দেয়। তারপরে বলে এ সমস্ত বিপর্যয়ের মোকাবেলা করা হবে, কোন ভয় নেই, সরকার সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত আছে। হতভাগা মানুষ, সাহস কত !

প্রচার মাধ্যমে যখন বারবার ঘোষনা করা হয়, '১০ বা ১২ নম্বর মহাবিপদ সংকেত, ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে।' তখন দেশের সরকারের পক্ষ হতে আল্লাহর কাছে গোটা জাতিকে তওবা করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার পরামর্শ দানের পরিবর্তে সরকার ঘোষনা করে, 'কোন ভয় নেই। আমরা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।' এই ধরনের ঘোষনা চরম ধৃষ্টতার শামিল। অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় কোনকিছুই টিকে থাকে না থাকতে পারে না। হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের জাতিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যে কারণে আল্লাহর গযবে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ঐ সমস্ত কারণসমূহ বর্তমান জাতির ভেতরে বিদ্যমান। আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহর বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আলোচ্য সূরার ১৪ নম্বর আয়াতে 'মিরছাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী অভিধানে এই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে, ঘাঁটি, আশ্রয়স্থল বা অবস্থানের জায়গা। শব্দটির ক্রিয়ামূল হলো 'রাছাদ'। মূল আয়াতের অর্থ হলো, 'তোমার মালিক এদের ধরার জন্যে ওঁৎ পেতে ছিলেন।' সাধারণতঃ ওঁৎ পেতে থাকা হয় কোন ঘাঁটিতে। এই জন্যেই এই আয়াতে 'মিরসাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অত্যাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জালিমদের গতিবিধি ও কর্মকান্ডের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখার অর্থেই আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার মালিক এদের ধরার জন্যে ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে ছিলেন।' ঘাঁটি বলা হয়ে থাকে এমন কোন গোপন স্থানকে যেখানে কোন ব্যক্তি অন্য কারো প্রতীক্ষায় আত্মগোপন করে থাকে এই উদ্দেশ্যে যে, সে যে ব্যক্তির প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে, সে ব্যক্তি কাছাকাছি এলেই সহসা তাকে আক্রমণ করবে। এ অবস্থায় যার ওপরে আক্রমণ করা হয় সে এই ঘাঁটিতে অপেক্ষামান ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্বে কিছু অনুমানও করতে পারে না। তাকে ধরা হতে পারে বা তার ওপরে আক্রমণ আসতে পারে, এই চেতনা না থাকার কারণেই সে ঐ পথে চলতে থাকে, যে পথে তাকে ধরার জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করা হচ্ছে।

পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে বা অবিশ্বাস পোষণ করে পৃথিবীতে যারা অশান্তি এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে, নিষ্ঠুর পায়ে মানবতাকে পদদলিত করে, অন্যায়-অত্যাচারের প্লাবন বইয়ে দেয়, মহান আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ যে আছেন এবং তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, প্রকাশ্য ও গোপনে যা সংঘটিত হচ্ছে, সবই তার জ্ঞানের আওতায় এবং তাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের প্রতি তিনি যে দৃষ্টি রাখছেন, এ কথা ঐসব স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী জালিমদের স্মরণে থাকে না। কোন ধরনের জবাবদিহি কোনদিন কারো কাছেই করতে হবে না–এই অনুভূতি হৃদয়ে পোষণ করে তারা তাদের জুলুম ও নিপীড়নমূলক কর্মকান্ডের বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে। অহঙ্কারে মদমত্ত জালিম এভাবে গর্বিত পদে এগিয়ে যেতে থাকে ঐ সীমানার (Boundary) কাছে, যে সীমানা আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অতিক্রম করতে দেবেন না। এভাবে শেষের খুব কাছে যখন পৌছে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহান আল্লাহর আযাব এসে এদেরকে গ্রেফতার করে।

ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদ, আ'দ জাতি, সামূদ জাতি, হযরত নূহের জাতি, আবু লাহাব ও আবু জেহেলের গোষ্ঠীসহ পৃথিবীর অসংখ্য ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী ও জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর চিরপ্রতিষ্ঠিত নৈতিক বিধানের অধীনেই গ্রেফতার করেছেন, করছেন এবং আগামীতেও

করবেন। এসব জালিমদেরকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করে ক্ষমতার দম্ভ চূর্ণ করে দেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে এরা চরম ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। এদের নাম উচ্চারণ করতেও মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

১৫ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতে মানুষের সাধারণ নৈতিক অবস্থার সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মানুষরা এমন হয় যে, যখন তার মালিক তাকে অর্থ ও মর্যাদা দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন এবং সম্মান দান করেন তখন সে বলে হ্যাঁ আমার মালিক আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি ভিন্নভাবে তাকে পরীক্ষা করেন এবং এক পর্যায়ে তার রেযেককে সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে নাখোশ হয়ে বলে, আমার মালিক আমাকে অপমান করেছেন।'

কোরআনের জ্ঞান বিবর্জিত কুসংস্কারে বিশ্বাসী বর্তমানের অধিকাংশ লোকদের মতো আরবের সে যুগের লোকদেরও বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি অধিক প্রিয়, তিনি তাকেই অঢেল ধন-সম্পদ দান করেন। আর তিনি যাদেরকে অপছন্দ করেন, তাদেরকে দারিদ্রতার নিষ্পেষণে জর্জরিত করেন। এ কথা তারা বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও স্বল্পতা–এই উভয় অবস্থার মধ্যে মানুষকে নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি দেখতে থাকেন, অঢেল ধন-ঐশ্বর্য হস্তগত হলে মানুষ কি ধরনের চরিত্র প্রকাশ করে আর দৈন্যতার মধ্যেই বা মানুষ কোন্ ধরনের আচরণ করতে থাকে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে সে অহঙ্কারী, অত্যাচারী হয়ে ওঠে না মানবতার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটায়। আপন প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, অথবা আপন মনিব আল্লাহর কথা ভুলে যায়। আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ থেকে সে অবারিত হস্তে সাহায্যপ্রার্থী বা অভাবীদেরকে দান করে, না অভাবী সাহায্যপ্রার্থীকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর দ্বীনের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে 'একটি আযাব বিশেষ' বলে মনে করে, না আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে।

আর অভাব এবং দৈন্যতায় আক্রান্ত হয়ে আপন প্রভুকে অভিসম্পাত দিতে থাকে, না ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে। চরম দরিদ্র আর দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে ধৈর্যের পথ অবলম্বন করে, না অসহিষ্ণু হয়ে ন্যায়-অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে অর্থ-সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দারিদ্রের সর্বগ্রাসী অভিশাপ যখন সমস্ত কিছুকেই গ্রাস করে, তখন সে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির ভয়ে অন্যায়-অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত থাকে, না পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে সামান্য কয়েকদিনের সুখভোগের লক্ষ্যে অবৈধ পথে অগ্রসর হয়। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার জন্যই তিনি কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন এবং কাউকে দৈন্যতায় নিক্ষেপ করেন।

আখিরাতের প্রতি উদাসীন ও উপেক্ষা প্রদর্শনকারী লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই হলো সম্মান এবং মর্যাদার মানদন্ড। এসব জিনিস যার হস্তগত হয়েছে, তিনিই পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী আর যে ব্যক্তি এসব থেকে বঞ্চিত রয়েছে, যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারেনি, তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী নয়। এই ঘৃণিত নীতির আবর্তেই পৃথিবীতে মানবতা আবর্তিত হচ্ছে। উন্নত চরিত্র, উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকমান, সততা, মহানুভবতা, ন্যায়-পরায়ণতা, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি, পান্ডিত্য এসবের কোন মূল্য দেয়া হয় না। এসব দুর্লভ গুণ ও বৈশিষ্ট্য যে সব দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, মানব সমাজে এরা অপাংতেয়। সমাজের কোন একটি স্তরেও নেতৃত্বের আসন

লাভের যোগ্য এরা নন। জাতির পরিচালকদের কাছেও এরা গুণীজন হিসাবে বিবেচিত হন না। সামাজিক বা জাতিয় কোন অনুষ্ঠানেও এরা দাওয়াত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। এদের একটিই অপরাধ, কেন তারা ধন-সম্পদ আর প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হননি।

আর আপাদ-মস্তক যাদের নোংরামীতে নিমজ্জিত, কদর্যতা আর কলুষতাই যাদের চারিত্রিক ভূষণ, ন্যায়-অন্যায়বোধটুকু যারা বিসর্জন দিয়েছে, দুষ্কৃতি আর দুর্নীতির উচ্চমার্গে যাদের অবস্থান, অশ্লীলতা আর নোংরামীর যারা স্রষ্টা, পরস্বার্থ অপহরণে যারা পারদর্শী, ব্যক্তিস্বার্থের কাছে যারা জাতিয়স্বার্থ বলিদানে উন্মুখ, সততা, ন্যায়-নীতি শব্দগুলো যারা পরিহার করে চলে, এসব লোকগুলোই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এরাই জাতিয় হিরো এবং গুণীজন হিসাবে বরিত হয়ে থাকে। কারণ এদের রয়েছে অবৈধ পথে উপার্জিত অঢেল অর্থ-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি। সমাজের ক্ষুদ্র একটি নেতৃত্বের আসন থেকে শুরু করে দেশের বৃহত্তর নেতৃত্বের আসনে এরাই সমাসীন। পরকালে অবিশ্বাসী এসব ভ্রষ্ট ও চরিত্রহারা লোকগুলো নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে রয়েছে বলেই সর্বত্র অশান্তি, বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

মানুষের ভেতরে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই হলো সম্মান এবং মর্যাদার মানদন্ড–এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে **১৭ থেকে ২০ নম্বর আয়াতসমূহে**। ১৭ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দটিতেই বলা হয়েছে, 'কাল্লা' অর্থাৎ কখনো নয় বা এমনটি নয়। অর্থাৎ তোমরা যে ধারণা অনুসারে অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছো, তা সত্য নয়। এসব বিষয় সম্মান ও অসম্মানের মানদন্ড কখনো হতে পারে না। কোন ব্যক্তির চরিত্র উন্নত না নিকৃষ্ট, তা বিবেচনা না করেই এবং এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা বিচার বিবেচনায় না এনে একমাত্র অর্থ-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকেই সম্মান-মর্যাদা ও অপমানের মানদন্ড বানিয়ে নিয়েছো, এটা তোমাদের মারাত্মক ভুল ধারণা আর বুদ্ধির দৈন্যতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, ধন-সম্পদের মোহ তোমাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, সমাজে যারা ইয়াতিম, তাদের ধন-সম্পদ পর্যন্ত তোমরা আত্মসাৎ করে নিজের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করছো।

সম্মান-মর্যাদা ও অপমানের যে মানদন্ড তোমরা নির্ধারণ করেছো, এটা বহাল থাকলে ন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করে অবৈধ পথে অপরের সম্পদ ও ইয়াতিমদের সম্পদ কৌশলে আত্মসাৎ করার পথে কোনই প্রতিবন্ধকতা থাকে না। পিতা অথবা পিতা-মাতা উভয়ের অবর্তমানে ইয়াতিমরা চরম অসহায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের অসহায়ত্বের সুযোগে তোমরা প্রাপ্য অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করো। এই ইয়াতিমদের পিতা অথবা পিতা-মাতা উভয়েই জীবিত থাকা অবস্থায় তোমরা এদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করেছো। যখনই তারা পিতাকে হারিয়ে চরম এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়েছে, তখনই তোমাদের দৃষ্টিতে তারা করুণার পাত্র এবং লাঞ্ছনা-অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত হয়েছে। এই ইয়াতিমরা তোমাদের দৃষ্টিতে কোন ধরনের অধিকার লাভের যোগ্য নয়।

শুধু তাই নয়, অভাবীদেরকেও তোমরা কোনই সাহায্য করো না। তোমাদের প্রতিষ্ঠিত শোষণমূলক নীতির কারণে অর্থ-সম্পদের ওপরে একচেটিয়া প্রভুত্ব কায়েম করেছো তোমরা।

শোষিত শ্রেণী ক্ষুধার্ত অবস্থায় এক মুঠো খাদ্যের আশায় যখন তোমাদের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, তখন তোমরা যেমন ব্যক্তিগতভাবে তাদেরকে খাদ্য দাও না, তেমনি অন্যকেও অভাবীদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে বা খাদ্য দেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দাও না। এমনকি তোমাদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করে তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ সুষম বন্টন না করে নিজেই কুক্ষিগত করো। তৎকালীন আরব সমাজে মৃত ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ বন্টনের এক অদ্ভূত নীতি প্রচলিত ছিল। মৃত ব্যক্তির যাবতীয় অর্থ-সম্পদ পরিবারের পুরুষদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি লাভ করতো, যে ব্যক্তি ছিল যুদ্ধবাজ। যুদ্ধ করা এবং পরিবারবর্গের সংরক্ষণ করার ক্ষমতা যার ভেতরে ছিল, সে-ই যাবতীয় অর্থ-সম্পদ দখল করতো। অর্থাৎ শক্তিশালী ব্যক্তি অন্যান্য শরীকদের বঞ্চিত করে একাই সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যেতো। পরিবারের অসহায়, অক্ষম, দুর্বল, নারী ও শিশুদেরকে, ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হতো। আরব জাহিলিয়াতের ঐ ঘৃণ্য প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মতো বর্তমান সমাজকেও আক্রান্ত করেছে। শোষণমূলক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে শোষক শ্রেণী আরেকদিকে সৃষ্টি হয়েছে শোষিত শ্রেণী। বৈধ পথে সহজে অর্থোপার্জনের যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশে শোষক শ্রেণীর হাতে পূঁজি আবর্তিত হবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং এ কারণেই ধনীর অর্থ-সম্পদ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে আর গরীব ক্রমশঃ নিঃস্বই হয়ে যাচ্ছে।

সাহায্য-সহযোগিতা লাভের আশায় অভাবী-গরীব লোকজন ধনীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে পথও তাদের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে। সমাজের অসহায়, দুর্বল, অক্ষম ও ইয়াতিমদের সম্পদ দখল করার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের কৌশলের উদ্ভাবন করা হয়েছে। কল-কারখানা, লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জায়গা-জমির প্রয়োজনে পূঁজিপতি ধনীক শ্রেণী কৌশলে দুর্বলের জায়গা দখল করে অথবা স্বল্পমূল্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করে। দেশের প্রচলিত আইনও এদেরকেই সহযোগিতা করে। অপরকে ঠকানো, অন্যের অধিকার খর্ব করা, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার লক্ষ্যেই আখিরাতে অবিশ্বাসী লোকজন তাদের মন-মগজ প্রসূত নিয়ম-পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত করেছে।

এসব করা হয়েছে মাত্র একটিই উদ্দেশ্যে যে, তারা অর্থ-সম্পদের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ধন-সম্পদ এদের কাছে এতটাই প্রিয় যে, তা অর্জনের জন্যে এরা যে কোন পথ অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। নিজের দেশের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মোড়ল রাষ্ট্রগুলো অনুন্নত দুটো দেশের মধ্যে উস্কানি দিয়ে যুদ্ধ বাধায়। এরপর শুরু করে উভয় রাষ্ট্রের কাছে মারণাস্ত্র বিক্রির ব্যবসা। দুর্বল রাষ্ট্রকে তার দেশের খনিজ সম্পদ বিক্রি করে নিঃস্ব হতে বাধ্য করা হচ্ছে। অশ্লীল অশালীন চরিত্র বিধ্বংসী গ্রন্থ রচনা এবং ছায়াছবি নির্মাণ করে তা দেশে দেশ সরবরাহ করে প্রভূত অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। এভাবে নানা কৌশলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোকে অন্যায়ভাবে শোষণ করছে, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

দেশের অভ্যন্তরেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আখিরাতের প্রতি উদাসীন লোকগুলো দ্রুত অর্থ-বিত্তের মালিক হবার লক্ষ্যে সুদ, ঘুষ, মাদক ব্যবসা, নারী দেহের ব্যবসা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। তার ব্যবসার কারণে জাতিয় চরিত্র কোন নিম্ন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলো, সমাজে কোন ধরনের অশান্তি আর বিপর্যয় সৃষ্টি হলো এর কোনদিকেই অর্থলোলুপ লোকগুলো দৃষ্টি দেয় না। অর্থ এদের কাছে এত অধিক প্রিয় বস্তু যে, তা অর্জনের জন্য এরা মানুষ অপহরণ করে তার দেহের রক্ত, কিড্‌নী ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করে। শুধু তাই নয়, অর্থলোভীরা মানব কংকালের ব্যবসা পর্যন্ত শুরু করেছে।

অর্থলোলুপ লোকগুলো এই ধরনের জঘন্য কর্মকান্ডে এ জন্যই লিপ্ত হয় যে, এরা বিশ্বাস করে এমন কোন সত্তা নেই, যিনি তাদের প্রতিটি কর্মকান্ড রেকর্ড করে রাখছেন, যাবতীয় গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখছেন এবং যার কাছে মৃত্যুর পরে জবাবদিহি করতে হবে। সুন্দর করে সাজানো এই পৃথিবীটা কখনো কোনদিনই ধ্বংস হবে না, চিরযৌবনা এই পৃথিবীর যৌবন অনন্তকাল অটুট থাকবে, বার্ধক্য এই পৃথিবীকে হানা দেবে না, হবে না পৃথিবী কখনো জরাগ্রস্ত। সুতরাং নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ভোগ-বিলাস ও উত্তরাধিকারীদের প্রাচুর্যতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিক সম্পদ বৃদ্ধিই এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

২১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে, অর্থলোলুপদের প্রতি অবিমিশ্রিত ঘৃণা বর্ষণ করা হয়েছে এবং এদের নিকৃষ্ট পরিণতির চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। ২১ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দেই বলা হয়েছে, অসম্ভব! কখনোই না, তোমরা যা ধারণা করছো, অবশ্যই তা নয়। নানা চিত্রে, অপূর্ব অলংকারে, মনোরম দৃশ্যে সাজানো এই পৃথিবীর সবটুকু যৌবন নির্মম হাতে শোষণ করে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা বানিয়ে দেয়া হবে। সমস্ত পৃথিবীটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলায় পরিণত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। দেখার যদি সেদিন কেউ থাকতো তাহ্লে সে দেখে কল্পনাও করতে পারতো না, পৃথিবী নামক গ্রহটায় কখনো সৌন্দর্যের কোন চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

মহাধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমস্ত মৃত মানুষদের ভেতরে প্রাণের সঞ্চারিত করা হবে। তারপর তারা সবাই উঠে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। পৃথিবীতে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে যা রয়েছে, তা সেদিন দৃষ্টি গোচরে আনা হবে। প্রজ্জ্বলিত জাহান্নাম মানুষের সামনে উপস্থিত করা হবে। অগণিত ফেরাশ্তাদেরকে মানুষ দেখতে পাবে। মানুষের সৎকাজ ও অসৎকাজ পরিমাপ করার জন্য পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হবে। হিসাব গ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি মানুষ সেদিন দেখতে পাবে। পৃথিবীতে মানুষ গোপনে যা করেছে, প্রকাশ্যে যা করেছে, তা সবই সেদিন সর্বসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতাকে যারা পৃথিবীতে অস্বীকার করতো, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না বলে বিশ্বাস করতো, তারা সেদিন দেখতে পাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রচন্ড প্রতাপ। আল্লাহর পক্ষ থেকে সেদিন ঘোষণা দেয়া হবে–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ-لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ-

আজ বাদশাহী ও রাজত্ব কার? কে একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী? সমস্ত সৃষ্টিলোক থেকে আওয়াজ উঠবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার। (সূরা মু'মিন-১৬)

পৃথিবীতে অসংখ্য ভ্রান্ত পথ ও মতের অনুসারী জালিম গোষ্ঠী ও দল নিজেদের ক্ষমতার এবং শক্তিমত্তার অহঙ্কারে ধারণা করতো, তাদের মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই। তাদেরকে ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে বা তাদের মোকাবেলা করতে পারে, এমন শক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষদের মধ্যে অধিকাংশ লোকগুলো এসব জালিমদের আনুগত্য ও প্রশংসা করতো। কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে, আজ বলো প্রকৃত শাসনদন্ড কার হাতে–বাদশাহী ও রাজত্ব কার? যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী কে? সবর্ত্র কার আদেশ চলছে?

এই বিষয়গুলো এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন মানুষ যদি বিষয়টি অনুধাবন করে, তাহলে সে যত বড় ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, তার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি না হয়ে পারে না। চরম অহঙ্কারী ব্যক্তিও বিনয়ী না হয়ে পারে না। সামানী বংশের প্রতাপশালী শাসক নাসর ইবনে

আহ্মদ নিশাপুরে আগমন করে একটি দরবার আহ্বান করেন। তারপর তিনি আদেশ জারী করেন, তিনি সিংহাসনে আসীন হবার পর আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করা হবে এবং তারপরেই দরবারের কাজকর্ম শুরু হবে। একজন আলেম আল্লাহর কোরআনের সূরা মু'মিনের ১৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যার অর্থ হলো, 'আজ বাদশাহী ও রাজত্ব কার? কে একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী? সমস্ত হাশরের ময়দান থেকে আওয়াজ উঠবে, একমাত্র আল্লাহর যিনি কাহ্হার।' কোরআনের এই আয়াত শুনে তিনি এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, কাঁপতে কাঁপতে তিনি সিংহাসন থেকে নেমে মাথার রাজমুকুট খুলে সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, 'হে আমার রব! সমস্ত বাদশাহী এবং ক্ষমতা একমাত্র তোমারই-আমি তোমার গোলাম।'

কিয়ামতের দিনের ভয়াল চিত্র দেখে মানুষ ভয়ে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে যাবে। চোখের পলক ফেলতেও তারা ভুলে যাবে। সমস্ত শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যিনি নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তিনিই সেদিন প্রত্যক্ষভাবে সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাঁর সামনে কারো পক্ষে সামান্য একটি শব্দ করারও সাহস হবে না। তিনিই সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। যে ফেরেশ্তারা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর আদেশ পালন করছে, তারা সেদিন নীরব নিস্তব্ধ মূক-বধিরের মতো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবতীয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার রব সেদিন স্বয়ং আবির্ভূত হবেন' এ কথাটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহর যে অসীম ক্ষমতার কথা ও কিয়ামতের দিনের দৃশ্যের কথা শোনাচ্ছেন, সেদিন মানুষ এই চর্মচোখে তা প্রত্যক্ষ করবে। পৃথিবীর বুকে সবথেকে ক্ষমতাধর ব্যক্তিও সেদিন আল্লাহর প্রবল প্রতাপের সামনে থর থর করে কাঁপতে থাকবে। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রকাশ সেদিন মানুষের সামনে ঘটবে, এই অর্থেই বলা হয়েছে, সেদিন তোমার রব্ব স্বয়ং আবির্ভূত হবেন।

আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নবী-রাসূলগণ মানুষকে সতর্ক করেছে, কিন্তু তারা তাঁদের কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি। মিরাসী সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ অন্যান্য হকদারদের মধ্যে বন্টন না করে পৈশাচিক লোভের বশবর্তী হয়ে এবং অদম্য আকাংখা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে একাই আত্মসাৎ করেছে। অক্ষম, দুর্বল, অসহায়-ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ শক্তির বলে দখল করেছে। অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদের স্তুপ গড়েছে। অন্যায় পথে অর্থোপার্জন করতে গিয়ে দেশ, সমাজ ও মানবতার কি মারাত্মক ক্ষতি করেছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়নি। অভাবী ও সাহায্যপ্রার্থীকে ধারে কাছে ঘেষ্তে দেয়নি, অর্থ-সম্পদের প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণে পৃথিবীকে অমর-অক্ষয় মনে করেছে। তাদের এই ধারণা, বিশ্বাস এবং কর্মকান্ড স্বয়ং তাদের জন্যেই কি বিরাট ক্ষতি ডেকে এনেছে, সেদিন তারা অনুভব করতে পারবে। অনুশোচনা আর অনুতাপে সেদিন তারা ভেঙে পড়বে। প্রকৃত চেতনা সেদিন জাগ্রত হবে, কিন্তু তা কোনই কাজে আসবে না। পরিণতি দেখার পূর্বে পৃথিবীর জীবনে যদি চেতনা জাগ্রত হতো, তাহলে তা কাজে আসতো। কিন্তু কর্মের নিকৃষ্ট পরিণতি দেখার পরে যে চেতনা জাগ্রত হবে, তা অনুশোচনা বৃদ্ধিই করে চলবে।

এই অর্থলোলুপ অভিশপ্ত লোকগুলো সেদিন নিকৃষ্ট পরিণতি দেখে আফসোস করে বলতে থাকবে, সেদিন আমরা যদি নবী-রাসূলদের অনুসরণ করে অন্যের হক বুঝিয়ে দিতাম এবং অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ না করতাম! পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখের জন্য ন্যায়-অন্যায়বোধ ত্যাগ করে অর্থোপার্জন করেছি, কিন্তু অন্তকালের এই জীবনের জন্যে কোন

কিছুই এখানে পাঠাইনি। যদি এই চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে পূর্বেই এখানে কিছু পাঠাতাম, তাহলে আজ এমন নিকৃষ্ট পরিণতি বরণ করতে হতো না। অপরাধীরা সেদিন পেছনে ফেলে যাওয়া জীবনের যাবতীয় অপকর্মকে স্মরণ করে আবার নতুনভাবে উপদেশ গ্রহণ করে সৎ পথ অবলম্বন করার জন্য আগ্রহ পোষণ করবে। কিন্তু সেদিন এই স্মরণ এবং আগ্রহ কোনটাই কাজে আসবে না। পৃথিবীর জীবনে সৎকাজ করার যে সুযোগ তার ছিল সে কথা স্মরণ করে সেদিন সে শুধু আক্ষেপই করতে থাকবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, সেদিন তাদের অনুতাপ আর অনুশোচনা তাদেরকে আমার শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের অবাধ্যতার কারণে সেদিন তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হবে, যার দৃষ্টান্ত একমাত্র আমি ব্যতীত অন্য কেউ-ই স্থাপন করতে পারবে না। আমি এমনভাবে তাদেরকে সেদিন বাঁধবো, আমার কোন সৃষ্টি তেমনভাবে বাঁধতে সক্ষম নয়। আমি এমন আযাবে সেদিন তাদেরকে নিক্ষেপ করবো, যে আযাব অন্য কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়।

২৭ থেকে ৩০ আয়াতে ঐসব নেককার সৎলোকগুলোর কথা বলা হয়েছে, পৃথিবীতে যারা দ্বিধাহীন চিত্তে, সন্দেহ মুক্ত মনে, কোন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতীতই মানসিক প্রশান্তির সাথে আপন প্রভু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান অনুসরণ করেছে। আল্লাহর নির্দেশকে বোঝা মনে করে, শাস্তি মনে করে অনিচ্ছা সত্বে এবং বাধ্য হয়ে তারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি। বরং প্রশান্ত চিত্তে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ-উচ্ছাস আর শ্রদ্ধা মিশ্রিত করে আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ পালন করেছে। আল্লাহ তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তার জটিল দেহকে পরিচালিত করছেন, যে পৃথিবীতে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে, এই পৃথিবীকে তার জন্যে বসবাসের উপযোগী করেছেন, এখানে জীবন ধারণের জন্যে যাবতীয় উপকরণ তিনি সরবরাহ করছেন, তারই জন্য তার প্রভু এই পৃথিবীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে তারই কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তারই কল্যাণে উদ্ভিদ সবুজ-শ্যামলীমার অলঙ্কারে সজ্জিত হচ্ছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে তিনি তাকে করুণাধারায় সিক্ত করছেন। এই অনুভূতিতে সে আপন স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে।

স্রষ্টার প্রতি অসীম মমতা আর শ্রদ্ধায় তার হৃদয়-মন বিগলিত হয়ে সে বার বার আপন রব্বকে সিজ্‌দা দিয়ে, রব্ব-এর প্রতিটি নিদের্শ পরম শ্রদ্ধাভরে সম্মান ও মর্যাদার সাথে অনুসরণ করে নিজের মানসিক প্রশান্তি ব্যক্ত করেছে। আপন প্রভুর নিদের্শ পালন করতে গিয়ে এবং তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে যাবতীয় অত্যাচার-নির্যাতন নিপীড়ন হাসি মুখে বরণ করেছে। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠকে জান্নাতের মতোই মনে করেছে। ফাঁসির রশিকে মনে করেছে জান্নাতী ফুলের মালা। পৃথিবীর জীবনে কোন কষ্টকেই সে কষ্ট বলে মনে করেনি। এসবই করেছে সে আপন রব্ব-এর প্রতি পরম প্রশান্তির কারণে। এই শ্রেণীর লোকদেরকেই কিয়ামতের ময়দানে আহ্বান করা হবে, 'হে প্রশান্ত আত্মা!' বলে। এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু কিয়ামতের ময়দানেই আহ্বান জানানো হবে না, ঐ শ্রেণীর লোকগুলোর মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন দান করেও একইভাবে আহ্বান জানানো হবে।

অপরাধীদের মৃত্যুর সময় যেমন কঠিন আযাবের সাথে তাদেরকে অপমান আর লাঞ্ছনা দিতে দিতে বন্দীশালার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তার বিপরীতে আল্লাহর গোলামদের মৃত্যুর সময়

এভাবে আহ্বান জানিয়ে তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেয়া হবে যে, তুমি যেমন প্রশান্ত চিত্তে তোমার রব্ব-এর গোলামী করে জীবনকাল অতিবাহিত করেছো, তেমনি তোমার রব-ও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং এগিয়ে চলো আপন মনিবের রহমতের দিকে। সেই মেহ্মান খানায় গিয়ে প্রশান্তিদায়ক সুসুপ্তিতে নিমগ্ন হও, যা তোমার মনিব তোমার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

হাশরের ময়দানে পুনর্জীবন দান করে যখন উঠানো হবে, অপরাধীরা ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়বে, তাদেরকে কঠিন বন্ধনে বেঁধে শাস্তি দেয়া হবে, সেই কঠিন দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও আল্লাহর অনুগত গোলামদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হবে, আজকের দিনের কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না, সুতরাং প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান করতে থাকো। এই নিশ্চয়তা দেয়া হবে মধুমাখা শব্দে, মমতা সিক্ত ভাষায়। পরিশেষে ঐ একই আহ্বান জানিয়ে বলা হবে, তোমরা যেমন আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলে, আমিও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম। এখন চলো তাঁরই দিকে, যাঁর সাথে তোমাদের প্রকৃত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে তোমরা পৃথিবীতে অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেছো। তবুও আপন প্রভুর সাথে গোলামীর সম্পর্কে কোন ফাটল ধরতে দাওনি।

আমার সাথে ছিল আমার প্রিয় বান্দাহ্দের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন, পরম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আমার প্রতি ছিল তাদের হৃদয়ে অদম্য আকর্ষণ, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যারা দিবারাত্রি প্রতি মুহূর্তে ছিল ব্যাকুল। যারা পৃথিবীতে প্রতিটি কাজেকর্মে আমার নির্দেশ কি, তার অনুসন্ধান করে তা অনুসরণ করেছে, আমিও আমার সেই ব্যাকুল গোলামদের জন্যে, প্রিয় বান্দাহ্দের জন্যে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি, যেখানের সুখ-শান্তি কখনো কোনদিন শেষ হবে না, সেই অশেষ সুখময় স্থান জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করো। ঐ জান্নাত তোমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

সূরা আল–বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৯০

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'বালাদ' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়েই মক্কা নগরী মানুষের কাছে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন নগরী হিসাবে বিবেচিত হতো। এখানে কোন ধরনের রক্তপাত বা দাঙ্গা-মারামারি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর কারণ হলো, আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ শরীফ এখানেই অবস্থিত। কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্ব ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর কাছে এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের ওপরে নির্যাতন-নিপীড়ন করা, এই পবিত্র শহরেই তারা বৈধ করে নিয়েছিল। যেখানে ক্ষুদ্র একটা প্রাণীর ওপরেও কোন ধরনের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেই শহরেই আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের দেহ থেকে রক্ত ঝরানো বৈধ করে নেয়া হয়েছিল। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের ওপরে যখন অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছিল, এক দুঃসহ পরিবেশে মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই পরিবেশেই মক্কায় এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল।

আল্লাহর কোরআন হলো এক জীবন্ত মুজিজা। বিশাল একটি ভাষণ ছোট্ট কয়েকটি শব্দের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা কোরআনের অন্যতম নীতি। এই সূরাতেও সেই একই নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। কোন পথ অবলম্বন করলে মানুষ সত্যকার অর্থে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, এটাই হলো এই সূরার মূল আলোচিত বিষয়। এই পৃথিবীতে মানুষের সঠিক অবস্থান এবং কোন পথ অবলম্বন করলে মানুষ সত্যকার অর্থে সফল হতে পারবে, তা ছোট্ট কয়েকটি শব্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষকে সত্যপথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং সে পথে চলার জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন তাও দেয়া হয়েছে। সত্যপথ অনুসরণ করে কল্যাণকর পরিণতি ভোগ ও অসত্য পথ অবলম্বন করে নিকৃষ্ট পরিণতি ভোগ–এটা একান্তভাবেই মানুষের চেষ্টা ও সাধনার ওপরে নির্ভর করে। এই পৃথিবীটা কোন খেল-তামাসার স্থান করে সৃষ্টি করা হয়নি। এখানে মানুষের সৃষ্টিই হয়েছে কষ্টকর শ্রমের মধ্যে দিয়ে।

পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ ধারণা করে, এই পৃথিবীই প্রথম এবং এখানেই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। সে বৈধ পথে উপার্জন করুক আর অবৈধ পথেই উপার্জন করুক, কোন উচ্চশক্তি এসব কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করছেন না এবং কারো কাছে তার কর্মের কোন হিসাব দিতে হবে না, এটা হলো মানুষের সবথেকে মূর্খতাপ্রসূত ধারণা। এরপর মানুষের আরেকটি মূখতাপ্রসূত ধারণার প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানুষ প্রশংসা কুড়ানোর লোভে অহেতুক প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নিজের বড়ত্ব জাহির করে। অথচ এ কথা তার চেতনায় জাগ্রত থাকে না, তার এসব কর্মকান্ডের হিসাব সেই মহান সত্তার কাছে দিতে হবে। তাকে জবাব দিতে হবে, কোন পথে সে অর্থোপার্জন করেছিল এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছিল।

মানুষকে প্রকৃত সত্য অনুভব করার এবং মিথ্যা অনুভব করার মতো জ্ঞান-বিবেক ও বুদ্ধি দেয়া হয়েছে। তাকে দেয়া হয়েছে চিন্তা করার ক্ষমতা ও উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান। এসব যোগ্যতা তার ভেতরে দিয়েই দুটো পথ তার সামনে প্রদর্শন করে বলা হয়েছে, এর একটি পথ

অনুসরণ করলে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, কিন্তু সেই পথটি অত্যন্ত কষ্টের পথ। এই পথে অগ্রসর হতে হলে নিজের মনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে চলতে হয়। মন যা কামনা করে, তা আল্লাহর বিধানের মানদন্ডে পরিমাপ করে এর সত্যতা যাচাই করে তা অনুসরণ করতে হয়। আরেকটি পথ রয়েছে, যে পথে অগ্রসর হলে ধ্বংসের অতলান্তে তলিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই পথে চলা অতি সহজ এবং মনের যাবতীয় কামনা-বাসনা সহজেই এই পথে পূরণ করা সম্ভব হয়। নিজের মনও অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে এই পথ অনুসরণ করতে চায়। কিন্তু এই পথটিই হলো চরম ব্যর্থতা আর ধ্বংসের পথ।

সফলতার পথ বড়ই কষ্টসাধ্য বিধায় অধিকাংশ মানুষের প্রবণতা এ পথে অগ্রসর না হয়ে ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়। কিন্তু মানুষের উচিত কষ্টসাধ্য হলেও সফলতার পথেই অগ্রসর হওয়-অহেতুক লোকদের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের লক্ষ্যে অর্থ ব্যয় না করে, প্রদর্শনীমূলক কাজে নিজেকে জড়িত না করে সমাজের দুস্থ, ইয়াতিম, দুর্বল ও অভাবগ্রস্থদের কল্যাণে নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে ঐ লোকগুলোর দলে নিজেকে শামিল করা, যে লোকগুলো সমাজ ও দেশের বুকে আল্লাহর দেয়া বিধান প্রতিষ্ঠিত করে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেছে। এই পথটিই মহান আল্লাহর রহমত লাভের একমাত্র পথ। আর নিজের প্রবৃত্তি যে পথে চলতে চায় সে পথটি অত্যন্ত সহজ বটে, কিন্তু তার গন্তব্য হলো জাহান্নাম। যেখানে একবার পৌঁছলে ফিরে আসার দ্বিতীয় কোন পথ উন্মুক্ত থাকে না।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) শপথ এই (পবিত্র) নগরীর, (২) (এমন এক) নগরীর যেখানে তুমি (সম্পূর্ণ) স্বাধীন। (৩) আমি শপথ করছি (আদি) পিতা ও তার (ঔরস) থেকে যা জন্ম দিয়েছে (তাদের)। (৪) আমি মানুষকে এক কঠোর পরিশ্রম দিয়ে পয়দা করেছি। (৫) এই মানুষটি কি এ কথা মনে করে যে, তার ওপর কারোরই কোনো ক্ষমতা চলে না? (৬) সে বলে, আমি তো প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। (৭) সে কি ভেবেছে যে, তার এসব (কর্মকান্ড) কেউ দেখেনি?

(৮) আমি কি (তার নিজের ভালো-মন্দ দেখার জন্যে) তাকে দুটো চোখ দেইনি? (৯) আমি কি তাকে একটি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দেইনি? (১০) আমি কি তাকে (ন্যায়-অন্যায়ের) দুটো পথ বলে দেইনি? (১১) (কিন্তু দুর্গম) গিরিপথটি পার হওয়ার সে কোনো হিম্মতই দেখায়নি। (১২) তুমি কি জানো, সে দুর্গম গিরিপথটি কি? (১৩) (তা হচ্ছে) দাসত্বের শেকল খুলে (কাউকে মুক্ত করে) দেয়া, (১৪) দুর্ভিক্ষের দিনে কাউকে (কিছু) খাবার দেয়া, (১৫) নিকটতম

কোনো ইয়াতিমকে আহার পৌঁছানো। (১৬) কিংবা ধূলোয় ধূসরিত কোনো মিসকীনকে কিছু দান করা।

(১৭) অতপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে, একে অপরকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দেবে। (১৮) তারাই হবে (সত্যিকার অর্থে) সৌভাগ্যবান। (১৯) আর যারা অস্বীকার করেছে তারা ব্যর্থ হবে। (২০) যেখানে এদের ওপরে আগুনের শিখাই ছেয়ে থাকবে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে মক্কার লোকগুলোকে বুঝাচ্ছিলেন। বিশেষ করে আখিরাতের বিষয়টি তাদের মন-মানসিকতায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদেরকে অপরাধ ও কলুষমুক্ত জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বৈধ ও অবৈধ পথে সম্পদ উপার্জন এবং তা অহঙ্কার প্রদর্শন ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ বা বাহ্‌বা কুড়ানোর লক্ষ্যে ব্যয় করা ইত্যাদি ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে সতর্ক করছিলেন। কোন পথে সম্পদ উপার্জন করা হলো এবং কোন পথেই বা তা ব্যয় করা হলো, এ সম্পর্কে মৃত্যুর পরে আদালতে আখিরাতের আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, এই বিষয়টিকে তারা ক্রমাগত অস্বীকার করে চলছিল। তারা দাবী করছিল, এমনটি কখনোই ঘটবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন **এই সূরার প্রথম আয়াতে** 'না' শব্দ ব্যবহার করে তাদের ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে জানিয়ে দিলেন, তোমরা যা ধারণা করছো, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং আমার রাসূল তোমাদেরকে যা শুনাচ্ছেন এবং যে পথ অবলম্বন করার জন্যে তোমাদেরকে বার বার আহ্বান জানাচ্ছেন, তাই একমাত্র সত্য।

প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ 'লা' অর্থাৎ 'না' বলে অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে শপথ করা হয়েছে এমন একটি শহর বা নগরীর, যে শহরটি সৃষ্টির শুরু থেকেই সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসাবে মানুষের কাছে পরিগণিত হয়ে আসছে, কারণ এখানে আল্লাহর ঘর অবস্থিত। এই ঘরের কারণেই গোটা মক্কা নগরী সম্মান ও মর্যাদার। যে কোন মানুষ এসে এখানে নিরাপত্তা লাভ করতো। কেউ যদি তার পিতার হত্যাকারীকেও এই এলাকায় দেখতে পেতো, তবুও সে কা'বা ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পিতার হত্যাকারীর ওপরে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতো। এই এলাকা হলো মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীর নিরাপত্তা, স্বস্তি ও শান্তির এলাকা। যে কোন ধরনের বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলতা, যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে এই এলাকা মুক্ত এবং এই বিষয়টি মক্কার সে যুগের লোকগুলোও কঠোরভাবে অনুসরণ করতো।

যে লোকগুলো ছিল অতিমাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল, নীতি-নৈতিকতাহীন, চরম প্রতিশোধ পরায়ণ, শতাব্দীকাল অতিবাহিত হবার পরেও যারা বংশপরম্পরায় প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতো, সেই লোকগুলোই আপন পিতা, ভাই বা অন্য কোন আত্মীয়ের হত্যাকারীকে, প্রাণের শত্রুকে এই এলাকায় হাতের মুঠোয় পেয়েও নিরাপত্তা দিতো শুধুমাত্র আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কারণে। অসীম সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ এই শহরের শপথ করে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যা ধারণা করছো এবং যে বিশ্বাস অন্তরের লালন করছো তা সত্য নয়। যে বিশ্বাসের ওপরে ভিত্তি করে তোমরা নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছো, তা কোনক্রমেই সত্য নয়-অবশ্যই তা ধ্বংসের পথে ধাবমান। সত্য অস্বীকার করা ও উপেক্ষা করা এবং

মহাসত্যের বাহকের প্রতি নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার করার যে ঘৃণ্য নীতি তোমরা অবলম্বন করেছো, অবশ্যই তা মিথ্যা। এই নীতি তোমাদেরকে ধ্বংসের শেষ স্তরে পৌঁছে দেবে।

শপথ এই মহাপবিত্র, নিরাপত্তা দানকারী, স্বস্তি দানকারী, প্রশান্তি দানকারী মক্কা নগরীর, তোমরা যে পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করছো ও যে পদ্ধতিতে ব্যয় করছো এবং হৃদয়ে এই চিন্তা লালন করছো যে, 'সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করার ব্যাপারে কখনো কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না' এটা মারাত্মক ভুল। আমি এই পবিত্র নগরীর শপথ করে বলছি, তোমরা এখন যা করছো এবং সত্য অস্বীকারের যে নীতি অবলম্বন করেছো, তা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আমি তোমাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে তোমাদের ভেতর থেকেই–যিনি তোমাদের ভেতরে সবচেয়ে মহৎ ও সৎ ব্যক্তি, তাঁকেই নবী হিসাবে নির্বাচিত করেছি। তিনি তোমাদেরকে ভ্রান্তপথ থেকে সহজ সরল সঠিক পথে নিয়ে আসার লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, আর তোমরা তাঁর ওপরে নির্মম অত্যাচার করছো। আমি এই পবিত্র শহরের শপথ করে বলছি, তোমরা তোমাদের ঘৃণ্য আচরণের কারণে মহাধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছো।

আলোচ্য সূরার ২ নম্বর আয়াতে রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যে শহরটি সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। এখানে সমস্ত প্রাণী নিরাপত্তা লাভ করে, স্বস্তিবোধ করে, শান্তি লাভ করে। এই শহরে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনার শৈশব ও যৌবনের চারণভূমি এই শহর। এখানেই আপনি নবুয়াত লাভ করেছেন। আপনি এখানে অবস্থান করছেন। এসব কারণে এই শহরের সম্মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা আপনার আপন এলাকা, আপনার পবিত্র জন্মভূমি। যেখানে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং যে কোন স্থানে গমন ও বিচরণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার রয়েছে। অথচ এই শহরের পরিবেশ আপনার জন্যে এক শ্বাসরুদ্ধকর করে তুলেছে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী। আপনার প্রিয় স্মৃতি বিজড়িত মাতৃভূমি–আপনার চারণভূমিকে আপনারই জন্যে কন্টকাকীর্ণ করে তুলেছে মিথ্যার অন্ধ পুজারীরা। যে শহরের প্রতিটি ধূলিকণা ছিল আপনার জন্যে প্রশান্তিদায়ক, সেই শহরের প্রতিটি ধূলিকণাকে আপনার জন্যে শাণিত অস্ত্রের রূপ দেয়া হয়েছে।

যেখানে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতি একটি প্রাণীকেও নিরাপত্তা দিচ্ছে সত্যের শত্রুরা, পরম আপনজনের হত্যাকারীকেও যে এলাকায় নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে। সেই পবিত্র এলাকায় আল্লাহর রাসূলের এবং তাঁর কোন অনুসারীর নিরাপত্তা নেই। সেই মহাপবিত্র এলাকায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত ও পবিত্র দেহের রক্ত ঝরানো বৈধ করা হয়েছে। হালাল করা হয়েছে তাদের রক্ত, যারা মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্। পবিত্র হারাম শরীফে আল্লাহর রাসূল মহান আল্লাহকে সিজ্দা দিচ্ছেন, সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব-এর উদ্দেশ্যে সিজ্দায় লুটিয়ে পড়েছেন, এই অবস্থায় তাঁর মাথার ওপরে উটের পচা দুর্গন্ধযুক্ত নাড়িভূড়ি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর পবিত্র কণ্ঠনালীতে কাপড় পেঁচিয়ে দু'দিক থেকে এমনভাবে টেনে ধরা হয়েছে, আল্লাহর রাসূলের শ্বাস বন্ধ হয়ে তাঁর চোখ মোবারক কোঠর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ মুসলমানদেরকে এই পবিত্র স্থানে রক্তাক্ত করা হয়েছে। যে কোন প্রাণী, উদ্ভিদ এবং পরম শত্রুর জন্যেও যে এলাকায় বৈধ অবৈধের সীমা অনুসরণ করা হয়েছে, সেই সীমা অনুসরণ করা হয়নি শুধু আল্লাহর রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রে।

তাঁর অপরাধ (!) একটিই, তিনি মানুষদেরকে মহাসত্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। মানুষকে শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অন্যায়-অত্যাচার থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আন্দোলন

করছেন। তাঁর অনুগত লোকদের অপরাধ (!) তাঁরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গোলামী করতে রাজী হয়নি। এদের একমাত্র অপরাধ হলো, এরা চরম প্রশংসিত মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। এই অপরাধেই মক্কার জাহিল লোকগুলো তাদের সহায়-সম্পদ, দেহের রক্ত ও প্রাণ পবিত্র এলাকায় বৈধ করে নিয়েছে। মক্কার লোকগুলোও যেমন কা'বা এলাকায় ক্ষুদ্র একটি মশাকে হত্যা করাও অপরাধ মনে করতো, কিন্তু সেই একই এলাকায় কোন মুসলমানকে হত্যা করা অপরাধ মনে করতো না। অর্থাৎ এদের কাছে ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর প্রাণের যে মূল্য ও মর্যাদা ছিল, একজন মুসলমানের প্রাণের সে মূল্য ছিল না।

বর্তমানে অমুসলিম শক্তির কাছেও মুসলমানদের প্রাণের কোন মূল্য নেই। বন্যের হিংস্র প্রাণীর মূল্য তাদের কাছে অনেক বেশী এবং এসব প্রাণী সংরক্ষণের জন্যে তারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। হিংস্র পশুর চারণভূমি গ্রীষ্মের মৌসুমে প্রায় পানি শূন্য হয়ে পড়ে। অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিতভাবে অর্থ ব্যয় করে ঐসব এলাকায় জলাধার নির্মাণ করে দিচ্ছে, যেন কোন পশু পানি সঙ্কটে না পড়ে। বাঘ, সিংহ, শৃগাল, কুকুর, শুকর থেকে শুরু করে সামান্য একটি টিকটিকির মতো প্রাণীকেও তারা আধুনিক চিকিৎসা উপকরণে সজ্জিত ক্লিনিকে নিয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলে। একবার আটলান্টিক মহাসাগরে বেশ কয়েকটি তিমি বরফে আট্‌কা পড়লো। ইউরোপ-আমেরিকার কয়েকটি দেশ তড়িঘড়ি করে সেখানে 'আইস কাটার' বরফ কাটা জাহাজ প্রেরণ করে তিমিগুলো উদ্ধার করে সাগরে ছেড়ে দিল। এভাবে বরফে আট্‌কা পড়া তিমিকে উদ্ধার করে এবং এসব দৃশ্য প্রচার মাধ্যমে বার বার প্রচার করে তারা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে থাকে, প্রাণীর প্রতি তারা কতটা দরদী।

দরদ নেই শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রে। সে যুগের মক্কার জাহিলদের অনুকরণে আধুনিক জাহিলরাও মুসলমানদের প্রাণের কোন মূল্য দিচ্ছে না। এক আল্লাহকে তারা বিশ্বাস করে, কোরআনকে তারা মহান আল্লাহর বাণী হিসাবে বিশ্বাস করে, শুধুমাত্র এই অপরাধে (!) মুসলিম নারীদের ইজ্জত-আব্রু হালাল করে নেয়া হয়েছে। মুসলিম শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবকদেরকে পাখির মতো গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হচ্ছে। বন্দী মুসলমানদেরকে পেছনের দিকে হাত দুটো বেঁধে খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। গর্ভবতী মুসলিম নারীর পেট চিরে গর্ভের শিশুকেও হত্যা করা হচ্ছে। মাতা-পিতার শান্তির কোল থেকে শিশু ছিনিয়ে নিয়ে পাথরে আছ্‌ড়ে হত্যা করা হচ্ছে। সামান্য একটি পিঁপ্‌ড়ার যে মূল্য রয়েছে, বর্তমান পৃথিবীতে অমুসলিমদের কাছে মুসলমানের সেই মূল্য নেই। বর্তমান জাহিলদের পূর্বসূরী আরব জাহিলদের চরিত্রে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই একই গুণ ও বৈশিষ্ট্য বহন করছে আধুনিক জাহিলরা। আল্লাহর বিধানের শত্রুদের চারিত্রিক মান, গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিটি যুগে একই রকম ছিল, এদের চরিত্র অপরিবর্তনীয়।

এরপর ৩ নম্বর আয়াতে পিতা ও পুত্রের শপথ করে বলা হয়েছে, মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। পিতা ও পুত্র বলতে পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সন্তানগণ তথা সমস্ত মানব গোষ্ঠীই হতে পারে। কোন কোন মুফাস্‌সীর বলেছেন, এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ হযরত ইবরাহীম হলেন মুসলিম জাতির পিতা এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর বংশধর। আরবে তখন পর্যন্তও দ্বীনে ইবরাহিমী কেউ কেউ অনুসরণ করতো। তিনিই তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান ও স্ত্রীকে এই এলাকার মানব বসতিহীন

নির্জন মরু প্রান্তরে আল্লাহর আদেশে রেখে গিয়েছিলেন। তিনিই সন্তানকে সাথে নিয়ে আল্লাহর আদেশে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করে এই এলাকাকে গোটা বিশ্বের মানুষের মিলন কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। সেই পবিত্র এলাকায় তাঁরই বংশধর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের রক্ত হালাল করে নেয়া হয়েছে, এ জন্য সেই পবিত্র এলাকার ও সেই মহান পিতা-পুত্রের নামে শপথ করা হয়েছে।

যে মূল কথাটি বলার জন্যে শপথ করা হয়েছে, **৪ নম্বর আয়াতে** সেই কথাটি ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের জীবন হলো কঠোর শ্রমে পরিপূর্ণ। পৃথিবীতে আগমন থেকে শুরু করে, টিকে থাকা এবং জীবন-যাপন করা, এর সবটাতেই ঝুঁকি ও শ্রম জড়িত। মায়ের গর্ভে যখন মানুষ ভ্রুণ আকারে ছিল, তখনও তাকে পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকারে বিকশিত করার ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে শ্রম দিতে হয়েছে। ঐ ভ্রুণটি যেন কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, এ জন্য তার মা'কে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সতর্কতার সাথে শ্রম দিতে হয়েছে। ভ্রুণ যখন পরিপূর্ণ মানব শিশুর আকার ধারণ করেছে, তখন স্বয়ং তাকেও টিকে থাকার লক্ষ্যে মাতৃগর্ভে শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে এবং প্রচন্ড শ্রম ব্যয় করেই তাকে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আসতে হয়েছে। মাতৃগর্ভে সে যে কোন সময় একটু অসতর্কতার কারণে মৃত্যুবরণ করতে পারতো। যখন সে পৃথিবীতে আগমন করছে, তখন মৃত্যুর খুব কাছে সে পৌঁছে গিয়েছে। সংগ্রামের একটি দীর্ঘ অধ্যায় অতিক্রম করে তাকে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে।

পৃথিবীতে আসার পরে দেহে সঞ্চিত ক্যালোরি ব্যয় করে চিৎকার করতে হয়েছে। এই চিৎকারের ফলেই তার বুকে অবস্থিত কোমল ফুসফুসে ক্রিয়া শুরু হয়েছে। মাতৃগর্ভ থেকে চরম এক প্রতিকূল পরিবেশে এসে তাকে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে পদার্পণ করতে হয়েছে। শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের সোনালী দ্বারে পদার্পণ করা পর্যন্ত যেমন তার নিজের শ্রম জড়িত, তেমনি তার মাতা-পিতা থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজনের অনেকের শ্রমই জড়িত। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে তাকে দুঃসহ সংগ্রাম করতে হয়েছে। এরপরে তার অবশিষ্ট জীবনেও শ্রম ব্যতীত একটি মুহূর্তও অতিবাহিত করতে পারেনি। শারীরিক অথবা মানসিক শ্রম ব্যয় করেই তাকে প্রতিটি মুহূর্ত পার করতে হয়েছে। যে ব্যক্তি অসৎ পথ অবলম্বন করেছে, সে পথেও তাকে টিকে থাকার জন্যে চিন্তাশক্তি ও শারীরিক শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে।

তাকে শঙ্কিত থাকতে হয়েছে, কোন মুহূর্তে প্রতিপক্ষ তাকে পরাজিত করে সামনে অগ্রসর হয়। তার স্বাস্থ্য, অর্থ-সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা অর্জন এবং রক্ষা করার ব্যাপারে তাকে মানসিক বা শারীরিক শ্রম দিতে হয়েছে। সম্পদ অর্জনের চিন্তায় যেমন তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে, তেমনি তা সংরক্ষণ করার ব্যাপারেও কঠোর শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। উচ্চপদ অর্জনের জন্য যেমন তাকে সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়েছে, ঐ পদে নিজেকে আসীন রাখার জন্যেও সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হচ্ছে। শ্রম ব্যতীত কোনকিছুই অর্জন করা কোন মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি।

যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর অনুগত গোলাম হিসাবে গড়তে চেয়েছে, তাকেও শ্রম ব্যয় করে সংগ্রাম মুখর জীবন-যাপন করতে হয়েছে। প্রতিটি ক্ষণ তাকে তার নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তান লোভের দিকে আকৃষ্ট করেছে, ভোগ-বিলাসের চিত্র তার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছে। এসবের মাথায় পদাঘাত করে আল্লাহর গোলাম হিসাবে টিকে থেকে নিজেকে জান্নাতের পথে অগ্রসর

করানো প্রচন্ড শ্রমের ব্যাপার। ইসলাম বিরোধী শক্তির চতুরমুখী ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ প্রতিহত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া অকল্পনীয় শ্রমসাধ্য। কঠিন এই বন্ধুর পথপরিক্রমায় তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। এভাবে মানুষকে পরিশ্রমজনিত কষ্টের মধ্যেই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হয়। যখন সে গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে, তখনও তার মস্তিষ্ক সচল থাকে–শ্রম দিতে থাকে। মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রম করে চলার প্রকৃতি দিয়ে। অর্থাৎ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা, দুর্ভোগ ও চেষ্টা-সাধনা করে চলার এবং কঠিন সংগ্রাম করে টিকে থাকার জীবন দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রম মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা, দুর্ভোগ, দুর্যোগ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিরই অপর নাম হলো মানব জীবন। সংগ্রাম তথা শ্রম ব্যয় ব্যতীত কোথাও কোন অর্জন নেই এই পৃথিবীতে–চিরন্তনী এই কথাগুলো মানুষের চেতনায় কেন জাগ্রত করা হলো, কেন চিরসত্য এই কথাগুলো বলা হলো, তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতসমূহে। **৫ থেকে ৬ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, মানুষের প্রকৃত অবস্থা হলো এই, সেই দুর্বল অসহায় অক্ষম মানুষ কি করে ধারণা করে যে, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কারো তাকে জবাবদিহি করতে হবে না? চরম দুর্বলতা আর অসহায়ত্ব যাকে আষ্টেপৃষ্ঠে পরিবেষ্টন করে রয়েছে, সে কিভাবে মনে করে তার গর্বিত মস্তক ধুলায় অবনমিত করে দেয়ার জন্যে কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই? সে এই পৃথিবীতে অনুভব করছে, একজন অসীম শক্তির অধিকারীর করুণা ব্যতীত তার পক্ষে সময়ের একটি মুহূর্তও অতিবাহিত করা সম্ভব নয়, তারপরেও সে তাকে উপেক্ষা করার নীতি কিভাবে অবলম্বন করেছে?

মহান স্রষ্টার করুণা সিক্ত যার জীবন, সেই স্রষ্টাই তাকে যে কোন মুহূর্তে চরম কোন দুর্যোগে নিক্ষেপ করে তার যাবতীয় স্বপ্ন-সাধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন। যে জীবনটাকে কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে বৈধ-অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়েছে, সেই সাধের জীবনটাকে তিনি অচল অথর্ব, অক্ষম, পঙ্গু করে দিয়ে এমন অবস্থায় পৌছে দিতে পারেন, তখন তার নিজের জীবনই নিজের কাছে এক দুঃসহ বোঝা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। কোন ধরনের পূর্ব সতর্ক সংকেত ব্যতীতই তিনি প্রকৃতিক দুর্যোগে তাকে নিক্ষেপ করে জীবনের যাবতীয় আশা-আকাংখা ও কল্পনাকে ধূলায় মিশিয়ে দিতে পারেন–এই চেতনা কি তার নেই? দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রামের বন্ধনে যার জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সে কি করে অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে বলে যে অর্থ-সম্পদ আমি দু'হাতে উড়িয়ে থাকি!

এই পৃথিবীতে অপরের অধিকার ক্ষুন্ন না করে বৈধ পথে অর্থোপার্জন করে কোন ধরনের হিসাব ব্যতীতই দু'হাতে অর্থ উড়িয়ে দিয়েছে, এমন ধরনের কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে না। যারা অবৈধ পথে, অপরের অধিকার ক্ষুন্ন করে, অল্প সময়ে প্রভূত অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়, তারাই কেবল হিসাব ছাড়া অর্থ ব্যয় করতে পারে। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রদর্শনীমূলক একটা মানসিকতা জেগে ওঠে। এরা অহেতুক এমন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে–যা দেশ, জাতি ও সমাজের ক্ষতিই করে। শুধুমাত্র নোংরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে দেহ-মন ভাসিয়ে দেয়ার জন্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করে গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নট-নটীদের অশালীন গান আর অশ্লীল নৃত্য ভোগ করার জন্যে এরা দু'হাতে অর্থ ব্যয় করে। বিয়ের জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অগণিত লোককে দাওয়াত দেয়া হয়। অপ্রয়োজনীয় সম্বর্ধনা, স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, বিয়ে বার্ষিকী, জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদির নামে অহেতুক অর্থ ব্যয় করা হয়।

বিয়ে অনুষ্ঠানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বিরাট অঙ্কের দেন মহর ধার্য করা হয়। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে, ক্লাবে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বিরাট অঙ্কের চাঁদা দেয়। এসবই করা হয় নিজের অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্যতা প্রকাশের লক্ষ্যে। মানুষকে এ কথাই জানানো হয় যে, সে অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী এবং অর্থের বলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। সুতরাং মানুষ তার প্রশংসা করবে, তাকে ভয় করে চলবে, নেতৃত্বের আসন তাকে দেয়া হবে, দানবীর হিসাবে সমাজে খ্যাতি অর্জন করবে, এসব উদ্দেশ্যেই ঐ শ্রেণীর লোকগুলো দু'হাতে অর্থ ব্যয় করে থাকে। তৎকালীন আরবে এভাবে অর্থ ব্যয় করে গর্ব প্রকাশ করা হতো যে, আমি অমুক কাজে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছি। শুধু তাই নয়, কে কত অর্থ ব্যয় করেছে এবং করার ক্ষমতা রাখে, এসব বিষয়ে কাব্য রচনা করে তা জনসমাবেশে আবৃত্তি করে শোনানো। এভাবেই পরকাল অবিশ্বাসী লোকগুলো অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতো।

৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব নির্বোধ ব্যক্তি এসব অমূলক কর্ম করছে, তারা কি এটা ধারণা করেছে, সে কোন পথে অর্থোপার্জন করেছে এবং কোন উদ্দেশ্যে এত বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করছে, এ সম্পর্কে তার মনিব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি কিছুই জানেন না? অবৈধ পথে অর্থোপার্জন করে মসজিদ-মাদ্রাসা, নানা ধরনের ক্লাবে কোন উদ্দেশ্যে দান করছে, তা মানুষের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকলেও মহান আল্লাহর কাছে তা প্রচ্ছন্ন থাকে না। এসব প্রদর্শনীমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষকে প্রতারিত করতে সক্ষম হলেও আল্লাহও তার কর্মকান্ডে প্রতারিত হচ্ছেন বলে কি সে মনে করে? অবশ্যই না, তিনি ভালো করেই জানেন, সে কোন পথে অর্থোপার্জন করেছে এবং কোন উদ্দেশ্য সাধন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে অর্থ ব্যয় করছে।

এক শ্রেণীর লোক অসৎ পথে অর্থোপার্জন করে মসজিদ, মাদ্রাসা, ক্লাবে বা সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনীর মাধ্যমে দান করে। এরা সমাজে নিজের পরিচিতি ঘটানোর লক্ষ্যে, নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্যে দান করে। তাদের এসব দানের পেছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাহলো, আগামীতে তারা দেশ, সমাজ ও জাতির নেতৃত্ব গ্রহণের প্রত্যাশী। একবার নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট হতে পারলে যে অঙ্কের অর্থ তারা দান করেছে, তার কয়েকগুণ অর্থ সরকারী তহবীল থেকে আত্মসাৎ করবে। তাদের এই হীন উদ্দেশ্য জনগণের কাছে অপ্রকাশিত থাকলেও তার মনিব মহান আল্লাহর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। সে মনে করে, তার এই গোপন উদ্দেশ্য এবং কর্মকান্ডের জন্যে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত কিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তাঁর কাছে সমস্ত কিছুর জবাব অবশ্যই দিতে হবে।

মানুষ কিভাবে তার আপন স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় এবং কিভাবে এ কথা ভুলে যায় যে, কেউ তার কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করছে না? তার আপন মনিব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে তাকে দেখছেন, তার প্রতিটি কর্মকান্ডের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখছেন, এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্যে তো তাকে জ্ঞানের উপকরণে সজ্জিত করা হয়েছে। তার দেহ কাঠামোর অভ্যন্তরীণ দিক ও বাহ্যিক দিক যদি এমন হতো যে, শোনার, বলার, দেখার ও চিন্তা করার মতো কোন উপকরণ তাকে দেয়া হয়নি–তাহলে বোঝা যেতো যে, সে অজ্ঞ এবং অজ্ঞতার কারণে আপন স্রষ্টাকে চিনতে ব্যর্থ হয়ে ভ্রান্ত পথে চলছে। পক্ষান্তরে বিষয়টি তো এমন নয়। জ্ঞানের উপকরণে তাকে সজ্জিত করা হয়েছে, যে পৃথিবীতে সে বিচরণ করছে, সেখানে স্রষ্টাকে চেনা ও জানার মতো অগণিত নিদর্শন ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এরপরও যদি সে নিজের রব-কে চিনতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেটা তার নিজেরই ব্যর্থতা।

এ জন্যে আলোচ্য সূরার ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আমি কি তোমাকে সত্য আর মিথ্যা প্রত্যক্ষ করার জন্যে, নিজের দেহসহ পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা অগণিত নিদর্শন দেখে আপন প্রভুকে চেনার জন্যে দুটো চোখ কি তোমাকে দেইনি? তোমাকে তো পশুর মতো বাকশক্তিহীন বানানো হয়নি। কথা বলার জন্যে তোমার মুখে জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট দিয়েছি। তোমাকে বাকশক্তিসম্পন্ন সত্তা বানিয়েছি যেন, তুমি তোমার চিন্তাধারা জিহ্বা ও ওষ্ঠের সাহায্যে ভাষার তুলিতে প্রকাশ করতো সক্ষম হও। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–মানুষকে আমি এমন এক অবস্থায় তার মায়ের গর্ভ থেকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি, যে সময় তার কোনো চেতনাই ছিল না। পেটের ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল না যে, তার ক্ষুধা পেয়েছে। সেই সাথে তাকে আমি তিনটি জিনিস দিয়েছি। তাকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং চিন্তা করার মতো মগজ দিয়েছি।

একটি মাত্র চোখসম্পন্ন কোনো প্রাণী পৃথিবীতে নেই। সমস্ত প্রাণীরই দুটো করে চোখ দেয়া হয়েছে। প্রাণীসমূহ চোখ দিয়ে খাদ্য অন্বেষণ করে, কোন দিক থেকে বিপদ আসতে পারে, সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে এবং নিজের অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখে। মানুষও তার চোখ দিয়ে নিজের যাবতীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখে। পক্ষান্তরে নিজের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে পশুর দেখার এবং মানুষের দেখার মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। মানুষ তার চোখ দিয়ে সুন্দর-কুৎসিত, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, সোজা-বাঁকাসহ জ্ঞানের অসংখ্য শাখার যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য দেখে মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করে-যে ক্ষমতা পশুর নেই। মানুষ দৃষ্টি দিয়ে দেখে, শ্রবণ শক্তি দিয়ে শ্রবণ করে এবং মস্তিষ্ক দিয়ে বিচার করে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করে। ন্যায়-অন্যায় উপলব্ধি করে, যথার্থতা নির্ণয় করে, কল্যাণ ও অকল্যাণ চিন্তা করে। এ ধরনের অগণিত বিষয় মানুষ আর পশুর চোখের দেখার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তার বোঝা উচিত যে, তাকে দুটো চোখ, শোনার মতো কান, কথা বলার মতো জিহ্বা ও ঠোঁট এবং চিন্তা করার মতো মগজ দেয়া হয়েছে।

এভাবে মানুষকে জ্ঞানের উপকরণ ও উপলব্ধি করার মতো অলঙ্কার দেয়া হয়েছে, যেন সে আপন রব্ব-এর অসংখ্য নিদর্শন দেখে স্রষ্টার প্রতি তার কি কর্তব্য রয়েছে এবং পৃথিবীতে তাকে কোন উদ্দেশ্য সাধন করার লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছে, তা নির্ণয় করে। পক্ষান্তরে চোখ, কান, বাকশক্তি ও চিন্তা করার মতো মগজ থাকার পরেও যারা এগুলো কাজে লাগায় না, তাদের এসব অঙ্গের ভেতরে আর পশুর ঐ একই অঙ্গের ভেতরে কোন পার্থক্য থাকে না। পশুর ভেতরে আর আপন স্রষ্টাকে যারা চিনতে পারে না, এসব মানুষের ভেতরে কোন পার্থক্যই শুধু থাকে না–বরং এরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যায়। সূরা আ'রাফের ১৭৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যাদের বুঝার মতো অন্তর রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না। তাদের কাছে দেখার মতো চোখ রয়েছে কিন্তু সেই চোখ দিয়ে তারা সত্যকে দেখে না। তাদের কাছে শোনার মতো কান রয়েছে কিন্তু সেই কান দিয়ে তারা সত্য কথা শুনতে চায় না। এরা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের চাইতেও বেশী বিভ্রান্ত।

চোখ দিয়ে আপন স্রষ্টার সৃষ্টিকে দেখে সেই সৃষ্টির প্রশংসা করে কাব্য-সাহিত্য এরা রচনা করে, কিন্তু নিজের স্রষ্টাকে চেনার মতো কোন নিদর্শন এদের চোখে পড়ে না। কান দিয়ে নানা ধরনের মতবাদ-মতাদর্শ ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কিত বক্তৃতা শোনে কিন্তু নিজের মনিব মহান

আল্লাহ সম্পর্কে কোন আলোচনা এরা শোনে না। মস্তিষ্ক দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় কিছু সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে, কিন্তু মহান মালিকের অসীম করুণা সম্পর্কে একটি মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা করে না। এই শ্রেণীর অকৃতজ্ঞ মানুষদেরকেই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমাকে জ্ঞানের এসব অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়েছে নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে। বৃথা অহঙ্কার প্রদর্শন আর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্যে নয়।

মানুষকে শ্রবণমক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বানানোর তাৎপর্য হলো, এদেরকে বিবেক বুদ্ধির অধিকারী বানানো হয়েছে। চিন্তাশীলদের কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, জন্তু-জানোয়ারকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বলা যায় না–যদিও তারা শোনে এবং দেখে। সুতরাং শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন বলতে সেই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে বোঝানো হয়নি, যা জন্তু, জানোয়ারেরও রয়েছে। বরং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ যেসব উপায়-উপকরণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, সেসব উপায়ের অধিকারী হওয়ার কথাই কোরআনে বলা হয়েছে। শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি মানুষের জ্ঞানার্জনের উপায়সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এ জন্যে এ দুটো বিষয়ের উল্লেখ কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এটা বোঝানো হয়েছে ও মানুষকে দেয়া সেসব অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়শক্তি, যেসবের সাহায্যে মানুষ জ্ঞানার্জন করে থাকে। মানুষকে যেসব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি দেয়া হয়েছে তা জন্তু-জানোয়ারের অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় শক্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

কারণ মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পেছনে সক্রিয় থাকে চিন্তাশীল মন ও মস্তিষ্ক। এই মন ও মস্তিষ্কই ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্যসমূহকে একত্রিত ও সুবিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল গ্রহণ করে এবং পথনির্দেশনা গ্রহণ করে। এরপর সে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং এর ওপরই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে মানুষের জীবন পদ্ধতি। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সোজা-বাঁকা, ভুল-নির্ভুল, কল্যাণ-অকল্যাণ, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি বোঝার জন্য জ্ঞানের এসব অলঙ্কারই মানুষের জন্যে যথেষ্ট নয়। মানুষ নিজের জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে নিজের চলার পথ, সফলতা ও কল্যাণ লাভের পথ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে না। এ ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম বিধায় মানুষকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এ জন্য আলোচ্য সূরার ১০ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষকে তো ন্যায় ও অন্যায়ের দুটো পথ সম্পর্কেই স্পষ্টভাবে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আমাদেরকে সহজ সরল পথপ্রদর্শন করো' শিরোণাম থেকে 'কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের শর্ত' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

সত্য আর মিথ্যার স্পষ্ট পার্থক্য করে মানুষকে দেখানো হয়েছে। এখন মানুষ যদি সত্য পথ অবলম্বন করে তাহলে সে তার শুভ পরিণতি ভোগ করবে। আর যদি মিথ্যা পথ অনুসরণ করে তাহলে স্বয়ং তাকেই তার নিকৃষ্ট পরিণতির জন্যে দায়ী হতে হবে। জ্ঞানের অলঙ্কারে সজ্জিত করেই মানুষের রব্ব মানুষকে ছেড়ে দেননি। তিনি সত্য পথও মানুষকে প্রদর্শন করেছেন এবং সত্য আর মিথ্যার স্পষ্ট পার্থক্যও বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেন মানুষ আপন স্রষ্টার সামনে কোনো অজুহাত খাড়া করতে না পারে যে, তাকে সত্য পথপ্রদর্শন করা হয়নি, সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য তাকে বুঝানো হয়নি বা সত্য মিথ্যা বোঝার মতো জ্ঞান তাকে দেয়া হয়নি।

সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেখানোর পরও আখিরাতের প্রতি উদাসীন ও উপেক্ষা প্রদর্শনকারী এবং সন্দেহ-সংশয় পোষণকারী লোকগুলো সত্য অনুসরণ করেনি। সত্য

অনুসরণে কল্যাণ লাভ বা সফলতা নিশ্চিত কিন্তু সে কল্যাণ অর্জনের পথটি ত্যাগ, তিতীক্ষা ও কোরবানীর। বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করতে সক্ষম হলেই সফলতা অর্জন করা যাবে। বাধার এই বিন্ধ্যাচলকেই **আলোচ্য সূরার ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতে** দুর্গম গিরিপথের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, এই পথ অতিক্রম করার মতো সৎ সাহস তারা দেখাতে সমর্থ হয়নি। দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করা চরম কষ্টের ব্যাপার। এই পথ অতিক্রম করতে হলে চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়। পথের প্রতিটি বাঁকে বিপদ ওৎ পেতে থাকে। একটু অসতর্ক হলেই গিরিখাদে নিপতিত হয়ে প্রাণ হারানোর ভয় থাকে। প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক জড়িত মনে সতর্কতার সাথে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে পথ চলতে হয়।

ক্ষণিকের অসতর্কতার কারণে পা পিছ্লে যেতে পারে। পা দুটো দৃঢ়তা হারালে পাহাড় থেকে পড়ে দেহ রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে পারে। এ জন্যে দুর্গম গিরিপথের অভিযাত্রীকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, দুর্দান্ত সাহসী, অসীম মনোবল ও দৃঢ়পদের অধিকারী হতে হয়। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাকে সজাগ ও সচেতন থাকতে হয়। গিরিপথের অভিযাত্রীর মতোই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয় কল্যাণ লাভকারী তথা আল্লাহর জান্নাত প্রত্যাশী ব্যক্তিকে। জান্নাত লাভের পথ বড়ই দুর্গম। এ পথের প্রতিটি বাঁকে বিপদ ওৎ পেতে রয়েছে। লোভ-লালসা নামক হিংস্র পশু তার ওপরে যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পথচ্যুত করতে পারে। প্রলোভন নামক দানব তাকে ধাক্কা দিয়ে ধ্বংসের অতল তলদেশে নিক্ষেপ করতে পারে। আতঙ্ক তার পা দুটোর বন্ধন শিথিল করে দিতে পারে। অর্থ-ধন-সম্পদের মমতা তার চলার গতি স্তব্ধ করে দিতে পারে। এ ধরনের অসংখ্য অশুভ শক্তি এসে তার গতিপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য জান্নাতের পথের পথিককে হতে হয় সদাসতর্ক, সচেতন, সদাজাগ্রত, অসীম সাহসী, দুর্জেয় মনোবলের অধিকারী। এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যই তাকে ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রচন্ড দাপটের সামনে টিকিয়ে রাখে।

সফলতা ও কল্যাণের পথকে দুর্গম গিরিপথের সাথে তুলনা করে এ কথাই মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, মহাসত্যের পথ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত পথ–দ্বীনি আন্দোলনের পথে চলতে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কষ্ট করতে হবে এবং শ্রম ব্যয় করতে হবে, তাহলেই কল্যাণ লাভ করা যাবে। এই পথের যে পথিক হবে, তাকে অবশ্যই দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রবৃত্তির সাথে এবং শয়তানের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। লোভ-লালসা তাকে গ্রাস করতে চাইবে, ভয়-ভীতি ও আতংক তাকে চলৎ শক্তিহীন করে দিতে চাইবে, সম্মান-মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের কামনা তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠবে। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে আযাব বলে মনে হবে। এসব কিছুকে নির্মম পায়ে পদদলিত করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। অপরদিকে অসফলতা ও অকল্যাণের পথে চলার জন্যে এসব ত্যাগ স্বীকারের কোনই প্রয়োজন হবে না। মনের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের দেহ-মনকে ভাসিয়ে দিলেই তীব্র গতিতে সে অকল্যাণের শেষ স্তরে পৌঁছে যাবে। আখিরাতে অবিশ্বাসী, উপেক্ষা প্রদর্শনকারী এবং সন্দেহ-সংশয় পোষণকারী লোকগুলো সফলতার ঐ কষ্টের পথ অবলম্বন না করে অকল্যাণের সহজ পথই অবলম্বন করেছে, এ কথাই উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে।

এরপর ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, সফলতা অর্জনের সেই কষ্টকর পথের সাথে তোমাদের পরিচয় আছে কি? এই পথ হলো ত্যাগ আর কোরবানীর পথ। এই পথে প্রতি পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। লোভ-লালসা সংবরণ করতে হয় এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে লাগাম

পরিয়ে দিতে হয়। যেসব মানুষ দাস হিসাবে মানবেতর জীবন-যাপন করছে, তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্যে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করতে হয়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করতে হয়। যে ব্যক্তি অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে, তাকে আহার দিতে হয়। যেসব ইয়াতিম অভিভাবকহারা হয়ে আর্তনাদ করছে, তাদের আর্তনাদের কারণসমূহ দূর করতে হয়। দরিদ্র-অসহায় ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ধূলি মলিন ব্যক্তির প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হয়। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী সংগঠনকে সামনের দিকে অগ্রসর করার জন্যে প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থ-সম্পদের। এই কাজে নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

এই পথটিকেই আলোচ্য সূরায় 'আকাবা' অর্থাৎ উর্ধ্বগামী 'দুর্গম পথ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পথ জটিল বটে, কিন্তু এই পথের শেষেই রয়েছে অশেষ কল্যাণ, নে'মাত ও সফলতা এবং কষ্টকর হলেও এই পথেই অগ্রসর হতে হবে। এই পথটি অতিক্রম করতে সক্ষম হলেই মঞ্জিলে মকসূদে উপনীত হওয়া যাবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, মূল্যবান বস্তু মূল্য দিয়েই গ্রহণ করতে হয়। চাওয়া-পাওয়ার লক্ষ্যবস্তু যতটা বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হতে, তা লাভ করার জন্যে বা অর্জন করতে হলে ততবেশী কষ্ট এবং সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অনাহার ক্লিষ্ট ধূলি-মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অসহায় মানব সন্তানকে অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে বলেই বর্তমানে তার এই করুণ অবস্থা। তাকে তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করতে হবে। ভ্রান্ত নিয়ম-নীতির বেড়াজালে বন্দী মানবতা অন্নকষ্টে জর্জরিত হয়ে করুণ স্বরে আর্তচিৎকার করছে, জরা-ব্যাধি তাদেরকে গ্রাস করেছে। অবহেলিত এই মানবতাকে নিদারুণ গ্লানি বহন করতে বাধ্য করেছে মানুষের বানানো নিষ্ঠুর নিয়ম-নীতি। এসব কিছুকে নিষ্ঠুর হাতে উৎপাটিত করে মানুষের অধিকার মানুষকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

পৃথিবীর বিশাল-বিপুল জনগোষ্ঠীকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, চিকিৎসাহীন, শিক্ষাহীন, আশ্রয়হীন ও নিরাপত্তাহীন রেখে নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট ও তাদের তোষণকারী জালিম গোষ্ঠী ভোগ-বিলাসের গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছে। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে বহাল রাখার জন্যে মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে সেই অর্থে বিলাস উপকরণ ও মারণাস্ত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। যে মুহূর্তে উন্মুক্ত আকাশের নিচে সূর্য তাপে দগ্ধ হয়ে, ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে বিপর্যস্ত হয়ে সম্মানিত আদম সন্তান রোগ, ব্যাধি-জরাগ্রস্ত হয়ে অনাহারে আর চিকিৎকসার অভাবে করুণ স্বরে আর্তনাদ করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিপুল অর্থ ব্যয় করে মারণাস্ত্রের কারখানায় নিত্য-নতুন অস্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা চলছে। মদের মান উন্নয়নের জন্যে অগণিত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। মানুষের মৌলিক কল্যাণ জড়িত নয়, এমন খাতে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এভাবে প্রতি পদে পদে মানবতার সাথে নিষ্ঠুর প্রহসন করা হচ্ছে।

বঞ্চিত মানবতার সাথে নিষ্ঠুর প্রহসনের যাবতীয় পথে চিরদিনের জন্যে অর্গল তুলে দিতে হবে। এই কাজটি করার জন্যে যে পথে অগ্রসর হতে হয়, সেই পথটিই হলো কোরআনের ভাষায় 'আকাবা' অর্থাৎ 'দুর্গম গিরিপথ।' এই পথে অগ্রসর হতে পারলে নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চে পর্যায়ে উপনীত হয়ে সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে পৌঁছানো যাবে। এই পথের অগণিত বাঁকে দরিদ্রতা, অপবাদ, অন্যায়, অত্যাচার, নিষ্ঠুর নির্যাতন, কারাবরণ, ফাঁসির রশি মুখ ব্যদন করে অপেক্ষা করছে। প্রয়োজনে এসব বরণ করতে হবে। এ পথে অগ্রসর হলে পৃথিবীতে যশ-মান, খ্যাতি, প্রশংসা, বাহ্‌বা, ধন-দৌলত কিছুই লাভ হবে না। এ পথ শুধুই ত্যাগ-তিতীক্ষা, কোরবানী আর সবরের পথ।

তদানীন্তন পৃথিবীতে নিকৃষ্ট দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থের বিনিময়ে মানুষ বিক্রি হতো এবং সেই ক্রীতদাসকে দিয়ে অমানুসিক পরিশ্রম করানো হতো। সামান্যতম মানবাধিকারও তাদের প্রতি প্রদর্শন করা হতো না। প্রতি পদে তারা অমানবিক আচরণের মুখোমুখি হতো তাদের মনিবের কাছ থেকে। সর্বপ্রথম ইসলামই এই দাসদেরকে মানবাধিকার দিয়েছে। মানবতার মহান মুক্তিদুত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই দাসের দেহের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তিদাতার প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করবেন। হাতের পরিবর্তে হাতকে, পায়ের পরিবর্তে পা-কে এবং লজ্জাস্থানের পরিবর্তে লজ্জাস্থানকে।

উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হাদীসটি বোখারী, মুসলিম, তিরমিজী ও নাসায়ী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সন্তান হযরত ইমাম জয়নুল আবেদিন এই হাদীসের বর্ণনাকারী সায়াদ ইবনে মারজানাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি নিজের কানে এই হাদীস হযরত আবু হুরাইরাকে বর্ণনা করতে শুনেছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি নিজের কানে এই হাদীস শুনেছি। এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত ইমাম জয়নুল আবেদিন তাঁর নিজের সবচেয়ে মূল্যবান দাসকে ডেকে এনে মুক্ত করে দিলেন। মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময়ে ঐ দাসের মূল্য ছিল দশ হাজার দিরহাম। এ জন্যে ইসলামী আইনবিদগণ বলেছেন, দাসকে মুক্ত করে দেয়া সাধারণ দানের তুলনায় অনেক বেশী সওয়াবের কাজ। মুসলমানরা দাসদের দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ বিলিয়ে দিয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই কাজে ছিলেন অগ্রগামী।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে চেষ্টাকারীর সমমর্যাদা সম্পন্ন।' একজন লোক এসে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, আমার মন পাষাণ হয়ে গিয়েছে, সেখানে দয়া-মায়ার কোন অস্তিত্ব নেই। রাসূল তাকে বললেন, 'তুমি ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং গরীবদেরকে আহার করাও।' অর্থাৎ এই দুটো কাজ করলে হৃদয়ে দয়া-মায়ার উদ্রেক হবে। বিশ্বনবী ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি ইয়াতিমদেরকে প্রতিপালন করে, আমি এবং সেই ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাতে এইভাবে অবস্থান করবো। এ কথা বলে তিনি তাঁর দু'হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিত করলেন।' তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার খাদ্যের সাথে কোন ইয়াতিমকে শরীক করবে, তার জন্যে আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।'

বিশ্বনবী ইয়াতিমদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, যে বাড়িতে ইয়াতিমদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়, সেই বাড়িটি অতি উত্তম। আর সবথেকে নিকৃষ্ট বাড়ি হলো ঐটি, যে বাড়িতে ইয়াতিমদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাবে, তার হাত ঐ ইয়াতিমের যতগুলো চুল স্পর্শ করবে, ঐ ব্যক্তির আমলনামায় ততগুলো সওয়াব লেখা হবে।' সুতরাং প্রদর্শনীমূলক দান ও নাম-যশ কুড়ানোর পরিবর্তে দুস্থ মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করাই হলো সফলতা অর্জনের পথ। আর এই পথ হলো কষ্টসাধ্য এবং শ্রম ব্যয় করার পথ। কষ্টের সাগর পাড়ি দিয়েই সফলতার স্বর্ণদ্বারে উপনীত হতে হবে।

মানুষ সৎপথে টিকে থাকার লক্ষ্যে যতই অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নিপীড়ন স্বীকার করুক না কেন, এসবের কোনই মূল্য নেই, যদি সে মানুষের ঈমান না থাকে। কিয়ামতের ময়দানে আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর কাছ থেকে সৎকাজের বিনিময় লাভ করতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈমানদার হতে হবে। ঈমান ব্যতীত কোন সৎকাজের বিনিময় আখিরাতে পাওয়া যাবে না। এর যা বিনিময় হয়, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনেই চুকিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে আখিরাতে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। ব্যক্তিকে ঈমানদার হতে হবে তাহলেই তার সৎকাজের বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে আশা করা যায়। আলোচ্য সূরার ১৭ নম্বর আয়াতে এই কথাটিই এভাবে বলা হয়েছে, 'অতপর তাদের দলে শামিল হয়ে যারা ঈমান আনবে, একে অপরকে ধৈর্যের অনুশীলন করাবে এবং একে অপরকে দয়া দেখানোর উপদেশ দেবে।'

যে দুর্গম পথ অতিক্রম করার কথা এই সূরায় বলা হয়েছে, সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে দেয় আল্লাহর প্রতি ঈমান। এই ঈমানই মানুষের ভেতরে পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ, সহানুভূতি, দয়া-মায়া, সাহায্য-সহযোগিতা ও দান করার অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়। দুর্ভেদ্য দুর্গম পথ অতিক্রম করার দর্জয় সাহস যোগায় ঈমান। অজেয়কে জয় করার অদম্য স্পৃহা সৃষ্টি করে ঈমান। মানুষের ভেতরে এ ধরনের অসংখ্য দুর্লভ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দেয় ঈমান। (ঈমান কি ধরনের গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, আমার লেখা 'আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দাবি' নামক গ্রন্থটি।)

আল্লাহর কোরআনে কোথাও সৎকাজের কথা প্রথমে বলা হয়নি। সৎকাজের শুরুতেই ঈমানকে শর্ত হিসাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ঈমান ও সৎকাজের উল্লেখ রয়েছে যেসব আয়াতে, তার প্রথমেই বলা হয়েছে, 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে।' আলোচ্য সূরার ১৭ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, একাকী ঈমান এনে অবস্থান করা যাবে না। অর্থাৎ কোন ঈমানদার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি ঈমান আনতে আগ্রহী হবে, তাকে অবশ্যই ঈমানদারদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে শরীক হতে হবে। এরপর আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে ঈমানদারদের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হলে ঈমানের দাবী অনুসারে দেশে অন্যায়ের প্রতিরোধ ও সৎকাজের প্রসার, অকল্যাণের মূলোৎপাটন ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই করা সম্ভব নয়।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই সংগঠনের সিলেবাসে গ্রন্থ ছিল মাত্র দুটো। একটি কোরআন ও অপরটি হাদীস এবং এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল। ঐ সংগঠন থেকে যে দুর্লভ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্র গড়ার উপাদান, মানবীয় অতুলনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, শিক্ষাগ্রহণ করে, প্রশিক্ষণ নিয়ে যে লোকগুলো বেরিয়ে এসেছিল, বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা-সাধনা করলেও তাদের মতো একটি লোকও তৈরী করতে পারবে না।

আল্লাহর রাসূল অপূর্ব গুণাবলীসম্পন্ন লোক তৈরী করেছিলেন, সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোক তৈরী করার প্রতিষ্ঠান হলো দ্বীনি আন্দোলন। এই আন্দোলন ও সংগঠনই ব্যক্তির ভেতর থেকে যাবতীয় কলুষ-কালিমা বিদূরিত করে নৈতিক চরিত্রের দুর্লভ অলঙ্কারে ব্যক্তিকে সজ্জিত করে দেয়। এই আন্দোলন সবর-এখতিয়ারের পথ দেখায়। এখান থেকেই ধৈর্যহারা মানুষ অসীম

ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নিয়ে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। দয়া-মায়া, মমতাহীন মানুষ এখান থেকেই অসীম দয়া করতে শেখে। কৃপণ বলে খ্যাতি অর্জনকারী ব্যক্তি এখান থেকেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার অর্থ-সম্পদ অবারিত হস্তে বিলিয়ে দেয়।

১৭ নম্বর আয়াতে ঈমানদারদের দল তথা দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের দুটো গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, এরা একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উৎসাহ উদ্দিপনা দিয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, এরা একজন আরেকজনের প্রতি দয়া-মায়া, সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রেরণা দিয়ে থাকে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একজন মুমিন তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামীর গোটা জীবনই ধৈর্য অবলম্বনের জীবন। ঈমান আনার সাথে সাথেই তাকে ধৈর্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হয়। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে ফেরাউনের যাদুকররা যখন ঈমান আনলো এবং সেই সাথে সাথে তাদের ওপরে যে কঠিন পরীক্ষা নেমে এলো, অসীম ধৈর্যের সাথে তারা সেই ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পৃথিবী থেকে ঈমান নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছিল।

সুতরাং ঈমান আনার সাথে সাথেই ঈমানদারকে সমস্ত কিছুতেই অসীম ধৈর্য ধারণ করতে হয়। মহান রব্ব আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ পালন করার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, নিজের প্রবৃত্তিকে অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন, চরম দরিদ্রতার মোকাবেলা করে অবৈধ অর্থ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্যে ধৈর্যের প্রয়োজন। দ্বীনি আন্দোলন থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তি লোভ-লালসা দেখিয়ে থাকে, তাদের পাতা ফাঁদে পা দিলে পৃথিবীর জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ হাতের মুঠোয় ধরা দেয়। এই ঘৃণ্য পথ থেকে বিরত থাকতে গেলে ধৈর্যের প্রয়োজন। একমাত্র আল্লাহর গোলামী করার কারণে বাতিল শক্তি জুলুম নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে দেয়, এই কঠিন অবস্থাতেও ধৈর্যের প্রয়োজন। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, ঘৃণা, অর্থ-সম্পদ, দৈহিক শক্তি, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি বার বার অন্যায় পথে ধাবিত হতে থাকে, এসব কিছুকে অন্যায় পথ থেকে বিরত রেখে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করারও অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন।

ধৈর্যের এই প্রশিক্ষণ একাকী নির্জনে গ্রহণ করাও যায় না এবং একাকী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য নামক দুর্লভ গুণ সৃষ্টিও হয় না। ঈমানদার ব্যক্তি যখন দলবদ্ধভাবে, একটি আন্দোলনে–সংগঠনে অবস্থান করে, সেখান থেকেই সে প্রশিক্ষণ লাভ করে। এই ব্যক্তি যখন দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর ভেতরে প্রতিটি ব্যাপারে অসীম ধৈর্যের নিদর্শন দেখতে পায়, স্বাভাবিকভাবেই তার ভেতরে ঐ গুণ সংক্রামিত হয়। এই ব্যক্তি যখন একাকী কোন বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন তার ভেতরে সংক্রামিত সেই গুণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ইসলাম বিরোধী শক্তি ঐ ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন নির্জন ফাঁসি কক্ষে ফাঁসির রশি কণ্ঠে পরিয়ে দেয়, তখন অসীম ধৈর্যের সাথে বলতে থাকে, 'আমি কোথায় কি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলাম, এটা আমার দেখার বিষয় নয়–আমি আল্লাহর গোলাম হিসাবে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছি, এটাই আমার জীবনের সবথেকে বড় সফলতা।'

দ্বিতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো, মায়া-মমতা, বদান্যতা ও সহানুভূতি। প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারদের সমন্বয়ে যে দল, সমাজ ও জাতি গড়ে ওঠে, এরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়। একে অপরের প্রতি মমতা ও করুণা প্রবণ হয়। আর্তমানবতার সেবায় এরা নিজেদেরকে

নিয়োজিত করে। এই দুর্লভ গুণও সৃষ্টি হয় ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমে। ব্যক্তি যখন নিজেকে এই দলে শামিল করে তখন সে দেখতে পায়, সংগঠনের প্রতি নেতা-কর্মী একে অপরের সাথে অত্যন্ত মমতা প্রবণ। একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে মমতা সিক্ত ভাষায়। এদের আচরণে ও কথায় কঠোরতার কোন স্থান নেই। মমতাপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসি জড়িয়ে রয়েছে পরস্পরের ঠোঁটে। মমতার আদ্রতাপূর্ণ এই আচরণ ঐ ব্যক্তির চরিত্রেও সংক্রামিত হয়। সে একাকী যখন অন্যের সাথে আচরণ করে, তখন তার আচরণে মমতার প্রকাশ ঘটে।

বস্তুত ইসলামী দল ও এই দলের সংগ্রামের ফলে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরেই মমতার ফল্‌গুধারা বইতে থাকে। গোটা জাতি রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে শাসক হিসাবে না পেয়ে কর্তব্য পরায়ণ–সেবাপরায়ণ সেবক পেয়ে থাকে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর শাসনামলে রাষ্ট্রের একজন খৃষ্টান কর্মচারী তাঁর কাছে একদিন নিজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবেদন পত্র দিয়েছিল। প্রায় একমাস পরে ইসলামী সাম্রাজ্যের কর্ণধার গেলেন খৃষ্টানদের গির্জা পরিদর্শনে। সেখানে ঐ খৃষ্টান কর্মচারী খলীফার সাথে দেখা করে বললেন, 'আমি সেই খৃষ্টান যুবক–এই রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী। আমি আমার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় একমাস পূর্বে আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম।'

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতাপশালী শাসক হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খৃষ্টান যুবকের দিকে মমতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'আমিও ওমর–সেই মুসলমান। তোমার আবেদন পত্র সেই মুহূর্তেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে যথাস্থানে প্রেরণ করেছি। আগামী মাসের প্রথম তারিখ থেকেই তুমি তোমার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে।' এই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারের মমতাসিক্ত আচরণ। বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।' বোখারী শরীফে এসেছে, 'এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে অন্যায় অবিচার করে না, তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত থাকবে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণের কাজে নিযুক্ত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে কিয়ামতের বিপদসমূহের মধ্যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'

একজন আরেকজনের দোষ-ত্রুটি গোপন তখনই রাখে, যখন সে তার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হয়, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। আবু দাউদ ও তিরমিজী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'দয়া-মায়াপ্রবণ লোকদের ওপরে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন করুণা করে থাকেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর ওপরে দয়া করো, তাহলে আকাশ ওয়ালা (আল্লাহ তা'য়ালা) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' তিনি আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজে দয়া করে না, তার প্রতি অন্য কেউ দয়া করে না।' পরস্পরের প্রতি সালামের রীতি, ছোটদেরকে স্নেহ করার নীতি ও বড়দেরকে শ্রদ্ধা-সম্মান করার রীতি ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এবং ইসলামী সংগঠন এসবের প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজে এই ভাবধারা প্রবর্তন করে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া ও স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।'

আল্লাহর নবী বলেছেন, 'তিন ধরনের লোক জান্নাতে গমন করবে। তার মধ্যে এক ধরনের লোক হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজের আত্মীয় ও মুসলমানদের জন্যে দয়াশীল ও নমনীয় হয়।' আল্লাহর রাসূল বলেন, 'একজন মুমিন ব্যক্তি অপর মুমিন ব্যক্তির জন্যে এক প্রাচীরের মতো। এই প্রাচীরে প্রতিটি অংশ অপর অংশকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে রাখে।' আল্লাহ রাসূল বলেন, তুমি মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাস ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি অখন্ড শরীরের মতোই দেখতে পাবে। যেমন শরীরের একটি অঙ্গে কোন ব্যথা দেখা দিলে সেই ব্যথা সমস্ত শরীরে সংক্রামিত হয়, মুমিনদের অবস্থাও অনুরূপ হয়। কেউ একজন বিপদগ্রস্ত হলে, সবাই সেই বিপদে এগিয়ে আসে।' এরই ভিত্তিতে গড়ে ওঠে মুসলিম সমাজ। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই ব্যক্তিকে ঈমান আনার পরেই ইসলামী সমাজ গড়ার কাজে শামিল হতে হয়। এ জন্যে ইসলামী সংগঠন থেকে দূরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি ঈমানের দাবি অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে অনেক ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়না, পরিশেষে আদালতে আখিরাতে তার পক্ষে কল্যাণ লাভ করাও কঠিন হয়ে পড়বে।

আলোচ্য সূরার ১৮ থেকে ২০ আয়াতে মানুষের ভেতরে দুটো দলের কথা বলা হয়েছে। একটি দলে অবস্থান করবে সেই সব লোকগুলো, আলোচ্য সূরায় ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতে বর্ণিত পৃথিবীতে যারা 'আকাবা' অর্থাৎ দুর্গম পথ দৃঢ়পদে নির্ভীক চিত্তে অতিক্রম করে কল্যাণ ও সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে এরা অবস্থান করবে ডান দিকে এবং এই লোকগুলো হবে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের জন্যেই তাঁর জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন।

আর যারা দুর্গম পথের ত্যাগ-তিতীক্ষা, দুঃখ-কষ্ট, কোরবানী ইত্যাদি দেখে আতঙ্কিত হয়ে এই পথে অগ্রসর হয়নি, তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ ঈমানদারদের দলে শামিল হয়ে ঈমানের দাবি অনুসারে যারা নিজেদের জীবন গড়েনি, তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে এবং এরা কিয়ামতের ময়দানে বাম দিকে অবস্থান করবে। বাম দিকে যারা অবস্থান করবে তারাই হলো হতভাগার দল। পৃথিবীতে এই লোকগুলো আপাদ-মস্তক নোংরামিতে নিমজ্জিত ছিল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদের জন্যেই তাঁর জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা সেদিন তাদেরকে গ্রাস করবে।

❁

সূরা আশ্–শাম্স

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৯১

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতের 'শাম্স' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরায় সামূদ জাতির ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। সুতরাং সূরার আলোচিত বিষয়াদি স্পষ্ট করে দেয় যে, এই সূরা মক্কার সেই পরিবেশে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন রাসূলের দাওয়াতী কার্যক্রমকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে বিরোধী পক্ষ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিন, আকাশমন্ডল, পৃথিবী ও এসবের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের শপথ করে বলেছেন, তিনি মানুষকে সত্য ও মিথ্যা, পাপ ও পূণ্য চেনা-জানার মতো যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ঐ ব্যক্তিই সফলতা অর্জন করবে, যে ব্যক্তি সত্য পথ চিনে তা অবলম্বন করবে আর ঐ ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি সত্যকে চেনার মতো যোগ্যতা থাকার পরেও তা প্রয়োগ করে সত্য চিনে তা অনুসরণ করলো না। এরপর সামূদ জাতির ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে নবুয়াত ও রিসালাতের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। মানুষকে যদিও ন্যায়-অন্যায়বোধ তার প্রকৃতিতে দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু সঠিক পথ লাভের জন্যে তার ঐ ন্যায়-অন্যায় বোধটুকুই যথেষ্ট নয়। এর জন্যে প্রয়োজন স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রদান। আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই হেদায়াত নবী-রাসূলদের মাধ্যমেই তিনি দিয়ে থাকেন-এটাই আল্লাহর চিরন্তনী নীতি।

সত্য সঠিক নির্ভুল পথ রচনায় মানুষ ব্যর্থ হবে, এ কারণেই তিনি যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে নির্ভুল পথপ্রদর্শন করেছেন। অথচ সেই মানুষই নিজেদের কল্যাণকামীকে গ্রহণ ও অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তার প্রতি নির্মম অত্যাচার করেছে। সামূদ জাতিও তাদের কল্যাণকামীর প্রতি জুলুম করেছিল ফলে তারা নিকৃষ্ট পরিণতি বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীও বিশ্বমানবতার কল্যাণকামী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি জুলুম অত্যাচার করছে। সুতরাং তারা যদি সত্য গ্রহণ করে সত্যের বাহকের প্রতি ঘৃণ্য আচরণ করতে থাকে, তাহলে তাদের পরিণতিও ঐ সামূদ জাতির অনুরূপই হবে–সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে যারা সত্য প্রতিষ্ঠাকামী লোকগুলোর প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করবে, তাদের পরিণতিও ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) শপথ সূর্যের এবং তার রৌদ্রচ্ছটার, (২) শপথ চাঁদের যখন সে (আলোর জন্যে সূর্যের) পেছনে পেছনে আসে, (৩) শপথ দিনের যখন সে তাকে আলোকিত করে ফেলে, (৪) শপথ রাতের যখন সে তাকে ঢেকে দেয়, (৫) শপথ আকাশের ও তার নির্মাণ কৌশলের, (৬) শপথ পৃথিবীর ও তার বিছিয়ে দেয়ার (নৈপুণ্যের), (৭) শপথ মানব প্রকৃতির ও তার (যথাযথ) বিন্যাস স্থাপনের, (৮) অতপর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার পাপের (পথের) ও (পাপ থেকে) বেঁচে থাকার জ্ঞান প্রদান করেছেন। (৯) নিঃসন্দেহে মানুষদের সেই সফলকাম যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে, (১০) আর তাকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।

(১১) সামূদ জাতি আল্লাহর নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। (১২) যখন তাদের বড় নাফরমান ব্যক্তিটি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো, (১৩) আল্লাহর নবী তাদের বললো, এই হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো উটনী এবং এই হচ্ছে তার পানি পান (করার জায়গা)। (১৪) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো এবং এই উটনীকে তারা হত্যা করে ফেললো। অতপর তাদের এই না-ফরমানীর কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর (মহা) বিপর্যয় নাযিল করলেন। অতপর তিনি তাদের (মাটির সাথে) একাকার করে দিলেন। (১৫) (আর রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা!) তিনি এসব ব্যাপারে কারো পরিণতির পরোয়া করেন না।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এই সূরার ৮ নম্বর আয়াতে মূল যে কথাটি বলা হয়েছে, তা বলার পূর্বে ৭ টি জিনিসের শপথ করা হয়েছে। শপথ করা হয়েছে সূর্যের এবং তার কিরণচ্ছটার। এরপর শপথ করা হয়েছে ঐ চন্দ্রের যা প্রতি মুহূর্তে সূর্যের পেছনে সঞ্চারণশীল। শপথ করা হয়েছে সেই দিনের, যা রাতের

ঘন অন্ধকারকে বিদূরিত করে পরিদৃশ্যমান জগতকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে। রাতের শপথ করা হয়েছে, যখন তার অন্ধকারের পর্দা আলোকিত জগতটাকে আবৃত করে। শপথ করা হয়েছে ঐ দূর আকাশের এবং তার নির্মাণ কৌশলের। এরপর শপথ করা হয়েছে এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীকে যেভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্যে বাসোপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। পরিশেষে শপথ করা হয়েছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির এবং এই প্রকৃতিকে যে কৌশলের মাধ্যমে বিন্যাস করা হয়েছে। এরপরেই ৮ নম্বর আয়াতে মূল কথা বলা হয়েছে যে, মানুষকে তিনি তাঁর বিধানের বিপরীত ভ্রান্তপথ সম্পর্কে যেমন স্পষ্ট জ্ঞান দান করেছেন এবং সেই ভ্রান্তপথ থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো উপকরণও দিয়েছেন।

কোরআনের তাফসীর অধ্যয়নকালে পাঠককে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ মূল যে কথা বলার জন্যে যেসব বিষয়ের শপথ করেন, ঐসব বিষয়ের সাথে মূল আলোচিত বিষয়ের অপূর্ব সামঞ্জস্যতা থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সামঞ্জস্যহীন কোন কথা বলেন না। আর শপথ করা হয় মূল বক্তব্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করানোর লক্ষ্যে। মানুষ যেন উপলব্ধি (Realization) করতে পারে, কথাটির গুরুত্ব কতবেশী। প্রথমে শপথ করা হয়েছে সূর্য ও তার কিরণচ্ছটার। বিজ্ঞানীগণ বলছেন, সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য অবস্থিত এবং সমস্ত গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে এবং সূর্যও তার আপন অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। এর আবর্তনের কারণে সূর্যের বিভিন্ন অংশের গতিবেগ নানা ধরনের হয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ ধারণা করে যে, সূর্য একটি নক্ষত্র হিসাবে সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সূর্যকে এত বেশী উজ্জ্বল এবং তেজদীপ্ত অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐ সূর্যের থেকেও লক্ষ গুণ আলোকিত ও তেজদীপ্ত নক্ষত্র মহাকাশের নিচে শূন্যগর্ভে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যেমন Rigel নক্ষত্রটি সূর্যের থেকেও ৫০,০০০ গুণ আলোকিত ও তেজদীপ্ত। এরপর S. Doradus সূর্যের থেকে ১০,০০,০০০ গুণ আলোকিত ও তেজদীপ্ত। এ সবের থেকেও অগণিত নক্ষত্র মহান আল্লাহ ঐ দূর আকাশের নিচে সৃষ্টি করেছেন যার আলো ও তাপ ঐসব সূর্যের থেকে কয়েক কোটি গুণ বেশী। এসব নক্ষত্র সুবিশাল দূরত্বে অবস্থান করার কারণে পৃথিবী থেকে তা দেখা যায় না এবং এর উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ে না। খালি চোখে দেখার একটি সীমা রয়েছে এবং এই সীমা অতিক্রম করলেই দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি সমান্তরাল রেল লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, তাহলে সে দেখতে পাবে–লাইন দুটো বহুদূরে গিয়ে পরস্পর মিশে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো লাইন দুটো মিশে যায়নি। দৃষ্টির এই বিভ্রাট কাটিয়ে ওঠার জন্যে মানুষ দূরবীন আবিষ্কার করলো। অনেক দূরের জিনিসকে সে কাছে এনে দেখার ব্যাপারে সফল হলো। এরপর ক্রমান্বয়ে এই দূরবীনের শক্তিকে সে বৃদ্ধি করতে থাকলো। সর্বশেষ ১৯২৪ সালে ইডুইন হাবেল সবথেকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। তার আবিষ্কৃত এই দূরবীন দিয়ে মহাশূন্যে ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বছরের দূরত্ব পর্যন্ত দেখা যায়। এরপর মহাশূন্যে যে কি আছে, তা বিজ্ঞানীরা জানে না। সুতরাং আকাশের ঠিকানা যে কোথায়, আকাশ যে কতদূরে, তা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

আলোক বছরের হিসাবটা এরকম যে, আলো প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। তাহলে এক মিনিটে অতিক্রম করবে ১১,১,৬০,০০০ মাইল পথ। এই সংখ্যাটিকে ৬০ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ৬,৬৯,৬০,০০০০ মাইল পথ। অর্থাৎ ঘন্টায় আলো

৬,৬৯,৬০,০০০০ পথ অতিক্রম করে। প্রতি ঘন্টায় আলো এই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করলে ২৪ ঘন্টায় অর্থাৎ একদিনে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে, তা ঐ সংখ্যাটিকে ২৪ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে। এভাবে মাস ও বছরের হিসাব পাওয়া যাবে। সুতরাং এক বছরে আলো যতটা দূরত্ব অতিক্রম করে, একেই আলোক বছর বলা হয়। এভাবে হিসাব করলে এক লক্ষ বছরে আলো কতটা দূরত্ব অতিক্রম করে তার হিসাবও পাওয়া যাবে। ১০ লক্ষে হয় এক মিলিয়ন। বিজ্ঞানী হাবলের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মহাশূন্যের ১১,০০০ মিলিয়ন আলোক বছর দূরত্বে কি রয়েছে তা দেখা যায়। আর পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব মাত্র ১৪,৮৮,১৪,৪০০ কিলোমিটার। এই সূর্যের থেকেও শত কোটি গুণে বড় এবং আলোকিত ও তেজদৃপ্ত অগণিত নক্ষত্র রয়েছে ঐ মহাকাশে।

প্রশ্ন হলো, সূর্যের তাপ ব্যতীত পৃথিবীতে কোন কিছুই সৃষ্টি হবে না এবং টিকে থাকতেও পারবে না। সুতরাং সূর্যের থেকেও শত কোটি গুণে বিশাল, আলোকময় এবং তেজদীপ্ত কোন নক্ষত্রকে কেন সূর্যের স্থলাভিষিক্ত করা হলো না? এটা করা হলে পৃথিবী সচল ও সজীব থাকার জন্যে যে তাপের প্রয়োজন, তা অধিক পরিমানে পাওয়া যেতো। কিন্তু তা না করে অন্যান্য নক্ষত্রের তুলনায় একেবারেই নগণ্য, স্বল্পালোকিত ও কমমাত্রায় তেজদীপ্ত সূর্যকেই কেন পৃথিবীতে তাপ বিকিরণের কাজে মহান আল্লাহ ব্যবহার করছেন?

এই জটিল প্রশ্নের উত্তরও বিজ্ঞানীগণ খুঁজে পেয়েছেন। তারা দেখেছেন, সূর্যের থেকেও বিশালাকৃতির নক্ষত্রে যে তাপ রয়েছে, তা পৃথিবীর জন্যে এতটাই ক্ষতিকর যে, সেই তাপ পৃথিবী পর্যন্ত পৌছালে মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। তদুপরি পৃথিবীকে সচল-সজীব ও দীপ্তিময় রাখার জন্যে প্রয়োজন তাপযুক্ত সাতটি রংয়ের বা সাত রং মিশ্রিত আলোর। এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র সূর্যের ভেতরেই দান করেছেন, অন্যান্য বিশাল আকৃতির নক্ষত্রে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য নেই। এ জন্যই তিনি রাব্বুল আলামীন-সৃষ্টির যেখানে যা প্রয়োজন, তিনি তাই দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছেন।

দৃশ্যমান সূর্যের থেকেও লক্ষ গুণে বিশাল-আলোকময়, দীপ্তিমান ও তেজদীপ্ত নক্ষত্রসমূহকে বাদ দিয়ে পৃথিবীকে ফলে-ফুলে, প্রাণের স্পন্দনে সচল-সজীব রাখার জন্যে দৃশ্যমান সূর্যকেই মহান আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন। সূর্য তাপের মাধ্যমে মানুষ কল্যাণ লাভ করছে। এই সূর্য ব্যতীত পৃথিবী অচল–অচল মানুষের জীবন। তেমনি পাপ-পূণ্যের চেতনা ও ওহীর জ্ঞান ব্যতীতও মানুষের জীবন অচল। সূর্যের আলো-তাপ ব্যতীত উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, পৃথিবী পরিণত হবে শুষ্ক মরুপ্রান্তরে। নির্মল বায়ুর অভাবে মানুষের জীবন হয়ে উঠবে ওষ্ঠাগত। আলোর অভাবে পৃথিবী পরিণত হবে অন্ধকার বিবরে। পাপ-পূণ্যের চেতনা বোধ ও ওহীর জ্ঞানের অভাবে এই মানুষ ও পশুর ভেতরে কোনই পার্থক্য থাকবে না–ফলে মানুষের মানবিক সত্তাও অন্ধকারের বিবরে হারিয়ে যাবে। সূর্যের আলোয় যেমন সমস্ত কিছু স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তেমনি পাপ-পূণ্যের চেতনাবোধ ও ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের আলোয় অন্ধকার বিদূরিত হয়ে সত্য স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং মানুষের জীবন ও কল্যাণ–অকল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল জিনিসের শপথ করে মহান আল্লাহ তাঁর মূল আলোচনা পেশ করেন। চাঁদের শপথ করা হয়েছে, এই চাঁদও মানুষের জীবন ও কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে জড়িত। বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩শ' ৯৯ কিলোমিটার বা ২ লক্ষ ২১ হাজার ৪শ' ৫৬ মাইল। চাঁদ প্রতি ঘন্টায় ৩

হাজার ৭শ' কিলোমিটার বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। চাঁদে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর প্রায় ১৫ দিনের সমান। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য থেকে জানা যায় চাঁদের এক গুচ্ছ জটিল ঘূর্ণন গতি রয়েছে এবং তা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে। আবার পৃথিবীর সাথে সূর্যের চারপাশে ঘুরে এবং সৌর পরিবারের সাথে ছায়াপথের চারপাশে ঘুরে তখন তার একই দিক পৃথিবী ও সূর্যের সামনে আসে এবং সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। কারণ চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। ঘূর্ণন গতির কারণে যখন পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে এসে পড়ে তখন পূর্ণিমা প্রতিভাত হয়। এভাবে চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে এসে পড়ে তখন সংঘটিত হয় চন্দ্র গ্রহণ। আবার চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে, তখন চাঁদের আলোকিত অংশ দৃষ্টি গোচর হয় না। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদকে তখন আর দেখা যায় না এবং এই অবস্থাকেই মানুষ অমাবশ্যা নামে চিহ্নিত করে।

পৃথিবী তার আপন অক্ষের ওপর আবর্তিত হতে সময় নেয় প্রায় ২৪ ঘন্টা–এ জন্যে ২৪ ঘন্টায় একদিন নির্ধারণ করা হয়েছে। সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন–এ জন্যে ৩৬৫ দিনে বছর গণনা করা হয়। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের সময় লাগে ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেন্ড। এটাকে মোটামুটি ৩০ দিন ধরে 'মাস' নির্ণয় করা হয়েছে। চাঁদ আবহমান কাল থেকেই পৃথিবীর প্রতি একটি মুখ প্রদর্শন করে রয়েছে। চাঁদের যেদিকটি আমরা অবলোকন করে থাকি, সব সময় সেটিই দেখি এবং কখনো চাঁদের অপর পিঠ আমরা দেখতে পাই না। চাঁদের 'লক-ইন মোশন' অর্থাৎ চাঁদের যে গতি রয়েছে, তা যদি পৃথিবীকে দান করা হতো, তাহলে চাঁদের মতো পৃথিবীর আলোকিত পৃষ্ঠটি চিরকাল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকতো। ফলে পৃথিবীর আলোকিত পৃষ্ঠটি ক্রমে ক্রমে উত্তাপ পুঞ্জিভূত হয়ে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ আগ্নেয় গিরির গলিত লাভার মতোই টগবগ করে ফুটতে থাকতো। পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতো না। পৃথিবীতে সকাল-সন্ধ্যা, রাত বলতে কিছুই থাকতো না, বরং সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে পৃথিবীতে আলোকিত দুপুর বিরাজ করতো।

চাঁদের প্রভাব পৃথিবীর জীবনে অনস্বীকার্য। চাঁদের অভিকর্ষ প্রভাব না থাকলে পৃথিবীর মহাসমুদ্রের জলস্রোতধারা হতো এমন কিছুর যার সাথে আমরা অপরিচিত–তা হতে পারতো সমুদ্রের জীবদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির অবস্থা এবং পৃথিবীবাসীর জন্য এক চরম দুঃসংবাদ। চাঁদের অভিকর্ষ প্রভাবের জন্যই জোয়ার-ভাটার বর্তমান পরিস্থিতি আমরা আজকের মতো করে জানি। আয়তনে এই চাঁদটি দ্বিগুণ হলে অথবা বর্তমান আয়তন মাত্রায় দূরত্বের হিসাবে অর্ধেক নেমে আসলে সমুদ্রের পানির ওপর চাঁদের আকর্ষী প্রভাব কমপক্ষে বর্তমান অবস্থার দ্বিগুণ হতো। এই অবস্থায় লবণাক্ত এলাকার বৃদ্ধি, আবাসযোগ্য ভূমির হ্রাস, আবাদী জমির ঘাটতি এবং জলোচ্ছ্বাসজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতো। চাঁদের আয়তন বর্তমানের অর্ধেক অথবা বর্তমান আয়তনের দ্বিগুণ দূরত্বসীমায় অবস্থায় করলে এ বল মাত্রা বর্তমানের অর্ধেক হয়ে যাবার কথা। এই পরিস্থিতিতে যে পরিমাণ পানি নদ-নদীগুলোয় প্রবিষ্ট হতো, সে পরিমাণটি সেচ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পানির তুলনায় হতো অনেক নিচে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এমনি একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতো মারাত্মক রকমের অচল অবস্থা।

পৃথিবীতে নদী-সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা ঘটে থাকে চাঁদের আকর্ষণে। চাঁদের ঘূর্ণন গতির কারণে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে পড়ে সেখানে চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী হয়। স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের ওপর চাঁদের আকর্ষণ সবথেকে বেশী বলে চারদিক থেকে পানি ঐ

আকর্ষিত স্থানের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং চাঁদের আকর্ষণের স্থানের পানি ফুলে ওঠে মুখ্য জোয়ার সৃষ্টি করে। একই সময়ে পৃথিবীর যে অংশে চাঁদের টানে জোয়ার সৃষ্টি হয় তার বিপরীত দিকের পানি অপেক্ষা পানির নিচের স্থলভাগ চাঁদের দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়। এ সময় পানির ওপর পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব হ্রাস পায় এবং বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে চারদিকের পানি এসে সে স্থানে গৌণ জোয়ার সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর যে অংশে মুখ্য জোয়ার সৃষ্টি হয় তখন তার বিপরীত অংশে গৌণ জোয়ার সৃষ্টি হয়। এই সময় জোয়ারের মধ্যবর্তী দুই দিক থেকে পানি সরে যায় তখন সেই দুই দিকে ভাটার সৃষ্টি হয়। সূর্যও জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি করে থাকে। অমাবশ্যার অমানিশায় কৃষ্ণকালো ঘোর অন্ধকারে চারদিক আবৃত করে ফেলে তখন চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর একদিকে এবং একই লাইনে অবস্থান করে। সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের তুলনায় কম হলেও উভয়ের মিলিত আকর্ষণ খুবই প্রবল হয়। এই সময় যে জোয়ার হয় তাকে Spring tides বলা হয়। জোয়ার ভাটা মহান আল্লাহ অকারণে সৃষ্টি করেননি। এর ভেতরেও মানুষের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। জোয়ার-ভাটায় নদীর পানি লবণাক্ত হয়ে পানির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ফলে পানি সহজে বরফে পরিণত হয় না। জোয়ার-ভাটার কারণে নদীতে তীব্র স্রোত সৃষ্টি হয়, এ কারণে নদীর তলদেশে তলানি জমতে পারে না-নদীও ভরাট হয় না, নদীর আবর্জনা সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যায় এবং নদীর পানি থাকে নির্মল। জোয়ার-ভাটার কারণে বিশাল আকৃতির বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে সহজে গমনাগমন করতে পারে। সুতরাং চাঁদ মানুষের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এর সাথেও মানুষের অসংখ্য কল্যাণ ও অকল্যাণ জড়িত। এই চাঁদের শপথ করে মহান আল্লাহ মানুষের সেই চেতনার কথা উল্লেখ করেছেন, যে চেতনা না থাকলে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন প্রভেদ থাকতো না। মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্যেই মানুষের ভেতরে পাপ ও পূণ্যের চেতনা প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য সূরার ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে শপথ করা হয়েছে দিন ও রাতের। বলা হয়েছে, শপথ দিনের যখন সে তাকে আলোকিত করে ফেলে, শপথ রাতের যখন সে তাকে ঢেকে দেয়। রাতের আগমনে সূর্য লুকিয়ে যায় এবং গোটা রাত সূর্যের আলো-উত্তাপ অনুপস্থিত থাকে। আসলে রাত বলতে বুঝায় সূর্যের দিকচক্রবালের নিচে চলে যাওয়াকে। কেননা এই কারণেই সূর্যের আলো পৃথিবীর সেই এলাকায় পৌছে না, যেখানে রাত সমাচ্ছান্ন হয়ে পড়ে। এ কথা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই অবগত রয়েছে যে, পৃথিবীর দুটো গতি রয়েছে। এর একটির নাম বার্ষিক গতি অপরটির নাম আহ্নিক গতি। ৩৬৫ দিনে একবার সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী একটি পূর্ণ ঘূর্ণি সমাপন করে এবং আরেকটি আহ্নিক গতির জন্য নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণায়মান পৃথিবী দিন ও রাত্রির সৃষ্টি করে চলে। এই কক্ষগতির সাথে অক্ষগতির একটা সুসামঞ্জস্য রয়েছে বলেই দিন-রাত্রি এবং ঋতুর সৃষ্টি হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অক্ষগতির সঠিক কারণ কি এবং তার উৎস কোথায় ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান কেবল অনুমানলব্ধ। সম্প্রসারণশীল এই মহাবিশ্বের শাসনে বার্ষিক গতির পাশাপাশি দিন-রাত্রি সৃষ্টিকারী এই আহ্নিক গতি বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন তাঁর বান্দাহ্দের কল্যাণের জন্য। এ সম্পর্কে আমরা সূরা নাবার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মানব জীবনে সফলতা ও কল্যাণের লক্ষ্যে মানুষের প্রকৃতির ভেতরে যেমন ন্যায় ও অন্যায়ের প্রবণতা দান করেছেন, তেমনি মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই রাত ও দিনের সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরপর ৫ ও ৬ নম্বর আয়াতে শপথ করা হয়েছে আকাশের ও তার নির্মাণ কৌশলের এবং পৃথিবীর ও তার বিছিয়ে দেয়ার নৈপুণ্যের। আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। এসবের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহ্দের জন্য অসংখ্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সূরা গাশিয়ার ১৮ আয়াত ও তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।)

আলোচ্য সূরার ৭ নম্বর আয়াতে মানুষের প্রকৃতি ও তার যথাযথ বিন্যাস স্থাপন এবং সেই সত্তার শপথ করা হয়েছে, যিনি এই মানুষকে সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'সমস্ত প্রশংসা ঐ রব্ব-এর' শিরোণামে ও আ'মপারার কয়েকটি সূরার যেসব আয়াতে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব আয়াতের ব্যাখ্যায় কিভাবে মানুষকে সুবিন্যস্তভাবে অপূর্ব নৈপূণ্যতার সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আলোচনা করেছি। আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতির কথা বলেছেন। সূরা রূমের ৩০ নম্বর আয়াতেও মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হও সেই প্রকৃতির ওপর, যার ওপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আপন স্রষ্টার প্রতি অবনত ও তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া–এই প্রবণতা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে প্রবষ্টি করে দেয়া হয়েছে। যে কোন প্রয়োজনে সে একজন মহাশক্তিধর স্রষ্টার সামনে নিজের সমগ্র সত্তাকে সমর্পণ করবে এবং তাঁর কাছেই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে সাহায্য কামনা করবে, এই প্রবণতা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ভেতরেও এই প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা কোন না কোন কিছুকে অসীম শক্তিধর মনে করে তার পূজা-অর্চনা করছে। প্রকৃত স্রষ্টাকে তারা যদি চিনতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা অবশ্যই কাল্পনিক দেব-দেবীকে ত্যাগ করে প্রকৃত স্রষ্টারই গোলামী করতো। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ এবং মানুষ সেই আল্লাহরই গোলামী করবে, এই সত্য প্রকৃতি তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিটি মানব শিশুই তার প্রকৃতির ওপরে জন্মগ্রহণ করে থাকে। পরবর্তীতে তার মাতা-পিতা বা অন্য অভিভাবক তাকে সত্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। কাউকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানানো হয় আবার কাউকে মুশরিক বানানো হয়। বিষয়টি এমন যে, পশুর গর্ভ থেকে নিখুঁত শাবক জন্ম নেয়। কিন্তু মুশরিকরা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এসব শাবকের কান কেটে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তার কান কাটা অবস্থায় মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেননি। গরু, ছাগল, মোষ ইত্যাদির বাচ্চা নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরে মানুষ ভ্রান্ত আদর্শ অনুসরণ করার কারণে এসব বাচ্চার অঙ্গহানী করে দেয়, তেমনি প্রতিটি মানব শিশু সত্য প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। পরবর্তীতে তার ভেতরে ভ্রান্ত প্রকৃতি প্রবিষ্ট করানো হয়।'

মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেন, 'আমার রব বলেছেন–আমি আমার সব বান্দাহ্কে নির্দোষ-সুস্থ আল্লাহমুখী প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলাম। পরবর্তীতে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন–তাদের স্বভাবধর্ম থেকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। তাদের জন্য আমার হালাল করা বস্তুসমূহ হারাম করে দিয়েছে। আর সেসব জিনিসকে আমার সাথে শরীক বানানোর আদেশ দিয়েছে, যাদের শরীক হওয়ার কোন প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করিনি।' মানুষের দেহগত কাঠামো এবং প্রকৃতিতে অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। সুন্দর একটি দেহ কাঠামো দেয়া হয়েছে। মানব দেহের অভ্যন্তরে ও বাইরের দিকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা

একান্তভাবেই মানুষের মতোই জীবন পরিচালনার উপযোগী। এই মানুষকে দেখার, শোনার, যাবতীয় বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করার, বস্তুর স্বাদ অনুভব করার, স্পর্শানুভূতি অনুধাবনের এবং অন্যান্য বিষয়ের যে ইন্দ্রিয়নিচয় দেয়া হয়েছে, তা তার আনুপাতিকতা ও নিজস্ব বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে মানুষের জন্য জ্ঞানার্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম বানানো হয়েছে।

মানুষকে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও অনিচ্ছা শক্তি, যুক্তি দেয়ার শক্তি, কোন কিছুর মর্ম অনুধাবনের শক্তি, কল্পনা শক্তি, চিন্তা শক্তি, স্মরণ শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, দৈহিক শক্তিসহ নানা ধরনের শক্তি তার ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই দেয়া হয়েছে। এসব শক্তির সাহায্যে মানুষ এই পৃথিবীতে তার জন্য নির্দিষ্ট কাজসমূহ সম্পন্ন করে। মানুষকে জন্মগতভাবে–সৃষ্টিগতভাবে অপরাধপ্রবণ, পাপী, দুষ্কৃতিকারী হিসাবে সৃষ্টি করা হয়নি। সুস্থ সোজা সরল প্রকৃতির ওপরে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে এমন বিবেক দেয়া হয়েছে, যে বিবেক সব সময় সত্যের দিকেই রায় দিয়ে থাকে। প্রকাশ্যে সে মিথ্যের প্রতি রায় দিলেও তার ভেতরের বিবেক সত্য কথাই বলতে থাকে। তার দৈহিক কাঠামোও সহজ সরল সত্য পথে চলার অনুকূলে, তার দেহের কাঠামো এমনভাবে গঠন করা হয়নি যে, সে ইচ্ছে করলেও সত্য পথে চলতে পারবে না। এভাবেই মানুষকে কল্যাণ ও সফলতার পথে অগ্রসর হওয়ার উপযোগী দৈহিক কাঠামো ও স্বভাব-প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এভাবে মানুষের সফলতা ও কল্যাণের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত সাতটি বিষয়ের শপথ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য সূরার ৮ নম্বর আয়াতে বলেছেন, পাপ ও পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার মতো জ্ঞান প্রদান করেছেন। পাপকে চেনার ও তা থেকে বিরত থাকার জ্ঞানকেই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে 'ইলহাম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য সূরার ৮ নম্বর আয়াতের প্রথম শব্দটি 'আলহামাহা'। এর অর্থ হলো 'তাকে গোপন প্রত্যাদেশ করা হলো বা অন্তরের মধ্যে বিশেষ ভাব জাগিয়ে দেয়া হলো। এই শব্দটির মূল হলো 'ইলহাম'। এই শব্দটির আরেকটি অর্থ হলো, কণ্ঠনালীর নিচে নামিয়ে দেয়া বা গলধঃকরণ করানো। এই মৌল শাব্দিক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই শব্দটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন চিন্তা, চেতনা, ধারণা-কল্পনাকে অবচেতনভাবে মানুষের চিন্তার জগতে, জ্ঞানের জগতে বা মন-মানসিকতায় বদ্ধমূল করে দেয়াকে বুঝানোর জন্য একটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতেও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

মূল আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার পাপের পথে ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার জ্ঞান প্রদান করেছেন।' এই আয়াতে 'ফুজুর' ও 'তাকওয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পাপ, অন্যায়, চরিত্রহীনতা তথা কুপ্রবৃত্তিকে 'ফুজুর' বলা হয়েছে এবং পুণ্য-সুপ্রবৃত্তি বা পাপের পথ থেকে নিজেকে বিরত রাখার প্রবণতাকে 'তাকওয়া' বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব সৃষ্টির সময় মানুষের প্রকৃতিতে পাপ ও পূণ্য উভয়ের প্রবণতা ও আকর্ষণ বা ঝোঁক রেখে দিয়েছেন। এই বিষয়টি প্রতিটি মানুষই নিজের ভেতরে স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম এবং প্রতি মুহূর্তে তা অনুভব করেও থাকে। প্রতিটি মানুষের চেতনায় মহান আল্লাহ এই ধারণা ও বিশ্বাস প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন যে, নৈতিক চরিত্রে ভালো ও মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায় বলে একটি কথা রয়েছে। এটা সে বুঝতে পারে, কোনটি মন্দ ও অন্যায় আর কোনটি ভালো ও ন্যায়। মানুষ এটাও অনুভব করতে পারে, উত্তম চরিত্র ও ন্যায় কাজ এবং খারাপ চরিত্র ও অন্যায় কাজ কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে না। পাপ, অন্যায় ও চরিত্রহীনতা তথা ফুজুর একটা অত্যন্ত

গর্হিত, খারাপ ও বীভৎস ব্যাপার। অপরদিকে পূণ্য, ভালো কাজ, ন্যায়-নীতি অবলম্বন খুবই উচ্চমানের জিনিস, অন্যায় বা পাপ থেকে বিরত থাকা বা তাকওয়া অবলম্বন করা খুবই ভালো জিনিস।

প্রকৃতপক্ষে পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ ইত্যাদির ধারণা মানুষের কাছে কোন অপরিচিত বিষয় নয়। মানুষের প্রকৃতি এসব জিনিসের সাথে সুপরিচিত। একজন ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে বা অন্যায়ের প্রতি সমর্থন দেয়, কিন্তু তার ভেতর থেকে কেউ একজন বলে ওঠে এটা অন্যায়। অন্যায়কে অন্যায় জেনেও সে অন্যায় কাজ করে বা তার প্রতি সমর্থন দেয়। নিজ স্বার্থের কারণে অন্যায়কে মৌখিকভাবে শতবার ন্যায় বললেও তার ভেতরে অবস্থিত সুপ্রবৃত্তি হাজার বার বলে এটা অন্যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উত্তম-অধম ইত্যাদির পার্থক্যবোধ সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের ভেতরে দান করেছেন। মানুষের ভেতরে যে নফস রয়েছে, সেই নফস-ই মানুষকে উল্লেখিত বিষয়সমূহের সাথে পরিচিত করে দেয়। আল্লাহর কোরআনে মানুষের নফস সম্পর্কিত তিনটি রূপের কথা বলা হয়েছে।

প্রতিটি মানুষের ভেতরে এমন একটি নফস রয়েছে বা এমন একটি শক্তি রয়েছে, যা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে অন্যায়ের পথে, খারাপ পথে তথা পাপ ও দুষ্কৃতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ-উদ্দিপনা দিতে থাকে। এই শক্তিকে বা নফসকে 'নফসে আম্মারা' বলা হয়। নফসে আম্মারাই মানুষকে অপরাধ জগতের দিকে অগ্রসর করিয়ে থাকে। মানব প্রকৃতিতে আরেকটি শক্তি বা নফস রয়েছে, যা মানুষের ভেতরে অনুশোচনা বা অনুতাপ সৃষ্টি করে। মানুষ যদি খারাপ চিন্তা করে, অপরাধ করে, কোন পাপ করে, কোন অন্যায় কাজ করে, গর্হিত কাজ মানুষের দ্বারায় সংঘটিত হয়, তখন তার ভেতরে যে লজ্জা, অনুতাপ, অনুশোচনা সৃষ্টি হয়, বিবেকের দংশনে দংশিত হতে থাকে, ভেতর থেকে তাকে তিরস্কার করতে থাকে, দৃষ্টি দিয়ে অনুশোচনার অশ্রু ঝরায় এই শক্তিকে বা নফসকে সূরা আল কিয়ামাহ্-এর দ্বিতীয় আয়াতে 'নফসে লাউয়ামাহ্' বলা হয়েছে। এই নফসে লাউয়ামাহ্ যার ভেতরে প্রবল শক্তিশালী, তার দ্বারায় কোন অসতর্ক মুহূর্তে অপরাধ সংঘটিত হলেই সে ব্যক্তি সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে চোখের পানিতে জায়নামাজ ভিজিয়ে দেয় আর বার বার তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকে।

প্রতিটি মানুষের ভেতরেই এই 'নফসে লাউয়ামাহ্' রয়েছে। আপাদ-মস্তক নোংরামীতে লিপ্ত থাকার কারণে এই 'নফসে লাউয়ামাহ্' দুর্বল হয়ে পড়ে। তবুও সে সত্যকে কখনো মিথ্যা এবং মিথ্যাকে কখনো সত্য বলে স্বীকৃতি দেয় না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেকে নিজেই খুব ভালোভাবে জানে, সে কে কি ও কেমন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা কিয়ামাহ্-এর ১৪ ও ১৫ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'বরং মানুষ নিজেকে খুব ভালোভাবে জানে, সে যতই অক্ষমতা পেশ করুক না কেন।' প্রতিটি ব্যক্তি স্বয়ং জানে সে নিজে কি। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে গোটা পৃথিবীর মানুষকে প্রতারিত করতে পারে, ধোঁকা দিতে পারে, কিন্তু সে যে মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করছে, এ কথা সে খুব ভালো করেই জানে। খুনী যতই অস্বীকার করুক যে, সে খুন করেনি এবং তার উকিল তাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য যতই সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তি আদালতে পেশ করুক না কেন, কিন্তু খুনী ঠিকই জানে যে সে খুন করেছে। চোর নিজের ঘৃণ্য

কর্ম গোপন করা ও নিজেকে ধর্মভীরু প্রমাণ করার জন্য যত কলা-কৌশলেরই আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, সে যে স্বয়ং চোর–এ কথা অন্যদের অজানা থাকলেও তার কাছে তো অজানা থাকে না।

আল্লাহর বিধান ইসলামকে মৌলবাদ, সেকেলে, সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিশেষণে যতই বিশেষিত করা হোক না কেন, যে বা যারা এসব করছে–তারা ভালো করেই জানে যে, কোন ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এসব তারা করছে। স্বৈরাচার, জালিম বিশ্বাসঘাতক চরিত্রহীন ও অন্যায় পথ অবলম্বনকারী ব্যক্তি নিজের স্বৈরাচারী-জুলুমমূলক কর্মকান্ড, অনাচার-অত্যাচার ও কদাচারকে যথার্থ বলে প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য দলিল-প্রমাণ ও ওযর আপত্তি পেশ করে নিজের বিবেকের দংশনকে ভুলে থাকার জন্য এবং নিজের প্রতিবাদী মনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। যেন তার বিবেক ও মন তাকে তিরস্কার না করে। শেষ পর্যন্ত অপরাধী ব্যক্তির বিবেক ও মন এ কথা মেনে নেয় যে, সে যে কাজ করেছে-তা না করে কোন উপায় তার ছিল না। বাধ্য হয়েই সে ঐ কাজ করেছে, যা করা উচিত নয়। এভাবে সে মনকে সান্ত্বনা দেয় এবং বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত থাকতে চায়।

এত কিছুর পরেও সে এ কথা ভালো করেই জানে যে, ক্ষমতার মসনদে বসে সে জনগণের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছে। জনগণের অর্থ-সম্পদ সে কিভাবে কোন পথে লুটপাট করেছে। নিজের কোন কোন আত্মীয়কে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সে কার অধিকার ক্ষুন্ন করেছে, তার প্ররোচনায় এবং মদদে কোন কোন ব্যক্তি কাকে হত্যা করেছে, তার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে দলের লোকগুলো কিভাবে নারীর ইজ্জত লুটেছে, প্রতিপক্ষের ওপর কিভাবে জুলুম করেছে, নিজেরা খুন করে কোন কৌশলে নির্দোষ লোকদেরকে হত্যাকারী সাজিয়েছে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কিভাবে জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে এ কথা তার ভালো করেই জানা থাকে। সুতরাং প্রতিটি মানুষেরই এ কথা খুব ভালোভাবে জানা থাকে যে, তার স্বভাব-চরিত্র কেমন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকেই তার অবস্থান, মর্যাদা ও স্বরূপ অনুসারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন, প্রয়োজনীয় জ্ঞান, চেতনা ও দেহ কাঠামো দিয়েই সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শন করা একমাত্র তাঁরই দায়িত্ব। সূরা ত্বা-হা'র ৫০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি প্রতিটি জিনিসকে তার সৃষ্টিগত দেহ সংগঠন দান করেছেন এবং পরে পথপ্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাণীকেই 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা চেতনা দান করা হয়েছে। গরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া, জিরাফ, জেব্রা, ঘোড়া, কুকুর, শিয়াল ইত্যাদী ধরনের জন্তুর শাবক বেশ কয়েকিট পর্দায় আবৃতাবস্থায় মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আগমন করে। এই পর্দাগুলো পাতলা ঝিল্লির অনুরূপ। সদ্য ভূমিষ্ঠ শাবক স্বয়ং এই পর্দার আবরণ ছিন্ন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারে না। তার মা'কে এই চেতনা দেয়া হয়েছে যে, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সে তার জিহ্বা দিয়ে শাবকের চেহরা থেকে ঐ পর্দা সরিয়ে দেবে। এরা করেও তাই, বাচ্চা পৃথিবীর আলো-বাতাসে আসার সাথে সাথে তারা জিহ্বা দিয়ে চেটে প্রথমে বাচ্চার মুখমন্ডল পরিষ্কার করে দেয়।

এরপর ঐ শাবককে মায়ের স্তন খুঁজে নেয়ার মতো জ্ঞান দেয়া হয়েছে। মাথা দিয়ে স্তনে চাপ দিলে বেশী বেশী দুধ আসবে এবং মায়ের স্তন মুখের ভেতর নিয়ে চুষতে হবে, এই চেতনা

শাবকের ভেতরে দেয়া হয়েছে। তেলাপিয়া বা নাইলোটিকা মাছের ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার পরে মা তার বাচ্চার সাথে সাথে থাকে। বিপদ বুঝতে পারলেই সে মুখ হা করে আর বাচ্চাগুলো অমনি মায়ের মুখের ভেতরে প্রবেশ করে। মা মুখ বন্ধ করে বিপদ মুক্ত দূরত্বে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে মুখ থেকে বের করে দেয়। একই প্রক্রিয়ায় কুমিরও তার বাচ্চাকে হেফাজত করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এভাবে ঐ মাছ ও কুমিরকে এবং তাদের বাচ্চাকে জ্ঞান দান করেছেন। বড় বড় ঝিল এবং হাওড় এলাকায় বকের আকৃতির এক ধরনের পাখি বাস করে। এরা বিপদের ইঙ্গিত পেলেই বাচ্চাগুলোকে নিজের দুই ডানার ভেতরে নিয়ে পানির নিচে ডুব দিয়ে বিপদ মুক্ত দূরত্বে গিয়ে ভেসে ওঠে। এই পাখিকে এই ধরনের জ্ঞান দান করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

বেজী মাটির গর্তে বাস করে। মাটির নিচে সে একটি গুহার মতো তৈরী করে। বেজী তার গুহা থেকে বের হওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি প্রবেশ পথ তৈরী করে। একদিকের পথ দিয়ে বিপদ আসতে থাকলে অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে, এই জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছে। বেজী তার ক্ষুদ্র আকৃতির মুখ দিয়ে কুমিরের বড় আকৃতির ডিম ভেঙ্গে খেতে পারে না। এ জন্য সে সামনের দু'পা দিয়ে কুমিরের ডিম আঁক্‌ড়ে ধরে পেছনের দু'পায়ের ওপর ভর করে দেহকে সোজা করে। তারপর কুমিরের ডিম শক্ত কোন কিছুর ওপরে আছ্‌ড়ে ফেলে ভেঙ্গে খায়। বড় ধরনের ডিম ভেঙ্গে খাওয়ার এই জ্ঞান বেজীকে দান করা হয়েছে। জন্মান্ধ ক্ষুদ্র উই পোকা থেকে শুরু করে বিশাল দেহের অধিকারী হাতী পর্যন্ত, প্রতিটি প্রাণীকেই 'ইলহামের' মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করা হয়েছে।

মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়-তার অবস্থান, যোগ্যতা, মর্যাদা ও দায়িত্ব অনুসারে 'ইলহামের' মাধ্যমে পৃথক পৃথক ধরনের জ্ঞান তাকেও দান করা হয়েছে। সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো অসহায় অবস্থার মধ্যে পৃথিবীর অন্য কোন জীবকে নিক্ষেপ করা হয়নি। ক্ষুধার যন্ত্রণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও তা প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। মল-মুত্র ত্যাগের প্রয়োজন হলে বলার মতো ভাষা তার নেই। প্রস্রাব-পায়খানায় গোটা দেহ লেপ্‌টে গেলেও বলতে পারে না। দেহের কোথাও আঘাত পেলে বা যন্ত্রণা হলেও দেখাতে বা বলতে পারে না। কান্না ব্যতীত মানব শিশুর আর কিছুই করার থাকে না। শিশুর বাকশক্তি নেই, এ জন্য কান্নার মাধ্যমে সে তার অসুবিধার কথা ব্যক্ত করে। কান্নার মাধ্যমে তার অসুবিধার কথা ব্যক্ত করতে হবে, এই 'ইলহাম' তাকে করা হয় তার স্রষ্টার পক্ষ থেকে-যাঁর নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

শিশুকে বেড়ে ওঠার জন্য এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান যদি আল্লাহ তা'য়ালা না দিতেন, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী একত্রিত হয়েও শিশুর চেতনার জগতে এই জ্ঞান প্রবিষ্ট করাতে সক্ষম হতো না। মানুষ একটি বিবেক সম্পন্ন সত্তা এবং এই হিসাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সৃষ্টির সূচনা থেকেই ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে জ্ঞান দান করে যাচ্ছেন। 'ইলহাম' করা হচ্ছে বলেই মানুষ পরস্পর নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে সমাজ-সভ্যতার উন্নতি বিধান করে চলেছে। মানুষ তার সৃষ্টির শুরু থেকে নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করছে, মানুষের এই আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মধ্যে খুব অল্পই নিছক মানবীয় চিন্তা ও গবেষণার ফলশ্রুতি।

নতুবা প্রতিটি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সূচনা হয়েছে এই ভাবে যে, একজন ব্যক্তির অনুভবের জগতে হঠাৎ করে কোন বিষয় অনুভূত হলো আর অমনি সে তার সাহায্যে বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করে বসলো। প্রতি মুহূর্তে মানুষ দেখছে কোন বস্তু ওপর থেকে নিচে পতিত হয়। গাছের নিচে বসে একজন মানুষ বসে দেখছে গাছের ফল বৃন্তচ্যুত হয়ে নিচে পড়ছে। সহসা তার চিন্তার জগতে সূত্র দেয়া হলো, বৃন্তচ্যুত ফল ওপরের দিকে কেন না যেয়ে নিচের দিকে কেন নেমে এলো। এই দৃশ্যই তাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের সূত্র দিয়ে গেল।

মানুষের আরেকটি দিকও রয়েছে, আর সেদিকটি হলো মানুষ একটি নৈতিক সত্তা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের ভেতরে উত্তম-অধমের এবং ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ, ভালোর প্রতি ভালো মনোভাব ও মন্দের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করার অনুভূতি 'ইলহাম'-এর মাধ্যমেই দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভেতরে এই পার্থক্যবোধ এবং অনুভূতি ও চেতনা এক চিরন্তন সত্য (Universal truth)। এই কারণেই পৃথিবীতে কখনো কোন মানুষের সমাজ উত্তম–অধম, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা মুক্ত থাকেনি। এই বিষয়টি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, এক মহাবিজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের প্রকৃতিতে এই জ্ঞান প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন।

মানুষের ভেতরে আরো একটি নফস রয়েছে, যাকে পবিত্র কোরআনে 'নফসে মুতমায়িন্নাহ্' বলা হয়েছে। আল্লাহকে সিজ্দা দিয়ে, আল্লাহর বিধান পালন করে, সৎ ও ন্যায় কাজ করে, আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথ ও মত থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরে মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে, মনে ভাষায় ব্যক্ত করতে না পারা তৃপ্তি অনুভব করে এবং নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে ভাবতে ভালো লাগে, দ্বীনি আন্দোলনের পথে ত্যাগ করে, কোরবানী দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করে, এটার নামই হলো 'নফসে মুত্মায়িন্নাহ্'। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিবেদিত সকল স্তরের ব্যক্তিবর্গকে নিজের ভেতরের 'নফসে আম্মারা'–কে পরাজিত করতে হবে এবং 'নফসে লাউয়ামাহ্'-কে প্রবল শক্তিশালী করতে হবে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই 'নফসে মুতমায়িন্নাহ্'-অর্জন করা যাবে। নফস-এর প্রথম রূপকে পরাজিত করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হলে কোনক্রমেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে না। আর আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে যে ব্যক্তি ব্যর্থ হবে, তার পক্ষে কল্যাণ লাভ ও সফলতা অর্জন কখনোই সম্ভব হবে না।

আলোচ্য সূরার ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষদের মধ্যে সেই দলটি অবশ্যই কল্যাণ লাভ করেছে ও সফলতা অর্জন করেছে, যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর যে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে কলুষিত করেছে, সে অবশ্যই ব্যর্থ হয়েছে এবং পরিণামে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। আলোচ্য যে কথা বলার জন্য সাতটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে, সেই মূল কথাই বলা হয়েছে ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব তত্ত্ব ও তথ্য এবং সত্য তাঁর বান্দাহ্দেরকে বুঝাতে, মন-মানসিকতায় দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দিতে চান, তার সাক্ষ্য হিসাবে তিনি বেশ কয়েকটি অধিকতর স্পষ্ট বিষয়ের উল্লেখ করে থাকেন–আলোচ্য সূরাতেও সেই নীতিই অবলম্ববন করা হয়েছে। যেসব বিষয়ের শপথ করা হয়, সেগুলো মানুষ তার পরিবেশে অথবা তার দেহে এবং সত্তায় প্রকাশমান দেখতে পায় আর এটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম।

আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরাতেও সেই নিয়ম অনুসারে দুটো পরস্পর বিরোধী জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন সূর্য ও চাঁদ, রাত ও দিন এবং আকাশ ও পৃথিবী–এসবই পরস্পর

বিরোধী। সূর্য ও চাঁদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সূর্যের আলো অত্যন্ত প্রখর এবং উত্তাপ সম্বলিত। এই আলো পৃথিবীতে তাপের সৃষ্টি করে, পানিকে বাষ্পাকারে পরিণত করে মহাশূন্যে মেঘমালায় পরিণত করে। অপরদিকে চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের উপস্থিতিতেও চাঁদ আকাশের নিচে মহাশূন্যে তার নিজস্ব কক্ষপথে অবস্থান করে কিন্তু আলোহীন নিষ্প্রভ অবস্থায় থাকে। সূর্য যখন অস্ত যায় তখনই চাঁদ তার জ্যোৎস্নালোক বিকিরণ করতে শুরু করে। কিন্তু এই আলোয় কোন উত্তাপ থাকে না বা সে আলো রাতকে দিনের মতো পরিণত করতে পারে না। সুতরাং সূর্যের আলো যে কাজ সম্পাদন করে চাঁদের আলো সে কাজ করতে সক্ষম নয়। আবার চাঁদের আলো যে কাজ সম্পাদন করে, সূর্যের আলো তা পারে না। এ দুটো আলো সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী এবং এরই শপথ করে মূল কথা ব্যক্ত করা হয়েছে আলোচ্য সূরায়।

অপরদিকে রাত ও দিনও পরস্পর বিরোধী এবং উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পারস্পরিক এতটাই বিপরীত যে, রাত ও দিনকে কেউ এক ও অভিন্ন বলতে পারে না। রাতের ভেতরে মানুষের যে গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের যে কল্যাণ উপস্থিত রয়েছে, তা দিনের মধ্যে নেই। আবার দিনের মধ্যে যে গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা রাতের মধ্যে অনুপস্থিত। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আকাশকে এতদূরে সংস্থাপন ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্তও তার ঠিকানা খুঁজে পায়নি। অপরদিকে ঐ মহাকাশের অনেক নিচে এই পৃথিবীকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। এ দুটো জিনিসই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকলেও এ দুটো জিনিসের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এরপর মানব প্রকৃতি সম্পর্কে শপথ করে বলা হয়েছে, মানুষকে প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মানসিক শক্তির মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ ও আনুপাতিকতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তার ভেতরে ন্যায়-অন্যায়ের ও ভালো-মন্দের উভয় প্রকারের ভাবধারা বা ঝোঁকপ্রবণতা এবং কার্যকারণ (factors) প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। মানুষের ভেতরে এসব কার্যকারণ ও ঝোঁকপ্রবণতার সাথেও একটির সাথে আরেকটির ব্যাপক ব্যবধান এবং পরস্পর বিরোধী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরস্পর বিরোধী অথচ সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর পরস্পর বিরোধী জিনিসের শপথ করে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের ভেতরেও পরস্পর বিরোধী দুটো জিনিস দেয়া হয়েছে। তিনি সহজাত 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে এ দুটো পরস্পর বিরোধী জিনিসের অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায়ের, ভালো-মন্দের মৌলিক পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমে বুঝানো হয়েছে ফুজুর অর্থাৎ পাপ বা অন্যায় সম্পর্কে। তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এটা অত্যন্ত গর্হিত ও খারাপ জিনিস, এসব পরিহার করে মানুষকে জীবন পরিচালিত করা উচিত। দ্বিতীয়ত তাকে বুঝানো হয়েছে তাকওয়া অর্থাৎ ভালো ও কল্যাণ সম্পর্কে। মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ভালো ও কল্যাণ খুবই উত্তম। মানব জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে এ দুটোর কোন বিকল্প নেই। সূর্য-চন্দ্র, দিন-রাত, আকাশ ও পৃথিবী এসব যেমন এক ও অভিন্ন নয় এবং এসবের গুণ-বৈশিষ্ট্যও এক নয়, পরস্পর বিরোধী–তেমনি মানব সত্তার ফুজুর ও তাকওয়াও এক নয় এবং সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। এই পরস্পর বিরোধী দুটো বিষয় কেমন করে এক অভিন্ন হতে পারে? ন্যায় ও অন্যায়ের এবং ভালো ও মন্দের যে মানদন্ড মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির জন্য প্রদান করেছেন, এর বিপরীত মানদন্ডকে কোনক্রমেই

গ্রহণ করা যেতে পারে না। মানুষের ভেতরে যেমন ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি পবিত্র কোরআন-ফোরকান অবতীর্ণ করেছেন, যেন মানুষের কাছে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

মানুষ নিজের, দেশের ও জাতির স্বার্থে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ও সন্ত্রাসবাদের মানদন্ড নির্ধারণ করবে, এই অবকাশ পৃথিবীর কোন দেশের নেতা-নেত্রী বা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে দেয়া হয়নি। নিজেদের মনগড়া কোন মানদন্ডের নিরিখে কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণ করতে গেলে অবশ্যই তা অন্যায় হবে। যেমন বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানদের স্বাধীকার আন্দোলনকে অমুসলিম গোষ্ঠী সন্ত্রাসবাদ নামে আখ্যায়িত করে মুসলমানদের ওপরে দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। অথচ অমুসলিমদের স্বাধিকার আন্দোলনকে তারা মদদ দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ন্যায়-অন্যায় এবং ভালো ও মন্দের যে মানদন্ড মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই মানদন্ড প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম ও আন্দোলন করা কোরআনের বাহকদের তথা মুসলমানদেরই দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে মুসলমানরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলেই বর্তমানে তারা গোটা পৃথিবীতে জুলুম অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যেমন মানুষের ভেতরে ভালো ও মন্দের পার্থক্য জ্ঞান 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে দিয়েছেন তেমনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেও মানব জাতির কাছে সত্য আর মিথ্যার পরিচয় সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ দুটো বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিণতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আলোচ্য সূরার ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে সেই পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিঃসন্দেহে মানুষের ভেতরে সেই দলটি কল্যাণ লাভ করেছে, সফলতা অর্জন করেছে, যারা নিজের সত্তাকে অপরাধ মুক্ত রেখে পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছে। আর তারাই ব্যর্থ হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যারা নিজের সত্তাকে অপরাধ মুক্ত রাখতে পারেনি এবং পরিশুদ্ধতা অর্জন করেনি।

আলোচ্য আয়াতে 'তাযকিয়ায়ে নাফস'-এর ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 'তাযকিয়া' শব্দের অর্থ হলো, পবিত্র ও শুদ্ধকরণ বা উৎকর্ষ সাধন ও ক্রমবিকাশ সাধন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের ভেতরের সত্তাকে তথা নফস্-কে যাবতীয় খারাপ প্রবণতা থেকে মুক্ত রাখবে, খারাপ প্রবণতা তথা 'নফসে আম্মারা'-কে দমন করে 'নফসে লাউয়াম্মাহ্ ও নফসে মুতমায়িন্নাহ্'-কে উন্নত করবে, এর উৎকর্ষতা বিধান করে তাকওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করবে এবং ক্রমশঃ এর শক্তি বৃদ্ধি করবে, সে অবশ্যই কল্যাণ লাভ ও সফলতা অর্জন করবে। নফসে আম্মারাকে দমন ও নফসে লাউয়াম্মাহ এবং নফসে মুতমায়িন্নাহ্-এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিজেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উৎসর্গ করতে হবে, কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করাকে নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই কাজ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দিতে হবে। যথাসময়ে নামাজ আদায় করতে হবে এবং নামাজ আদায়কালে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, 'আমি স্বয়ং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং সিজ্দা দিচ্ছি আল্লাহ তা'য়ালার পায়ের ওপরে।' বুঝে কোরআন অধ্যয়ন করতে হবে এবং আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ পরম শ্রদ্ধাভরে পালন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং যে কোন অবস্থায় তাঁর ওপরে সন্তুষ্ট ও তাঁরই

ওপরে নির্ভর করতে হবে। বিশেষ করে গভীর রাতে উঠে আল্লাহকে সিজ্দা দিয়ে চোখের পানিতে সিজ্দার স্থান ভিজিয়ে দিতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার চোখের পানি খুবই পছন্দ করেন। আল্লাহর রাসূলের চরিত্রে যেসব অভ্যাস ছিল, তা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে ইনশাল্লাহ্ নফসে আম্মারা ক্রমশ দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়বে, অপরদিকে নফসে লাউয়াম্মাহ এবং নফসে মুতমায়িন্নাহ্ শক্তিশালী হবে-পরিশেষে রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জন করা যাবে।

আলোচ্য সূরার ১০ নম্বর আয়াতে 'দাচ্ছাহা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, গোপন করা, হরণ করা, কলুষিত করা বা পথভ্রষ্ট করা, অপহরণ করা, গুপ্ত করা বা লুকিয়ে রাখা। এই আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের ভেতরে ঐ দলটি ব্যর্থ হবে, ক্ষতিগ্রস্থ হবে বা জাহান্নামে যাবে, যারা নিজের ভেতরের সৎপ্রবণতাকে শক্তিশালী না করে, নিজের নফস বা সত্তায় অবস্থিত সৎ প্রবণতাসমূহকে উৎকর্ষ ও বিকশিত না করে, তাকে সৎ পথে পরিচালিত না করে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করবে, সৎ প্রবণতাকে দমন করবে, একে বিভ্রান্ত করবে সেই ব্যর্থ হবে। মানুষের ভেতরের এই জাগ্রত সৎ সত্তা প্রতি মুহূর্তে পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের মতই আলো বিকিরণ করতে থাকে। নিকষ কালো মেঘ যখনই তা আড়াল করে, তখন তার আলো আর দৃষ্টি গোচর হয় না।

অর্থাৎ উজ্জ্বল চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তেমনি মানুষ যখন আল্লাহর বিধানের বিপরীত পন্থা তথা অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন তার সৎ প্রবণতার ওপরে পাপের অন্ধকারের পর্দা আবৃত হয়ে পড়ে। এভাবে আল্লাহর বিধান মানুষ যখন একটির পর আরেকটি লংঘন করতে থাকে, ততই তার অন্তর জগৎ কলুষিত হয়ে পড়ে, হৃদয়ের সৎ জ্যোতি কলুষতার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এই মানুষের ভেতরে 'নফসে আম্মারা' প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নফসে লাউয়াম্মাহ্ ও নফসে মুতমায়িন্নাহ্ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সত্তায় সৎ ও অসৎ প্রবণতা প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন এবং সেই সাথে মানুষকে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে কোনটি সৎ আর কোনটি অসৎ সেটা বুঝার মতো জ্ঞানও দান করেছেন। এই জ্ঞান যথেষ্ট নয় বলে সৎ ও অসৎকে চেনার জন্য পবিত্র কোরআনও দান করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের ভেতরের সৎ ও অসৎ শক্তির নিয়ন্ত্রণ মহান আল্লাহ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেননি, এটা মানুষের নিজের ওপরে ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ ইচ্ছে করলে সাধনার মাধ্যমে নিজের সত্তার সৎ প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করতে পারে আবার কেউ ইচ্ছে করলে অপরাধের জগতে প্রবেশ করে নিজের সত্তার অসৎ প্রবণতাকে বৃদ্ধি করতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সত্তায় সৎ ও অসৎ সম্পর্কিত চেতনাবোধ এবং জ্ঞান, এর অনুকূলে দেহ কাঠামো দিয়েছেন, তদুপরি পথনির্দেশক হিসাবে কোরআন দিয়েছেন। এসব কিছু দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি দেখছেন, কে সৎপথ অবলম্বন করে আর কে অসৎ পথ অবলম্বন করে। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন আর যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে, তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

সৎ পথে চলার জন্য মানুষের সত্তায় সৎ ও অসৎ-এর ভেতরে পার্থক্য করার মতো চেতনা ও জ্ঞান এবং এটা যাথেষ্ট নয় বলে পথনির্দেশক হিসাবে কোরআন দেয়া হয়েছে, এরপরও কোন

ব্যক্তি যদি নিজেকে অসৎ পথে পারিচালিত করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাকে অভিযুক্ত করে বলে যে, 'যেমন নাচাও তেমনই নাচি পুতুলের কি দোষ' তাহলে এসব লোককে জ্ঞানপাপী আর নির্বোধ ছাড়া কি বলা যেতে পারে! সুতরাং মানুষের দেহ সত্তায় যে সৎ ও অসৎ প্রবণতা বিদ্যমান, এই সৎ প্রবণতাকে বিকশিত করা ও তার উৎকর্ষ বিধানের দায়িত্ব একান্তভাবেই ব্যক্তির নিজের-আল্লাহর নয়। মানুষ সৎ পথে চলবে আর সেই সাথে সে মহান আল্লাহর কাছে সৎপথে চলার জন্য সাহায্য কামনা করবে-এটা মানুষের দায়িত্ব।

আলোচ্য সূরার ১১ থেকে ১৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পৃথিবীর সেই শক্তিশালী জাতি সামূদের ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে, যে জাতি শক্তির গর্বে মদমত্ত হয়ে নিজেদের দেহ সত্তার অভ্যন্তরের খারাপ প্রবণতাকে অপরাধের পথে ঠেলে দিয়ে এতটা বিকশিত করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর প্রেরিত নবীর সাথে বিদ্রোহ করেছিল। পরিণতিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আযাবের নির্মম চাবুকের কষাঘাতে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আয়াতগুলোয় বলা হয়েছে, 'সামূদ জাতি আল্লাহর নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো। যখন তাদের বড় নাফরমান ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো, আল্লাহর নবী তাদের বললো, এই হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো উটনী এবং এই হচ্ছে তার পানি পান করার জায়গা। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো এবং এই উটনীকে তারা হত্যা করে ফেললো। অতপর তাদের এই না-ফরমানীর কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর মহাবিপর্যয় নাযিল করলেন। অতপর তিনি তাদের মাটির সাথে একাকার করে দিলেন।' (সামূদ জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল ফজরের তাফসীর।)

আলোচ্য সূরায় কয়েকটি জিনিসের শপথ করে মানুষের দেহসত্তার ভেতরে সৎ ও অসৎ প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, এর ভেতরে হঠাৎ করে সামূদ জাতির ধ্বংসের ইতিহাস এই জন্য আলোচনা করা হয়েছে যে, যাদের সামনে কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, মক্কার সেই ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীও তাদের ভেতরের পাপ প্রবণতাকে অপরাধমূলক কর্মের মাধ্যমে এতটা বিকশিত করেছিল যে, সত্যের প্রদীপকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য তারা সর্বাত্মক বিরোধিতায় নিয়োজিত হয়েছিল। এমনকি সত্যের বাহক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। মক্কার শিশু কিশোর তরুণ যুবক বৃদ্ধ পর্যন্ত সামূদ জাতির ধ্বংসের ইতিহাস জানতো। এই জন্য তাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছিলো যে, সামূদ জাতি যেমন নিজেদের ভেতরের পাপ প্রবণতাকে বিকশিত করে পৃথিবী থেকে লাঞ্ছনামূলক শাস্তি ভোগ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, তোমরাও যদি অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদেরকেও ঐ একই পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।

ইতিহাস থেকে সামূদ জাতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার পূর্বে যেসব কথা বলা হয়েছে, তারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সামূদ জাতির ধ্বংসের ইতিহাস উল্লেখ করে। প্রথমে বলা হয়েছে, মানুষের সত্তাকে এক সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সেই সত্তার ভেতরে সৎ ও অসৎ সম্পর্কিত চেতনাবোধ বা জ্ঞান 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। মানব জাতিকে এ কথা অবগত করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'য়ালা আরেকটি কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষের চেতনার জগতে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে, সেই ইলহামী জ্ঞানের ভিত্তিতেই প্রতিটি মানুষ জীবন পরিচালিত করার মতো প্রয়োজনীয় বিস্তারিত হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম নয়।

সাফল্য ও কল্যাণের পথে নির্ভুলভাবে অভ্রান্তপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজন ওহী ভিত্তিক জ্ঞান। এই প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যেই আল্লাহ তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলদেরকে বিস্তারিত হেদায়াত দান করেছেন। ফুজুর তথা অসৎ, খারাপ, মন্দ, অন্যায়, অপরাধ, পাপ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, বিপর্যয় ইত্যাদি বলতে কি বুঝায় এবং এর সংজ্ঞা কি, এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে কোন কোন জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে ও কোন কোন জিনিস পরিত্যাগ করতে হবে, ওহীর মাধ্যমে আসা জ্ঞানে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে তাকওয়া তথা ভালো, উত্তম, ন্যায়, সুনীতি, সুন্দর, মহত্ত্ব ইত্যাদি বলতে কি বুঝায় এবং এর সংজ্ঞা কি, এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে কোন কোন জিনিসকে গ্রহণ করতে হবে, নিজের চরিত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে, এসব জিনিস কিভাবে অর্জন করা যাবে তা ওহীর মাধ্যমে আসা জ্ঞানে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুতরাং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত এই সুস্পষ্ট হেদায়াত যে ব্যক্তি গ্রহণ করে না, সে যেমন 'ফুজুর' তথা অপরাধ প্রবণতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না, সফলতা ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারে না, তেমনি 'তাকওয়া' তথা সৎ প্রবণতাকে বিকশিত করে হেদায়াতের পথে, সাফল্য ও কল্যাণের পথেও অগ্রসর হতে পারে না।

নিজের নফসকে 'ফুজুর' তথা অসৎ প্রবণতা থেকে মুক্ত রেখে, নফসে আম্মারাকে দমন করে, নফসে লাউয়াম্মাহ্ ও নফসে মুতমায়িন্নাহ্-এর শক্তিবৃদ্ধি করে মানব গোষ্ঠীর ভেতরে যে লোকগুলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে–তথা তাকওয়া অর্জন করেছে, তারাই কেবলমাত্র সফলতা অর্জন করতে ও কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে। আর যারা তাকওয়া তথা দেহসত্তায় বিদ্যমান সৎ প্রবণতাকে দমন করে তাকে ফুজুরের পথে, অপরাধ জগতের দিকে ঠেলে দিয়েছে, নফসে আম্মারা-এর শক্তিবৃদ্ধি করেছে, তারাই নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হবে এবং জাহান্নামে যাবে। হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম যে সামূদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই জাতি 'ফুজুর'-এ আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। একটির পর আরেকটি অপরাধ করতে করতে তাদের ভেতরে নফসে আম্মারা প্রবলভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, অপরদিকে নফসে লাউয়াম্মাহ্ ও নফসে মুতমায়িন্নাহ্ ছিল মৃতপ্রায়।

আল্লাহর নবী হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম সেই সামূদ জাতিকে 'ফুজুর' থেকে বিরত থেকে নফসে আম্মারাকে দমন করে নফসে লাউয়াম্মাহ্ ও নফসে মুতমায়িন্নাহ্-কে শক্তিশালী বানিয়ে এর বিকাশ সাধন ও উন্নতি বিধানের জন্য বলেছিলেন। কিন্তু হতভাগা সেই জাতি আল্লাহর রাসূলের কথাই শুধু অমান্য করেনি, আল্লাহর দেয়া নিদর্শন উটনীকেও তারা হত্যা করেছিল। তাদের এই ঘৃণ্য কর্মই প্রমাণ করেছিল যে, তাদের আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত ছিল 'ফুজুর' তথা অপরাধের সাগরে। তেমনি তোমরাও যারা অপরাধের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে আল্লাহর প্রেরিত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করছো, বিরোধিতা করছো আল্লাহর বিধানের সাথে, তোমাদের পরিণতিও ঐ সামূদ জাতির অনুরূপ যেন না হয়, সে জন্য 'ফুজুর' তথা অপরাধের জগৎ থেকে ফিরে এসে প্রবেশ করো 'তাকওয়া'র জগতে। তাহলে অর্জন করতে পারবে সফলতা ও লাভ করতে পারবে কল্যাণ।

নবী ও রাসূলদের অবর্তমানে তাদের মিশন জারি রেখেছে দ্বীনি আন্দোলন। এই আন্দোলনও মানুষকে 'ফুজুর' তথা অন্যায়, অপরাধ ও পাপের জগৎ থেকে বের করে 'তাকওয়া' তথা ন্যায়, ভালো ও কল্যাণের আলোকিত জগতে নিয়ে এসে সফলতার পথে অগ্রসর করানোর

লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ফুজুর-এ নিমজ্জিত লোকগুলো এই আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করছে, যেমন বিরোধিতা করেছে সামূদ জাতি এবং মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী। প্রত্যেক নবী-রাসূলের সাথেই 'ফুজুর'-এ নিমজ্জিত লোকগুলোই বিরোধিতা করেছে। তারা যখনই সীমালংঘন করেছে, তখনই আল্লাহর আযাবের চাবুক তাদের ওপরে বর্ষিত হয়েছে। যেমনভাবে বর্ষিত হয়েছিল, নমরুদ, ফেরাউন, আ'দ ও সামূদ জাতির ওপরে। বর্তমানেও 'ফুজুর'-এ নিমজ্জিত লোকগুলো যখন আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রোহ-বিরোধিতা করবে, সীমালংঘন করবে, তখনই তাদের ওপরে আযাবের চাবুক বর্ষিত হবে।

অবাধ্য, জালিম, স্বৈরাচারী, অত্যাচারী 'ফুজুর'-এ নিমজ্জিত লোকগুলোর ওপরে আযাবের চাবুক বর্ষণ করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে কারো পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়নি, কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হয়নি। ভবিষ্যতের পরিণতির কথা তাঁকে ভাবতে হয়নি যে, তিনি অপরাধীদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, পরবর্তীতে এর পরিণতি কি হতে পারে। পৃথিবীর রাজা, বাদশাহ, শাসক, নেতা-নেত্রী দেশের জনগণের বিরুদ্ধে, অধীনস্থদের বিরুদ্ধে, দলীয় লোকদের বিরুদ্ধে, বিরোধিদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে একাধিক বার পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, কিভাবে পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এসব দুর্বলতা থেকে মুক্ত। তাঁকে কোন পরিণতির কথা চিন্তা করতে হয় না। তিনি অপরাধিদের বিরুদ্ধে যখন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বা করেন, তখন সেই অপরাধিদের কোন সমর্থক তাঁর পদক্ষেপকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে একেবারেই অক্ষম এবং অসহায়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন অপরাধী জাতির ধ্বংসের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। সেসব জাতির ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ যখন শাস্তিমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তখন নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপের সামনে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি কেউ করতে পারেনি। মহান আল্লাহ হলেন রাজাধিরাজ, তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশ-সর্বোচ্চ এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়েই তাঁকে কারো কাছ থেকে যেমন পরামর্শ গ্রহণ করতে হয় না, তেমনি তাঁর গৃহিত পদক্ষেপের ব্যাপারেও কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এই কথাগুলোই বলা হয়েছে আলোচ্য সূরার শেষ আয়াতে। 'ফুজুর'-এ নিমজ্জিত অপরাধী সামূদ জাতির ধ্বংসের ইতিহাস উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আর রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা! তিনি এসব ব্যাপারে কারো পরিণতির পরোয়া করেন না।'

সূরা আল–লাইল

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৯২

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতের 'লাইলি' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কোরআনের গবেষকগণ ধারণা করেন, মক্কায় যে পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সূরা আশ্ শাম্‌স অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ একই পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সূরা আল লাইল-ও অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এ দুটো সূরার মূল বক্তব্যে এক অদ্ভূত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। পৃথিবীতে দুটো পথের মধ্যে একটি সত্য আরেকটি মিথ্যা। এই দুটো পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং তা অনুসরণের পরিণতি ও অনুসরণ করার পরে কি ধরনের ফলাফলের সম্মুখিন হতে হবে, এটাই এই সূরার মূল আলোচিত বিষয়। পৃথিবীতে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে, দলগতভাবে ও জাতিগতভাবে যে চেষ্টা-সাধনা করছে, শ্রম দিয়ে যাচ্ছে, তা নৈতিকতার দিক দিয়ে যেমন পরস্পর বিরোধী, তেমনি পরস্পর বিরোধী মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারী।

রাত ও দিনও পরস্পর বিরোধী, এর একটির গুণ-বৈশিষ্ট্য অপরটির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। মানুষ যে নৈতিক বিশেষত্বের প্রতিনিধিত্ব করে, তার জীবন-যাপনের পদ্ধতিও সেই নৈতিক বিশেষত্বের অনুরূপ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির নৈতিক বিশেষত্ব যদি এটা হয় যে, আল্লাহ, রাসূল, আসমানী কিতাব ও পরকালকে বিশ্বাস করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা দান-সদকা করে, কল্যাণকে কল্যাণ মনে করেই জনসাধারণের স্বার্থে কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খারাপকে ক্ষতিকর মনে করেই যে কোন ধরনের খারাপ কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে।

অপরদিকে কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির নৈতিক বিশেষত্ব যদি এটা হয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না, পরকালকে অবিশ্বাস করে অথবা পরকালের প্রতি উদাসীন। মহান আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ বা সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোন পরোয়া করে না। সুন্দর ও কল্যাণের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না। সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করতে অস্বস্তি বোধ করে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা সাধারণ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করার পরিবর্তে কার্পণ্যই করে থাকে। যে পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে, সে পদক্ষেপের অশুভ পরিণতির কথা তারা চিন্তা করে না।

এই দুই ধরনের নৈতিক বিশেষত্বের প্রতিনিধিত্ব যারা করে, তাদের কর্ম পদ্ধতি যেমন পরস্পর বিরোধী তেমনি এ দুটের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে এবং এর পরিণতির মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথম ধরনের নৈতিক বিশেষত্বের প্রতিনিধিত্ব যে ব্যক্তি, দল বা জাতি করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের জীবনকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করার জন্য চলার পথকে সহজ করে দেবেন। মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা, অন্যায়-অসৎ ও ভ্রষ্টকর্ম থেকে বিরত থাকার বিষয়টি তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে, পাপের পথে অগ্রসর হওয়া এদের জন্য চরম কষ্টকর হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি, দল বা জাতি দ্বিতীয় ধরনের নৈতিক বিশেষত্বের প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের জন্য অন্যায়, পাপ, অকল্যাণ ও দুর্নীতির পথকে সহজ করে দেবেন। এদের জন্য সৎকাজ করা ও সৎপথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে। এই

শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা পৃথিবীতে সম্পদ অর্জন করার লক্ষ্যে যে কোন পথ অবলম্বন করে। প্রয়োজনে নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু তার অর্জিত ধন-সম্পদ সবই অন্যের অধিকারে চলে যাবে যখন সে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। এই ধন-সম্পদ তার কোন কল্যাণে আসবে না।

এরপর বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে মানুষসহ যাবতীয় সৃষ্টিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে পথহারা করে ছেড়ে দেননি। সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শনের দায়িত্বও অন্য কোন সৃষ্টির প্রতি অর্পণ করা হয়নি। এই দায়িত্ব তিনিই স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করবে একজন আর সেই সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শন করবে আরেকজন, এটা কোন যুক্তি ভিত্তিক কথা নয়। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকে স্বয়ং পথপ্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে যারা নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে, অর্জিত ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে ব্যয় করবে, তারাই কেবল আপন মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর যারা আপন প্রভুর দেখানো পথ অনুসারে জীবন পরিচালিত করবে না, তাঁর বিধানের দিক থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনের কুন্ড প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

সূরা আল-লাইল-মক্কী
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
আয়াত-২১-রুকু-১

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٣ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١٠ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ۝١١ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٢ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝١٣ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝١٤ لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ۝١٥ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٦ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝١٧ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝١٨ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤى ۝١٩ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۝٢١

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) রাতের শপথ যখন তা (আঁধারে) ঢেকে যায়, (২) দিনের শপথ যখন তা (আলোয়) উদ্ভাসিত হয়, (৩) নারী ও পুরুষ-তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন-তাদের শপথ, (৪) অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা (হবে) নানামুখী, (৫) অতএব যে (আল্লাহর পথে) দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে। (৬) ভালো কথাগুলো যে সত্য বলে মেনে নেয়, (৭) অবশ্যই আমি তাকে সহজভাবে (তার গন্তব্যে) পৌছে দেবো। (৮) যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে, (৯) যে ভালো কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, (১০) অবশ্যই আমি তাকে কঠোরভাবে (তার গন্তব্যে) পৌছাবো। (১১) অথচ যখন তার (রাশি রাশি) ধন-সম্পদ বিলীন হয়ে যাবে তখন তা তার কোনো কাজেই লাগবে না। (১২) (আসলে মানুষকে) সঠিক পথপ্রদর্শন করা অবশ্যই আমার কাজ। (১৩) দুনিয়া আখিরাতের নিরঙ্কুশ মালিকানা আমারই জন্যে।

(১৪) আমি তোমাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের ব্যাপারে সাবধান করেছি। (১৫) নির্ঘাত পাপী ছাড়া অন্য কেউই এখানে নিমজ্জিত হবে না। (১৬) যে (পাপী এই দিনকে) অস্বীকার করেছে এবং (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (১৭) যে (আল্লাহকে) বেশী বেশী ভয় করে, তাকে

আমি (এ থেকে) বাঁচিয়ে দেবো, (১৮) যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে (আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ) ব্যয় করেছে। (১৯) (অথচ) তোমাদের কারোরই তার কাছে এমন কিছু ছিলো না যে (যার জন্যে) তোমাদের কোনো রকম প্রতিদান দেয়া হবে, (২০) (হ্যাঁ, পাওনা) এটুকুই যে, সে শুধু তার মহান মালিকের সন্তুষ্টিই কামনা করেছে। (২১) (আর এ কারণে) অচিরেই তার মালিক (তার ওপর) সন্তুষ্ট হবেন।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে পরস্পর বিরোধী গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তিনটি বিষয়ের শপথ করে ৪ নম্বর আয়াত থেকে মূল বক্তব্য শুরু হয়েছে। রাত ও দিনের শপথ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে এই রাত ও দিন পরস্পর ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এরপর শপথ করা হয়েছে নারী ও পুরুষের। এ দুটো সত্তাও পরস্পর বিরোধী। যদিও নারী স্বাধীনতার দাবীদার অর্বাচিন লোকগুলো বলে থাকে নর আর নারীর মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে কোনই পার্থক্য নেই বরং তারা সৃষ্টিগতভাবে যেমন সমান, তেমনি সমান অধিকার লাভের ক্ষেত্রে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এসব মতলববাজদের জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছে। মাত্র কিছু দিন পূর্বেও মনে করা হতো যে, বিজ্ঞান যতই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে–সৃষ্টিকর্তা ততই মানুষের মন থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। কথাটিকে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে বললে যার অর্থ দাঁড়ায়, প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব, প্রাধান্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধ স্রোতে চলে যাচ্ছে। সৃষ্টিকর্তা ও পালন কর্তাকে এই পৃথিবী এবং সমগ্র মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেখান থেকেই এই ধারণা উৎসারিত যে, বিন্দু থেকেই বৃত্ত। প্রতিটি ধর্মের বিশ্বাসীরাই মনে করেন যে, সবকিছুই সেই কেন্দ্রমুখী (Centripetal)। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষকে কেন্দ্রবিমুখ (Centrifugal) করে তোলে। অর্থাৎ মানুষ কেন্দ্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের অবিস্মরণীয় আবিষ্কারগুলো স্রষ্টার কুদরত এবং কারিশমাকেই পুনর্ব্যক্ত এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠা করছে।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার এ ধারাক্রমে সর্বশেষ সংযোজন হলো মানব জিনের জটিল ভাষার পাঠোদ্ধার। ২০০০ সনের ২৬ শে জুন গোটা পৃথিবী জুড়ে জেনোম প্রজেক্টের যুগান্তকারী সাফল্যের ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। এ ঘোষণা আসার পরে জেনেটিক কোড বা মানব জিনের নীল নকশা তথা ডিএনএর ধারাবিন্যাসের (DNA Sequence) পাঠোদ্ধার সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিপুল আনন্দে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে চমকে দেয়ার মতো মন্তব্য করেছিলেন আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। তিনি বলেছিলেন, 'এর ফলে মানুষ এখন ঈশ্বরের প্রাণ সৃষ্টির ভাষা আয়ত্ত করতে চলেছে। স্রষ্টা যে ভাষায় প্রাণ সৃষ্টি করেন আজ আমরা সে ভাষাটি শিখছি। আমরা স্রষ্টার সবচাইতে ঐশ্বরিক ও পবিত্র উপহারের চমৎকারিত্বের জন্য আরো বেশী করে বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছি।'

আমরা মুসলিমরা সেই শৈশব থেকেই শুনে আসছি মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন। খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন মুসলিম নামধারী মুরতাদদের চমকে দিয়ে ঈমানদারদের আজন্ম লালিত বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করেছেন শুধু। এখানে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এখানে কিন্তু ব্যক্তি ক্লিনটন হিসেবে তাঁর মতামত দেননি। তিনি তাঁর মতামত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। সচেতন মানুষ এ কথা জানে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন কোন বিষয়ে কোন কথা বলেন তখন সে কথাটা সাধারণভাবে গোটা পশ্চিমা বিশ্বের কথা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি যখন কোন বিবৃতি দেন তখন অসংখ্য বিভাগ এবং

অসংখ্য বিশেষজ্ঞ তাদের একত্রিত মাথা ঘামিয়ে সে বিবৃতি তৈরী করেন। তারপর তা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার বিবৃতি বা বক্তব্য চূড়ান্ত করে তারপর তা প্রচার করা হয়।

আলোচ্য ক্ষেত্রে জেনেটিক কোড উন্মোচনকে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন 'স্রষ্টার ভাষা আয়ত্ব করা' অথবা 'সৃষ্টিকর্তার পবিত্র উপহার' বলে যে মন্তব্য করেছেন সেটা বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের অফিসিয়াল বক্তব্য হিসেবেই করেছেন। এই ব্যক্তি তার ধর্ম বিশ্বাসে খৃষ্টান। কিন্তু তিনি যা বলেছেন সে কথা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে এবং তিনি তা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার জন্য জেনোম প্রজেক্ট তথা জেনেটিক ম্যাপ বা জেনেটিক সিকোয়েন্স নিয়ে অতি সংক্ষেপে এখানে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রকল্পটির নাম হলো জেনোম প্রজেক্ট। জেনোম বলতে বোঝায় মানবদেহের সবগুলো ডিএনএ। সবগুলো ডিএনএকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় জেনোম। ডিএনএর অন্তর্ভুক্ত হলো জিন। জীবদেহের গঠন এবং জীবন ধারণের মৌলিক ও অপরিহার্য উপাদান হলো প্রোটিন। প্রোটিন তৈরীর রহস্য বা ফর্মূলা নিহিত রয়েছে জিনে। জেনোমের আকৃতি ধারণারও অতীত। মোটামুটি ফুলস্কেপ সাইজের কাগজে জেনোমের সাংকেতিক ভাষা যদি লিপিবদ্ধ করতে হয় তাহলে ২ লক্ষ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে। ডিএনএ হলো একটি অণু বা মলিকিউল। এর সম্পূর্ণ উচ্চারণ হলো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড। ডিএনএ কোড এক প্রকার সংকেত, এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পথনির্দেশ। এই রাসায়নিক পথনির্দেশ মাড়িয়েই মানবদেহ বিকশিত হয়। জেনেটিক কোড নামে অবিহিত এই জৈব রাসায়নিক নির্দেশনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের আকৃতি, গঠন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তা-চেতনা। মানুষের জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট পড়ে ফেলার জন্য বিজ্ঞানীদেরকে করতে হয়েছে জেনেটিক সিকুয়েন্স বা ধারাবিন্যাস। এই ধারাবিন্যাস সম্পন্ন হয়েছে ৪ টি ভিতের ওপর।

এই চারটি ভিতের ইংরেজী আদ্যাক্ষর হলো A=এডেনিন, T=থিয়ামিন, C=সাইটোনিন এবং G=গুয়ানিন। এই চারটি ভিত রচিত হয় ৩শ' কোটি জিন ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক বিল্ডিং রকের সাহায্যে। একটি জিনের মধ্যকার ৪টি ভিত আবার জোড়াবদ্ধ হয়ে একজোড়া চেইন তৈরী করে। এডিনিনের সাথে থিয়ামিন আর সাইটোসিনের সাথে গুয়ানিন জোড়াবদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে জিনিসটি তৈরী হয় সেটাকেই বলে ডিএনএ। একটি ডিএনএতে ২৮ থেকে ৩৫ লক্ষ জোড়া ঐ ভিতে থাকে। একটি মানব কোষে প্রায় ৬ ফুট দীর্ঘ ডিএনএ চেইন বা শেকল আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ডিএনএর মধ্যে আছে জোড়ায় জোড়ায় চেইন বা শেকল এবং ৩শ' কোটি জোড়া বেজ বা ভিত।

ডিএনএ'র মলিকুলের একটা প্যাঁচানে মইয়ের মতো কাঠামো আছে, যার নাম ডাবল হেলিক্স। মইয়ে ধাপ সৃষ্টির জন্য আড়াআড়িভাবে স্থাপিত দন্ডগুলোর গায়ে জেনিটিক কোড বা জিনের সাংকেতিক বার্তাগুলো লিপিবদ্ধ। প্রত্যেকটি জিনে শত শত শব্দ ও বাক্য আছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পাঠোদ্ধার করতে হবে ৩শ' কোটি মানব জেনম। আর কাজটা এমন নিখুঁতভাবে করতে হবে যাতে কোন জিন ঠিক কোন প্রোটিন তৈরী করে এবং কি উদ্দেশ্যে করে তা নির্ণয় করা যায়।

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মানব জিনের অপরিহার্য অঙ্গ ডিএনএ'র জোড়া সম্পর্কে বহু পূর্বেই মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের প্রায় ৮টি সূরায় এই

যুগল বা জোড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। সূরা রা'দ, সূরা নাহল, সূরা ইয়াছিন, সূরা নাজম, সূরা শূরা, সূরা যুখরুফ, সূরা জারিয়াহ ও সূরা নাবা। এসব সূরায় বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনা থেকে সৃষ্টির সব ধরনের প্রক্রিয়ায় আল্লাহর কুদরত এবং অনন্ত সত্যের সন্ধান লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ ..اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

মহান পবিত্র সে আল্লাহ, সৃষ্টিসমূহের সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। (সূরা ইয়াছিন-৩৬)

এই যুগল যেমন মানব জাতির মধ্যে রয়েছে, তেমনি রয়েছে পশু, পাখি, উদ্ভিদ প্রভৃতির মধ্যেও। জড়পদার্থের মধ্যেও এমন যুগল রয়েছে। বিদ্যুতেরও যুগল রয়েছে। কিন্তু সেই যুগল বিপরীত ধর্মী। যেমন ধনাত্মক বিদ্যুৎ এবং ঋণাত্মক বিদ্যুৎ (Positive electricity and negative electricity) এমনকি পরমাণুরও (Atom) রয়েছে দুই বিপরীত যুগল। এগুলো হলো ধনাত্মক নিউক্লিয়াস আচ্ছাদিত প্রোটন (Proton)। চারধারে জড়িয়ে থাকা ঋণাত্মক ইলোকট্রোন (Electron)। সূরা রাদে ফলমূলের জোড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। সূরা নাহলের ৭২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে ?'

এই আয়াতটি ডিএনএ বা জেনেটিক ধারাবিন্যাসের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক। Scientific Indications in the Holy Quran গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, A species is master minded by Allah to keep up the continuity of its kind from one generation to the next. The science genetics has shown that this is made possible by the transmission of genetic material from one generation to the next. অর্থাৎ আল্লাহ কোন প্রজাতিকে সৃষ্টি করার সময় এমনভাবে তার পরিকল্পনা করেন যাতে করে তার বংশগতির ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। জেনেটিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মানুষের জিন এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পরিবাহিত হয়।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ডিএনএতে রয়েছে ৩শ' কোটি জোড়া। তাদের গ্রন্থনার আকৃতিকে বলা হয়েছে (Double Helix) অর্থাৎ সর্প যুগল। জেনেটিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে ১৯৫০ সালে। ডিএনএ'র অন্তর্গত ২৩টি ক্রোমোজমের পাঠোদ্ধার সম্পন্ন হলো এই ২০০০ সালে। অবশ্য আরেকটি পাঠোদ্ধার এখনো বাকী রয়েছে। হয়তো আগামী কিছু দিনের মধ্যেই সেটাও সম্পন্ন হবে। মানবদেহের জটিল রহস্য বিশেষ করে তার কোটি কোটি জেনেটিক যুগল বা জোড়া সম্পর্কে মানব জাতি অবগত হতে পেরেছে মাত্র মাস কয়েক বা কয়েক বছর পূর্বে। অথচ এই যুগল-এই জোড়া এবং তার জেনেটিক বা বংশগতির ধারা পবিত্র কোরআন দেড় হাজার বছর পূর্বেই উল্লেখ করে মানুষকে পরিবারিক জীবন গঠনের জন্য অনুপ্রেরণা দান করা হয়েছে।

দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন কোরআন অবতীর্ণ হয় তখন তো বিজ্ঞান বিশেষ করে জীববিজ্ঞান বলতে গেলে প্রায় অজানা অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে মানুষ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে

সাথে জানতে পারছে প্রাণ রসায়ন (Bio-chemistry), জৈব প্রযুক্তি (Bio-technology) জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering), অণুজীববিদ্যা (Molecular biology) ইত্যাদি। শুধুমাত্র জেনেটিক বিজ্ঞানই নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আল্লাহর কোরআনের বাণী অভ্রান্ত। বিজ্ঞানী কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিও যখন বললেন এবং প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবী এবং সেই সাথে সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু (Celestial objects), অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র তাদের আপন আপন কক্ষ পথে ঘুরছে।

তাদের এই ঘোষণা শুনে মানুষ বলা শুরু করলো যে, একটি নতুন চিরসত্য আবিষ্কৃত হলো। অথচ বিজ্ঞানী কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিওর ঘোষণার বহু পূর্বে পবিত্র কোরআনের সূরা ইয়াছিন ঘোষণা করেছে যে, সমস্ত কিছুই স্বীয় কক্ষপথে সাঁতার কেটে ফিরছে। শুধু পৃথিবীর আপন কক্ষপথ পরিভ্রমণই নয়, প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী থিওরী বিগ ব্যাং (Big Bang) বা মহাবিস্ফোরণের কথাও (Theory of expanding universe) পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে। মহাবিশ্বে যে অসীম এবং প্রতিদিনই সেটা যে সম্প্রসারিত হচ্ছে সেটাও কোরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। সূরা আম্বিয়া, সূরা তাকভীরসহ একাধিক সূরায় স্পষ্ট ভাষায় এসব ঘটনা ও তত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে।

আলোচ্য সূরায় যে তিনটি পরস্পর বিরোধী স্বভাব সম্পন্ন বিষয়ের শপথ করা হয়েছে, এর মধ্যে নারী ও পুরুষ একটি। নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, পুরুষের গড়পরতা উচ্চতার তুলনায় নারীর গড়পরতা উচ্চতা ১২ সি.এম কম। এই পার্থক্য কোন নির্দিষ্ট জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পৃথিবীর সমস্ত নর-নারীর মধ্যেই এই পার্থক্য বিদ্যমান। পুরুষের গড় ওজন ৪৭ কেজি আর নারীর গড় ওজন সাড়ে ৪২ কেজির অধিক নয়। অর্থাৎ আনুপাতিক হারে পুরুষের তুলনায় নারীর ওজন ৫ কেজি কম। ডাঃ ক্যারিনি ইনসাইক্লোপীডিয়ায় মন্তব্য করেছেন, সমষ্টিগতভাবে পরীক্ষা করা হলে প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের মাংশপেশী পুরুষের মাংশপেশী হতে ভিন্ন প্রকৃতির, এবং ঘনত্ব ও শক্তির দিক দিয়ে এতই দুর্বল যে, এগুলো স্বাভাবিক শক্তির তিনভাগ করা হলে দুই ভাগই পুরুষের অংশে পড়বে। আর নারীর অংশে পড়বে মাত্র একভাগ। মাংশপেশীর দ্রুত সঞ্চালন গতি ও সংকোচনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিদ্যমান। নারীর তুলনায় পুরুষের মাংশপেশী চলার গতিতে অগ্রগামী এবং ক্রিয়ায় অধিক শক্তিশালী।

পুরুষের হৃদপিন্ডের তুলনায় নারীর হৃদপিন্ড ৬০ গ্রাম ছোট এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ওজনের। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কারবনিক এসিডের যেসব অণুকণা মানব দেহ হতে নির্গত হয়, তা অভ্যন্তরীণ তাপের দরুণ বায়ুতে রূপান্তরিত হয়ে শ্বাস–প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত আকারে নির্গত হয়। কিন্তু পুরুষ প্রতি এক ঘন্টায় প্রায় ১১ ড্রাম কার্বন জ্বালিয়ে ফেলতে সক্ষম, পক্ষান্তরে নারী এক ঘন্টায় অধিক ৬ ড্রাম জ্বালাতে সক্ষম। পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক তাপও পুরুষের তুলনায় অর্ধেকের কিছু বেশী। পুরুষ নির্দিষ্ট দুরত্ব হতে ঘ্রান অনুভব করে। কিন্তু নারীকে ঐ একই দূরত্ব হতে ঘ্রান অনুভব করতে হলে ঘ্রান হতে হবে দ্বিগুণ। নারী হালকা ব্রসিড এসিডের গন্ধ $\frac{১}{২০০০০০}$ অনুপাতে এবং পুরুষ $\frac{১}{১০০০০০}$ অনুপাতে অনুভব করতে পারে। গড়ে পুরুষের মগজের ওজন নারীর মগজের তুলনায় ১০০ ড্রাম বেশী। পুরুষের মগজের পরিমাণ তার দেহের গঠনের তুলনায় ৪০ ভাগের একভাগের অনুরূপ। কিন্তু নারীর মগজ তার শারীরিক গঠনের তুলনায় ৪৪ ভাগের এক ভাগের অনুরূপ হয়ে থাকে। নারীর

মাথার মগজে বক্রতা ও প্যাঁচ অনেক কম এবং তার আবরণগুলোর ব্যবস্থাপনাও অসম্পূর্ণ। দেহ বিজ্ঞানের পরিভাষায় মাথার পেছনের ভাগকে লঘু মস্তিষ্ক বলা হয়। পুরুষের মগজের সাথে লঘু মস্তিষ্কের সম্পর্ক ১ বনাম ৮ $\frac{৪}{৭}$ বলে প্রমাণিত হয়েছে। অপরদিকে নারীর মস্তিস্কে এটা অনধিক ১ বনাম $\frac{১}{৪}$ এর অনুরূপ মাত্র। মানুষের মাথার যে সব অংশের পরিমাণ বেশী হওয়ার ওপর জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তা ও বোধশক্তির প্রখরতা ও প্রকৃষ্টতা নির্ভরশীল, লঘু মস্তিষ্ক তার মধ্যে অন্যতম। পুরুষের মগজের আনুপাতিক ওজন প্রায় ৪৯ আউন্স। আর নারীর মগজের ওজন ৪৪ আউন্স মাত্র। ২৭৮ জন পুরুষের মগজের ওজন করা হলে সবচেয়ে বড় মগজটির ওজন ছিল ৬৫ আউন্স আর ছোট মগজটি ছিল ৩৪ আউন্স। ২৯১ জন নারীর মগজের ওজন করা হলে বড় মগজটির ওজন ছিল ৫৪ আউন্স আর ছোটটির ওজন ছিল ৩১ আউন্স।

এতো গেল নারীর এক দিক। অপরদিকে নারীর প্রতি মাসে ঋতুস্রাব হয় যা পুরুষের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। নারী সাবালক হওয়ার পরে এটা দেখা দেয়। এ সময়ে নারীর শরীরে তাপ ধারণ করার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে অধিক মাত্রায় দেহ হতে তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপ কমে নারী দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময়ে নারীর নাড়ী ক্ষীণ হয়ে পড়ে। রক্তের চাপ কমে যায়। শ্বাস গ্রহণে পার্থক্য দেখা দেয়। ইনডোক্রিনেস, টনসিল এবং লিমপ্যাটিক গ্লান্ডস্-এ পরিবর্তন ঘটে। প্রোটেইন ম্যাটাবোলিজম কমে যায়। ফস্ফেট্স এবং ক্লোরাইনড্স কম পরিমাণে নির্গত হয় এবং গ্যাসিউস্ ম্যাগাবোলিজম-এর অবনতি ঘটে। হজম শক্তির অবনতি ঘটতে পারে, খাদ্যবস্তুর প্রোটিন ও চর্বির ভাগ শরীর গঠনে অপর্যাপ্ত হয়। কণ্ঠ নালীতে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। স্নায়ুমন্ডলী আবসন্ন ও অনুভূতি শক্তি শিথিল হয়। স্মরণশক্তি কমে যায় এবং কোন বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী হয়না।

উনবিংশ শতাব্দীর এন্সাইক্লোপেডিয়ার সংকলয়িতা নারী শব্দের বিশ্লেষণ প্রসংগে লিখেছেন–যদিও নর-নারীর ভেতরে লিঙ্গগত পার্থক্যটাই বড় হয়ে দেখা দেয় তবু সেটাই তাদের ভেতরকার বৈষম্যের একমাত্র মানদণ্ড নয়। এমন কি বাইরে থেকেও তাদের যা কিছু পুরুষের অনুরূপ বলে মনে হয়, মূলত তাও সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের ।

এ মন্তব্য করেই তিনি দেহবিজ্ঞানের গবেষণা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। তার সারমর্ম হলো–মূলত নারীর শারীরিক গঠন প্রায়ই শিশুদের মতোই, তাই তোমরা দেখেছো যে নারীদের অনুভূতিও শিশুদের মতই উচ্ছ্বাস প্রবণ। যে কোন প্রভাব অতি সহজেই তাদের ভেতরে দাগ কাটে। শিশুরা যেমনি কোন দুঃখের ব্যাপার ঘটলে সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, আবার কোন খুশীর খবর পেলে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, নারীদেরও তো সেই দশা! তারা পুরুষের তুলনায় বেশী ভাবপ্রবণ ও দুর্বলমনা। বাইরের যে কোন প্রভাব তাদের এতটা প্রভাবান্বিত করে যে, তাদের জ্ঞানও সে ক্ষেত্রে হার মেনে যায়। এ কারণেই তাদের ভেতরে স্থিরতার একান্ত অভাব। যার ফলে, যে কোন কঠিন ও ভয়াবহ ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

গবেষণা ও জ্ঞানগর্ভ অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বাভাবিক পুরুষের দৈর্ঘ্য যে কোন স্বাভাবিক নারীর দৈর্ঘ্য থেকে বার সেন্টিমিটার অধিক। এ পার্থক্য কোন বিশেষ এলাকা বা জাতির ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অসভ্য জাতি থেকে শুরু করে উঁচুদরের সভ্যজাতির ভেতরেও এই একই ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। যুবকদের ভেতরে এ পার্থক্য যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখা যায় শিশুদের ভেতরেও। শিরা-উপশিরার গতি ও শক্তির দিক থেকেও

নারী জাতি পুরুষের চাইতে অনেক দুর্বল। ডক্টর দাওফারীনী তার রচিত 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়ায়' লিখেছেন-পুরুষের শিরা-উপশিরা থেকে একেবারেই ভিন্ন-নেহাৎ আলাদা ধরনের। তার প্রক্রিয়া ও শক্তির দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে, নারী দেহের শিরাগুলো এতই দুর্বল যে, তার স্বাভাবিক শক্তি ও গতিকে যদি তিন ভাগ করা যায়, তা'হলে তার দু'ভাগেই পুরুষদের ভাগে পড়ে এবং বাকি এক ভাগ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে নারীদেহে। শিরা-উপশিরার স্পন্দনের দ্রুততা ও ধীরতার বেলায়ও অনুরূপ পার্থক্যই বিদ্যামান। পুরুষের দেহের শিরাগুলো নারীদেহের শিরা থেকে যেরূপ দৃঢ়তর, তেমনি দ্রুততর।

মানুষের জ্ঞান ও মেধাশক্তি যে পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে প্রতিপালিত হয়, তাতেও উভয় শ্রেণীর ভেতরে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মনীষী নিকোলাস ও মনীষী বেইলী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মেয়েদের ইন্দ্রিয়শক্তি পুরুষের ইন্দ্রিয় শক্তি থেকে অনেক দুর্বল । নারীর অনুভূতি শক্তি সম্পর্কে মনীষী লোমব্রুযার ও সিয়ারজী প্রমুখ পণ্ডিতদের সর্বসম্মত অভিমত এই-নারীদের পুরুষ থেকে এ ক্ষেত্রে দৌর্বল্য অনেক বেশী। তাদের গবেষণাপ্রসুত যুক্তি হলো এই, দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি নরের চাইতে, নারীর অনের কম বলেই ধৈর্য তাদের নরের চাইতে বেশী মনে হয়। নরের চাইতে নারীর অনুভূতি অনেক কম না হলে আগুনের মত দাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে তারা এত ঘনিষ্ঠভাবে জীবনভর থাকতে পারতো না। লোম ব্রুযারের মূল বক্তব্য হলো, গর্ভ ও প্রসবের কঠিন কষ্ট সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং ভেবে দেখনু যে, নারীরা দুনিয়ার বুকে কত কঠিন দুঃখ-কষ্ট করছে। যদি নারীদের অনুভূতি শক্তি পুরুষের মতোই তীক্ষ্ম হতো, তাহলে কিছুতেই তারা এতবড় দুঃখ নীরবে সহ্য করতে পারতো না। মানব জাতির সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের প্রখর অনুভূতি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন । তা না হলে বনী আদমের উৎপত্তির গুরুভার বয়ে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না।

নারী পুরুষ থেকে দৈহিক ব্যাপারে দুর্বল হলেও লজ্জা ও উত্তেজনায় পুরুষকে চিরকাল হার মানায়। তাদের মস্তিষ্কের অনুভূতি ও উত্তেজনা কেন্দ্রটি পুরুষের চাইতে বেশী সুবিন্যস্ত ও সজাগ। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে নারীদের পাল্লা পুরুষের চাইতে ভারী। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ শক্তি দ্বারা নারীরা কোন কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হয় না। কারণ, অনুভূতি ও উত্তেজানার প্রাবল্যের ফলে তারা জ্ঞানের সীমারেখা স্থির রাখতে ব্যর্থ হয়। যেমন, অধ্যাপক দাফারীনী তার এনসাইক্লোপিডিয়ার লিখেছেন, এ পার্থক্যটা উভয় শ্রেণীর বাইরের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাম স্যপূর্ণ বৈ নয়। পুরুষের ভেতর যেমন মেধা ও জ্ঞান শক্তির উপকরণ বেশী, নারীর ভেতরে তার দুর্বল দিকটা অর্থাৎ লজ্জা ও উত্তেজনার উপকরণ বেশী।

ইউরোপের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক মনীষী ক্রশিয়ার মতে, নারীর প্রকৃতিগত দৌর্বল্যের পরিচয়ই পাই আমরা তাদের উত্তেজনার প্রাবল্য থেকে। তার মূল বক্তব্য হলো এই, নারীর শ্রেণীগত দৌর্বল্যর পরিণতি স্বরূপই আমরা তাদের ভেতরে পুরুষের তুলনায় বেশী উত্তেজনার পরিচয় পাই। তাদের এ ত্রুটিই তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব গর্ভ, প্রসব ও স্তন্যদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট ডেকে আনে।

সুতরাং রাত, দিন ও নারী-পুরুষ-এই তিনটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের শপথ করে আলোচ্য **সূরার ৪ নম্বর আয়াতে** মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা-সাধনা হবে নানামুখী। অর্থাৎ মানব মন্ডলীর চেষ্টা-প্রচেষ্টা, শ্রম-সাধনা যেমন নানা ধরনের ও প্রকারের হয়ে থাকে, তেমনি এর ফলাফলও অনুরূপ হয়ে থাকে। মানুষ কর্ম করবে এক ধরনের আর ফল লাভ করবে তার বিপরীত-এমন কখনোই হবে না। একজন মানুষ তার

সমগ্র জীবনকাল ব্যাপী আপন প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে কোরআনের বিধান নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করলো, নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নিজের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা, মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করলো, নিজের কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ উন্মুক্ত অবারিত হস্তে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যয় করলো। এই দুর্গম পথে চলতে গিয়ে সে অবর্ণনীয় জুলুম অত্যাচার সহ্য করলো, এই ব্যক্তি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করার পরে আপন মালিকের কাছ থেকে অবশ্যই মহাপুরস্কার হিসাবে জান্নাত লাভ করবে। এর বিপরীত কিছুই সে লাভ করতে পারে না। কারণ তার যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা এই পথেই সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ছিল।

অপরদিকে এক ব্যক্তি তার সমগ্র জীবনকাল ব্যাপী আপন রব মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে নিজের জীবন পরিচালিত করলো। তাকে কেন এবং কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, এখানে তার মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য কি, এ সম্পর্কে সে উদাসীন থেকে পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা, খ্যাতি আর অর্থ-সম্পদ লাভ করাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করলো এবং এসব অর্জন করার জন্য সে বৈধ ও অবৈধ কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি দিল না, এই ধরনের ব্যক্তি তার নিজ কর্মের প্রতিফল হিসাবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অনুরূপ প্রতিফল লাভ করতে পারে না। সে তার নিজ কর্মের নিকৃষ্ট প্রতিফল হিসাবে জাহান্নামই লাভ করবে, কারণ তার যাবতীয় প্রচেষ্টা এই পথেই নিয়োজিত ছিল।

মানুষের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সাধনা, মেধা ও শ্রম বিভিন্ন ধরনের হলেও তা মূলত দুইটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে গোটা মানব মন্ডলীর মধ্যে দুটো শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। প্রথম শ্রেণীতে অবস্থান করছে সেই লোকগুলো, যারা বিশ্বাস করে এই পৃথিবীর জীবনকালই শেষ নয়–মৃত্যুর পরে আরেকটি অনন্তকালের জীবন রয়েছে, সেই জীবনে পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের চুলচেরা হিসাব আপন রব্ব-এর সামনে দিতে হবে এবং সেই জীবনে সফলতা অর্জন করাই প্রকৃত সফলতা। প্রতিটি যুগেই পৃথিবীতে এই শ্রেণীর লোকগুলো ছিল সংখ্যা লঘিষ্ঠ। এই সংখ্যা লঘিষ্ঠ লোকগুলো পরকালের জীবনে সফলতা অর্জন করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে তাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করে।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে সেই লোকগুলো-যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ, এদের ভেতরে কেউ পরকাল অবিশ্বাসী অথবা পরকালের প্রতি সন্দিহান। এরা পৃথিবীর জীবনে সফলতা অর্জন করাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে এবং পৃথিবীর জীবনে সফলতা অর্জন করাকেই প্রকৃত সফলতা বলে বিবেচনা করে। এই সফলতা অর্জন করার লক্ষ্যেই তারা মেধা ও শ্রম ব্যয় করে সাধনা করতে থাকে।

প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা লঘিষ্ঠ লোকগুলো কোন পথ অবলম্বন করে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, সে বিষয়টি **আলোচ্য সূরার ৫ থেকে ৬ নম্বর আয়াতে** বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতগুলোয় তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য যাদের ভেতরে প্রস্ফুটিত হবে, তারাই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। প্রথম যে গুণটি তার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে সৌরভ ছড়াবে তাহলো, সেই ব্যক্তি কখনো অর্থ-ধন-সম্পদের দাসত্ব করবে না। এই পৃথিবীতে ঐলোকগুলোর দ্বারাই মানব সভ্যতা সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের ভেতরে অর্থ-সম্পদ অর্জন করার অদম্য লালসা রয়েছে। কুৎসিত এই লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে এই শ্রেণীর লোকগুলো অকল্যাণমূলক ক্ষতিকর যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করেছে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে এসব লোক নিজের ধন-সম্পদের পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আপন আত্মীয়-স্বজনকে যেমন বঞ্চিত করে থাকে, তেমনি কূটজালে আবদ্ধ করে প্রতিবেশীদের ধন-সম্পদের ওপরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। তার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে সমাজ বাধা হয়ে দাঁড়ালে, সে সমাজকে বিশৃংখলতার অতল তলদেশে তলিয়ে দিতেও সে দ্বিধাবোধ করে না।

অপরদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ লিপ্সু যে লোকগুলো পৃথিবীর ধন-ভান্ডারের ওপরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এরা প্রথমে অগণিত জনতাকে বুভূক্ষ রেখে নিজেদেরকে সমরাস্ত্রে শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। তারপর কূট কৌশলের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশসমূহ ও নানা সম্পদে পরিপূর্ণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহকে নিজের বলয়ে নিয়ে এসে শোষণ করে নিজের দেশকে অর্থ-সম্পদে স্ফিত করতে থাকে। সারা পৃথিবীতে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে কোন রাষ্ট্র যদি প্রতিবাদের ঝান্ডা উত্তোলন করতে চায়, তাহলে তারা মুহূর্ত কাল দেরি না করে মারণাস্ত্র নিয়ে সেই রাষ্ট্রের ওপরে বন্য হায়েনার মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে। অগণিত মানব সন্তান অস্ত্রের খোরাকে পরিণত হচ্ছে দেখেও এদের বিবেক কোন প্রতিবাদ করে না। ইতিহাসে দেখা যায়, এভাবেই অর্থ লিপ্সু লোকগুলো বার বার মানব সভ্যতাকে কলঙ্কিত করেছে।

সুতরাং সফলতা অর্জনের জন্য মানুষকে প্রথমেই অর্থ-সম্পদের প্রতি নির্লোভ হতে হবে। যে ব্যক্তি এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সে ব্যক্তির দ্বারায় কখনো তার নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, দেশ ও জাতি এবং মানব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং সে তার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ সেই পথেই ব্যয় করবে, যে পথ তার নিজের মনিব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পছন্দ করেন। নিজের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবীদের অধিকার সে বুঝিয়ে দেয়। মানুষের কল্যাণে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে সে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।

সফলতা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় যে দুর্লভ গুণটি অর্জন করতে হবে, সেটা হলো সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে ভয় করা। এই গুণটি এমন এক দুর্লভ গুণ, যা মানুষের গোটা চরিত্র ও জীবনধারাকে পরিবর্তন করে দেয়। অত্যাচারীকে করে সংযত, কৃপণকে করে দয়ালু আর উচ্ছৃংখল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ব্যক্তিকে করে তোলে সুশৃংখল। মানব প্রকৃতিতে সুপ্তাবস্থায় যেসব মহৎ গুণাবলী রয়েছে, তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আর যেসব ঘৃণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত রয়েছে, তা চিরতরে দূরিভূত করে দেয়। যার হৃদয়ে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আপন রব্ব-আল্লাহ তা'য়ালার ভয় জাগরুক রয়েছে, তার কাছ থেকে নিজ পরিবার, প্রতিবেশী, জাতি এবং মানব সভ্যতা শুধু কল্যাণই লাভ করতে থাকে। তার স্পর্শে যাবতীয় অকল্যাণ হয় দূরিভূত। সে যুগে একজন সুন্দরী তন্বী তরুণী অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে নির্জন পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পড়ন্ত বেলায় পথ অতিক্রম করছিল। তরুণী লক্ষ্য করলো, সামনের দিক থেকে একজন সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী বলিষ্ঠ যুবক তারই দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে।

নির্জন পাহাড়ের পথে যুবককে এগিয়ে আসতে দেখে তরুণী ভয়-বিহ্বলা হয়ে মাটির ওপরে বসে পড়লো। সে ভাবলো আজ তার ইজ্জত ও অলঙ্কার সবকিছুই লুণ্ঠিত হবে। যুবক ধীর পায়ে এগিয়ে এসে তরুণীর ভয় কম্পিত চোখের ওপরে চোখ রেখে বললো, 'মা, তোমার কোনো ভয় নেই-তুমি কোথায় যাবে বলো, আমি প্রহরা দিয়ে নিরাপত্তার সাথে তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবো। আমার পরিচয় শোনো, আমি একজন মুসলমান।' আল্লাহর

ভয় মানুষের চরিত্রকে এই ধরনের বর্ম দিয়েই পরিবেষ্টন করে রাখে। আল্লাহর ভয়ে সদাকম্পমান মানুষগুলো মানবতার কল্যাণের প্রতীক, এদের স্পর্শেই মানব সভ্যতা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে বিকশিত হয়-পৃথিবীময় সৌরভ ছড়াতে থাকে।

সফলতা অর্জনের জন্য তৃতীয় যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে তাহলো, উত্তম-কল্যাণ ও সত্য গ্রহণে অকুণ্ঠিত হতে হবে। দ্বিধাহীন অকুণ্ঠিত চিত্তে, যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় ছেড়ে মুছে কোন ধরনের প্রশ্ন ব্যতীতই মহাসত্য গ্রহণ করতে হবে। মূল আয়াতে বলা হয়েছে, 'ভালো কথাগুলো যে সত্য বলে মেনে নেয়।' এখানে ভালো কথা বলতে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল কর্তৃক পরিবেশিত যাবতীয় বিধানাবলীকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর দেয়া বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে, তিনি যে মানদন্ড অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকেই যাবতীয় কিছুকে পরিমাপ করতে হবে। আল্লাহর দেয়া মানদন্ডে যা উত্তীর্ণ হবে তাই গ্রহণ করতে হবে আর যা উত্তীর্ণ হবে না, তা অবশ্যই ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করতে হবে। এ কথা দৃঢ়ভাবে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যে বিধান দিয়েছেন, তাই শুধু অনুসরণ ও পালন যোগ্য এবং এর বিপরীত যা কিছুই বাহ্যিক দিক দিয়ে সুন্দর অবয়বে বিদ্যমান রয়েছে, তা সবই পরিত্যাজ্য।

এই তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে মানব চরিত্রে সৃষ্টি হয় না। চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সাধনা, মেধা ও শ্রম ব্যয় করে এসব দুর্লভ গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়। সর্বোত্তম ও মহৎ এই গুণ-বৈশিষ্ট্য যে ব্যক্তি বা জাতি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে, **আলোচ্য সূরার ৭ নম্বর আয়াতে** মহান আল্লাহ ওয়াদা করছেন, 'অবশ্যই আমি তাকে সহজভাবে তার গন্তব্যে পৌছে দেবো।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সফলতা দান করবেন। যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সে ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালালো, যে গন্তব্যে পৌছার জন্য সে চলা শুরু করলো, আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য পথকে সহজ সরল করে দেবেন। এখানে একটি কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, সহজ সরল পথ হলো সেই পথ-যে পথ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে, যে পথ মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানুষের প্রকৃতি যে পথে অগ্রসর হতে আগ্রহী এবং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও যে পথ পছন্দ করেন, সেই পথটিই হলো সহজ-সরল পথ।

এই পথ এমন একটি পথ, যে পথে চলতে গিয়ে মানুষকে নিজের বিবেক, বুদ্ধি ও প্রকৃতির প্রতিবাদের সম্মুখিন হতে হয় না। এই পথে চলার উপযোগী করেই মানুষের দেহ-কাঠামো, দেহের অভ্যন্তরীণ দিকসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে। এ পথে যখন কোন মানুষ অগ্রসর হয়, তখন তাকে তার দেহ ও মনের ওপরে শক্তি প্রয়োগ করে এ পথে চলতে বাধ্য করার প্রয়োজন হয় না। মহান আল্লাহর বিধান ও মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, এ দুটো পরস্পর সামঞ্জস্যশীল। কারণ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে, সে তার স্রষ্টা আপন মনিবের দাসত্ব করবে। ইতিপূর্বে সফলতা অর্জনের জন্য আমরা যে তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছি, তা যখন কোন মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হবে, তখন তার জন্য এই পথে চলা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়বে।

মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথ তথা অন্যায় পথে চলতে গেলেই স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হয়। অন্যায় পথের কোন পথিক যখন অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করতে উদ্যোগী হয়, তখন তাকে মেধা ও শ্রম ব্যয় করে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে হয়। মনে আতঙ্ক থাকে, সাধারণ মানুষ যদি প্রকৃত বিষয় জানতে পারে

তাহলে তাকে প্রতিরোধের সম্মুখিন হতে হবে, লোক নিন্দার মোকাবিলা করতে হবে। এভাবে অন্যায়কারীকে প্রতিটি অন্যায় কর্ম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতি নিয়ত যুদ্ধ প্রতিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হয়।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে সহজ সরল পথে চলতে গিয়ে উক্ত ধরনের কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় না। একজন লোক যখন তার কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ মানবতার কল্যাণে ব্যয় করতে থাকে, নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীদের সমস্যা দূর করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা-সাধনা করে। আর্তপীড়িত মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে, অভাবীর অভাব মোচন ও দুঃখীর দুঃখ দূর করার চেষ্টা করে, সমাজের সর্বস্তরের জনগণ এই ধরনের লোককে অবশ্যই হৃদয়ের মণি কোঠায় আশ্রয় দান করবে। যে ব্যক্তি যে কোন ধরনের নৈতিক অপরাধ থেকে নিজের জীবনকে মুক্ত রেখেছে, প্রতিটি কাজকর্মে ইনসাফের নীতি অবলম্বন করেছে, কখনো কারো সাথে বেঈমানী, বিশ্বাসঘাতকতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ, অশোভন আচরণ, করেনি, কথা দিয়ে কারো মনে ব্যথা দেয়নি, সমাজের প্রতিটি লোক যার আশ্রয়কে অত্যন্ত নিরাপদ মনে করে, যার কথার ভেতর দিয়ে বিনয়ের ফলগুধারা ঝরে পড়ে, এই ধরনের লোক পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজে অবস্থান করলেও সেই সমাজের লোকগুলোর কাছে সে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র হিসাবে বিবেচিত হবেই। সমাজের প্রতিটি স্তরের লোক অবশ্যই তাকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করবে। সাধারণ মানুষ এই লোকের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভব করবে। এই ধরনের লোক সম্পর্কে মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً-

যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে-সে নর বা নারী হোক না কেন, সে যদি মুমিন হয় তাহলে তাকে আমি অবশ্যই উত্তম জীবন-যাপন করার সুযোগ করে দেবো। (সূরা আন নাহ্‌ল-৯৭)

ইতিপূর্বে আলোচ্য সূরার ৫ থেকে ৬ নম্বর আয়াতে মানব জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য যে তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রস্ফুটিত হবে, তখন সাধারণ জনগণ অবশ্যই তাকে ভালোবাসবে, তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেবে। তার সাথে সম্মান ও সম্ভ্রমের সাথে কথা বলবে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا-

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, পরম দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য সাধারণ মানুষের হৃদয়ে অবশ্য অবশ্যই মমতার উদ্রেক করে দেবেন। (সূরা মরিয়াম-৯৬)

দ্বীনি আন্দোলনের সকল স্তরের জনশক্তিকে উল্লেখিত তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। তাহলে পাপ পঙ্কিলতায় আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত বর্তমান জাহিলিয়াতের সূচিভেদ্য অন্ধকার ছিন্ন করে মানুষের মনে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার পথ সুগম করা যাবে। মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং সহজে দ্বীনি আন্দোলনের দাওয়াত প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছানো যাবে। শুধু তাই নয়, উল্লেখিত তিনিট গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারলে এই পৃথিবীর জীবনেই শুধু নয়, আখিরাতের ময়দানেও শুভ পরিণতি লাভ করা যাবে। এই তিনটি গুণ যে ব্যক্তি বা জাতির ভেতরে বিদ্যমান থাকবে-ব্যক্তি, দল বা জাতি যখন কল্যাণকে কল্যাণ ও ভালোকে ভালো হিসাবে গ্রহণ করে এই পথকেই নিজের জন্য একমাত্র গ্রহণীয় ও উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবে এবং পাপ

পঙ্কিলতার পথকে নিজের জন্য পরিত্যাজ্য ও অনুপযুক্ত-অবাঞ্ছনীয় মনে করবে, ধন-সম্পদের প্রতি মোহমুক্ত হয়ে তা ত্যাগ করবে এবং পরহেজগারীর জীবন অবলম্বন করবে, তখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে এই পথে চলা অত্যন্ত সহজ সরল করে দেবেন।

এই ধরনের ব্যক্তির জন্য তখন সৎ কাজ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়বে আর অন্যায় পথে অগ্রসর হওয়া মারাত্মক কঠিন হয়ে যাবে। এই চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে অবৈধ ধন-সম্পদের পাহাড় এসে উপস্থিত হলেও তা গ্রহণ করার অনপযুক্ত বলে সে তার দৃষ্টি ঘৃণাভরে ফিরিয়ে নেবে। চরিত্র বিধ্বংসী কোন কর্মকান্ড এবং দৃশ্য তার চোখে পড়ার সাথে সাথে তার ভেতরে একটা অবিমিশ্র ঘৃণা রি রি করে উঠে গোটা শরীর শিহরিত হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার ভেতরেই সে তার দেহ মনে তৃপ্তি লাভ করবে। গভীর রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে মহান আল্লাহকে সেজ্‌দা দেয়ার মধ্যে দিয়ে সে তার মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে। এভাবে এই পথে চলার ব্যাপারে মহান আল্লাহ পরিবেশ তার অনুকূল করে দেবেন। যে কোন অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তাঁর রহমত দিয়ে পরিবেষ্টন করে রাখবেন।

আলোচ্য সূরার ৭ নম্বর আয়াতের বক্তব্য ও সূরা বালাদের ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতের বক্তব্য একত্রিত করলে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। আলোচ্য সূরার ৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই আমি তাকে সহজভাবে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেবো।' আর সূরা বালাদের ১১ ও ১২ নম্বর আয়াতে ঐ একই পথকে দুর্গম কঠিন পথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ একই পথকে এক সূরায় 'দুর্গম পথ' ও অন্য সূরায় 'সহজ পথ' হিসাবে উল্লেখ করা হলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, কোন মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়তে চায়, চলতে চায় দ্বীনি আন্দোলনের পথে, তখন তাকে সর্বপ্রথমে নিজের সত্তায় অবস্থিত কুপ্রবৃত্তি তথা 'নফ্‌ছে আম্মারা'-এর সাথে কঠিন দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এই পথ অবলম্বনের ব্যাপারে তার নফস প্রতিটি পদে বাধার সৃষ্টি করে। এরপর বাধার সৃষ্টি করে তার নিজ পরিবারের লোকজন, প্রতিবেশী, সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে তার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে। সর্বোপরি শয়তান তার গতিপথে অর্গল তুলে দেয়। তাকে আর্থিক ক্ষতি, ধন-সম্পদ এবং আপনজন হারানোর ভয় দেখায়, লোমহর্ষক নির্যাতনের চিত্র তার সামনে পেশ করে তাকে আতঙ্কিত করে তোলে, কারাগারের বদ্ধ কপাট তার সামনে উন্মুক্ত করে দেয়, ফাঁসীর রশি এসে তার সামনে দোলায়িত হতে থাকে। এসব কোন কিছুর পরোয়া না করে ব্যক্তি যখন আল্লাহর গোলামীর পথে চলার সিদ্ধান্তে পাহাড়ের মতোই অটল থাকে, তখন তার জন্য আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করা তথা সিরাতুল মুস্তাকিমে চলা অত্যন্ত সহজ করে দেয়া হয়।

এই পথে চলার জন্য যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে নিয়োজিত হতে হয়, সূরা বালাদে সেই অবস্থাকেই 'দুর্গম পথ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পথে চলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, অপরিবর্তনীয় কঠিন সঙ্কল্প এবং নিজের অভ্যন্তরে অবস্থিত নফসে আম্মারাকে দমন করে উল্লেখিত তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করার পরবর্তী অবস্থাকে আলোচ্য সূরায় 'সহজ পথ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এক সৈনিককে দক্ষ সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কঠিন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন সময়টা তার কাছে দূরাতিক্রম্য বলেই মনে হয়। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে যখন প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষ হয়, তখন তার জন্যে সৈনিক সূলভ জীবন-যাপন করা তথা যুদ্ধের ময়দানে সগর্বে পদচারণা করা খুবই সহজ হয়ে পড়ে। অনুরূপ একজন মানুষ যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সে নিজেকে একমাত্র

আল্লাহর অনুগত গোলাম হিসাবে গড়বে এবং প্রতিকূল অবস্থার সাথে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন প্রাথমিক এই অবস্থায় তাকে কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়। তারপর সে যখন প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন তার পক্ষে এই পথে চলা সহজ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে বিন্দু পরিমাণ অগ্রসর হওয়া তার জন্য কঠিন হয়ে যায়।

মানব জীবনে সফলতা অর্জনের ব্যাপারে তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিষয় বিস্তারিতভাবে পেশ করার পর **৮ থেকে ৯ নম্বর আয়াতে** এমন তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দল ও রাষ্ট্রকে নৈতিক পতনের গহ্বরে নিক্ষেপ করে তথা ধ্বংসের অতল তলদেশে তলিয়ে দেয়। প্রথমে যে গুণটির কথা বলা হয়েছে তাহলো কার্পণ্যতা। এটা হলো মানুষের চেষ্টা-সাধনা, মেধা ও শ্রম ব্যয় করার দ্বিতীয় পর্যায়। কার্পণ্যতা বলতে সাধারণভাবে যা বুঝানো হয়ে থাকে যে, একজন মানুষ অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে এবং তা নিজের, পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনের উপকারে ব্যয় করে না-এই অবস্থাতেই মানুষ কার্পণ্যতা বলে চিহ্নিত করে। এখানে সেই অর্থে কার্পণ্যতা বুঝানো হয়নি। এখানে কার্পণ্যতা বলতে যা বুঝানো হয়েছে তাহলো, অর্জিত ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে এবং মানুষের কল্যাণে ব্যয় না করাকে।

পৃথিবীতে এই ধরনের মানুষের সংখ্যাই অধিক যারা যে কোন উপায়ে ধন-সম্পদ উপার্জন করে এবং তা নিজের ও পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বচ্ছন্দের লক্ষ্যে অবারিত হস্তে ব্যয় করে। বিপুল অর্থ ব্যয় করে তারা পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নিয়ে পৃথিবীর দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণে বের হয়। জীবনকে কানায় কানায় ভোগ করার জন্য দু'হাতে অর্থ ব্যয় করে। ক্ষণিকের জন্য আনন্দ-ফূর্তি লাভ করার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মদ আর নতর্কীদের পেছনে অর্থের বন্যা বইয়ে দেয়। কিন্তু এই লোকগুলোই সমাজ ও দেশের কোন কল্যাণমূলক কাজে একটি কানা-কড়িও ব্যয় করতে চায় না। সমাজে ভালো কোন প্রথা প্রচলনের জন্য অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে এরা হাত গুটিয়ে নেয়। এই লোকগুলোই আবার সম্মান-মর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি, প্রশংসা-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য এবং বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে যে কোন অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণে এবং আপন প্রভু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একটি পয়সাও ব্যয় করতে রাজি হয় না। আল্লাহর কোরআন এই শ্রেণীর লোককেই কৃপণ বলে চিহ্নিত করেছে। ঘৃণিত তিনটি গুণের মধ্যে এটা হলো প্রথম গুণ।

দ্বিতীয় যে গুণটির কথা বলা হয়েছে তাহলো, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন করা। অর্থাৎ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের রব আল্লাহ তা'য়ালার পছন্দ-অপছন্দের প্রতি কোন গুরুত্ব না দেয়া। আধুনিক পরিভাষায় এটাকে বলা যেতে পারে ধর্মনিরপেক্ষতা। জন্ম থেকে শুরু করে একজন মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য যেসব নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতির প্রয়োজন হয়, তা আল্লাহর বিধান থেকে গ্রহণ না করে নিজের সুযোগ সুবিধা অনুসারে মানুষের বানানো বা নিজের স্বার্থে প্রণীত নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা–মানুষের এই অবস্থাকেই আল্লাহর কোরআন 'বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন' বলে চিহ্নিত করেছে।

অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের কোন পরোয়া না করে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে জীবন পরিচালিত যারা করছে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহর কোরআন বলেছে–এরা আল্লাহর প্রতি বিমুখ হয়ে বৈষয়িক স্বার্থ ও সুযোগ অর্জন করাকে নিজের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার একমাত্র লক্ষ্যস্থল

বানিয়ে নিয়েছে। ঘৃণিত প্রথম গুণটির সাথে এই দ্বিতীয় গুণটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ আল্লাহর বিধানের সাথে বেপরোয়া মনোভাব তখনই পোষণ করে যখন সে মানুষের হৃদয় থেকে আদালতে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি বিদায় গ্রহণ করে। আখিরাতের ভয় না থাকার কারণেই মানুষ যে কোন পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে এবং তা ব্যয়ও করে আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে। তার কোন কাজে তারই মনিব মহান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হচ্ছেন বা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, সে ব্যাপারে এদের কোন কৌতুহল থাকে না।

ঘৃণিত তৃতীয় যে গুণটির কথা বলা হয়েছে তাহলো, 'ভালো কথাকে বা ভালো বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাই এদের প্রতিষ্ঠিত নীতি।' এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভালো কথা বা ভালো বিষয়ই হলো মানুষের জন্য প্রেরিত মহান আল্লাহর বিধান। এই বিধানকে অচল, স্থবির, সেকেলে, পশ্চাৎপদ, উন্নতির বিপরীত ইত্যাদি প্রমাণ করাই এদের নীতি। কোন ব্যক্তি বা দল যখনই মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়, তখনই এরা এদের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কিভাবে সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহিত করা যাবে, কোন পথে এই বিধি-বিধানের ত্রুটি আবিষ্কার করা যাবে, এরা সেই চেষ্টাতেই আত্ম নিয়োগ করে।

এই তিনটি ঘৃণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যারা তাদের সম্পর্কে আলোচ্য **সূরার ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,** 'অবশ্যই আমি তাকে কঠোরভাবে তার গন্তব্যে পৌঁছাবো।' অর্থাৎ উল্লেখিত তিনটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি, দল, সমাজ ও রাষ্ট্র যে পথে অগ্রসর হয়, চলার সেই পথকে আলোচ্য সূরায় অত্যন্ত দুর্গম ও দুষ্কর বলে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, এরা যে পথে চলছে-সেই পথকে এদের জন্য অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল করে দেয়া হবে। এরা অন্যায় পথ অবলম্বন করে যে গন্তব্যে পৌঁছতে চায়, সেই পথের প্রতিটি বাঁকে এদেরকে প্রতিরোধের সম্মুখিন হতে হবে।

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের বিবেক ও প্রকৃতি চায় সৎ পথে অগ্রসর হতে। কোন মানুষ যখন তার ভেতরে প্রকৃতিকে অস্বীকার করে নফসে আম্মারা এবং শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথ-অন্যায় পথে অগ্রসর হয়, তখন প্রথমে তার বিবেক ও প্রকৃতি তাকে বাধা দেয়। এই পথের পথিক যদিও বৈষয়িক স্বার্থ, বস্তুগত সুখ-শান্তি, সুখ ও সাফল্যের লালসায় অন্যায় পথে ধাবিত হয়, কিন্তু তাকে নিজের স্বভাব-প্রকৃতি, মন-মানসিকতা, আপন প্রভু মহান আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদীর সাথে প্রতিমুহূর্তে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়। অন্যায়ের পর অন্যায় করে, বেঈমানী বিশ্বাঘাতকতা করে, পবিত্রতা, শালীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিক পরিশুদ্ধতা বিসর্জন দিয়ে সে যখন নিজের স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে ধাবিত হতে থাকে, তখন তার এই নিকৃষ্ট কার্যক্রমের কারণে সমাজ, দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। অপরের সম্মান ও মর্যাদার যখন তার দ্বারা ক্ষুন্ন হয়, অন্যের সম্পদ যখন সে অন্যায় পথে কুক্ষিগত করে, অপরের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয় না, তখন সে যেমন নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত অপমানিত হয়, তেমনি সমাজের লোকদের চোখেও সে পরস্বার্থ অপহরণকারী ঘৃণিত ব্যক্তি হিসাবে নিন্দিত হয়।

এই শ্রেণীর কোন লোক যদি শক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হয়, তাহলে স্বীয় অন্যায় কর্মের জন্য তাকে দন্ড ভোগ করতে হয়। আর যদি ব্যক্তি ধনাঢ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হয়, তাহলে তার ধন-সম্পদ আর প্রভাবের কারণে মানুষ প্রকাশ্যে তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও তার বিরুদ্ধে

সর্বসাধারণের অন্তরে ঘৃণা আর ক্ষোভ ক্রমশ ধূমায়িত হতে থাকে। সময়ের ব্যবধানে সেই ক্ষোভ এক সময় বিস্ফোরিত হয়ে ঐ ব্যক্তিকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। সাধারণ মানুষ তখন তার নাম শুনলে ঘৃণায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এ জন্যই অন্যায় পথকে শক্ত, কঠোর ও দুষ্কর পথ বলা হয়েছে। কেননা এরা নিজের বিবেক, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই অন্যায় পথে অগ্রসর হয়।

এই বিষয়টি যেমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি তা একটি সমাজ, দল, জাতি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব ব্যক্তি, দল, সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর পথে চলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত থাকতে থাকতে এদের শিরা-উপশিরায় এমনভাবে কদর্যতা জড়িয়ে যায় যে, তা পরিহার করে সৎ নীতি অবলম্বন করা এদের জন্য কষ্টকর হয়, অপরদিকে পাপের পথে, অন্যায়-অবিচারের পথে অগ্রসর হওয়া এদের জন্য সহজ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর লোকজন, দল, সমাজ ও দেশ অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার ক্ষুন্ন করে যে সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ধন-সম্পদ অর্জন করে, তা কালের প্রবাহে ধ্বংস হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতা থেকে এরা এমনভাবে মুছে যায় যে, তাদের অর্জিত কোন কিছুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। এদেরকে লক্ষ্য করেই **আলোচ্য সূরার ১১ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, 'অথচ যখন তার রাশি রাশি ধন-সম্পদ বিলীন হয়ে যাবে তখন তা তার কোনো কাজেই লাগবে না।'

সমাজের সাধারণ একজন অন্যায় পথের পথিক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের শক্তিশালী স্বৈরাচারী কর্ণধার পর্যন্ত, কেউ-ই বাদ পড়েনি। সকল স্তরের অন্যায়কারীকেই কালের নির্মম নিষ্ঠুর দন্ড ভোগ করতে হয়েছে। তাদের অর্জিত ধন-সম্পদ তাদেরকে ইতিহাসে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অমর অক্ষয় করে রাখতে সক্ষম হয়নি। অতীতের নমরুদ, ফেরাউন, হামান, সাদ্দাদ, নিকট অতীতের হিটলার, মুসেলিনী এবং বর্তমান কালের স্বৈরাচারীদেরকেও রক্ষা করতে পারেনি। এই পৃথিবীতে যেমন তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি, আখিরাতেও তাদের অর্জিত সম্পদ কোনই কাজে আসবে না। অবশ্যই তাদেরকে আদালতে আখিরাতে মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে। মানব সভ্যতা তথা গোটা মানব জাতি যেন ধ্বংস এবং বিপর্যয়ের মুখোমুখি না হয়, এ জন্য মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শনের বিষয়টি মহান আল্লাহ স্বয়ং নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন।

আলোচ্য সূরার ১২ আয়াতে পথপ্রদর্শনের দায়িত্বের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আসলে মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করা হচ্ছে আমারই কাজ।' আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করে তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে ছেড়ে দেননি বা তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অমনোযোগী নন। সৃষ্টিকে তিনি পথনির্দেশনা দিয়েছেন এ জন্য যে, সৃষ্টি যেন বিভ্রান্ত হয়ে বিপর্যয় আর ধ্বংসের অতলে তলিয়ে না যায়। এই পথনির্দেশনা মানুষসহ যাবতীয় সৃষ্টিকে দেয়া হয়েছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সূরা আশ্ শামসের ৮ নম্বর আয়াতের তাফসীর ও তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'তিনিই প্রাণীসমূহকে জীবন ধারণের শিক্ষা দিয়েছেন' ও 'সৃষ্টিসমূহের প্রতি আল্লাহর হেদায়াত' শিরোণাম দেখুন।)

মানুষকে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করে পথপ্রদর্শন করেছেন যেন মানুষ বিপদগ্রস্ত না হয়, সে যেন ধ্বংস গহ্বরে নিক্ষিপ্ত না হয়। মহাসত্যের এই পথ যদি মানুষ অবলম্বন না করে ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়, তাহলে ক্ষতি যা হবার তা তারই হবে-মহান আল্লাহর এতে কোন কিছুই যায় আসে না। আল্লাহর বিধান অমান্য করে কোন মানুষ কখনোই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে

যেতে পারে না। এই কথাটিই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এই **সূরার ১৩ নম্বর আয়াতে। বলা হয়েছে,** 'দুনিয়া আখিরাতের নিরঙ্কুশ মালিকানা আমারই জন্যে।' অর্থাৎ এই পৃথিবী ও আখিরাতের সর্বত্র তোমাকে আমার অসীম ক্ষমতা পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তোমার অস্তিত্বের কোন পর্যায়েও তুমি আমার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বহির্ভূত নও। সমস্ত জগতের একচ্ছত্র আধিপত্য একান্তভাবেই আমার। আমি যে পথপ্রদর্শন করেছি, এই পথে তুমি অনুসরণ করো অথবা অমান্য করো, এতে আমার ক্ষমতার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। কারণ আমার আধিপত্য কারো কর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। আমি যে পথপ্রদর্শন করেছি, তা অনুসরণ করলে তুমিই কল্যাণের অধিকারী হবে না করলে তুমিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমি যে পথ তোমাদেরকে প্রদর্শন করেছি, যদি তুমি আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে আগ্রহী হও, তাহলে তা অনুসরণ করো। আর যদি আমার বিধান পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে যেমন খুশি তেমনভাবে চলতে চাও, সে স্বাধীনতাও তোমার রয়েছে। তুমি যদি আখিরাত অস্বীকার করে পৃথিবীর ভোগ-বিলাস কামনা করো, তাহলে এ পথে চেষ্টা করলে তুমি তা অর্জন করতে সক্ষম হবে, কিন্তু আখিরাতে কিছুই পাবে না। আর যদি আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে আগ্রহী হও, তাহলে পৃথিবীতে অবশ্যই আমার নির্দেশিত পথে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে। কারণ পৃথিবী ও আখিরাতের একমাত্র মালিক আমি এবং সমস্ত কিছুর ব্যাপারে যাবতীয় আধিপত্য একমাত্র আমারই। তুমি যেমনভাবে যে পথে চেষ্টা-সাধনা করবে, সে পথেই তুমি তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে পথপ্রদর্শন করেছেন, সে পথ অবলম্বনের ব্যাপারে যারা চেষ্টা-সাধনা করবে না, বিপরীত পথে চেষ্টা-সাধনা করবে, তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে এই **সূরার ১৪ থেকে ১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে**, ঐ লোকগুলোই প্রজ্জ্বলিত সেই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হবে, যে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। যারা পাপী, অপরাধী, আমার বিধানকে অস্বীকার করেছে, আমি যে পথপ্রদর্শন করেছি সে পথ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমার পছন্দনীয় পথে অর্জিত ধন-সম্পদ দান করেনি, তারাই কেবল ঐ জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে জ্বলতে থাকবে।

জ্বলন্ত ঐ কুন্ড তথা আল্লাহর জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকতে পারবে কারা? তাদের পরিচয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ **আলোচ্য সূরার ১৭ থেকে ১৮ নম্বর আয়াতে বলেন**, যারা তাদের আপন রব্ব-মহান আল্লাহকে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে ভয় করেছে এবং নিজের অর্জিত ধন-সম্পদ নিজেকে পরিশুদ্ধ করার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছে। বিভিন্ন সূরার তাফসীরে এ কথা আমরা বার বার উল্লেখ করেছি যে, মানুষকে কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়ই সত্য সঠিক পথে দৃঢ় রাখতে পারে। যার ভেতরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি রয়েছে, সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহর ভয় যাদের হৃদয়ে জাগরুক রয়েছে, তারা যে অর্থ-ধন-সম্পদ উপার্জন করে, নিজেদেরকে এসব ধন-সম্পদের মালিক মনে করে না। তারা বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ তাদের কাছে এসব ধন-সম্পদ গচ্ছিত রেখেছেন, সুতরাং এসব সম্পদ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য, তাঁরই নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে হবে। মানুষের পক্ষে কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ তখনই ব্যয় করা সম্ভব হয়, যখন সে মানুষের মন থেকে অর্থের প্রতি লালসা দূরিভূত হয়ে যায়। অর্থের প্রতি লোভ-লালসা দূরিভূত হওয়ার অর্থই হলো, সেই ব্যক্তির পক্ষে কখনোই অবৈধ পথে

অর্থোপার্জন করা সম্ভব হয় না। আর এভাবেই একজন মানুষ হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে পারে। সুতরাং যারা জীবনে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করেছে অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করেছে এবং অর্জিত ধন-সম্পদ তাঁরই পছন্দনীয় পথে ব্যয় করেছে, মহান আল্লাহ ওয়াদা করছেন-তিনি তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবেন।

পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হলো তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে কোন বিনিময় লাভের আশায়। ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে এই আশায় যে, সমাজে সে সম্মান ও মর্যাদার বিশেষ আসন লাভ করবে। নির্বাচনের সময় সমাজের লোকগুলো তার ধান-খয়রাতের কথা স্মরণ করে তাকেই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। রাজনৈতিক দলগুলোও দেশের মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের আশায় দুর্যোগ পীড়িত মানুষের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। অর্থাৎ সম্মান-মর্যাদা, প্রশংসা, যশ-মান, খ্যাতি, সমর্থন ও সহানুভূতি লাভের আশায় ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহকে যারা ভয় করে, তাঁর সন্তুষ্টি যারা অর্জন করতে আগ্রহী-তারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে একমাত্র মহান মালিকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

এই সূরার ১৯ থেকে ২০ নম্বর আয়াতে পরহেযগার লোকগুলোর ধন-সম্পদ ব্যয় করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, এই লোকগুলো এ জন্য অর্থ-সম্পদ মানবতার কল্যাণে ব্যয় করছে না যে, এরা সমাজের লোকগুলোর কাছে কোনভাবে ঋণী ছিল। সমাজের লোকগুলো সহযোগিতা দিয়ে ঐ পরহেযগার লোকটির ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বা ঋণ পরিশোধের জন্য ধন সম্পদ ব্যয় করছে। এই লোকগুলোর মনে এই আশায়ও নেই যে তারা সমাজের লোকদের সমর্থন সহানুভূতি লাভ করে ভবিষ্যতে তাদের প্রতিনিধি সেজে বসবে। অর্থাৎ বৈষয়িক কোন স্বার্থ সামনে রেখে এরা তাদের অর্জিত সম্পদ ব্যয় করে না। এদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একটিই আর তাহলো এরা তাদের আপন রব-মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে আগ্রহী। পৃথিবীর বিন্দুমাত্র স্বার্থ এদের সামনে নেই।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর জীবনীতে দেখা যায়, মক্কার যেসব ক্রীতদাস-দাসী কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতো, তাদের মালিক তাদের ওপরে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাতো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নগদ অর্থের বিনিময়ে ঐসব দাস-দাসীকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দিতেন-যেন তারা নির্যাতন মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে মহান আল্লাহর গোলামী করতে পারে। হযরত আবু বকরকে এভাবে উন্মুক্ত অবারিত হস্তে অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁরই পিতা তাঁকে ডেকে বললেন, হে আমার সন্তান! আমি দেখছি তুমি এসব লোকদেরকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করছো, যেসব লোকগুলো দুর্বল অক্ষম কর্মোক্ষম নয়। এদেরকে মুক্ত করে কি লাভ হবে। তুমি বরং ঐসব যুবক শ্রেণীর লোকদেরকে মুক্ত করো, যাদের দেহ বলিষ্ঠ শক্তিশালী এবং কঠিন কর্ম করতে সক্ষম। আল্লাহর রাসূলের সাহাবী খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর তাঁর পিতাকে বিনয়ের সাথে জানালেন, হে আমার পিতা! আমি পৃথিবীর কোন স্বার্থ সামনে রেখে এসব লোকদেরকে নগদ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিচ্ছি না। আমি আমার এই কাজের বিনিময় একমাত্র মহান আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করতে ইচ্ছুক, আমি তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এভাবে অর্থ ব্যয় করছি। সুতরাং পরহেযগার লোকরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত পৃথিবীর কোন স্বার্থ সামনে রেখে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে না।

এভাবে যারা একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের **সম্পর্কে এই সূরার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে**, 'আর এ কারণে অচিরেই তার মালিক তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন।' যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় নিজের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের ওপরে সন্তুষ্ট হয়ে পরকালে জান্নাত দান করবেন এবং এই পৃথিবীতে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দার ওপরে বিপদ নেমে আসতে থাকে। সেই বান্দাহ্ যখন আল্লাহর পথে কোন কিছু দান করে, সেই দানের কারণে তার ওপর থেকে বিপদ উঠিয়ে নেয়া হয়।

এসব কিছু ছাড়িয়ে মহান আল্লাহ তাকে এমন নে'মাত দান করেন, যে নে'মাত পৃথিবীর যাবতীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করেও লাভ করা যায় না। সেই নে'মাতের হলো অল্পে তুষ্ট থাকা, যে কোন অবস্থায় আত্মতৃপ্তি লাভ করা। নিজেকে নির্লোভ রাখা এবং অভাবের তাড়না মুক্ত রাখা। যে কোন অবস্থায় নিজেকে খুশী রাখা। এটা এমন একটি নে'মাত, যা পৃথিবীর সমুদয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও কোন মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না। আল্লাহকে ভয় করে যারা অর্জিত ধন-সম্পদ তাঁরই পথে ব্যয় করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অন্তরে এমন সন্তুষ্টির ফলগুধারা, এমন খুশীর ভাব প্রবাহিত করে দেন যে, সে ব্যক্তি স্বচ্ছল অথবা অস্বচ্ছল যে কোন অবস্থাতেই খুশী থাকে। অর্থনীতির চির প্রতিষ্ঠিত একটি কথা হলো, অভাব অফুরন্ত-মানুষ যত পায় আরো অধিক লাভ করার জন্য সে লালায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু মহান তাঁর ঐ অনুগত বান্দাদের মন থেকে অভাববোধ মুছে দেন। ফলে তারা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও মানসিক যন্ত্রণা মুক্ত জীবন লাভ করে।

স্বাচ্ছন্দে-সঙ্কটে, বিপদে বা আনন্দে সেই ব্যক্তির হৃদয় তৃপ্ত থাকে। কোন ধরনের অশান্তি অস্থিরতা বা মানসিক উদ্বেগ তাকে তাড়া করে ফিরে না। কোন ব্যাপারেই সে অস্থির হয় না, হৃদয় তার সঙ্কীর্ণতায় ভুগে না। কঠিন বিপদের মুহূর্তে নিজের জীবনকেও সে বোঝা মনে করে ক্লান্ত হয় না। এই নে'মাত একমাত্র মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউই দিতে পারে না। মহান এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এই নে'মাতই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর অনুগত বান্দাহ্দের হৃদয়ে ঢেলে দেন।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ বিমুখ মানুষদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থবল-জনবল, বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সমস্ত কিছুই সে করায়ত্ব করেছে। এরপরও 'আরো চাই' মনোভাব থেকে তারা মুক্ত নয়। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত তারা মানসিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগতে থাকে। নানা বিষয়ে মানসিক দুশ্চিন্তা তাদেরকে অক্টোপাশের মতোই জড়িয়ে রাখে। নীরবে নিভৃতে প্রকাশ্যে গোপনে এদেরকে একটা অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ তাড়া করতে থাকে। না পারে এরা একটু স্বস্তিতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে, না পারে আরামে তৃপ্তির নিদ্রার স্বাদ গ্রহণ করতে। আল্লামা গাজ্জালী (রাহঃ) তাঁর কিমিয়ায়ে সাহাদাতের মধ্যে এই অবস্থাকেই পৃথিবীর জাহান্নামের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অনুগত বান্দাহ্দেরকে এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্ত রেখে এমন মানসিক প্রশান্তি দান করেন, যে প্রশান্তি তাদের হৃদয়ে জান্নাতের অমীয় শান্তির সুধা প্রবাহিত করতে থাকে।

সূরা আদ-দোহা

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৯৩

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ- এই সূরার প্রথম আয়াতের 'দুহা' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরা রাসূলের মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ করা হয়। মক্কার হেরা নামক গুহায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপরে ক্বদরের রাতে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পরে মহান আল্লাহ কিছু দিন আর ওহী প্রেরণ করেননি। ওহীর বিরতির কারণ সম্পর্কে গবেষকগণ বলেছেন, ওহী অবতীর্ণের বিষয়টি রাসূলের কাছে ছিল তাঁর চেতনার অগোচরে। তিনি কোনদিন আকাংখা প্রকাশ করেননি বা তাঁর মনে এ ধরনের কল্পনাও আসেনি যে তাকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হোক, সকাল সন্ধায় তাঁর কাছে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আগমন করুক, এ ধরনের কোন কথা তাঁর মনের নিভৃত জগতে কোন অসচেতন মুহূর্তেও উঁকি দেয়নি।

ফলে প্রথম ওহী অবতীর্ণ যখন হলো তিনি স্বাভাবিকভাবেই অস্থির হয়ে পড়ে ছিলেন। এই অস্থিরতা দূরিভূত করার জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। এরপর আসে ওহী ধারণ করার প্রশ্ন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন তাঁর কাছে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এলেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি বিশ্বনবী হিসাবে নির্বাচিত হলেন, তাঁকে একটা বিশাল দায়িত্ব দেয়া হলো, এ সমস্ত দিকগুলো হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে তাঁকে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া তাঁকে যে দিক নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন, এ কাজ থেমে ছিল না বলে পবিত্র কোরআনে দেখা যায়। যখন যা করা প্রয়োজন তা তাঁর মন-মস্তিষ্কে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উদয় করে দেয়া হত। ওহীর বিরতি চললেও স্বয়ং আল্লাহ ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক।

ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে না বিরতি চলছে, এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বড় অস্থির হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। ওহীর বিরতির কারণে তিনি এতটা মানসিক অস্থিরতায় নিমজ্জিত ছিলেন যে, তিনি নির্জন স্থানে ভ্রমণ করতেন বা কখনো পাহাড়ের ওপরে ওহীর চিন্তায় ঘুরতে থাকতেন। অবস্থা কখনো এমন হত যে, তিনি উঁচু পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যাবেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে তাকে বলতেন, 'আপনি আল্লাহর নবী।' তারপর তিনি মানসিক শান্তি লাভ করতেন এবং তাঁর মনের অস্থিরতা দূরিভূত হত। (ইমাম যুহরী, ইবনে জারীর)

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, ওহী অবতরণ হতে যত দেরী হতে থাকে ততই তাঁর মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে তিনি যখন পাহাড়ের এমন স্থানে যেতেন যে, আরেকটু অগ্রসর হলেই তিনি নীচে পড়ে যাবেন। এমন সময় তিনি মহাশূন্য থেকে কণ্ঠ শুনে থেমে যেতেন। তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতেন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আকাশ এবং এই পৃথিবীর শুন্যমার্গে একটা সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং তিনি তাঁকে ডেকে বলছেন, 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনি নিশ্চিত হোন, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল!'

বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং মুসনাদে আহ্মাদে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল্ মুসান্নাফে ইমাম যুহরী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে এ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। ইবনে সাআদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা শিবলী নোমানী (রাহ) তাঁর সীরাতুন্নবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ওহী কিছুদিন বন্ধ থাকার কারণে আল্লাহর রাসূল মনোকষ্টে ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অলিক কাহিনী রচনা করা হয়েছে যার কোনই ভিত্তি নেই। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বলা হয় সেসব হাদীস সনদের দিক থেকে কতটুকু শক্তিশালী তা অবশ্যই পর্যালোচনার বিষয়। আল্লামা শিবলী (রাহ) বোখারী শরীফে যে বর্ণনা এসেছে সে সম্পর্কে বলেন, এ বর্ণনা ইমাম যুহরী পর্যন্ত শেষ হয়েছে। এর ওপরে আর কোন বর্ণনাকারী নেই। বর্ণনাটি প্রকৃত পক্ষে ছেদপূর্ণ। স্বয়ং বোখারীর ভাষ্যকারেরা বলেছেন, এতবড় একটা ঘটনার ব্যাপারে ছেদপূর্ণ বর্ণনা ধর্তব্য নয়। সুতরাং এ বর্ণনা গ্রহণ করা যায় না। (সীরাতুন্নবী)

দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহী অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদিন আমি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার কানে একটা শব্দ প্রবেশ করলো। আমার মনে হলো শব্দটা আকাশ থেকে হলো। আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ফেরেশতা, যাকে আমি হেরার গুহায় দেখেছিলাম। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর শুন্যমার্গে একটা কুরছিতে উপবিষ্ট। এ দৃশ্য দেখে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়িতে এসে বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও। বাড়ির লোকজন আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিল এ সময়ে আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হলো। (ইমাম যুহরী, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ), বোখারী, মুসনাদে আহ্মাদ, মুসলিম, ইবনে জারীর)

'ওহী' আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো, গোপন ইঙ্গিত। শরিয়তের পরিভাষায় ওহী বলতে বুঝানো হয়, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীদের অন্তরে প্রবেশ করানো হয় বা ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়। এ কারণে নবীদের অন্তরে বিশ্বাস এমন দৃঢ় হয় যে, সাধারণ মানুষের থেকে সে বিশ্বাসের মর্যাদা পৃথক। তাঁকে যে মহান আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে বাণী প্রেরণ করা হলো এ সম্পর্কে নবীর অন্তরে সামান্যতম দ্বিধা থাকে না। আরেক কথায় বলা যায়, জ্ঞান বৃদ্ধি হবার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমের নাম হলো ওহী যা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং তা শুধু মাত্র নবী রাসূলদের জন্য নির্দিষ্ট। এর সম্পর্ক সরাসরি আলমে কুদস্ এবং আলমে গায়েবের সাথে। ওহী যে কিভাবে অবতীর্ণ হয় তা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, 'কখনো তা আমার কাছে মনে হয় যে, ঘন্টার শব্দ অবিরাম গুঞ্জন সৃষ্টি করেছে, আবার কখনো মৌমাছীর গুঞ্জনের ন্যায়, আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে এসে আমাকে শোনায় আমি তা শুনি আল্লাহ আমার অন্তরে তা সুরক্ষিত করে দেন।'

বিশ্বনবীর কথায় ওহী অবত্তীর্ণের অবস্থাকে যেভাবে উপমার মাধ্যমে বা ফেরেশতার আগমনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, তা মানুষের বোধশক্তির কাছাকাছি হলেও এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কোন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে না। যতদূর উপলব্ধি করা যায় ওহী অবতীর্ণের সময় যে প্রকৃত অবস্থা কি হয় তা বুঝিয়ে বলা নবীর আয়ত্বের বাইরে। তাই বলে এটা নবীর অক্ষমতাও নয়।

যেমন যে ব্যক্তি সাগরের অতল তলদেশে বিশেষ পোশাক পরিধান করে অবতরণ করে, সেখানে তাঁর প্রকৃত অবস্থা কেমন হয় তা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সে প্রকাশ করে তাদের কাছে যারা কোনদিন সাগরের তলদেশে অবতরণ করেনি। কিন্তু পানির নিচে সে যেমন অবস্থা উপলব্ধি করে, তাঁর সে উপলব্ধি বোধটাকে সে আরেকজনের ভেতরে সংক্রামিত করতে পারে না। তেমনি নবীগণ ওহী অবতীর্ণের সময় কেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করতে পারেন কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি বোধটাকে তো আর শ্রোতার মনে প্রবেশ করাতে পারেন না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন যে, 'এবং ওহীর এ অবস্থাটা আমার ওপর ভীষণ কঠিন বোধ হতে থাকে। পুনরায় যখন এই কষ্টকর অবস্থার অবসান ঘটে তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলা হয়ে থাকে তা আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয়ে যায়।'

ফেরেশতা যখন মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসেন বা পর্দার আড়াল থেকে মহান আল্লাহর সাথে কথা হয় সে সময়ের অবস্থা হয় খুব সহজ। কিন্তু ওহী অবতীর্ণ করার প্রথম অবস্থা অর্থাৎ ওহী যখন মৌমাছীর গুঞ্জনের মত বা ঘন্টার অবিরাম শব্দের মত আসতে থাকে তখন ভীষণ কষ্ট অনুভব হয়। প্রশ্ন হলো এমন কেন হয়?

এ সম্পর্কে গবেষকগণ ধারণা করেন, 'মহান আল্লাহ মানুষকে মানুষের আবশ্যকীয় শর্ত ও স্বভাব চরিত্রের সাথে এমনভাবে জড়িত করে দিয়েছেন যে নবী ও রাসূলদের মত পবিত্র এবং নিষ্পাপ সত্তাও নিজেদের সমস্ত পবিত্রতা থাকার পরেও মানবীয় প্রভাবে প্রভারিত না হয়ে উপায় থাকে না। এ কারণে তাদের ওপরে যখন ওহী অবতীর্ণ হয় সে সময়ে তাদেরকে সেই উর্ধ্ব জগতের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রাখে এবং আল্লাহর নূরের ছায়ায় তাঁরা মহান আল্লাহর কথা গ্রহণ করেন।'

একদিকে তাঁরা মানবীয় দেহধারী অপরদিকে তাঁরা আল্লাহর নূরের ছায়ায়-এ কারণে তাদের ওপরে উভয় জগতের প্রভাব নিপতিত হয়। সে সময়ে তাদের মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ দমন করে তাঁকে এমন এক জগতের উপযোগী করা হয় যে, তাঁরা যেন ওহী শ্রবণ এবং ধারণ করতে সক্ষম হন। মানুষ নবীর মানবীয় বৈশিষ্ট্য অবদমিত করে তাকে যখন আল্লাহর নূরের জগতের উপযোগী করা হয় তখন তাঁর ভেতরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেটাই হলো মানুষের চর্ম চোখে অস্থিরতা, নবীর কাছে তখন সেটাই কষ্টানুভব হয়। সেই কষ্টের অবসান যখন হয় তখন নবীকে সেই জগতের যাবতীয় পবিত্রতা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তিনি তখন অপূর্ব শান্তি অনুভব করেন। যে সময়ের ভেতরে এ অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সময় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। ওহী অবতীর্ণের বিশেষ অবস্থায় যখন মানবসুলভ অনুভূতি ও বোধশক্তির ওপর উর্ধ্বজগতের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, তখন মানবদেহে এক ধরণের অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। সে সময় নবীর শ্রবণ শক্তির সম্পর্ক স্থাপন হয় ওহী শ্রবণের সাথে, তখন তাঁর কাছে এ জড়জগতের কোন শব্দ স্থান পায় না।

প্রথম প্রকারের ওহী অবতীর্ণের সময় নবীর যে অবস্থা হত এই অবস্থাকে ইউরোপিয় গবেষকগণ রোগ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেই শিশুকাল হতেই মৃগীরোগী। এ রোগ তাঁর মাঝে মধ্যেই দেখা দিত।' (না-আউযুবিল্লাহি মিন যালিক।)

তাদের কথা যে কত বড় মিথ্যা তা তাঁরা জেনে বুঝেই শুধুমাত্র বিশ্বনবী, ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লিখেছেন। হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বাড়িতে অবস্থানকালে বিশ্বনবীর যে বক্ষবিদারণ করা হয় তখন থেকে নাকি তাঁর এ রোগের সৃষ্টি। আমাদের বক্তব্য হলো, সে সময়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল পাঁচ বছর। ঐ পাঁচ বছর বয়সেই শুধুমাত্র একবার সে রোগ দেখা দিল আর মাঝের ৩৫ বছর দেখা দিল না, ঠিক তিনি যখন নবুওয়াত লাভ করলেন ৪০ বছর বয়সে, তখন পুনরায় সে রোগ দেখা দিল, এ সমস্ত প্রশ্ন ঐসব গবেষকদের মনে জাগেনি কেন?

প্রকৃত পক্ষে তারা জেনে বুঝেই, বিশ্বনবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার এবং ইসলামকে কোন ঐশী বিধান হিসাবে স্বীকৃতি না দেবার লক্ষ্যেই বিশ্বনবীর ওপরে মৃগী রোগের অপবাদ চাপানোর ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য এবং বিষয়বস্তু হলো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানসিক প্রশান্তি দান করা। সাময়িকভাবে ওহী অবতীর্ণ করা বন্ধ থাকার কারণে আল্লাহর রাসূলের মনে যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল, সে অস্থিরতা দূর করার লক্ষ্যেই এ সূরা অবতীর্ণ করা হয়েছিল। প্রথমে আলোকোজ্জ্বল দিনের ও রাতের প্রশান্তির শপথ করে বিশ্বনবীকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনার রব-আপনাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি এবং তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। এরপর রাসূলকে আগামী দিনের সুসংবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, বর্তমানে দ্বীনি আন্দোলন প্রাথামিক পর্যায় অতিক্রম করছে এবং এই অবস্থায় আপনি প্রবল বাধার মোকাবেলা করছেন, সেই বাধা কখনো স্থায়ী হবে না। আগামীতে আপনার জন্য শুভ দিন অপেক্ষা করছে। যেমন রাত যতো গভীর হতে থাকে উজ্জ্বল সূর্যের আগমনী ঘন্টা ততই জোরে বাজতে থাকে–তেমনি বাধার তীব্রতা যতোই তীব্র হচ্ছে, আপনি ততই সফলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই আপনার অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

কোরআন ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ময়দানে বর্তমানে আপনি যে পর্যায় অতিক্রম করছেন, আগামীতে যে পর্যায়সমূহ আপনার সামনে প্রতিভাত হবে, তা পূর্বের পর্যায়ের তুলনায় অবশ্যই উত্তম হবে এবং এই পরিবর্তনের ধারা কখনো থেমে থাকবে না। এভাবে করে আপনি ক্রমশঃ একটি শুভ পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাবেন। সেই সোনালী সূর্য উদিত হবার আর বেশী দেরী নেই, যে সূর্যের উজ্জ্বল আলো অবলোকন করে আপনি আনন্দিত হবেন। আপনার প্রতি আপনার রব-অনুগ্রহের ধারা বৃষ্টির মতোই বর্ষণ করতে থাকবেন।

এরপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সরাসরি তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে করুণা বিগলিত ভাষায় বলছেন, আপনার রব-আপনাকে বিস্মৃত হতে পারে, তিনি আপনাকে ত্যাগ করতে পারেন, এ কথা আপনার মনে উদয় হলো কিভাবে? আমি আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি, এ কথা চিন্তা করে আপনি কেন অস্থির হয়ে পড়লেন? আপনি একটু লক্ষ্য করে দেখুন তো, যখন আপনি এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তো আমি আপনার প্রতি করুণার বারি বর্ষণ করে আসছি। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তেই তো আমার রহমত আপনাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আপনি মাতা-পিতাহারা ইয়াতীম ছিলেন, আপনাকে প্রতিপালন করার জন্য আপনার ওপরে ছায়া দানের ব্যবস্থা আমিই করেছি। সত্য পথ সম্পর্কে আপনি অনবহিত ছিলেন, মহাসত্য সম্পর্কে আপনি অনভিজ্ঞ ছিলেন, আমিই আপনাকে সত্য পথপ্রদর্শন করেছি এবং মহাসত্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করেছি। আপনি সহায়-সম্পদহীন অসহায় দরিদ্র ছিলেন, আমিই আপনাকে স্বচ্ছল বানিয়েছি। আপনার জীবনের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আপনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন তো, আপনার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমি আপনার সাথে ছিলাম কিনা!

জীবনের সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আপনি আমার রহমতের বারিধারায় সিক্ত হচ্ছেন। সুতরাং এসব নে'মাতের শোকর কিভাবে আদায় করতে হবে তা আপনি অনুধাবন করুন। আপনি ইয়াতীম, অসহায় অস্বচ্ছল ছিলেন, আপনি আপনাকে সর্বাবস্থায় ছায়াদান করেছি। আপনিও এই ধরনের লোকগুলোর জন্য মমতার ছায়া বিছিয়ে দিন। ○

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) শপথ আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের, (২) শপথ রাতের (অন্ধকারের), যখন তা (চারদিকে) ছেয়ে যায়। (৩) তোমার মালিক (ওহীর সাময়িক বিরতি দিয়ে) তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাননি এবং তিনি তোমার ওপর অসন্তুষ্টও হননি। (৪) (তোমার) পরবর্তি (দিন) তোমার আগের (দিনের) চেয়ে উত্তম। (৫) অল্পদিনের মধ্যেই তোমার মালিক তোমাকে (এমন কিছু) দেবেন যে, তুমি (তাতে) খুশী হয়ে যাবে। (৬) তিনি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি-অতপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনি কি তোমাকে (এমন অবস্থায়) পাননি যে, তুমি সঠিক পথের সন্ধানে বিব্রত ছিলে-অতপর তিনি তোমাকে পথের দিশা দেখিয়েছেন। (৮) তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি-অতপর তিনি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিয়েছেন, (৯) তাই কখনো তুমি কখনো ইয়াতীমদের ভয় দেখিয়ো না। (১০) কোন প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিয়ো না। (১১) তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ বর্ণনা করে যাও।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরায় মূল কথা বলার পূর্বে এমন দুটো ক্ষণের শপথ করা হয়েছে, যে দুটো ক্ষণই মানুষের জন্য শুভক্ষণ। প্রথম আয়াতে শপথ করা হয়েছে আলোকোজ্জ্বল মধ্য দিনের। দিনের এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতাকে চলমান রাখা এবং এর বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এই সময় মানুষ পূর্ণ শক্তিতে সক্রিয় থাকে। সূর্যও পূর্ণ শক্তিতে এ সময় তার উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতে থাকে। বিশাল বালুর স্তুপের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সূচ পড়ে থাকলেও তা সূর্যের আলোয় স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এই শপথের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, আপনার সামনে বর্তমানে যে জাহিলিয়াতের অন্ধকার ঘনিভূত হয়ে রয়েছে, তা অচিরেই দূরিভূত হয়ে মধ্য দিনের মতোই আপনার সামনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় আয়াতে শপথ করা হয়েছে ছেয়ে যাওয়া রাতের। মানব জীবনের রাতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দিবাভাগের পরিশ্রম জনিত কারণে মানুষের স্নায়ু মন্ডলীতে এক ধরনের বিষ পূঞ্জিভূত হতে থাকে। সে বিষ অপসারিত করে মানুষকে পুনরায় কর্মোপযোগী করার জন্য নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন। কয়েক ঘন্টা আরামদায়ক নিদ্রা ভোগ করার পরই মানুষ পুনরায় সজীব হয়ে ওঠে। রাতের নির্জন পরিবেশ সেই তৃপ্তিদায়ক নিদ্রার বাহন। মানুষ শ্রমক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দেয়। নিদ্রা উপভোগ করার পরে প্রত্যুষে সে যখন শয্যা ত্যাগ করে, তখন তার দেহ থাকে সজীব-সচল ও কর্মক্ষম। ক্লান্তিবোধের কোন চিহ্ন আর দেহ-মনে থাকে না। একটা ঝরঝরে প্রশান্তির ভাব মানব দেহকে জড়িয়ে থাকে। সেই রাতের শপথ করে রাসূলকে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, সেই দিনটি বেশী দূরে নয় যখন আপনিও দেহ-মনে তৃপ্তিদায়ক নিদ্রার পরমুহূর্তের মতোই প্রশান্তি অনুভব করবেন। আপনি আন্দোলনের দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করার পরে যখন সফলতা অর্জন করবেন, তখন আপনার দেহ-মন থেকে যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। আপনি শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করবেন।

ওহী অবতীর্ণের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে কিছু দিন ওহী অবতীর্ণ করা বন্ধ রাখা হয়েছিল। কতদিন যাবৎ রাসূলের প্রতি ওহী আসা বন্ধ ছিল এ সম্পর্কে ইতিহাসে মতভেদ বিরাজমান। কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে ১২ দিন, কেউ বলেছেন ৪০ দিন আবার কেউ বলেছেন ১৫ দিন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে ২৫ দিন। আল্লাহর রাসূলের কাছে যখনই কোন ওহী অবতীর্ণ হতো, সাথে সাথে তিনি তা মানুষদেরকে পড়ে শোনাতেন। মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী রাসূলকে বিদ্রূপ করার জন্য প্রতিদিনই তাঁকে প্রশ্ন করতো, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নতুন কোন খবর আছে নাকি? রাসূলও সাথে সাথে তার ওপরে নাজিলকৃত ওহী তাদেরকে পড়ে শোনাতেন। ক্রমাগতভাবে একটির পর আরেকটি দিন অতিবাহিত হতে থাকলো, নতুন কোন ওহী আসছে না এবং আল্লাহর রাসূলও তা মানুষদেরকে পড়ে শোনাতে পারছেন না। রাসূল দারুণভাবে মানসিক দিক দিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত হলেন।

এই অবস্থায় রাসূলের নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা ইসলামের দুশমন ছিল, তারা তাঁকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো, 'তোমার আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে ত্যাগ করেছে।'

একদিকে পরম প্রিয়তম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাড়া-শব্দ নেই, অপরদিকে ইসলাম বিরোধিদের বিদ্রূপ–রাসূলকে চরম মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সম্পূর্ণ একটি বিরোধী পরিবেশে দ্বীনি আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে নামিয়ে দিলেন, চারদিকে বিষাক্ত নাগিনীরা যখন নিঃশ্বাস ফেলছে, এ সময়ে একমাত্র আশ্রয় সেই মহান আল্লাহ নীরব রয়েছেন, রাসূল অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বার বার তিনি আত্ম সমালোচনা করছেন, তাঁর দ্বারা এমন কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি তো, যে কারণে তাঁর মালিক অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উত্তপ্ত ময়দানে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন! আর অপরাধ যদি হয়েও থাকে, তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কেন তিনি নীরব রয়েছেন! এ ধরনের নানা চিন্তা রাসূলকে আচ্ছন্ন করেছিল। একটা বোবা যন্ত্রণা রাসূলের বুকের ভেতরে গুমরে ফিরছিল। পরম প্রেমাস্পদ-আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে আসা ওহী আর জিবারঈল আলাইহিস্ সালামের সাথে প্রেমময় সাক্ষাৎ এবং পরম প্রেমাস্পদ রাব্বুল আলামীনের একান্ত সান্নিধ্যই ছিল সঙ্কটপূর্ণ জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও বিরহী হিয়ার মরমীয়

প্রশান্তি। একটি অসভ্য ও বর্বর জাতির অমানবিক হৃদয়হীন আচরণ ও কঠোর ব্যবহারের মধ্যে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন রাসূলের সান্ত্বনা।

নিজের আপন আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও দীর্ঘ দিনের পরিচিত সমাজ যখন তাঁকে ত্যাগ করলো, নিষ্ঠুরভাবে ছুড়ে দিল দূরে-বহু দূরে একান্ত উৎপাত মনে করে, লোমহর্ষক নির্যাতনে তাঁর এবং তাঁর পরম প্রিয় অনুসারী'দের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুললো। যে সত্যের প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, সেই মহাসত্যকে তারা অযৌক্তিকভাবে আঘাতের পর আঘাত করছে, মহাসত্যের প্রদীপকে তারা নির্বাপিত করার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিচ্ছে, এই কঠিন মুহূর্তে পরম প্রিয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ওহীই রাসূলের হৃদয়ে বয়ে আনতো স্নিগ্ধ শান্তির অমীয় ঝর্ণাধারা। কিন্তু যখন ওহী আসা সাময়িকের জন্য বন্ধ হলো, তখন রাসূলের সামনে পরিদৃশ্যমান সমস্ত আলোগুলো যেন নিভে গেল। উত্তপ্ত ময়দানে তার চলার যাবতীয় রসদও যেন মুহূর্তে ফুরিয়ে গেল। সহসা তিনি যেন নিজেকে আবিষ্কার করলেন এক ক্লান্ত-শ্রান্ত পথিক হিসাবে। সমস্ত পথ যেন তাঁর সামনে রুদ্ধ হয়ে এলো।

এমনি এক করুণ পরিবেশে **আলোচ্য সূরার ৩ নম্বর আয়াতে** মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে জানিয়ে দিলেন, আপনার প্রতিপক্ষ যা বলছে এবং আপনি যা চিন্তা করছেন, এর কোনটাই ঠিক নয়। আমি আপনাকে পরিত্যাগও করিনি এবং আপনার প্রতি সামান্যতম অসন্তুষ্টও হইনি।

পর্বত পরিবেষ্টিত অথবা মরুপ্রান্তরে অজানা অচেনা ক্লান্ত-শ্রান্ত ক্ষুধার্ত তৃষিত পথহারা পথিক যেমন পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে, চরম এক পুলক তার দেহ-মনে ফলগুধারা বয়ে আনে, তেমনিভাবে রাসূলের কাছেও মহান প্রভু আল্লাহ তা'য়ালার বলা কথাগুলো শান্তির অমীয় সঞ্জীবনী সুধা বয়ে আনলো। আল্লাহর বলা এই কথাগুলোর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে যেন দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা আর মমতার এক মধুর আবেশ বিদ্যমান ছিল, যা সেই মুহূর্তে রাসূলের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। নিগৃহীত, নির্যাতিত ও আপনজন কর্তৃক পরিত্যক্ত রাসূলের জন্য এই কথাগুলোর প্রয়োজনীয়তা ছিল অসীম। যে কথাগুলোর আগমনে মুহূর্তে বুকের ভেতর বরফের মতো জমে থাকা যন্ত্রণা গলে পড়েছিল। রাসূলের ওপরে পাহাড়সম নিষ্ঠুর বোঝা যেন মুহূর্তে অপসারিত হয়েছিল।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে ত্যাগ করেননি বা তাঁর ওপরে অসন্তুষ্ট হননি, এই কথাগুলো রাসূলের হৃদয়পটে অঙ্কিত করে দেয়ার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা আলোকোজ্জ্বল মধ্যদিনের ও রাতের শপথ করেছেন। দিনের আলো ও তাপ ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্নভাবে কারো ওপরে পড়তে থাকলে সেই লোকটি অবশ্যই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে। এ জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দিনের উজ্জ্বলতা বিদ্যমান থাকার পর রাতের আগমন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এই রাতেই মানুষ দিনের ক্লান্তি দূর করতে সমর্থ হয়। একইভাবে ওহীর প্রখরতা রাসূলের ওপরে ক্রমাগতভাবে পড়তে থাকলে তাঁর দেহ-মনের ওপরে এক প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হতো। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা ওহীর বিরতি দিয়ে রাসূলের ভেতরে ওহী ধারণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করেছিলেন। এ বিষয়ে আমরা এ সূরার শানে নযুলে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এরপর আলোচ্য সূরার ৪ নম্বর আয়াতে রাসূলকে আগামী দিনের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে, একটি করে দিন তোমার জীবন থেকে অতিবাহিত হবে, নতুন দিনের আগমন ঘটবে, সেই নতুন দিনটি তোমার কাছে পূর্বের তুলনায় উত্তম হবে। যে দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেই কাজের সফলতার ব্যাপারে রাসূলকে আল্লাহ তা'য়ালা আগাম

সুসংবাদ দিয়েছেন এই আয়াতে। দ্বীনি আন্দোলনের শৈশবকাল। রাসূল আল্লাহর নির্দেশে একা এই পথে অগ্রসর হলেন। ক্রমশঃ মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গী-সাথী তার জুটে গেল। আপন আত্মীয়-স্বজন তাঁকে শুধু দূরেই নিক্ষেপ করলো না, আন্দোলনের শত্রুদের সাথে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর সাথে শত্রুতা করতে লাগলো। গোটা জাতি তাঁর দুশমনে পরিণত হলো। অন্ধকার! চারদিকে ঘোর অমানিশার অন্ধকার! কোথাও সফলতার সামান্যতম আলোর রেশটুকুও নেই। এই ঘন তমশার মধ্যে তাওহীদের প্রদীপ ক্ষীণ শিখায় আলো বিকিরণ করছিল আর সেই আলোর শিখাকে বিরোধী গোষ্ঠী ফুঁৎকারে নির্বাপিত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

ঠিক এই কঠিন মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে নিশ্চয়তা দিলেন, আপনি মোটেও বিচলিত হবেন না। হতাশার বিন্দুমাত্রও যেন আপনাকে স্পর্শ করতে না পারে। আগামীতে আপনার জন্য শুভ দিন অপেক্ষা করছে। অচিরেই সাফল্যের সোনালী সূর্য উদিত হবে এবং সেই সূর্যের আলোয় আন্দোলনের ময়দান থেকে অন্ধকার দূরিভূত হবে। আপনি চিন্তা করবেন না, যে জাহিলিয়াত আপনার সামনে পাহাড়ের মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা নিজের ঘরেই আত্মহত্যা করবে। আজ যে সঙ্কটপূর্ণ দিন আপনি অতিবাহিত করছেন, আগামী দিন হবে আপনার জন্য শুভক্ষণ। আপনি তো পরশ পাথর। আপনার স্পর্শে সমস্ত কিছুই খাঁটি সোনায় পরিণত হবে। এই আন্দোলন এক সময় পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কম্পন সৃষ্টি করবে। কারো ক্ষমতা নেই তাওহীদের এই আমানত এর ধারক-বাহকদের বুক থেকে মুছে ফেলার। যে কা'বা ঘরে আজ আপনাকে তাওহীদের ধ্বনী উচ্চারণ করতে দিচ্ছে না, সেই দিন সামনে যখন তাওহীদের এই ধ্বনী কা'বা ঘরের চার দেয়াল অতিক্রম করে প্রান্তর ছাড়িয়ে অগাধ জলধী পেরিয়ে অপ্রতিহত বন্যার গতিতে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হতে থাকবে।

গোটা পৃথিবীর সবথেকে সম্মান ও মর্যাদার আসন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনিই হবেন এই পৃথিবীর ভেতরে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। পৃথিবী ব্যাপী আপনার নামটিই সবথেকে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। শুধু পৃথিবীতেই নয়-কিয়ামতের ময়দানে আপনিই হবেন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। কল্পনার অতীত নে'মাত দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করা হবে। সুতরাং আপনি নিশ্চিত মনে আপনার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যান। পেছনে দৃষ্টি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, সামনের দিকে অগ্রসর হন। এমন এক সময় আসবে যখন আপনার বিরোধিদের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেখানে দাঁড়িয়ে তারা আজ আপনাকে হুমকি দিচ্ছে, ঐ স্থান থাকবে আপনার পবিত্র পায়ের নীচে। যে মাথা আজ গর্বিত ভঙ্গিতে আপনার সামনে উঁচু হয়ে রক্তচক্ষু তুলে ধরছে, সেই মাথা আপনার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়বে-সেদিন বেশী দূরে নয়। এমন সময় আপনার সামনে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে, যখন আপনার শত্রুপক্ষ আপনার কাছে শুধু করুণাই ভিক্ষা চাইবে।

৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে যে ওয়াদা দিলেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা **দেয়া হয়েছে ৫ নম্বর আয়াতে**। বলা হয়েছে, সামান্য দিনের ব্যবধানে তোমার রব-তোমাকে এমন সব নে'মাতের অধিকারী করবেন, যা লাভ করে তোমার খুশীর কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

আল্লাহর এই ওয়াদা নিছক শুধু কথার কথাই ছিল না। ইতিহাস সাক্ষী, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের জীবনকালেই ওয়াদা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর

অবর্তমানে তাঁরই অনুসারীরা তাঁর আনিত আদর্শ ইসলামকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করবে, সে চিত্রও রাসূলের সামনে মহান আল্লাহ তুলে ধরেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আমার অবর্তমানে আমার উম্মত যেসব এলাকায় বিজয় কেতন উড্ডিন করবে, সেসব এলাকা আমাকে দেখানো হয়েছে। তা দেখে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

'হে মক্কা ! এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর থেকে তুমি আমার কাছে প্রিয়, কিন্তু তোমার নিষ্ঠুর সন্তানেরা আমাকে থাকতে দিল না।' এই কথাগুলো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের। তাঁর মনে বড় সাধ ছিল, মক্কায় অবস্থান করে প্রাণভরে বাইতুল্লাহর খেদমত করবেন। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা তাঁর আদর্শ ইসলামকে সহ্য করেনি। তাঁকে মক্কায় থাকতে তাঁরা দেয়নি। প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনার দিকে যাবার সময় অশ্রু সজল দৃষ্টিতে কা'বার দিকে তাকিয়ে তিনি উল্লেখিত কথাগুলো বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন। তাঁর শৈশব কৈশোর ও যৌবনের চারণভূমি মক্কা তিনি বিজয় করলেন। অত্যন্ত দ্রুত ইসলাম চারদিকে তার সৌরভ ছড়িয়ে দিলো। দক্ষিণ উপকূল থকে উত্তরে রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে পারস্যোপসাগর থেকে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র আরবদেশ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনাধীনে আসে। সাড়ে বার লক্ষ বর্গমাইল এলাকার তিনি শাসক ছিলেন।

আরবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই ভূখন্ড এক সুসংবদ্ধ আইন ও শাসনের নিয়ন্ত্রণে আসে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেছিলেন যে, তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য যখনই রাসূল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চরমভাবে পর্যদুস্ত হয়েছে। তাওহীদের আওয়াজ গোটা সাম্রাজ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মানুষের বানানো সমস্ত মতবাদ মতাদর্শ গর্বিত মস্তক অবনমিত করে রাসূলের পদতলে লুটিয়ে পড়েছে। যেসব মানুষের মন-মানসিকতায় শিরকের অন্ধকার পূঞ্জিভূত ছিল, সে অন্ধকার দূরিভূত হয়ে সেখানে তাওহীদের মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। নরখাদকের মতোই যারা নারীর ইজ্জতের ওপরে হামলা করতো, তারা সামান্য কিছু দিনের ব্যবধানে হয়ে পড়েছিল নারীর ইজ্জতের অতন্দ্রপ্রহরী। অগণিত মানুষের মন-মস্তিকে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছিল।

জাহিলিয়াতের বর্বর অন্ধকারে যে জাতি ছিল নিমজ্জিত, মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে সেই জাতি গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় জাতিতে পরিণত হয়েছিল, পরিবর্তনের এই ধরনের ঘটনা গোটা বিশ্বের ইতিহাসে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবেই তাঁর নবীকে খুশী করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাসূলের বিদায়ের পরে দ্বীনি আন্দোলন গোটা পৃথিবীর বাতিল শক্তির তখ্তে তাউসে যে কম্পন সৃষ্টি করেছিল, সে কম্পনের ফলে জাহিলিয়াতের বিশাল বিশাল দুর্গ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল। ইউরোপ ও আফ্রিকার একটি বিশাল অংশের ওপরে ইসলাম অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গোটা পৃথিবীর মানুষ জ্ঞানার্জন ও সভ্যতা শেখার জন্য ছুটে আসতো ইসলামের কাছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবেই তাঁর নবীর কাছে করা ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছিলেন। এই নেয়ামত তিনি তাঁর নবীকে এই পৃথিবীতেই দিয়েছিলেন, আর আদালতে আখিরাতে তাঁকে যে কি ধরনের নে'মাত দানে ধন্য করবেন, তা কল্পনাও করা যায় না।

সাময়িকভাবে ওহীর বিরতির কারণে স্বয়ং রাসূল যেমন উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তেমনি তাঁর বিরোধী পক্ষও তাঁকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করছিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে

মমতা সিক্ত ভাষায় জানিয়ে দিলেন, আপনাকে ত্যাগ করার বা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনার জীবনের কোন একটি পর্যায়েও আমি আপনার ওপর থেকে আমার রহমতের ছায়া উঠিয়ে নেইনি। প্রতিটি মুহূর্তে আমি আপনাকে আমার রহমতের চাদরে আবৃত করে রেখেছি। আপনি আপনার জীবনের সূচনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন। আপনি কি অবস্থায় ছিলেন এবং কিভাবে আমি আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছি।

আলোচ্য সূরার ৬ থেকে ৮ নম্বর আয়াতে সেই কথাগুলোই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'য়ালা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলা হয়েছে, আমার রহমত তো আপনার জীবনের সূচনা থেকেই আপনাকে পরিবেষ্টন করেছিল। আপনি পৃথিবীর আলো-বাতাসে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই পিতাকে হারিয়েছিলেন। জন্মগতভাবেই আপনি ছিলেন ইয়াতীম। এ সময়ে আপনাকে আমি আপনার মমতাময়ী মায়ের আশ্রয়ে রেখেছিলাম। আপনি যখন মাতৃহারা হলেন তখন আমি আপনাকে আপনার দাদার অতুলনীয় স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছি। আপনার দাদার অবর্তমানে আপনার চাচা আবু তালিবের স্নেহছায়ায় আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনার চাচা আপনার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা কোন পিতার পক্ষেও পালন করা সেই পরিবেশে সম্ভব ছিল না। যে সময়ে গোটা জাতি আপনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সে সময় তিনি বিশাল মহীরুহের মতোই আপনাকে ছায়া দিয়েছেন। এসব ব্যবস্থা তো আমিই করেছিলাম। একটি মুহূর্তের জন্যেও আমি আপনাকে আশ্রয়হীন করিনি।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী জ্ঞান বিবর্জিত ছিলেন। আর ওহীর জ্ঞান না থাকলে মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায় না। প্রকৃত সত্যের সন্ধানে তাঁর হৃদয়-মন ছিল ব্যাকুল। এর মানে এই নয় যে, তাঁর চিন্তা-চেতনাও মক্কার অন্যান্য লোকদের অনুরূপ ছিল। গোটা জগতের প্রচলিত পরিবেশ হতে, প্রচলিত প্রথা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। যাবতীয় পংকিলতার মধ্যে বাস করেও যিনি ছিলেন সমস্ত পংকিলতার উর্ধ্বে। গোটা পৃথিবীর এক ইঞ্চি ভূমি সে সময়ে মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত ছিল না। যে মক্কা নগরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বনবী হিসাবে ঘোষনা দেয়া হয়েছিল, সে মক্কা নগরী ছিল যেন মূর্তির কেন্দ্রস্থল। মানুষ মূর্তির প্রতি এতটা অনুরক্ত ছিল যে, কা'বা ঘরেই মূর্তি স্থাপন করেই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের বাসগৃহেও মূর্তি স্থাপন করেছিল। তাঁরা প্রতি দিন ঊষা লগ্নে তথা দিনের শুরু করতো মূর্তির সামনে মাথানত করে, রাতে শয্যায় আশ্রয় নেয়ার পূর্বে তথা দিনের কাজ শেষ করতো মূর্তির সামনে মাথানত করে। কোথাও তাঁরা ভ্রমণে গেলে পকেটে করে মূর্তি নিয়ে যেত। যথা সময়ে পথিমধ্যে সে মূর্তির সামনে মাথানত করে মনের কামনা-বাসনা পেশ করা হত। এমনি এক পরিবেশে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন।

সেই শিশুকাল থেকেই তিনি মূর্তির প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতেন। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যগণ তাকে কোন দিন কোন মূর্তির সামনে অগ্রসর করাতে পারেনি। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সেই পরম সত্তার সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং অনুধাবন করেছেন, দৃষ্টির সামনের মানুষগুলো যাদের সামনে মাথানত করছে, নিজের মনের আকাংখা পেশ করছে, বিপদে যার কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তার কোনই ক্ষমতা নেই। বরং সে মূর্তিই আরেকজন মহাক্ষমতাশালীর অধীন। তাঁর গোত্র কুরাইশরা কা'বা এবং হজ্জের নেতৃত্ব হাতে পেয়ে যে চরম অনাচারের মধ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করেছে। মক্কার বাইরে থেকে যারা হজ্জ করতে আসবে তাদেরকে কুরাইশদের পোশাক পরিধান করে কা'বাঘর

প্রদক্ষিণ করতে হবে, নতুবা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হবে। হজ্জের অংশ হিসাবে সবাই আরাফাতের ময়দানে গেলেও কুরাইশরা যাবে না।

মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন যাবতীয় পাপ ও পংকিলতার বহু উর্ধ্বে। পবিত্র কোরআন থেকে যেমন সূরা শুরার ৫২ নং আয়াত, সূরা কাসাসের ৮৬ নং আয়াত ও আলোচ্য সূরার ৭ নং আয়াতসহ অনেক আয়াত থেকেই আমরা জানতে পারি, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ওহী অবতীর্ণের পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সে জ্ঞান সাধারণ কোন মানুষের থেকে তেমন বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। যে বিষয়টা ছিল, তার ভেতরে আর সাধারণ মানুষের ভেতরে বিশাল পার্থক্য ছিল। নবুওয়াত লাভের পূর্বে সাধারণের থেকে তাদের জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্মে অন্য মানুষের সাথে সামঞ্জস্য থাকলেও তাদের কাজের ধরন এবং মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ছিল গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের থেকে পৃথক। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং ওহী সম্পর্কে ধারণা ছিলনা বললেই চলে। একদিকে এ কথার সাক্ষ্য পবিত্র কোরআন দেয় অপর দিকে সাক্ষ্য দেয় স্বয়ং নবীর অবস্থা। কেননা, ওহী সম্পর্কে যদি তাদের পূর্ণ জ্ঞান পূর্ব হতেই থাকতো, তাহলে প্রথম ওহী অবতীর্ণের সময় তাঁরা অস্থির হয়ে পড়তেন না।

পক্ষান্তরে ওহী আসার পূর্বে তাদের মনে এবং চিন্তার জগতে যে সমস্ত চিন্তার উদয় হত, সে চিন্তা কোন মিথ্যা ভিত্তির উপরে ছিল না। প্রকৃত সত্যের দিকেই তাদের চিন্তা ধাবিত হতো। তাদের চোখ যা দেখতো, তাদের ঘুমের অবচেতন জগতে যে দৃশ্য এসে চোখের সামনে ধরা দিত, তা ছিল বাস্তব। মহান আল্লাহ ওহীর জ্ঞান দিয়ে তাদের সামনে মহা সত্যের এক আশ্চর্য পৃথিবীর দ্বার উন্মোচন করে দিতেন। তাদের বিশ্বাস দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হত।

অর্থাৎ নবীগণ ওহীজ্ঞানের পূর্বে পরিচালিত হতেন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক হেদায়াতের দ্বারা। তাদের বুদ্ধির জগৎ মহান আল্লাহ এমনভাবে গঠন করেছিলেন যে, কোনটা সত্য এবং কোনটা মিথ্যা তার পার্থক্য তাঁরা অনায়াসে বুঝে নিয়ে সেভাবে জীবন পরিচালিত করতেন। ইউরোপের অন্ধ বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ ব্যতীত কেউ বলতে পারবে না যে, কোন একজন নবীও তাদের গোটা জীবনে মুহূর্তের জন্য কোন মূর্তির সামনে মাথানত করেছেন।

কেন করেননি ? কারণ তাদের বুদ্ধিই বলে দিত পৃথিবীর অন্যান্য জড়পদার্থের মতই এই মূর্তিও জড়পদার্থ। এসবের নিজস্ব কোনই ক্ষমতা নেই। গোটা পৃথিবীর দিকে তাদের দৃষ্টি সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই নিপতিত হত এবং তাদের মন বলে উঠতো, এসবের পেছনে একজন মহাক্ষমতাবানের ক্ষমতা কার্যকর রয়েছে। সৃষ্টির কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। সাধারণ কোন মানুষের মনে এ ধরণের কোন চিন্তার উদয় না হলেও নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনে নবীদের মনে হত। যারা উচ্চ পর্যায়ের সাধক ছিলেন বা সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গবেষণা করতেন এবং সৃষ্টির সন্ধান করতে যেয়ে স্রষ্টার সন্ধান করতেন বা লাভ করতেন তাদের মনেও উল্লেখিত চিন্তার উদয় হত।

এ কারণেই চিন্তাশীলগণ কোরআনের আলোকে বলেছেন, নবীদের নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনের চিন্তাধারা উচ্চ পর্যায়ের মানুষের চিন্তাধারার মতই ছিল। পবিত্র কোরআনে মানুষকে আল্লাহ আহ্বান করেছেন, তোমরা যে পৃথিবীতে বাস করছো, তোমরা যে দেহ নিয়ে চলাফেরা করো, দৈনন্দিন জীবনে তোমরা যে সামগ্রী ব্যবহার করো, যে বীর্য তোমরা স্ত্রীর গর্ভে নিক্ষেপ করো এ সব নিয়ে তোমরা কেন চিন্তা গবেষণা করো না ?

এ সব নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলেই তোমরা অনুধাবন করতে পারবে, তোমাদের প্রকৃত স্রষ্টা কে। তোমরা অনুভব করতে পারবে, তোমাদেরকে বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি। মহান আল্লাহ যাকে নবী হিসাবে তাঁর বান্দাদের সামনে প্রেরণ করবেন, তাদের মনে এ সমস্ত চিন্তার উদয় হত এবং তারা মহাসত্য অনুধাবন করতেন। প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ চিন্তা গবেষণা এবং সহজাত জ্ঞানের প্রয়োগ করে নবীগণ চলতেন। বিভিন্ন নবীর নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই আমাদের সামনে সে সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

আমরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পূর্ববর্তী জীবনে দেখতে পাই, সে সমাজে প্রচলিত কোন একটি প্রথার সাথে তিনি নিজেকে বিলীন করে দেয়া দূরে থাক, ক্ষণিকের জন্য তা গ্রহণ করেননি। তিনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুহূর্তের জন্যেও অংশীদারিত্ব মেনে নেননি। মাতৃগর্ভ থেকে এই বিশাল পৃথিবীতে এসে চৈতন্য উদয়ের পরে তিনি ঐ সমস্ত বিশ্বাস নিজের অন্তরে এক মুহূর্তের জন্য স্থান দেননি, যে বিশ্বাসের বেষ্টনে তিনি পরিবেষ্টিত ছিলেন।

যে পরিবারে এবং পরিবেশে তিনি শিশুকাল থেকে চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন, অবাক করার বিষয় হলো, সে পরিবার এবং পরিবেশের সামান্য ছোঁয়া তাকে স্পর্শ করতে পারলো না। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানুষের জীবনে আর তাঁর জীবনে কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যে আদর্শ মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, সে আদর্শে যে বিকৃত করা হয়েছিল এবং ঘৃণিত নতুন প্রথার আমদানী করে তা অনুসরণ করা হতো, ক্ষণিকের জন্যে তিনি তা মেনে নেননি। কোন প্রতিমার উদ্দেশ্যে বলিদানকৃত পশুর গোস্ত তিনি ভক্ষণ করেননি। বন্যার পানির ন্যায় যে সমাজে মদ প্রবাহিত হতো, তাকে সে মদ স্পর্শ করতে পারেনি। নারী ভোগের প্রতিটি দ্বার যেখানে ছিল উন্মুক্ত, তিনি সে দ্বারের দিকে নিজের অজান্তেও কখনো নিজের পদদ্বয় দূরে থাক–মুহূর্তের জন্যে স্বীয় মনকে অগ্রসর করাননি।

তাঁর গোত্র কুরাইশ গোত্র সে সমাজে আভিজাত্যের অভিমানে একটা বৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাঁরা দাবী করতো সমস্ত মানুষের মধ্যে তাঁরা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হজ্জের সময়ে অন্যদের মত তাদেরকে আরাফাতে যেতে আসতে হবে না। তাদের দাবী ছিল, কুরাইশরা শ্রেষ্ঠত্বের কারণে কা'বার বাইরে গিয়ে সাধারণ হাজ্জীদের মত আরাফাতে অবস্থান করতে পারে না, এটা তাদের মর্যাদার পরিপন্থী। কিন্তু তাঁরা এটা অবগত ছিল যে, মক্কা থেকে হজ্জের সময় আরাফাতে গমন করা ইবাদাতের অংশ। কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এই ইবাদাতকে সংকীর্ণ করেছিল।

মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে যারা কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে বা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তাঁরাও আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের সূত্রে মর্যাদার দাবী উত্থাপন করে কুরাইশদের অনুকরণে হজ্জের ইবাদাতে সংকীর্ণতা এনেছিল। তাঁরাও আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আরেকটি প্রথা তাঁরা প্রবর্তন করেছিল, কা'বা এলাকার বাইরে থেকে যারা আসবে তাঁরা তাদের সাথে নিয়ে আসা খাদ্য আহার করতে পারবে না এবং পোষাক পরিধান করতে পারবে না।

কা'বার সেবক কুরাইশরা যে খাদ্য সরবরাহ করবে তা আহার করতে হবে এবং যে পোষাক সরবরাহ করবে তা পরিধান করতে হবে, সরবরাহ করতে অক্ষম হলে উলঙ্গ হয়ে কা'বা তাওয়াফ করতে হবে। সে সমাজের মানুষ এ সমস্ত বাতিল প্রথা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে

অনুসরণ করতো। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের এ সব প্রথা কোন দিন গ্রহণ করেননি। নবুওয়াত লাভের পূর্বে কুরাইশদের প্রবর্তিত প্রথা নিষ্ঠুর পায়ে দলিত মথিত করে তিনি আরাফাতে গমন করতেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যে পদ্ধতিতে হজ্জ আদায় করেছেন, তিনি সে পদ্ধতি তথা আল্লাহর শিখানো নিয়মে হজ্জ সমাপন করেছেন। অর্থাৎ তদানীন্তন পৃথিবীতে প্রচলিত যাবতীয় অনাচার থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত।

সমস্ত দিক থেকেই তিনি ছিলেন এক পুত ও পবিত্র চরিত্রের মানুষ। তাঁর ভেতরে যা অনুপস্থিত ছিল তা হলো ওহীর জ্ঞান। ওহীর জ্ঞান ব্যতীত কোন মানুষই মহাসত্যের সন্ধান লাভ করতে পারে না। এ জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে আলোচ্য সূরায় বলেছেন, 'তিনি কি তোমাকে এমন অবস্থায় পাননি যে, তুমি সঠিক পথের সন্ধানে বিব্রত ছিলে–অতপর তিনি তোমাকে পথের দিশা দেখিয়েছেন।' অর্থাৎ ওহীর জ্ঞানে আপনাকে সজ্জিত করা হয়েছে।

ইতিহাস যে যুগটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' বা মূর্খতার যুগ হিসাবে, সেই মূর্খতার ঘোর অন্ধকার অমানিশার ঘনঘটার মধ্যেই প্রদীপ্ত সূর্যের মত আগমন করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দিশারী নবী সম্রাট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তদানীন্তন পৃথিবীতে মানুষ সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে শোষিত হচ্ছিল, রাজনৈতিকভাবে গোত্রতন্ত্র তথা জুলুমমূলক ব্যবস্থা জগদ্দল পাথরের মত মানুষের ওপরে চেপে বসেছিল, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে মায়ের জাত নারীকে তলিয়ে দেয়া হয়েছিল, 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতিই ছিল সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এহেন সমাজ ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত মানবতা মুক্তির লক্ষ্যে আর্তনাদ করছিল। মানবতার এই করুণ অবস্থা অবলোকন করে করুণার মূর্ত প্রতীক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হৃদয় ব্যথা কাতর হয়ে উঠেছিল।

তিনি মানুষকে এ অপমানজনক অবস্থা থেকে মুক্ত করে মহামুক্তির স্বর্ণদ্বারে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে মাত্র সতের বছর বয়সে (কেউ বলেছেন, বিশ বছর বয়সে) কিছু উৎসাহী মানুষকে সাথে নিয়ে হিলফুল ফুযূল নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ মহান সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, মানবতাকে যে কোন ধরণের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত করে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী নিরাপত্তাপূর্ণ ও শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতিকে সুসভ্য হিসাবে গড়ে তোলা। নবুওয়াত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিরামহীন গতীতে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালনা করলেন। পক্ষান্তরে তিনি কাংখিত ফল লাভ করতে পারলেন না। গোটা জাতিকে মুক্ত করে শোষণ মুক্ত সমাজ উপহার দিতে তিনি সক্ষম হলেন না।

এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন জাগে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেন সক্ষম হলেন না ? তিনি কি ঐ আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক ছিলেন না ? অথবা (আল্লাহ ক্ষমা করুন) তাঁর চরিত্রে কোন দুর্বলতা ছিল ? অথবা, তাঁর মধ্যে আন্দোলন সংগঠন ও নেতৃত্বের কোন ধারণা বর্তমান ছিল না ? অথবা ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি মানব মুক্তির মহান আন্দোলনকে চোরাবালিতে নিক্ষেপ করেছিলেন ?

ইতিহাস সাক্ষী, মহান আল্লাহ তাঁকে এ ধরণের যাবতীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত করেই এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ তাকে 'সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী' বলে সনদ পত্র দিয়েছেন এবং সর্বকালের মানুষদের জন্য 'একমাত্র উত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় চরিত্র' হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রাণের শত্রু যারা ছিল সে

সমাজে, তাঁরাও তাকে 'আল আমীন' অর্থাৎ বিশ্বাসী এই উপাধিতে ভুষিত করেছেন। পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মধ্যেও কালোদাগ (Blackspot) থাকলেও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চরিত্রে কোন কালোদাগ আবিষ্কার করতে পারেনি। Spotless character-এর অধিকারী ছিলেন তিনি।

আবার প্রশ্ন জাগে, এ ধরণের একজন Spotless character-এর অধিকারী এক মহান ব্যক্তি মাত্র সতের বছর বয়স থেকে শুরু করে চল্লিশ বছর বয়স অর্থাৎ তেইশ বছর পর্যন্ত অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েও সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌছতে কেন সক্ষম হলেন না ? পক্ষান্তরে ঐ একই ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স থেকে তেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ এই দ্বিতীয় তেইশ বছর আন্দোলন করে এমন একটি সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতি পৃথিবীর সভ্যতায় উপহার দিলেন, যে সমাজ রাষ্ট্র ও জাতি বর্তমান ও আগামী দিনের জাতিসমূহের জন্য চীর অনুসরণীয়।

তাঁর আন্দোলনের দুটো অধ্যায়ের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যে প্রকৃত সত্য দৃষ্টি গোচর হয়, তাহলো সতের বছর থেকে চল্লিশ বছর অর্থাৎ এই তেইশ বছর আন্দোলন করে তিনি তাঁর কাংখিত ফল লাভে সক্ষম হননি। অপরদিকে চল্লিশ বছর থেকে তেষট্টি বছর আন্দোলন সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌছে ছিল। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা বিরাট এবং অকল্পনীয় পরিবর্তন সাধিত হলো। ফলে এমন একটি সমাজ জাতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, আকাশের নিচে ও পৃথিবীর বুকে এ ধরণের বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত ভীতিহীন নিরাপত্তাপূর্ণ সুখী-সমৃদ্ধশালী সৌভ্রাতৃত্বমূলক জীবন ব্যবস্থা ইতিহাসে অনুপস্থিত। যে সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা,শ্রমনীতি, শিল্পনীতি ছিল গবেষকদের কল্পনার বিষয় বস্তু, তা-ই এই তেইশ বছরের আন্দোলনে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করলো। পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্ব পর্যন্ত এ তেইশ বছরের আন্দোলন ও তার ফলাফল, গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্যে অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

আবার প্রশ্ন জাগে, প্রথম তেইশ বছরের আন্দোলন কেন যৌক্তিক পরিণতি লাভ করলো না ? আর দ্বিতীয় তেইশ বছরের আন্দোলন কোন্ অলৌকিক ক্ষমতার স্পর্শে সাফল্য লাভ করলো ? এ সম্পর্কে চিন্তা করলে আমাদের সামনে যে সত্যটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে, প্রথম তেইশ বছরের আন্দোলন ছিল তাঁর নিজস্ব ধ্যান ধারণা চিন্তা কল্পনা ও মস্তিষ্ক প্রসূত। আর দ্বিতীয় তেইশ বছরের আন্দোলন ছিল ওহীভিত্তিক জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। এখানে প্রকারান্তরে মহান আল্লাহ্ প্রমাণ দেখালেন, মানুষের চিন্তা কল্পনা ধ্যান-ধারণা তথা মানুষের তৈরী কোন আদর্শ মানুষের মুক্তি দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মানুষের সমস্যার সার্বিক সমাধান দিতে পারে একমাত্র ওহী তথা আল্লাহর অবতীর্ণ করা জীবন বিধান। মানুষ যতই সৎ, নীতিবান, নিষ্ঠাবান ও অনুপম গুণাবলীর অধিকারী হোক না কেন, সে মানুষ তাঁর মন-মস্তিষ্ক প্রসূত, ধারণানুযায়ী বা কল্পনা নির্ভর কোন নীতিমালা দিয়ে যদি মানব গোষ্ঠীর সমস্যার সার্বিক সমাধান দানে অগ্রসর হয়, তাহলে সে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে। তার সমস্ত প্রচেষ্টা ত্যাগ-তিতীক্ষা ও শ্রম ব্যর্থতার চোরাবালিতে হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

মানুষ যদি তার কল্পনা প্রসূত নীতিমালা প্রয়োগ করে মানব গোষ্ঠীর সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সুষ্ঠ সমাধান দানে সক্ষম হত, তাহলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিবান ও চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-ই সর্বাগ্রে সফল হতেন। মানব জাতির জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে

শান্তিপূর্ণ জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ওহীভিত্তিক জ্ঞান তথা আল কোরআনের যে বিকল্প নেই, তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রথম তেইশ বছরের আন্দোলন জ্বলন্ত সাক্ষর বহন করে। তাঁর পরবর্তী তেইশ বছরের আন্দোলন যখন ওহীর জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তখনই তিনি শোষিত নিপীড়িত ও নির্যাতিত আর্ত মানবতাকে মহামুক্তির স্বর্ণ শিখরে উপনিত করতে সফল হয়েছেন।

এরপর তাঁকে বলা হয়েছে, 'তিনি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাননি–অতপর তিনি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিয়েছেন।' অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল তাঁর জীবনের শুরু করেছিলেন দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে। উত্তরাধিকারী সূত্রে তিনি লাভ করেছিলেন একটি উষ্ট্রী আর একজন ক্রীতদাসী। এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন বৈষয়িক সম্পদ ছিল না। পরবর্তীতে তাঁর গুণমুগ্ধ হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজের বিশাল ব্যবসার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করেছিলেন। রাসূল তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতা আর মেধা প্রয়োগ করে সে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বিদুষী নারী ধনবতী হযরত খাদিজার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করালেন। ধন-সম্পদের স্তুপ তাঁর পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু এসব ধন-সম্পদ তিনি নিজে ভোগ করার পরিবর্তে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে ব্যয় করতেন। আর্তপীড়িত মানবতার সেবায় যাবতীয় সম্পদ উৎসর্গ করেছিলেন। এভাবেই মহান আল্লাহ তাঁকে নিঃস্ব অবস্থা থেকে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী বানিয়ে ছিলেন।

আগামী দিনের সুসংবাদ, যাতনাপূর্ণ অতীত ও তাঁর প্রতি অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরার ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে তাঁকে বলছেন, 'অতপর তুমি কখনো ইয়াতীমদের ভয় দেখিয়ো না। কোন প্রার্থীকে কোনো সময় ধমক দিয়ো না।' ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হয়োনা বা তাদেরকে ভয় দেখিয়ো না–এ কথার অর্থ হলো, আপনার আচার আচরণ ও ব্যবহারে এমন কোন ভাব যেন প্রকাশ না পায়, যা দেখে ইয়াতীমরা আপনার সান্নিধ্যে আসতে ভয় পায়। আপনি স্বয়ং ইয়াতীম ছিলেন, সুতরাং আরেকজন ইয়াতীমের যে কি যন্ত্রণাবোধ, তা আপনার থেকে ভালো আর কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে! সুতরাং ইয়াতীমদের জন্য আপনি করুণার বাহু বিছিয়ে দেবেন, তাদেরকে করুণাধারায় সিক্ত করবেন, এটাই হবে আপনার উত্তম নীতি। আপনি ইয়াতীম ছিলেন, আমি আপনাকে সর্বোত্তমভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছি। এর শোকর হিসাবে আপনিও ইয়াতীমদের প্রতি সদয় হবেন।

এরপর বলা হয়েছে কোন প্রার্থীকে আপনি কখনো বিমুখ করবেন না। প্রার্থী সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে। কেউ অর্থ-ধন-সম্পদ বা বৈষয়িক কোন বস্তুর প্রার্থী হয় আবার কেউ অজ্ঞতা দূর করার জন্য জ্ঞানের প্রার্থী হয়। আলোচ্য আয়াতে এ দুটো বিষয়কে একত্রিত করেই বলা হয়েছে কোন প্রার্থী যেন তোমার কাছ থেকে বিমুখ না হয়। বৈষয়িক কোন বস্তুর জন্য বা কোন অভাবী যদি তোমার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করে, তাহলে তা দেয়ার ক্ষমতা থাকলে তাকে বিমুখ করবে না। আর যদি দেয়ার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তার সাথে কোনক্রমেই রূঢ় আচরণ করবে না। বিনয়ের সাথে মমতা জড়িত কণ্ঠে তুমি নিজের অক্ষমতার কথা তাকে জানাবে। তুমি স্বয়ং দরিদ্র ছিলে, সুতরাং দারিদ্র যে কি কষ্টের, তা তুমি ভালো করেই অবগত রয়েছো। সুতরাং কোন অভাবীর সাথে কখনোই কঠোর আচরণ করবে না।

রাসূলের নীতি ছিল, কোন অভাবী তাঁর কাছে কোন বিষয়ে আবেদন করলে সামর্থ থাকলে তিনি সাথে সাথে তা পূরণ করতেন। আর দেয়ার মতো কিছু না থাকলে বিনয়ের সাথে অভাবীকে জানাতেন, 'আল্লাহ আমাকে দিক, আমিও তোমাকে দেবো।' অথবা 'এখন নয়, আবার এসো তখন দেবো।' তাঁর গোটা জীবনকালে এমন একটি ঘটনাও ক্ষণিকের জন্য ঘটেনি যে, তিনি কোন প্রার্থীর সাথে বিন্দুমাত্র অশোভন আচরণ করেছেন। অক্ষমতার কারণে সাহায্য দিতে অক্ষম হলেও সাহায্য প্রার্থী রাসূলের মমতা সিক্ত আচরণে এতটা আনন্দ চিত্তে ফিরে যেতো যে, সাহায্য লাভ করলেও বোধহয় সে ততটা খুশী মনে ফিরে যেতো না।

আবার অজ্ঞতা দূর করার জন্য যারা জ্ঞানের প্রার্থী হয়, তাদের সাথেও অশোভন আচরণ করা যাবে না। কারণ আপনি স্বয়ং ওহী জ্ঞানের অভাবে মহাসত্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন। আপনি নিজ চোখে দেখেছেন, প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে মানুষ কিভাবে জড়পদার্থের পূজা আরাধনা করেছে। আমি আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করে আপনাকে যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞানদান করেছি। সুতরাং জানার জন্য কোন প্রার্থী আপনার কাছে আসবে, তখন তাকে আপনি জানাবেন। জ্ঞানের অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে যারা নিজেদেরকে সাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, কোন কিছু জানতে চাইলে রূঢ় আচরণ করে। প্রশ্নকারী সমাজের কোন স্তরের লোক তা জেনে তারপর সাক্ষাৎ দান করে। প্রশ্নকারী সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন হলে তাকে সাক্ষাৎ দেয় না বা তার সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভঙ্গিতে কথা বলে। আপনি এমন করবেন না। প্রশ্নকারী সমাজের যে স্তরের লোকই হোক না কেন আর প্রশ্ন যে ভঙ্গিতেই করুক না কেন, তা যদি ইসলামের সাথে সম্পর্কিত হয়, আপনি মমতাভরে তা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে তার মনের বোঝা নামিয়ে দেবেন।

কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সাফল্যের সোনালী দ্বারে উপনীত করার এটাও একটি মাধ্যম যে, আন্দোলনের সাথে জড়িত সকল স্তরের জনশক্তি সমাজের আর্তমানবতাকে সাহায্য সহযোগিতা করবে, তাদের সাথে মমতাপূর্ণ আচরণ করবে। এই নির্দেশ রাসূলের প্রতি এমন এক সমাজে অবতীর্ণ হয়েছিল যে, সে সমাজে অসহায়, ইয়াতীম ও দুর্বলদের কোন স্বীকৃত অধিকার ছিল না। সেই লোকগুলোর প্রতি যখন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মমতা সিক্ত আচরণ করা হলো, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হলো। বর্তমানেও কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে হলে রাসূলের অনুরূপ আচরণ করতে হবে।

শেষের আয়াতে রাসূলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, 'তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ তথা নে'মাতসমূহ বর্ণনা করে যাও।' এ কথার অর্থ হলো মহান আল্লাহ আপনাকে যে নে'মাতসমূহ দান করেছেন, সে জন্য আপনি তাঁর শোকর আদায় করুন।

প্রথমতঃ আপনি জন্মগতভাবে ছিলেন ইয়াতীম, আপনার জীবনের প্রতিটি স্তরে আপনাকে সর্বোত্তম আশ্রয় দান করা হয়েছে। এর শোকর হিসাবে আপনি দুস্থ মানবতাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। আপনি ওহী জ্ঞান বিবর্জিত অবস্থায় ছিলেন, ওহী জ্ঞানের অলঙ্কারে আপনাকে সজ্জিত করা হয়েছে। এর শোকর হিসাবে আপনি মানুষকে মহাসত্যের দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আহ্বান জানাবেন। আমার যেসব বান্দাহ্ পথহারা ভ্রান্ত পথের দিকে ধাবিত হচ্ছে, আপনি অসীম ধৈর্যের সাথে তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন। এই কাজের আঞ্জাম দিতে গিয়ে যেসব তিক্ততা ও দুঃখ-কষ্ট আসবে, আপনি তা পরম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবেন। আপনি প্রতিটি পদক্ষেপে স্মরণ রাখবেন, আপনার কিছুই ছিল না,

বর্তমানে আপনি যা কিছুই লাভ করেছেন, তা সবই আমার দান। আপনার জ্ঞান, ধন-ঐশ্বর্য্য, মেধা, যোগ্যতা সবই আমি দিয়েছি। এসব কিছুই আপনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে আপনি আমার শোকর আদায় করবেন। আপনার প্রতিটি কথা, কাজ ও আচরণের মধ্য দিয়ে শোকর গোজারীর ভাবধারা প্রকাশ পেতে থাকবে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মূর্ত প্রতীক। তাঁকে যে দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেই দায়িত্ব যখন পূর্ণতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হলো, তখন তিনি পৃথিবীর সাধারণ নেতাদের মতো বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেননি। তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনে কোথাও কোন বিচ্যুতি ঘটলো কিনা, এ জন্য তিনি বার বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন। আল্লাহর প্রশংসা আদায়ের মধ্যে তিনি নিজেকে মগ্ন করে দেন। আল্লাহর রাসূল ও পৃথিবীর একজন সাধারণ জননেতার মধ্যে কত বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তা রাসূলের জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিজয়ের আনন্দে উদ্বেল হওয়ার পরিবর্তে সময়ের প্রতি পলকে তাঁর মুখ থেকে মহান আল্লাহর হাম্‌দ ও তাস্‌বীহ্ উচ্চারিত হতো। তিনি মাত্র তেইশ বছরের এক সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি গোটা জাতির চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, আকিদা-বিশ্বাস, দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গি, স্বভাব-প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও সামাজিকতা, কৃষ্টি ও চিন্তাধারা, সামরিক যোগ্যতা ও রাজনীতি, অর্থনীতিসহ যাবতীয় নীতিমালার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। মুর্খতা ও বর্বতায় নিমজ্জিত একটি জাতিকে জাগ্রত করে তিনি এতটা যোগ্য বানিয়ে দিলেন যে, তারা পৃথিবীকে জয় করলো এবং বিশ্বজাতিসমূহের অবিসংবাদিত নেতার আসনে আসীন হলো।

কিন্তু যে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এত বিরাট বিপ্লব সাধিত হলো, তিনি কোন আনন্দ উৎবসের আয়োজন করে নিজের গুণ-কীর্তন শোনেননি। চারদিকে প্রশংসার প্লাবন বইয়ে দেননি। তিনি শুধু মহান আল্লাহর দরবারে মাথানত করে দিয়ে বার বার নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। নিজের ভুল-ক্রটি আর দুর্বলতার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন আর আপন প্রভুর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করেছেন। এভাবেই তিনি মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ, 'তুমি তোমার মালিকের অনুগ্রহসমূহ বর্ণনা করে যাও'– পালন করেছেন।

সূরা আলাম–নাশরাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৯৪

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতের 'আলাম নাশ্‌রাহ্‌' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরার মূল বিষয়বস্তু এর পূর্বেকার সূরা দোহার প্রায় অনুরূপ। এ জন্য গবেষকগণ বলেন, সূরা দোহা এবং এই সূরাটি প্রায় একই সময়ে একই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। রাইসুল মুফাচ্ছিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বর্ণনা করেছেন, এই সূরাটি মক্কায় সূরা দুহার পরই অবতীর্ণ হয়েছে।

এই সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়াবলী অনুধাবন করতে হলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবন সামনে রাখতে হবে। নবুওয়াত লাভ করার পরে তিনি যখন দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন, তখন যে পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়েছিলেন, ক্ষণপূর্বেও তিনি তাঁর কল্পনাতেও ছিল না যে, দাওয়াতী কাজ শুরু করার সাথে সাথে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে। মানুষদেরকে তিনি যখন জানিয়ে দিলেনে তাঁকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে ও তাঁর ওপরে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে এবং কোরআনের শিক্ষা হলো সমস্ত মানুষ একমাত্র আল্লাহর গোলামী করবে, এই কথা ঘোষণা করার সাথে সাথে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ এবং গোটা জাতি তাঁর দুশমনে পরিণত হলো।

অথচ এই আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও জাতির কাছে সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার আসনটি ছিল একান্তভাবেই শুধু তাঁরই। সকলের কাছে তিনি ছিলেন অসীম স্নেহ আর ভালোভাসার পাত্র। সবার কাছে তিনি ছিলেন আল আমীন। যখনই তিনি নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন, তখনই সবার কাছে তিনি হয়ে গেলেন চরম দুশমন। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হলো তাঁর প্রাপ্য। সমাজ দেশ ও জাতি তাঁর ওপরে বিপদ-মসবিতের পাহাড় চাপিয়ে দিল। সময়ের ব্যবধানে যদিও তিনি যে কোন ধরনের অবস্থার মোকবেলা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এই অবস্থা তাঁর জন্য বড়ই হতাশা-ব্যঞ্জক ও মর্মযন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে উৎসাহ, উদ্দিপনা, অনুপ্রেরণা ও তাঁর ভেতরে অসীম সাহস সঞ্চারের লক্ষ্যেই এই সূরায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেয়া হয়েছে।

তিনি ছিলেন ওহী জ্ঞান বিবর্জিত, তাঁর বক্ষকে ওহী জ্ঞান ধারনের উপযোগী করা হয়েছে। নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে গোটা মানবতাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখে তাঁর মনে যে বেদনার উদ্রেক হতো, তা দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সবর্ত্র তাঁর প্রশংসা উচ্চকিত করা হয়েছে। এই ধরনের নে'মাত পৃথিবীর কোন মানুষ কখনো না ইতিপূর্বে লাভ করেছে আর না পরবর্তীতে লাভ করবে। এসব কথা রাসূলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ভেতরে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন এবং কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ময়দানে অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহস যুগিয়েছেন।

রাসূলকে যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হচ্ছিলো, সেই পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, যে কঠিন অবস্থার মোকাবেলা আপনাকে করতে হচ্ছে, এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হবে না। আর এই পথের দাবিই হলো প্রথম দিকে এই অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই পরিবেশ পরিস্থিতিকে সাহসের মোকাবেলা করতে হলে রসদ প্রয়োজন এবং সে রসদ লাভ করা যাবে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে। এ জন্য আপনি একগ্রাচিত্তে ঐ আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করুন, যিনি আপনাকে এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ করে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দেবেন। ❒

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) (হে মুহাম্মাদ,) আমি কি (জ্ঞান ধারনের জন্যে) তোমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) (হ্যাঁ) আমিই তোমার ওপর থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, (৩) (এমন একটি বোঝা) যা তোমার কোমরকে নুয়ে দিচ্ছিলো, (৪) আমিই তোমরার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি? (৫) (মনে রেখো) কষ্টের সাথে অবশ্যই আরামের ব্যবস্থা আছে। (৬) নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম। (৭) অতপর যখনি তুমি অবসর পাবে, তখনি তুমি (ইবাদাতে) পরিশ্রমে লেগে যেও, (৮) নিজে সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী হয়ে যাও।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

যাকে যে পদে অধিষ্ঠিত করা হয়, সে পদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তার যদি কোন ধারণা না থাকে তাহলে সে ব্যক্তি ঐ দায়িত্ব পালনে অবশ্যই অযোগ্যতার পরিচয় দেবে এতে কোন সন্দেহ নেই। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির ওপরে দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে সে ব্যক্তি এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়বে যে, সে কিভাবে এই বিরাট দায়িত্ব পালন করবে এবং দায়িত্বের ভারে সে নুয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার ক্ষণপূর্বে কল্পনাও করেননি যে, তাঁকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হবে অথবা তিনি নবী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন, এ জাতিয় কোন চিন্তা বা ধ্যান-ধারণা তাঁর ভেতরে কখনোই ছিল না। নবী হিসাবে তাঁকে যখন নির্বাচিত করা হলো এবং ময়দানে যখন তিনি তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অগ্রসর হলেন, তখন ময়দানের বাস্তব পরিস্থিতি অবলোকন করে তিনি চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। একটি মাত্র চিন্তাই তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছিল যে, তিনি কিভাবে এই গুরুদায়িত্ব পালন করবেন!

যে দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এবং এই দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কোন মানুষ তাঁকে পরামর্শ দেবে, এমন একজন মানুষেরও কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। তাহলে তিনি কিভাবে প্রতিকূল ময়দানে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করবেন! গোটা পৃথিবী যেখানে শির্ক আর মূর্তিপূজায় লিপ্ত, চারদিকে পথভ্রষ্টতা পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত। এক গভীর অন্ধকার–অমাবশ্যার কালো রজনীর তমসাবৃত অন্ধকার। যে অন্ধকার ছেয়ে নিয়েছিল ঐ জনপদের জীবনধারার সমস্ত অঙ্গনকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল চরম অস্থিরতার নৈরাজ্য, অর্থনীতিতে সুদের নির্মম শোষণ, নৈতিক অবক্ষয়ের এমন এক চরম অবস্থা বিরাজ করছিল,

মদ-নারী ও যুদ্ধ যাদের অস্থিমজ্জায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। গোটা মানবতা দাঁড়িয়েছিল ধ্বংসের বেলাভূমিতে এসে। মানব সমস্যার জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির অন্বেষায় তিনি এত অস্থির হয়ে পড়লেন যে, চিন্তার ভারী বোঝা যেন তাঁর পাঁজর ভেঙ্গে দিচ্ছিলো। এরপরই তাঁর ওপরে বিচ্ছুরিত হলো হেদায়াতের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধুর বক্ষ উন্মোচন করে দিলেন। যে দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করা হয়েছিল, সে দায়িত্ব পালনের উপযোগী তাঁকে করা হলো। বিশ্ব নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী তাঁর ভেতরে প্রবিষ্ট করে দেয়া হলো। যে দায়িত্ব তিনি পালন করার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন, সেই দায়িত্ব সম্পর্কিত যাবতীয় যোগ্যতা ও জ্ঞানের অলঙ্কারে তাঁকে সজ্জিত করা হলো। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতিকূল ময়দানে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে তিনি আন্দোলনকে বিজয়ের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাবেন, সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য তাঁকে অবগত করা হলো। এই কথাগুলোই মহান আল্লাহ তা'য়ালা **আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে** তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'হে নবী! আমি কি জ্ঞান ধারনের জন্যে তোমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেইনি? হ্যাঁ আমিই তোমার ওপর থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, এমন একটি বোঝা যা তোমার কোমরকে নুয়ে দিচ্ছিলো।'

অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলে, আমিই তোমাকে সেই বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছি। যে যোগ্যতা তোমার ভেতরে ছিল না, আমিই সে যোগ্যতা তোমার ভেতরে দিয়েছি। তুমি যে কাজের অনুপযুক্ত ছিলে, আমিই তোমাকে সেই কাজের উপযুক্ত করে গড়েছি। কোন পথ অবলম্বন করলে আর্তমানবতা মুক্তি লাভ করবে, এই চিন্তায় তুমি ব্যাকুল হয়েছিলে, আমি তোমাকে সেই পথ প্রদর্শন করেছি। সত্য পথের সন্ধানে তুমি অস্থির হয়েছিলে, আমিই তোমাকে সত্য প্রদর্শন করেছি। আমিই তোমার ভেতরে অপূর্ব সাহসিকতা, দৃঢ় মনোবল, বিজয়ের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় এবং হৃদয়ের উদারতা ও প্রশান্তি দান করেছি। তোমাকে অসীম জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির অধিকারী বানিয়েছি আমি। আমিই তোমাকে অতুলনীয় কর্মকুশলতা ও সুক্ষ্ম বিবেচনা শক্তি দান করেছি। এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাহায্যেই তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে, বিপর্যয় দূর করে সমস্ত কিছু সঠিক ও সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলবে।

জাহিলিয়াতের সূচিভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত চরম পর্যায়ের মূর্খ ও বর্বর সমাজের মধ্যে কোন ধরনের উপায়-উপকরণের বা বাহ্যিক কোন পৃষ্ঠপোষক শক্তির সামান্যতম সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীতই তুমি তাওহীদের মশাল জ্বালাতে সক্ষম হবে। আন্দোলনের ময়দানে তুমি অকুতোভয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে বাতিলের মোকাবেলা করে বাতিলকে দু'পায়ের নিচে কবরস্থ করতে তুমিই সক্ষম হবে। কেননা তোমার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তোমার জন্য অপরিহার্য ছিল। আমিই তোমার ভেতরে এসব কিছুই দান করেছি। তোমার সামনে যেসব বাধা ছিল, আমিই তা অপসারণ করে দিয়েছি। সুতরাং আন্দোলনের ময়দান উত্তপ্ত দেখে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই, জ্ঞান আর কৌশলের অস্ত্রে তুমি সজ্জিত, এখন সামনের দিকেই দৃঢ়পদে অগ্রসর হও।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, রাসূলের ওপরে এক দুর্বহ বোঝা চেপে ছিল, আল্লাহ তা'য়ালা সেই বোঝা অপসারণ করেছেন। সেই ভারী দুর্বহ বোঝা ছিল, চিন্তা-ভাবনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং মনের অস্থিরতা। আল্লাহর রাসূল নিজ জাতির মুর্খতা, বর্বরতা, অজ্ঞতা দেখে তাঁর তীব্র অনুভূতিশীল হৃদয়ের ওপর সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মারাত্মক চাপ অনুভব করতেন। কারণ তাঁর সামনেই প্রকাশ্যে প্রতিটি ঘরে ঘরে মূর্তিপূজা অনুষ্ঠিত হতো। শিরক ও পৌত্তলিক প্রথা এবং

কুসংস্কারের প্লাবন বয়ে যেতো। নৈতিক অবক্ষয়, পাপ-পঙ্কিলতা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা গোটা সমাজ দেহে এক মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। সামাজিক অত্যাচার-অনাচার, অবিচার, অন্যায়, পারস্পরিক কর্মকান্ডে, লেনদেনের সম্পর্ক রক্ষায় এক ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। শক্তিমানদের পদতলে শক্তিহীনরা নিদারুণভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছিলো। কন্যা সন্তানকে এক চরম আপদ মনে করে জীবন্ত প্রোথিত করা হচ্ছিলো। তুচ্ছ কারণে এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপরে সর্বগ্রাসী আক্রমণ পরিচালিত করতো। অকারণ প্রতিশোধ স্পৃহা গোটা জাতিকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, প্রতিশোধমূলক যুদ্ধ শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে চলতো।

সমাজের কারো জান-মালের সামান্যতম নিরাপত্তা ছিল না। এমন কোন বিপর্যয় ছিল না যে, তা সে সমাজকে গ্রাস করেনি। এই অবস্থা দেখে মানবতার মহান মুক্তির দুত চরমভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। চিন্তার অকুল সমুদ্রে তিনি নিমজ্জিত ছিলেন। ভেবে পাচ্ছিলেন না, কিভাবে তিনি মানবতাকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করবেন। এই চিন্তায় ছিল তাঁর ওপরে এমন এক বোঝা, যে বোঝার ভারে তিনি আক্রান্ত ছিলেন এবং তিনি যেন নুয়ে পড়ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াতের পদে বরণ করে নিয়ে মানব মুক্তির মহাসনদ তাঁকে দান করলেন। আর এভাবেই তাঁর ওপর থেকে দুর্বহ সেই বোঝা অপসারিত হয়েছিল। তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত নামক মহামূল্যবান চাবি মহান আল্লাহ রাসূলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলেন, এই চাবির সাহায্যেই ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত মানবতা পুনরায় সম্মানের আসনে আসীন হতে সক্ষম হবে। মানব জীবনের সর্বদিকে কল্যাণ ও সফলতার রাজপথ উন্মুক্ত করা যেতে পারে কেবলমাত্র এই চাবির সাহায্যে। বর্তমানেও যারা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে দিবারাতির অহর্নিশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তারাও এই চাবি ব্যতীত ভিন্ন কোন পথে মানবতাকে মুক্তি দিতে কখনোই সক্ষম হবেন না এবং এই চাবির কোন বিকল্প নেই–এ কথা চিরন্তন সত্য।

এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, **'আমিই তোমরার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি?'** অর্থাৎ একমাত্র আমিই আপনার নামটি গোটা পৃথিবীময় উচ্চকিত করেছি–সর্বত্র প্রশংসা আর শ্রদ্ধাভরে আপনার নামটি উচ্চারণের ব্যবস্থা আমিই করেছি। এ কথাটি মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে যে সময়ে বলেছিলেন, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, একক ও নিঃসঙ্গ একজন মানুষের সাথে সামান্য কয়েকজন প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন লোক রয়েছে এবং যাদের অবস্থান মাত্র মক্কা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই লোকের প্রশংসা, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা কিভাবে গোটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে! কিভাবে মানুষ পৃথিবী ধ্বংস হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর নামটি সবচেয়ে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করবে! কিন্তু মানুষ যা কল্পনা করতে অক্ষম, মহান আল্লাহ এক বিস্ময়কর পদ্ধতিতে সেটাই বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করলেন স্বয়ং তাঁরই শত্রুদের মাধ্যমে। কিভাবে সেটা করলেন, তার একটি পটভূমি রয়েছে।

সে পটভূমির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হচ্ছে তবুও তাঁকে দ্বীনি আন্দোলন থেকে বিরত করা যাচ্ছে না, এ কারণে ইসলাম বিরোধী নেতৃত্বের মনে ধারণা হলো নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ একটা কিছু অর্জন করতে চায় এ কারণে সে এবং তাঁর অনুসারীরা নির্যাতন সহ্য করেও তাদের কার্যক্রমে বিরতি দিচ্ছে না এবং আদর্শ ত্যাগ করছে না। এই অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে ইসলাম বিরোধিদের নেতা ওতবা ইবনে রাবিয়া নবীর কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'হে মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ! বলো তো, প্রকৃত পক্ষে তোমার মনের ইচ্ছাটা কি ? যদি মক্কার নেতৃত্ব কামনা করো তাহলে তা গ্রহণ করতে পারো। যদি আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়ে কামনা করো তাহলে আমরা ব্যবস্থা করে দেব। গোটা মক্কার ধন রত্ন চাও আমরা তোমার সামনে এনে দিচ্ছি। তবুও তুমি যা বলছো তা থেকে বিরত হও।'

বিশ্বমানবতার মহান মুক্তির দূত নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা না বলে পবিত্র কোরআনের একটা আয়াত তাকে শুনিয়ে দিলেন। আয়াতের অর্থ হলো, 'হে রাসুল ! আপনি বলে দিন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে মহান আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না। তোমরা তাকেই অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করো। আপনি আরো তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে অস্বীকার করো ? যিনি মুহূর্ত কালের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর সাথেই তোমরা অংশীদার স্থাপন করছো ? তিনিই হলেন গোটা পৃথিবীর প্রতিপালক।' বিশ্বনবীর মুখে পবিত্র কোরআন শুনে ওতবা থরথর করে সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তাঁর মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বের হয়নি। দ্রুত সে বিশ্বনবীর সামনে থেকে সরে পড়েছিল।

পবিত্র কোরআন শুনে ওতবা ইবনে রাবিয়ার ভেতরের জগৎ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। সে কুরাইশদের অন্যান্য নেতাদের বলেছিল, 'আমি নিজের কানে শুনে এসেছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা পড়েছে তা কোন কবির কবিতা নয়। সে যে কি পড়লো তা আমার বুঝে আসছে না। তোমাদের কাছে আমার পরামর্শ হলো, সে যা করছে তাতে তোমরা তাকে বাধা দিওনা। যদি সে তাঁর কাজে সফল হয়ে গোটা আরবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বিজয়ী হয় তাহলে তোমাদেরই সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আর তা করতে না পারলে সে নিজেই একদিন শেষ হয়ে যাবে।'

কিন্তু ওতবার পরামর্শ কোন নেতা গ্রহণ না করে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল। ইতিমধ্যে হজ্জের সময় উপস্থিত হলো। কুরাইশ নেতারা প্রবীণ ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার কাছে এলো পরামর্শের জন্য। সে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে বললো, 'হজ্জের সময় এসেছে। চারদিক থেকে লোকজন এখানে আসবে। তাঁদের কানে এর মধ্যেই মুহাম্মাদের কথা পৌঁছেছে। এখন তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে একমত হও। তাঁর সম্পর্কে সবাইকে একই কথা বলতে হবে। আমাদের পরস্পরের কথা যেন মানুষের কাছে দু'ধরণের হয়ে না যায়। তাহলে মানুষ আমাদের কথা মিথ্যা মনে করবে। আমরা সবাই তাঁর সম্পর্কে একই কথা বলবো।'

সমবেত লোকজন ওয়ালিদকে জানালো, 'কি কথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে বলতে হবে তা আপনিই আমাদেরকে বলে দিন। আপনার শেখানো কথাই আমরা সবার সামনে বলবো।'

কিন্তু আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে কি কথা যে বলতে হবে দীর্ঘক্ষণের চেষ্টাতেও ওয়ালিদের মাথা থেকে বের হলো না। অবশেষে সে উপস্থিত নেতাদেরকে জানালো, 'তোমরাই পরামর্শ দাও তাঁর সম্পর্কে কি কথা বলা যায় ?'

কয়েকজন বললো, 'আমরা মানুষদের কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানাবো সে একজন গণক।' ওয়ালিদ এ কথায় একমত না হয়ে বললো, 'মানুষ বহু গণককে দেখেছে, গণকদের কথা থাকে ইশারা ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কোন একটি কথাও গণকের মত নয়।'এবার কয়েকজন পরামর্শ দিল, 'তাকে পাগল হিসাবে পরিচিত করা হোক।'

ওয়ালিদ প্রতিবাদ করে বললো, 'অসম্ভব! তাকে পাগল বললে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, বরং আমাদেরকেই মানুষ পাগল ঠাওরাবে। মানুষ বহু পাগল দেখেছে। তাঁর কোন একটি কথাও পাগলের মত নয়। পাগলদের একটি কথার সাথে আরেকটি কথার কোন সামঞ্জস্য থাকে না, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা একটির সাথে আরেকটির অদ্ভূত সামঞ্জস্য রয়েছে।'

এবার কয়েকজন পরামর্শ দিল, 'তাকে কবি হিসাবে পরিচিত করা যায়।' ওয়ালিদ পুনরায় অস্বীকার করে বললো, 'না, তাকে কবি বলা যায় না। এদিকের মানুষ কবিদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। নানা ধরণের কবিতার সাথে তাঁরা পরিচিত। তাঁর কোন একটি কথাও কোন কবির মত নয়।' এবার অনেকে পরামর্শ দিল, 'তাকে যাদুকর হিসাবে সবার কাছে পরিচিত করা হোক।'

ওয়ালিদ বললো, 'মানুষ নানা ধরনের যাদুকরের সাথে ও যাদুর সাথে পরিচিত। যাদুকরেরা যেমন সুতার গিরায় ফুঁক দেয়, ঝাড়ফুঁক করে, তাবিজ কবজ দেয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে ধরনের কোন কাজ করেন না।' এবার সবাই বললো, 'তাহলে আপনি যা বলতে চান তাই বলুন।' ওয়ালিদ বললো, 'তাঁর কথার ভেতরে যে মাধুর্যতা আছে এ সম্পর্কে কারো মনে কোন দ্বিধা নেই। তাঁর কথার ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় এবং তাঁর মর্মার্থ অতি গভীরে প্রোথিত। তোমরা তাঁর সম্পর্কে মানুষকে যা বলবে মানুষ তার কোনটাই বিশ্বাস করবে না। আমার মতে তাঁর সম্পর্কে যাদুকর কথাটা বেশী উপযুক্ত। যদিও সে যাদুকর নয় কিন্তু তাঁর কথার ভেতরে যাদুর থেকেও বেশী প্রভাব রয়েছে। তাঁর কথায় সংসারে বিভেদ সৃষ্টি হয়। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, পিতার কাছ থেকে সন্তান পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং তাঁর কথা যাদুর থেকে অধিক কার্যকরী। তাঁর কথার কারণেই আজ আমাদের গোটা জাতির ভেতরে বিভেদ রেখা সৃষ্টি হয়েছে।'

মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী এই কথাই সর্বত্র প্রচার করতে থাকে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একজন যাদুকর। ইসলাম বিরোধী প্রতিনিধিদল হজ্জের মৌসুমে হাজীদের প্রতিটি তাঁবুতে গিয়ে প্রচার করতো, 'আমাদের এখানে মুহাম্মাদ নামক ভয়ঙ্কর ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকর এবং তাঁর যাদুর ক্রিয়া এতই প্রভাবশালী যে, পিতা হতে পুত্রকে, স্বামী থেকে স্ত্রীকে, মা থেকে সন্তানকে এবং ভাই থেকে ভাইকে পৃথক করে দেয়। তোমরা তাঁর ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং তাঁর কোন কথা শুনবে না।' শুধু হাজীদের ক্ষেত্রেই নয়, কা'বাঘর জিয়ারত করতে যারাই আসতো বা ভিন্ন কোন দেশের লোক মক্কায় এলেই তারা তাদেরকে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলে সাবধান করে দিতো।

আল্লাহর রাসূলকে তারা বিভিন্ন ধরনের চিত্রে মানুষের সামনে পেশ করতো। সে যুগে যদি বর্তমান যুগের মতো প্রচার মাধ্যম থাকতো, রেডিও, টেলিভিশন, ডিস এ্যান্টিনা, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি থাকলে এ সমস্ত প্রচার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মানুষ অসংখ্য অর্থহীন, ভিত্তিহীন কথাইনা শোনার দুর্ভাগ্য লাভ করতো। কার্টুনিষ্টরা আল্লাহর রাসূলকে কেন্দ্র করে কত বিকৃত ছবি এঁকে গোটা দেশ ছেয়ে দিত। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন ভিত্তিহীন প্রচার প্রপাগান্ডা চালানো হয় তখন ঐ ব্যক্তির নগদ লাভ যেটা হয় তাহলো, তাঁর সম্পর্কে যাদের সামান্যতম কৌতুহল ছিল না তাঁরাও কৌতুহলী হয়ে ওঠে। তাঁর সম্পর্কে যারা কিছুই জানতো না, তাঁরাও তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাঁর নামটা প্রতিটি মানুষের কানে পৌঁছে যায়, ঘরে ঘরে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে। তাদের এই অপপ্রচারের কারণে ব্যক্তি পরিচিতি লাভ করে।

আল্লাহর রাসূলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামটা এতদিন যারা শোনেনি, এবার তাঁরাও নামটা শুনলো। সর্বত্র তাঁর সম্পর্কে একটা গুঞ্জন সৃষ্টি হলো। নির্বোধ আর জ্ঞানান্ধ যারা, তাঁরা হয়ত অর্থহীন মন্তব্য করলো। কিন্তু যাদের হৃদয় জীবিত, যুক্তিতে যারা বিশ্বাসী, সত্য উদ্ঘাটনে যারা আগ্রহী তাঁরা নীরবে প্রকৃত সত্য অবগত হবার লক্ষ্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এগিয়ে এলো। প্রকৃত সত্য অবগত হলো এবং যারা সৌভাগ্যবান ছিল তাঁরা মহাসত্য ইসলাম কবুল করে আল্লাহর বান্দায় পরিণত হলো। আর যারা ছিল হতভাগা তাঁরা প্রকৃত সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হলো। ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিটি যুগেই সমস্ত নবীদের সাথে, ইসলামের বাহকদের সাথে একই আচরণ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার করা হয়েছে। কোন একজন নবীও বিরোধী শক্তির অপপ্রচারের কবল থেকে মুক্ত ছিলেন না। বর্তমানেও যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছেন তাঁরাও অপবাদ মুক্ত নন। তাদেরকেও বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর এই অপতৎপরতা ছিল কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে। কিন্তু তাদের এই অপতৎপরতার ফল হলো সম্পূর্ণ উল্টো। রাসূলের নামে অপবাদ দিয়ে লোকদেরকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হলো, অথচ এই প্রক্রিয়ায় তাঁর পবিত্র নামটি আরবের প্রতিটি গৃহকোণে পৌঁছে গেল। মক্কার ক্ষুদ্র অপরিচিত গন্ডির মধ্য থেকে বের করে তাঁকে আরবের সমগ্র গোত্র ও গোষ্ঠীর কাছে পরিচিত করে তুললো ইসলামের এই শক্ররাই। এরপর স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে কৌতুহল সৃষ্টি হলো। লোকজন পরস্পরে প্রশ্ন করতে থাকলো, কে এই মুহাম্মাদ? কোন ধরনের লোক সে? মানুষ কেন তাঁর কথায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে? তাঁর কথা কেন এতটা প্রভাবশীল? মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যতোই অপবাদের অস্ত্র শানিত করলো, সাধারণ মানুষের মনে তাঁর সম্পর্কে জানার কৌতুহলও ততোই অদম্য হয়ে উঠলো।

সাধারণ মানুষ আল্লাহর রাসূলের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করলো। মানুষ যখন নিজের কানে রাসূলের কণ্ঠে আল্লাহর কোরআন শুনলো, তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হলো, যে জিনিসকে বিরোধী পক্ষ যাদু বলে তাদের কাছে পরিচিত করেছিল সেই জিনিসে প্রভাবিত লোকদের জীবনধারা ও স্বভাব-চরিত্র আরবের সাধারণ লোকদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখতে পেলো, তখন বিরোধী পক্ষের প্রচারিত অপবাদ, দুর্ণামই প্রশংসা, যশ ও সুখ্যাতি হিসাবে দেখা দিলো। মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থা এমন হলো যে, দূরের ও কাছের আরব গোত্রসমূহের প্রত্যেকটিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। এমন একটি গোত্রের অস্তিত্ব ছিল না, যে গোত্রের দু'চারজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। প্রতিটি গোত্র ও গোষ্ঠীতেই রাসূলের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকের অস্তিত্ব তৈরী হয়ে গেল। আর এভাবেই মহান আল্লাহ বিশ্বনবীর পবিত্র নামটি প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চকিত করেছিলেন।

হিজরতের পরে মদীনায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর সুষমামন্ডিত নামটি আরব জাহানের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। পৃথিবীতে অবস্থানকালেই তিনি দেখলেন, মহান আল্লাহ কিভাবে তাঁর নামটিকে প্রতিটি জনপদে পৌঁছে দিয়েছেন। প্রতিটি স্থানে গোপনে প্রকাশ্যে, নীরবে নির্জনে মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে মমতা জড়িত ভাষায় কিভাবে তাঁর নামটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে, তা তিনি জীবিত থাকাবস্থায়ই দেখে

গেলেন। এরপর তাঁর বিদায়ের পরে তাঁরই অনুগত সাহাবাগণ তাঁরই আনিত আদর্শ নিয়ে গোটা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লো। পৃথিবীর আনাচে কানাচে প্রতিটি জনপদে 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' নামটি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে উচ্চারিত হতে থাকলো। বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত তা অব্যাহত গতিতে উচ্চারিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা হতেই থাকবে।

কোথায় নেই তাঁর পবিত্র নামের পরশ। গোটা পৃথিবী জুড়ে শুধুমাত্র প্রতিদিন পাঁচবার আজানেই পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' নামটি। অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক এই নামটিকে কত অলঙ্কারেই না সজ্জিত করেছেন। কেউ বলেছেন, এই নামের পবিত্র পরশ পেয়েই বোধহয় গোলাপ অপূর্ব এই সুরভী লাভ করেছে। বুলবুলী আর কোকিল ঐ নামের পরশ লাভেই অপূর্ব কণ্ঠ লাভ করেছে। ঐ 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' নামের পরশ ব্যতীত বুলবুলীর গান আর কোকিলের গুঞ্জনই বৃথা, ফুলের বাগানে আবদ্ধ কলির হাসিও বৃথা। বেগবান বন্যার অপ্রতিরোধ্য গতির মতোই 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' নামটি জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সুদূর চাঁদের বুকেও 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' নামটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে–নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং যা স্বকর্ণে শ্রবণ করেছেন। পৃথিবীতে মসজিদ আর মুসলমানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে আর সেই সাথে অসীম মমতায় উচ্চারিত হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' নামটি।

অমুসলিমদের মধ্যে বিখ্যাত অসংখ্য মনীষীগণ, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, ধর্মনেতা, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমরবিদ ইত্যকার বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করে এত প্রশংসা করেছেন যে, তা একত্রিত করলে বিরাট আকারের গ্রন্থ রচিত হবে। ডঃ মাইকেল হার্ট লিখিত দি হান্ড্রেড (The Hundred) নামক গ্রন্থে 'মুহাম্মাদ' নামটিকেই সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয়েছে। গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠসমূহের প্রবেশ পথে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নাম উল্লেখ করে যে নামফলক বা স্মৃতিস্তম্ভ (Epitaph) স্থাপন করা হয়েছে, সে নামফলকের প্রথমেই শ্রেষ্ঠ আইনদাতা (Law Giver) হিসাবে 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' নামটিকেই সর্বপ্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত আজান ও নামাজে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের কথা উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে, তাঁর প্রশংসা বাণী ঘোষণা করা হচ্ছে এবং তাঁর জন্য দোয়া করা হচ্ছে অগণিত কণ্ঠে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল স্বয়ং বলেছেন–'হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে আমাকে জানালেন, আমার রব ও আপনার রব জানতে চেয়েছেন যে, আমি কিভাবে তোমার নামকে উচ্চকিত করে দিয়েছি? আমি বললাম, সেটা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, যখন যেখানেই আমার নাম উচ্চারিত হবে, তখন সেখানেই আমার নামের সাথে তোমার নামও উচ্চারণ করা হবে।' পৃথিবীতে যেখানেই মহান আল্লাহর নাম তাঁর বান্দাহ্রা যখনই উচ্চারণ করছে, তখনই বিশ্বনবীর প্রিয় নামটিও পরম শ্রদ্ধাভরে পাশাপাশি উচ্চারণ করছে। আলোচ্য সূরায় মহান আল্লাহর বলা 'আমিই তোমরার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি' এই কথাটি এভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পৃথিবীতে দিনের পাশাপাশি রাতের অবস্থান করে, অন্ধকারের পাশে আলোর অবস্থান। উষ্ণতার পাশে শীতলতার অবস্থান। দুঃখের পাশেই সুখের অবস্থান। তবে এ বিষয়গুলো মানুষের চেষ্টা-সাধনার সাথে ওৎপ্রোতভবে জড়িত। আল্লাহর কোরআন বলছে, মানুষ যা চেষ্টা

সাধনা করে, মহান আল্লাহ তা দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের পথে যথাযথ পন্থায় চেষ্টা-সাধনা করলে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। রাসূল যে কঠিন পথ অতিক্রম করছিলেন, সেদিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথাটি দু'বার বলা হয়েছে যে, 'মনে রেখো কষ্টের সাথে অবশ্যই আরামের ব্যবস্থা আছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম।' অর্থাৎ নবুওয়াত লাভ করার পরে আন্দোলনের ময়দানে তোমার ওপরে বিপদ মসিবতের যে পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, তোমার সামনে বাধার যে বিন্ধাচল দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, এটা কোন চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। প্রতিটি নবীর সামনেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। অচিরেই সমস্ত বাধা দূরিভূত হবে এবং তুমি শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করবে।

পৃথিবীর প্রতিটি স্থানেই সত্যের পতাকাবাহীরা যেখানেই দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে পা রাখবে, সেখানেই এই অবস্থার সৃষ্টি হবে। সত্য আর মিথ্যার দ্বন্দ্ব এই পৃথিবীতে চিরন্তন নীতি। যেখানে সত্য তার নিজস্ব আলো প্রজ্জ্বলিত করেছে, সেখানেই অন্ধকারপুরের অধিবাসী মিথ্যা শক্তি প্রবল ঝাপটা দিয়ে সত্যের সে আলো নির্বাপিত করতে চেয়েছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে প্রাথমিকভাবে এই অবস্থারই সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে চলার পথ মহান আল্লাহ তা'য়ালা সহজ করে দেন। মনে রাখতে হবে ঝড়ের প্রথম তান্ডব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়। ধীরে ধীরে ঝড়ের তান্ডব হ্রাস পেতে থাকে। প্রাথমিক পরিস্থিতির ভয়বহতা দেখে যদি কেউ আন্দোলনের ময়দান থেকে ছিট্‌কে পড়ে, তাহলে সে অকল্যাণের পথই অবলম্বন করলো। পরবর্তী কালের আরামদায়ক প্রশান্তি তার ভাগ্যে কখনোই জুটবে না। সুতরাং আল্লাহর গোলাম হিসাবে নিজেকে গড়ার প্রাথমিক অবস্থায় এবং দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে পা রাখার সূচনাতে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক মনে হতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করার পরই সাফল্যের সোনালী দ্বারে উপনীত হওয়া যায়।

আন্দোলনের ময়দানে প্রাথমিক অবস্থায় যখন বিপদ মসিবতের যে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে, ইসলাম বিরোধী বাতিল শক্তি প্রবল ঝাপটায় সত্যের আলো নির্বাপিত করার লক্ষ্যে উদ্বাহু নৃত্যে এগিয়ে আসে, এই অবস্থায় মন দুর্বল হওয়া এবং হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এই অবস্থায় ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান করার জন্য মানসিক শক্তি একান্ত প্রয়োজন। বৈষয়িক কোন বস্তুর মাধ্যমে সেই মানসিক শক্তি অর্জন করা যায় না। বিপদ মসিবতের প্রত্যেকটি স্তর অতিক্রম করার মানসিক শক্তি লাভ করতে হলে যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, সেই আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করতে হবে। একমাত্র তাঁরই কাছে করুণা ভিক্ষা ও মানসিক শক্তি, দৃঢ়পদ এবং অজেয় মনোবল চাইতে হবে। সেই কথাটিই আলোচ্য সূরার শেষের দুটো আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে, 'অতপর যখনি তুমি অবসর পাবে, তখনি তুমি ইবাদাতে লেগে যেও, নিজে সম্পূর্ণ আল্লাহমুখী হয়ে যাও।'

বৈষয়িক ঝামেলা থেকে যখন অবসর পাবে, ময়দানে আন্দোলনের কাজ থেকে যখনই ক্ষণিকের জন্য অবসর পাবে, তখনই সেই আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা-সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করবে, যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছো। গভীর রাতে এবং দিনের নির্জন পরিবেশে তাঁর সামনে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়ে, পৃথিবীর সমস্ত দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র মহান প্রভু আল্লাহর দিকে নিজের মনকে

রুজু করে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ো। দেখবে মন থেকে যাবতীয় দুঃখবোধ, হতাশা, ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য, মানসিক যন্ত্রণা, ভয়-ভীতি সমস্ত কিছুই দূর হয়ে যাবে। মনের গহীনে অনুভব করবে অসীম সাহস আর অজেয় মনোবল। বাতিলের প্রবল শক্তিকে তোমার কাছে পানির বুদ্বুদের মতোই মনে হবে। পৃথিবীর কোন শক্তিই তোমার কাছে আর শক্তি বলে মনে হবে না। মিথ্যা শক্তির যাবতীয় বাধা অতিক্রম করে তুমি সামনের দিকেই অপ্রতিরোধ্য বন্যার গতিতেই তুমি এগিয়ে যেতে থাকবে।

মহান আল্লাহর এই কথাটির বাস্তব রূপ আমরা অবলোকন করেছি রাসূলের জীবনে যুদ্ধের ময়দানে। বদরের প্রান্তরে মাত্র তিনশত তেরজন প্রাণ উৎসর্গকারী মুজাহিদ সাথে নিয়ে তিনি বাতিলের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেএক অভাবনীয় দৃশ্য। এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তাওহীদের আওয়াজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এটা যেন নির্ভর করছে এই সামান্য তিনশত তেরজন মানুষের ওপরে। এ কারণেই বুঝি মুসলিম মুজাহিদদের চেহারায় শাহাদাতের অদম্য নেশা। এরা যুদ্ধে এসেছে বাতিল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আল্লাহর যমীনে আল কোরআনের রাজ কায়েম করার জন্য। মানুষকে মানুষের বানানো আইন-কানুনের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করতে। তাদের একমাত্র সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ। আর আল্লাহর ওপরে নির্ভর করেই তাঁরা এসেছেন বদরের প্রান্তরে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

বদরের রণপ্রান্তর। হক ও বাতিলের–দু'পক্ষেরই সৈন্য বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি দন্ডায়মান। সত্যের সামনে মিথ্যা, আলোর সামনে অন্ধকার দন্ডায়মান। উভয় বহিনীর সৈন্যই পরস্পরে পরিচিত। শুধু পরিচিতই নয়–তারা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রক্তের বন্ধনে একে অপরে জড়িত। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে আজ পিতার সাথে পুত্রের। চাচার সাথে ভাতিজার। ছোট ভাইয়ের সাথে বড় ভাইয়ের। সবার হাতেই রক্ত পিপাসু উন্মুক্ত তরবারী। পিতা মহাসত্য আল ইসলামের পক্ষে আর পুত্র বাতিল শক্তি মিথ্যার পক্ষে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে মরণপণ সংঘাত। একজন অপরজনকে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেবার লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বদরের ময়দানে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মোকাবেলা করেছিলেন তাঁর আপন ঔরষজাত সন্তানের সাথে। সে সময় পর্যন্ত তাঁর সন্তান ছিল অমুসলিম। ইসলাম বিরোধিদের সেনাপতি ছিল ওৎবা। বদরের রক্তঝরা ময়দানে সে মোকাবেলা করেছিল তাঁরই ঔরষজাত সন্তান হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর মামাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু কেন–কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পবিত্র রমজান মাসে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে এই প্রাণক্ষয়ী-রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ! এই যুদ্ধের কারণ হলো, মানুষের বানানো মতবাদ মতাদর্শ ও আইন-কানুনের ধারক-বাহকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠাকামীদের এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে। ইসলামী জাগরণের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত মহান নেতা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের চিরদিনের মতই স্তব্দ করে দেয়ার জন্য বাতিল শক্তি মরণ কামড় দেয়ার উদ্দেশ্যে মারণাস্ত্র হাতে বদরের প্রান্তরে জমায়েত হয়েছে।

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময়ে বিশ্বনবীর অবস্থা কেমন ছিল। তাঁর গোটা মুখমন্ডলে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের

পূর্ণ অনুরাগ পরিস্ফুটিত হচ্ছিল। একান্ত মনোনিবেশের অবস্থা তাঁর ভেতরে বিরাজিত ছিল। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলছিলেন, 'হে আমার আল্লাহ্ ! আজ তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন করো। আজ যদি তুমি সাহায্য না করো তাহলে এই যমীনে তোমার নাম নেয়ার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।'

কখনো তিনি সিজদায় গিয়ে বলছিলেন, 'আজ তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ করো। হে আমার আল্লাহ ! আজ যদি তোমার এই সামান্য সংখ্যক বান্দাহ্ এই ময়দানে বাতিলের হাতে শেষ হয়ে যায়, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার এই পৃথিবীতে তোমার দাসত্ব করার মতো আর কেউ থাকবে না।'

আল্লাহর রাসূলের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাঁর কাঁধ মোবারক থেকে পবিত্র চাদর পড়ে যাচ্ছিল, সেদিকে তাঁর কোন অনুভূতি ছিল না। সাহাবারা নবীর এই অবস্থা দেখছিলেন। নবীর এই ব্যাকুলতা সাহাবাদের মধ্যেও সংক্রামিত হলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবীর এই অবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি এত ব্যাকুল হবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করবেন।' পরবর্তী ইতিহাস শুধুমাত্র বিজয়েরই ইতিহাস। আর এই বিজয় অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে কিভাবে মাত্র গুটি কয়েক মুসলমান বিশাল সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করেছে তা অবলোকন করে। মুসলমানদের বিজয়ের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য তারা গোয়েন্দা পাঠিয়েছে। গোয়েন্দাদল ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করেছে, মুসলিম বাহিনী একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দিনের আলোয় অমিত তেজে বীরবিক্রমে ময়দানে লড়াই করে। রাতে তারা বিশ্রাম গ্রহণ করে না। গভীর রাতে তারা গোটা দিনের যুদ্ধজনিত ক্লান্তি জড়ানো দেহ আরামের শয্যা থেকে উঠিয়ে মহান প্রভু আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যায়। দুচোখের পানি ছেড়ে দিয়ে তারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করতে থাকে। আল্লাহর সাহায্যেই তারা বিজয় অর্জন করে। তাদের দিনের চরিত্র হলো তারা অমিত তেজী বীর-বিক্রমশালী সৈনিক, সিংহ নিনাদে তারা ময়দানে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাদের রাতের চরিত্র হলো দরবেশ। দিনে যুদ্ধের ময়দানে যে শক্তি তারা ব্যয় করে, সেই শক্তির উৎস হলো তাদের রাতের নামাজ। সুতরাং কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ময়দানে যে শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন, সেই শক্তি অর্জন করতে হবে মহান আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে। এ বিষয়েই দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে আলোচ্য সূরার শেষের দুটো আয়াতে।

সূরা আত–তীন

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৯৫

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে, 'আত্ তীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরা অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন মক্কায় আবার কেউ বলেছেন মদীনায়। তবে কোরআনের অধিকাংশ গবেষকগণ এই সূরায় আলোচিত বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে মন্তব্য করেছেন, এ সূরা মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিক দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সময়ে বাতিল শক্তির সাথে ইসলামের তেমন কোন সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি।

সৎকাজের শুভ পরিণতি ও অসৎকাজের অশুভ পরিণতির সত্যতা প্রমাণ করাই এই সূরার মূল আলোচিত বিষয়। ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের মন্দ ফল অবশ্যম্ভাবী–এ কথা প্রমাণ করার জন্য বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদাবান মনীষী নবী-রাসূলদের আগমনের স্থানসমূহের শপথ করে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে যেমন সর্বোত্তম কাঠামোয় সবথেকে সুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার পদ–নবুওয়াতের পদেও মানুষের ভেতর থেকেই অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এভাবে এই মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির ভেতর থেকে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এই মানুষই আপন কর্মগুণে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার এমন অতল দেশে তলিয়ে যায় যে, হিংস্র পশুও অধঃপতনের সে স্তরে পৌছতে সক্ষম নয়। আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা নিজের গঠন কাঠামোর ও পদমর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেকে সর্বোন্নত নৈতিক গুণাবলীতে বিভূষিত করে এমন উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করে, যে স্থানের উপযোগী করেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এক শ্রেণীর মানুষ নিজের অবমূল্যায়ন করে নৈতিক অধঃপতনের শেষ স্তরে নামিয়ে দিল, আর আরেক শ্রেণীর মানুষ নিজের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক থেকে চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেকে পরহেযগারীর উচ্চমার্গে উপনীত করলো, এই দুই শ্রেণীর মানুষের কর্ম বিচার করে কোন ধরনের প্রতিফল দেয়া হবে না, এ ধরনের চিন্তাধারা কোনক্রমেই সঠিক হতে পারে না। মহান আল্লাহ অবশ্যই এই দুই ধরনের কর্মের সঠিক বিচার করে যথাযথ প্রতিফল দান করবেন, কেননা তিনিই হলেন সমস্ত বিচারকের তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) শপথ 'তীন' ও 'যয়তুন'-এর, (২) শপথ সিনাই উপত্যকার, (৩) (আরো) শপথ এই নিরাপদ নগরী মক্কার। (৪) অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি। (৫) তারপর আমি তাকে (আবার) সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করেছি। (৬) কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে এমন সব পুরস্কার, যা কোনদিন শেষ হবে না। (৭) (বলতে পারো,) কোন জিনিস এরপরও তোমাকে শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করাচ্ছে? (৮) আল্লাহ কি সব বিচারকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এই সূরার প্রথম তিন আয়াতে চারটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে। প্রথম শপথ করা হয়েছে আনজির নামক ফলের নামে, দ্বিতীয় শপথ করা হয়েছে যয়তুন ফলের নামে, তৃতীয় শপথ করা হয়েছে সিনাই উপত্যকার নামে এবং চতুর্থ শপথ করা হয়েছে মক্কা নগরীর নামে। তীন এবং যয়তুন বলতে আসলে কি বোঝায়, এ সম্পর্কে মুফাস্সীরদের মধ্যে মতভেদ বিরাজমান। কেউ বলেছেন তীন বলতে আনজির ফলকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষ ভক্ষণ করে। আর যয়তুন হলো সেই ফল যে ফল থেকে যয়তুন তেল নির্গত হয়। কেউ বলেছেন এই ফল দুটো মানব স্বাস্থ্যের জন্য পরম উপকারী বিধায় মহান আল্লাহ এই দুটো ফলের নামে শপথ করেছেন। কেউ বলেছেন তীন ও যয়তুন বলতে মহান আল্লাহ দুটো স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তীন বলতে দেমাশক্ শহর আর যয়তুন বলতে বায়তুল মাকদাসকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন তীন বলতে হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক নির্মিত সেই মসজিদকে বুঝানো হয়েছে, যে মসজিদ তিনি জুদী পর্বতের চূড়ায় নির্মাণ করেছিলেন।

কেউ বলেছেন, যে ফল যে এলাকায় অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই এলাকাকে সেই ফলের নামে নামকরণ করা আরবদের সাধারণ নীতি ছিল। তীন ও যয়তুন ফল সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন এলাকায় অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হতো বিধায় এ দুটো এলাকাকে তীন ও যয়তুন বলা হয়। বিখ্যাত মুফাস্সীরগণ এই মত সমর্থন করেছেন। প্রকৃত সত্য মহান আল্লাহ রাব্বুল

আলামীনই ভালো জানেন। এরপর শপথ করা হয়েছে সিনাই উপত্যকার যেখানে তুর পর্বত অবস্থিত। সর্বশেষ শপথ করা হয়েছে পবিত্র মক্কা নগরীর। এই চারটি জিনিসের **শপথ করে ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,** 'অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি বা সর্বোত্তম কাঠামোয় নির্মাণ করেছি।' অর্থাৎ মানুষকে এমন বিজ্ঞান সম্মত দেহ কাঠামো দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। মানুষের দেহে যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন, সেখানেই তা দান করা হয়েছে।

চোখ দুটো সামনের দিকে কপালের নীচে না দিয়ে মাথার পেছনের দিকে দিলে ভালো হতো, এ কথা বলার মতো নির্বোধ এই পৃথিবীতে নেই। কান দুটো মাথার দু'পাশে না দিয়ে বগলের নীচে দিলে অন্যের কথা শোনার জন্য শরীর থেকে পোষাক খুলে হাত দুটো উঁচু করে শোনা লাগতো। হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের সাথে জোড়া লাগানো থাকলে সুন্দর দেখাতো, এমন কথা বলার মতো পাগল কেউ নেই। সুতরাং মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে শুধুমাত্র সর্বোত্তম দেহ কাঠামোই দান করেননি, সেই সাথে মানুষকে এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। মানুষকে চিন্তা, অনুধাবন, অনুভব, জ্ঞানার্জন এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করার ক্ষমতা দান করেছেন, যা অন্য কোন জীবকে দেয়া হয়নি। জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রয়োগ ও বিবেক পরিচালনের অধিক উন্নত পর্যায়ের যোগ্যতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। আর এই গুণাবলীর কারণেই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়েছে।

পৃথিবীর বুকে মহান আল্লার পক্ষ থেকে সবথেকে সম্মান ও মর্যাদার আসন হলো নবুওয়াত-রেসালাতের আসন। এই আসন কোন ফেরেশ্তাকে না দিয়ে মানুষকে দিয়ে মানব মন্ডলীর সম্মান ও মর্যাদার আসন উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে। আর এ জন্যই মহান আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলদের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্থানসমূহের নামে শপথ করে বলা হয়েছে যে, মানুষকে আমি সুন্দর কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। মানুষের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই মানুষ সর্বাধিক সুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আরবের সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বিশাল এলাকা মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম পর্যন্ত অগণিত নবী-রাসূলের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে। সিনাই উপত্যকায় অবস্থিত তুর পর্বতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছিল। পবিত্র মক্কা নগরীর গোড়া পত্তন ঘটেছিল হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে। পিতা-পুত্রে অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে মক্কা এলাকায় কেন্দ্রীয় শহর গড়ে উঠেছিল।

কোন একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সে আদর্শের ভিত্তিতে একটা সুসংগঠিত দল গঠন করতে হয়। সে দলের একটা কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকে। গোটা দেশে থাকে স্থানীয় কার্যালয়। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত নির্দেশ ঐ স্থানীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় তা ঐ আদর্শের অনুসারী কর্মীগণ বাস্তবায়ন করে থাকেন। তেমনি মুসলিম একটা মিল্লাতের নাম। এই মিল্লাতের আদর্শ হলো ইসলাম। এই মিল্লাতের জাতির পিতার নাম হলো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম। আল্লাহর নির্দেশে তিনি এই মিল্লাতের জন্য একটা কেন্দ্র নির্মাণ করলেন। কেননা, এই মিল্লাতের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, তাঁর আগমনের সময় আগত। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামও তাঁর আগমনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

সুতরাং ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যে ঘর নির্মাণ করলেন তা কোন সাধারণ ঘর ছিল না। এই ঘর প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একটাই ছিল, গোটা বিশ্বে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন এখান থেকেই পরিচালিত হবে-এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখেই হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-ও তাঁর মা'কে জনমানবহীন এই প্রান্তরে রেখে যাওয়া হয়েছিল, ইসমাঈলের কোরবানীও ছিল ঐ একই উদ্দেশ্যে এবং কা'বার নির্মাণও ছিল ঐ একই লক্ষ্যে।

গোটা পৃথিবীতে যারা তাওহীদের মশাল বহন করবে, তারা যেন প্রতি বছরে একবার হজ্জ নামক বিশ্ব সম্মেলনে এসে সমবেত হয়, একত্রে সমস্বরে এক আল্লাহর দাসত্বের ঘোষনা বজ্র কণ্ঠে দিতে পারে, পারস্পরিক পরিচিতি লাভ করতে পারে, একে অপরের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে তা সমাধানের বাস্তব পন্থা অবলম্বন করতে পারে, আল্লাহ বিরোধী শক্তির মোকাবেলা কিভাবে করা যায় এবং গোটা পৃথিবীতে কিভাবে এক আল্লাহর আইন জারি করা যায়-এ সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যেই সেদিন কা'বা নির্মাণ করে আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম সমস্ত মানুষকে সে ঘরের দিকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষনা হলো-

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا-وَاتَّخِذُوْامِنْ مَّقَامِ...اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

এবং স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমি এই ঘরকে (কা'বাকে) জনগণের জন্য কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করলাম এবং আদেশ দিলাম যে, ইবরাহীম যেখানে দাসত্ব করার জন্য দন্ডায়মান হয় সেখানে চিরস্থায়ীভাবে নামাজের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করো। এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিলাম আমার ঘরের প্রদক্ষিণকারী, অবস্থানকারী (এতেকাফকারী) রুকু সেজদাকারীদের জন্য আমার এই ঘরকে পবিত্র রাখো। এবং এ কথাও স্মরণ করো যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই স্থানকে একটা শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দিন এবং এখানের অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদেরকে সব ধরনের ফলের রেজেক দান করো। তাঁর দোয়ার জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন, আর যে আমার বিধান অবিশ্বাস করবে তাকেও আমি কিছুকালের জন্য এসব সামগ্রী দান করবো। এবং স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই ঘরের ভিত গড়ছিল, তখন উভয়েই দোয়া করছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই প্রচেষ্টাকে তুমি কবুল করো; তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছু জানো। হে আমাদের রব্ব! আমাদের উভয়কেই তুমি তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশ থেকে এমন একটা জাতি বের করো যারা তোমারই দাসত্ব করবে। আমাদেরকে তুমি তোমার দাসত্ব করার পদ্ধতি বলে দাও এবং আমাদের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দাও, তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী। হে আমাদের প্রতিপালক! এদের জন্য এদের জাতির ভেতর থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করো যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তাদেরকে (তোমার) কিতাব ও হেকমত শিক্ষাদান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়বেন। নিশ্চয়ই তুমি বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ। (সূরা বাকারা-১২৫-১২৯)

পবিত্র কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে-

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ-فِيْهِ

اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ-وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا-

এ কথা অবশ্যই সত্য যে, মক্কায় অবস্থিত ঘরটিই মানুষের এবাদতের ঘর হিসাবে সর্বপ্রথম বানানো হয়েছে। এ ঘর হচ্ছে বরকতময় এবং গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য হেদায়েতের কেন্দ্র। এতে রয়েছে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থান। এর অবস্থা হলো এই যে, এখানে যে কেউ প্রবেশ করবে সেই নিরাপত্তা লাভ করবে। (ইমরাণ-৯৬-৯৭)

সূরায়ে আনকাবুতে মক্কার এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ-

এরা কি দেখতে পায়নি, আমরা কি ধরণের নিরাপত্তাপূর্ণ হারাম প্রস্তুত করেছি। অথচ তার চারদিকে মানুষকে ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।"(সূরা আনকাবুত-৬৭)

পবিত্র কোরআনে অনেক স্থানেই কা'বাঘর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, এই ঘর বানানোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে। বলা হয়েছে, এই ঘর হলো হেদায়েতের কেন্দ্র, এখান থেকেই একত্ববাদের বাণী গোটা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। এই ঘরকে মহান আল্লাহ এমনই সম্মান ও মর্যাদাদান করেছেন যে, এখানে মানুষ পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। কে না জানে গোটা আরবে হত্যা, নির্যাতন, লুটতরাজ ও যুদ্ধ ছিল নিয়মিত ব্যাপার। কিন্তু সে সময়ের ইতিহাস সাক্ষী, কা'বা এলাকা ছিল নিরাপদ । এখানে প্রাণের শত্রুকেও কেউ কিছুই বলতো না। কা'বা এলাকার ভেতরে নিজের পিতা, আপন ভাই বা মায়ের হত্যাকারীকে আরবের একেবারে পাষাণ, অসভ্য নির্মম কোন লোকও যদি দেখতে পেতো তবুও সে তাকে কিছুই বলতো না। কারণ তাদের কাছে কা'বা ছিল সম্মানিত এলাকা।

যাদের জীবিকা অর্জনের পেশা ছিল জোর পূর্বক অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া, অহেতুক যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে সম্পদ হস্তগত করা, তারাও কোরবানীর পশু দেখলে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিত। গোটা বছরের আটমাস গোটা আরবে রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেও তারা বছরের চারটি মাস কোন ধরণের যুদ্ধ মারামারি করতো না। সে চারটি মাস হলো রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ ও মহররম। অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম নবুওয়াত লাভ করার পরে তিনি তাঁর এলাকার মানুষ ও যারা দূর-দূরান্ত থেকে প্রতি বছর হজ্জ আদায়ের জন্য এবং তাওয়াফ করার জন্য কা'বাঘরে আসতো, তাদের মাঝে তিনি যে মহাসত্যের আলো বিচ্ছুরিত করেছিলেন, তার প্রভাবে কিছু মানুষ আলোকিত হয়েছিল।

বিশ্বনবীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় আড়াই হাজার বছর পরেও হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের শিক্ষার একটা বিরাট প্রভাব গোটা আরব জগতে বিদ্যমান ছিল। যেমন তারা বছরের চারটি মাস ও কোরবানীর পশু এবং কা'বা এলাকাকে সম্মান করতো। তাছাড়া এমন অনেক মানুষের অস্তিত্ব তখন পর্যন্ত ছিল, যারা মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এসবই ছিল আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের ইসলামী কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ ফসল।

সুতরাং এখানে ঐ আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হলো, মানব মন্ডলীকে যেমন আমি সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি, তেমনি তাদের মধ্যে নবুওয়াত, রেসালাতের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন আসনে আসীন লোকদের আগমনও ঘটিয়েছি। মানুষের ভেতরে তাক্ওয়ার যে গুণ রয়েছে, সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য যখন বিকশিত হয়, তখনই মানুষ তার জন্য সংরক্ষিত সম্মান

ও মর্যাদার আসনে আসীন হতে পারে। আর তার ভেতরে যে ফুজুর তথা খারাপ গুণ রয়েছে, সেই পথ অবলম্বন করে যখন সে পশুত্বের নিম্ন স্তরে গিয়ে উপনীত হয়, তখন তার সম্মান ও মর্যাদা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যে মানুষকে এত সুন্দর আকৃতি, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, আবিষ্কার-উদ্ভাবনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেই মানুষ তার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এমন এক নিকৃষ্ট স্তরে গিয়ে উপনীত হয় যে, স্বয়ং পশুও সে স্তরে উপনীত হতে অক্ষম। মানুষকে সর্বোত্তাম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর এই মানুষ যখন নিজের দেহ ও মানসিক শক্তি, জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিকে অন্যায় আর পথভ্রষ্টতার পথে, পাপের পথে প্রয়োগ করে, তখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে সেই অন্যায় ও পথভ্রষ্টতা এবং পাপের পথের যাবতীয় পরিবেশকে তার জন্য অনুকূল করে দেন। এভাবে তাকে অধঃপতনের পথে নীচের দিকে ধাবিত করতে করতে এত দূর নীচে নামিয়ে দেন যে, পৃথিবীর কোন জীবই অতটা নীচের দিকে ধাবিত হতে পারে না।

মানব মন্ডলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এটা একটি রূঢ় বাস্তবতা যে, চরিত্রহীনতা, পরস্বার্থ অপহরণ, আত্মসাৎ, যৌন উন্মাদনা, মাদকাশক্তি, হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা, হঠকারিতা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, ক্রোধের উন্মত্ততা, প্রতিশোধ স্পৃহা ইত্যাদি ধরনের খারাপ গুণাবলী সম্পন্ন লোকজন যে অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হয়, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সে লোকগুলো নীচতার একেবারে শেষ স্তরে পৌছে যায়। মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান পৃথিবীর মানুষের আচরণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, তুচ্ছ কারণে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে হত্যা করে বসে। শক্রতায় এতই অন্ধ হয়ে যায় যে, যে কোন ধরনের ক্ষতি করতে বিবেকে বাধে না। এক জাতি আরেক জাতির প্রতি পাশবিকতার যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তা বনের হিংস্র কোন পশুও প্রদর্শন করতে পারে না। অরণ্যের অধিবাসী হিংস্র জানোয়ার জঠর জ্বালায় আরেক প্রাণীকে হত্যা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। অকারণে এক পশু আরেক পশুকে হত্যা করে না।

কিন্তু এই মানুষ যখন জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বসে, তখন বনের হিংস্র পশুর থেকেও হিংস্র প্রকৃতি ধারণ করে অত্যন্ত নির্মম নিষ্ঠুরভাবে আরেকজন মানুষকে হত্যা করে। বনের হিংস্র স্বভাবের পশুগুলো তার দেহে যা আছে, তারই সাহায্যে অন্য পশুকে বধ করে খায়। নিজের থাবা আর নখর দিয়ে শিকারকে ছিন্নভিন্ন করে। কিন্তু এই মানুষ আরেক মানুষকে হত্যা করার জন্য ভয়ঙ্কর এবং জঘন্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। অপূর্ব সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি এই মানুষ নিজের জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এমন ধরনের মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা দিয়ে মুহূর্তে বর্তমান পৃথিবীর মতো কয়েকটি পৃথিবীকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা যায়। ক্ষণিকের মধ্যে মানুষের এই সুন্দর দেহটাকে ধ্বংস করে বাতাসে মিশিয়ে দেয়া যায়।

জঙ্গলের পশুর আচরণ এমন দেখা যায়নি যে, তারা অন্য পশুকে ধরে একটু একটু করে নির্মম নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করছে। দিনের পর দিন নির্মম অত্যাচার, নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ চালিয়ে আরেকটি পশুকে হত্যা করছে, এমন আচরণ পশু-প্রাণীর ইতিহাসে নেই। কিন্তু এই মানুষ সেই পশু-আচরণকেও পরাজিত করে আরেকটি মানুষকে ধরে দিনের পর দিন নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ চালিয়ে, লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করেছে। এমন ধরনের অস্ত্র সে যুদ্ধের ময়দানে প্রয়োগ করেছে যে, যুগের পর যুগ ধরে অনাগত মানব সভ্যতাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। মানুষ নিজেরই অনুরূপ আরেকজন মানুষকে চরম যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যার ধারণা করাও কোন প্রাণীর পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। পশু

নিজের যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আরেকটি পশুর ওপরে উদগত হয়–কিন্তু তাকে হত্যা করে না। কিন্তু এই মানুষ একটি নারীকে কয়েকজনে মিলে ধর্ষণ করে ধর্ষিতাকে হত্যা করে তার লাশ এমনভাবে বিকৃত করে যে, তাকে আর চেনার উপায়ও থাকে না।

মাতা-পিতার সামনে যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, সন্তানের সামনে মাকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে, মেয়ের সামনে মা'কে ধর্ষণ করে এই মানুষ নামের নরপশু। মায়ের কোল থেকে শিশু সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে পাথরের ওপরে আছড়ে হত্যা করে সেই সন্তানের রক্ত পান করতে মা'কে বাধ্য করে আরেক মানুষ। গর্ভবতীর পেট চিরে সন্তান বের করে পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠে সুন্দর অবয়বধারী এই মানুষ। গোটা মানব বস্তীকে ঘেরাও করে দাহ্য পদার্থ ঢেলে দিয়ে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে সর্বোত্তম কাঠামোয় নির্মিত এই মানুষ। নির্মম আগুনের উত্তাপে জীবন্ত মানুষগুলো যখন মরণ চিৎকার দিতে থাকে, তখন তাদের হত্যাকারী মানুষগুলো মদ্যপ অবস্থায় পাশবিক উল্লাসে অট্টহাস্য করতে থাকে। কোন জীব আরেকটি জীবকে জীবন্ত কবর দেয় না। কিন্তু এই মানুষ আরেকটি মানুষকে জীবন্ত প্রোথিত করে। পশু আর মানুষের ভেতরে যদি উন্মত্ততা, হিংস্রতা আর বর্বরতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতো, তাহলে নিঃসন্দেহে পশু মানুষের অনেক পেছনে পড়ে থাকতো। পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মানুষ যতো মানুষকে হত্যা করেছে, হিংস্র প্রাণী তার এক ভাগও হত্যা করতে সক্ষম হয়নি।

এই মানুষ নীচতার যেদিকেই অগ্রসর হয়েছে, সেদিকেই সে অধঃপতনের শেষ সীমাও অতিক্রম করেছে। আনুগত্যের ক্ষেত্রে এই মানুষ তারই অনুরূপ আরেকজন মানুষের আনুগত্য করে, মানুষের বানানো আইন-কানুন মেনে চলে। অথচ বনের কোন পশু আরেক পশুর আইন মেনে চলে না বা এক পশু আরেক পশুকে তার আইন মেনে চলতে বাধ্যও করে না। ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে এই মানুষ তার থেকেও নিকৃষ্ট সৃষ্টি, গাছ, পাথর এবং পশু-প্রাণীর পূজা করেছে, তাদের সামনে নিজের উঁচু মাথা নত করে দিয়েছে। সামান্য একটি ইঁদুরকেও এই মানুষ নিজের আরধ্য দেবতা বানিয়েছে। এভাবে মানুষ নিচের দিকে নামতে নামতে এতটাই নিচে নেমে গিয়েছে যে, ইবলিস শয়তান এদের কর্মকান্ড দেখে দৌড়ে পালাতে থাকে আর বলতে থাকে, ইন্নি আখাফুল্লাহ্–অর্থাৎ আমি আল্লাহকে ভয় করি।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতেই ভালো এবং মন্দ দুটো গুণাবলী বিদ্যমান, পাপের পথে অগ্রসর হয়ে যারা মন্দ গুণ বিকশিত করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তারাই পশুর থেকেও নিচের স্তরে নেমে গিয়েছে। আর যারা নিজের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল সৎপথে অগ্রসর হয়ে উত্তম গুণাবলীকে বিকশিত হবার সুযোগ দিয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য সূরার ৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎপথ অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য এমন সব নে'মাত নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, যা অফুরন্ত–কোনদিন তা শেষ হবে না।

অর্থাৎ নিজ প্রকৃতিতে, নিজের দেহ সত্তায় অবস্থিত ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে যারা বিকশিত হবার সুযোগ দিয়েছে, মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করেছে, তওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতরে প্রতি ঈমান এনেছে ঈমানের দাবী অনুসারে নিজেদের জীবনকে বিকশিত করেছে, তারা ঘৃণা ও লাঞ্ছনার ধ্বংস গহবরে কখনোই পতিত হবে না। তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন, সেই কাঠামোর

ওপরেই তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। এ কারণেই তারা অশেষ শুভ কর্মফলের অধিকারী হবে। তাদের কর্মের এমন বিনিময় তারা লাভ করবে, যা কখনো শেষ হবে না।

মানব সমাজে এই বিষয়টি চিরন্তন সত্য যে, একদল মানুষ নিজের প্রকৃতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত হবার সুযোগ দিয়েছে আরেক দল মানুষ খারাপ গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত হবার সুযোগ দিয়ে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে পতিত হয়েছে, এ দুটো দল আপন কর্মানুসারে শুভ ও অশুভ প্রতিফল লাভ করবে না, এই চিন্তা মানুষ কিভাবে করতে পারে? পাপী ও অপরাধী লোকগুলো তাদের আপন কর্মের শাস্তি ভোগ করবে না এবং সৎভাবে জীবন-যাপনকারী, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ময়দানে অসীম ত্যাগ স্বীকারকারী লোকগুলো আপন শুভ কর্মের উত্তম বিনিময় লাভ করবে না, এটা যেমন ইনসাফের কথা নয় এবং সুস্থ বিবেক বুদ্ধি এ কথা গ্রহণও করতে পারে না। এই বিষয়ের দিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে-

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ-مَالَكُمْ-كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ-

অনুগত বান্দাহ্দেরকে কি আমি অপরাধীদের অনুরূপ বানিয়ে দেবো? তোমরা কিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলে? (সূরা কলম-৩৫-৩৬)

পরকাল সত্য হওয়ার পক্ষে এটা শক্তিশালী নৈতিক যুক্তি প্রমাণ। নৈতিক চরিত্র ভালো-মন্দ এবং কর্মের মধ্যে সৎ ও অসতের পার্থক্যের অনিবার্য দাবী হলো ভালো এবং মন্দ লোকের পরিণাম এক হবে না বরং এ ক্ষেত্রে সৎলোক তার সৎকাজের ভালো প্রতিদান লাভ করবে এবং অসৎ লোক তার অসৎ কাজের মন্দ ফল লাভ করবে। তা যদি না হয় এবং ভালো ও মন্দের ফলাফল যদি একই ধরনের হয় সে ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্রের ভালো ও মন্দের পার্থক্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে ইনসাফহীনতার অভিযোগ অরোপিত হয়। যারা পৃথিবীতে অন্যায়ের পথে চলে তারা তো অবশ্যই চাইবে যেন কোন প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে। কারণ, এই ধারণাই তাদের আরামকে হারাম করে দেয়। কিন্তু বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহ তা'য়ালার যুক্তিপূর্ণ বিধান ও ন্যায় বিচারের নীতির সাথে এটা আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, তিনি সৎ ও অসৎ উভয় শ্রেণীর মানুষের সাথে একই ধরনের আচরণ করবেন এবং সৎকর্মশীল ঈমানদার ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে কিভাবে জীবন পরিচালিত করেছে আর আল্লাহ বিরোধী অসৎ লোকগুলো কি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তার কিছুই দেখবেন না।

একজন মানুষ বা একটি দল অথবা একটি জাতি গোটা জীবন নিজেদেরকে নৈতিকতার বিধি-বন্ধনে আবদ্ধ রাখলো, অধিকারীর অধিকার আদায় করলো, প্রাপকদের অধিকার বুঝিয়ে দিলো, অবৈধ স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখলো এবং ন্যায় ও সত্যের জন্য নানা ধরনের ক্ষতি সহ্য করলো। আরেক ব্যক্তি বা দল অথবা একটি জাতি সাম্ভাব্য যে কোন উপায়ে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণ করলো। আল্লাহর অধিকার কি তা জানার চেষ্টা করলো না, বান্দাহ্র অধিকারে একের পর এক হস্তক্ষেপ করলো এবং স্বার্থ ও ভোগের উপকরণ যেভাবে সম্ভব দু'হাতে আহরণ করলো। মহান আল্লাহ এই দুই শ্রেণীর মানুষের জীবনের এই পার্থক্য উপেক্ষা করবেন এটা কি তাঁর কাছে আশা করা যায়? আমৃত্যু যে দুই দলের জীবনধারা এই মোহনায় মিলিত হলো না, মৃত্যুর পরে সেই দুই দলের পরিণাম

যদি একই ধরনের হয়, তাহলে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় ইনসাফহীনতা আর কি হতে পারে? পরকালে অবিশ্বাসী ও সন্দেহ সংশয় পোষণকারী লোকদের এই ধরনের চিন্তাধারার প্রতিবাদ করে মহান আল্লাহ্ বলেন–

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ-سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ-سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ-

অসৎ কর্মে জড়িত লোকগুলো কি ধারণা করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের অনুরূপ করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু কি একই ধরনের? এই লোকগুলো খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। (সূরা জাসিয়া-২১)

এ জন্যই আলোচ্য সূরার শেষ দুটো আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ন্যায় পথের পথিক আর অন্যায় পথের পথিক একই পরিণতির সম্মুখিন হবে, এই চিন্তাধারা পোষণ করে প্রকৃত পক্ষে পরকালকেই অস্বীকার করা হচ্ছে এবং মহান আল্লাহর প্রতি ইনসাফহীনতার এক মারাত্মক অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে। পৃথিবীতে মানুষের আদালতে যদি তোমরা ভালো কাজের ভালো ফল আর মন্দ কাজের মন্দ ফল আশা করো, আখেরাতেও অনুরূপ ফল লাভ করবে–এ কথা কেন মেনে নিচ্ছো না? তাহলে কি তোমরা পৃথিবীর মানুষ বিচারপতিকে ইনসাফকারী হিসাবে বিবেচনা করো আর মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারনা করো যে, তিনি ইনসাফ করবেন না? অথচ তিনি হলেন সবচেয়ে বেশী ইনসাফকারী এবং সমস্ত বিচারকের তুলনায় সবথেকে শ্রেষ্ঠ মহান বিচারক। মানুষ বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হতে পারে, ভুল করতে পারে, কোন কিছুর মোহে জুলুমমূলক রায় দিতে পারে, প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে অকারণ দন্ড দিতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা এসব ধরনের দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

সূরা আল–আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৯৬

শানে নুযুল ও সংক্ষীপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে, 'আলাক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহর কোরআনের প্রত্যেক গবেষকই এ ব্যাপারে একমত যে, এই সূরার দুটো অংশ রয়েছে। ১ থেকে ৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত প্রথম অংশ আর ৬ থেকে ১৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ। পবিত্র কোরআনের গবেষকগণ বলেন, প্রথম পাঁচটি আয়াতই সর্বপ্রথম ওহী হিসাবে আল্লাহর রাসূলের ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এই সূরার দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়েছিল সেই সময় যখন আল্লাহর রাসূল পবিত্র কা'বা ঘরে রীতি মতো নামাজ আদায় শুরু করেছিলেন এবং ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা আবু জেহেল হুমকি প্রদর্শন করে তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো।

ওহী নাজিলের সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্জনতা অবলম্বন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তিনি মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে একটা পাহাড়ে চলে যেতেন। সে পর্বতের হেরা নামক গুহায় বিশেষ ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে পড়তেন। এ সময়ে তিনি সত্য এবং সুন্দর স্বপ্ন দেখতেন। তিনি এমন স্বপ্ন দেখতেন তা যেন মনে হত তিনি তা বাস্তবে দেখছেন। পর্বতের গুহায় তিনি ইবাদাতের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বর্ণনায় এসেছে। বুখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, হেরা গুহায় তিনি যে ইবাদাত করতেন তা ছিল চিন্তা গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণ করা। তিনি বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেতেন অথবা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা স্বয়ং গিয়ে দিয়ে আসতেন বা লোক মারফত প্রেরণ করতেন। কোন সময় কয়েকদিনের খাবার তিনি একত্রে নিয়ে যেতেন।

হযরত আয়েশা বলেছেন, মহান আল্লাহ যে সময়ে তাকে অনুগ্রহ করে মানব জাতির জন্য নবী নির্বাচিত করলেন তখন তিনি নবুওয়াতের একটা অংশ হিসাবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে মহান আল্লাহ তাকে নির্জনবাসের প্রতি গভীর আগ্রহী করে তোলেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা দিনের আলোর মতই বাস্তবে পরিণত হত। একাকী কোন নির্জন স্থান সে সময়ে তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আরেকটি বর্ণনায় দেখা যায়, নবুওয়াতের সূচনা লগ্নে তিনি বাইরে বের হলেই কোন নির্জন উপত্যকায় বা কোন নির্জন সমভূমিতে চলে যেতেন। সে সময়ে তিনি কোন জড়পদার্থের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেতেন, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ !

এ কথা শোনার সাথে সাথে তিনি চমকে উঠে তাঁর চারদিকে তাকিয়ে সালাম দাতার সন্ধান করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আশেপাশে গাছ পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। এভাবেই সময় তখন অতিবাহিত হচ্ছিল। গবেষকগণ বলেন, ওহী এবং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে তিনি যেন ধারণ করতে পারেন , এ কারণেই নবুওয়াতের পূর্বে কিছুদিন মহান আল্লাহ এ অবস্থা সৃষ্টি করে তাঁর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন।

হাদীস শরীফে দেখা যায়, যে সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্জনতা অবলম্বন করতেন তখন তিনি প্রচুর দান করতেন। অভাবীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন। বাড়িতে ফিরে আসার সময়ে কা'বাঘরে এসে তিনি সাত বার বা ততোধিক বার তওয়াফ করতেন তারপর বাড়িতে যেতেন। এ সময়ে তিনি যে সমস্ত স্বপ্ন দেখতেন তা শুধু মাত্র সে সময়ের

জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না। এ ধরণের স্বপ্ন নবুওয়াত লাভের পরেও তিনি তাঁর জীবনে বহুবার দেখেছেন। হাদীসে কুদসী নামে যে হাদীসগুলো রয়েছে, তা অনেকই এ পর্যায় ভুক্ত। এ ছাড়াও তাঁর মনে বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নানা কথার উদয় করে দেয়া হত। এরপর সেই রমজান মাসে তিনি হেরা গুহায় চলে গেলেন এবং সেই মহান রাত বিশ্বমানবতার সামনে এসে উপস্থিত হলো, যে রাতে নির্ভুল জীবন বিধান বিশ্বনবীর কাছে অবতীর্ণ হতে থাকলো।

সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এ সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে আমার সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে ছিল একখন্ড রেশমী কাপড়। সে কাপড়ে কিছু লেখা ছিল। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমাকে বললেন, 'পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম আমি পড়তে পারি না। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর সে আলিঙ্গন এমন ছিল যে, আমার মনে হলো আমার প্রাণ বায়ু নির্গত হবে। তিনি আমাকে পুনরায় বললেন, 'পড়ুন'। আমি পূর্ববৎ বললাম, আমি পড়তে পারিনা। তিনি সেই আগের মতই আমাকে এমন জোরে জড়িয়ে ধরলেন যে, এবারেও আমার ধারণা হলো আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আবারও তিনি আমাকে আদেশ করে বললেন, 'পড়ুন'। এবার আমি বললাম, আমি কি পড়বো ? তিনি বললেন, 'পড়ুন আপনার রব-এর নাম সহকারে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিন্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন, আর আপনার রব খুবই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা সে অবগত ছিল না।'

আল্লাহর রাসূল বলেন, 'তিনি যা পড়লেন আমিও তাকে তা পড়ে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি বিদায় নিলেন। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি জাগ্রত হলাম। তখন আমার উপলব্ধি হলো সমস্ত ঘটনাটি এবং যা আমাকে পড়ানো হয়েছিল তা আমার স্মরণে জাগরুক হয়ে আছে।' ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ বলেন, বিশ্বনবীর সাথে বাস্তবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম যে আচরণ করবেন সে আচরণ তাঁর ঘুমের ভেতরে করার অর্থ হলো তা ছিল ঘটিতব্য ঘটনার ভূমিকা।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, এরপর তিনি সে পাহাড়ের গুহা থেকে বের হয়ে এলেন। পাহাড়ের মাঝামাঝি অবস্থানে আসার পরে তিনি তাঁর মাথার ওপর থেকে এক অশ্রুত কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তাকে ডেকে বলা হচ্ছে, 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল!' এ কণ্ঠ শ্রবণ করে তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম একজন অপূর্ব সুন্দর মানুষের আকৃতি ধারণ করে আছেন, কিন্তু তাঁর দুটো পাখা রয়েছে এবং সে পাখা দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

তিনি পুনরায় বললেন, 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরাঈল !' তিনি হযরত জিবরাঈলের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর তিনি আকাশের যেদিকেই দৃষ্টি দিলেন সেদিকেই তাকে দেখতে পেলেন। সমস্ত আকাশ জুড়েই জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিরাজ করতে দেখলেন। তিনি অবিচল থেকে সেই দৃশ্য দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখতে থাকলেন। তিনি তাঁর কদম মোবারক কোন দিকেই সরাতে পারছিলেন না। তিনি দেখছিলেন তাঁর সন্ধানে তাঁর সহধর্মিনী লোক প্রেরণ করেছে, সে লোক তাঁর সন্ধান করছে কিন্তু তিনি সে লোককে বলতে পারলেন না তাঁর নিজের অবস্থানের কথা। লোকটি ফিরে চলে গেল। এরপর আকাশে আর কোন দৃশ্য দেখলেন না। তারপর তিনি ভীত কম্পিত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং হযরত খাদিজাকে বললেন, 'আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও! আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও!'

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলেন। তাঁর ভীত কম্পিত অবস্থার অবসান হলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'হে খাদিজা! আমার এ কি হলো!' তারপর তিনি সমস্ত ঘটনা তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়ে বললেন, 'আমার নিজের জীবনের ভয় হচ্ছে।' হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'অসম্ভব! বরং আপনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর শপথ! আপনাকে আল্লাহ্ কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি সব সময় সত্য কথা বলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করেন, তাদের হক আদায় করেন। মানুষের আমানত প্রত্যার্পণ করেন। অসহায় মানুষের বোঝা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেন। গরীবদেরকে নিজে উপার্জন করে সাহায্য করেন। মেহমানের হক আদায় করেন এবং উত্তম কাজে সহযোগিতা করেন।'

এরপরে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাথে করে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। এ লোক ছিলেন বয়সে বৃদ্ধ ও অন্ধ। তিনি ছিলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার চাচাত ভাই। তিনি পৌত্তলিকতা সহ্য করতে না পেরে পরবর্তীতে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী এবং হিব্রু ভাষায় ইন্‌জিল লিখতেন। হযরত খাদিজা তাকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে সমস্ত ঘটনা জেনে নিলেন।

সবকিছু শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'এ তো সেই ফেরেশতা যাকে মহান আল্লাহ হযরত মুছা আলাইহিস্ সালামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আফসোস! আপনার নবুওয়াত যুগে আমি যদি যুবক থাকতাম ! আফসোস! আপনার জাতি যখন আপনাকে বহিষ্কৃত করবে ! সে সময়ে যদি আমি জীবিত থাকতাম !' তাঁর এ সমস্ত কথা শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, 'আমার জাতি আমাকে বের করে দেবে?' ওয়ারাকা ইবনে নওফেল জানালো, 'অবশ্যই ! আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, এ দায়িত্ব যার ওপরেই অর্পিত হবে অথচ তাঁর সাথে শত্রুতা করা হবে না, এমন কখনো হয়নি। সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো।'

ওহীর সূচনায় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার এ সব ঘটনা অকাট্য এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের আগমনের মুহূর্তকাল পূর্বেও তিনি অবগত ছিলেন না বা কল্পনাও করেননি তাকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নবী পদের জন্য আকাংখা পোষণ করা তো অনেক পরের বিষয়, তাকে নিয়ে এমন ঘটনা ঘটবে এ ধরণের চিন্তাও তাঁর মনে কোনদিন জাগেনি। জিবরাঈলের আগমন তাঁর কাছে ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক বিষয়। এ ধরণের একটা অলৌকিক ঘটনা কোন সাধারণ মানুষের সাথে ঘটলে সে মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হতো, তাঁর মধ্যেও তাই হয়েছে। তাঁর এই প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে যে, তিনি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন।

এ কারণেই দেখা যায়, তিনি যখন দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করলেন, তখন মক্কার লোকজন তাকে বিভিন্ন ধরনের অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করলেও এ কথা তাকে তাঁরা বলেনি, 'আপনি বহুদিন থেকে নবী হবার চেষ্টা সাধনা করছেন এবং একদিন আপনি এমন একটা কিছু দাবী করবেন এটা আমরা জানতাম।' কিন্তু ইতিহাস বলে, তাঁরা এ ধরনের কোন প্রশ্ন কোনদিন করেনি। না করার কারণ হলো, তাদের সামনে বিশ্বনবীর গোটা জীবন ছিল। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁরা তাকে দেখছিল।

তাঁর ভেতরে তাঁরা এমন কোন কিছু দেখেননি, যার কারণে তাদের কাছেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ছিল সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা। ফলে তাঁরা তাকে নানা প্রশ্ন

বাণে জর্জরিত করলেও ঐ প্রশ্ন কখনো করেনি। গোটা পৃথিবীর ভেতরে তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের ব্যক্তিত্ব। এ কারণেও তিনি এক মুহূর্তের জন্যে মনে করেননি, তাঁর মত সৎ এবং পবিত্র মানুষের একটা কিছু হওয়া উচিত। নবী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর মধ্যে সাধারণ কোন নেতা হবার প্রবণতাও ছিল না। তারপর তাঁর ওপরে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পরে তিনি এই গুরু দায়িত্বের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সাধারণ কয়েকজন মানুষের ওপরে নয়, বিশেষ কোন দেশ বা এলাকা অথবা শুধু মক্কার দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পণ করা হয়নি। তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে বিশ্বনবী-বিশ্বনেতা। তিনি শুধু গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য নির্বাচিত হলেন না, সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য নির্বাচিত হলেন। এ যে কত বড় দায়িত্ব তা আমরা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারি না। এই দায়িত্বের কথা চিন্তা করেও তিনি অস্থির ছিলেন।

প্রথম ওহী অবতীর্ণের ঘটনা থেকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ইউরোপিয় গবেষক এবং ঐতিহাসিকদের ছড়ানো কথাবার্তা যে সম্পূর্ণ জঞ্জাল তা স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয়ে যায়। একজন মানুষের চরিত্রের অপ্রকাশিত দিক সম্পর্কে জানার প্রথম সূত্র আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। একজন মানুষের চরিত্র বাইরের জগতের কাছে অদ্ভুত সুন্দর বলে প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু কোন মানুষের চরিত্র তাঁর স্ত্রী এবং একান্ত সেবকের কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। স্বামীর চরিত্রের দুর্বল দিক তাঁর স্ত্রী জানে। স্বামী তাঁর যৌন জীবনে স্ত্রীর কাছে নির্লজ্জ কিনা, লজ্জাশীল কিনা, যৌন জীবনে স্বামী পশুর মত আচরণ করে কিনা, স্ত্রীর সামনে স্বামী বস্ত্রহীন হয়ে পড়ে কিনা, এ সমস্ত দিক বাইরে প্রকাশ না হলেও স্ত্রীর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। ব্যক্তির একান্ত সেবক জানে তাঁর মনিবের অভ্যাস, চলাফেরা, সে কোথায় কোথায় যায়, কি আহার করে, তাঁর আচরণ, কথাবার্তা, ভাষার মাধুর্যতা বা কাঠিন্য ইত্যাদি দিক সম্পর্কে সেবক বাইরের লোকজনের থেকে বেশী জানে।

তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে যদি মানবশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত না হতেন, তাহলে তিনি কোন ক্রমেই ঈমান আনতে পারতেন না। আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কোন অপ্রাপ্ত বয়সের মামুলী নারী ছিলেন না। ইতিপূর্বে তাঁর জীবনে দু'জন স্বামী অতিবাহিত হয়েছে। তিনি আল্লাহর রাসূলকে স্বামীরূপে লাভ করার পূর্বেই আগের স্বামীর সন্তানের জননী ছিলেন। তারপরেও গোটা মক্কায় তাঁর চরিত্র এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে সুনাম ছিল। একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল। অধিক বিচক্ষণ না হলে সাধারণ কোন জ্ঞান নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী হওয়া যায় না। খাদিজা ছিলেন সেই পর্যায়ের ব্যবসায়ী। সুতরাং ব্যক্তি নির্বাচনে তাঁর মত নারী ভুল করতে পারেন না।

প্রতিটি মানুষের জীবনের দুটো দিক থাকে, দুটো চরিত্র থাকে। একটা হলো ব্যক্তিগত দিক বা চরিত্র, আরেকটা হলো সাধারণ দিক বা চরিত্র। Personal character and public character. এ দুটো চরিত্র কোন মানুষের কখনো একই ধরনের হতে পারে না। কিন্তু একমাত্র বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ব্যতিক্রম ধরণের ব্যক্তিত্ব। যার দুটো চরিত্র ছিল না। তাঁর দিনের এবং রাতের চরিত্রে কোনই পার্থক্য ছিল না। তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে আদেশ দিয়েছেন, 'আমি রাতে কি করি এবং দিনে কি করি, সমস্ত কিছুই মানুষকে ডেকে ডেকে জানিয়ে দাও।'

পৃথিবীর বুকে বিশ্বনবীর পূর্বে বা পরে এমন কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিল-না কিয়ামত পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করবে-যিনি তাঁর দাম্পত্য জীবনের সঙ্গিনীকে আদেশ দিবেন, 'তোমরা আমার

দিন রাতের সবদিক সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দাও?' তাঁর চরিত্রে যদি কোন সামান্য কালিমা থাকতো, তাঁর দাম্পত্য জীবনে যদি কোন ধরনের উশৃংখলতা মুহূর্তের জন্যেও হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে প্রকাশ পেতো, তাহলে তিনি তাঁর স্বামীর দাবীর প্রতি তথা নবুওয়াতের প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করতেন না।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার মত একজন বয়স্কা, ঐশ্বর্যশালিনী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, দাম্পত্য জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নারীর সাথে এমন এক ব্যক্তিত্বের বিয়ের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করলেন, যার ছিল না কোন ধন-সম্পদ, বয়সে খাদিজার তুলনায় পনের বছরের ছোট অথচ তাকেই নির্বাচিত করা হবে বিশ্বনবী হিসাবে। এমন একটা অসম বিয়ের ঘটনার মধ্যেও একটা কারণ নিশ্চয়ই নিহিত আছে। গবেষকদের ধারণায় সে কারণ হলো, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের নিষ্কলুষতার দিক। কেননা, খাদিজার কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন একটি দিকও অপ্রকাশিত থাকবে না, অন্য কোন পনের বিশ বছর বা সমবয়স্কা নারীর দৃষ্টিতে যা ধরা পড়তো না, খাদিজার দৃষ্টিতে তা অবশ্যই ধরা পড়তো। এ কারণেই বোধহয় তাঁর মত মহিয়সী অভিজ্ঞতা সম্পন্না নারীকেই মহান আল্লাহ বিশ্বনবীর জন্য স্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। যে নারী দিনের আলোয় এবং রাতের অন্ধকারে অতি কাছ থেকে ঐ মানুষটিকে দীর্ঘ পনের বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, যে মানুষটাকে বিশ্বনবী-বিশ্বনেতা হিসাবে আল্লাহর পক্ষ থেবে নির্বাচিত করা হবে।

একজন মানুষ নিজের স্ত্রী ব্যতীত পরিবারের সমস্ত সদস্য এমন কি পিতা-মাতা ও নিজের সন্তান-সন্ততির কাছেও ভন্ডামি করতে পারে। এ সমস্ত কাজে সে সফলও হতে পারে। কিন্তু নিজের স্ত্রীর কাছে এসব করে সফল হওয়া যায় না। প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, আল্লাহর রাসূলের কথা যে মানুষটি সর্বপ্রথম নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন তাঁর পনের বছরের জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজা। দীর্ঘ পনের বছরে তিনি দেখেছিলেন, এই ব্যক্তিটি কত বিশাল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। দীর্ঘ পনের বছর সংসার ধর্ম পালন করলেন যার সাথে, তাঁর সামান্য কোন ক্রটিও তিনি দেখতে পাননি।

আল্লাহর রাসূলের সাথে ছিলেন তাঁর তের চৌদ্দ বছর বয়সের কন্যা, চাচাত ভাই আলী, যিনি সেই শিশুকাল থেকে বিশ্বনবীর সাথে ছিলেন। হযরত যায়েদ-তিনিও ছিলেন পনের বছর বয়সের। তাঁর একান্ত বন্ধুও ছিল, অসংখ্য আপন আত্মীয়-স্বজন ছিল। প্রাণের দুশমন চাচা আবু লাহাব ছিল। ওরাকা ইবনে নওফল তিনিও ছিলেন মক্কার একজন বৃদ্ধ জ্ঞান তাপস। তিনিও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর শিশুকাল থেকে দেখেছেন। বিশ্বনবীর দাবীর প্রতি তিনিও সামান্য সন্দেহ পোষণ না করে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। তাঁর কাছেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উচ্চ সম্মান এবং মর্যাদা ছিল, তা না হলে তিনি তাঁর ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না।

তাঁর মত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের কাছে ফেরেশতার আগমন এবং তাঁর নবী নির্বাচিত হওয়া ওরাকার কাছে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। তাঁরা কেউ কোন দিন বিশ্বনবীর চরিত্রে সামান্য দুর্বলতা সম্পর্কে কোন কথা উত্থাপন করতে পারেননি। অথচ ইউরোপিয় কোন কোন ঐতিহাসিক-গবেষকদের চোখে বিশ্বনবীর দুর্বলতা আবিষ্কার হলো। হবারই কথা, তাঁরা অতীতেও নিজেদের চরিত্র দিয়ে অপরকে পরিমাপ করেছেন বর্তমানেও করবেন এতে আমাদের অবাক হবার কিছু নেই।

❋

সূরা আলাক–মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-১৯-রুকু-১

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ

الْاَكْرَمُ ۝٣ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ كَلَّآ اِنَّ

الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى ۝٦ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨ اَرَءَيْتَ

الَّذِىْ يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى ۝١١ اَوْ

اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝١٢ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٣ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝١٤

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا ۢ بِالنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۝١٧ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝١٨ كَلَّا ۭ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝١٩

সেজদা

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) (হে মুহাম্মাদ), তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, (২) (যিনি) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, (৩) তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার মালিক বড়োই মেহেরবান। (৪) তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারা (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিখিয়েছেন, (৫) মানুষকে এমন সব কিছু শিখিয়েছেন, যা তিনি (না শেখালে) সে জানতেই পারতো না। (৬) (আর) হ্যাঁ, এই মানুষই (এক সময়) বিদ্রোহে মেতে উঠে। (৭) সে দেখতে পায় তার যেন কোন অভাব নেই। (৮) অথচ (এ নির্বোধ ভেবে দেখে না যে,) একদিন তার মালিকের দিকেই (তার) প্রত্যাবর্তন হবে।

(৯) তুমি কি সেই (দাম্ভিক) ব্যক্তিটিকে দেখেছো যে–সে তাকে বাধা দিলো, (১০) (বাধা দিলো আল্লাহর) এক বান্দাহ্কে যে নামায পড়ছিলো। (১১) তুমি কি তাকে দেখেছো সে বান্দাহ্টি কতোটুকু সঠিক পথের ওপর ছিলো! (১২) কিংবা সে কি (মানুষদের আল্লাহ তা'য়ালাকে) ভয় করার আদেশ দেয়? (১৩) সে ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি মনে করো, যে (আল্লাহকে) অস্বীকার করে এবং (তাঁর থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) এই (দাম্ভিক) লোকটি কি জানে না যে, আল্লাহ তা'য়ালা (তার সব কিছুই) পর্যবেক্ষণ করছেন।

(১৫) (কিছুতেই) না, যদি সে (এ থেকে) ফিরে না আসে, তাহলে তাকে আমি সম্মুখভাগের চুলের গোছা ধরে হেঁচড়াবোই। (১৬) (তুমি জানো, সে কোন্ ব্যক্তি যার চুল ধরে আমি

এভাবে হেঁচড়াবো?) সে হচ্ছে (আমাকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এক না-ফরমান ব্যক্তি। (১৭) (বাঁচার জন্যে পারলে) সে তার সঙ্গী-সাথীদের ডেকে আনুক। (১৮) আমিও তার জন্যে (আযাবের) ফেরেশ্‌তাদের ডাক দেবো। (১৯) না, তুমি কিছুতেই তার অনুসরণ করো না, তুমি (বরং) তোমার মালিকের সামনে সিজ্‌দাবনত হও এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করো।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, 'আপনি পড়ুন আপনার রব-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' এভাবেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রেরিত ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহীর সূচনা করা হলো। সূচনা করা হলো, 'পড়ো' শব্দের মাধ্যমে। রাসূল আগন্তুক দুতের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুটে জবাব দিলেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' আগন্তুক ছিলেন মহান আল্লাহর প্রধান ফেরেশ্‌তা স্বয়ং জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম-যিনি নবী-রাসূলদের কাছে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বাণী বহন করতেন। আল্লাহর দুত তাঁকে বলছেন 'আপনি পড়ুন' আর তিনি বলছেন, 'আমি পড়তে অক্ষম।' উভয়ের বাক্যালাপ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রথম ওহী রাসূলের সামনে লিখিত আকারে পেশ করা হয়েছিল এবং এ কথা সর্বজন বিদিত যে, মহান আল্লাহ যাঁকে বিশ্বনবী তথা বিশ্বনেতৃত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন নিরক্ষর। পৃথিবীর কোন পাঠশালায় তিনি কখনো অক্ষর জ্ঞানার্জন করেননি।

প্রথম ওহীর সূচনা যদি এভাবে হতো যে, 'আমি যা উচ্চারণ করছি, আপনিও আমার সাথে সাথে তাই উচ্চারণ করুন' তাহলে আল্লাহর রাসূল কোন আপত্তি ব্যতীতই ফেরেশ্‌তার সাথে সাথে ওহী উচ্চারণ করে যেতেন। আল্লাহর রাসূল ওহী লিখিত আকারে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আমি পড়তে জানি না।' ইসলাম বিদ্বেষী মহল থেকে প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে যে, তিনি যদি লেখাপড়া না জানতেন, তাহলে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি নিজের নাম কোথায় লেখা আছে এটা দেখে নামের শেষে 'রাসূলাল্লাহ' শব্দটি কেটে 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ' নিজের হাতে লেখলেন কেমন করে?

প্রকৃত ঘটনা ছিল হোয়াদবিয়ার সন্ধির সময় চুক্তিনামায় লেখা হয়েছিল, 'এই চুক্তিনামা মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' মেনে নিয়েছেন।' কুরাইশদের প্রতিনিধি সুহায়েল ইবনে আমর 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' শব্দ লেখা দেখে তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললো, 'আমরা যদি আপনাকে রাসূল হিসাবেই স্বীকৃতি দিতাম তহালে তো এত কিছুর প্রয়োজনই হত না। এই 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' শব্দ আমরা গ্রহণ করতে পারি না। এখানে লেখতে হবে, 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে সুহায়েল ! তুমি অবিশ্বাস করছো ? আল্লাহর কসম ! মহান আল্লাহই আমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।' এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে আদেশ করলেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ'-এর পরিবর্তে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখো।' হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আল্লাহর রাসূলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' শব্দটা তিনি নিজে হাতে মুছে দেবেন? এটা কি সম্ভব? তাঁর শরীরে প্রাণের স্পন্দন থাকা পর্যন্ত 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' শব্দ তিনি নিজের হাতে মুছে ফেলতে পারবেন না। বিনয়ে বিগলিত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মৃদু কণ্ঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার নাম মুছে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবীর মনের অবস্থা অনুভব করলেন। তিনি হযরত আলীকে বললেন, 'কোথায় সেই মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' শব্দটি আমাকে দেখিয়ে দাও, আমিই মুছে দিচ্ছি।' হযরত আলী সন্ধি পত্রের ওপরে 'মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ' শব্দটির ওপরে নিজের হাতের আঙ্গুল রেখে আল্লাহর রাসূলকে দেখিয়ে দিলেন। নবী স্বয়ং তাঁর নামের সাথে 'রাসূলাল্লাহ' শব্দটি মুছে 'ইবনে আব্দুল্লাহ' শব্দ দুটো নিজেই লিখে দিলেন। বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল হোদায়বিয়া সন্ধির সময় নিজের নামের শেষে ইবনে আব্দুল্লাহ শব্দটি নিজের হাতেই লেখেছিলেন।

এ সম্পর্কে আল্লামা শিবলী নোমানী (রাহ). ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, 'লেখা পড়ার কাজ কর্ম যখন দৈনন্দিন জীবন ধারার একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়, তখন লেখা পড়া না জানা একজন মানুষ অন্যের লেখা দেখে নিজের নামের অক্ষর বিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা, নিজের নাম কোন কোন অক্ষরে লেখা যায়, এ সম্পর্কে সেই অক্ষরের সাথে পরিচিত হওয়া অসম্ভবের কিছুই নয়।' প্রকৃত ব্যাপার ছিল এটাই। আল্লাহর রাসূল ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে প্রতি নিয়ত তাঁকে লেখার সাথে পরিচিত হতে হয়েছে। ইতিপূর্বেও তিনি অনেকের সাথে লিখিত সন্ধি করেছেন, এ সমস্ত লেখার সাথে তাঁকে পরিচিত হতে হয়েছে। প্রতিটি কাজই লিখিতভাবে হয়েছে। সুতরাং লেখালেখির পরিবেশে থেকে বিভিন্ন অক্ষরের সাথে পরিচিত হওয়া একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়ত এভাবেই অক্ষরের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। অথবা সেটা ছিল তাঁর শত সহস্র মোজেজার একটি। সুতরাং প্রথম ওহী তাঁর সামনে যেমন লিখিত আকারে পেশ করা হয়েছিল এ কথা যেমন প্রতিষ্ঠিত সত্য তেমনি এ কথাও চিরসত্য যে, আল্লাহর রাসূল ছিলেন নিরক্ষর–উম্মী।

এই কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছে, সেই সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই কোরআনকে সমগ্র মানব জাতির জন্য জীবন বিধান এবং নির্ভুল জ্ঞান-বিজ্ঞানের একমাত্র উৎস হিসাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে। ওহী জ্ঞান বিবর্জিত অবস্থায় জড়বাদ আর বস্তুবাদের ওপরে ভিত্তি করে পৃথিবীতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রচিত হয়েছে, সে শিক্ষার সর্বশেষ স্তরও যারা অতিক্রম করেছে, তারাও মহাসত্যের সন্ধান লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন ও তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে তারা যে জ্ঞানার্জন করলো, তা অসম্পূর্ণ। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথাই জানতে পারেনি। যে স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন, সেই স্রষ্টার কাছে তার যে বড় সম্মান ও মর্যাদার রয়েছে, সে কথাও তাকে এই শিক্ষা ব্যবস্থা জানতে দেয়নি। এর ফলে সে আল্লাহর বিরুদ্ধে নিজেকেই পৃথিবীর 'খোদা' বানিয়ে নিয়েছে। পাগলের মতোই সে চিৎকার করে বলছে, 'আমি মানুষ, এই বিশ্বলোকের সেরা এবং এখানকার যাবতীয় কর্তৃত্ব আমার হাতের মুঠোর মধ্যে, আমিই সমস্ত কিছুর নিরঙ্কুশ ব্যবস্থাপক ও কর্তৃত্বাধিকারী।'

ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে এবং জড়বাদ আর বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তার বিপরীতে উল্লেখিত অর্থহীন প্রলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলো ঠিকই, কিন্তু সে যখনই ওহী ভিত্তিক শিক্ষার বলয় ও ওহীর হেদায়াতের আওতার বাইরে বেরিয়ে এলো, অমনি নিশ্চিত অনিবার্যতার শয়তানেরা তাকে গ্রেফতার করলো, ঘিরে ধরলো কল্পিত দেবতারা। এক আল্লাহর গোলামী করতে হবে–এই শিক্ষার অনুপস্থিতির ফলে মানুষ অসংখ্য প্রভুর গোলামী করতে বাধ্য হলো। এই প্রভুরা মানুষের নাক মাটির সাথে ঘষে

ঘষে তাকে এতটা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে দিয়েছে যে, মানুষ অসহায় অবস্থায় তাদেরই সামনে সিজদায় অবনমিত হতে বাধ্য হয়েছে। মানুষ তার নিজের মধ্যে নিহিত মহাসত্যের পরিচয় লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে-তারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের অস্তিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বস্তুবাদী শিক্ষা তাকে শিখিয়েছে, 'মহাবিশ্বলোকে মানুষের স্থান হীন নগণ্য কীট পতঙ্গের তুলনায় বেশি কিছু নয়।' এই শিক্ষা থেকেই মানুষ নিজকে জন্তু-জানোয়ার ধারণা ও তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে লক্ষ্যহারা হয়ে পড়েছে এবং কার্যতও তারা জন্তু-জানোয়ারের অনুরূপই আচরণ করছে। মানুষ এ কথাও জানতে বুঝতে পারেনি যে ভূপৃষ্ঠের এই সীমিত অবকাশটুকু নিঃশেষ হওয়ার সাথে সাথেই জীবনেরও অবসান হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জীবন যদি এই পৃথিবীতেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তা হবে ছবির একটি অপূর্ণাঙ্গ দিকমাত্র। জীবন ও তার এতসব দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য ও অসীম জুলুম নিপীড়নের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। যদি এখানেই শুরু ও এখানেই সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। কারণ এখানকার এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে প্রকৃত সত্য কি এবং বাতিল কি তা পূর্ণমাত্রায় প্রতিভাত হতে পারে না। তাহলে মানুষের জীবন এতই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায় যে, চিন্তাশীল বিবেকবান কোন মানুষ নিজের জন্যে এমন জীবন কল্পনাও করতে পারে না এবং মহান আল্লাহর পক্ষে মানুষের জন্যে এতটা সীমাবদ্ধ জীবনের ব্যবস্থা হওয়াটা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

মানুষের বানানো শিক্ষা গ্রহণ করার কারণে মানুষের হৃদয় যখন আল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল, ছবি পূর্ণতা লাভের পূর্বেই কেটে ফেলা হলো, যখন তারা এই পৃথিবীর সীমাবদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যেই নিজের দৃষ্টিকে সীমিত করে নিলো, তখন পৃথিবীর জীবনটা তাদের কাছে কুৎসিত হয়ে দেখা দিল। জীবনের যে কোন অর্থ থাকতে পারে, কোন তাৎপর্য থাকতে পারে, তা তাদের বোধগম্য হলো না। তখন তারা দেখতে পেলো যে, এই জীবনটা নিরর্থক ব্যর্থ, তাৎপর্যশূন্য, অস্থিরতা ও অশান্তিতে পরিপূর্ণ। এ অবস্থায় তারা পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর স্বাদ অস্বাদন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। কারণ এটাই হলো তাদের কাছে এক বিলীয়মান মহাসুযোগ। এই সুযোগ হারিয়ে ফেললে তা আর কোনদিনই ফিরে পাওয়া যাবে না-কেননা, জীবন তো এখানেই শেষ। এই জীবনের পরে আরোও কোন জীবন আছে, এই ধারণাই ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হতে দেয়নি। এ কারণেই তথাকথিত শিক্ষিত ও সভ্যতার দাবীদার দেশ ও দেশের অধিকাংশ জনগণের আচরণ, রুচি ও ব্যবহার অরণ্যের হিংস্র পশুর তুলনায়ও নিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছে। এর একমাত্র কারণ হলো ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।

ওহী ভিত্তিক শিক্ষা উপস্থিত না থাকলে মানুষ কোনক্রমেই মানুষ হতে পারে না, মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হতে পারে না, কল্যাণ ধর্মী কোন সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে না এবং অন্যের সাথে মমতাপূর্ণ প্রীতিমূলক কোন ব্যবহারও সে করতে পারে না। বর্তমানে গোটা বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই খোলা চোখেই স্পষ্ট দেখা যাবে, তথাকথিত শিক্ষিত দেশ ও জাতিসমূহ দুর্বল দেশ ও জাতিসমূহের সাথে কি ধরনের পশুসুলভ আচরণ করছে। মানব চরিত্র থেকে এসব অসৎ ও পশুসুলভ আচরণ বিদায় করে মানুষের উন্নত চরিত্রের বিকাশ সাধনের জন্যই ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। এ জন্যই ওহীর সূচনাতেই বলা হয়েছে, 'পড়ো' এবং পড়তে হবে সেই রব্ব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

এ কথা চিরন্তন সত্য যে অজ্ঞতাই পশ্চাদপদতা। অজ্ঞতা মানুষকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়। পড়তে হবে, না পড়লে কোন কিছু জানা অসম্ভব। যত পড়া যাবে, অধ্যয়ন করা যাবে, ততই জ্ঞানের জগতে সমৃদ্ধি ঘটবে। মানুষ হলো পৃথিবীতে জ্ঞানের কুঞ্জবনে এক মধুমক্ষিকা। এখানে সে যতো খুশী জ্ঞানার্জন করবে। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে দশজন লোক উপস্থিত হয়ে জানালো, 'আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিলে আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করার ইচ্ছা পোষণ করি।' খলিফা জানালেন, 'আপনারা নির্ভীক চিত্তে স্বাধীনভাবে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন।' লোকগুলো বললো, 'আমাদের দশজনের প্রশ্ন মাত্র একটি। কিন্তু আমরা আশা করি আপনি একটি প্রশ্নের দশ ধরনের জবাব দিয়ে আমাদেরকে সন্তুষ্ট করবেন। প্রশ্নটি হলো, জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে কোন্টি উত্তম এবং কেন উত্তম?'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাব দিলেন, 'আল্লাহর রাসূলের নীতি হলো জ্ঞান আর ফেরাউনের উত্তরাধিকার হলো সম্পদ-সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। সম্পদশালীর শত্রুর সংখ্যা অধিক আর জ্ঞানীর বন্ধুর সংখ্যা অধিক-অতএব জ্ঞানই উত্তম। তুমি স্বয়ং সম্পদের পাহারাদার আর জ্ঞান তোমার পাহারাদার-সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান বিতরণে বৃদ্ধি পায় আর সম্পদ বিতরণে হ্রাস পায়-অতএব জ্ঞানই উত্তম। সম্পদশালী হয় কৃপণ আর জ্ঞানী হয় দানশীল-সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান চুরি করা যায় না কিন্তু সম্পদ চুরি করা যায়-অতএব জ্ঞানই উত্তম। কালের করাল গ্রাসে সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয় কিন্তু জ্ঞান ক্ষতিগ্রস্থ হয় না-সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং তা গণনা করা যায় কিন্তু জ্ঞান সীমাহীন, তা গণনা করা যায় না-সুতরাং জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকার দূরিভূত করে হৃদয়কে আলোকিত করে আর সম্পদ হৃদয়কে কালিমা লিপ্ত অহঙ্কারী করে-অতএব জ্ঞানই উত্তম। জ্ঞান মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে যেমন আল্লাহর রাসূল আল্লাহকে বলেছেন, আমরা আপনার দাসত্ব করি, আমরা আপনারই দাস। পক্ষান্তরে সম্পদ ফেরাউন ও নমরুদকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তারা দাবী করেছে আমরা ইলাহ।'

জ্ঞানার্জন করা ইসলাম তার অনুসারীদের ওপর ফরজ করেছে। কারণ ইসলাম একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অনুসারীগণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলে তারা অপশক্তির ষড়যন্ত্রের সহজ শিকারে পরিণত হতে পারে। এ জন্য পড়তে হবে, জানতে হবে এবং জ্ঞানার্জন করতে হবে। ইসলামের আগমনই ঘটেছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য। পৃথিবী থেকে মূর্খতার অন্ধকার দূরিভূত করে গোটা পৃথিবীর পরিবেশকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করার উদ্দেশ্যেই ওহীর সূচনাতেই বলা হয়েছে, 'পড়ো' Red-red and red। আল্লাহর কোরআনের অনেক আয়াতে মানব মন্ডলীকে আহ্বান জানানো হয়েছে, হে চক্ষুষ্মানরা! দৃষ্টি উন্মিলিচিত করো। আমার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করো। আমি যে বস্তুসমূহ দান করেছি, তা নিয়ে গবেষণা করে নিজেদের কাজে লাগাও। হে জ্ঞানবান চিন্তাশীলরা! সমস্ত কিছুর ওপরে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। আমার সৃষ্টি বস্তুনিচয়কে যথাযথ উপায়ে ব্যবহার করো। জ্ঞানার্জন করো এবং জ্ঞানের অস্ত্র প্রয়োগ করে জিহিলিয়াতকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দাও।

জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাহ্দেরকে বলেছেন, আমার কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আবেদন করো, আমি তোমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দেবো। সূরা ত্বাহা-এর ১১৪ নম্বর আয়াতে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এভাবে দোয়া করতে বলা হয়েছে, 'হে আমার রব!

আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।' যারা জ্ঞানার্জন করেছে–জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানার্জন করেনি, তারা কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা যুমারের ৯ নম্বর আয়াতে বলেন, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?' জ্ঞানীদের সম্মান ও মর্যাদা মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেবেন। সূরা মুজাদিলার ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।' আল্লাহর কোরআনের যেমন জ্ঞানার্জন সম্পর্কে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে, এর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, তেমিন হাদীসেও জ্ঞান ও জ্ঞানীদের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে মদীনা নগরী থেকে দূরতম দেশ সুদূর চীনে যাওয়ার জন্যও উৎসাহিত করেছেন। রাসূলের এ কথার অর্থ এটা নয় যে, একমাত্র চীনে গিয়েই বোধহয় জ্ঞানার্জন করতে হবে। রাসূলের কথার অর্থ হলো, জ্ঞানার্জনের জন্য পৃথিবীর যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হবে, সেখানেই যেতে হবে। যুদ্ধে যারা মুসলমানদের হাতে সে সময়ে বন্দী হতো, তাদেরকে পণ্যের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হতো। কিন্তু আল্লাহর রাসূলই সর্বপ্রথম বন্দীদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, বন্দীদের মধ্যে যারা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন তারা দশজন মুসলমানকে অক্ষর জ্ঞান দান করতে পারলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। বাস্তবেও রাসূল তাই করেছিলেন। গণশিক্ষা কার্যক্রম এই পৃথিবীতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম চালু করেছিলেন।

কোন জ্ঞান অর্জন করতে হবে, সে কথাও প্রথম ওহীতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ওহীর সূচনাতেই বলা হয়েছে, 'পড়ো তোমার রব-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' ঐ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যে জ্ঞান স্বয়ং রব্ব–মানুষের মালিক, প্রভু, মনিব, ইলাহ, প্রতিপালক, আইনদাতা, বিধানদাতা তথা যাবতীয় প্রয়োজন যিনি আবেদন করার পূর্বেই পূরণ করেছেন এবং করেন, তিনি যে জ্ঞান ফেরেশ্তার মাধ্যমে তাঁর রাসূলের কাছে অবতীর্ণ করেছেন, সেই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি দিক রচনা করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা নয়–ধর্মভিত্তিক তথা ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কেবলমাত্র এই শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত পরিচয় এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবে। এই শিক্ষাই মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত করে এক মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল করতে পারে। অপরের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারে কেবলমাত্র ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

মানব জাতির জন্য সর্বশেষ যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা হলো, তার সূচনাতেই মানুষকে এই শিক্ষা দেয়া হলো, 'পড়ো তোমার রব-এর নামে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকেই স্মরণ করবে, তাঁর অস্তিত্ব হৃদয়ে জাগরূক রাখবে এবং এ কথা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণে রাখবে যে, তোমাকে তোমার প্রতিটি কাজ ও চিন্তার হিসাব তাঁর কাছেই দিতে হবে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন।' অর্থাৎ ওহীর সূচনাতেই মানুষের হৃদয়ে তার স্রষ্টার ভয়ের অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই লক্ষ্যে যে, মানুষ যেন সৎ হয় এবং পৃথিবীতে সৎপথ অবলম্বন করে। এই পৃথিবীতে যেন সৎমানুষের আবাদ হয় এবং পৃথিবী থেকে জুলুম অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার ইত্যাদির মুলোৎপাটন হয়। মানুষকে সৎ হিসাবে গঠন করার এবং পৃথিবীর পরিবেশকে জান্নাতের পরিবেশ হিসাবে গড়ার মূল কথাগুলো নিহিত রয়েছে ওহীর সূচনামূলক নির্দেশের মধ্যে। কারণ মানুষ যদি তার

স্রষ্টাকে প্রতি মুহূর্তে হৃদয়ে জাগরুক রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে সে মানুষের পক্ষে অসৎ পথ অবলম্বন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সে মানুষ ফেরেশ্তার অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী হতে বাধ্য।

আল্লাহর নাম নিয়ে প্রতিটি কাজ মানুষকে করতে হবে, এতে করে যেমন আল্লাহর কথা মানুষের স্মরণে থাকবে এবং কাজকর্মেও আল্লাহ্ তা'য়ালা বরকত দান করবেন। যে কাজে আল্লাহ তা'য়ালার নাম নেয়া হয়নি, সে কাজে বরকত থাকে না এবং শয়তান সে কাজে অংশগ্রহণ করে। বিষয়টি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, হালাল পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা না হলে সে পশুর গোস্ত আহার করা হারাম হয়ে যায়। মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, যখন কোন ব্যক্তি তার নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এবং আহার করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান তার সাথীদেরকে বলে, তোমাদের জন্য এই বাড়িতে রাত কাটানোর কোন সুযোগ নেই এবং খাওয়ারও নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাম না নিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করে তখন শয়তান তার সাথীদের বলে, তোমাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। সে ব্যক্তি যখন আহার করার সময়ও আল্লাহর নাম নিলো না তখন শয়তান বলে, তোমাদের রাত কাটানোর ও খাওয়ার ব্যবস্থাও এখানে হয়ে গেল।

ওহীর সূচনাতে বলা হয়েছে 'পড়ো তোমার রব-এর নামে।' এই আয়াতে 'রব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'পড়ো তুমি তোমার আল্লাহর নামে।' যদিও সে সময় আরবে 'আল্লাহ' নামের প্রচলন ছিল। মানুষ মহান আল্লাহকে আল্লাহ হিসাবে স্বীকৃতি দিতো বর্তমানে যেমন দিয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকৃতি দিতো না বর্তমানেও যেমন দেয় না। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করার পূর্ব থেকেই 'রব'-এর পরিচয় জানতেন এবং মহান আল্লাহকেই একমাত্র 'রব' হিসাবেই অনুসরণ করতেন। এ জন্যই তিনি নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে কোন মূর্তির কাছে বা প্রচলিত অন্যান্য পূজনীয় বস্তুর কাছে কোন প্রার্থনা করেননি এবং তাদের সামনে মাথাও নত করেননি। রব-এর পরিচয় তিনি জানতেন বলেই ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে তিনি এই প্রশ্ন করেননি যে, রব কি আমি জানিনা সুতরাং রব-এর পরিচয় আমাকে জানিয়ে দেয়া হোক। সুতরাং ওহীর সূচনাতে মানব মন্ডলীকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহকে অবশ্যই রব্ব হিসাবে মানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে।

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের শেষের অংশে বলা হয়েছে, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন।' ঐ রব-এর নামে যে রব-মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, সমস্ত সৃষ্টিকে প্রতিপালন করছেন, যে সৃষ্টির যেখানে যা যতটুকু প্রয়োজন, তাই সরবরাহ করছেন। যাঁর রহমত সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবং সমস্ত কিছুর ওপরে যাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। (রব শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'সমস্ত প্রশংসা ঐ রব-এর' শিরোণাম থেকে 'সুরক্ষিত আকাশ জগৎ' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে।' (এই আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'সমস্ত প্রশংসা ঐ রব-এর' শিরোণাম দেখুন।)

এই সূরার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি পড়ো এবং তোমার রব-বড়োই অনুগ্রহশীল, মেহেরবান।' অর্থাৎ পড়তে হবে-জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং যাঁর নামে পড়তে হবে, সেই রব শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, মেহেরবান ও দয়ালু-করুণাময়। তিনি আপন সৃষ্টিকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। সৃষ্টি করেই তিনি নিজের সৃষ্টির ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেননি। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রত্যেক সৃষ্টির প্রয়োজনের দিকেই তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন। তাঁর দয়া, তাঁর রহমত সমস্ত সৃষ্টি জগতকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'যিনি পরম মেহেরবান ও অসীম করুণাময়' শিরোণাম থেকে 'আল্লাহর কাছে খুশীর বিষয় এবং প্রিয় জিনিস' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

আলোচ্য সূরার ৪ ও ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন সব কিছু শিখিয়েছেন, যা তিনি না শেখালে সে জানতেই পারতো না।' ২ নম্বর আয়াতে মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তার সৃষ্টি কোথা থেকে কিভাবে এবং কয়টি পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সামান্য একটা শুক্রকীট–একটা ভ্রূণ থেকে, সবেগে নিক্ষিপ্ত অপবিত্র পানি থেকে মানুষের সূচনা। এরপর ৪ ও ৫ নম্বর আয়াতে সেই হীন ও নগণ্য অবস্থা অতিক্রমকারী মানুষকে বলা হয়েছে, সেই তোমাকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধি এবং বিবেকসম্পন্ন একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তায় পরিণত করেছেন তিনিই-যিনি তোমাকে সুন্দর কাঠামোয়, মনোরম অবয়বে, বলিষ্ঠ দেহে এবং দেহের অভ্যন্তরে জটিল কারুকার্যসহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভেতরে এমন সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা কোন একটি সৃষ্টির ভেতরেই দেয়া হয়নি। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষের এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ–সবথেকে উন্নত।

এটা মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ, এক বিশেষ করুণা, এটা তাঁর অতিবড় অনুগ্রহের বিশেষ অবদান। এই জন্য আলোচ্য সূরার তৃতীয় আয়াতে তাঁর সেই অনুগ্রহের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, 'তুমি যেমন সুন্দর অবয়বধারী, তেমনি তুমি জ্ঞানের অলঙ্কারে নিজেকে সজ্জিত করো আর তোমার রব্ব বড়ই অনুগ্রহশীল।' তিনি এতই অনুগ্রহশীল, তিনি এতই দয়ালু যে, তিনি শুধুমাত্র মানুষকে জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন এক শ্রেষ্ঠ জীবই বানাননি, কিভাবে কলম ব্যবহার করতে হবে, সে কৌশলও তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃথিবী ব্যাপী ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, জ্ঞানের বিস্তার, অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং বংশানুক্রমে জ্ঞানের উত্তরাধিকার সৃষ্টি, এর বিকাশ সাধন, সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের মাধ্যম বানানো হয়েছে এই কলমকে। পৃথিবীতে এই কলমের ব্যবহার নতুন কোন কিছু নয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষকে ইলহামী জ্ঞানের মাধ্যমে কলমের ব্যবহার শিখানো হয়েছে। (ইলহামী জ্ঞান সম্পর্কিত বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সূরা শাম্‌স-এর ৮ নম্বর আয়াতের তাফসীর দেখুন ।)

তবে বর্তমানে কলমের যে ধরণ আমাদের কাছে রয়েছে, প্রথমে এটা ছিল না। মানুষ প্রথমে ধারালো কোন জিনিসের সাহায্যে গাছের বাকল, শিলাখন্ড অথবা পশুর চামড়ার ওপরে আবিষ্কৃত সঙ্কেত অঙ্কন করেছে। এরপর পাতলা কোন বস্তুকে কলম বানিয়ে গাছের পাতার ওপরে তা অঙ্কন করেছে। ক্রমশঃ অক্ষর আবিষ্কার করে তা পর্বত গাত্র, পশুর চামড়া, কাপড়, হাড় এবং গাছের পাতার ওপরে লিখেছে। পাখির পালক–বিশেষ করে ময়ূরের পালক এবং বাঁশের কঞ্চিকে কলম হিসাবে ব্যবহার করেছে। এরপর সময়ের বিবর্তনে মানুষ উন্নত পদ্ধতির কলম আবিষ্কারক করেছে। আবিষ্কার করেছে লেটার প্রেস, কম্পিউটারসহ নানা ধরনের মুদ্রণ যন্ত্র। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে মানুষকে ইলহামী জ্ঞানের মাধ্যমে এসব

কিছু আবিষ্কারের ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি যদি ইলহামী চেতনার মাধ্যমে তাঁর বান্দাহ্দেরকে অক্ষর আবিষ্কার, কলমের ব্যবহার এবং লেখার পদ্ধতি না শিখাতেন, তাহলে মানুষকে যেমন জ্ঞানার্জন করতে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হতো এবং তার প্রচার ও প্রসার, বিস্তার, প্রয়োগ এবং জ্ঞানের উত্তরাধিকার সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো।

জ্ঞানার্জন এবং তার প্রচার ও প্রসারের যে স্বভাবসিদ্ধ যোগ্যতা এবং প্রতিভা মানুষের ভেতরে বিদ্যমান রয়েছে, তা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও মূল্যহীন হয়ে পড়তো। জ্ঞানের বিকাশ সাধন, অগ্রগতি ও উন্নয়ন, এক দেশ থেকে অন্য দেশে হস্তান্তর, এক বংশ থেকে অন্য বংশে উত্তারাধিকার সূত্রে প্রেরণ, স্থায়ীকরণ ও অধিকতর উন্নত করা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না মানুষকে কলমের ব্যবহার যদি আল্লাহ না শিখাতেন। প্রকৃত অর্থে মানুষ একেবারেই জ্ঞানহীন, অজ্ঞ ও মূর্খ এবং কোন বিষয়ের তার কোন জ্ঞান নেই। সে যেটুকু জ্ঞানের অধিকারী, তা দান করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং এটা একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহ। মানব সভ্যতার বিকাশ, এর অগ্রগতি, ক্রমবিকাশ এবং উন্নতির পথে যে জ্ঞানটুকু মানুষকে দান করা তাঁর আপন স্রষ্টা প্রয়োজন মনে করেছেন, ততটুকুই তাকে দান করা হয়েছে।

গোটা সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে মানুষের যেমন কোন ধারণা ছিল না, তেমনি ধারণা ছিল না তার নিজের সম্পর্কে। সৃষ্টিলোকের সামগ্রিক ব্যবস্থা তো দূরের কথা, মানুষ তার নিজের ভালো-মন্দের ব্যাপারেও বুঝতে অক্ষম এবং এটা বোঝার মতো জ্ঞান ও যোগ্যতা কোনটিই মানুষের নেই। বরং তার ভালো ও মন্দ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সুতরাং সমগ্র জ্ঞানের আধার মহান আল্লাহর কাছ থেকে সত্য পথের সন্ধান ও নির্দেশ গ্রহণ করা ব্যতীত মানুষের দ্বিতীয় কোন পথই নেই। জ্ঞানের যে সমুদ্র রয়েছে, সেই জ্ঞান সমুদ্র থেকে মানুষ ঠিক ততটুকুই জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম, যতটুকু মহান আল্লাহ চান। শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষ যা কিছুই আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন করেছে, এই কৃতিত্ব মানুষের নয়। আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন করার মতো জ্ঞান ও যোগ্যতা মহান আল্লাহ দিয়েছেন বলেই মানুষ তা করতে সক্ষম হয়েছে। মানুষ যেসব জ্ঞানকে নিজস্ব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন বলে মনে করে আসলে এসব ক্ষমতা মানুষের জ্ঞানের আওতায় পূর্বে ছিল না। মহান আল্লাহ যখন তা ইচ্ছা করেছেন, তখনই মানুষের চেতনার জগতে সেই জ্ঞান দান করেছেন।

আমরা সূরা শাম্সের ৮ নম্বর আয়াতের তাফসীরে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিকেই প্রয়োজন অনুসারে ইলহামী জ্ঞান দেয়া হয়। মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য যখন যা প্রয়োজন, সেই অনুসারে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অগোচরে ইলহামের মাধ্যমে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন। মানুষ যা জানতো না এবং কখনো সে তা কল্পনার চোখেও দেখেনি, সে বিষয় সম্পর্কে মানুষ অবহিত হচ্ছে এবং আবিষ্কার উদ্ভাবন করছে। যারা চিন্তা-গবেষণা করে, মানুষের কল্যাণে লেখতে থাকে, তারা একটি বিষয় স্পষ্ট অনুভব করে যে, তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে বা লেখানো হচ্ছে আর এটার নামই হলো ইলহাম। মানুষ কিছুই জানতো না এবং বুঝতো না, তাকে ইলহামের মাধ্যমে সেই না জানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালা অসীম দয়ালু এবং করুণাময়, তাঁর করুণাধারায় প্রতি নিয়ত সমস্ত সৃষ্টি সিক্ত হচ্ছে এবং তাঁরই অনুগ্রহের কারণেই মানুষ নিত্য-নতুন আবিষ্কারে সক্ষম হচ্ছে। **এ জন্যই আলোচ্য সূরার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,** 'তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না।'

মানুষের জ্ঞান লাভের উৎস হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। মানুষ শুরু থেকে যা কিছু জেনেছে এবং বর্তমানে জানছে এবং শেষ পর্যন্ত জানবে, একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই জানবে। বর্তমানে গোটা বিশ্বের সৃষ্টি রহস্যের যে দ্বার এই মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়েছে, মানব জীবনের যে দুর্ভেদ্য তত্ত্ব ও তথ্য সে অবগত হতে পেরেছে এবং তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে যেসব তথ্য জানতে পেরেছে তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান থেকেই জানতে পেরেছে।

ওহীর সূচনাতেই মানব জীবনের এসব মৌলিক বিষয় আলোচনা করে মানুষকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাকে খেল-তামাশার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি বা কোন দুর্ঘটনা কবলিত হয়েও তার সৃষ্টি হয়নি। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার জীবনের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। সে মালিকহীন কোন সৃষ্টি নয়, তার একজন মালিক রয়েছে যিনি অসীম দাতা ও দয়ালু এবং মহাকৌশলী বিজ্ঞানী। যাঁর কাছে রয়েছে জ্ঞানের মহাসমুদ্র। তিনি তুলনাহীন শিল্পী, তাঁর শৈল্পিক সৌন্দর্যের অতি সামান্যই প্রকাশ ঘটেছে মানুষের কাঠামো নির্মাণে। এ কথাও মানুষকে ওহীর সূচনাতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অপূর্ব নান্দনিক সৌন্দর্য দিয়ে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, প্রতি মুহূর্তে তাঁকেই স্মরণ করতে হবে অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। যে কোন অবস্থায় তাঁরই মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে-যেহেতু তিনিই হলেন একমাত্র রব।

ওহীর সূচনায় আলোচ্য সূরার উল্লেখিত ৫টি আয়াত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। ওহী অবতীর্ণের প্রথম অভিজ্ঞতার এই ঘটনাটি হঠাৎ করেই আল্লাহর রাসূলের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। তাঁকে কোন বিরাট দায়িত্বপূর্ণ এবং মহান কাজের দায়িত্বশীল নির্বাচিত করা হয়েছে ও ভবিষ্যতে তাঁকে কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হবে, কি কি কাজের আঞ্জাম দিতে হবে, সে সম্পর্কে ওহীর সূচনায় কিছুই বলা হয়নি। শুধুমাত্র একটা প্রাথমিক পরিচিতি ঘটিয়ে তাঁকে কিছু দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছিল। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা আল্লাহর রাসূলের জন্য বড় কঠিন ও অসহনীয় ছিল। প্রথমে তাঁর মন-মানসিকতা ও স্বভাব-প্রকৃতির ওপরে যে প্রবল ও কঠিন চাপ পড়েছিল, তা যেন দূরিভূত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে ওহী গ্রহণ ও নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারেন, এ জন্য তাঁকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছিল।

ওহীর সূচনাতে তাঁকে অল্প কথার ভেতর দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যে রব-কে পূর্ব থেকেই জানেন এবং অনুসরণ করে আসছেন, এখন তিনিই আপনার সাথে তাঁর প্রেরিত দূতের মাধ্যমে কথা বলছেন এবং তিনিই আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকেই আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণের ধারা শুরু হলো। আপনি যাঁকে রব হিসাবে অনুসরণ করতেন, তিনি আপনাকে বিশ্বনবী হিসাবে নির্বাচিত করেছেন, আপনাকে নবুওয়াত-রেসালাতের পদ দান করে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।

অবসর কালটি অতিক্রান্ত হওয়ার পরে দ্বিতীয় বার ওহী অবতীর্ণের ধারা যখন শুরু হলো, তখন সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক সাতটি আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছিল। সে আয়াতগুলোয় তাঁকে প্রথম বারের মতো নির্দেশ দেয়া হলো যে, আপনি উঠুন এবং বিশ্বমানবতা যে পথে ধাবিত হচ্ছে, তার মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক-সচেতন করে তুলুন। আর এই পৃথিবীতে যেখানেই অন্যদের প্রাধান্য, কর্তৃত্ব ও বড়ত্বের ভেরী উচ্চ নিনাদে বেজে চলেছে, সেখানে আপনি সার্বিকভাবে আপনার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব ও নিরঙ্কুশ

কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করে দিন। সেই সাথে রাসূলকে এই নির্দেশও দেয়া হলো যে, এরপর যে কাজ আপনাকে করতে হবে, তার প্রেক্ষিতে আপনার জীবন সর্বোতভাবে অতীব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং আপনি সমস্ত বৈষয়িক স্বার্থ ও সুবিধার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পরিপূর্ণ ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা সহকারে মানব মন্ডলীর সার্বিক সংশোধন ও উন্নয়নের কর্তব্য পালন করুন।

আলোচ্য সূরার ৬ নম্বর আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ এবং অংশ অবতীর্ণ হয়েছিল সেই পটভূমিতে যখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কা'বাঘরে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশিত পদ্ধতিতে নামাজ আদায় শুরু করেছিলেন। মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী নামাজ আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করে প্রথমে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। এ কথা তারা তখন স্পষ্ট অনুভব করেছিলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নতুন আদর্শ অনুসরণ করছেন। তারা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে আবু জেহেলের কাছে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। আবু জেহেল রাসূলের নামাজ আদায়ের দৃশ্য নিজ চোখে দেখে আল্লাহর রাসূলকে হুমকি প্রদর্শন করে নামাজ আদায় তথা নতুন আদর্শ অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল আবু জেহেলের হুমকির প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে তিনি যথানিয়মে নামাজ আদায় করতে থাকেন। আবু জেহেলের আদেশ অমান্য করা হচ্ছে-তার আত্মসম্মানে যেন চপেটাঘাত করলো। সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে আল্লাহর রাসূলের প্রতি আদশে জারি করলো, 'হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) তুমি যে পদ্ধতিতে ইবাদাত করছো, এই পদ্ধতিতে কা'বাঘরে ইবাদাত করা যাবে না।' পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূলকে কারো নির্দেশ অনুসরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি। বরং সকলে তাঁরই নির্দেশ অনুসরণ করবে, এই জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি যথারীতি কা'বাঘরেই নামাজ আদায় করে চললেন।

আবু জেহেল সমবেত কুরাইশদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, 'সে কি তোমাদের সামনে মাটিতে কপাল রেখে সিজ্‌দা করে? লোকজন তাকে জানালো যে আব্দুল্লাহর পুত্র মাটিতে কপাল রেখে সিজ্‌দা করে। আবু জেহেল দম্ভভরে বললো, আমি যদি তাকে মাটিতে কপাল রেখে সিজ্‌দা করতে দেখি, তাহলে আমি তার ঘাড়ের ওপর পা রেখে তার মুখটি মাটির সাথে ঘষে দেবো।' (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর রাসূল আবু জেহেলের ঘৃণ্য ইচ্ছার কথা শুনতে পেলেন। তবুও তিনি নির্বিকার চিত্তে কা'বাঘরেই নামাজ আদায় করতে থাকলেন। আবু জেহেল একদিন আল্লাহর রাসূলকে নামাজ আদায়রত দেখতে পেয়ে তার ঘৃণ্য ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে রাসূলের দিকে অগ্রসর হলো। কিন্তু উপস্থিত লোকজন দেখতে পেলো, তাদের নেতা আবু জেহেল কোন এক অদৃশ্য শক্তির আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে পেছনের দিকে সরে আসছে।

তারা তাকে ঘিরে ধরে উৎকণ্ঠিত স্বরে জানতে চাইলো, তুমি ওভাবে ভীতগ্রস্থ হয়ে সরে এলে যে? আবু জেহেল কম্পিত কণ্ঠে জানালো, 'আমি যখন মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম আমার ও তাঁর মাঝে আগুনের একটি গর্ত। তাছাড়া এমন ভয়াবহ ধরনের কিছু ছিল, যা আমাকে ধ্বংস করে দিতো।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আবু জেহেল যদি আমার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতো, তাহলে আল্লাহর ফেরেশ্‌তারা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতো।' হাদীস

শরীফে কয়েক জনের বর্ণনায় এই ধরনের বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। ওহীর সূচনা হবার পরে ইসলামী আদর্শের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল নামাজের মাধ্যমে। আর এই নামাজ আদায়েই বাধা প্রদান করছিল আবু জেহেল। এই উপলক্ষ্যেই আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয় এবং এই সূরার সাথেই তা আল্লাহর নির্দেশে স্বয়ং রাসূল তা সংযোজন করে দেন এবং এটা খুবই স্বাভাবিক সংযোজন।

যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং অনুগ্রহ করে তাকে জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি দান করেছেন, যা সে জানতো না তাই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তার প্রতি অসীম অনুগ্রহ করেছেন, অথচ সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তার আপন স্রষ্টার সাথে না-ফরমানী করছে। তার সাথে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। একের পর এক সে সীমালংঘন করে যাচ্ছে। কোন পরিণতির কথা সে চিন্তা করছে না। মানুষের এই আচরণের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে **আলোচ্য সূরার ৬ থেকে ৮ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, মানুষ ক্ষুদ্র অপরাধ থেকে বৃহত্তর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস এই জন্যই প্রদর্শন করে যে, অপরাধ করার সাথে সাথেই তাকে গ্রেফতার করা হয় না বা তার ওপর আযাবের কোন চাবুক বর্ষিত হয় না। তখন অপরাধীর মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, অপরাধের কোন শাস্তি যখন সে লাভ করলো না, তখন তার এই অপরাধের জন্য কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। তার অর্থবল, জনবল রয়েছে, সম্পদের কোন অভাব নেই। চারদিকে তার প্রচুর সমর্থক রয়েছে, যে কোন মুহূর্তে তাদেরকে ডাক দিলেই তারা তার সমর্থনে ছুটে আসবে।

সুতরাং তার কিসের ভয়, সে কাউকে পরোয়া করবে না। এভাবে সে ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অপরাধীর এই বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতিবাদ করেই আলোচ্য সূরার ৬ নম্বর আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে, তোমরা যে ধারণা করছো তা অবশ্যই সত্য নয়। তোমরা নির্বোধ, এ কথা কেন তোমাদের মনে জাগ্রত হয় না যে, তোমাদেরকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং মৃত্যুর পরের জগতে তোমাকে তোমার মহান রব-এর দরবারে যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে!

মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা আবু জেহেলেরও অনুরূপ ধারণা ছিল। ধন-সম্পদ অর্জনের পথে সে ন্যায়-অন্যায়ের কোন হিসাব করতো না। এমনকি কা'বাঘরের সম্পদ চুরি করতেও তার বিবেকে বাধেনি। কোন দুর্বল শ্রেণীর লোক বা ইয়াতিম তার কাছে কোন সম্পদ গচ্ছিত রাখলে সে তা আত্মসাৎ করতো। এভাবে সে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিল।

আবু জেহেল এবং তার অনুরূপ লোকদের মিথ্যা ধারণার প্রতিবাদ করে মহান আল্লাহ বলেন, তারা যে ধারণা অনুসরণ করে ক্রমশঃ সীমালংঘন করে যাচ্ছে এবং দেখছে যে, তাদের কৃত অপরাধের কারণে তাদেরকে তৎক্ষণাত গ্রেফতার করা হচ্ছে না বা আযাবের চাবুক তাদের ওপরে নেমে আসছে না। এই কারণে তারা আরো বেশি অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠছে। কিন্তু তাদেরকে এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, একদিন তাদেরকে এই পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় গ্রহণ করতে হবে এবং মৃত্যুর পরের জগতে নিজের মনিব মহান আল্লাহর কাছে যাবতীয় কর্মের হিসাব অবশ্যই দিতে হবে।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর রাসূল কা'বাঘরে নামাজ আদায় করছিলেন এবং আবু জেহেল তাঁকে বাধা দিচ্ছিলো। **আলোচ্য সূরার ৯ থেকে ১০ নম্বর আয়াতে** সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, তুমি সেই দাম্ভিক অহঙ্কারী আল্লাহভীতি শূন্য

হৃদয়ের অধিকারী লোকটির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছো, সে কত বড় ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে? কত জঘন্য এবং কদর্য কাজ সে করেছে? তার ধৃষ্টতা চরমভাবে সীমালংঘন করেছে, সে আযাবের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে, কেননা সে আল্লাহর ঐ বান্দাহ্কে কা'বাঘরে নামাজ আদায় করতে বাধা দিয়েছে, যে বান্দাহ্ স্বয়ং আল্লাহর রাসূল। যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবুওয়াত ও রেসালাতের মতো সম্মান ও মর্যাদার পদে অধিষ্ঠিত করেছেন।

১০ নম্বর আয়াতে 'আব্দ অর্থাৎ বান্দাহ্' শব্দ দ্বারা স্বয়ং আল্লাহর রাসূলকে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাহ্কে 'আব্দ' হিসাবে উল্লেখ করেন, তখন তা অত্যন্ত স্নেহের সাথে, মমতার সাথে এবং গভীর ভালোবাসার সাথে উল্লেখ করেন। কারণ 'আব্দ' তাঁকেই বলা হয়, যিনি সর্বোতভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে থাকেন। আর যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্য করেন, তাঁর ওপরে আল্লাহ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হবেন, তাকে ভালোবাসবেন এটাই স্বাভাবিক। পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েক স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আব্দ' হিসাবে উল্লেখ করে হয়েছে। (আব্দ শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ' শিরোণাম দেখুন।)

আল্লাহর রাসূল নামাজ আদায় করছিল আর আবু জেহেল এতে বাধার সৃষ্টি করছিল। রাসূল নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন না এবং পবিত্র কোরআনের কোথাও নামাজ আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। তাহলে আল্লাহর নবী নামাজ আদায়ের পদ্ধতি কোত্থেকে শিখলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গবেষকগণ বলেছেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওহীর মাধ্যমে রাসূলকে কোরআন-বহির্ভূত অনেক কিছু বলতেন এবং শিখাতেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাঁকে গোটা পৃথিবীর জন্য করুণার মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রেরণ করবেন, মানুষ এবং জ্বিন জাতির জন্য যাঁকে শেষ নবীই শুধু নয় বিশ্বনবী হিসাবে নির্বাচিত করবেন, তাঁর জ্ঞানের পরিধি সমস্ত সৃষ্টির তুলনায় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ যে কি ধরণের আয়োজন করেছিলেন, তা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। নবুওয়াত দান করার পূর্বে বিশেষ ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর এই প্রিয় বান্দাহ্কে এই বিশ্ব প্রকৃতি থেকে নানাভাবে জ্ঞান আহরণের এবং উপলব্ধির মত যোগ্যতা ও মানসিকতা দান করেছিলেন। সত্যানুসন্ধিৎসু মন-মানসিকতা তাঁকে আল্লাহ দান করে মহাসত্য অনুসন্ধানের পথে অগ্রসর করেছিলেন। এ কারণে আমরা তাঁর জীবন-ইতিহাসে দেখতে পাই, তরুণ বয়সে তিনি প্রচলিত কোন একটি দিকের প্রতি দুই বারের অধিক আকর্ষিত হননি।

কিশোর বা তরুণ বয়সে তিনি তাঁর সমবয়সিদের কাছে তাঁর পশুপাল রেখে মক্কা শহরে কোন এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। প্রথম বার আসার সাথে সাথে তাঁর চোখে এমন ঘুম দেয়া হয়েছিল যে, তিনি উক্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন কিছুই বলতে পারবেন না। দ্বিতীয় বার আসার পরেও ঐ একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। গভীর ঘুমের অতলে তাঁকে তলিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাঁর সমস্ত চেতনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দেয়া হয়েছিল যে, উক্ত অনুষ্ঠানের কোন শব্দও যেমন তাঁর পবিত্র কর্ণে প্রবেশ করেনি, কোন দৃশ্যও তাঁর পবিত্র চোখ দর্শন করেনি।

এ সম্পর্কে স্বয়ং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মূর্খতার যুগে মানুষ যা করতো সেসব কাজ করার ক্ষেত্রে দু'বারের অধিক আমার ভেতরে আগ্রহ জাগেনি। আর সে দু'বারই আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেছেন। এরপর থেকে সে কাজের কোন আগ্রহ আমার ভেতরে সৃষ্টি হয়নি।'(ইবনে জারীর, বায়হাকী)

সে যুগে মানুষ বস্ত্রহীন হতে সামান্যতম দ্বিধা করতো না। লজ্জা নামক অনুভূতি ছিল তাদের মৃত। পিতার সামনে সন্তান, সন্তানের সামনে পিতা উলঙ্গ হতে কোন দ্বিধা করতো না। বিশ্বনবীকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই উলঙ্গতা থেকে দু'বার হেফাজত করেছেন তৃতীয় বারের প্রয়োজন হয়নি। তাকে আরবের সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে হেফাজত করা হয়েছিল। তাঁর যে অপূর্ব সুন্দর চেহারা ছিল, বর্ণনাতীত ছিল দেহের গঠন, দৃষ্টির চাওনি, কথার মাধুর্যতা, এ সমস্ত দিকসহ তাঁর পূর্বে কোন মানুষ পৃথিবীতে আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্তও আসবে না।

পাপাচারে লিপ্ত হবার সব ধরণের যোগ্যতা এবং অবাধ সুযোগ থাকার পরেও তাঁকে কোন পাপ স্পর্শ করতে পারেনি। তদানীন্তন পৃথিবীর অবস্থা, যে দেশে আগমন করেছিলেন সে দেশের অবস্থা, যে পরিবেশ এবং সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে পরিবেশ এবং সমাজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এবং তাঁর স্বভাব চরিত্র ও জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিচক্ষণতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতে হয়।

তাঁর চার পাশের পরিবেশ তাঁর সমগ্র সত্তার শতকোটি ভাগের একভাগকেও নিজের প্রভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। কেন পারেনি-এ প্রশ্নের উত্তর ইউরোপীয় চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষকদের কাছে অনুপস্থিত। তাঁরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। কারণ তাদের দর্শন, কথন, লেখন, চলন ইত্যাদি সবই জড়বাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতার ওপরে ভিত্তিশীল-যা অত্যন্ত ভঙ্গুর। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এ সমস্ত দিক সম্পর্কে জবাব দিতে হলে অতিন্দ্রীয় শক্তিকে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকৃতি দিতে হয়, আর এ দিকের স্বীকৃতি দিতেই তাদের বিরাট কার্পণ্যতা। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তা তাঁরা গ্রহণ করবেন না, যদিও করেন তা খন্ডিত আকারে।

বিশ্বনবীর শিক্ষার ব্যাপারে আমরা বলতে চাই, তদানীন্তন সমাজ ও সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ স্বয়ং ছিলেন তাঁর শিক্ষক। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, তাঁর সম্পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহ নিষ্কলুষ করেই সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত চেতনার জগতে পাপের প্রতি একটা প্রচন্ড বিদ্রোহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। যাবতীয় অন্যায়ের ওপরে তাঁর একটা অবিমিশ্র ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষ ওহীজ্ঞানের পূর্বে মহান আল্লাহ অলক্ষ্যে থেকে তাঁকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি ছিলেন নিষ্পাপ, সমস্ত ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে এক বিস্ময়কর জগতে তিনি অবস্থান করেছেন। কলুষহীনতা আর নিষ্পাপের বর্ম দ্বারা বিশ্বনবীর নিজস্ব পৃথিবী ছিল পরিবেষ্টিত। সে পৃথিবীতে পাপের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ অসাধ্য। বিশ্বনবীর ব্যক্তিত্বই ছিল এমন যে, যাবতীয় পাপ এবং অন্যায় তাঁর সামনে মাথানত করতে বাধ্য হত।

আলোচ্য সূরার ১১ থেকে ১৪ নম্বর আয়াতে মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠীর ঘৃণিত আচরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে বলছেন, সেই লোকটির ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ তুমি অবশ্যই দেখলে, যে লোকটি আল্লাহর এক বান্দাহ্কে আল্লাহর গোলামী থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ দিচ্ছে। পৃথিবীর যাবতীয় কিছুর দিক থেকে যে বান্দাহ্ মুখ ফিরিয়ে মহান মালিকের দিকে রুজু হয়েছে, আপন প্রভুর ইবাদাত ব্যতীত সে আর অন্য কারো ইবাদাত, দাসত্ব, পূজা, আরধনা ও উপাসনা করতে প্রস্তুত নয়, একমাত্র আপন রব-মহান আল্লাহ তা'য়ালারই গোলামী করতে প্রস্তুত, তাকেই ঐ ব্যক্তি নিষেধ করছে যে। সে কত বড় ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে, তা নিশ্চয়ই তুমি দেখেছো। আল্লাহর গোলামী করতে প্রস্তুত ঐ বান্দাহ্ মহাসত্যের অনুসারী এবং সে লোকদেরকে আল্লাহর গোলামীর দিকে আহ্বান জানাচ্ছে,

আল্লাহকে ভয় করে অবৈধ পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে। আর নিষেধকারী ব্যক্তি আল্লাহকে অমান্য করছে, সীমালংঘন করছে এবং মহান আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এই নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে সে কতটা ঘৃণা কুড়াচ্ছে সেটা তুমি অবশ্যই দেখেছো।

আমিই তাকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছি, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছি, অনুগ্রহ করে তাকে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছি এবং সে যা জানতো না তাই তাকে শিক্ষা দিয়েছি–এভাবে তার প্রতি আমি অসীম অনুগ্রহ করেছি। কিন্তু সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আমার গোলামী করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার মতো ঘৃণ্য আচরণ অবলম্বন করেছে। তার এই আচরণ চরম ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নয়। এ কথা তার স্মরণে থাকা উচিত যে, যে আল্লাহ তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, সেই আল্লাহ তার প্রতিটি স্পন্দনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন এবং সমস্ত কিছুই তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সেই বান্দাহ্দের অবস্থাও দেখছেন যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে, কদর্য কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখে শুচিতা অবলম্বন করেছে, নিজেরা পবিত্র হয়েছে এবং অপরকেও পবিত্র হওয়ার জন্য সৎপথ অবলম্বনের ব্যাপারে উৎসাহিত করছে।

আলোচ্য সূরার ১৫ আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর ভাষায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন–লোকটি (আবু জেহেল) অহঙ্কারী, মিথ্যুক এবং আমার বিধান অমান্যকারী। সে হুমকি দেখায় তার নাকি সমর্থকের সংখ্যা অনেক বেশী। ঠিক আছে, সে তার সমর্থকদের ডেকে তার ঘৃণ্য ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। আমিও আমার আযাবের ফেরেশ্তাদেরকে যথাসময়ে প্রেরণ করবো। তারা তার মাথার সামনের ঐ চুলগুলো ধরবে, যে চুলগুলো ঝাঁকিয়ে হুমকি দিতে থাকে, তারপর তাকে ও তার সমর্থকদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা বলেন, আবু জেহেল যদি আল্লাহর রাসূলের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার লোকদেরকে ডাক দিতো, তাহলে সাথে সাথে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাঁর আযাবের ফেরেশ্তারা এসে উপস্থিত হতো।

আল্লাহভীতি শূন্য অহঙ্ককারী লোকগুলো সাধারণত নানা অঙ্গি-ভঙ্গি করে মাথা ঝাঁকিয়ে হুমকি প্রদর্শন করে থাকে। এ কথাই সে সাধারণ মানুষ বুঝানোর চেষ্টা করে যে, আমি প্রচুর অর্থ-বৃত্তের মালিক। আমার প্রচুর গুণগ্রাহী রয়েছে, সমর্থকের সংখ্যা অগণিত। আমার সাথে কেউ উচ্চকণ্ঠে কথা বললে তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার মতো লোকের অভাব নেই। এই শ্রেণীর লোকগুলো কোনক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে এদের অহঙ্কার প্রদর্শনের মাত্রা আরো বেড়ে যায় এবং বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ক্ষমতার দম্ভে এরা একের পর এক সীমালংঘন করেই চলে। আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দেরকে এরা নির্বিঘ্নে নামাজ পর্যন্ত আদায় করতে দেয় না। মহান আল্লাহর এদের এসব ঘৃণ্য কার্যকলাপ দেখতে থাকেন। তারপর অহঙ্কারী স্বৈরাচারী গোষ্ঠী যখন চরমভাবে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা অপমান আর লাঞ্ছনার সাথে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বিদায় করে দেন।

এরপর আলোচ্য সূরার শেষ আয়াতে রাসূল এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে, আমাকে সিজ্দা করতে এবং আমার গোলামী করতে যারা বাধার সৃষ্টি করে, তোমরা কোনক্রমেই তাদের নিষেধ শুনবে না এবং তাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা বরং তোমাদের রব-এর সামনে সিজ্দাবনত হও, কেননা এই সিজ্দার মধ্য দিয়েই তাঁর নৈকট্য অর্জন করা যাবে।

আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্‌রা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করবে, চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখবে। নিজেরা স্বয়ং আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবে এবং অন্যদেরকেও তা অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানাবে। এই কাজে কায়েমী স্বার্থবাদীর দল, ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী প্রবল বাধার সৃষ্টি করবে। তারা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্‌দেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। তারা নিজেদের বানানো আইন-কানুন অনুসরণ করার জন্য আল্লাহর অনুগত লোকদেরকে পরামর্শ দেবে। কিন্তু কোনক্রমেই তাদের সে পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে না। যারা নিজেদেরকে আল্লাহর গোলাম হিসাবে গড়তে আগ্রহী, তাদের ওপরে নির্যাতন, নিপীড়ন নেমে আসবে। এ সময়ে নির্যাতিতদের মনে যেন হতাশা পূঞ্জিভূত না হয়, সে জন্য নামাজের মাধ্যমে তাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। কারণ একমাত্র নামাজই মানুষকে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সাহায্য করে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'যখন বান্দাহ্ আল্লাহ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা দেয়, তখন সে বান্দাহ্ আল্লাহর এত কাছে চলে যায় যে, তার আর আল্লাহ তা'য়ালার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না।' দ্বীনি আন্দোলনের প্রাণই হলো নামাজ। আন্দোলনের ময়দানে যারা কাজ করে, একমাত্র নামাজই তাদেরকে অনুপ্রেরণা এবং শক্তি যোগায়। বাতিল শক্তি যখন ভয়াবহ নির্যাতন নিপীড়নের পথ অবলম্বন করে, তখন একমাত্র নামাজই আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের মনোবল অটুট রাখে। সুতরাং দ্বীনি আন্দোলনের সাথে জড়িত লোকদেরকে নামাজের প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই শুধু নয়-সময় সুযোগ পেলেই নফল নামাজ আদায়ে মনোনিবেশ করতে হবে। নামাজ মানুষের হৃদয়ের কালিমা দূরিভূত করে মন-মানসিকতাকে একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করে দেয় এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল করে তোলে। আলোচ্য সূরার শেষ আয়াত যখন আল্লাহর রাসূল তেলাওয়াত করতেন, তখনই তিনি সিজ্‌দায় চলে যেতেন। এ জন্য এই আয়াত তেলাওয়াত করলে বা শুনলে সিজ্‌দা করা একান্ত জরুরী।

সূরা আল-কাদ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৯৭

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরায় পর পর তিন স্থানে 'আল কাদ্‌রি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরাটির অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কে মতভেদ বিরাজমান। কেউ মন্তব্য করেছেন, এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, এই সূরা মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিক দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ গবেষকগণ এই সূরার বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে বলেছেন, এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এই সূরার মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু মক্কার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সূরার পূর্বেকার সূরা আলাকের পরেই এই সূরাকে স্থান দেয়ার কারণ হিসাবে গবেষকগণ বলেন, ওহীর সূচনা করা হয়েছে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ করে এবং এই সূরায় বলা হয়েছে, ওহীর সূচনা হয়েছে কোন রাতে। এ কারণেই এই সূরাকে সূরা আলাকের পরেই স্থান দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য সূরায় আল কোরআনের গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটাই এই সূরার মূল আলোচিত বিষয়। এই সূরাতেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন যে, এই কোরআন তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ করেছেন। এমন এক রাতে এই কোরআন অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল, যে রাত অগণিত রাতের থেকেও অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ। যে রাতে এই কোরআন অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে, সেই রাত অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর। এই রাতে গোটা মানব মন্ডলীর কল্যাণের জন্য সেই অসীম বরকতপূর্ণ কাজটি সুসম্পন্ন করা হয়েছে, যা মানবেতিহাসের অগণিত মাস ও বছরেও করা হয়নি। এই রাতে অকল্যাণকর কিছু হতে পারে না। এ রাতে যা কিছু সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তা কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে।

কোন জনপদ বা জাতিকে যদি এই রাতে ধ্বংস করে দেয়ার সিদ্ধান্তও হয়ে থাকে, তাহলে সেটাও মানুষের কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে থাকেন, তা তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যেই গ্রহণ করেন। এই রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু কল্যাণ আর কল্যাণেই পরিপূর্ণ। এখানে অকল্যাণের কোন স্পর্শ ঘটতে পারে না। এই রাতে মহান আল্লাহর নির্দেশে অসংখ্য ফেরেশ্‌তা এবং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্‌ সালাম পৃথিবীতে আগমন করেন বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে। কদরের এই রাতটি সম্পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার রাত, কল্যাণ আর মঙ্গলের রাত। এই সম্মানিত ও মঙ্গলময় রাতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) আমি এই (গ্রন্থ)-টিকে নাযিল করেছি এক মর্যাদাপূর্ণ রাতে, (২) তুমি কি জানো সেই (মর্যাদাপূর্ণ) রাতটি কি? (৩) এই মর্যাদাপূর্ণ রাতটি হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। (৪) এই (সময়ের) মাঝে (ফেরেশ্‌তা ও তাদের সর্দার) 'রুহ' তাদের মালিকের সব ধরনের আদেশ নিয়ে (যমীনে) অবতরণ করে। (৫) (সে আদেশ হচ্ছে) প্রশান্তি-তা (পরবর্তী) সুবহে সাদেক পর্যন্ত (অব্যাহত) থাকে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এটিকে আমিই অবতীর্ণ করেছি এক বরকত ও মর্যাদাপূর্ণ রাতে। সূরা দুখানে বলা হয়েছে-

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ-

আমি এটি এক বরকত ও কল্যাণময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। (আয়াত-৩)

মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী অযৌক্তিক অপবাদ আরোপ করেছিল যে, স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী রচনা করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিতেন। তাদের কথার প্রতিবাদে সূরা কাদরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এই কিতাবের রচিয়তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়, স্বয়ং আমি আল্লাহ এই কিতাব তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এর প্রমাণ অন্য কোথাও অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই, যে কিতাব তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হচ্ছে, প্রমাণের জন্য এই কিতাবই যথেষ্ট।

এই গ্রন্থ তার আপন সত্তায় নিজেই এ বিষয়ের স্পষ্ট সাক্ষী যে, তা কোন মানুষের রচিত নয়-বরং বিশ্ব জাহানের রব্ব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব। তোমরা এই গ্রন্থের সম্মান-মর্যাদা ও মূল্য উপলব্ধি করতেও ভুল করছো। তোমাদের কাছে এটা এক মহাবিপদ বলে মনে হচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রহমতের ভিত্তিতে যে সময় সরাসরি তোমাদের কাছে তাঁর রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই মুহূর্তটি ছিল অতীব কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ। নিজেদের অজ্ঞতার কারণে তোমরা এই ভুল ধারণায় মধ্যে

নিমজ্জিত রয়েছো যে, এই রাসূল ও কিতাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তোমরাই বিজয়ী হতে সক্ষম হবে। অথচ এমন এক বিশেষ মুহূর্তে এই রাসূলকে রেসালাত দান ও তাঁর প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'য়ালা সবার ভাগ্যের ফায়সালা করেন। আর আল্লাহর ফায়সালা এমন দুর্বল কোন ফায়সালা নয় যে, ইচ্ছা করলেই কেউ তা পরিবর্তন করতে পারবে। আর আল্লাহর ফায়সালা কোন প্রকার মূর্খতা ও অজ্ঞতা প্রসূত ফায়সালা হয় না যে, তাতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থাকবে। সে ফায়সালা তো বিশ্বজগতের মালিক-শাসক ও নিয়ন্ত্রণকর্তার অটল ফায়সালা, যিনি সর্বশ্রোতা ও মহাকৌশলী বিজ্ঞানী।

যে রাতে এই কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে সে রাত ছিল অত্যন্ত বরকত ও কল্যাণময়। অর্থাৎ যেসব নির্বোধ ও মূর্খ লোকদের নিজেদের ভালো-মন্দের পার্থক্য বোধ পর্যন্ত নেই তারাই এই কিতাবের আগমনকে নিজেদের জন্য আকস্মিক বিপদ বলে ধারণা করছে এবং এই কিতাবের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু অমনোযোগী ও গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত লোকদেরকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য আমি যে মুহূর্তে এই কোরআন অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাদের ও সমগ্র মানব মন্ডলীর জন্য সেই মুহূর্তটি ছিল পরম সৌভাগ্যের। মুহূর্তটি ছিল গোটা বিশ্বের জন্য আনন্দঘন এবং অন্ধকার থেকে আলোয় আগমনের মুহূর্ত।

আল্লাহর রাসূলের ওপর ওহীর সূচনা তথা কোরআন কোন মাসের কত তারিখে অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সম্পর্কে কে কিভাবে বর্ণনা করেছেন আমরা সে আলোচনায় না গিয়ে প্রথমে দেখবো, স্বয়ং কোরআন এ ব্যাপারে কি বক্তব্য পেশ করেছে। সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ ঘোষনা করেছেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ..اِلَى اخِرِالاٰيَةِ

রমযান মাস, এতেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তা সমস্ত মানব জাতির জন্যে জীবন পরিচালনার বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট নছিহতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শন করে এবং সত্য ও মিথ্যার ব্যবধান স্পষ্টরূপে তুলে ধরে। সুতরাং আজ থেকে যে ব্যক্তিই এ মাসের প্রত্যক্ষদর্শী হবে তাঁর জন্য এই গোটা মাসের রোযা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যদি কেউ রোগী হয় এবং ভ্রমণে থাকে সে যেন অন্য দিনে এই রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের কাজ সহজ করে দিতে চান, কোন ধরণের কঠোরতা আরোপ বা কোন কঠিন কাজের দায়িত্ব দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। তোমাদেরকে এই পথ বলা হয়েছে এ জন্য যে, তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সত্যপথের সন্ধান দান করেছেন, সে কারণে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বের স্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ হতে পারো। (সূরা বাকারা-১৮৫)

পবিত্র কোরআনের ঘোষনানুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি, পবিত্র রমযান মাসে এই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। রোজার বিধি-বিধান এবং কেন রোযা পালন করতে হবে এ সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারছি। কোরআন কি এবং কেন তা অবতীর্ণ করা হয়েছে এ সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছি। কোন তারিখে এ কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা আলোচ্য সূরায় স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআন থেকে আমরা জানতে পারলাম রমযান মাসে ক্বদরের রাতে পবিত্র কোরআন তথা প্রথম ওহী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু এ ধারণা আমরা পাচ্ছি না, রমযান মাসের কোন তারিখে ক্বদরের রাত। এ তারিখ সম্পর্কে

অবগত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো হাদীস এবং হাদীস শাস্ত্রের যারা বিশারদ তাদের গবেষণা। ইবনে আব্দুল বার এবং মাসউদী বর্ণনা করেছেন, 'আবরাহার কা'বা আক্রমণের এক চল্লিশ বছরের সময় অর্থাৎ হস্তী বছরের রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।' বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে ক্বাইয়্যেম তাঁর 'যাদুল মায়াদ' নামক গ্রন্থে উক্ত তারিখ সম্পর্কে বলেছেন,'অধিকাংশ গবেষকগণ এ তারিখ সমর্থন করেছেন।'

অন্যান্য গবেষকগণ বলেন, 'প্রথম ওহী অবতীর্ণের প্রায় ছয় মাস পূর্ব থেকে আল্লাহর রাসূলকে যে সত্য স্বপ্ন দেখানো শুরু করা হয়েছিল, তখন থেকে তাঁরা হিসাব করে এ তারিখ নির্ণয় করেছেন।

কোন কোন গবেষক বলেছেন, রমযান মাসের সাত তারিখে প্রথম কোরআন অবতীর্ণ হয়। ইবনে সাআদ বলেছেন, রমযান মাসের বারো তারিখে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। বাকের বলেছেন, রমযান মাসের সতের তারিখে পবিত্র কোরআনের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়। বালাযুরী ইমাম বাকেরের বর্ণনা পেশ করেছেন।

কোন হাদীসে দেখা যায় হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার নামোল্লেখিত বর্ণায় ঐ তারিখের কথা। ইবনে আসীর এবং আত্ তাবারী আবু কেলাবাতুল জারমীর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, সে তারিখ ছিল রমযান মাসের ১৮ তারিখ। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন, সে তারিখ ছিল রমযান মাসের চব্বিশ। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, পবিত্র কদরের রাতে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই কদরের রাত–রমযানের কোন রাত তা কোরআন এবং হাদীসে স্পষ্ট করে না বলা হলেও এটা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, রমযানের শেষ দশদিনের মধ্যে যে কোন একদিন কদরের রাত।

হাদীস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনে বলেছেন, কদরের রাত হলো রমযান মাসের শেষ দশ রাতের মধ্যে এক বে-জোড় রাত। অর্থাৎ হতে পারে তা ২১-২৩-২৫-২৭-২৯–এর মধ্যের কোন রাত। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনে বলেছেন, কদরের রাতকে তোমরা রমযানের শেষ দশ রাতের ভেতরে অনুসন্ধান করো। রমযান মাস শেষ হতে যখন ৯ দিন অবশিষ্ট থাকে অথবা ৫ দিন অবিশষ্ট থাকে। অধিকাংশ হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসের অর্থ করেছেন বেজোড় রাত। (বুখারী)

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, ৯ দিন, ৭ দিন, ৫ দিন অথবা ৩ দিন অথবা শেষ রাত। এই দিনগুলোয় তোমরা কদর অনুসন্ধান করো। (তিরমিজী ও নাসায়ী)

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহর নবীর কাছ থেকে শুনে বলেছেন, কদরের রাত হলো সাতাইশ বা উন্ত্রিশে রমযানের রাত। (তায়ালিসী, আবু দাউদ)

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, কদরের রাত হচ্ছে রমযানের শেষ রাত। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে কদরের রাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন সাহাবাদের অনেকেরই সন্দেহ ছিল না যে, কদরের রাত ছিল রমযান মাসের সাতাইশের রাত। যেমন হযরত ওমর ও হযরত হোজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা। (ইবনে আবি শায়বাহ্)

যির ইবনে হুবাইশ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে কদরের রাত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব শপথ করে বলেছিলেন, সে রাত হলো রমযানের সাতাইশের রাত। (ইবনে হিব্বান, আহ্‌মাদ, নাসায়ী, মুসলিম, তিরমিজী ও আবু দাউদ)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন, আল্লাহর নবী বলেছেন, লাইলাতুল কদরকে তোমরা রমযানের শেষ দশ রাতের ভেতরে বেজোড় রাতে সন্ধান করো। (বোখারী, আহমাদ, মুসলিম ও তিরমিজী)

কোন কোন তাফসীরকার 'কাদ্‌র' শব্দের অর্থ করেছেন তাকদীর। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, এই রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকদীরের ফায়সালা জারী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ফেরেশ্‌তাদের ওপরে দায়িত্ব অর্পণ করেন। বলা হয়েছে-

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ -

এটা ছিল সেই রাত যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা দেয়া হয়ে থাকে। (সূরা দুখান-আয়াত-৪)

উল্লেখিত আয়াতে 'আমরিন হাকিম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষকগণ এর দুটো অর্থ গ্রহণ করেছেন। একটি অর্থ হলো, 'সেই নির্দেশটি সরাসরি জ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে এবং তাতে কোন ভুল-ক্রটি বা অপূর্ণতার কোনই সম্ভাবনা নেই।' আরেকটি অর্থ হলো, 'সেটি অত্যন্ত কঠিন, দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে-যা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই।' এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, মহান আল্লাহর রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় এটা এমন একটি রাত-যে রাতে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশসমূহের তাকদীরের ফায়সালা করে তাঁর সম্মানিত ফেরেশ্‌তাদের কাছে অর্পণ করেন। পরবর্তীতে তাঁরা ঐ ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করতে থাকেন। কেউ কেউ উল্লেখিত আয়াতকে শা'বান মাসের পনের তারিখ তথা লোকদের কাছে পরিচিত 'শবে বারাত' সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক ও চিন্তাবিদগণ বলেছেন, উল্লেখিত আয়াত 'লাইলাতুল কদ্‌র' সম্পর্কেই প্রযোজ্য। আহকামুল কোরআনে কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী শবে বারাত সম্পর্কে বলেছেন, 'শা'বানের পনের তারিখ তথা নেস্‌ফে শা'বান সম্পর্কে কোন একটি হাদীসও নির্ভরযোগ্য নয়, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ফযিলত সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে, তা কোনদিক দিয়েই নির্ভরযোগ্য নয়। ঐ রাতে মানুষের ভাগ্যের ফায়সালা হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে, তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

আলোচ্য সূরার ৩ নম্বর আয়াতে লাইলাতুল কাদ্‌র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এই মর্যাদাপূর্ণ রাতটি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।' কারণ এই রাত একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী ও সমগ্র মানব মন্ডলীর ভাগ্য রচনাকারী রাত। এই রাত যেমন ভাগ্য রচনাকারী তেমনি বিপর্যয়ের রাত। ভাগ্য রচনাকারী রাত তাদের জন্য যারা আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্‌ এবং এই রাতে অবতীর্ণ কিতাবের অনুসারী। আর ভাগ্য বিপর্যয়কারী রাত তাদের জন্য, যারা নিজেদের মনগড়া বিধান অনুসারে পৃথিবীকে পরিচালিত করতে চায়। এই রাতে অবতীর্ণ কিতাব শুধুমাত্র একটি কিতাবই নয়, এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, যা সমগ্র পৃথিবীর মানব মন্ডলীর ভাগ্য পরিবর্তনকারী কিতাব। এই রাতে গোটা মানব মন্ডলীর কল্যাণের জন্য, মানবতার মুক্তির জন্য সেই মহান কাজটি সুসম্পন্ন করা হয়েছে, যা মানবেতিহাসের অগণিত মাসেও করা হয়নি।

হাজার মাসের থেকেও এই রাত উত্তম-এ কথার অর্থ এটা নয় যে, এক হাজার মাসের থেকেও এই রাত উত্তম। আরবের অধিবাসীগণ অগণিত বা অসংখ্য কিছু বুঝাতে 'আলফি' বা হাজার শব্দটি ব্যবহার করতো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের বোধগম্য শব্দের মাধ্যমে বুঝিয়ে থাকেন, এ জন্য বলা হয়েছে সেই রাত হাজার মাসের থেকেও উত্তম। প্রকৃত পক্ষে সেই রাত হাজার নয়, লক্ষ নয়, শত কোটি রাতের থেকেও উত্তম। কারণ এটা সেই রাত-যে রাতে মানব মুক্তির মহাসনদ আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। এমন একটি কিতাব সেই রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল, যে কিতাব মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসে, মানুষকে সভ্যতা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি ধরনের সর্বোন্নত গুণ ও বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দেয়। মানুষের সামনে সেই বিধান পেশ করে, যা মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন ধরনের আইন-কানুন পেশ করে, যা মানুষের জন্য অনুসরণ করা অত্যন্ত সহজ।

এটা সেই রাত, যে রাতে অতুলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বলিত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল। শোষিত, নিপড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মুক্তির দিশারী হিসাবে ঐ রাতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। এটা সেই রাত, যে রাতে এমন এক বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, যা না ইতিপূর্বে হয়েছে, না আগামীতে আর হবে। শোষিত বঞ্চিত নিপড়িত মানবতাকে লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে উঠিয়ে সম্মানের আসনে আসীন করে দেয়ার, অধিকারীর অধিকার বুঝে দেয়ার, অন্যায়কারীর গতি স্তব্ধ করে দেয়ার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এই রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। নারী মুক্তির মহাসনদ সেই পবিত্র রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই মহামহিম রাতেই মানুষের আকিদা-বিশ্বাসে, চিন্তার জগতে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল মানুষের ক্ষুদ্র জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে। সেই রাত পৃথিবীর ইতিহাসে চির অমলিন এক বিস্ময়কর মহামূল্যবান রাত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় আল কোরআনুল কারীম সেই রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল, এ জন্যই সেই রাতের এত সম্মান ও মর্যাদা। এই সম্মানিত মর্যাদাবান কিতাব লাভ করে মানবতা ধন্য হয়েছে, এর শোকর হিসাবে মানুষকে রোজা পালন এবং রোজা শেষে আনন্দ উৎসব করার জন্য ঈদ পালন করতে বলা হয়েছে। এই রাতের ফযিলত বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল বলেন, এই রাতে যে ব্যক্তি না ঘুমিয়ে গোটা রাত নামাজ আদায়, কোরআন তেলাওয়াত ও যিক্‌রের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবে, আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির আগের ও পেছনের সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

সমস্ত ফেরেশ্‌তাদের নেতা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের নেতৃত্বে অগণিত ফেরেশ্‌তা মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশানুসারে এই রাতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। কল্যাণ আর মঙ্গলের বার্তা নিয়ে তাঁরা আগমন করেন। সে রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু কল্যাণ আর মঙ্গলেরই সুবিমল-সমীরণ প্রবাহিত হতে থাকে। এটা সেই রাত, যে রাত যে কোন ধরনের অকল্যাণের স্পর্শ মুক্ত। এই রাতের সূচনা লগ্ন থেকে বিদায় লগ্নের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তা সবই মানবতার কল্যাণে গ্রহণ করা হয়। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ব্যাপী-মহাবিশ্বের প্রতিটি পরতে পরতে সেই রাতে মহাকল্যাণের ধ্বনিই শুধু গুঞ্জন সৃষ্টি করে। ঐ সব ব্যক্তিরাই মহাসৌভাগ্যবান, যারা সেই রাতের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে, গোটা রাত জেগে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সূরা আল-বাইয়্যেনা

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৯৮

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটি আল 'বাইয়্যিনাতু'। এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরাটির অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কে কোরআনের গবেষকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য বিরাজমান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আতা ইবনে ইয়াসার, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ও কাতাদার মতানুসারে এই সূরা মাদানী। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এই সূরাকে মক্কী বলেছেন। গবেষকগণও মন্তব্য করেছেন, এই সূরায় আলোচিত বিষয়সমূহ থেকে এ কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না যে, এই সূরা মক্কী অথবা মাদানী। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, এই সূরা মক্কায় সে সময় অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মক্কার মুশরিক ও ইয়াহুদীদের সাথে সাথে আহ্‌লে কিতাব তথা খৃষ্টানরাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করছিল।

আল্লাহর কোরআনের সূরাসমূহকে মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁর রাসূল সাহাবাদের মাধ্যমে সজ্জিত করেছেন। সূরা আলাক ও সূরা আল কাদ্‌রের পরে এই সূরাকে স্থান দেয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সূরা আলাকের মাধ্যমে ওহীর সূচনা করা হয়েছে। আর সূরা কাদ্‌রে সেই ওহী কোন মাসে এবং কোন রাতে অবতীর্ণ হয়েছে তা জানানো হয়েছে এবং এই সূরায় আলোচনা করা হয়েছে, যে মানবতার মুক্তির মহাসনদ হিসাবে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কিতাবের সাথে একজন রাসূল প্রেরণও অপরিহার্য–এই কথাটিই আলোচ্য সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ যে কিতাব মানব জাতির মুক্তির লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কিতাবের শিক্ষার বাস্তব অনুশীলন করে দেখানোর জন্য একজন রাসূলের প্রয়োজন অপরিহার্য।

বলা হয়েছে, পৃথিবীর মানুষ যে অবস্থাতেই নিমজ্জিত থাক না কেন, তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন করার জন্য একজন রাসূলের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য এবং তিনি যে প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল, এ কথা প্রমাণ করার জন্য রাসূলের ব্যক্তি সত্তাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যাঁকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এটা সমুজ্জ্বল এবং উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে যে, তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। রাসূল হিসাবে তিনি তাঁর ওপরে অবতীর্ণ কিতাবের শিক্ষা মানুষের কাছে পেশ করবেন, কিভাবে তা অনুসরণ করতে হবে, তা নিজ জীবনে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেবেন এবং কিতাব যে কোন ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে। কোরআনের পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে তার অনুসারীরা সেই কিতাবের ভেতরে যেভাবে সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়েছে, এই কোরআনে সেরূপ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে না।

পৃথিবীতে অতীতে যেসব জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা সত্য পথের সন্ধান লাভ করেনি বলে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল, এ কথা ঠিক নয়। প্রত্যেক জনপদে হেদায়াতকারী প্রেরণ করা হয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথ তাদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা স্বয়ং সেই হেদায়াতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে এবং এভাবেই তারা ভ্রান্ত পথে ধাবিত

হয়েছে। তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য স্বয়ং তারাই দায়ী এবং বর্তমানেও রাসূলের মাধ্যমে যে হেদায়াত প্রেরণ করা হয়েছে, এই হেদায়াত যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে পথভ্রষ্টতার জন্য স্বয়ং তারাই দায়ী হবে। পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল তথা হেদায়াতকারী প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই মানুষকে সেই একই বিধানের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন যে, তোমরা নিজের কণ্ঠ থেকে সমস্ত কিছুর গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো আর এ ব্যাপারে অন্য কারো সাথে শরীক করো না।

তোমরা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে, নামাজ আদায় করবে এবং যাকাত দান করবে আর এটাই হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত অভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থা যারা অনুসরণ করবে না, রাসূলকে একমাত্র নেতা হিসাবে যারা মেনে নেবে না, তারা সৃষ্টির মধ্যে সবথেকে নিকৃষ্ট। পরিশেষে এদের স্থান হবে জাহান্নামে। আর যারা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থানুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে, সৎকাজ করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে, তারা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অত্যন্ত উঁচুমানের সৃষ্টি। এদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জান্নাত। এই লোকগুলোর কর্মকান্ডের প্রতি মহান আল্লাহ যেমন সন্তুষ্ট তেমনি এরাও আপন রব-মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং এই লোকগুলোর উত্তম কাজের জন্য সর্বোত্তম বিনিময় এটাই।

সূরা বাইয়্যেনা-মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত-৮-রুকু-১

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى

تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيْهَا كُتُبٌ

قَيِّمَةٌ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ

الْبَيِّنَةُ ۞ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ

وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ

هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۞

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মাঝে (যারা আমার আয়াতকে) অস্বীকার করে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র নিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা কখনো ফিরে আসতো না, (২) (আর সে প্রমাণটি হচ্ছে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূল (আসবে,) যারা (এদের) আল্লাহর পবিত্র কিতাব পড়ে শোনাবে, (৩) এতে রয়েছে উন্নত (মূল্যবোধ) ও সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) আগের কিতাবধারী লোকেরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও বিভেদ ও অনৈক্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। (৫) (অথচ) এসব লোকদের এ ছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও ইবাদাতকে নিবেদিত করে নেবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে, (কেননা) এই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান।

(৬) আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মাঝে যারা (আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলকে) অস্বীকার করেছে, তারা অবশ্যই জাহান্নামে (থাকবে), সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে এ লোকগুলোই হচ্ছে নিকৃষ্টতম। (৭) অন্যদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তারাই হচ্ছে সৃষ্টিকুলের (মধ্যে) সর্বোৎকৃষ্ট। (৮) তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার রয়েছে-(এমন এক) জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে ঝর্ণাধারা। এরা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন, এরাও হবে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট। (মূলত) এ হচ্ছে সে (ব্যক্তির পুরস্কার) যে তার মালিককে ভয় করেছে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে কাফির, মুশরিক এবং ইয়াহুদী-নাসারাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা যে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে, যে ভুল পথে এরা ধাবিত হচ্ছে, এই পথ থেকে এদেরকে সত্য-সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উজ্জ্বল অকাট্য দলিল বা সুস্পষ্ট প্রমাণপত্র প্রেরণ ব্যতীত অন্য কোন পথ উন্মুক্ত নেই। সেই সুস্পষ্ট প্রমাণ কি, তা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফির ছিল।' আহলে কিতাব ও মুশরিক এই উভয় শ্রেণীর লোকই সুস্পষ্ট কুফরিতে নিমজ্জিত। কুফরীর দিক থেকে এরা এক ও অভিন্ন কিন্তু এরপরও এই গোষ্ঠীকে আলোচ্য আয়াতে দুটো ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো, আহলে কিতাব বলতে সেই সব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কোরআন অবতীর্ণের পূর্বে পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের ওপরে অবতীর্ণ করা কিতাবসমূহের ভেতর থেকে পরিবর্তিত বা বিকৃত অবস্থায় যে কিতাব বর্তমান রয়েছে এবং তারা তার প্রতি স্বীকৃতি দেয় বা মেনে চলে।

যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা। এদের কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা কিতাব ছিল কিন্তু তারা এর ভেতরে নিজেদের ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে, সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেসব বিষয় হারাম ঘোষণা করেছেন, এরা তা হালাল করে নিয়েছে এবং আল্লাহর সাথে শিরক্ করেছে। খৃষ্টানরা বলেছে, তাদের নবী ঈসা-মসীহ হলেন স্বয়ং আল্লাহর পুত্র এবং তারা সেই সুবাদে আল্লাহর আত্মীয়-স্বজন। অপরদিকে ইয়াহুদীরা বলেছে, তাদের নবী উজাইরও আল্লাহর পুত্র। এভাবে তারা মহান আল্লাহর সাথে শিরক্ করেছে কিন্তু আল্লাহর কোরআনে কোথাও এদেরকে মুশরিক বলা হয়নি। এদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, এরা আহলে কিতাব বা যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে সেই সব লোক অথবা ইয়াহুদ-নাসারা। এরা তাওহীদের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বিকৃত একটি আদর্শ দাঁড় করিয়েছে।

আর মুশরিক বলা হয় তাদেরকে যারা তাওহীদের প্রতি, কোন নবী-রাসূলের প্রতি, আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী ও অনুসারী নয় এবং তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা কোন বিকৃত কিতাবেরও কোন অস্তিত্ব নেই। এদের গোটা জীবনধারাই শিরকে পরিপূর্ণ এবং শিরকের ওপরেই এদের গোটা জীবনের ভিত্তি স্থাপিত। এরা বিকৃতভাবেও তাওহীদকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এই আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের মধ্যে শুধু মাত্র আকিদা-বিশ্বাস ও চিন্তার ক্ষেত্রেই পার্থক্য নেই, এদের শরীয়াতের বিধানের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। আহলে কিতাবরা কোন কাজ করলে বা পশু যবেহ করলে তা স্বয়ং স্রষ্টার নামে করে থাকে। কিন্তু মুশরিকরা এর ব্যতিক্রম। এরা এদের কল্পিত বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে যে কোন কাজের সূচনা করে, তাদের নামেই পশু যবেহ করে এবং যে কোন ব্যাপারে এরা নির্ভর ও আশ্রয়

কামনা করে দেব-দেবীর কাছে। এ জন্য আহলে কিতাবরা মুসলমানদের কিছুটা কাছাকাছি থাকলেও মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফির ছিল।' এই আয়াতে ব্যবহৃত 'কুফর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার ধরণ তথা কুফরী আচার-আচরণ ও ব্যবহারের যতগুলো ধরন ও রূপ রয়েছে-তা সবই এই আয়াতের ভেতরে বিদ্যমান। এমন অনেক লোক রয়েছে যারা কোন স্রষ্টাকেই বিশ্বাস করে না। কিছু লোক রয়েছে যারা স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু তাঁর অসীম ও অসংখ্য গুণাবলীসহ তাকে বিশ্বাস করে না। কেউ তাকে বিশ্বাস করে কিন্তু সেই সাথে তাঁকে একমাত্র আইন ও বিধানদাতা হিসাবে বিশ্বাস করে না। কেউ তাকে বিশ্বাস করে কিন্তু সেই সাথে তাঁর শরীক রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। কেউ বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং স্রষ্টার যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই গুণ ও বৈশিষ্ট্য অন্যদের মধ্যেও রয়েছে, সুতরাং তারাও পূজনীয়।

কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তিনি হেদায়াতের জন্য নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করেছেন, এসবের প্রতি বিশ্বাস করে না। কেউ শুধুমাত্র একজন বা দু'জন বা ততোধিক নবী-রাসূলকে বিশ্বাস করে কিন্তু শেষনবীকে বিশ্বাস করে না। কেউ কিছু সংখ্যক নবী-রাসূলকে বিশ্বাস করে কিছু সংখ্যক নবী-রাসূলকে অবিশ্বাস করে। কেউ নবীকে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর আনিত জীবন বিধানের প্রতি বিশ্বাস করে না বা অনুসরণ করে না। কেউ তাকদীর বিশ্বাস করে কিন্তু পরকালের প্রতি সন্দিহান। কেউ আল্লাহর অবতীর্ণ করা কিতাবের এক অংশ মানে অপর অংশ মানেনা। কেউ আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধানের তুলনায় মানুষের বানানো বিধান যুগোপযোগী ও উত্তম বলে বিশ্বাস করে। কেউ আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় দলীয় আদর্শকে প্রাধান্য দেয়। কেউ বিশ্বাস করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া বিধি-বিধান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণযোগ্য এবং রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনে অনুসরণযোগ্য নয়।

এভাবে কুফরীর নানা ধরনের রূপ ও ধরন রয়েছে এবং কুফরীর কোন না কোন রূপ ও ধরনে মানুষ সেই অতীতকালে যেমন নিমজ্জিত ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কুফরীর যাবতীয় রূপ ও ধরনকেই কাফির নামে অবহিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে 'আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির ছিল' আল্লাহর এই কথার অর্থ এটা নয় যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক কাফির ছিল আর কিছু সংখ্যক ছিল না। বরং এই আয়াতে পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত কাফিরদেক দুইটি ভাগে বিভক্ত করে বলা হয়েছে, একভাগে ছিল কিতাবধারী কাফির আর আরেকভাগে ছিল কিতাব অস্বীকারকারী কাফির অর্থাৎ মুশরিক গোষ্ঠী। এই দুটো দল যে কুফরী অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তাদের এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার একটি মাত্র পথ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ উন্মুক্ত ছিল না। সেই একটি পথ হলো, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমুজ্জল দলিল প্রমাণ প্রেরিত হবে এবং তা কুফরীর প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগকে পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত করে তাদের সামনে তা সুস্পষ্ট করে দেবে। সেই সাথে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া জীবন বিধান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। এই ব্যবস্থা ব্যতীত কুফরীর নানা রূপ ও ধরনে নিমজ্জিত লোকগুলোকে তা থেকে বিরত করার দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না।

এই আয়াতের অর্থ এটাও নয় যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া জীবন বিধান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অখন্ডনীয় যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করলেই বুঝি কুফরীতে নিমজ্জিত লোকগুলো

তা থেকে বিরত হবে। বরং এর অর্থ হলো, কুফরীর গন্ধ শরীর থেকে ঝেড়ে মুছে পবিত্র হয়ে কোন আদর্শ গ্রহণ করার মতো উন্নত আদর্শ তাদের সামনে ছিল না। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া জীবন বিধান আসার পরে তা বর্তমানে রয়েছে। এখন এই কথা বলার কোন সুযোগ নেই যে, আমাদের সামনে কোন মহাসত্য নেই বিধায় আমরা কুফরীতে নিমজ্জিত রয়েছি। বরং মানব মুক্তির মহাসনদ লাভ করার পরেও যারা কুফরীতে নিমজ্জিত থাকবে, মানুষের বানানো আদর্শ অনুসরণ করবে, এর জন্য অন্য কেউ নয়-স্বয়ং তারাই দায়ী হবে। মহাসত্য প্রকাশিত হবার পরে তারা এখন আর আল্লাহর কাছে এই অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে না যে, 'আপনি আমাদেরকে সত্য পথপ্রদর্শন করেননি বিধায় আমরা কুফরীতে নিমজ্জিত ছিলাম। আমাদের সামনে আপনার দেয়া জীবন বিধান ছিল না বিধায় আমরা মানুষের বানানো আদর্শ অনুসরণ করেছি।'

মানুষ যেন এই অভিযোগ মহান আল্লাহর দরবারে উত্থাপন করতে না পারে, এ জন্য মানুষসহ সমস্ত সৃষ্টিকে পথপ্রদর্শন করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'আমাদেরকে সহজ সরল পথপ্রদর্শন করো' শিরোণাম থেকে 'সৃষ্টিসমূহের প্রতি আল্লাহর হেদায়াত' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

এ জন্য আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে এমন কোন জনপদ নেই, যেখানে হোদায়াতকারী প্রেরণ করা হয়নি এবং তাঁরা সকলেই এক আল্লাহর দাসত্ব করার দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ...اِلَى اخِرِالاٰيَةِ

এসব রাসূলই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল যেন তাদেরকে প্রেরণের পর লোকদের কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি প্রমাণ না থাকে। (নিসা-১৬৫)

এই উদ্দেশেই মহান আল্লাহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ও জনপদে হেদায়াতকারী ও তাঁদের সাথে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এই হেদায়াতকারীগণ বিপুল সংখ্যক মানুষ পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞানতত্ত্ব-মহসত্য পৌঁছিয়েছেন এবং পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাব রেখে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পৃথিবীতে প্রতিটি যুগেই মানুষের সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য কোন না কোন কিতাব বর্তমান ছিল। এরপরও যদি কোন ব্যক্তি, সমাজ, দল বা জনগোষ্ঠী পথভ্রষ্ট হয় সে জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর প্রেরিত হেদায়াতকারীকে দায়ী করা যেতে পারে না বরং তারাই এর জন্য দায়ী, যারা সত্য গ্রহণ করেনি। আহলি কিতাবের অনুসারীরা লোকগুলোও যেন বলতে না পারে, 'আমরা বিকৃত বা পরিবর্তিত কিতাবের অনুসরণ করতাম বিধায় আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি। আমরা জানতাম না যে, আমাদের কিতাবে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংযোজন বিয়োজন ঘটেছে।' তারা যে বিকৃত আদর্শের অনুসরণ করছে, এ কথা আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْجَاءَ كُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ..اِلَى اخِرِالاٰيَةِ

হে আহলি কিতাব! আমার এই রাসূল এমন এক সময় তোমাদের কাছে এসেছে ও দ্বীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা তোমাদের সামনে পেশ করছে, যখন রাসূল আগমনের ক্রমিকধারা দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ ছিল। (নবী এ জন্য এসেছে) যেন তোমরা বলতে না পারো যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। অতএব দেখো, এখন সেই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসেছে। (সূরা মায়িদা-১৯)

তারা কি ধরনের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল এবং কোন বিকৃতির শিকার তারা হয়েছিল, এ কথাগুলো আল্লাহর রাসূল তাদের সামনে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরও তারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে কোরআনের আদর্শ গ্রহণ করেনি, সত্য পথের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। সুতরাং তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য অন্য কেউ নয়-স্বয়ং তারাই দায়ী।

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'এদের হেদায়াতের জন্য বা সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ আসবে।' দ্বিতীয় আয়াতে সেই দলিল প্রমাণ কি, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, সেই দলিল প্রমাণ হলো আল্লাহর রাসূল। রাসূলই হলেন সেই উজ্জ্বল অকাট্য দলিল। কারণ রাসূলের নবুওয়াত লাভ করার পূর্ববর্তী জীবন ও পরবর্তী জীবন এবং তিনি নিরক্ষর হওয়ার পরও কোরআনের মতো একটি সর্বোন্নত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বিশ্বকোষ মানুষের সামনে পেশ করা, তাঁর উপস্থাপিত উন্নত মানের শিক্ষা ও তাঁর সংস্পর্শে তাঁর অনুসারীদের জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সূচিত হওয়া, তাঁর পেশকৃত সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিভিত্তিক আকীদা-বিশ্বাস, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ইবাদাত, উন্নতমানের পবিত্র নৈতিকতা ও মানব জীবনের জন্য সর্বোত্তম নীতি, আদর্শ ও আইন বিধানের শিক্ষাদান, তাঁর কথা ও কাজের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া, এবং যে কোন ধরনের বিরোধিতা ও প্রতিরোধ অতিক্রম করে অসীম সাহসিকতার সাথে তাঁর নিজ কর্ম ও আন্দোলনে অবিচলভাবে অব্যাহত রাখা, সূচিত আন্দোলনের ওপরে সুদৃঢ়ভাবে স্থির থাকা, প্রাণের শত্রুর প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণ ইত্যাদি গুণ ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ও তর্কাতিতভাবে প্রমাণ করছিল যে, তিনি প্রকৃত অর্থেই মহান আল্লাহর রাসূল এবং পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত লোকদের জন্য তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণ ও উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা।

দ্বিতীয় আয়াতে সহীফা শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রাসূল আসবেন তিনি এদেরকে পবিত্র সহীফা পড়ে শোনাবেন এবং সেই সহীফাতে থাকবে সর্বোন্নত মূল্যবোধ ও সঠিক বিষয়বস্তু, লিপিবদ্ধ থাকবে শাশ্বত ও সঠিক লেখাসমূহ। সহীফা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, লিখিত কাগজ। আল্লাহর কোরআনের এই শব্দটি নবী-রাসূলদের প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহকে বুঝানোর জন্য একটি উন্নত পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'সুহুফাম্ মুত্বাহ্হারাহ' তথা পবিত্র সহীফা বলতে বুঝায় এমন সহীফাসমূহ, যার ভেতরে কোন ধরনের জটিল, প্রমাণহীন, অবান্তর, কল্পিত, বিভ্রান্তিমূলক, মিথ্যা, নৈতিক অবক্ষয়মূলক বা নীতি বর্জিত কোন কথার সংমিশ্রণ ঘটেনি। যেসব কথা রয়েছে, তা সবই পবিত্র এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক এবং সর্বোন্নত নীতিমালার অলঙ্কারে সজ্জিত। মহান আল্লাহ যে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, সেই কোরআন উল্লেখিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। পৃথিবীতে ধর্মগ্রন্থের নামে যেসব গ্রন্থ চালু রয়েছে, সেসব গ্রন্থের একটিতেও উল্লেখিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সামান্য ছোঁয়া পর্যন্ত নেই।

এই কোরআন মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে যে ধরনের শিক্ষা ও আদর্শ এবং নীতিমালাসমূহ পেশ করেছে, তা যে কোন যুগের জন্য উপযোগী এবং এর মোকাবেলায় অধিক উন্নত নীতিমালা, শিক্ষা ও আদর্শ মানুষের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবেও না। আল্লাহর এই কিতাব হলো কালজয়ী-অমর, এই কিতাবের মোকাবেলা করার মতো একটি গ্রন্থের অস্তিত্ব ইতোপূর্বে কোনকালে ছিল না এবং আগামীতেও থাকবে না। এই কিতাব অনন্ত কাল ধরে তার নিজস্ব আলো বিচ্ছুরিত করে যেতেই থাকবে। মানুষকে প্রদর্শন করতে থাকবে নিত্য-নতুন জ্ঞানের আলোক বর্তিকা।

আলোচ্য সূরার ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আহলে কিতাব তথা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই সব কিতাবের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের বিভক্তি ও অনৈক্যের কারণ এটা ছিল না যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কাছে নবী-রাসূল এবং কোন কিতাব প্রেরণ করেননি। বরং অসংখ্য নবী ও রাসূল তাদের ভেতরে এসেছিলেন, তারা সেসব নবী রাসূলদের সাথে অমানবিক আচরণ করেছে। তাদেরকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। নবী-রাসূলদের অবর্তমানে আল্লাহর কিতাবসমূহে তারা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েছে। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'অভিশপ্ত ইহুদীদের ইতিবৃত্ত' শিরোণাম থেকে 'পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত খৃষ্টান জাতি' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

নিজেদের আদর্শে যখন তারা বিকৃতি ঘটিয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভেতরে অসংখ্য দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হলো সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণসহ। তারা শেষনবীকেও অস্বীকার করে নিজেদের বিকৃত আদর্শের ওপরে অটল থেকে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ অটুট রেখেছে। এই আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রথম বিভেদের ঘটনা ঘটে হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আগমনের পূর্বে অভিশপ্ত ইহুদীদের উপদলসমূহের মধ্যে। বিভেদের কারণে তারা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে তারা সবাই হযরত মূসা ও তাওরাত কিতাবের অনুসারী বলে নিজেদেরকে দাবী করতো। সে সময়ে এরা প্রধান যে পাঁচটি দলে বিভক্ত হয় তাহলো, সামেরী, সাদুকী, আসেয়ী, ফারেসী ও গালী। প্রত্যেকটি দল-উপদলের পৃথক নিদর্শন ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল।

তাদের এই ধর্মীয় মতানৈক্যের কট্টর রূপ প্রকাশিত হয় সিরিয়া ও রোম সাম্রাজ্যে ও মিসরের খৃষ্টানদের মধ্যে। এসব স্থানে যে দুটো দল ছিল, তার একটি হলো মালাকানী ও অপরটি ছিল মনোফেসী। এরা একদল বিশ্বাস করতো হযরত ঈসা একাধারে মানুষ ও স্বয়ং ইলাহ ছিলেন। অপর দলের বিশ্বাস হলো, হযরত ঈসা শুধুমাত্র ইলাহ ছিলেন। এই উভয় দল একে অপরকে বিধর্মী কাফির নামে আখ্যায়িত করে। সম্রাট হিরাক্লিয়াস পারসিকদে ওপর বিজয় লাভ করার পর খৃষ্টানদের সমস্ত দল উপদলকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ঐক্যের ব্যাপারে যে সূত্র আবিষ্কার করা হয় তাহলো, হযরত ঈশার প্রকৃত রূপ কি এবং তিনি মানুষ না স্বয়ং ইলাহ ছিলেন, অথবা মানুষ ও ইলাহ-এই দুই রূপের সংমিশ্রণ তার ভেতরে ঘটেছিল, এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই তত্ত্ব প্রথমে গ্রহণ করে তা রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে। রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত গির্জাসমূহ এই তত্ত্ব মেনে নেয় এবং এই তত্ত্বকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যে কোন মূল্যে সবকিছুর ওপরে স্থান দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মিসরের খৃষ্টানরা এই তত্ত্বকে অস্বীকার করে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস খৃষ্টধর্মের এই মতানৈক্য দূর করে মহান আল্লাহ যে একক, এই ধারণা মেনে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন। এ ব্যাপারে কোন ধরনের মতভেদ সৃষ্টি করা বা বিতর্ক উত্থাপন করাকে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তারপর এই মতকে রাষ্ট্রের অভিমত হিসাবে তিনি সমগ্র প্রাচ্য দেশে প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু এত কিছু করেও খৃষ্টানদের মধ্যের বিভেদ দূর করা যায়নি। তারা এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ভিন্নমতাবলম্বীকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে, পশুর চামড়ার মধ্যে ভরে পানিতে ডুবিয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত নৃশংস পদ্ধতিতে হত্যা করতে থাকে। এভাবে ইহুদী আর খৃষ্টানদের নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ চরম নৃশংসতার জন্ম দেয়। এসব অমানবিক পশুসুলভ ঘটনা এ জন্য ঘটেনি যে, তাদের কাছে

কোন জ্ঞান ছিল না। বরং প্রকৃত সত্য জানার পরেও একমাত্র বিকৃতি, স্বার্থ ও পদের লোভে তারা পরস্পরে হানাহানীতে লিপ্ত হয়েছিল। এ জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য **সূরার ৪ নম্বর আয়াতে** এসব কিতাবধারীদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আগের কিতাবধারী লোকেরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও বিভেদ ও অনৈক্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।'

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম একজন নবী-রাসূল ও বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে ইসলামের আগমন। তাঁর পর থেকে আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে যতো নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সবাই স্ব স্ব গোষ্ঠী ও জনপদের অধিবাসী এবং নিজ জাতিকে সেই চির সবুজ ইসলামের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন। এই পৃথিবীতে নবী ও রাসুলদেরকে প্রেরণ করা হয় পথভ্রষ্ট মানুষকে সত্য ও সহজ সরল পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে। তাদের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে তাঁরই গোলামীর দিকে আহ্বান করা। একমাত্র আল্লাহকেই সমস্ত শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করা, তাঁকেই প্রতিপালক হিসেবে মান্য করা, একমাত্র আল্লাহকেই নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়াই হলো মানুষের কর্তব্য, এই কর্তব্য পালনের দিকেই মানুষকে আহ্বান করাই হলো পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্বই সমস্ত নবী ও রাসূল পালন করেছেন।

প্রত্যেক নবীই তাঁর নিজের জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্বরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে তাঁরা শিক্ষা দান করেন, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। নবী ও রাসূলগণ তাঁর অনুসারীকে মূর্তি পূজা এবং শিরক থেকে হেফাজত করেন। সমাজে প্রচলিত মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় প্রথা থেকে তাদেরকে বিরত রাখেন। আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় জীবন যাপন করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহর আইন প্রচলিত করে তা মেনে চলার জন্য পরামর্শ দান করেন।

পৃথিবীর এমন কোন জনপদ বা নগরী নেই, যেখানে মহান আল্লাহ্ নবী প্রেরণ করেননি। প্রত্যেক নবীর প্রচারিত আদর্শ ছিল ইসলাম। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রত্যেক নবীর শিক্ষা পদ্ধতি এবং আইন কানুনে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নবীগণ তাদের জাতির ভেতরে যেসব মূর্খতা অজ্ঞানতা কুসংস্কার এবং অনাচার প্রচলিত হয়ে পড়েছিল, সেগুলোর মূল উৎপাটনের ব্যাপারে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। যে সব ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা জাতিকে গ্রাস করেছিল, এসব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতির দিক দিয়ে জাতি যখন প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল তখন নবীগণ তাদেরকে আইন কানুন দান করেছিলেন। তারপর ক্রমশঃ জাতি উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে, সেই সাথে তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও আইন কানুনও ব্যাপকভাবে দান করেছেন। মোট কথা নবী ও রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করার জন্য ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও মানুষকে নামাজের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীতে যারা মনিব সেজে বসেছে, যারা দাসত্ব গ্রহণ করছে, মানুষকে যারা নিজেদের বানানো আদর্শ, মতবাদ, আইন-কানুনের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছে, তাদেরকে যেন সাধারণ মানুষ অস্বীকার করে, এই অনুপ্রেরণা মানুষের ভেতরে জাগ্রত করা এবং তাদেরকে সংগ্রাম মুখর করে গড়ে তোলাও নবীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের কাছে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَافِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا. اِلَى اخِرِالايَةُ

প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভেতরেই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশসহ যে, তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয় বা নিজেদের দাস বানিয়ে রাখে এমন সব শক্তিকে অস্বীকার করো। (নাহল-৩৬)

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে জীবন বিধান রচনা করেছেন নবী এবং রাসূলগণ তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। এ দায়িত্ব পালন করেন নবীগণ। আল্লাহ তাঁর আইন-কানুন নিজে এসে কোন মানুষের কাছে দিয়ে যান না। তাঁর নিয়মের অধিনেই তাঁর আইন-কানুন মানুষের কাছে আসে। আল্লাহর নিয়ম হলো তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকেই একজনকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং তাঁর কাছে ফেরেশতার মাধ্যমে জীবন বিধান প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসূল এসেছেন তাঁরা তাদের গোটা জীবন ব্যাপী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করে যান। এ দায়িত্ব পালনে তাঁরা সামান্যতম কোন অবহেলা প্রদর্শন করেন না। মুহূর্তের জন্য তাঁরা ভুলে যাননা, কোন দায়িত্বসহ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সংশোধন করার জন্য যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সবাই মানুষকে একই দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রত্যেক নবীই বলেছেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই।' আমরা দেখি বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদগণ মানুষকে নিজের দলে আকৃষ্ট করার জন্য বা সরকারকে উৎখাত করার জন্য মুখরোচক কথাবার্তা বলে জনগণকে নিজের দিকে টানে। অথবা কোন সাময়িক সমস্যার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। তারপর ক্ষমতায় বসে নিজের আসল রূপ প্রকাশ করে।

পৃথিবীতে কোন নবী কিন্তু এমন করেননি। তাঁরা দেশের কোন সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেননি। অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়ে মানুষের সামনে অবতীর্ণ হননি। কৃত্রিম কোন বিষয় তাঁর জাতির সামনে টেনে আনেনি। তাঁরা সরাসরি বলেছেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই।' এই কথা শোনার সাথে সাথে নবীর পরিবার, সমাজ, দেশ কেন তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেছে তা চিন্তা করে দেখার বিষয়। ইলাহ শব্দ দিয়ে তাঁরা কি বুঝিয়েছেন যে, নবীদেরকে মানুষ নির্যাতন করেছে, হত্যা পর্যন্ত করেছে। প্রত্যেক নবীর ওপরেই নির্যাতন করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই বলার কারণে।

সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি, শোষকের দল, শাসকের দল যখন বুঝেছে, নবীগণ যে ইলাহ-এর কথা বলছে, তাকে ইলাহ বলে গ্রহণ করলে নিজের কর্তৃত্ব বলতে আর কিছুই থাকবে না, সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে হবে, তখনই তারা নবীর সাথে তথা দ্বীনি আন্দোলনের সাথে শত্রুতা করেছে বর্তমানেও করছে। প্রত্যেক নবীর সাথেই তৎকালীন সমাজের এবং শাসকের সাথে এই ইলাহ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। কোরআনে বিবৃত এ সমস্ত কাহিনী অন্য কোন পৃথিবীর নয়, বরং যে পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে, মানুষের সাথে যে পৃথিবী সম্পর্কিত সেই পৃথিবীরই ঘটনা এবং এ সমস্ত ঘটনা মানুষের সাথে সম্পর্কিত। নবী এবং রাসূলগণ যে দেশে এবং জাতির ভেতরে আগমন করেছেন, তাদের রাজনৈতিক সমস্যা ছিল, অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল, সাংস্কৃতিক সমস্যা ছিল তথা নানা ধরণের সমস্যা ছিল। সে সব সমস্যা সমাধানেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নবী ও রাসূলগণ, তাদের অনুসারী ইসলাম প্রতিষ্ঠার

আন্দোলনে নিবেদিত ব্যক্তিবর্গ প্রতিটি দেশেই সব ধরণের সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র একটি সমস্যা সামনে রেখেছেন। সে সমস্যা হলো ইলাহ্ কেন্দ্রিক।

তাঁরা অন্য কোন সমস্যা জাতির সামনে তুলে না ধরে প্রধান সমস্যা অর্থাৎ সবধরনের তাগুতের দাসত্ব ত্যাগ করে মহান আল্লাহকে ইলাহ বলে স্বীকৃতি দিতে বলেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রথম আহ্বানেই বলেছিলেন, হে মানুষ! বলো আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ্ নেই। তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (ইয়া আইয়ুহান্নাস! কুলু লাইলাহা ইল্লাল্লাহ......তুফলিহু।)

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, পৃথিবীতে কোন সমস্যার সৃষ্টি তখনই হয়, যখন মানুষ আল্লাহকে রব হিসেবে, ইলাহ হিসেবে পরিত্যাগ করে। নিজেকে, সমাজের নেতাকে, প্রচলিত প্রথাকে, নিজের পরিবারকে, সমাজের আইনকে, দেশের শাসককে, দেশের নানা ধরণের নীতিকে, দৃষ্টির সামনের সাময়িক স্বার্থকে, ধর্মনেতাকে তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে নিজের মাবুদ বা ইলাহ তথা রব্ব হিসেবে প্রধান্য দান করেছে, তখনই দেশে, সমাজে, ব্যক্তি জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে নানা ধরণের সমস্যার আবির্ভাব ঘটেছে। এ কারণে নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ দেশের, সমাজের সমস্ত সমস্যা উপেক্ষা করে প্রধান সমস্যার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আলোচ্য সূরার ৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত কথাগুলোই বলা হয়েছে। পৃথিবীতে যতো নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তাঁরা ঐ একটি বিষয়ের দিকেই মানব জাতিকে আহ্বান করেছেন। ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিজেদের দ্বীন ও ইবাদাতকে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই নিবেদিত করে নেবে।' (এ কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার ইবাদাতের তাৎপর্য' শিরোণাম থেকে 'ইবাদাতের পূর্ব শর্ত লক্ষ্য স্থির করা' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

গোটা মানব গোষ্ঠীকে একটি মাত্র আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে-অন্য কারো নয়। আল্লাহর দাসত্বের ক্ষেত্রে অন্য কারো দাসত্বের সংমিশ্রণ ঘটাবে না। সে যে আল্লাহর দাসত্ব করছে, তার প্রমাণ সে দেবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে। যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো না বা নামাজের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করলো, সে এ কথাই প্রমাণ করলো যে, তার পক্ষে আল্লাহর দাসত্ব করা সম্ভব নয়। এরপর সে যাকাত আদায় করবে। আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে সে এ কথা প্রমাণ করবে যে, সে এই ধন-সম্পদের মালিক নয়। মহান আল্লাহ তার কাছে এসব ধন-সম্পদ অনুগ্রহ করে গচ্ছিত রেখেছেন এবং তাঁরই নির্দেশে সে এই সম্পদ ব্যয় করছে। সে আল্লাহর দাস এবং প্রয়োজনে আল্লাহর নির্দেশে সে তার যাবতীয় সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। আর সে যদি যাকাত আদায় না করে, তাহলে সে এ কথাই প্রমাণ করলো যে, সে মহান আল্লাহর আদেশ মানতে মোটেও প্রস্তুত নয়। মানুষ একমাত্র আল্লাহর গোলামী করবে এবং এই গোলামীর নিদর্শন স্বরূপ সে নামাজ আদায় করবে এবং যাকাত দেবে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, এটাই হচ্ছে সহজ সরল এবং সঠিক জীবন বিধান। মানুষ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাইলো, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে একটি সহজ সরল ও সঠিক জীবন বিধান দান করুন।' ঐ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতে বলা হলো, একমাত্র আমারই গোলামী করবে অর্থাৎ শুধুমাত্র আমার দেয়া বিধি-বিধান অনুসরণ

করবে এবং নামাজ আদায় করবে-যাকাত দেবে। আর এটাই হলো চিরস্থায়ী ও সহজ সরল সঠিক জীবন বিধান।

৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আহলে কিতাব তথা ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা যারা আল্লাহ এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে ঈমান আনেনি, তাঁকে অনুসরণ করেনি, তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে এবং সেখান থেকে কখনোই মুক্তি পাবে না। কারণ তারা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অত্যন্ত নিকৃষ্টতম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত সর্বশেষ এবং বিশ্বনবী, তাঁর ব্যক্তি সত্তাই এ কথার সবচেয়ে বড় সাক্ষী। সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ দেখার পরেও যারা তাঁকে অমান্য করেছে, তাঁর আদর্শ গ্রহণ করেনি, আল্লাহর সৃষ্টিলোকে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কোন সৃষ্টি নেই। এমনকি তারা জন্তু-জানোয়ারের তুলনায়ও হীন ও নগণ্য। কারণ জন্তু-জানোয়ারের তো বিবেক বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। কর্মের দিক থেকেও তারা স্বাধীন নয়। কিন্তু সত্য অস্বীকারকারী এই মানুষগুলো বিবেক বুদ্ধি থাকার পরও আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করছে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করছে না।

৭ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ৬ নম্বর আয়াতের বিপরীত কথা। এই আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ রাসূল আগমনের পরে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, কিতাবের অনুসরণ করেছে, রাসূলকেই একমাত্র আদর্শ নেতা হিসাবে অনুসরণ করেছে, তারা সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। এমনকি ফেরেশ্তাদের তুলনায়ও অধিক উত্তম ও সম্মান মর্যাদার অধিকারী। কারণ ফেরেশ্তাদের কোন কর্মের স্বাধীনতা নেই। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার শক্তি তাদের নেই। আর এই মানুষগুলো স্বাধীন এবং তারা ইচ্ছে করলে আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে পারে। এরপরও তারা আল্লাহর আইনের অধিনে নিজেদের জীবন পরিচালিত করছে, রাসূলের আনুগত্য করছে এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রতিকুল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। সুতরাং এরাই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

৮ নম্বর আয়াতে ৭ নম্বর আয়াতে বর্ণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে পুরস্কার রয়েছে-এমন এক জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত থাকবে ঝর্ণাধারা। এরা সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন, এরাও হবে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট। মূলত এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পুরস্কার যে তার মালিক-রব্ব-কে ভয় করেছে।' অর্থাৎ পৃথিবীতে যাবতীয় কর্মকান্ডের ব্যাপারে তারা একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করেছে। তাদের সমস্ত কর্মের হিসাব আদালাতে আখিরাতে মহান আল্লাহর কাছে দিতে হবে, এ কথা তারা স্মরণে রেখেছে। নিজের অজান্তেও যেন আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন কাজ হয়ে না যায়, সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছে। পৃথিবীতে এরা যুগের গড্ডালিকা প্রবাহে দেহ-মন এলিয়ে দিয়ে জীবন-যাপন করেনি। আল্লাহর কাছে গ্রেফতার হতে হবে-এমন ধরনের কোন কাজ ও কথা তারা বলেনি। এই ধরনের লোকদের জন্যই মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট নেয়ামত রেখেছেন।

সূরা আয-যিলযাল

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–৯৯

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ– এই সূরার প্রথম আয়াতের শেষে 'যিলযালাহা' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূরাটির অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কেও গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য বিরাজমান। কেউ বলেছেন, এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে আবার কেউ বলেছেন এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে অধিকাংশ গবেষকগণ এই সূরার মূল বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গীকে কেন্দ্র করে বলেছেন, এই সূরা মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এই সূরায় ইসলামের মৌল আকিদাসমূহ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মানুষের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে–যেন মানুষের মনে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবন কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং এই পৃথিবীতে মানুষ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে অপরাধই সংঘটিত করেছে, তা সেদিন তার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সেদিন পৃথিবীকে এমনভাবে কম্পিত করা হবে যে, সেদিনের যাবতীয় ঘটনাবলী মানুষের ভেতরে যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করবে। মানুষ এই পৃথিবীতে যা কিছুই করছে এবং যে মাটির ওপর সে দাঁড়িয়ে করছে, এই মাটি এবং তার চার পাশের সমস্ত জিনিস সেদিন মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। নির্জীব ও প্রাণহীন বস্তুসমূহ মানুষের কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে, অথচ এ কথা কোন মানুষ কখনো কল্পনাও করেনি। অথচ এসবই সেদিন প্রতিটি মানুষের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশে কথা বলতে থাকবে।

এরপর মানুষ সেদিন দলে দলে পৃথিবীর প্রতিটি স্থান থেকে বের হয়ে এসে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। মানুষ এই পৃথিবীতে যেসব কাজ করেছিল তা সেদিন সবাইকে প্রত্যক্ষ করানো হবে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ কোন কাজই বাদ পড়বে না, ভালো কাজ যা করেছে তা যেমন দেখানো হবে তেমনি দেখানো হবে খারাপ কাজসমূহ। সেদিন কোন কিছুই গোপন বা অপ্রকাশিত থাকবে না।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু-১

(১) যখন পৃথিবীকে ঝাঁকুনি দিয়ে তার (প্রবল) কম্পনে (তাকে) কম্পিত করা হবে, (২) পৃথিবী তার ভেতরে যা রয়েছে (তখন তা) বের করে দেবে, (৩) তখন মানুষরা (হতভম্ব হয়ে) বলতে থাকবে, এর কি হলো? (যমীন সবকিছুকে উগ্‌লে দিচ্ছে কেন?) (৪) সেদিন সে (তার সবকিছু) খুলে খুলে বর্ণনা করবে, (৫) কেননা তাকে তার সৃষ্টিকর্তাই এ (কাজে)র আদেশ দেবেন। (৬) সেদিন সমগ্র মানব সন্তান দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে, যাতে করে তাদেরকে তাদের (কর্মকান্ডের) নথিপত্র দেখানো যায়। (৭) অতএব যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণও কোনো ভালো কাজ করবে (সেদিন) তা সে দেখতে পাবে, (৮) (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি অণু পরিমাণ খারাপ কাজও করে, তাকেও সে (তার চোখের সামনে) দেখতে পাবে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবন ব্যবস্থা তথা কিয়ামত সংঘটিত এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। **১ থেকে ৫ নম্বর আয়াত** পর্যন্ত বলা হয়েছে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সমস্ত মানুষ যখন পুনর্জীবন লাভ করবে, তখন সেদিনের সেই পৃথিবীকে এমন প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেয়া হবে যে, মৃত্তিকা অভ্যন্তরে যা কিছুই লুকায়িত ছিল, গোপন এবং প্রকাশিত ছিল, তা সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে। অর্থাৎ মাটির ভেতরে যা ছিল, তা সেদিন সবই মাটি উদগীরণ করে দেবে। সেদিনের সেই লোমহর্ষক দৃশ্য অবলোকন করে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের মনে কোন ধরনের ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি হবে না। কারণ তারা পৃথিবীতে অবস্থানকালেই আল্লাহর কিতাব থেকে জেনেছে, আদালতে আখিরাতে কি ঘটবে। সেদিন যা কিছুই ঘটবে আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস অনুসারেই ঘটবে।

কিন্তু পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেনি, পরকাল আখিরাতের প্রতি ছিল সন্দিহান বা বিশ্বাস করেনি, সেদিন যা কিছুই ঘটবে, তা তাদের চিন্তা-চেতনা ও

বিশ্বাসের পরিপন্থী হিসাবেই ঘটতে দেখবে। এ জন্য তারা সেদিন ভয়ে আতঙ্কে, ত্রাসে কম্পিত হতে থাকবে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘটমান ঘটনাসমূহ দেখতে থাকবে আর বলতে থাকবে, এসব কি ঘটছে! এসব না ঘটলেই তো ভালো হতো, তাহলে আজ আমরা এই মুসিবতের সম্মুখিন হতাম না।

যমীন সেদিন তার ভেতরে যা কিছুই লুকায়িত ছিল তা উদগীরণ করে দেবে। পৃথিবীতে মানুষসহ যাবতীয় প্রাণী যেখানে যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদের ফসিলসমূহ এবং মাটির সাথে মিশে যাওয়া দেহের অংশসমূহ একত্রিত হয়ে মাটির ভেতর থেকে উঠে আসবে। পৃথিবীতে মানুষ যা করছে এবং বলছে, তার কোন ধ্বংস নেই। মানুষের পায়ের নিচের যমীন ও চারদিকের বস্তুসমূহের ওপরে মানুষের প্রতিটি ক্রিয়া প্রতিফলিত হচ্ছে। এসব প্রতিফলিত দৃশ্যসমূহ সেদিন যমীন প্রকাশ করে দেবে। যেসব ধন-রত্ন ও সম্পদের জন্য পৃথিবীতে মানুষ পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করেছে, সংগ্রাম-আন্দোলন করেছে, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিন্‌তাই, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, হত্যা-খুন ও যুদ্ধ করেছে, অপরের অধিকার ক্ষুন্ন করেছে, সেসব অর্থ-সম্পদ সেদিন মাটি উদগীরণ করে দেবে। অপরাধী লোকগুলো সেদিন ধন-সম্পদ উদগীরণ করার সেই দৃশ্য বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে। তারা দেখতে থাকবে আর ভাবতে থাকবে, এই ধন-সম্পদের জন্যই পৃথিবীতে তারা অন্যায় অসৎ পথে অগ্রসর হয়েছিল, রক্তের নদী প্রবাহিত করেছিল। রাতের অন্ধকারে আরেকজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আজ সেসব ধন-সম্পদ তাদের সামনে স্তুপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে, কোনই কাজে আসছেনা। বরং এসব ধন-সম্পদই আজ তাদের জন্য চরম বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন মানুষের দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের কর্মকান্ড সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে থাকবে। মাটি তার নিজের ওপর সংঘটিত ঘটনাসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে থাকবে। সেদিন মাটিসহ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু গোপন বিষয়সমূহ নিজস্ব স্বাধীন শক্তি প্রয়োগ করে কিছুই বলতে পারবে না, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বলার আদেশ দেবেন বলেই তারা বলতে পারবে। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা এই মহাবিশ্বের যাবতীয় কিছুরই রব্ব, সমস্ত কিছুই একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং সেদিন প্রতিটি বস্তু তাঁরই আদেশে মানুষ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে থাকবে।

যমীনের ওপরে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনা সেদিন প্রকাশ করে দেবে-এই আয়াতটি আল্লাহর রাসূল তেলাওয়াত করে সাহাবাগণকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি বলতে পারো, যমীনের অবস্থাটা কি যা সেদিন সে বলবে?' সাহাবগণ আবেদন করলেন, 'এ বিষয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' রাসূল বললেন, যমীন সেদিন প্রতিটি নারী-পুরুষ সম্পর্কেই তাদের সেই কাজের সাক্ষ্য দেবে, যা সে যমীনের ওপর থেকে করেছে। যমীন বলবে, অমুক ব্যক্তি অমুক দিনে এই কাজ করেছিল। যমীন এসব অবস্থারই বিস্তারিত বর্ণনা দেবে।' (তিরমিযী)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাবস্থায় বায়তুল মালের যাবতীয় সম্পদ তার প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে বলতেন, 'হে বায়তুলমাল! তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আমি তোমাকে বৈধ পথে আসা সম্পদ দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিলাম এবং বৈধ পথেই তা ব্যয় করে তোমাকে শূন্য করেছি।'

আলোচ্য সূরার ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেদিন মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথকভাবে তার আমলনামা দেয়া হবে। ৭

ও ৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে একটি অণু পরিমাণও ভালো কাজ করেছে, সেও তার আমলনামায় তা দেখতে পাবে। তেমনি যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণও খারাপ কাজ করেছে, তাও সে তার আমলনামায় দেখতে পাবে।

পৃথিবীতে নবী-রাসূল ব্যতীত কোন মানুষই পাপের স্পর্শহীন নয়। সর্বোৎকৃষ্ট মুমিন বান্দারাও কোনো না কোনো পাপের বেষ্টনীতে আবদ্ধ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েক স্থানে ওয়াদা করেছেন, যারা তাঁর গোলামী করার ব্যাপারে সতর্ক, তাদের দ্বারা যেসব ক্ষুদ্র পাপ নিজের অজান্তে বা অসতর্কভাবে অনুষ্ঠিত হবে, তা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এ ছাড়াও হাদীস শরীফে দেখা যায়, মুমিন বান্দাহ্‌রা পৃথিবীতে যে রোগ-শোক ও নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট-পেরেশানীতে নিপতিত হয়, এর ফলে তাদের ক্ষুদ্র পাপসমূহ আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেন। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকদের আমলনামায় যেসব ক্ষুদ্র পাপ থাকবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা দয়া করে সেসব অনিচ্ছাকৃত পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। সুতরাং কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ময়দানে যারা কাজ করছে, তাদেরকে অবশ্যই ক্ষুদ্র পাপ থেকেও দূরে থাকতে হবে। কারণ এই ক্ষুদ্র পাপই বৃহৎ পাপের দরোজা উন্মুক্ত করে দেয়।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তোমরা একটি খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করো। তা সম্ভব না হলে মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলো। হাসি মুখে কথা বলাও সদকার সমান সওয়াব। কারো বোঝা উঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করা, রোগী দেখতে যাওয়া, প্রতিবেশীর বাড়িতে তরকারী পাঠানো বা তাদের প্রয়োজনে কোন জিনিস দিয়ে সাহায্য করা। এসব কাজ ক্ষুদ্র ও সামান্য হলেও এর মধ্যে অসংখ্য সওয়াব নিহিত রয়েছে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে এসব কাজ থেকে দূরে অবস্থান করে সওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা কোন মুসলমানের জন্য উচিত নয়। এসব ক্ষুদ্র কাজের উত্তম বিনিময় সেদিন মহান আল্লাহ তা'য়ালা দান করবেন।

আর যারা আল্লাহর গোলামী করেনি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমানও আনেনি, তারাও ভালো কাজ থেকে মুক্ত নয়। এরাও ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ ধরনের ভালো কাজ করে থাকে। কিন্তু এদের ভালো কাজের বিনিময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতেই পরিশোধ করে দেন। কিয়ামতের ময়দানে এরা কিছুই পাবে না। কারণ কিয়ামতের ময়দানে ভালো কাজের বিনিময় লাভ করার প্রথম শর্তই হলো ঈমান। প্রথমে ঈমান আনতে হবে তারপর সৎকাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে আশা করা যেতে পারে। আল্লাহর প্রতি যার ঈমানই নেই, সে ব্যক্তি সৎকাজের মাধ্যমে কি করে আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের আশা করতে পারে? সুতরাং ঈমানহীন লোকগুলো পৃথিবীতে যতো ভালো কাজই করুক না কেন, এর বিনিময় তারা এই পৃথিবীতেই লাভ করবে। পৃথিবীতে এরা নাম-যশ, সম্মান-মর্যাদা, উচ্চপদ, প্রশংসা-খ্যাতি ও ধন-সম্পদ লাভ করবে। লোকজন এদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে। এদের নামে দেশের বুকে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। এভাবে এরা এদের সৎকাজের বিনিময় পৃথিবীতেই লাভ করবে।

(এই সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বুঝার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'সুনির্দিষ্ট দিনে মহাধ্বংস যজ্ঞ ঘটবে' শিরোণাম থেকে 'সেদিন আল্লাহ বিরোধিদের চেহারা ধূলি মলিন হবে' শিরোণাম পর্যন্ত এবং সূরা নাবার ১৭ থেকে ৩০ নম্বর আয়াতের, সূরা ইনশিকাকের ৪ নম্বর আয়াতের ও সূরা ইনফিতারের ১০ ও ১২ নম্বর আয়াতের তাফসীর দেখুন।) ❋

সূরা আল-আ'দিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-৯৯

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতে আল আ'দিয়াতি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরাটির অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। কোন কোন গবেষক বলেছেন, এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে আবার কোন কোন গবেষক বলেছেন, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ গবেষক এই সূরাটির মূল বক্তব্য ও আলোচিত বিষয়কে কেন্দ্র করে মন্তব্য করেছেন, এই সূরাটি মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্তর্গত।

মানুষ পরকালে অবিশ্বাসী ও সন্দেহ প্রবণ হলে তার চারিত্রিক অধঃপতন কত নিচের নেমে যেতে পারে, সে কথা বুঝানোই এই সূরার মূল আলোচিত বিষয়। সেই সাথে মানুষকে এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, আদালতে আখিরাতে কেবলমাত্র মানুষের বাহ্যিক কাজের ধরণই শুধু দেখা হবে না, কাজের পেছনে তার হৃদয়ের গভীরে কি উদ্দেশ্য গোপন ছিল, তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে। মানুষের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই সূরার প্রথমে চতুষ্পদ জন্তু ঘোড়ার নানা ক্রিয়া সম্পর্কে শপথ করে বলা হয়েছে, মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং এই অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্য স্বয়ং সে নিজেই বহন করছে। সে অর্থ-সম্পদ, ধন-দৌলতের লালসায় এমনভাবে আক্রান্ত হয়েছে যে, বৈধ ও অবৈধের কোন সীমানা সে মানে না। যে কোন প্রকারে সে তার নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে। নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করতে গিয়ে তার দ্বারায় কার কি ক্ষতি হচ্ছে, সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই-দৃষ্টি কেবল ধন-দৌলতের দিকেই নিবদ্ধ।

সৃষ্টির সময় স্বয়ং স্রষ্টা তাকে যে কাজের উদ্দেশ্যে যে শক্তি দান করেছিলেন, সে সেই শক্তিকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে অন্যায় পথে ব্যয় করছে আর এভাবেই সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছে। আদালতে আখিরাতে যখন তার সমাধিক্ষেত্র থেকে তাকে বের করে পুনর্জীবন দান করা হবে, তখন যেসব স্বার্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য পৃথিবীতে সে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে, তা হৃদয়ের গোপন কুটুরী থেকে বের করে সবার সামনে প্রকাশ করে দেয়া হবে। পৃথিবীতে কোন মানুষ কি ধরনের কাজ করে এসেছে এবং আদালতে আখিরাতে কার সাথে কি ধরনের আচরণ-ব্যবহার করতে হবে, কোন মানুষ কি ধরনের ব্যবহার পাবার যোগ্য তা আল্লাহ তা'য়ালা ভালো করেই জানেন।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) শপথ (সেই) দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর, যারা (উর্ধ্বশ্বাসে) শব্দ করতে করতে দৌড়ায়, (২) শপথ সে সব (সাহসী) ঘোড়ার যাদের ক্ষুরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়, (৩) শপথ এমন সব ঘোড়ার যারা প্রত্যুষে ধ্বংস লীলা ছড়ায়, (৪) (এবং এর ফলে) যারা বিপুল পরিমাণে ধূলা উড়ায়, (৫) শত্রু শিবিরে পৌঁছে যারা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, (৬) মানুষরা সত্যিই তার মালিকের ব্যাপারে বড়োই অকৃতজ্ঞ। (৭) অথচ মানুষ (তার) এই অকৃতজ্ঞ আচরণের ওপর নিজেই সাক্ষী হয়ে থাকে, (৮) অবশ্য সে মানুষটি ধন-দৌলতের মোহেই বেশী মত্ত থাকে। (৯) এরা কি (এ কথা) জানে না যে, এই কবরের মধ্যে যা আছে তাকে বের করে পুনরায় জীবিত করা হবে? (১০) (মানুষের) অন্তরে যা (ছিলো) তারও (সেদিন) যাচাই বাছাই করা হবে। (১১) এদের (সবার) সম্পর্কে তাদের মালিকই সবচেয়ে ভালো জানেন।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে এভাবে শপথ করা হয়েছে যে, 'শপথ সেই দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোর, যারা উর্ধ্বশ্বাসে শব্দ করতে করতে দৌড়ায়, শপথ সে সব সাহসী ঘোড়ার যাদের ক্ষুরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয়, শপথ এমন সব ঘোড়ার যারা প্রত্যুষে ধ্বংস লীলা ছড়ায়, এবং এর ফলে যারা বিপুল পরিমাণে ধূলা উড়ায়, শত্রু শিবিরে পৌঁছে যারা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।'

এভাবে শপথ করেই মূল কথা বলা হয়েছে যে, 'মানুষ প্রকৃতই তার আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং সে যে প্রকৃতই অকৃতজ্ঞ এ ব্যাপারে সে স্বয়ং নিজেই সাক্ষী। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য শক্তি মত্তা দান করেছেন, সে সেই পথে তা ব্যয় না করে একমাত্র ধন-দৌলত অর্জনের পথেই ব্যয় করছে। আর এই অর্থ-সম্পদ অর্জন করার ক্ষেত্রেও সে বৈধ ও অবৈধের কোন সীমারেখা মানছে না।' এখানে প্রশ্ন জাগে, যে ঘোড়ার বিষয়ে শপথ করে মানুষ সম্পর্কে মূল কথাগুলো বলা হলো, সেই কথাগুলোর সাথে ঘোড়ার কি সম্পর্ক রয়েছে?

এই বিষয়টি বুঝার জন্য যে সময়ে এবং যে পরিবেশে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল, আরবের সেই পরিবেশ পরিস্থিতি সামনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। তদানীন্তন আরব সমাজে মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যা-লুণ্ঠন, ধর্ষন, লুটতরাজ ও যুদ্ধ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, যেমন চলছে বর্তমান পৃথিবীতে। বর্তমানে এসব নিকৃষ্ট কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্য যেমন আধুনিক যান-বাহন ব্যবহার করা হয়, সে যুগেও তেমনি ঘোড়া ব্যবহার করা হতো। আর আরবীয় ঘোড়া ক্ষিপ্রতার দিক থেকে বর্তমান পৃথিবীতেও সুনামের অধিকারী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম নবুওয়াত লাভ করার বহু পূর্ব থেকেই আরব সমাজের এসব নিকৃষ্ট কর্মকান্ড চলে আসছিল। সে সময় রাতের আগমনের অর্থই ছিল বিপদের আগমন। রাতকে তারা একটা ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় সময় বলে মনো করতো। রাত যেন ছিল তাদের কাছে বিভীষিকার প্রতীক।

কারণ রাতের অন্ধকারেই দ্রুতগামী ঘোড়াকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে লুণ্ঠনকারী দল যে কোন জনবসতীর ওপর আক্রমণ চালাতো। রাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও জনবসতীর লোকজন শত্রুর আক্রমেণর ভয়ে তটস্থ ও কম্পমান থাকতো। রাতটা কোনভাবে অতিবাহিত করে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়লে তখন তারা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তো। নিরাপদ জীবন-যাপন ছিল তাদের কাছে আকাশ-কুসুম কল্পনা। তদানীন্তন আরব সমাজে এক সম্প্রদায়ের সাথে আরেক সম্প্রদায়ের, এক গোষ্ঠীর সাথে আরেক গোষ্ঠীর, এক গোত্রের সাথে আরেক গোত্রের শুধুমাত্র প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের কারণেই আক্রমণ করতো না, অর্থ-ধন-সম্পদ লুট করার উদ্দেশ্যে, পশুসম্পদ লুট করার উদ্দেশ্যে, নারী ভোগের উদ্দেশ্যে, নারী ও শিশুদেরকে ধরে নিয়ে দাস হিসাবে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে, এ ধরনের নানা উদ্দেশ্যে তারা আক্রমণ করতো। আর আক্রমণের সময় হিসাবে তারা রাত অথবা ভোর রাতকেই বেছে নিতো।

এই ধরনের জুলুম অত্যাচার, অনাচার ও লুটতরাজের কাজে তারা বাহন হিসাবে দ্রুতগামী ঘোড়াকেই ব্যবহার করতো। গোটা আরব দেশের অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। সাধারণ মানুষের জীবন থেকে শান্তি শৃংখলা ও স্বস্তিবোধ হারিয়ে গিয়েছিল। মানষের জীবন হয়ে পড়েছিল সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর। চারদিকে লুটতরাজ, মারামারি আর চুরি ডাকাতির প্রাবল্য। এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপর কখন আক্রমণ করে, এই ভয়ে সবাই তটস্থ। জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই, নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে রাত অতিবাহিত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। শত্রুর আক্রমণের ভয়ে গোটা রাত জেগে প্রহরা দিয়েছে, শেষ রাতে ঘুমের ভারে চোখ ঢুলু ঢুলু, এমন সময় প্রত্যুষ্যে শত্রু এসে আক্রমণ করেছে। আরবের সমস্ত লোকই এই অবস্থা ও তার তীব্রতা মর্মে মর্মে অনুধাবন করছিল।

অবলা প্রাণী দ্রুতগামী ঘোড়াকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে তস্করের দল অত্যন্ত দ্রূত তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে আবার মরুপথে প্রত্যুষ্যের ধুলো উড়িয়ে নিমিষে চোখের আড়ালে চলে যেতো। পেছনে পড়ে থাকতো, নির্মমভাবে নিহত ব্যক্তির রক্তের ফোয়ারা, ধর্ষিতা নারীর করুণ আর্তনাদ, সন্তানহারা মায়ের হাহাকার আর লুণ্ঠিত জনপদ। অশ্বারোহী দস্যু-তস্কর লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রী আর নারী-শিশুকে নিয়ে পৈচাশিক উল্লাসে নিজের গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছতো। এ জন্যই মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐসব ঘোড়ার শপথ করে এবং এই অবস্থাকেই এই সূরায় একটি বাস্তব ও ঘটনা-ভিত্তিক প্রমাণ হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন, মানুষ তার রব্ব-এর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

অর্থাৎ মানুষ পারস্পরিক মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাহাজানি, ছিনতাই, দস্যুপনা, সন্ত্রাস, লুটতরাজের কাজে, আল্লাহর বিধানের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে, দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করার কাজে যে শক্তি ব্যয় করছে, সেই শক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐসব কাজে ব্যয় করার জন্য দেননি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারনের জন্য তার দেহে যে শক্তিমত্তা দিয়েছেন, দৈহিক যে কাঠামো দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে নানা ধরনের উপায়-উপকরণ দিয়েছেন, তা মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তা না করে আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথে নিজের দেহের শক্তি, দেহের কাঠামো ও বৈষয়িক উপায়-উপাদান ব্যবহার করে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করে প্রকৃত অর্থেই চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

যে স্রষ্টা তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, তার জীবনকে সুন্দর পথে, কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্য নবী-রাসূল দিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে জীবন বিধান দিয়েছেন, কিন্তু মানুষ আপন রব্ব-এর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর না হয়ে স্বয়ং রব্ব-কেই অস্বীকার করছে, আপন মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, মনিবের দেয়া বিধান উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছে। মনিবের অনুগত লোকগুলোকে নানা ধরনের বিপদে ফেলার চক্রান্ত করছে। মনিবের দাসত্ব, গোলামী, পূজা-উপাসনা ও বন্দেগী না করে নিজের হাতের বানানো মূর্তির গোলামী করছে। এভাবে মানুষ নিজেই তার কর্মকান্ডের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করছে যে, সত্যই সে আপন মনিবের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছে। তাকে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে লক্ষ্যেই পৃথিবীর যাবতীয় বৈষয়িক উপায়-উপাদান তার অধিনস্থ করে দেয়া হয়েছে, সে মানুষ তার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে ধনার্জনের মোহে এতই অন্ধ হয়ে পড়েছে যে, ন্যায়-অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে সে জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে ধনার্জন করছে।

আলোচ্য সূরার ৯ ও ১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আপন স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে সে ধন-সম্পদের মোহে অন্ধ হয়ে রয়েছে। সে ভুলে গিয়েছে মৃত্যুর কথা। সে ভুলে গিয়েছে একদিন তার মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুর পরে সে যে জগতে অবস্থান করবে, সেই জগৎ থেকে তাকে বের করে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং তার কাছ থেকে যাবতীয় কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে, এই কথা সে ভুলে গিয়েছে। পরকালের কথা যদি সে মনে রাখতো, নিজের শেষ পরিণতির কথা যদি সে স্মরণে রাখতো, তাহলে তার পক্ষে কোনক্রমেই এই ধরনের অকৃতজ্ঞ সুলভ আচরণ করা সম্ভব হতো না।

শুধু তাই নয়, এই পৃথিবীতে মানুষ নানা ধরনের কাজ করছে। তার প্রত্যেকটি কাজের পেছনে যে ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মনোভাব, চিন্তাধারা ও প্রবণতা রয়েছে, তা অন্য মানুষ জানতে পারে না। কেউ সমাজ সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, কেউ মানব সেবায় নিয়োজিত হয়, কেউ দেশ সেবার ঘোষণা দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে পা দেয়, কেউ শিক্ষাবিদের ভূমিকা পালন করতে থাকে। মানুষের এসব বাহ্যিক কার্যকারণ বা অভিপ্রায়ের পেছনে যে উদ্দেশ্য (Motive) গোপন থাকে, মৃত্যুর পরের জীবনে আদালতে আখিরাতে সেই উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রকাশ করে দেবেন। উদ্দেশ্য পরখ করে দেখে তা যাচাই বাছাই করা হবে। কাজের বাইরের ধরন দেখেই সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। মানুষ কে কি

ধরনের কাজ করেছে, শুধুমাত্র তার ওপরেই নির্ভর করা হবে না। সেই কাজের পেছনে কোন উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল, সেটাই খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কাজের পেছনে মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, মহান আল্লাহ সেটাই দেখবেন।

পৃথিবীতে মানুষের আদালতেও যখন কোন ঘটনার বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেই ঘটনার পেছনে কোন উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল, তা অনুসন্ধান করে দেখা হয়। কিন্তু মানুষের মনে কোন উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল, তা যাচাই করে দেখার মতো কোন মাধ্যম পৃথিবীতে মানুষের কাছে নেই। মানুষ যতটুকু মুখ দিয়ে স্বীকৃতি দেয়, বা জেরার মুখে যতটুকু প্রকাশ করে, ততটুকুই বিচারকগণ জানতে পারেন। কিন্তু মহান আল্লাহর দরবারে যখন কোন বিষয়ের যাচাই বাছাই করা হবে, তখন স্বয়ং আল্লাহ-যিনি মানুষের মন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মনে কি ধরনের জল্পনা-কল্পনা হয়, সেটাও তিনি জানেন-তিনি তা যাচাই বাছাই করে দেখবেন। কোন কাজের পেছনে কি উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল, তা সেদিন তিনি প্রকাশ করে তার ওপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এখানে একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, মানুষের এই গোপন তত্ত্ব ও হৃদয়ে লুকায়িত অপ্রকাশিত বিষয়সমূহ আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ব থেকেই জানেন, এই জানার ভিত্তিতেই তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। এটা করবেন না বলেই তিনি সুষ্ঠু বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলনামা, মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের সাক্ষ্য, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর সাক্ষ্য এবং বাহ্যিক কাজের ধরনের সাথে সেই কাজের পেছনে কোন ধরনের উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল, তা প্রকাশ করে-এ সবকিছুর ভিত্তিতেই মানুষের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, যেন কোন মানুষ এই অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে যে, তার কোন কিছু যাচাই-বাছাই না করেই তাকে দন্ড দেয়া হলো। এ জন্যই আলোচ্য সূরার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এদের সবার সম্পর্কে তাদের মালিকই সবচেয়ে ভালো জানবেন।' অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কথা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, কোন ব্যক্তি কি কাজ করেছে, তার কাজের পেছনে কোন ধরনের উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল এবং সেই কাজের জন্য সে কি ধরনের প্রতিফল লাভের যোগ্য।

মানুষকে পুরস্কার দেয়া ও দন্ড দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের আমলনামা ও তার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর সাক্ষ্যের তিনি মুখাপেক্ষী নন। এরা সাক্ষ্য দিলে এবং আমলনামা দেখার পরেই তিনি মানুষের ব্যাপারে সত্য অবগত হয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, এসবের সাহায্য ব্যতীত তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম-বিষয়টি এমন নয়। মানুষের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলার যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দেয়ার ও তাদের মনে সুষ্ঠু বিচারের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতীতি সৃষ্টির লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমলনামাকে সামনে আনবেন, যে ব্যক্তি অপরাধী তার অপরাধের ব্যাপারে তারই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ও ব্যক্তির চারপাশের যাবতীয় বস্তুর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন।

সূরা আল–কারিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–১০১

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ– এই সূরার প্রথম আয়াতে 'আল কারিআ'তু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে, এ ব্যাপারে গবেষকদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে যখন প্রয়োজন ছিল মানুষের মনে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় প্রতীতি সৃষ্টির এবং সেই লক্ষ্যেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়। মানুষের মনে আখিরাতের ভয় সৃষ্টি করে মানুষকে যাবতীয় অন্যায় থেকে বিরত করে তার ভেতরে উন্নত চরিত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টা এই সূরার বক্তব্যে লক্ষ্যনীয়।

মৃত্যুর পরে পরকালীন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এক মহা বিপর্যয় ও ভাঙনের মধ্য দিয়ে যাকে বলা হয় কিয়ামত এবং এরপর আদালতে আখিরাতের ময়দানে যা কিছু সংঘটিত হবে, সেসব বিষয়ই এই সূরার মূল আলোচিত বিষয়। পরপর তিনবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমন বাচন ভঙ্গি প্রয়োগ করা হয়েছে যেন, শ্রোতা তা শোনার জন্য তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে সজাগ ও উৎকর্ণ করে তোলে। সেই অকল্পনীয় ভয়াবহ দুর্যোগ সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের হৃদয়ে এক দুর্নিবার আকর্ষণ ও অদম্য ইচ্ছা শক্তি জাগ্রত হয়।

এরপর মূল বক্তব্য পেশ করা হয়েছে এভাবে যে, সেদিন মানুষ অস্থির চিত্তে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এমনভাবে চারদিকে ছুটতে থাকবে যে, যেমনভাবে ব্যঘ্র আতঙ্কে পলায়নপর হরিণগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটতে থাকে। সেদিন পাহাড়-পর্বতসমূহ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুপস্থিতির কারণে মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্যাঁজা ধুনা তুলার মতো হয়ে মহাশূন্যে উড়তে থাকবে। একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলি কণায় পরিণত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরে আদালতে আখিরাতে কোন ব্যক্তির খারাপ কাজের তুলনায় ভালো কাজ বেশী এবং ভালো কাজের মোকাবেলায় খারাপ কাজ বেশী, এটাই হবে সেদিনের বিচার-ফায়সালার চূড়ান্ত ভিত্তি। ভালো কাজ যাদের বেশী হবে তারা অনন্ত সুখের অধিকারী হবে। আর যাদের খারাপ কাজ বেশী হবে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে উত্তপ্ত অগ্নি ভর্তি এক ভয়ঙ্কর গহ্বর, যার ভেতরে অপরাধীর দল চিরকালের জন্য অবস্থান করবে।

সূরা আল–কারিয়া–মক্কী | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | আয়াত–১১-রুকু–১

اَلْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ۝١٠ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١١

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে––

রুকু ১

(১) এক মহা (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) দুর্যোগ! (২) কি সে মহা দুর্যোগ? (৩) তুমি জানো সে মহা দুর্যোগটা কি? (৪) এ (হচ্ছে এমন এক) দিন, যেদিন মানুষগুলো পতঙ্গের মতো (ইতস্তত) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে, (৫) পাহাড়গুলো রঙ বেরঙের ধুনা তুলোর মতো উড়তে থাকবে, (৬) এরপর যার ভালো কাজ তার ওযনের পাল্লায় ভারী হবে, (৭) সে (অনন্তকাল ধরে) সুখের জীবন লাভ করবে। (৮) আর যার ওযনের পাল্লা (হালকা হবে), (৯) হাবিয়া দোযখই হবে তার (আশ্রয়দায়িনী) মা। (১০) তুমি কি জানো সেই (ভয়াল আযাবের) গর্তটি কি? (১১) তা হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত আগুনের এক (বিশাল) কুন্ডলি।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

পরকাল সম্পর্কে সূরা ফাতিহার ৩ নম্বর আয়াতের ও আ'মপারার কিয়ামত সম্পর্কিত বিভিন্ন সূরার তাফসীরে এ কথা আমরা উল্লেখ করেছি যে, আখিরাতের ভয় ব্যতীত কোন মানুষই চরিত্রবান হতে পারে না। আদালতে আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে পৃথিবীর যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে, এই অনুভূতি হৃদয়ে সক্রিয় না থাকলে পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে সৎভাবে জীবন পরিচালিত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। আলোচ্য সূরার প্রথম তিন আয়াতে সেই আখিরাত কিভাবে সংঘটিত হবে, তা বলতে গিয়ে এমন ধরনের বর্ণনা ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে, যা শ্রোতার মনে প্রকৃত বিষয় জানার জন্য এক দুর্বার দুর্বিনীত আকর্ষণ সৃষ্টি করে। যে সম্পর্কে শ্রোতার কোন ধারণাই নেই, সেই বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করার জন্য শ্রোতা যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যেই প্রথমেই বলা হয়েছে, 'এক মহা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দুর্যোগ! কি সে মহা দুর্যোগ? তুমি জানো সে মহা দুর্যোগ কি?'

এই বর্ণনা ভঙ্গির মাধ্যমে শ্রোতার মনে যেমন প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য প্রবল আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি হয়, তেমনি তার মনে এক অজানা ভয়ের সঞ্চার হয়। বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়ার মতো ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, এক মহা ভয়াবহ দুর্ঘটনা! এক মহাবিপর্যয় সৃষ্টিকারী দুর্যোগ! বলার এই ভঙ্গিই এক ভীতিময় অবস্থার সৃষ্টি করে। ঘটনা যেটা ঘটবে সেটা যেমন

ভীতিকর এবং বিভীষিকা উদ্রেককারী, তেমনি সেই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়েও ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা ভঙ্গির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এরপর শ্রোতাকে ভীতিতে আক্রান্ত করা ও তার ভেতরের জগতকে আতঙ্কে তোলপাড় করে দেয়ার জন্য পুনরায় বলা হয়েছে, সেই ভয়াল ঘটনা যে কি, তা কি তুমি জানো? অর্থাৎ সেই ঘটনা এমন এক বিভীষিকাপূর্ণ ঘটনা, যা মানুষের বোধশক্তির বাইরে এবং কল্পনা শক্তির উর্ধ্বের বিষয়।

কিয়ামত সংঘটিত হবার প্রথম পর্যায়ের বিষয়টি মানুষের সামনে এভাবেই তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য সূরার প্রথম তিনটি আয়াতের মাধ্যমে। এমন এক ভয়াল দৃশ্য, এমন ভীতিকর চিত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হয়েছে যেন, মানুষের দেহের প্রতিটি স্নায়ু আতঙ্কে সংকুচিত হয়ে যায় এবং দেহের রক্ত যেন বরফের মতোই জমাট বেঁধে যায়। আতঙ্ক সংক্রামক ও ভীতি সঞ্চারক বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের মনে পরকালের ভীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছে যেন, মানুষ এই পৃথিবীতে সৎভাবে জীবন পরিচালিত করে তথা আল্লাহর গোলামী করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় মাটি ও পাথরের রঙ ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণে পৃথিবীর পাহাড়গুলোর রঙও ভিন্ন। কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অকেজো করে দেবেন। বর্তমান পৃথিবীর ওপরের-নিচের এবং মৃত্তিকা অভ্যন্তরের যাবতীয় গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। এর ফলে বন্ধনহীন পর্বতসমূহ ওজনহীন হয়ে মহাশূন্যে উড়তে থাকবে। ধুনকার তুলো ধুনো করার পরে সেই তুলো বাতাসে ধরলে যেমন তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উড়তে থাকে, ঠিক তেমনি সেদিন পাহাড়সমূহ ধুনা তুলোর মতো, ধুনা পশমের মতোই উড়তে থাকবে। একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ঘটে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হবে। প্রজ্জ্বলিত আলোর সামনে যেমন পঙ্গপাল বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকে, ঠিক তেমনি সেদিন মানুষগুলো ভয়ে আতঙ্গে বিবর্ণ হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে থাকবে। কিন্তু পালানোর কোন জায়গা সেদিন পাওয়া যাবে না।

এরপর যখন বিচার পর্ব শুরু হবে, তখন মানুষের আমল ওজন দেয়া হবে। **আলোচ্য সূরার ৬ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, মানুষ তার আমলের যে পুঁজি নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, তা ওজনযোগ্য অথবা ওজনযোগ্য নয়, অথবা তার সৎ কাজসমূহের ওজন অসৎ কাজের তুলনায় বেশী না কম, এটাই হবে মহান আল্লাহর আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি। আর ওজন করার এই বিষয়টিকেই কোরআনে নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন মিজান প্রতিষ্ঠিত করা হবে। মিযান আরবী শব্দ। যার অর্থ নিক্তি, দাঁড়িপাল্লা, পরিমাপক যন্ত্র, ওজনের মাধ্যম। কিন্তু ইসলামী শরীয়াতের ভাষায় মিযান বলা হয় সেই পরিমাপক যন্ত্রকে যা দ্বারা পরকালে বিচার দিবসে মানুষের ভালো-মন্দ তথা নেকী ও গোনাহ ওজন করা হবে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কোন বস্তুর আকার, আয়তন থাকলে তা ওজন করা যায়– কিন্তু নেকী ও গোনাহের তো কোন আকার, আয়তন নেই, তা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে কিভাবে? মানুষের মনে এ ধরনের প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো অজানাকে জানা। এই প্রশ্নের উত্তর দু'ধরনের হতে পারে। প্রথমত' হাশরের ময়দানে নেকী ও গোনাহকে ওজন দেয়ার জন্যে মহাশক্তিশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নেকী ও গোনাহের আকার, আয়তন প্রদান করতে পারেন। এ কথার সমর্থনে হাদীসে পাওয়া যায়, বিচারের দিন মানুষ বড় বড় পাহাড়ের আকৃতিতে তাদের নেকসমূহ দেখতে পাবে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ পৃথিবীতে এক এক বস্তু ওজন করার জন্যে এক এক ধরনের পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে নানা ধরনের ফসল, গোস্ত, মাছ ইত্যাদি ওজন করে। আবার পানি, তেল, মধু, দুধ তথা তরল জিনিষ ওজন করার জন্য ভিন্ন ধরনের পরিমাপক ব্যবহার করা হয়। তরল পদার্থের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় ল্যাক্টোমিটার দিয়ে। তাপমাত্রা ও হিমাংঙ্ক পরিমাপ করা হয় থার্মোমিটার দিয়ে। বায়ু বা বাতাসের চাপ পরিমাপ করা হয় বেরোমিটার দিয়ে। সুতরাং হাশরের ময়দানে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দাহ্দের সওয়াব ও গোনাহ পরিমাপ করার জন্য এমন ধরনের পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করবেন-যা পৃথিবীর মানুষ কোনদিনই কল্পনা করতে পারবেনা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষের সওয়াব ও গোনাহ অবশ্যই ওজন করা হবে। এখন কি দিয়ে কেমন করে ওজন দেয়া হবে সেটা আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ-فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُلَئِكَ....اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

সেদিন সত্য ও সঠিকভাবে ওজন করা হবে। যাদের পাল্লাভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনবে। কেননা তারা আমার আয়াতের সাথে জালেমদের ন্যায় আচরণ করেছিল। (আ'রাফ- ৮-৯)

অর্থাৎ সেদিন আল্লাহর সুবিচারের মানদন্ডে ওজন ও সত্য উভয়ই সমার্থবোধক হবে। সত্য ব্যতীত সেদিন আর কোন জিনিসেই ওজন পূর্ণ হবে না এবং ওজন ব্যতীত কোন জিনিসই সত্য বলে বিবেচিত হবে না। যার কাছে যত সত্য থাকবে, সে ততটা ওজনদার হবে এবং সিদ্ধান্ত যা-ই হবে, তা ওজন হিসাবে ও ওজনের দৃষ্টিতেই হবে। অপর কোন জিনিসের বিন্দুমাত্র মূল্য স্বীকার করা হবে না। দ্বীনি আন্দোলন বিরোধী লোকদের জীবন এই পৃথিবীতে যতোটা জাঁকজমকপূর্ণ হোক বা দীর্ঘই হোক না কেন অথবা সে যতোটা সম্মান-মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন, আদালতে আখিরাতের দাঁড়িপাল্লায় তার কোন ওজনই হবে না। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বিরোধিদের কাজকর্ম যখন সেই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে, তখন তারা নিজেদের চোখেই দেখতে পাবে যে, পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন ব্যাপী তারা যা কিছুই করছিলো, তাতে শুষ্ক তৃণখন্ডের সমান ওজনও হয়নি। এদের কাজের কোন মূল্যায়নই করা হবে না। এদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً-اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ..اِلَى اخِرِالاٰيَةُ

হে নবী! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের পৃথিবীর জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সবকিছু সঠিক করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রব-এর আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হাবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেবো না। (সূরা কাহ্ফ-১০৩-১২৫)

অর্থাৎ তারা যা কিছু করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন হয়ে তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অনুসারে ও আখিরাতের চিন্তা না করেই শুধুমাত্র পৃথিবীতে সফলতা অর্জনের জন্যই করেছে। এরা রাজনীতি করেছে, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, মিছিল-মিটিং, ধর্মঘট করেছে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসারে। এসব করার পেছনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন রয়েছে কিনা, তা অনুসন্ধান করে দেখেনি। পৃথিবীর জীবনকেই তারা আসল জীবন মনে করেছে। পৃথিবীতে সাফল্য ও

সচ্ছলতাকেই নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও তাঁর সন্তুষ্টি কিসে এবং তাঁর সামনে গিয়ে আমাদের কখনো নিজেদের কাজের হিসাব দিতে হবে, এ কথা কখনো চিন্তা করেনি। তারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন বুদ্ধিমান জীব মনে করতো। যার কাজ পৃথিবীর এ চারণ ক্ষেত্র থেকে কিছু লাভ হাতিয়ে নেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরা যা কিছুই করেছে তা এই পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও ধন-দৌলত অর্জন করার উদ্দেশ্যেই করেছে। এই ধরনের লোকজন পৃথিবীতে যতোই বড় বড় কৃতিত্ব দেখাক না কেন, পৃথিবী শেষ হবার সাথে সাতে সেগুলোও শেষ হয়ে যাবে। নিজেদের সুরম্য অট্টালিকা ও প্রাসাদ, নিজেদের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও সুবিশাল লাইব্রেরী, নিজেদের সুবিস্তৃত রাজপথ ও যান্ত্রিক বস্তুসমূহ, নিজেদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীসমূহ, নিজেদের শিল্প, কলকারখানা, নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য কর্ম এবং অন্যান্য যেসব জিনিস নিয়ে তারা গর্ববোধ করে, তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও তারা আল্লাহর তুলাদন্ডে ওজন করার জন্য নিজেদের সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে পারবে না। সেখানে থাকবে শুধুমাত্র কর্মের উদ্দেশ্য এবং ফলাফল।

যদি কারো উদ্দেশ্য পৃথিবীর জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, ফলাফলও সে পৃথিবীতে চেয়ে থাকে এবং পৃথিবীতে নিজের কাজের ফল দেখেও থাকে, তাহলে তার সমস্ত কার্যকলাপ এ ধ্বংসশীল পৃথিবীর সাথেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আখিরাতে যা পেশ করে সে কিছু ওজন পেতে পারে, তা অবশ্যি এমন কোন কর্মকান্ড হতে হবে, যা সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছে, তাঁর দেয়া জীবন বিধান অনুসারে করেছে এবং যেসব ফলাফল আখিরাতে প্রকাশিত হয় সেগুলোকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে করেছে। এ ধরনের কোন কাজ যদি তার আমলনামায় না থাকে তাহলে পৃথিবীতে সে যা কিছু করেছিল সবই নিঃসন্দেহে বৃথা যাবে।

এ কথাটি এখানে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মানব জীবনের কার্যাবলী দুই দিকে বিভক্ত হবে। একদিক হচ্ছে ইতিবাচক দিক আর অপরদিক হচ্ছে নেতিবাচক। ইতিবাচক দিকে কেবলমাত্র আল্লাহর দেয়া বিধানকে জানা ও মানা এবং তার অনুসরণে কেবল আল্লাহর জন্য কাজ করা হলেই তা হিসাবের মধ্যে গণ্য হবে আর পরকালে কোন জিনিস ওজনদার ও মূল্যবান বলে গণ্য হলে তা কেবলমাত্র সে কারণেই হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে অথবা কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিমুখ হয়ে মানুষ যা কিছুই নিজের কামনা-বাসনা অথবা অন্য মানুষ ও শয়তানের অনুসরণে সত্যবিরোধী পথে করবে, তা নেতিবাচক দিকের মধ্যে গণ্য হবে। এই দিকের কাজ কেবল যে কোন মূল্য পাবে না তাই নয়, বরং এসব কাজ মানুষের ইতিবাচক কাজের মূল্যও কমিয়ে দেবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেদিন মানুষের সৎ ও অসৎ কাজসমূহ ওজন দেবেন। আল্লাহ বলেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا.اِلَى اٰخِرِالاٰيَةُ

কিয়ামতের দিন আমি সঠিক-নির্ভুল ওজন করার জন্যে দাঁড়িপাল্লা সংস্থাপন করবো। তার ফলে কোন ব্যক্তির ওপর একবিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবেনা। যে ব্যক্তি একবিন্দু পরিমাণও কিছু আমল করে তা আমি তার সামনে উপস্থিত করবো। আর হিসাব নেয়ার জন্য আমিই যথেষ্ট। (আল-আম্বিয়া– ৪৭)

এই দাঁড়িপাল্লা কোন্ ধরনের হবে তা অনুধাবন করা আমাদের জন্য কঠিন। সেটা এমন কোন জিনিস হবে, যা বস্তু ওজন করার পরিবর্তে মানুষের নৈতিক গুণাবলী, কর্মকান্ড ও তার

পাপ-পুণ্য ওজন করবে এবং যথাযথ ওজন করার পর নৈতিক দিক দিয়ে কোন্ ব্যক্তি কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী তা জানিয়ে দেবে। পূণ্যবান হলে কি পরিমাণ পূণ্যবান এবং অপরাধী হলে কি পরিমাণ অপরাধী। আল্লাহ্ তা'য়ালা এর জন্য আমাদের ভাষার অন্যান্য শব্দ বাদ দিয়ে দাঁড়িপাল্লা শব্দ এ জন্য নির্বাচিত করেছেন যে, এর ধরনটি হবে দাঁড়িপাল্লার সাথে সামঞ্জস্যশীল অথবা এ নির্বাচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, একটি দাঁড়িপাল্লার পাল্লা যেমন দুটো জিনিসের ওজনের পার্থক্য সঠিকভাবে জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি আমার ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাও প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের কাজকর্ম যাচাই করে কোন প্রকার কমবেশী না করে তার মধ্যে পূণ্যের না পাপের কোন্ দিকটি প্রবল তা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়।

সুতরাং পৃথিবীতে যারা মহান আল্লাহর বিধান সন্তুষ্ট চিত্তে অনুসরণ করেছে এবং এই বিধান আল্লাহর পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলন করেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের পাল্লা অবশ্যই কিয়ামতের দিনে ভারী হবে। আর যারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানের বিপরীত পথ অনুসরণ করেছে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য মানুষের বানানো আইন-কানুন অনুসরণ করেছে, তাদের পাল্লা হবে শূন্য এবং এদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। **আলোচ্য সূরার ৯ থেকে ১১ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, 'হাবিয়া দোযখই হবে তার আশ্রয়দায়িনী মা। তুমি কি জানো সেই ভয়াল আযাবের গর্তটি কি? তা হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত আগুনের এক বিশাল কুন্ডলি।'

আরবী 'হাবিয়া' শব্দটি 'হাওয়া' শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো 'উচ্চস্থান থেকে কোন বস্তুর নিচে পতিত হওয়া।' আর 'হাবিয়া' বলা হয় এমন এক গভীর গর্তকে, যার ভেতরে কোন জিনিস পড়ে যায়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামকে গভীর গর্ত এ কারণেই বলেছেন যে, তা হবে অত্যন্ত গভীর। এই গভীরেই অপরাধীদেরকে উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এই জাহান্নাম হবে তাদের আশ্রয়দায়িনী মা–এই কথার অর্থ হলো, মায়ের গর্ভে শিশু যেমন থাকে, মায়ের গর্ভে থেকে বাচ্চা যেমন বিচ্ছিন্ন থাকে না, তেমনি গভীর জাহান্নাম থেকে অপরাধীরা বিচ্ছিন্ন থাকবে না।

মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে কলিজায় কম্পন ধরানোর ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, 'তুমি কি জানো সেই ভয়াল আযাবের গর্তটি কি?' এই ভঙ্গিটি মানুষের মনে ভীতি সঞ্চারক ভঙ্গি। জাহান্নামের এই গভীর গর্ত–যা শুধুমাত্র পীড়াদায়ক আগুনে পরিপূর্ণ, সেই গর্তই হচ্ছে ঐ লোকগুলোর মা, যারা নেক আমল করেনি, পৃথিবীতে ইসলামী আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে এবং এই আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করেছে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা কোন ধরনের ভূমিকা পালন করেনি, এই পথে ব্যয় করেনি, সময় দেয়নি এবং কোন ধরনের মেধাও ব্যয় করেনি, বরং যা কিছুই করেছে তা এই পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য করেছে, এই লোকগুলোর দাঁড়িপাল্লা হালকা হবে এবং এরাই তাদের মা–আগুনে পরিপূর্ণ জাহান্নামের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। (জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা নাবার তাফসীর পড়ুন।)

সূরা আত-তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-১০২

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ 'আত্ তাকাসুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরাটির অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কে কোরআন গবেষকদের মধ্যে মতভেদ বিরাজমান। কেউ বলেছেন, এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে আবার কেউ বলেছেন, এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে অধিকাংশ গবেষকগণ এই সূরার আলোচিত বিষয়, মূল বিষয়বস্তু ও বাচনভঙ্গিকে কেন্দ্র করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এই সূরা মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছে।

ধন-সম্পদের নেশায় যারা বুঁদ হয়ে থেকে আখিরাতকে ভুলে থাকে, তাদেরকে সতর্ক করাই এই সূরার মূল আলোচিত বিষয়। এই পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ সম্মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ অর্জন ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তৃতি এবং ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে থাকে। আর এটাই হলো বস্তুবাদী দর্শনের মূল কথা অর্থাৎ যা কিছুই করা হবে তা এই পৃথিবীর জীবনকে কেন্দ্র করেই করা হবে। কারণ এই পৃথিবীর জীবনের ওপারে আর কিছুই নেই। সুতরাং এই পৃথিবীতে প্রতিযোগিতা মূলকভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে হবে। যারা বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী, এই লোকগুলো পৃথিবীতে সম্মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য, নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিধি বিস্তার করার জন্য এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার বা ক্ষমতায় যাওয়ার পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য যে কোন পথে অগ্রসর হয়ে থাকে। তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে কে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো বা হচ্ছে, সেদিকে তার কোন দৃষ্টি থাকে না এবং পরকালে এসব ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, সে চিন্তাও তার কল্পনায় থাকে না।

এসব কর্মের মর্মান্তিক পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন করাই এই সূরার মূল উদ্দেশ্য। এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে বলা হয়েছে, তোমরা কে কার তুলনায় সুখ ও সম্পদ লাভ করবে, এই চিন্তায় তোমরা নিজেদেরকে ঐ দিনটি সম্পর্কে গাফেল করে রেখেছো, যেদিনটিতে তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে দেয়া যাবতীয় নে'মাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং প্রতিটি নে'মাত সম্পর্কে তোমাদের আপন রব-মহান আল্লাহর কাছে জবাবাদিহি করতে হবে। আর সেই দিনটি বেশী দূরে নয়, যখন তোমরা জানতে পারবে, এই পৃথিবীতে যে বিষয় তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছিল, তা সবই মিথ্যা।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) (জীবন সামগ্রীর) আধিক্য তোমাদের গাফেল করে রেখেছে, (২) এমনি করেই (একদিন) তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে। (৩) এমনটি কখনো নয়, অচিরেই তোমরা (তোমাদের বিদ্রোহের পরিণাম) জানতে পারবে, (৪) অতপর এমন কখনো নয়, তোমরা অতি সত্ত্বরই (এর পরিণাম) জানতে পারবে। (৫) (কতো ভালো হতো!) তোমরা যদি সঠিক জ্ঞান (কি–তা) জানতে পারতে, (৬) অবশ্যই তোমরা জাহান্নামকে দেখতে পাবে। (৭) তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজ চোখে তা দেখতে পাবে। (৮) অতপর (আল্লাহ তায়ালার) নে'মাত সম্পর্কে তোমাদের সেদিন জিজ্ঞেস করা হবে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে জীবন-যাপন করার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন হয়, সেসব উপকরণ তোমরা একে অপরের তুলনায় কে কতটা অর্জন করবে, কতটা লাভ করবে এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করছো। সুখ আর সম্পদ লাভের চিন্তা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা তোমাদেরকে গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছে। আরবী 'তাকাসুর' শব্দটি এসেছে 'কাছ্রাত' শব্দ থেকে এবং আরবী অভিধানে এই শব্দটির তিনটি অর্থ করা হয়েছে। প্রথম অর্থ করা হয়েছে, 'মাত্রার অতিরিক্ত কোন কিছু লাভের চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা।' দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, 'স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী লাভ করার জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করা এবং অন্যকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।' তৃতীয় অর্থ করা হয়েছে, 'অতিরিক্ত লাভ করার ফলে অন্যের সামনে সে বিষয়ে অহঙ্কার করা যে, সে অনেকের তুলনায় বেশী লাভ করেছে।'

সুরতাং আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এমন যে, স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক লাভের চিন্তা তথা 'আরো চাই' মনোভাব তোমাদেরকে এমনভাবে গ্রাস করে রেখেছে যে, তোমরা এসবের তুলনায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে ভুলে রয়েছো। ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের চিন্তা তোমাদেরকে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যে, তোমাদের চিন্তার জগৎ থেকে এ কথা বিদায় গ্রহণ করেছে, তোমাদেরকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ অস্বাদন করতে হবে। পৃথিবীতে যেসব বস্তু তোমরা লাভ করেছো এবং ভোগ করছো, এসবের

হিসাব তোমাদেরকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে দিতে হবে-ধন-সম্পদ লাভের চিন্তা মাথায় প্রবেশ করে মৃত্যুর চিন্তা ও হিসাব দেয়ার চিন্তাকে মস্তিষ্ক থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ ভীতিহীন মানুষগুলোর মনোভাব 'আরো চাই।' যা রয়েছে তাতে সে মোটেও সন্তুষ্ট নয়, তাকে আরো অধিক পেতে হবে। বেশী পেতে হবে-এই মনোভাব তাকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করেছে। অপরকে পেছনে ফেলে কি করে সাফল্য অর্জন করবে, বেশী কিভাবে লাভ করবে, এই চিন্তাধারায় সে প্রতি মুহূর্তে তাড়িত হচ্ছে। বস্তুবাদী এই চিন্তা-চেতনার ওপরেই গড়ে উঠেছে আধুনিক অর্থনীতি এবং এই বস্তুবাদী অর্থনীতি একটি থিউরি আবিষ্কার করেছে যে, 'অভাব অফুরন্ত'। অভাবের শেষ নেই বলেই মানুষ অধিক লাভ করার জন্য মরিয়া হয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং এভাবেই দেশ ও জাতি নানা দিকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কিভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে? এভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, একজন একটি শিল্প স্থাপন করলো, আরেকজনের মনে চিন্তা এলো যে, তাকে এর থেকেও অনেক বড় শিল্প তাকে গড়ে তুলতে হবে। এভাবে মানুষ যখন প্রতিযোগিতা মূলকভাবে এগিয়ে যেতে থাকে, তখনই দেশ ও জাতি শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

এ ধরনের অবান্তর যুক্তি দিয়ে বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়ে জন্ম দিয়েছে পুঁজিবাদ নামক এক শোষণমূলক মতবাদের। সেই সাথে সমাজে ও দেশে নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত করে ছেড়েছে এবং মানুষকে করে তুলেছে আত্মকেন্দ্রিক। নিজের সম্পদের ভান্ডার কিভাবে সমৃদ্ধি করবে এবং সুখ কিভাবে লাভ করবে, এই চিন্তা ব্যতীত সে অন্য কারো কল্যাণ চিন্তা করতে পারে না। বস্তুবাদী এই দর্শন 'প্রতিযোগিতা মূলকভাবে অর্জন করতে হবে' এই মনোভাব শুধু ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, ধনী দেশগুলোকেও এই মনোভাব চরমভাবে গ্রাস করেছে এবং এর পরিণতি কি হতে পারে, দেশ ও সমাজে কি ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে, সে সম্পর্কে এদেরকে উদাসীন করে দিয়েছে।

আলোচ্য সূরায় ধন-সম্পদ লাভের এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা কোন সমাজকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি। মানব জাতির মধ্যে যারা এই ধরনের কর্মে লিপ্ত, তাদের সকলের প্রতি এই সূরার বক্তব্য প্রযোজ্য। পৃথিবীতে স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক স্বার্থ লাভ ও সেই ব্যাপারে অহঙ্কার করার সর্বনাশা দৈত্য যেমন ব্যক্তির ওপরে সওয়ার হয়েছে, তেমনি জাতি ও দেশসমূহের ওপরেও চেপে বসেছে। অধিক মাত্রায় অর্জনের লোভ এমন প্রত্যেকটি জিনিস থেকেই তাদেরকে অমনোযোগী করেছে, যে জিনিসগুলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির নৈতিক অধঃপতন প্রতিরোধ করার জন্য একমাত্র অবলম্বন ও অপরিহার্য।

বাড়ি একতলা আছে দোতলা করতে হবে, গাড়ির মডেল পুরোনো হয়ে গিয়েছে, নতুন মডেল না হলে রাস্তায় বেরুনো প্রেষ্টিজের ব্যাপার, জমি দশ বিঘা রয়েছে, এর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। মিল-কল-কারখানা, মার্কেট, বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স ক্রমশঃ বৃদ্ধিই করতে হবে। আর এসব বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বৈধ ও অবৈধ পথে দু'হাতে অর্থোপার্জন করতে হবে। এভাবে অর্থোপার্জন করতে গিয়ে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থ-ধন-সম্পদ বৃদ্ধির এই নেশা মানুষকে দিবারাত্রি অহর্নিশি অস্থির করে রাখে। ফলে এই ধরনের লোকদের মাথায় দেশ ও জাতির কল্যাণের চিন্তা যেমন স্থান পায় না, তেমনি স্থান পায় না মৃত্যুর চিন্তা এবং পরকালে জবাবদিহির চিন্তা।

অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির নেশায় মাদকদ্রব্যের ব্যবসা, বেশ্যালয় স্থাপন এবং পতিতাদেরকে বৈধতার মোড়কে আবৃত করার জন্য 'যৌনকর্মী' নামকরণ, নগ্ন ছায়া-ছবি নির্মাণ করে জাতিয় চরিত্রের ধ্বংসসাধন, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের প্রতি আকর্ষিত করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমে অশ্লীল দৃশ্যযুক্ত নগ্ন প্রচার, সাহিত্যের নামে যৌন আবেদনমূলক রচনা ইত্যাদি পন্থায় অর্থোপার্জন করার এক সর্বগ্রাসী প্রতিযোগিতা গোটা বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। পূঁজিপতি লোকগুলো একদিকে এসব ব্যাবসা করে তাদের পূঁজির পরিধি বৃদ্ধি করছে, অপরদিকে মানুষ নৈতিক চরিত্র হারিয়ে পশুর থেকেও অধিক নিচে নেমে যাচ্ছে। যৌনতার সয়লাব পৃথিবী ব্যাপী বয়ে যাচ্ছে। মানুষ নানা ধরনের মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষ পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ হারিয়ে ফেলছে। জাতি ক্রমশঃ মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে এবং জাতিয় উন্নতি ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। এভাবে একশ্রেণীর পূঁজিপতিগণ মানবদেহে জ্বলন্ত ক্ষত ক্রমশঃ বৃদ্ধিই করে চলেছে।

অধিক পাওয়ার লোভ, বেশী লাভ করার ঘৃণ্য মানসিকতা অধিক মাত্রায় শক্তি অর্জন, অধিক সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত এবং সর্বাধিক সংখ্যক অস্ত্র সংগ্রহের জন্য এক জাতি আরেক জাতির সাথে প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে। এক দেশ যদি ১৫০০ কিলোমিটার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করলো, প্রতিবেশী আবিষ্কার করলো ২০০০ কিলোমিটার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র। অন্যদের তুলনায় কিভাবে অধিক পরিমাণ মারাত্মক অস্ত্র সংগ্রহ করা যাবে, তার চিন্তা ও চেষ্টা-সাধনায় এমনভাবে মশগুল হয়ে পড়েছে যে, দেশের মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করছে, সে করুণ চিৎকার তাদের কর্ণ কুহরে পৌছাচ্ছে না। এসব মারণাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে আল্লাহর এই সুন্দর পৃথিবী ব্যাপক জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং মানব জাতি মারাত্মকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে কথা মুহূর্তের জন্যও এদের মনে স্থান পাচ্ছে না। অগণিত মানুষকে শোষণ করে, তাদেরকে অশিক্ষা, নিরাপত্তাহীন, ক্ষুধার্ত ও চিকিৎসা বঞ্চিত রেখে মারণাস্ত্রে তীব্রভাবে শান দেয় হচ্ছে।

অধিক অর্জনের নেশা মানুষকে তার আপন প্রভু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ পালন করা থেকে বিরত রেখেছে। পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি মানুষের মন থেকে বিদায় করে দিয়েছে। পরকাল-পরিণতির ব্যাপারে গাফিল করে দিয়েছে এবং নৈতিক সীমা ও নৈতিক দায়িত্বের দিক দিয়েও গাফিল করে দিয়েছে। অধিকারীর অধিকার এবং তা আদায় করার ব্যাপারে নিজেদের কর্তব্য থেকে গাফিল করে দিয়েছে। জীবন যাত্রার মান উন্নত করার চিন্তায় এরা মশগুল। শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোর খনিজ সম্পদের দিকে লোলুপ শকুনের মতোই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে এবং কৌশলে বা শক্তি প্রয়োগ করে তা হস্তগত করছে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে মনষ্যত্বের মান যে কত নিচে নেমে গিয়েছে, সেদিকে তাদের কোন দৃষ্টি নেই এবং এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ গাফিল।

জীবন যাত্রার মান উন্নত করার সামগ্রী এবং রূপচর্চার সামগ্রী উন্নত থেকে উন্নততর করার জন্য এবং মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও মহাশূন্য বিজয় করার জন্য এরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যায় করে যাচ্ছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশ ও নৈতিক চরিত্র উন্নত করার জন্য এদের কোন প্রচেষ্টা নেই। নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার মতো উপায়-উপকরণ ও উপাদান যারা আবিষ্কার করছে, তাদেরকে নানা ধরনের পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে এবং পৃথিবীর যাবতীয় নেয়ামত রাজি ভোগ-বিলাসের জন্য এদের পায়ের নিচে স্তুপিকৃত করা হচ্ছে। অপরদিকে যারা মনুষ্যত্বের ভিত রচনা করছে এবং নৈতিক চরিত্র গড়ার জন্য অক্লান্ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে,

তাদেরকে সমাজে অপাংক্তেয় করা হচ্ছে এবং জীবন-যাপনের জন্য নূন্যতম প্রয়োজন থেকেও এদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এভাবেই 'অধিক পাওয়ার লোভ' মানুষকে পশুত্বের নিচে নামিয়ে দিয়েছে এবং কল্যাণকর সমস্ত কিছু থেকে করেছে গাফেল।

ধন-সম্পদ ও অর্থ কেমন করে কিভাবে অধিক পরিমাণে অর্জন করবে সেই চিন্তায় এরা দিশাহারা, কিন্তু তা কোন উপায়ে অর্জন করা হবে, সে উপায় বৈধ না অবৈধ, ন্যায় অথবা অন্যায়, সঙ্গত না অসঙ্গত, সে বিষয়ে তাদের চিন্তা বিবেচনা নেই। আনন্দের ও ভোগ-বিলাসের এবং যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার উপায়-উপকরণ ও উপাদান তাদেরকে লাভ করতে হবে, কিন্তু এর পরিণাম যে কতটা ভয়াল-ভয়ঙ্কর হতে পারে, লোভ-লালসার সমুদ্রে ডুবে থাকার কারণে তারা সে সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়েছে। বেশী চাওয়া ও পাওয়ার লোভ এদেরকে এমনভাবে উদরস্থ করেছে যে, বৈষয়িক সুখ-স্বার্থ ও দৈহিক সুখ স্বাদের উর্ধ্বে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রতি এসব অর্বাচিন লোকগুলোর কোন দৃষ্টি নেই। এদের কাছে এই পৃথিবীর জীবনই শেষ ও চূড়ান্ত সুতরাং যতক্ষণ দেহে স্পন্দন রয়েছে, ততক্ষণ জীবনকে কানায় কানায় উপভোগ করতে হবে।

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'এমনি করেই তোমরা কবরের কাছে গিয়ে হাযির হবে।' অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অর্জনের পেছনে ধাবিত হতে হতে তোমাদের অলক্ষ্যে মৃত্যুর হিম শীতল থাবা তোমাদেরকে গ্রাস করবে, তোমরা কবরে গিয়ে উপস্থিত হবে। এই পথেই তোমরা তোমাদের সারাটা জীবন কাটিয়ে দাও এবং মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা ঐ চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারো না। আলোচ্য আয়াতে কবরের বর্ণনা এসেছে। কবর বলতে কি বুঝায়, এ সম্পর্কে অনেকেই বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে নানাজনে নানা রকম মন্তব্য করে থাকে। বিষয়টি সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মানুষ মৃত্যুর পর হতে অনন্ত অসীম জীবনে মহাবিশ্বের যে অংশে অবস্থান করে ইসলামী পরিভাষায় সেই অংশকেই আলমে আখিরাত বা পরলোক বলে। মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে কেয়ামতের মাঠে উঠার অর্থাৎ পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে অবস্থান করে, সেই জগতই হলো আলমে বারযাখ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কোরআনে বলেছেন-

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ-

এখন এসব মৃত মানুষদের পিছনে একটি বরযাখ অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত। (মুমিনুন-১০০)

মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরে কেয়ামতের মাঠে উঠার অর্থাৎ পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে অবস্থান করে, সেই জগতই হলো আলমে বারযাখ। বারযাখ শব্দের অর্থ হচ্ছে পর্দা বা যবনিকা। পৃথিবী ছেড়ে বিদায় গ্রহনের পরে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবী, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক জগতে মানুষের আত্মা অবস্থান করবে। এই আলমে বারযাখ এমনি একটি স্থান যেখান থেকে মানুষের আত্মা পৃথিবীতেও ফিরে আসতে পারবেনা বা জান্নাত-জাহান্নামেও যেতে পারবে না। এই আলমে বারযাখকেই কবর বলা হয়। আলমে বারযাখের দুটো স্তর। একটির নাম ইল্লিন অপরটির নাম সিজ্জিন।

পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষ মহান আল্লাহর আইন কানুন-বিধান মেনে চলেছে এবং তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করেছে, সেই সমস্ত মানুষের আত্মা ইল্লিনে অবস্থান

করবে। ইল্লিন কোন বেহেশ্ত যদিও নয়-তবুও সেখানের পরিবেশ বেহেশতের ন্যায়। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান পৃথিবীতে যারা অনুসরণ করেছে তারা মৃত্যুর পরে ইল্লিনে আল্লাহর মেহমান হিসেবে অবস্থান করবে। আর যারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করেনি এবং তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করেনি, এমনকি ইসলামকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের মৃত্যুর পরে তাদের অপবিত্র আত্মা সিজ্জিনে অবস্থান করবে। এটা জাহান্নাম নয় কিন্তু এখানের পরিবেশ জাহান্নামের মতোই। কবর আযাব বলতে যা বুঝায় তা এই সিজ্জিনেই হবে। কবর বলতে মাটির সেই নির্দিষ্ট গর্ত বা গুহাকে বুঝায় না যার মধ্যে লাশ কবরস্থ করা হয়। ইন্তেকালের পরে মানুষের দেহ ব্যঘ্র, সর্প যদি ভক্ষন করে বা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথবা সমুদ্রে কোন জীব জন্তুর পেটেও চলে যায় তুবও তার আত্মা কর্মফল অনুযায়ী ইল্লিন অথবা সিজ্জিনে অবস্থান করবে।

মানুষ মৃত্যুর পর এমন এক জগতে অবস্থান করে যে জগতের কোন সংবাদ বা তাদের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ স্থাপন পৃথিবীর জীবিত মানুষের পক্ষে অসম্ভবই শুধু নয়-সম্পূর্ণ অসাধ্য। মৃত মানুষগণ কি অবস্থায় কোথায় অবস্থান করছে, তা পৃথিবীর জীবিত মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। এ কারণেই মৃত্যুর পরের ও কিয়ামতের পূর্বের এ রহস্যময় জগতকে বলা হয় আলমে বারযাখ বা পর্দা আবৃত জগত। মৃত্যুর পরবর্তী জগত সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কবরের বর্ণনা করা হয়েছে। আলমে বারযাখই হলো সেই কবর। কিয়ামতের সময় হযরত ইস্রাফিল আলাইহিস্ সালামের তৃতীয় সাইরেন ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মানুষ ওই কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। তারপরই শুরু হবে বিচার পর্ব।

ফেরাউন ও তার বিশাল সৈন্য বাহিনী লোহিত সাগরের অতল তলদেশে নিমজ্জিত হয়েছে। ফেরআউন ব্যতীত সকলেই হয়তঃ নানা ধরনের প্রাণীর আহারে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে যারা ইসলামের সাথে বিরোধিতা করে তাদের শেষ পরিণতি দেখানোর জন্যে মহান আল্লাহ ফেরাউনের লাশ হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন। মিশরের যাদুঘরে ওই পাপীষ্ঠের লাশ রক্ষিত আছে। ইচ্ছে হলে কেউ স্বচোক্ষে দেখে আসতে পারে। কিন্তু এদের সকলের আত্মা যার যার কবরে অর্থাৎ ওই আলমে বারযাখের সেই অংশে অবস্থান করছে, যেখানে পাপীদের আত্মা অবস্থান করবে। আল কোরআন ঘোষনা করছে-

بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ-اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا..............

আর ফেরাউনের সঙ্গী সাথীরা নিকৃষ্ট আযাবের আওতায় পড়ে গেল। প্রতিদিন তাদেরকে আযাবের সামনে পেশ করা হয়। যখন কিয়ামতের মুহূর্ত এসে যাবে তখন বলা হবে ফেরাউন ও তার সাথীদেরকে আরো কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো। (আল মুমিন-৪৫-৪৬)

আলমে বারযাখ বা কবরে যে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে, কোরআনের এ আয়াত তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে দু'পর্যায়ের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে এক ধরনের আযাব হবে পাপীদের। যা ফেরাউনের দলবল ও তাকে ভোগ করতে হচ্ছে। এ আযাব এই ধরনের যে, তাদেরকে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, কিয়ামতের পরে এটাই হবে তোমাদের অনন্তকালের বাসস্থান। এভাবে তাদের মধ্যে প্রচন্ড ত্রাসের সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই ধরনের আযাবও যে কত ভয়ংকর তা কল্পনাও করা যায় না। আর কিয়ামত সংঘটিত হবার

পরে শুরু হবে চূড়ান্ত আযাব ভোগ। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সাথীদের মৃত্যুর পর থেকেই প্রতি মুহূর্তেই ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য দেখিয়ে আযাব দেয়া হচ্ছে এবং যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে, কিয়ামতের পরে সেই অকল্পনীয় আযাবের মধ্যেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

এই ধরনের আযাব শুধু ফেরাউন ও তার সাথীদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয় বরং যারা আল্লাহর আইন মানে না, ইসলামের সাথে মুনাফেকি করে, বিদ্রোহ করে তাদের সকলের জন্যে নির্ধারিত। আল্লাহর কোরআন বলছে-

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ-فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَاكُنَّا.اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

যারা নিজেদের উপর জুলুম করা অবস্থায় (গোনাহ করা অবস্থায়) ফেরেশ্তাদের হাতে ধরা পড়ে যায় (অর্থাৎ মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়) তখন (গোনাহ ত্যাগ করে) সাথে সাথে আত্মসমর্পন করে বলে, আমরা তো কোন অপরাধে লিপ্ত ছিলাম না। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, তা আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত আছেন। এখন যাও, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো। সেটাই তোমাদের প্রকৃত বাসস্থান। (নাহল-২৮-২৯)

এই ধরনের আয়াত কোরআনে বহু স্থানে আছে এবং এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণনা এসেছে। প্রত্যেক পাপীকে তার ইন্তেকালের পর থেকেই কিয়ামত পর্যন্ত সেই ভয়াবহ পরিণাম তার চোখের সামনে তুলে ধরা হবে, সেই ভয়ঙ্কর আযাব তাকে দেখানো হবে অবশেষে যা তাকে ভোগ করতেই হবে। অপরদিকে পৃথিবীতে আল্লাহর আইন যারা নিজেরা মেনে চলেছে এবং এই যমীনে কোরআন হাদীসের আইন চালু করার চেষ্টা করেছে, সেই সমস্ত নেক বান্দাদেরকে মৃত্যুক্ষণ থেকে শুরু করে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত অপূর্ব সুন্দর বাসস্থানের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখানো হতে থাকবে যা আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বর্ণনা করেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন, "তোমাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাকে তার শেষ বাসস্থান সকাল-সন্ধ্যায় প্রদর্শন করা হয়। সে জান্নাতি হোক অথবা জাহান্নামী। তাকে বলা হয় এটা সেই বাসস্থান যেখানে তুমি প্রবেশ করবে যখন আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার সামনে তোমাকে উপস্থিত করবেন। (বোখারী)

ইন্তেকালের পরপরই কবরে বা আলমে বারযখে গোনাহগারদের শাস্তি ও নেক্কার বান্দাহদের অনাবিল সুখ-শান্তির উল্লেখ করে আল কোরআন বলছে-

وَلَوْتَرٰى اِذْيَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ..اِلَى اٰخِرِ الاٰيَةُ

যদি তোমরা সে অবস্থা দেখতে যখন ফেরেশতাগণ অবিশ্বাসীদের আত্মা কবয করছিল এবং তাদের মুখমন্ডলে ও পার্শ্ব দেশে আঘাত করেছিল এবং বলেছিল, নাও- এখন আগুনে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার স্বাদ গ্রহণ করো। (আনফাল-৫০)

ওই সমস্ত পরহেজগারদের আত্মা পাক পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতাগণ কবয করেন তখন তাদেরকে বলেন- يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

তোমাদের ওপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তোমরা যে নেক কাজ করেছো তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। (নাহল-৩২)

কিয়ামতের দিন বিচার শেষে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে আলমে বরযখে আযাবের মধ্যে কালযাপন করবে পাপীগণ এবং পরম শান্তিতে বাস করবেন নেক্কার

বান্দাহগণ। আয়াত দু'টো কবরে পাপীদের আযাব এবং পূণ্যবানদের জন্য সুখ শান্তির উৎকৃষ্ট প্রমাণ। হাদীস বলছে কবর কারো জন্য জান্নাতের বাগানের ন্যায় হবে এবং কারো জন্য জাহান্নামের অংশ বিশেষ হবে।

পৃথিবীতে যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করেছে তাদের শাস্তি মৃত্যুক্ষণ থেকেই শুরু হয়ে যায়। একটা সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ রেখে তাদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেয়া হয়। জাহান্নামের উত্তপ্ত বায়ু অগ্নিশিখা তাদেরকে স্পর্শ করতে থাকে। নানা ধরনের বিষধর ও ভয়ংকর দর্শন সর্প, বিচ্ছু তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে দংশন করতে থাকে।

আলমে বরযখ বা কবরে দেহ থাকবেনা। থাকবে শুধু আত্মা, মানুষের শরীরে সুখ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করার যে অনুভূতি আছে সেই আত্মারও সেই ধরনের সব অনুভূতি থাকবে। গোনাহগারদের অবস্থা অনুমান করতে হলে একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কিছুটা অনুমান করা যায়। যেমন ফাঁসির আসামীর যখন বিচার চলে তখনও সে অবস্থান করে কষ্টদায়ক হাজতে আর বিচারের রায় চূড়ান্ত হয়ে গেলে নির্মম যন্ত্রণাদায়ক ফাঁসি।

অপরদিকে যারা আল্লাহর আইন মেনে চলেছে মৃত্যুর পরে তারা হবে আল্লাহর মেহমান। মৃত্যুর সময় এদের কাছে ফেরেশতা এসে কি বলবে সে সম্পর্কে কোরআন বলছে–

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّاتَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ...اِلٰى اٰخِرِالْاٰيَةِ

তাদের কাছে অবশ্যই ফেরেশতা নাজিল হয়ে বলে, ভয় করোনা, দুঃখ বা চিন্তা করো না। সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হও যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। (হামীম সাজদা–৩০)

আল্লাহর রাসূল বলেন, আল্লাহ বলেছেন আমি আমার নেক বান্দাদের জন্যে কবরে এমন অনেক কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছি যা কোন চক্ষু কোনদিন দেখেনি। কোন কান তা শুনেনি। কোন মানুষ তা কল্পনাও করেনি। (বোখারী ও মুসলিম)

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা কর্তৃক বর্ণনাকৃত এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে কবরে তাকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় তার ভবিষ্যত বাসস্থান দেখানো হয়। সে যদি নেক্কার হয় তাকে জান্নাত দেখানো হয় আর গোনাহগার হলে জাহান্নাম দেখানো হয় এবং বলা হয় এটাই তোমার আসল বাসস্থান। রাসূল বলেন, অতঃপর তোমাকে সেখানে আল্লাহ তা'য়ালা পাঠিয়ে দেবেন।

যখন বান্দাহকে কবরে রাখা হয় এবং যখন তার সঙ্গী সাথীগণ তাকে দাফন করার পর প্রত্যাবর্তন করতে থাকে, যাদের চলার পদধ্বনি সে তখনো শুনতে পায় তখন তার কাছে উপস্থিত হন দু'জন ফেরেশ্তা। তারা মুর্দাকে বসাবেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে দেখিয়ে বলবেন, পৃথিবীতে জীবিত থাকতে এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী ধারণা পোষণ করতে?

যারা পৃথিবীতে জীবিত থাকতে ইসলামের বিধান মেনে চলেছে তারা বলবে তিনি আল্লাহ্র বান্দাহ এবং রাসূল। তখন ফেরেশতারা বলবেন–এই দেখো, জাহান্নামে তোমার জন্যে কত জঘন্য ও যন্ত্রনাদায়ক স্থান নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তোমার এ স্থানকে জান্নাত দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন এ কারণে যে, তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান মেনে চলেছো। কিন্তু যারা পৃথিবীতে ইসলামের বিধান মেনে চলেনি তারা রাসূলকে চিনতে পারবে না। বলবে

আমি তাঁকে চিনি না। তাঁর সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। ফেরেশতারা বলবেন, তুমি তোমার জ্ঞান বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করোনি। আল্লাহর কোরআন পড়েও জানার চেষ্টা করোনি। তারপর তাকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করবে আযাবের ফেরেশতা। সে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। সে চিৎকার জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী শুনতে পাবে।

মৃত্যুর পরে আত্মাকে প্রশ্ন করা হবে তোমার নবী কে? তোমার জীবন আদর্শ কি ছিল? তোমার রব্ব কে? নেক্কার বান্দাহ বলবে, আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম। আমার জীবন আদর্শ ছিল ইসলাম। আমার রব্ব মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কবর হলো আখিরাতের শুরু বা পৃথিবীর শেষ মঞ্জিল এবং আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। এই মঞ্জিলে যদি কোন ব্যক্তি গ্রেফতার হয়ে যায় তাহলে তাকে জাহান্নামে যেতেই হবে। আর এই মঞ্জিলে যে ব্যক্তি নিজের কর্মের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আলোচ্য সূরার ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে মানুষের অজ্ঞতা ও ভুল ধারণা সম্পর্কে দুই বার বলা হয়েছে যে, এমনটি কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে। বিষয়টিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্যই দুই বার একই কথার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন ভঙ্গিতে দুই বার বলা হয়েছে। মানুষ যে ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত তাদের সেই ভুল ধারণা অত্যন্ত দ্রুত ভেঙ্গে যাবে, এই কথাটিই এখানে গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে। মানুষ মনে করে, পৃথিবীতে জীবন-যাপনের উন্নত উপায়-উপকরণ অধিক পরিমাণে লাভ করাই হলো প্রকৃত সফলতা। অন্যের তুলনায় কে কত বেশী ধন-সম্পদ হস্তগত করেছে, বৈষয়িক উন্নতি করেছে, নব নব আবিষ্কারে নিজের দেশ ও জাতিকে পৃথিবীর মানচিত্রে সভ্য জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আধুনিক সমরাস্ত্রে দেশকে সজ্জিত করে অন্যান্য দেশকে পদানত করেছে, উন্নত প্রযুক্তিগত বিদ্যার মাধ্যমে ভিন্ন দেশের খনিজ সম্পদ নিজ দেশের নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ভিন্ন দেশের গোপন তথ্য জানার ব্যাবস্থা করেছে, এটাই প্রকৃত সফলতা এবং এভাবেই তারা উন্নতির চরম সোপানে পৌঁছেছে।

এই উন্নতি ও সাফল্যের কি নির্মম পরিণতি হতে পারে এবং তা যে কত মারাত্মক ও মর্মান্তিক হবে, তা এই মানুষ অতি শীঘ্রই জানতে পারবে। এ ছাড়াও মানুষ যে কত বড় ভুল এবং সাংঘাতিক বিভ্রান্তির মধ্যে নিজের জীবনকাল অতিবাহিত করছে, তাও অতি শীঘ্রই সে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। যে ভুলের গড্ডালিকা প্রবাহে মানুষ নিজের জীবনকে ভাসিয়ে দিয়েছে, সেই ভুলের কত বড় মাশুল যে তাকে দিতে হবে, এ কথা সে খুব দ্রুতই অনুভব করতে পারবে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতি শীঘ্রই সে জানতে পারবো।' এই 'অতি শীঘ্রই' বিষয়টি বুঝার জন্য সময়ের হিসাবে যেতে হবে। মানুষ যে সময় গণনা করে বা হিসাব করে, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তা একান্তই নগণ্য। যেমন মানুষের কাছে যা এক শতাব্দী, তা আল্লাহর কাছে একটি মুহূর্ত মাত্র হতে পারে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, 'অতি শীঘ্রই সে জানতে পারবে।' অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথেই সে জানতে পারবে, কোন ধরনের ভুলে সে নিমজ্জিত ছিল কি ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে তার জীবনকাল সে অতিবাহিত করেছে। আর এ কথা তো চরম সত্য যে, মানুষ এবং মৃত্যুর মধে ব্যবধান অতি সামান্যই। এই মৃত্যু যখন মানুষকে আলিঙ্গন করবে, তখন সে জানতে পারবে, যেসব ব্যস্ততার মধ্যে সে নিজের গোটা জীবনকাল অতিবাহিত করেছে তা তার জন্য সফল জীবন ছিল না ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ ছিল।

এরপর আলোচ্য সূরার ৫ থেকে ৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি প্রকৃত সফলতা ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত হতে, তাহলে তোমরা এই ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার পেছনে ছুটতে ছুটতে জীবনের মূল্যবান সময় নিঃশেষ করে দিচ্ছো, এই কাজ কখনোই করতে না। যে আখিরাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করছো এবং সে চিন্তা থেকে নিজের মন-মস্তিষ্ক মুক্ত রেখে পৃথিবীতে তথাকথিত সফলতা অর্জনের আশায় ছুটছো, সেই জাহান্নাম অবশ্যই তোমরা নিজ চোখে দেখতে পাবে। যে জাহান্নাম ছিল তোমাদের ভাষায় 'মোল্লাদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা' সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন সেই জাহান্নাম তোমরা দু'চোখ ভরে প্রত্যক্ষ করবে। ভয়ে আতঙ্কে তোমাদের বুকের কলিজা মুখ দিয়ে বের হয়ে আসার উপক্রম হবে। তখন তোমরা প্রকৃত সত্য যে কি, প্রকৃত সফলতা কাকে বলে তা বুঝতে পারবে। অনুধাবন করতে পারবে, নিজের জীবনকে কিভাবে তোমরা ব্যর্থ করে দিয়েছো। তখন অনুশোচনা আর শাস্তি ভোগ ব্যতীত কোন উপায় থাকবে না।

শুধু তাই নয়, ঐ জাহান্নামে প্রবেশ করার পূর্বে মহান আল্লাহর বিচারালয়ে ঐসব নে'মাতের হিসাব তাদেরকে দিতে হবে, যে নে'মাত তারা পৃথিবীতে ভোগ করেছে। যে নে'মাত লাভ করার উদ্দেশ্যে তারা আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত ও জাহান্নামকে ভুলে ছিলো। সেই নে'মাত সম্পর্কে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি করতে হবে। নে'মাতসমূহের মধ্যে এমন অসংখ্য অগণিত নে'মাত রয়েছে, যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে দান করেছেন। অগণিত জগৎ তিনি সৃষ্টি করে তার ভেতর থেকে এই পৃথিবীকেই তিনি মানুষের আবাসস্থল হিসাবে নির্বাচিত করেছেন এবং এই পৃথিবীর পরিবেশকে মানুষের জন্য অনুকূল করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহর অগণিত নে'মাতের মধ্যে সামান্য কয়েকটি নে'মাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের তাফসীরে। ঐ তাফসীর সামনে রাখলে নে'মাতের বিষয়টি জানা সহজ হবে।

এরপর এমন অনেক নে'মাত রয়েছে, যা লাভ করতে শ্রম ও মেধা ব্যয় করে। মানুষ শ্রম ও মেধা ব্যয় করে যে নে'মাত অর্জন করেছিল সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে, কোন পথে সে তা লাভ করেছিল এবং কোন পথে সে তা ব্যয় করেছে। মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে যেসব নেয়ামত দিয়েছেন, যেমন আলো-বাতাস, পানি, মাটি, বৃক্ষ-তরু-লতা, পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর, নানা ধরনের গ্যাস, খনিজ দ্রব্যসহ অসংখ্য নে'মাত। এসব নে'মাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, এগুলো সে কোন কোন কাজে ব্যবহার করেছে। এসব নে'মাত ভোগ করে সে কি আল্লাহর গোলামী করেছে না অন্য কোন শক্তির গোলামী করেছে। আল্লাহর সৃষ্টি পৃথিবীতে বাস করে, আল্লাহর দেয়া জীবন লাভ করে, আল্লাহর দেয়া যাবতীয় নে'মাত ভোগ করে আল্লাহর বিধান মেনে চলার লক্ষ্যে কাজ করেছে? নাকি মানুষের বানানো বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে, এই প্রশ্ন তাকে করা হবে।

অথবা আল্লাহ প্রদত্ত নে'মাতকে সে 'প্রকৃতি প্রদত্ত' কল্পিত দেব-দেবী প্রদত্ত মনে করেছে, না একমাত্র আল্লাহরই দেয়া বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছে, এই প্রশ্নও করা হবে। প্রশ্ন করা হবে, আল্লাহর নে'মাত ভোগ করে সে কিভাবে আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করেছে। যাবতীয় নে'মাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন সমস্ত মানুষকেই প্রশ্ন করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মানুষকে যেসব নে'মাত দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্ ও আল্লাহর না-ফরমান বান্দাহ্ সবাইকেই জবাবদিহি করতে হবে। তবে যারা আল্লাহর নে'মাত ভোগ করে একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করেছে, তাঁর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত

করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করেছে, তাদেরকে সহজভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর যারা মহান আল্লাহর নে'মাত ভোগ করে আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধান অনুসরণ করেছে, বিপরীত বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে যাবে।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল আমাদের ঘরে আগমন করলেন এবং আমরা তাঁকে সবেমাত্র উঠানো সজিব খেজুর খেতে দিলাম এবং ঠান্ডা পানি পান করতে দিলাম। আল্লাহর রাসূল খেজুর আর পানির দিকে তাকিয়ে বললেন, এসব সেই নে'মাত–যে বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (নাসায়ী)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা-কে বললেন, 'চলো আমরা আবুল হাইসাম ইবনে তীহান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) আনসারীর ঘরে যাই।' এ কথা বলে তিনি তাঁদেরকে সাথে নিয়ে ইবনে তীহানের খেজুর বাগানে উপস্থিত হলেন। ইবনে তীহান এক ছড়া খেজুর এনে তাঁদের সামনে রাখলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে তীহানকে বললেন, 'তুমি এই খেজুরগুলো ছড়া থেকে ছিঁড়ে আনলে না কেন?' ইবনে তীহান বললেন, 'আপনারা ছড়া থেকে বেছে বেছে উত্তম খেজুরগুলো আহার করবেন, এটাই আমার ইচ্ছা।' আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথীগণ খেজুর আহার করলেন এবং ঠান্ডা পানি পান করলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল বললেন, 'ঐ আল্লাহর শপথ! যাঁর মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ! এই নে'মাতগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে–এই শীতল ছায়া, এই ঠান্ডা পানি। (মুসলিম)

মানুষ পথ চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে, তৃষ্ণার্ত হলে ঠান্ডা পানি পান করে, ক্ষুধা অনুভব করলে খাদ্য গ্রহণ করে, ঠান্ডা অনুভব করলে তাপ গ্রহণ করে। আল্লাহর দেয়া গোস্ত, মাছ, ফল, সজি, মিষ্টিসহ অসংখ্য নে'মাত নানা প্রক্রিয়ায় আহার করছে, কিন্তু মনের জগতে এই অনুভূতি সক্রিয় নেই–এই নে'মাতসমূহের জন্য কঠিন জবাব দিতে হবে। এসব নে'মাত ভোগ করে আল্লাহর দেয়া দেহটাকে পরিপুষ্ট করে দেহের শক্তি ব্যয় করছে আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে। মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করছে না, সেই সময় অতি নিকটে, যখন যাবতীয় নে'মাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মুমিন এবং কাফির–উভয়কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তবে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। যে কোন কাজের শুরুতে এবং শেষে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন। আল্লাহর কোন কোন নেয়ামত ভোগ করে কিভাবে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে, সে পদ্ধতিও তিনি শিখিয়ে গেছেন। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর বিচারালয়ে হিসাব যেন সহজভাবে নেয়া হয়, এ জন্য তিনি মহান আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا–

হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ কোরো। (মুসনাদে আহমদ)

সূরা আল-আসর

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-১০৩

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতে 'ওয়াল আ'সরি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরাটির অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কেও গবেষকদের মধ্যে মতভেদ বিরাজমান। অনেকেই বলেছেন, এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে বিপুল সংখ্যক গবেষক ও তাফসীরকার মন্তব্য করেছেন, এই সূরাটি মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রাথমিককালে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোর বিষয়বস্তু ও বর্ণনা ভঙ্গি হতো অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং মর্মস্পর্শী। যেন তা কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে হৃদয় আন্দোলিত হয় এবং প্রবলভাবে মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। শোনার সাথে সাথে তা যেন স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং ভুলে যেতে চাইলেও যেন ভোলা না যায়। এ জন্য প্রথম দিকে অবতীর্ণকৃত সূরাসমূহ মানুষের মুখে মুখে স্বতঃস্ফুর্তভাবেই উচ্চারিত হতো।

ইমাম শাফেয়ী (রাহ) এই সূরাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, মানুষ যদি এই সূরাটি সম্পর্কে অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানুষের হেদায়াতের জন্য এই সূরাটিই যথেষ্ট। আল্লাহর রাসূলের সাহাবাদের দৃষ্টিতে এই সূরাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হলেই তারা একে অপরকে এই সূরাটি তেলাওয়াত করে শোনাতেন। তাঁরা একে অপরকে এই সূরা না শুনিয়ে বিদায় গ্রহণ করতেন না। এই সূরাটির ছোট্ট ছোট্ট বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক ও ভাবপ্রকাশক মর্ম নিহিত রয়েছে। এই ছোট্ট সূরাটির মধ্যে ভাবের এক মহাসমুদ্র প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই সূরাটির মূল আলোচিত বিষয় হলো, মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ কোনটি এবং কোন পথে তার ধ্বংস ও বিপর্যয় তা স্পষ্টভাবে এই সূরায় বলে দেয়া হয়েছে। মাত্র তিনটি আয়াতের সমাহার এই ক্ষুদ্র সূরার ভেতরে মানব জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান রয়েছে। যেন ক্ষুদ্র ঝিনুকের মধ্যে একটি মহাসমুদ্র প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) সময়ের শপথ! (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে (নিমজ্জিত আছে), (৩) সে লোকগুলো বাদে, যারা (আল্লাহ তা'য়ালার ওপর) ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, একে অপরকে সেই (নেক কাজের) তাগিদ দিয়েছে এবং এরা একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এই সূরাটিতে সময়, কাল বা ইতিহাসের শপথ করে বলা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ এক মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। বিশেষ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে এখানে বলা হয়নি। বলা হয়েছে সমস্ত মানব মন্ডলীর কথা। সমস্ত মানুষ ক্রমশঃ মহাক্ষতির দিকে এবং নিরুদ্দেশের পথে অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান। যে ক্ষতিকর পথে মানুষ এগিয়ে চলেছে সে পথের শেষে রয়েছে এক মহাধ্বংস গহ্বর। তবে সেইসব লোকগুলো এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে, যাদের মধ্যে চারটি গুণের সমাহার ঘটেছে। প্রথম গুণটি হলো ঈমান। দ্বিতীয় গুণটি হলো আমলে সালেহ বা সৎকাজ। তৃতীয় গুণটি হলো মহাসত্যের ব্যাপারে একে অপরকে উপদেশ দেয়া বা উৎসাহিত করা। চতুর্থ গুণটি হলো, মহাসত্য গ্রহণ করার পরে যে সব পরীক্ষা আসে, সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য ধৈর্য ধারনের উপদেশ দেয়া এবং এ ব্যাপারে পরস্পরকে উৎসাহিত করা।

এখানে প্রশ্ন জাগে, এই কথাগুলো বলার জন্য কেন সময়ের শপথ করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ কোন বিষয়ের বা কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অথবা নিশ্চিত করে বলার জন্য মহান আল্লাহর নামে শপথ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ যখন কোন বিষয়ের শপথ করে যে কথা বলতে চান, শপথকৃত বিষয়ের সাথে মূল কথার এক অপূর্ব সামঞ্জস্য থাকে। যে কথাটি তিনি বলতে চান, শপথকৃত উক্ত জিনিস তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তিনি সে বিষয়ের শপথ করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা আলোচ্য সূরায় কালের শপথ করেছেন। কাল বা সময় অত্যন্ত তীব্র গতিতে মানব জীবনকে শেষের খুব কাছে অগ্রসর করিয়ে দিচ্ছে। এ জন্য সময় মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষের জন্য এই পৃথিবীতে যতটুকু সময়কাল নির্ধারণ করেছেন, তার অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও কারো পক্ষে এখানে অবস্থান করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে মানুষ সময়ের যে হিসাব করে, সেই সময় অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যদি ৮০ বছর তিনদিন তিন ঘন্টা তেত্রিশ সেকেন্ড নির্ধারণ করে রাখেন, তাহলে সে

ব্যক্তি পৃথিবীতে আবিষ্কৃত যাবতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে চৌত্রিশ সেকেন্ড অবস্থান করতে পারবে না। নির্ধারিত এই সময় মানব সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার সময়কাল থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শেষের খুব কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। মানব সন্তান শৈশব অতিক্রম করে কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের কোঠা ছাড়িয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে, এর অর্থ হলো বদ্ধ কলি থেকে ফুল যেন প্রস্ফুটিত হলো। আর ফুল প্রস্ফুটিত হবার অর্থই হলো এখন সে যে কোন মুহূর্তে ঝরে যাবে। রোদ, বৃষ্টি ঝড়ে ফুল ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে হরিদ্রাভা ধারণ করে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। মানুষ যৌবনে পদার্পণ করার অর্থই হলো সে এখন ক্রমশ প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

মানব জীবনের সৌনালী যৌবনের সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, মহাকাল সেই সৌরভ ক্রমশ নিঃশেষে চুষে নেয়। যৌবনের সুষমা, লাবণ্য আর মাধুরীময় আভা মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায়। যে সময় মানব জীবন থেকে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, সে সময় প্রাণান্তকর সাধনার পরেও আর ফিরে পাওয়া যায় না। মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অমূল্য দান হচ্ছে মহামূল্য সময়। এই সময়ই মানুষকে পরিপক্ক করে, কোনো মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্মলাভ করে না। নদীর স্রোত আর কালের স্রোতের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, নদীর স্রোত ইচ্ছে করলে থামিয়ে দেয়া বা তার গতি পরিবর্তনও করা যায়, কিন্তু কালের স্রোতের ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। অর্থের অপব্যবহার করলে-তাকে অমিতব্যায়ী বলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় অমিতব্যায়ী হলো সময়ের অপব্যবহার যে করে। কারণ সময় হলো সবচেয়ে বড় সম্পদ। আর মানুষ এই বড় সম্পদই সবচেয়ে বেশী অপচয় করে থাকে।

আজকের এই নবীন ঊষা কিছুকাল পরে অতীতের স্বপ্ন বলে মনে হবে। অর্থ সম্পদ হারালে তা ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পূরণ করা যায়। জ্ঞানের অভাব হলে তা অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে সংযম বা ওষুধের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে তা চিরদিনের জন্যই হারিয়ে যায়। বর্তমান বলে কিছুই নেই, যে মুহূর্তে যাকে বর্তমান বলি, সেই মুহূর্তেই তা অতীত হয়ে যায়, অতএব কালের মধ্যে আছে কেবল অতীত ও ভবিষ্যৎ-আর তাদের মধ্যে হাইফেন হয়ে আছে পরিস্থিতিহীন বিন্দুমাত্র বর্তমান, যা থেকেও নেই, যা এক মুহূর্তে থেকে সেই মুহূর্তেই নেই হয়ে যায়, এর নামই সময়। যে ফুল গভীর নিশীথে ঝরে পড়েছে, তা আর কখনোই ফুটবে না। যে সময় চলে যাচ্ছে মানব জীবনের ওপর দিয়ে, তা আর ফিরে আসবে না। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা সময়ের শপথ করেছেন, কারণ এই জীবনের সময়কাল অতিদ্রুত ফুরিয়ে আসছে, অথচ সেই সময়কে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করা হচ্ছে না। এই জন্যই বলা হয়েছে, সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, ব্যতিক্রম শুধু তারাই-যারা জীবনকালকে উল্লেখিত চারটি গুণে গুণান্বিত করে অতিবাহিত করছে।

এখানে বর্তমান বলে কিছুই নেই-এই মুহূর্তটি পর মুহূর্তেই অতীতের গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। প্রতিটি অনাগত মুহূর্ত এসে ভবিষ্যতকে বর্তমানে রূপান্তরিত করছে এবং বর্তমান মুহূর্ত চোখের পলকে অতিবাহিত হয়ে কালের গর্ভে প্রবেশ করে বর্তমানকে অতীতে রূপান্তরিত করছে। বাড়ির ঘড়িটি সেকেন্ডের স্তর পার হয়ে মিনিট অতিক্রম করে ঘন্টা চিহ্নিত স্থানে গিয়ে শব্দ করে বাড়ির মালিককে এ কথাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, 'ওহে গৃহকর্তা! এখনো

সাবধান হও, তোমার জন্য নির্দিষ্ট জীবনকাল থেকে একটি ঘন্টা পুনরায় কোনদিন ফিরে না আসার জন্য মহাকালের বিবরে গিয়ে প্রবেশ করলো।'

পৃথিবীর শিক্ষাঙ্গনসমূহে যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। প্রশ্ন পত্রের ওপরে লেখা থাকে, 'সময়-৩ ঘন্টা।' অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখতে বলা হয়েছে, তা তিন ঘন্টার মধ্যে লিখে শেষ করতে হবে। শুধু লেখলেই চলবে না, সুন্দর হস্তাক্ষরে প্রশ্নের সঠিক উত্তর যথাযথভাবে লিখতে হবে। তাহলেই কেবল পরীক্ষায় যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। নির্দিষ্ট এই সময় অতিক্রান্ত হলে পরীক্ষার্থীকে সময় দেয়া হয় না। পরীক্ষার্থী যদি পরীক্ষার স্থানে প্রশ্নের উত্তর না লেখে সময় ক্ষেপণ করে, তাহলে সে কোনভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না এবং নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাবার পরে পরীক্ষার্থী যত অনুরোধই করুক না কেন, তাকে কিছুতেই সময় দেয়া হয় না।

মানব জীবনের বিষয়টিও ঠিক এমনি। এই পৃথিবীতে তাকে নির্দিষ্ট সময়কাল দেয়া হয়েছে এবং তাকে এখানে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এখানে তার কাজ হলো সে আঁকা-বাঁকা পথ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ যে পথ তাকে প্রদর্শন করেছেন, সেই পথে সে তার জীবনকাল অতিবাহিত করবে। সময় মানব জীবনের প্রকৃত মূলধন। এই মূলধন তাকে যথার্থ পন্থায় ব্যয় করতে হবে। যে কাজের জন্য বরফ নিয়ে আসা হলো, সেই কাজে বরফ ব্যবহার না করে তা যদি ফেলে রাখা হয়, তাহলে সে বরফ তো অত্যন্ত দ্রুত গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তা কোনোই কাজে লাগবে না। মানুষের জীবনও বরফের মতোই। তাকে যে নির্ধারিত জীবনকাল দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কালের কৃষ্ণকালো বিবরে গিয়ে প্রবেশ করছে। মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সময়কে যদি অপচয় করা হয় বা আল্লাহর অপছন্দনীয় পথে তা ব্যয় করা হয়, তাহলে এ কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, সে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সে স্বয়ং নিজের যে ক্ষতি করছে, সেই ক্ষতি কখনো পুষিয়ে নেয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ জন্য কালের শপথ করে বলেছেন, মহাকালের তীব্র গতিশীল স্রোতই জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, চারটি গুণ বিবর্জিত মানুষ অর্থহীন কাজে নিজের মহামূল্যবান জীবনকাল ক্ষয় করছে, তা সবই অকল্পনীয় ক্ষতিকর বিষয়। এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে কেবলমাত্র মুক্ত থাকতে পারবে তারাই, যারা নিজের জীবনে উক্ত চারটি গুণ অর্জন করেছে তথা নিজেকে উক্ত চারটি গুণে গুণান্বিত করেছে। আলোচ্য সূরায় যে ক্ষতির কথা হয়েছে, তা শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়-ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দল, গোষ্ঠী তথা পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। তীব্র হলাহল-গরল যদি কোনো ব্যক্তি পান করে, তাহলে তার ওপর যেমন গরলের প্রতিক্রিয়া হবে, তেমনি সমাজের সকল ব্যক্তি বা একটি দেশের সকল জনগণ যদি তা পান করে, তাহলে এক ব্যক্তির ওপরে তা যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, গোটা দেশের জনগণের ওপরেও সেই একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

আলোচ্য সূরায় উল্লেখিত চারটি গুণের অভাবে যেমন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গোটা মানব সভ্যতা। এই সূরায় উদ্ধৃত চারটি মৌলিক গুণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি ও জাতি এক মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এটা এমনই এক ক্ষতি যে, এই ক্ষতি কোনভাবেই পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে ক্ষতির ধরনটা কেমন? কারণ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তারা যে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত-সেটা তেমন একটা বুঝা যায় না। কারণ তারা একের পর এক আবিষ্কার করে গোটা পৃথিবীর মানব

সভ্যতাকে অবাক করে দিচ্ছে। তাদের জীবন যাত্রার মান ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমরাস্ত্র ইত্যাদির দিক থেকে ক্রমশঃ উন্নতিই করছে। অর্থাৎ এই দৃশ্যই সবর্ত্র দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত চারটি গুণ ব্যতীতই তারা সফলতা ও কল্যাণ লাভ করছে।

আমরা ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি সূরার তাফসীরে সফলতা ও কল্যাণের যে সংজ্ঞা কোরআন পেশ করেছে, তা আলোচনা করেছি। এ কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর কোরআন আলমে আখিরাতে মানুষের সাফল্য লাভকেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ এবং সেই জগতে তার ব্যর্থতাকেই প্রকৃত ব্যর্থতা বা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই পৃথিবীতে এক ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাঙ্গন থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষার ডিগ্রী অর্জন করলো, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের মূল কর্ণধারের পদটি তাকে দেয়া হলো এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ তাকে নেতা হিসাবে অনুসরণ করলো, ভোগ-বিলাসের যাবতীয় উপায়-উপকরণ তার পদানত হলো, কোন কিছুর অভাব এবং দৈন্যতার সাথে তার কখনো পরিচয় ঘটলো না, গোটা বিশ্বের ওপরে তার একচ্ছত্র ক্ষমতা পাকাপোক্ত হলো, মানুষের দৃষ্টিতে এই লোকটিই হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সফলতার অধিকারী এবং তার মাতা-পিতা একজন সফল সন্তানের অধিকারী হিসাবে মানুষের কাছে বিবেচিত হলো।

পক্ষান্তরে মানুষের দৃষ্টিতে সেই সফল ব্যক্তি তার জীবনে মুহূর্ত কালের জন্যও তার আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি আদেশও মানলো না, বরং তার গোটা জীবনকাল ব্যাপী লোকটি পৃথিবী থেকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী দল ও লোকগুলোর প্রতি জুলুম অত্যাচার চালালো, আল্লাহর অনুগত বান্দাহ্দের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাদেরকে কারারুদ্ধ করলো। এই ব্যক্তি মৃত্যুর পরের জগতে সবথেকে ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে এবং সবার তুলনায় এই ব্যক্তিই ব্যর্থতার মুখোমুখি হবে। আল্লাহ তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিই সবথেকে সফলতা অর্জন করলো, যে ব্যক্তি তার গোটা জীবনকাল ব্যাপী আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহর অনুগত হয়ে নিজের জীবন পরিচালিত করলো তথা উল্লেখিত চারটি গুণ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করলো। যদিও সে ব্যক্তি পৃথিবীতে চরম অভাবের ভেতরে জীবন অতিবাহিত করেছে–তবুও সে তাঁর স্রষ্টা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে সফলতা ও কল্যাণ অর্জন করেছে। মোট কথা, পরকালের যারা সফলতা অর্জন করতে পারবে কেবলমাত্র তারাই সফল হবে আর পরকালে যারা ব্যর্থ হবে, তারাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।

মানুষকে সেই মারাত্মক ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে কেবলমাত্র চারটি গুণ। **সেই গুণটির প্রথম হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান**। আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি বললেই ঈমানের শর্ত পূরণ হবে না। মহান আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর ওপরে দৃঢ় বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের বাস্তব ছবি নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলার নামই হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। মৌখিকভাবে মহান আল্লাহর ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করা হলো–কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। আনুষঙ্গিক এমন কতকগুলো দিক এর সাথে জড়িত রয়েছে যে, সেদিকগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা ও প্রবল বিশ্বাস না থাকলে মৌখিক স্বীকৃতির কোন মূল্য নেই। ঈমান আনার সাথে সাথে ঈমানের শর্তগুলো পূরণ না করলে সে ঈমানের কোন মূল্য নেই। প্রথম শর্ত হলো, মহান আল্লাহর অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয় শর্তহলো, আল্লাহর গুণাবলীর ওপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তৃতীয় শর্ত হলো, আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি স্বীকৃতি ও দৃঢ় বিশ্বাস

থাকতে হবে। চতুর্থ শর্ত হলো, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সে অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

মহাক্ষতি থেকে যারা মুক্ত থাকতে আগ্রহী এবং ময়দানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা সংগ্রামরত, উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস থাকা একান্ত জরুরী। এসব বিষয়গুলো সম্পর্কে যাদের ধারণা অস্বচ্ছ, বিশ্বাস দুর্বল তাদের পক্ষে কোনক্রমেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকা ও আন্দোলনের ময়দানে সক্রিয় থাকা সম্ভব নয়। এদিকগুলো সম্পর্কে যাদের হৃদয়ে অস্বচ্ছ ধারণা বিদ্যমান এবং বিশ্বাস দুর্বল, বিপদের ঘনঘটা দেখলেই তাদের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হয়, 'আল্লাহ কি আছেন !'

বিপদ পরিবেষ্টিত হবার পরে হৃদয়-মনে এ ধরনের চিন্তার উদ্রেক হয় এবং মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারিত হয় দুর্বল ঈমানের অধিকারীদের। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ কথা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে যে, ঈমান যত দুর্বল হবে তারা ততবেশী হতাশ হয়ে পড়বে। কারণ ঈমানের দুর্বলতা মানুষের ভেতরে নৈরাশ্য আর হতাশা সৃষ্টি করে, অস্থিরতা বৃদ্ধি করে, ভীতি সৃষ্টি করে।

আর যাদের ঈমান যতটা সবল হবে, তারা ততটা দৃঢ়পদে ময়দানে অবিচল থাকেন। তাদের ভেতরে সামান্যতম নৈরাশ্য, হতাশা, ভীতি সৃষ্টি হয় না। কারণ তাদের এ চেতনা শানিত থাকে যে, 'মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীত বা অতিরিক্ত কোন কিছুই ঘটা কখনই সম্ভব নয়। যা ঘটবে তা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঘটবে।' ঈমানের শর্তের প্রতি এই স্বচ্ছ ধারণা ও বিশ্বাস থাকার কারণে মুমীন কখনও হতাশাগ্রস্থ হয় না। দুঃখ, বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। চরম বিপদে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে না, সে চোখ নিবদ্ধ থাকে মহান আর্‌শে আযীমের দিকে। ফাসীর মঞ্চেও তার মুখে ফুটে ওঠে মাধুর্য মন্ডিত স্নিগ্ধ হাসি।

ঈমানের ব্যাপারে প্রথম শর্তই হলো মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে তেমন কোন তাত্ত্বিক আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। দ্বিতীয় শর্ত হলো আল্লাহর গুণাবলীর ওপরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ হলেন সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান এবং যা কিছু মানুষের দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে বিদ্যমান, তারও স্রষ্টা হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি মাছির সামান্য একটা পাখা তৈরী করতে সক্ষম। তবে মানুষকে এ জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা বস্তুর রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম-কিন্তু স্বয়ং সে কোন বস্তুর স্রষ্টা নয়। বস্তুর স্রষ্টা হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তিনি প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনি শুধু স্রষ্টাই নন, সমস্ত কিছু সৃষ্টি তিনি তার সৃষ্টির প্রতিপালক হিসেবে অন্য কোন শক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করেননি। তিনি তার যাবতীয় সৃষ্টির লালন ও পালন কর্তা। কোথায় কোন সৃষ্টি অবস্থান করছে, কোন সৃষ্টির কখন কি প্রয়োজন, এ সম্পর্কে তিনি উদাসীন নন। সাগর-মহাসাগরের অতল তলদেশে শৈবালদামে আবৃত প্রস্তর খন্ডে বসবাসরত এমন ক্ষুদ্র একটি পোকা, যা ম্যাগ্‌নিফাইং (Magnifying) গ্লাসের সাহায্য ব্যতিত দৃষ্টি গোচর হবে না, সে পোকাটিরও আহারের ব্যবস্থাসহ যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করে থাকেন।

মানুষের দৃষ্টি যেখানে পৌছে না এবং যেখানে অনুভূতিও ক্রিয়াশীল থাকে না, এমন কোন স্থানে কোন সৃষ্টি যদি বিপদগ্রস্থ হয়ে আর্তনাদ করে ওঠে, সে আর্তনাদ তিনি শোনেন এবং

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনিই যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী। তিনি স্রষ্টা, তিনিই প্রতিপালক এবং সমস্ত সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্য তিনিই দান করেছেন, পৃথিবীকে যেমনভাবে সৃষ্টি করলে অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, তিনি সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি জীবসমূহের যে অঙ্গ দেহের যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তিনি স্থাপন করেছেন। যে বস্তুর মধ্যে যে ধরনের গুণাবলী উপস্থিত থাকা প্রয়োজন, সে বস্তুর ভেতরে তিনি সেই গুণাবলীই দান করেছেন। প্রতিটি খাদ্য বস্তুকে তিনি তার বান্দার আহারের জন্য আবৃত করে দিয়েছেন। যাবতীয় প্রশংসামূলক কর্ম এবং প্রশংসাযোগ্য কার্যাবলী তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। এ জন্য যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র যোগ্য সত্তা হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা।

তিনিই সর্বশক্তিমান। সমস্ত কিছুর ওপরে তিনিই একমাত্র শক্তিশালী। তাঁর শক্তি সমস্ত কিছুর ওপরে পরিব্যাপ্ত। তাঁর শক্তির মোকাবেলায় তাঁরই সৃষ্টি অন্যান্য শক্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে অসহায়। তাঁর শক্তির সামনে দৃশ্যমান যাবতীয় শক্তি একেবারেই ভঙ্গুর। তিনি মুহূর্তেই সমস্ত কিছু ধ্বংস স্তুপে পরিণত করতে সক্ষম এবং প্রজ্জ্বলিত অনল কুন্ড পুষ্পকাননে পরিণত করতেও সক্ষম। মানুষ যাকে মহাশক্তিশালী হিসেবে জ্ঞান করে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় এসব শক্তির সামান্যতম কোন মূল্য নেই। মানুষের কাছে অসম্ভব বলে যা বিবেচিত হয়, আল্লাহ পাকের কাছে তা অত্যন্ত সহজ। মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি কাঠি একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। একমাত্র আল্লাহ পাকই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তিনিই মানুষকে ধন-দৌলত দান করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে অসহায় দরিদ্রে পরিণত করতে পারেন। তিনিই মানুষকে বিপদগ্রস্থ করতে পারেন, আবার তিনিই মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। এ সমস্ত গুণ আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো ভেতরে উপস্থিত নেই।

আল্লাহ যদি কাউকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তাহলে তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ-ই দূর করতে পারে না। আর তিনিই যদি কারো প্রতি কোন কল্যাণ করতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়। মানুষসহ যে কোন প্রাণীর আহার দাতা একমাত্র তিনিই। তিনি ব্যতীত খাদ্যের ব্যবস্থা আর কেউ করতে পারে না। কোথা থেকে কিভাবে তিনি মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা করবেন, এ দায়িত্ব একমাত্র তাঁরই। সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা তিনিই সম্পাদন করে থাকেন। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, কাউকে তিনি অনাহারে রাখবেন, সেটাও তিনি পারেন আবার তিনি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কাউকে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত রিয্‌ক প্রদান করবেন, তাও তিনি পারেন। তাঁর সিদ্ধান্তে কেউ পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়, তাঁর কার্যাবলীতে কেউ হস্তক্ষেপ করতেও সক্ষম নয়। যা ইচ্ছা তিনি তাই করতে সক্ষম। সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কোন প্রয়োজনের জন্য তাঁকে কারো দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয় না। বরং সমস্ত সৃষ্টিই নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দিকে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি মেলে থাকে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অন্যতম শর্ত হলো, আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, 'সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলেন আল্লাহ।' তিনি ইচ্ছে করলে দিনকে রাতে পরিণত করতে পারেন, আবার রাতকে দিনে পরিণত করতে পারেন। বিশাল ঐ আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগরকে নিমিষে স্থলভাগে পরিণত করতে পারেন। আবার এই গোটা পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগকে জলভাগে

পরিণত করতে পারেন। তিনি জীবিতকে মৃতে পরিণত করতে সক্ষম, মৃতকে জীবিত করতে পারেন। যে লোক কপর্দকহীন অবস্থায় ছিন্ন বস্ত্রে ভিক্ষার থালা হাতে নিয়ে রাস্তার ধারে বসে একটি পয়সার জন্য আর্তচিৎকার করছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে রাজ সিংহাসনে আসীন করে দিতে পারেন।

যিনি রাজ তখ্‌তে বসে ক্ষমতার দম্ভে অহংকারে মদমত্ত হয়ে দোর্দন্ড প্রতাপে শাসন কার্য পরিচালনা করছেন, ক্ষণিকের মধ্যে এই দোর্দন্ড প্রতাপশালী লোকটিকে লাঞ্ছিতাবস্থায় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করে ফাসীর মঞ্চে উঠিয়ে দিতে পারেন। মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাক সমস্ত কিছুই ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে দিতেন। মানুষ এই পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান দিয়ে নানা ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এসব যন্ত্রের সাহায্যে অসম্ভব বলে যা মনে হয় তাই তারা সম্ভবে পরিণত করছে।

আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভয় করার একমাত্র যোগ্য সত্ত্বা তিনি, শুধুমাত্র তিনিই মানুষের পাপমোচন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন, দাসত্ব লাভের উপযোগী একমাত্র সত্ত্বা তিনি, তিনি তাঁর দাসদের সর্বদ্রষ্টা, তিনিই উত্তম সিদ্ধান্তদানকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, সমস্ত কৌশল ও জ্ঞান তাঁর হাতে নিবদ্ধ, তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি তাঁর দাসদের অপরাধ ক্ষমাকারী, তিনি অত্যন্ত মেহেরবান-দয়ালু, তিনিই আইন দাতা, বিধানদাতা। তিনি মহাশক্তিশালী-মহাপরাক্রান্ত, তিনিই যাবতীয় ঘটনার স্পষ্ট ব্যক্তকারী, তিনি অসীম ধৈর্যশীল, তিনিই অমর-অক্ষয়, চিরঞ্জীব, তাঁর সত্ত্বা চিরস্থায়ী, তিনি সমস্ত কিছুই পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না, মানুষের মনের গহীনে যে কল্পনার সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কেও তিনি জানেন, দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সমস্ত বিষয়ে তিনি জ্ঞাত, তিনি অভাবমুক্ত, তিনিই মহিমান্বিত, তিনিই প্রবল পরাক্রান্ত, তিনিই তাঁর সৃষ্টির প্রার্থনা শ্রবণকারী ও কবুলকারী, তিনি মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু, তিনিই আবেদন গ্রহণকারী। এধনের অসংখ্য গুণাবলী সমন্বিত সত্ত্বা হলেন আল্লাহ ছুব্‌হানাহু ওয়াতা'য়ালা।

তাঁর হুকুম ও আহ্‌কামের প্রতি তথা তাঁর আদেশ ও নিষেধের প্রতি আনুগত্য করতে হবে। তিনি যা আদেশ করেছেন তা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে আর যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে সন্তুষ্টির সাথে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহর গুণাবলীসহ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার পরে মানুষের জন্য এ অবকাশ আর থাকে না,যে, সে অন্য কারো আইন-কানুন, বিধানের সামনে মাথানত করবে। আল্লাহর বিধানসমূহ সে বোঝা বলে মনে করবে। তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের ব্যাপারে কোন ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করবে। ঈমানের অনিবার্য দাবীই হলো ঈমান আনয়নকারী পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, নিষ্ঠার সাথে, শ্রদ্ধার সাথে মহান প্রভু আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরে একজন মানুষ কোনক্রমেই অন্য কারো বিধানের সামনে, অন্য কোন শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। নিজে স্বয়ং কোন বিধি-বিধান রচিত করতে পারে না। যাবতীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে সে হয়ে পড়ে আল্লাহ তা'য়ালার মুখাপেক্ষী।

একজন মানুষ যখন আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীসহ আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান আনে, তখন তার মধ্যে আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হুয়, প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব (Personality) গড়ে ওঠে। ঈমানদার কখনও ব্যক্তিত্বহীন হয় না। ঈমানদার ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে। ঈমানদার ব্যক্তির জীবনধারা

হয় গঠনমূলক। তাঁর কথা বলায়, ব্যবহারে, ওঠা-বসায়, পোষাক-পরিচ্ছদে ব্যক্তিত্বের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ ভুল ধারণা বিদ্যমান রয়েছে যে, ঈমানদার-পরহেযগার ব্যক্তি মানেই হলো আল্লাহর প্রেমে বিভোর দুনিয়া ত্যাগী মানুষ। দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতি তার কোন দৃষ্টি থাকবে না। দুনিয়ার ব্যাপারে সে হবে উদাসীন। তার মাথার চুল, মুখের দাড়ি, পরিধেয় পোষাক থাকবে অবিন্যস্ত। প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি এমন নয়। ঈমানদার-মুত্তাকী ব্যক্তি কখনও কোন বিষয়ে ব্যক্তিত্বহীনের মতো কোন আচরণ করতে পারেন না। সে কোন পাগল শ্রেণীর মানুষ হয় না। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে থাকে। আল্লাহর সমস্ত গুণাবলীসহ যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান আনে, তার ভেতরে আত্মমর্যাদার সৃষ্টি হয়। কারণ আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান আনয়ন করার পূর্বে তার ভেতরে ব্যক্তিত্ব ছিল অনুপস্থিত। পৃথিবীতে দৃষ্টির সামনে পরিদৃশ্যমান যা কিছু সে দেখেছে, অনুভব করেছে, কোন বস্তুর মধ্যে সামান্যতম কোন শক্তির স্ফুরণ ঘটতে দেখেছে, তাকেই সে ভয় করে নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা মনে করে তার পূজা শুরু করেছে, তার সামনেই সে মাথানত করেছে।

মানুষ যখন এক আল্লাহর ওপরে ঈমান আনে, তাঁর আত্মসম্মান-মর্যাদাবোধ এতটা বৃদ্ধি লাভ করে যে, সে কাউকে ভয় পায় না। সত্য প্রকাশে এবং সত্য প্রচারে সে কখনও কোন শক্তির সামনে মাথানত করে না। সত্য প্রকাশে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে সে যদি ভয়ই পায়, তাহলে তো তার আত্মমর্যাদায় আঘাত আসে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি কখনও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ বিরোধী শক্তির ভয়ে অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে জানে না। আল্লাহর গুণাবলীসহ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপরে ঈমান আনে, সে ব্যক্তি হয় বিনয়ী। ঈমানদার হয় বিনম্র। তাঁর ব্যবহারে কখনও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না। কথায় এবং আচরণে অহংকারের ছোঁয়া থাকে না। মন-মানসিকতায় স্বৈরাচারী চিন্তাধারার উদ্রেক হয় না। ঈমানদার ব্যক্তি যদি ধনাঢ্য হয়, বিশাল বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয় তবুও তাঁর ভেতরে অহংকারের চিহ্নমাত্র থাকে না। কারণ ঈমানদার ব্যক্তি জানে যে, তাঁর এই সম্পদ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে এ সম্পদ ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ তিনি দেশের ধনীদের কাতারের একজন আছেন, দেশে-বিদেশে তাকে বিশিষ্ট নাগরিকের সম্মান-মর্যাদা দান করা হচ্ছে, আল্লাহ ইচ্ছে করলেই মুহূর্ত কাল পরেই তাকে কপর্দক শূন্য করে দেশের ভিখারীদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম।

আল্লাহ তা'য়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তাঁর ভান্ডার কখনও শূন্য হয় না। তাঁর সম্পদের ভান্ডার প্রতি মুহূর্ত পরিপূর্ণ। গোটা পৃথিবী বাসীকে তিনি এক মুহূর্তে অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী বানিয়ে দিতে সক্ষম। ঈমানদার তাঁর আশ্রয়স্থল মহান আল্লাহ সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখেন, এ কারণে অহংকারের পরিবর্তে তাঁর গোটা দেহ বিনম্রতার বর্মে আবৃত থাকে। তাঁর কথামালায় নম্রতার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সম্পদের অহংকার সে করে না। ঈমানদার ব্যক্তি শক্তির অহংকার করে না। কারণ সে জানে যে, আল্লাহর শক্তিই সবচেয়ে বেশী। কোন মানুষের এ শক্তি নেই যে, সে আল্লাহর সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও চলে যাবে। দৈহিক শক্তির অধিকারী কোন ব্যক্তি যখন ঈমান আনে তখন সে তাঁর শৌর্য-বীর্য শক্তির কারণে অহংকার করে না। কারণ সে জানে, তাঁর এই দৈহিক শক্তি যে কোন মুহূর্তে হারিয়ে যেতে পারে। আল্লাহর আদেশে তাঁর দেহের সমস্ত নার্ভগুলো অবশ হয়ে যেতে পারে। তাঁর চলতশক্তি হারিয়ে যেতে পারে। তাঁর পূর্বে প্রচন্ড দৈহিক শক্তি দিয়ে বিভিন্ন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল,

তাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে। এভাবে ঈমান মানুষকে অহংকার মুক্ত করে তার স্বভাবে বিনয় ও নম্রতার আবরণে অচ্ছাদিত করে।

ঈমানদার ব্যক্তি প্রখ্যাত জ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও সে জ্ঞানের অহংকার করে না। কারণ আল্লাহর কোরআনে সে পাঠ করেছে যে, মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। জ্ঞানের সমস্ত ভান্ডার রয়ে গিয়েছে আল্লাহর কাছে। মানুষ সে-তার জ্ঞান পরিপূর্ণ নয় এবং নির্ভূলও নয়। যে সামান্য জ্ঞান সে অর্জন করেছে, মস্তিষ্কে কোন ত্রুটি ঘটলে, স্মৃতিশক্তির কেন্দ্রস্থল বিকল হয়ে গেলে মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে যাবে। তাঁর জ্ঞান থাকে সব সময় সঠিক তথ্য দান করবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাঁর জ্ঞান তাকে কোন অজেয় ক্ষমতা দান করতে পারে না। অর্জিত জ্ঞান তাকে চিরঞ্জীব করতে পারে না। জ্ঞানের মাধ্যমে সে রোগ-ব্যধি-জরাকে জয় করতে পারেনি। মহান আল্লাহই হলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

এভাবে ঈমান মানুষকে তাঁর জীবনের প্রতিটি বিভাগ থেকে অহংকারের আবর্জনা দূরিভূত করে বিনয় আর নম্রতার আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। ঈমান এনেছি, এ দাবি করার পরে যদি তার ভেতরে এসব গুণাবলীর সৃষ্টি না হয়, তাহলে তার পক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। বাতিলের মোকাবেলায় উত্তপ্ত ময়দানে টিকে থাকাও সম্ভব হয় না। চরিত্রে বিনয় এবং নম্রতা না থাকলে অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না। আর নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করতে না পারলে ইসলামের দাওয়াতও কারো কাছে আকর্ষণীয়ভাবে পৌছানো যায় না।

মহান আল্লাহর ওপরে ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তির ভেতর থেকে মৃত্যুর ভয় তিরোহিত হয়ে যায়। সত্য কথা বললে, সত্য প্রচার করলে বিরোধী শক্তি তাকে হত্যা করতে পারে, এ ধরনের ভয় তার ভেতরে থাকে না। ঈমানদার ব্যক্তি বীর মুজাহিদে পরিণত হয়-সে কাপুরুষ হয় না। তার আচার-ব্যবহারে অসীম সাহস আর বীরত্ব প্রকাশ পায়। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় ভয় হলো মৃত্যুকে। যে জিনিস ভীতি সৃষ্টি করে তা থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা মানুষের স্বভাব। গভীর অরণ্যে হিংস্র জানোয়ার বাস করে। মানুষ এসব হিংস্র জানোয়ার অধ্যুষিত এলাকা এড়িয়ে চলে। বিদ্যুৎ যেন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে না পারে, প্রাণহানি যেন না ঘটে-এ জন্য মানুষ বিদ্যুতের ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। অর্থাৎ সতর্কতা অবলম্বন করলে যা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তা থেকে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ে এ কথা জাগ্রত থাকে যে, জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। এ দুটো জিনিস আল্লাহ তা'য়ালার গোলাম। মৃত্যুকে তিনি যখন আদেশ দান করবেন, তখনই সে তার কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসবে। মৃত্যু থেকে কোন ক্রমেই নিজেকে রক্ষা করা যাবে না।

ঈমান তার ভেতরে এক অজেয় মানসিক শক্তি সৃষ্টি করে দেয়। কোন ভয় তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয় না। মুমীনের হৃদয় হয় মৃত্যুভীতি শূন্য। পৃথিবীর কোন শক্তি আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার মৃত্যু ঘটাতে পারে এ কথা সে বিশ্বাস করে না। ঈমানদার জানে, মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না, তাহলে কেন সে মৃত্যুকে ভয় করবে। ঈমানদার শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুবরণ করাকে অবমাননাকর মনে করে। সে শহিদী মৃত্যু অনুসন্ধান করে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাতিল শক্তির সাথে লড়াই করে সে মৃত্যুকে বরণ করতে চায়। সে বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে শৃগালের মতো কয়েক শত বছর জীবিত থাকার মধ্যে কোন গৌরব নেই। সিংহের মতো বীরত্বের সাথে পাঁচ মিনিট জীবিত থাকার মধ্যে গৌরব নিহিত।

ঈমান আনার পরে মানুষের ভেতরে এ ধরনের আত্মমর্যাদা আর বীরত্ব, অজেয় মনোবল, নির্ভীকতা সৃষ্টি হয় বলে সে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সেই অনন্ত সুখের জীবনের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। ঈমানদার সব সময় শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে। সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায়, 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে কাপুরুষের মতো মৃত্যু দিও না। আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো।' ঈমানদার শয়নে স্বপনে জাগরণে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে। শাহাদাত বরণ করার ভেতরেই সে তার জীবনের সার্থকতা নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। ঈমান মানুষের ভেতরে দুর্বিনীত সাহস আর প্রচন্ড বীরত্ব সৃষ্টি করে দেয় বলে, সে বাতিল শক্তির আধিক্য দেখে বিচলিত হয় না।

আল্লাহর ওপরে ঈমান আনার কারণে মুমীন অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদে পরিণত হয়। পৃথিবীর কোন শক্তিকে সে ভয় পায় না। ইতিহাসে এর অসংখ্য ঘটনা সোনালী অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মুমীন ব্যক্তি কখনও মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর লক্ষ্য অর্জনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। সে এ কথা বিশ্বাস করে, কোন বুলেটের ওপরে যদি তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোটা পৃথিবীর জনবল তাকে প্রহরা দিয়ে, নিরাপত্তা দিয়ে ঐ বুলেট থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আর যদি কোন বুলেটে তার নাম লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে গোটা পৃথিবীর মানুষ তার বক্ষদেশ লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো বুলেট বর্ষণ করলেও একটি বুলেটও তাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। এই বিশ্বাসই ঈমানদারকে দুর্বার. দুর্বিনীত দুর্জেয় করে তোলে। আর এই ধরনের দুর্জেয় শক্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত দ্বীনি আন্দোলনের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হতে পারে না।

মুমীন ব্যক্তি কোন ক্ষতির ভয় করবে না। কোন ক্ষতি যদি তার হয়ই তাহলে সে এ কথাই বিশ্বাস করবে, স্বয়ং আল্লাহ তার তক্দীরে এটা নির্ধারণ করেছিলেন। বাহ্যিক কোন ক্ষতি দেখেও সে তার লক্ষ্য পথ থেকে একবিন্দু সরে আসবে না। Do or die-হয় সে প্রাণ দান করে শাহাদাত বরণ করবে না হয় সে বিজয়ী হয়ে গাজীর মতই ফিরে আসবে। ঈমানদার ব্যক্তি জানে তাঁর নিজের বলতে কিছুই নেই। সবকিছু তার কাছ থেকে আল্লাহ তা'য়ালা ক্রয় করে নিয়েছেন। মুমীনের প্রাণ, ধন-সম্পদ যা কিছু রয়েছে, এসব দান করেছেন আল্লাহ এবং ক্রয়ও করে নিয়েছেন আল্লাহ। বিনিময়ে তাকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাত দান করা হবে। একজন মানুষ যখন ঈমান আনে, তখন সে এই উপকারীতা লাভ করে যে, তার ভেতরে কোন ভীতি থাকে না। সংগ্রামের ময়দানে কোন ধরনের দুশ্চিন্তা তার ভেতরে বাসা বাঁধে না। তার আদর্শের ওপরে কেউ আঘাত করলে সে তা সহ্য করতে পারে না, সিংহ গর্জনে রুখে দাঁড়ায়।

ঈমানদার কখনও হতাশাগ্রস্থ হয় না, তাঁর ঈমান তাকে হতাশ হতে দেয় না। নৈরাশ্যবাদী তারাই হয়, যাদের কোন অভিভাবক নেই। যাদের ওপরে কোন শক্তি নেই, যারা আশ্রয়হীন, যাদেরকে সাহায্য করার কেউ নেই তারাই কেবল হতাশ হতে পারে। কিন্তু ঈমানদার বান্দা জানে যে, তার অভিভবাক হলেন সমস্ত ক্ষমতার অধিশ্বর স্বয়ং আল্লাহ। মুমীন বান্দা জানে, তাঁর রুজির মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহর পথ অবলম্বন করলে তার রুজির ওপরে আঘাত আসতে পারে, তার সন্তান-সন্ততি অনাহারে থাকতে পারে, এ ধরনের চিন্তায় হতাশ হয়ে সে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। ঈমান মানুষের ভেতরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয় যে, সবচেয়ে উত্তম বন্ধু, সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লাহ।

ঈমানদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, সমস্ত সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আল্লাহ তা'য়ালা। তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আল্লাহর মোকাবেলায় এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, যে শক্তি তাকে আল্লাহর গ্রেফতারী থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। ঈমানদার হয় আশাবাদী এবং তার ভেতরে মানসিক প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। একজন মানুষ গোনাহ্ করবে এটাই স্বাভাবিক। গোনাহ্ করার কারণে মুমীন আল্লাহর ভয়ে অস্থির হয়ে যায়। ঈমানদার ব্যক্তি কখনও বিপদে ধৈর্য হারায় না। জীবনের চরম মুহূর্তে সে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। যে কোন ধরনের বিপদই আসুক না কেন, ঈমানদার আল্লাহর ওপরে ভরসা করে। এটা হলো ঈমানের বাস্তব উপকারিতা। ঈমান মানুষের ভেতরে ধৈর্য সৃষ্টি করে দেয়। কারণ ঈমানদার এ কথা জানে যে, বিপদের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

পবিত্র কোরআন গোটা পৃথিবীর সৃষ্টিসমূহকে সাক্ষী রেখে দাবী করে যে, একমাত্র ঈমানদারগণই সঠিক তথ্য লাভে ধন্য। তাঁরা জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, সত্য সঠিক পথের অনুসারী এবং হেদায়াত প্রাপ্ত। যে কোন ধরনের জাগতিক কল্যাণ ও সফলতা এবং কিয়ামতের দিবসের মুক্তি তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। পৃথিবীতে পুত ও পবিত্র জীবনধারা একমাত্র তাদের ভাগ্যেই নির্দিষ্ট থাকে। এ কারণে ঈমানদারগণ এমন এক অভঙ্গুর শক্তিশালী অবলম্বন ধারণ করে থাকেন, যা কখনও ভেঙ্গে যাবার নয়। তাদের মালিক ও প্রতিপালক হলেন আল্লাহ, এ কারণে তিনি তাদেরকে যাবতীয় বাঁকা পথ ও অন্ধকার পথ থেকে বের করে আলোর পথে পরিচালিত করেন। আর যাদের ঈমান নেই তারা জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত, যাবতীয় সত্য জ্ঞান থেকে তারা দূরে অবস্থান করে। এ ধরনের মানব গোষ্ঠী মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। পরকালে এরা কোন ক্রমেই মুক্তি লাভ করবে না। এদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক স্থান জাহান্নাম।

ঈমানদার ব্যক্তি হয় কৃতজ্ঞ, বিনয়াবনত, গোটা পৃথিবীর যেদিকেই সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং নিজের দেহ সম্পর্কে চিন্তা করে, তখন সে শুধু আল্লাহর কুদরতই দেখতে পায়। এ কারণে সে বারবার আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়। আল্লাহর এসব কুদরত দেখে সে আল্লাহকে বেশী বেশী সেজ্দা দেয়। প্রকৃত পক্ষে এই পৃথিবীর যেসব লোক আল্লাহর গোলামী করে, খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, তাঁরাই হলো সর্বোত্তম।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অগণিত ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরা সবাই একমাত্র তাঁরই আজ্ঞাবহ এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তিনি মানব জাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শন করার জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, প্রতিটি জনপদে হেদায়াতকারী প্রেরণ করেছেন–এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর পরে দ্বিতীয় কোন নবী-রাসূলের আগমন কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে না। একমাত্র তাঁর ভেতরেই রয়েছে উন্নত ও অনুকরণীয় আদর্শ। তিনিই একমাত্র অনুসরণযোগ্য বিশ্বনেতা এবং তিনি নিষ্পাপ–কেবলমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে। পরকাল সম্পর্কে যে মতবাদ কোরআন ও সুন্নাহ পেশ করেছে, তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই অনুসারে পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালিত করতে হবে। অর্থাৎ ঈমানের যতগুলো শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তার প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমান আনতে হবে এবং বাস্তবে সে অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে আর এটার নামই হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান।

এই ঈমানের ওপরই একজন মুমিনের জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হবে এবং সেই ভিত্তির ওপরে গড়ে উঠবে তার গোটা জীবন। ঈমানের গুণাবলীতে পরিপূর্ণ এই জীবনই একজন মানুষের জীবনে সফলতা ও কল্যাণ বয়ে আনবে। পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে যদি ঈমান না থাকে, তাহলে সে মানুষের গোটা জীবনকালই ব্যর্থ হলো এবং সে মহাক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মহান আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীসহ তাঁর ওপরে ঈমান এনে এবং বাস্তব জীবনে সে ঈমানের অনুশীলন করতে হবে। এরপর যে গুণা অর্জন করতে হবে, তা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণের মধ্যে দ্বিতীয় গুণ। সে গুণটি হলো আমলে সালেহ্ বা সৎকাজ।

মানুষকে যে চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য মহাক্ষতি থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম, **তার দ্বিতীয় গুণটিই হলো সৎকাজ**। শুধুমাত্র সৎকাজই মানুষকে সেই মহাক্ষতি থেকে মুক্ত রাখতে পারবে না, সৎকাজের সাথে ঈমান থাকতে হবে এবং সেই সৎকাজ করতে হবে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত আদর্শ ও পন্থানুসারে। অর্থাৎ যে কোন সৎকাজের বিনিময় মহান আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করতে হলে সর্বপ্রথমে ঈমানের যাবতীয় শাখা-প্রশাখার প্রতি ঈমান আনতে হবে। ঈমানহীন যে কোন সৎকাজ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। ঝিনুক ব্যতীত যেমন মুক্তার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি ঈমান ব্যতীত কোন ধরনের সৎকাজের বিনিময় আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে আশা করা যায় না।

আল্লাহর কোরআনে এই সৎকাজকে 'আমলে সালেহ্' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এক কথায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ–নিষেধকেই আমলে সালেহ্ বলা যেতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর রাসূল যে কাজ করতে আদেশ করেছেন, সেই কাজ করা এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকাই আমলে সালেহ্। একজন ঈমানদারের জীবনের যে কোন কাজই আমলে সালেহ্ হতে পারে, যদি সে কাজের পেছনে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদন থাকে। ঈমান ও আমলে সালেহ্ এ দুটো বিষয় একটির সাথে অপরটি এমনভাবে জড়িত যে, একটি ব্যতীত আরেকটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

ঈমান ব্যতীত যেমন আমলে সালেহ্–এর কোন মূল্য নেই, তেমনি আমলে সালেহ্ ব্যতীত ঈমানের দাবী করাও বৃথা। নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করা হলো অথচ আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করা হলো না এবং আল্লাহর বিধান যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন ধরনের চেষ্টা-সাধনা করা হলো, এই ধরনের ঈমান আনায় মহান আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেই। আমলে সালেহ্ ব্যতীত, শুধুমাত্র ঈমান মানুষকে সেই মহাধ্বংস এবং মারাত্মক ক্ষতি থেকে কিছুতেই হেফাজত করতে সক্ষম হবে না, যে ক্ষতির কথা আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরার প্রথমেই সময়ের শপথ করে বলেছেন।

উল্লেখিত দুটো গুণ যখন মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হবে তখন এই ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের পক্ষে একাকী এবং বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করার কোনই সুযোগ থাকবে না। এই কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, যারা ঈমান আনবে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে আমলে সালেহ্ করতে থাকবে, তাদের পক্ষে সমাজে বা দেশে যে যার মতো বাস করবে, এই সুযোগ তাদেরকে ঈমান দেবে না। ঈমানকে টিকিয়ে রাখা এবং আমলে সালেহ্ জারী রাখার জন্যই উল্লেখিত দুটো গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকগুলোকে পরস্পর যোগাযোগ রাখতে হবে। সুযোগ থাকলে এই লোকগুলো একত্রিত হয়ে একটি সমাজ কায়েম করবে

অথবা একটি দল প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অধিক সুযোগ থাকলে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে। কারণ আলোচ্য সূরায় যে চারটি গুণের কথা বলা হয়েছে, প্রথম দুটো গুণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্জন করা গেলেও তা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন পরবর্তী দুটো গুণের শক্তিশালী অস্তিত্ব। আর পরবর্তী দুটো গুণ অর্জন করা যেতে পারে বা বিকশিত হতে পারে কেবলমাত্র সামাজিকভাবে, দলীয়ভাবে বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।

প্রথম দুটে গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলনে ঈমানদারদের তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা জীবন পরিচালিত করে তাদের একটি সমাজ বা দল অথবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি বা নাগরিককে অতিমাত্রায় সচেতন এবং দায়িত্বশীল হতে হবে। যেন সেই সমাজ, সেই দল বা রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ধরনের বিপর্যয় দেখা না দেয়। আমলে সালেহ্-এর বর্ম দ্বারা আবৃত তথা সৎকাজের দেয়ালে ঘেরা রাষ্ট্রের, দলের বা সমাজের গায়ে শয়তান ছিদ্র করে প্রবেশ করে তার ভেতরে কোন ধরনের বিভ্রান্তি এবং দুষ্কৃতি করতে না পারে। এ জন্য ঈমানদারদের সমাজের, দলের ও রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্য সচেতন থেকে একে অপরকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে মহাসত্য অবতীর্ণ করেছেন, তার ওপরে সুদৃঢ় থাকার ব্যাপারে উপদেশ দেবে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার পথে যেসব বিপদ, মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আসবে, পরম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করার জন্য ধৈর্য ধারণ করার নসীহত করবে।

সৎ পথের ওপরে তথা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করার ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহিত করা বা পরস্পরের ভেতরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার কর্তব্য একাকী অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে পালন করা যায় না। মহান আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি কোরআনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন, সে দায়িত্বও একাকী পালন করা যায় না।

সেই সাথে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে যে বাধা-বিপত্তি ও বিপদ-মুসিবত আসে, **সে অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়**। ধৈর্য ধারণের এই অনুশীলনও একাকী করা যায় না। একক কোন ব্যক্তির ওপরে কোন বিপদ এলে সে ব্যক্তি অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আর বিপদ যদি সবার ওপরে আসে তাহলে একে অপরকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিয়ে সে বিপদের মোকাবেলা সবাই একত্রিত হয়ে করতে পারে। সুতরাং হক-এর ব্যাপারে পরস্পরকে উপদেশ দেয়া এবং ধৈর্য ধারনের অনুশীলন করা একাকী হয় না। এর জন্য প্রয়োজন একটি সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের। এ জন্য প্রথম দুটো গুণের প্রাথমিক দাবীই হলো, এই গুণে গুণান্বিত লোকগুলো একত্রিত হয়ে একটি সমাজ বা দল গঠন করবে, যেন মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য পরবর্তী দুটো গুণও অর্জন করা যায়।

আলোচ্য সূরার তৃতীয় আয়াতে 'হক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে এই হক শব্দটির দুটো অর্থ করা হয়েছে এবং আল্লাহর কোরআনেও দুটো অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটির প্রথম অর্থ হলো, 'প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ বিষয়, সত্য-সঠিক-নির্ভুল, অভ্রান্ত, ইনসাফ, ন্যায়' ইত্যাদি। দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, 'অধিকার বা পাওনা।' সূরা আসরে যে 'হক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার ভেতর এই দুটো অর্থই নিহিত রয়েছে। এই শব্দটি মিথ্যার বা বাতিলের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। ঈমানদারগণ যে সমাজ, দল বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে, সেই সমাজে, দলে বা রাষ্ট্রে কোনক্রমেই যেন সত্যের পরিপন্থী, ইনসাফের বিপরীত,

মিথ্যা বা বাতিলের অনুকূলে কোন ধরনের কাজ হতে পারে, সেদিকে সবাই সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখবে। ঈমানদারদের জীবন হবে মহান আল্লাহর রঙে রঙিন, এই রঙের বিপরীত কোন ধরনের রঙকে ঈমানদাররা বরদাস্ত করতে পারে না। এখানে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কোন বাতিল মতবাদ মতাদর্শ দেখলে বা হকের বিপরীত কোন কাজ সংঘটিত হতে দেখলেই ঈমানদাররা দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করবে।

সত্যের বিপরীতে মিথ্যার অনুকূলে কোন শক্তি জেগে ওঠা মাত্র ঈমানদাররা তার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য বুহ্য রচনা করে মিথ্যা শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। যে শক্তি ঈমানের বিপরীত কোন কিছুর আমদানী করার চেষ্টা করবে, সে শক্তির উদ্ধত মস্তকে পদাঘাত করে তাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে দেবে। ঈমানের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের জাগরণকে তারা স্তব্ধ করে দেবে। ঈমানদারদের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেরাই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলবে না, এই বিধান অন্যান্য লোক যেন অনুসরণ করে, সে লক্ষ্যে তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। অন্য লোকদেরকে আল্লাহর বিধানের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সাম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রচেষ্টা চালাবে।

এভাবে তারা প্রত্যেকটি লোককে ইসলামী আদর্শের মূর্ত প্রতীকে পরিণত করবে। ঈমানদাররা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে আন্দোলন গড়ে তুলে এবং সেই আন্দোলনের মাধ্যমে আলোচ্য সূরার শেষে বর্ণিত দুটো গুণের অনুশীলন করবে, সেই অনুশীলনীই হলো সেই সমাজ, দল বা রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি। সমাজ, দল ও রাষ্ট্রকে যে কোন ধরনের দুষ্টক্ষত থেকে মুক্ত রাখবে ঐ জীবনী শক্তি তথা পরস্পরকে হকের ওপরে টিকে থাকার উৎসাহ ও উপদেশ এবং ধৈর্য ধারণের অনুপ্রেরণা।

মহাক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রথম গুণ হলো ঈমান, দ্বিতীয় গুণ আমলে সালেহ্ এবং তৃতীয় গুণ হলো হকের ওপরে টিকে থাকার জন্য পরস্পরের প্রতি উৎসাহ দান করা এবং উপদেশ দেয়া তথা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করা।

আলোচ্য সূরার শেষে যে গুণটির কথা বলা হয়েছে, তা হলো মানব জীবনের সবথেকে বড় গুণ-ধৈর্য। মানুষ যখন মিথ্যার বিপরীত সত্যকে গ্রহণ করবে, পৃথিবীর যাবতীয় মিথ্যা আদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি ত্যাগ করে একমাত্র সত্য আল্লাহর বিধান গ্রহণ করবে, সেই অনুসারে জীবন চালাবে এবং এই বিধান দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যা শক্তি সত্যের বাহকদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে। নানা ধরনের নির্যাতন, নিষ্পেষন, অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। এই অবস্থায় আল্লাহর বিধানের ওপর অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেবে। অসীম ধৈর্যের সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করে দ্বীনি আন্দোলনকে সামনের এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেভাবে নবী ও তাঁর সাহাবাগণ এগিয়ে গিয়েছেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে ধৈর্য তথা 'সবর' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ঈমানদারদের গোটা জীবনই ধৈর্যের জীবন। ঈমানের পথে পদেক্ষপ গ্রহণের সাথে সাথেই তার ধৈর্যের পরীক্ষা শুর হয়ে যায়। আল্লাহ তা'য়ালা যেসব আদেশ দিয়েছেন, তা পালন করার ব্যাপারে ধৈর্যের প্রয়োজন। যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা থেকে বিরত থাকাও ধৈর্যের প্রয়োজন। নৈতিক অপরাধ ও পাপ কাজ

থেকে বিরত থাকা ও পরিহার করে চলাও ধৈর্যের প্রয়োজন। প্রতিটি পদে যে পাপের হাতছানি ও আকর্ষণ, তা থেকে দূরে অবস্থান করাও ধৈর্যের প্রয়োজন। গভীর নিশীথে আরামের শয্যা ত্যাগ করে নামাজে দন্ডায়মান হওয়াও ধৈর্যের প্রয়োজন। জীবনে এমন অনেক সময় আসে, যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গেলে বৈষয়িক দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়, এ অবস্থায় পরম ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়।

আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে গেলে বিপদ-আপদ, মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিকে আলিঙ্গন করতে হয়, এসব ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য ব্যতীত সফল হওয়া যায় না এবং ঈমান টিকিয়ে রাখা যায় না। ঈমান গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনা থেকে শুরু করে নিজের পরিবারের লোকদের সাথে, সমাজের সাথে, দেশের প্রচলিত আইনের সাথে এবং শয়তানের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। এ অবস্থায় ধৈর্য ধারণ না করলে ঈমানের ওপরে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

আল্লাহর বিধান অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে হিজরাত ও জিহাদের প্রয়োজন হয়। এ পর্যায়েও ধৈর্য নামক মহৎ গুণটির একান্ত প্রয়োজন। এই অবস্থায় একজন মুমিন একাকী বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তাকে প্রতি পদে পদে পরাজয় বরণ করার ঝুঁকি থেকে যায়। সফলতা অর্জন করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য একটি মুমিন সমাজ বা দলের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি ধৈর্যশীল হয়, সমস্ত লোকগুলো পরস্পরকে ধৈর্যের প্রেরণা দিতে থাকে এবং মহাপরীক্ষার সময় তার পেছনে শীশাঢালা প্রাচীরের মতোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ঈমানদারদের সমাজ–দল বা সমাজের ও দলের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

এই সমাজ বা দলের গতি হবে অপ্রতিরোধ্য এবং দুর্বার। এক দুর্বিনীত অদম্য শক্তিতে এই দল আত্মপ্রকাশ করবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আলোচ্য সূরায় বর্ণিত চারটি গুণের সমাহার যে দলের কর্মীদের মধ্যে ঘটবে, একমাত্র সেই দলের পক্ষেই সম্ভব দেশের বুক থেকে অন্যায়-অবিচার আর অনাচার ও পাপাচার দূর করা। সেই দলকে মহান আল্লাহ অবশ্যই বিজয় দান করবেন এবং দেশ ও জাতির নেতৃত্ব তাদেরকে দান করবেন। একদিন তাদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণহীন শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

সূরা আল–হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–১০৪

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'হুমাযাহ্' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কোরআনের সমস্ত গবেষক এ ব্যাপারে একমত যে, এই সূরাটি মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিক দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরায় মানুষের যেসব দোষক্রটির কথা আলোচনা করা হয়েছে, সে যুগের মানুষের মধ্যে এগুলো বর্তমান ছিল।

এ সূরায় মানুষের ঐসব মারাত্মক দোষ-ক্রটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেসব দোষ-ক্রটির কারণে একটি পরিবার ও সমাজের পরস্পরে ভাঙ্গন ধরে। কাউকে ছোট করার জন্য ইঙ্গিত করে কথা বলা, অন্যের দোষ আরেকজনের কাছে বর্ণনা করা এবং মানুষকে অযথা গালাগালি ও অভিশাপ দেয়া। এসব খারাপ গুণের বিষয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এসব লোকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এরপর সেই কৃপণ স্বভাব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ বার বার হিসাব করে এবং মনে করে যে, এই অর্থ-সম্পদই তার সম্মান ও মর্যাদা লাভের মাপকাঠি এবং সম্পদ তার কাছে চিরকাল থাকবে। এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা এমন এক স্থানে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে, যেখানে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ স্থানটা হলো জাহান্নাম। যেখানের আগুন তাদের কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। সেখানে তাদেরকে নিক্ষেপ করে মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। এভাবে এই সূরায় মানুষের মনে পরকালের ভীতি জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

❀

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকূ ১

(১) দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্যে, যে (অন্যকে) অপমান, (তাদের) বদনাম করে। (২) যে (কাঁড়ি কাঁড়ি) অর্থ জমা করে এবং যথাযথভাবে তা গুণে রাখে, (৩) সে মনে করে, (তার এই) অর্থ (বুঝি) তার কাছে স্থায়ী হবে, (৪) বরং নির্ঘাত অল্পদিনের মধ্যেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগুন (-এর গর্তে) সে নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, (৫) তুমি কি জানো, বিচূর্ণকারী আগুন-(এর গর্তটি) কেমন? (৬) (এ হচ্ছে লোভীদের জন্যে) আল্লাহ তা'য়ালার প্রজ্জ্বলিত এক আগুন! (৭) যা (এতো মারাত্মক যে,) তা মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, (৮) (গর্তকে বন্ধ করে সেদিন) তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে, (৯) (যেন খুলে না যায় সে জন্যে) উঁচু উঁচু থাম দিয়ে (গেড়ে) রাখা হবে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এই সূরার ১ থেকে ৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত এমন এক শ্রেণীর মানুষের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাদের আপাদ-মস্তক হীনমন্যতায় (Inferiority complex) ও পরশ্রীকাতরতায় জর্জরিত। অন্যের ভালো এরা দেখতে পারে না। চেনা বা অচেনা হোক না কেন, কেউ একটু ভালো পোষাক পরিধান করলো বা ভালো একটা বাড়ি করলো, ভালো একটা গাড়ি কিনলো, কারো সন্তান পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলো, কোথাও কেউ ভালো একটু সুযোগ লাভ করলো, এই শ্রেণীর লোক এসব দেখলে বা শুনলেই একটা কটু মন্তব্য করবে। শুধু মন্তব্যই নয়, এরা সুযোগ পেলেই অন্যকে লোক সমাজে অপদস্ত করে বসে। অন্যের সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখে কথা বলে না। অন্যের প্রতি তীর্যক মন্তব্য ছুড়ে দেয়া, কারো প্রতি নির্দয় মন্তব্য করা এবং রসকসহীন কথা বলা অন্যের মনে আঘাত দেয়া এদের মজ্জাগত স্বভাব।

অন্যের পোষাক, চেহারা, হাঁটাচলা, ওঠা-বসা ইত্যাদি সম্পর্কে তীর্যক মন্তব্য করবে এবং একটা ত্রুটি বের করে সেই ত্রুটিমূলক বা শ্রুতিকটু বিশেষণ মানুষের ভেতরে ছড়িয়ে দেবে।

শুধু তাই নয়, এরা মানুষকে অন্যায়ভাবে অপমানকর খেতাবেও ভূষিত করে থাকে এবং মানুষের নাম বিকৃতি করে। অন্য মানুষকে এরা অযথা অপমান অপদস্ত করে, কথার মাধ্যমে মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ লাভ করে। শুধু তাই নয়, অপরের বদনাম করা, অকারণ দোষে আরেকজনকে দোষী করাও এদের স্বভাব। এরা যে সমাজে বাস করে, এদের মনোভাব হলো একমাত্র সে-ই যেন সেই সমাজের সবথেকে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি আর অন্যরা সবাই হীন ও নীচ। এ জন্য এরা অন্যকে হীন দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এরা সুযোগ পেলেই অন্যের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করতে থাকে।

একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলা, কানাঘুষা করা, গীবত গাওয়া, একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে উত্তেজিত করে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরানো, চোগলখুরী করে পরিবার ও সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, অমূলক কথা এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে আরেক ভাইয়ের কানে দিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়া, কারো সম্পর্কে অপবাদ ছড়িয়ে দেয়া, অন্যকে বিদ্রুপ করা এসব লোকের স্বভাব। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে, 'দুর্ভোগ রয়েছে বা নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্যে, যে অন্যকে অপমান-গালাগালি করে এবং অন্যের বদনাম করে, অন্যের দোষ প্রচারে অভ্যস্ত।'

উল্লেখিত অপকর্মগুলো করে ঐ শ্রেণীর লোকগুলোই বেশী, যারা অন্যায় পথে প্রচুর অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়েছে। রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হবার ফলে এরা এদের চারপাশের লোকগুলোকে হীন মনে করে এবং তার তুলনায় অন্য কেউ অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কেন হবে, এই ধরনের মনোভাব পোষণ করে। অর্থ-সম্পদের অহঙ্কারে এরা অন্যকে অপমান করে, অন্যের বিরুদ্ধে অপমানকর মন্তব্য করে। এরা মনে করে, এই পৃথিবী হলো অর্থের গোলাম। এখানে টাকা ছড়ালে যা খুশী তাই করা যায়। অন্যকে অপমান করে, ছোট করে, গালি দিলে যদি কোন ঝামেলা পড়তেই হয়, তাহলে সে ঝামেলা থেকে তো টাকাই মুক্ত করবে। এ জন্য এরা অন্যকে অপমান ও লাঞ্ছিত করার সাহস পায়। অর্থ-সম্পদের অহঙ্কারে এরা নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে। কত টাকা এবং সম্পদের অধিকারী সে হয়েছে, এ জন্য বার বার অর্থ আর সম্পদের হিসাব করে দেখে এবং কৌশলে তার চারপাশের লোকগুলোকে জানিয়ে দেয়, সে এত অর্থ এবং সম্পদের মালিক। কৃপণতা আর অর্থের পূজা করা এদের স্বভাব।

বিপুল অর্থ, বিত্ত-বৈভব অর্জন করে অহঙ্কারের পদভারে গোটা পৃথিবীটাকে নিজের হাতের মুঠোয় মনে করে। এরা মনে করে এই অর্থ আর বিপুল সম্পদ এদের চীরদিনের সাথী। অর্থ আর ঐশ্বর্য্য অবলম্বন করেই যেন এদের বেঁচে থাকা। অর্থের গরমে এরা যে কোন অন্যায় কাজে করতেও দ্বিধাবোধ করে না। মৃত্যুর কথা যেন এদের স্মৃতি থেকে মুছে যায় এবং জীবনের এক অসতর্ক মুহূর্তেও এদের স্মরণে আসে না যে, একদিন এসব ধন-সম্পদ আর ঐশ্বর্য্যের পাহাড় ডিঙিয়ে মৃত্যুর থাবা তার দিকে এগিয়ে আসবে, তখন তাকে শূন্য হাতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর পরে যে কোন জগৎ থাকতে পারে, সে কথা তো দূরে থাক-সে যে মৃত্যুবরণ করবে, এ কথাটিও ভুলে যায়।

এ জন্য আলোচ্য সূরার ৪ থেকে ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, এ ধরনের খারাপ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকগুলো যে আচরণ অবলম্বন করেছে এবং তারা যে ধারণা করছে, সে ধারণা অবশ্যই ভুল এবং তারা যে আচরণ করছে, সে আচরণই তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

যে মৃত্যুকে সে ভুলে আছে, সেই মৃত্যু তাকে এই পৃথিবী থেকে অবশ্যই ছিনিয়ে নেবে এবং এমন এক গর্তে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেই গর্তে আল্লাহ তা'য়ালার আগুন প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। সেই আগুনের তীব্রতা এত বেশী যে, তা অপরাধীদের হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করবে। মানুষের হৃদয়ই হলো যাবতীয় চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, আবেগ-উচ্ছাস, লালসা, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, যে কোন ধরনের চিন্তাধারা, খারাপ প্রবণতা ইত্যাদির উৎস কেন্দ্র। আল্লাহর জাহান্নামের আগুন ইসলাম ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিরোধিদের সেই হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে কলুষিত হৃদয় দিয়ে তারা কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো।

যে হৃদয় দিয়ে অন্য মানুষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করতো, যে হৃদয় অন্য মানুষ সম্পর্কে অবান্তর কথার জাল বুনতো। অন্যকে অপমান-অপদস্ত, গালাগালি, অপরের প্রতি নির্দয় মন্তব্য ছুড়ে দেয়া, অপরের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করার, চোগলখুরী করার, গিবত গাওয়ার, অন্যকে হীন দৃষ্টিতে দেখার কথাগুলো যে হৃদয়ে উদিত হতো, সেই হৃদয় পর্যন্ত আল্লাহর জাহান্নামের আগুন তার শিখা বিস্তার করবে। এই জাহান্নামেরই একটি স্তরের নাম হলো হুতামা। এই হুতামায় যা কিছুই নিক্ষেপ করা হবে, তা ভেঙ্গে, নিষ্পেষিত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ভষ্মিভূত করে দেবে। হুতামার অন্তহীন গভীরতা ও তার আগুনের ভয়াবহ প্রচন্ডতার মাধ্যমে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। এই সূরা ব্যতীত আল্লাহর কোরআনে অন্য কোন স্থানে জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহর আগুন বলা হয়নি। এই সূরায় জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহর আগুন হিসাবে চিহ্নিত করে, ঐ লোকগুলোর প্রতি অসীম ঘৃণা আর ধিক্কারই দেয়া হয়েছে, যারা মানুষকে অকারণে গালাগালি দেয়, অপমান করে, হীন ও নগণ্যভাবে, নিজের তুলনায় ছোট মনে করে, নিজেকে বাড়ি-গাড়ি ও বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক হিসাবে অহঙ্কার করে, কথা-বার্তা ও ব্যবহারে মাধ্যমে অন্যকে মানসিক যন্ত্রণা দেয়, চোগলখুরী ও গিবত করে।

এই লোকগুলোকে ঐ হুতামা নামক জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জ্বলিত করা হবে এবং সেই ভয়াল আগুনের কঠিনতা ও লোমহর্ষক অবস্থার বাস্তব চিত্র অঙ্কন করার জন্যই 'আল্লাহর আগুন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।' এই আগুনের গর্তে ঐ শ্রেণীর লোকগুলোকেও নিক্ষেপ করা হবে, যারা অর্থের পূজা করতো এবং কৃপণতা ছিল যাদের চারিত্রিক ভূষণ। অর্থের অহঙ্কারে যারা পৃথিবীটাকে নিজের হাতের মুঠোয় মনে করতো এবং মৃত্যুকে ভুলে থাকতো। হুতামা নামক জাহান্নামের সেই গর্তে এসব লোকদেরকে ফেলে দিয়ে জাহান্নামের মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে। সেখান বাইরে বের হবার কল্পনাও যেন করতে না পারে অপরাধিদের দল, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রজ্জ্বলিত আগুনের সেই গর্তে আগুনের লেলিহান শিখা বিশালাকারের স্তম্ভের মতোই ওপরে দিকে ধাবিত হবে। এই অবস্থার মধ্যে তারাই নিক্ষিপ্ত হবে, যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করেনি। আল্লাহর বিধান যে উন্নত ধরনের চরিত্র গড়ার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই বিধান অবলম্বনে উন্নত চরিত্র গড়েনি।

অর্থ লোলুপ দুনিয়া পূজারি লোকগুলোই পাপাসক্ত ও অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে থাকে। এদের মনোজগৎ হীনমন্যতা ও পরশ্রীকাতরতা বিকশিত হওয়ার জন্য খুবই উর্বর। এই মনোবৃত্তি এদেরকে অন্যের সম্মান ও মর্যাদাকে পদদলিত করা, অন্যের নিন্দা করা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, অপমান করা, কটাক্ষ করা, অন্যের প্রতি অশোভন ইঙ্গিত করা, উপহাস করা, ব্যঙ্গাত্মক উপাধিতে ভূষিত করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, হীন ও নীচ মনে করার ব্যাপারে প্ররোচিত করে। মানব চরিত্রের এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্য। মানুষের ভেতর থেকে যখন মৃত্যুভীতি ও

পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি মুছে যায়, তখন তার ভেতরে উল্লেখিত নিকৃষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে। ঈমান বিবর্জিত মানুষের বাস্তব অবস্থা এমনই হয়। আল্লাহর বিধান এই ধরনের নিচু মানের মানসিকতাকে চরমভাবে ঘৃণা করে। কারণ উন্নত নৈতিকতা হলো আল্লাহর বিধানের ভূষণ। এজন্য আল্লাহর দেয়া বিধান তথা ইসলামে পরশ্রীকাতরতা, হীনমন্যতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা, পরনিন্দা, পরচর্চা ও কুৎসা রটনা, অপবাদ দেয়া, অযথা অপমান করা, চোগলখুরী করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

মক্কায় ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের সাথে তেমনি আচরণ করতো, যেসব আচরণের প্রতি আলোচ্য সূরায় ঘৃণা ও ধিক্কার দিয়ে কঠোর শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বিরোধী লোকগুলোর ঘৃণ্য মানসিকতা ও আচরণের প্রতি ধিক্কার দিয়ে কঠোর শাস্তির কথা শুনিয়ে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া হয়েছে, যেন তারা আল্লাহর বিধান বিবর্জিত লোকগুলোর অভদ্রজনোচিত ও অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে নিজেদেরকে অপমানিত মনে না করে। তাদের হৃদয়ে যেন অপমানবোধ প্রবেশ করতে না পারে, এ জন্য এ কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে রব-এর সন্তুষ্টির কারণে তারা ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করেছে এবং সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য আন্দোলন করছে, সেই রব ঐ লোকগুলোকে ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি করবেন। যে আচরণ তারা করছে, তার বিনিময় অবশ্যই তাদেরকে পেতে হবে এবং ঈমানদাররা ঐ ঘৃণ্য আচরণ হাসি মুখে বরদাশ্‌ত করেও আন্দোলনের কাজ জারী রেখেছে, তাদেরকে তিনি সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করে এ কথা বুঝিয়ে দেবেন যে, তোমাদেরকে হীন ও নগণ্য মনে করতো বাতিল গোষ্ঠী, আসলে তোমরাই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং ওরাই হীন ও নগণ্য।

সূরা আল-ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-১০৫

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটি আল ফীল। এই শব্দ থেকে 'ফীল' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। আল্লাহর কোরআনের সমস্ত গবেষক এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এই সূরাটি মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম সূরা। আল্লাহর রাসূলের নবুওয়াত তথা তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের প্রতি মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী যখন বিরোধিতা করছিল, তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের অনুসারীদের ওপর নাজরানে ইয়েমেনের ইহুদী শাসক যুনাওয়াস অত্যাচারের যে স্টীম রোলার চালিয়েছিল, তার প্রতিশোধ হিসাবে হাবশা বর্তমানে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান শাসক ইয়েমেনের ওপর আক্রমণ করে হেমইয়ারী শাসনের পতন ঘটিয়েছিল। এরপর থেকেই ঐ এলাকায় ৫২৫ খৃষ্টাব্দেই হাবশীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে রোমান সরকার তাদেরকে ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। তদানীন্তন হাবশী সরকারের কোন নৌবাহিনী ছিল না, এ জন্য তারা রোমানদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে তাদের নৌবাহিনী ব্যবহার করে নিজেদের প্রায় ৭০ হাজার সৈন্য ইয়েমেনের উপকুলে নামিয়ে দিয়েছিল। পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশ ও রোমান প্রভাবিত এলাকার মধ্যে যে ব্যবসায়ের ওপর শত শত বছর ধরে আরবদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা খর্ব করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসাই ছিল হাবশা ও রোমান সরকারের উদ্দেশ্য।

রোমানরা নিজেদের নৌবাহিনীকে লোহিত সাগরে নামিয়ে দিয়ে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য অচল করে দিয়েছিল এবং আরবদের জন্য তখন কেবলমাত্র স্থলপথ ইয়েমেনের মধ্য দিয়ে মুক্ত ছিল। এই স্থলপথও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রোমানরা হাবশার খৃষ্টান সরকারে সাথে গোপন আঁতাত করে নৌবাহিনীর সাহায্যে হাবশীদের দিয়ে ইয়েমেন দখল করালো। ইয়েমেনের ওপর হাবশীদের আক্রমণ সম্পর্কে নানা ধরনের ইতিহাস বিদ্যমান। ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর লিখেছেন, দুইজন সেনাপতির অধিনে হাবশীদের বাহিনী সক্রিয় ছিল। একজনের নাম আজইয়াত এবং আরেকজনের নাম আবরাহা। পরবর্তীতে এই দুই সেনাপতির মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় এবং আজইয়াত নিহত হয় আবরাহার হাতে। পরবর্তীতে আবরাহা গোটা ইয়েমেন দখল করে হাবশার সম্রাটের কাছ থেকে নিজেকে তার প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দানে রাযী করায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, প্রচীন যুগে সাবা নামক রাজ্যের সীমানা ছিল দক্ষিণ আরব সাগর থেকে শুরু করে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, আফ্রিকা এবং ইয়েমেনের মাঝে সাগরের যে অংশ ছিল তাকে হাব্‌শ সাগর বলা হতো। ইয়েমেনের সামনের হাব্‌শ সাগরের ওপারে আফ্রিকার যে সমস্ত এলাকা ছিল তা সাবা রাজ্যের উপনিবেশ ছিল। এই জায়গাটাকে আরবরা হাব্‌শ বলে অভিহিত করেন। আরবী 'হাব্‌শ' শব্দের অর্থ হলো মিশ্রণ। ঐতিহাসিকদের মতে ঐ এলাকার মূল অধিবাসী এবং সাবাদের মিশ্রণের ফলে নতুন এক জাতির সৃষ্টি হয়, এদেরকেই হাব্‌শী বলা হয়। বংশ পরিচয় সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তারা বলেন, হাব্‌শার অধিবাসীগণ একবার ইয়েমেনের ওপর আক্রমণ করে তা দখল করে নিয়েছিল। সে সময়ে তারা সাবার বিভিন্ন বংশের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হবার সময় বলতো, আমরা তাই ইবনে উদাদ বা বনী কাহ্‌লানের বংশধর। (আব্দুল বার-আল্ ক্বাছ দুওয়াল উমাম-পৃষ্ঠা, ২৬)

ইউরোপীয়দের মতে, হাব্‌শীগণ অমিশ্রিত প্রকৃত সাম বংশের নয়। প্রকৃত অধিবাসীদের সাথে আরবের নানা এলাকার গোত্র এসে তাদের সাথে মিশ্রিত হয়েছে। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ২৪ নং খন্ড, সাবা অধ্যায়, পৃষ্ঠা, ৬২৪)

আরবরা হাব্‌শার শাসককে নাজ্জাশী নামে পরিচিত করে। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, নাজ্জাশী শব্দটা হাব্‌শী নয়–আরবী। আরবী নাজুশ শব্দের আরেকটি রূপ নাজ্জাশী। হাব্‌শী ভাষায় নাজুশ শব্দের অর্থ হলো, শাসক বা বাদশাহ। বিশ্বনবীর যুগে হাব্‌শার বাদশাহ ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যার নাম ছিল আস্‌হামা ইবনে আব্‌জার। তাঁর শাসনামলেই মুসলমানেরা দ্বীনি আন্দোলন বিরোধীদের অত্যাচারে মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে হাব্‌শায় হিজরত করেছিলেন।

বাদশাহ আস্‌হামা তাদেরকে সম্মান-মর্যাদার সাথে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ইসলামের শত্রুরা হাব্‌শায় পৌঁছে স্বয়ং বাদশাহ আস্‌হামার দরবারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজক কথা বলে তাদের হাতে মুসলমানদেরকে সমর্পণ করতে অনুরোধ করেছিল। আস্‌হামা তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারপর তিনি হযরত জাফরের বক্তব্য শুনে এমনই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি স্বয়ং ইসলাম কবুল করেছিলেন। এই বাদশাহের সাথেই আল্লাহর রাসূলের পত্র মারফত যোগাযোগ হয়েছিল। এই বাদশাহ ইন্তেকাল করলে বিশ্বনবীকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়ে ছিলেন। বিশনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে হাব্‌শার বাদশাহ আস্‌হামার ইন্তেকালের সংবাদ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে তিনি মক্কায় গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করেছিলেন।

উল্লেখিত ঘটনার পূর্বে হাব্‌শার ধর্ম এবং সভ্যতা সংস্কৃতি মিসর তথা আরবদের কৃষ্টি সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ধর্মের দিক দিয়ে তারা আরবের মূর্তি পূজকদের মতই ছিল কিন্তু রোম শাসকদের প্রভাবে মিসরে খৃষ্ট ধর্মের বিস্তৃতি ঘটলে হাব্‌শাতেও এর প্রভাব পড়ে। ফলে ৩৩০ খৃষ্টাব্দে হাব্‌শার বাদশাহ ওয়্‌নিয়াহ্‌ সর্বপ্রথম খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ধর্মীয় বিরোধ ও নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাব্‌শার আরবাত মতান্তরে আস্‌বাহ নামক আরেক বাদশাহ ইয়েমেন আক্রমন করে তা দখল করে নেয়। সে সময় আবরাহা নামক এক শক্তিশালী ব্যক্তিকে হাব্‌শার বাদশাহ ইয়েমেনের গভর্ণর নিয়োগ করেছিল। পরবর্তীতে আবরাহা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং হাবশার বাদশাহ এ সংবাদ পেয়ে তাকে হত্যা এবং ইয়েমেনকে একেবারে তছনছ করার প্রতীজ্ঞা ব্যক্ত করেছিল।

ইবনে কাসির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খন্ডে লিখেছেন, আবরাহা এ সংবাদ পেয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল। তারপর সে তাঁর নিজের শরীরের কিছু রক্ত আর ইয়েমেনের কিছু মাটিসহ হাব্‌শার বাদশাহের কাছে প্রেরণ করে পত্রে জানিয়েছিল, 'ইতিপূর্বেকার গভর্ণর যেমন আপনার অনুগত ও আজ্ঞাধীন ছিল, আপনার এই গোলামও তেমনি থাকবে। যখন থেকে আমি শুনেছি আপনি আমার ওপরে ক্রোধান্বিত, তখন থেকে আমি বড় অস্থিরতার মধ্যে দিন যাপন করছি। আমার নিজের শরীরের রক্ত ও ইয়েমেনের মাটি আপনার কাছে প্রেরণ করলাম, আপনি এই মাটির ওপরে আমার রক্ত ঢেলে তা আপনার পা দ্বারা পিষ্ট করে আপনি আপনার প্রতীজ্ঞা পূরণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন।' আবরাহার এই প্রস্তাবের কারণে তাকে বাদশাহ ক্ষমা করে দিয়েছিল এবং তার প্রতিনিধিত্ব অনুমোদন করেছিল।

আবরাহা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা হলো, সেছিল রাজবংশের সন্তান এবং তার নাক ছিল কাটা। এ কারণে তাকে 'আশরাম' অর্থাৎ নাককাটা বলা হতো। কেউ বলেছেন, আবরাহার

রাজত্ব শুরু হয় ৫২৫ খৃষ্টাব্দে কিন্তু আরদুল কোরআনের রচয়িতার বর্ণনানুসারে আবরাহার রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে। আরবী ইবরাহীম শব্দকে হাব্শী ভাষায় উচ্চারণ করা হয় আবরাহা। এই আবরাহা খৃষ্টধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল। সে গোটা ইয়েমেনে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য বহু প্রচারক নিয়োগ করেছিল এবং গোটা দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য গির্জা নির্মাণ করিয়েছিল। সবচেয়ে বড় এবং সুদর্শন-দৃষ্টিনন্দন গির্জা সে নির্মাণ করেছিল ইয়েমেনের রাজধানী শহর 'ছান্আ'য়। আরবরা এই গির্জার নাম দিয়েছিল 'আল কালিস'।

ইবনে কাসির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইবনে জারীরের বর্ণনা উল্লেখ করে লিখেছেন, নির্মাণ শিল্পের দিক দিয়ে এই গির্জা ছিল তদানীন্তন পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এই গির্জার নির্মাণ কাজ শেষ হলে আবরাহা হাব্শার বাদশাহকে লিখেছিল, আপনার সম্মানে রাজধানী ছান্আ শহরে এমন একটা অতুলনীয় গির্জা নির্মাণ করেছি, ইতিপূর্বে যা কোন ইতিহাস অবলোকন করেনি। যারা আরবের কা'বাঘরে হজ্জের জন্য সমবেত হয়ে থাকে, আমার ইচ্ছে হলো তারা এখন থেকে এই গির্জায় এসে সমবেত হোক এবং এটাই যেন আরব জাতির হজ্জের স্থানে পরিণত হয়। (তারীখে ইবনে কাসীর-দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৭০)

আবরাহার এই ঘোষনা জানতে পেরে শুধু আরবের অধিবাসীগণই নয়-কা'বাঘরের ভক্ত যারাই ছিল, তারা সবাই আবরাহার ওপরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সুহাইলী উল্লেখ করেছেন, এই গির্জা নির্মাণকালে আবরাহা তাঁর প্রজাদের ওপরে জুলুম অত্যাচারের সয়লাব বইয়ে দিয়েছিল। মানুষদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক নিযুক্ত করেছিল। মহামূল্যবান হীরা জহরত এবং রাষ্ট্রের অপরিমিত সম্পদ সে এই নির্মাণ কাজে ব্যয় করেছিল। দুষ্প্রাপ্য পাথরসমূহ দ্বারা নির্মিত অদ্ভুত সুন্দর এবং দীর্ঘ ও প্রশস্ত ভবন ছিল, বিস্ময়কর ও বিচিত্র স্বর্ণ খচিত চিত্রাবলীতে চিত্রিত এবং রত্ন খন্ডে সজ্জিত ছিল। আবলুস কাঠ, হাতীর দাঁত ও সুগন্ধি যুক্ত কাঠের কারুকার্যে সুশোভিত মিম্বর, রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ চিহ্ন দিয়ে এই গির্জার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। প্রথম আব্বাসীয় খলীফা সাফ্ফার শাসনকাল পর্যন্ত এই গির্জার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। (রাওজুল আনফ প্রথম খন্ড, ইবনে কাসীর দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১৭০)

গোটা আরবে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসীর কাছে কা'বার মর্যাদা ছিল অসীম। তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ীই কা'বাঘর তাওয়াফ করতো ও হজ্জ আদায় করতো এবং তাদের নিজস্ব মূর্তি সেখানে স্থাপন করতো। বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় জানা যায়, কা'বাঘরে তিন শত ষাটটি মূর্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত ঈসা ও হযরত মারইয়াম আলাইহিমুস সালাম আজমাঈনের ছবি ছিল। সুতরাং যে কোন শ্রেণীর মানুষের কাছে কা'বা ছিল সম্মান ও মর্যাদার পাত্র।

আবরাহার ঘোষনা সমস্ত মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিয়েছিল। ইয়েমেনের ছান্আ শহরে অবস্থানকারী এক আরবের কানে যখন আবরাহার এই ঘোষনা পৌঁছলো, তখন সে আবরাহার নির্মিত ঐ বিশাল গির্জায় গিয়ে সুযোগ মত মলমূত্র ত্যাগ করে তা অপবিত্র করে দিয়ে এসেছিল। আবরাহা এ সংবাদ জানতে পেরে স্পষ্ট অনুমান করলো, এ কাজ করেছে আরবের কোন লোক। তখন সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রতীজ্ঞা করলো, ইবরাহীমের কা'বাকে সে নিশ্চিহ্ন না করে শান্তিতে থাকবে না। এরপর সে ৫৭০ অথবা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে ৬০ হাজার সৈন্য ও বহু সংখ্যক হাতীসহ মক্কার দিকে অগ্রসর হলো। মুহূর্তে এ সংবাদ আরবের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। প্রতিটি মানুষের ভেতরে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। সর্বপ্রথম ইয়েমেনের যুনাজার নামক একজন নেতা ইয়েমেন থেকে বের হয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে দূত প্রেরণ করে আবরাহাকে মোকাবেলা করার জন্য তাদের সাহায্য কামনা করলো।

যুনাজার মোটামুটি একটা দল নিয়ে আবরাহাকে মোকাবেলা করে পরাজিত এবং বন্দী হলো। এরপর খাছআম গোত্রের নেতা নেফাইল ইবনে হাবিব মোকাবেলা করে পরাজিত হয়ে আবরাহার হাতে বন্দী হলো। আবরাহা যখন তায়েফে এলো তখন বনী সাক্বীফের নেতা মাসউদ ইবনে মুআত্তাব তাকে বললো, আমার বিশ্বাস আপনি কা'বা ধ্বংস করবেন না। কা'বায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা 'লাত' রয়েছে। এ কথা শুনে আবরাহা নীরব ছিল। তারপর মাসউদ মক্কার পথ আবরাহাকে দেখানোর জন্য আবু রাগাল নামক এক লোককে তাঁর পথপ্রদর্শক করে দিল। পক্ষান্তরে আবু রাগাল ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সার পর্যন্ত এসে মৃত্যুবরণ করলো। আরবের লোকজন সেই জাহিলিয়াতের যুগেও আবু রাগালের ওপর এতটা ক্ষুব্ধ ছিল যে, তারা তার কবরের ওপরে পাথর নিক্ষেপ করতো। তার অপরাধ ছিল, সে আবরাহাকে মক্কার পথ দেখাচ্ছিল।

আবরাহা মুহাস্‌সার পর্যন্ত এসে তাঁর আসওয়াদ ইবনে মাকসুদ নামক এক সেনাপতিকে আদেশ দিল, সে যেন তাঁর বাহিনী নিয়ে মক্কায় গিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে। সেই সেনাপতি মক্কার কাছে এসে দেখতে পেল, মক্কার অধিবাসীদের হাজার হাজার উট, দুম্বা, মেষ ও ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। সে আক্রমণ না করে ঐ সমস্ত পশুপাল তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এই সমস্ত উটের ভেতরে আব্দুল মুত্তালিবের দুইশত উটও ছিল এবং সেই ছিল কুরাইশদের নেতা। আবরাহার এই আক্রমণাত্মক ভূমিকা দেখে মক্কার সমস্ত গোত্র মিলে পরামর্শ করলো, আবরাহার সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সুতরাং আবরাহা যখন আক্রমণ করবে, সে সময়ে তারা সবাই পাহাড়ের ওপাশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

মক্কার অধিবাসীগণ মক্কায় অবস্থানকালেই আবরাহা তদের কাছে দূত প্রেরণ করলো। সে দূত এসে লোকজনের কাছে জানতে চাইলো, তোমাদের নেতা কে ? সমস্ত লোকজন বিশ্বনবীর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিমের দিকে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিল। আবরাহার দূত জানাতাহুল হিমইয়ারী গোত্রপতি আব্দুল মুত্তালিবের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের বাদশাহ আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি। তিনি এসেছেন ঐ কা'বাঘর ধ্বংস করতে। আপনারা যদি বাধা দেন তাহলে আপনাদের ক্ষতি হবে। আর যদি বাধা না দেন তাহলে আমাদের বাদশাহ আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।'

আব্দুল মুত্তালিব জবাব দিল, 'তোমাদের বাদশাহের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা কোনটাই নেই। কা'বা আল্লাহর ঘর এবং তাঁর নবী ইবরাহীমের স্মৃতি। আল্লাহর যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তিনি তা রক্ষা করবেন। তবে বাধা দানের ক্ষমতা আমাদের নেই।'

তারপর আব্দুল মুত্তালিব তাঁর সাথীদের নিয়ে বাদশাহের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবের সুন্দর চেহারা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দেখে তাকে নিজের পাশে বসালো। আব্দুল মুত্তালিবের মুখের প্রাঞ্জলভাষা শুনে ও তাঁর বাগ্মিতা দেখে আবরাহা অত্যধিক প্রভাবিত হয়ে পড়লো।

আলোচনার একপর্যায়ে আব্দুল মুত্তালিব অভিযোগ করলো, 'আপনার লোকজন আমাদের পশুপাল ধরে এনেছে। আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, আমাদের পশুপাল ফেরৎ দিয়ে দিন।' আব্দুল মুত্তালিবের আবেদন শুনে আবরাহা কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'আপনি জানেন আমি কি উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু আপনি সে সম্পর্কে কোন কথা না বলে পশুপাল সম্পর্কে বলছেন, আপনার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি।'

আব্দুল মুত্তালিব জবাব দিল, 'পশুপালের মালিক আমি, সুতরাং আমি সেগুলোর দাবী করছি। আর কা'বার মালিক আমি নই, আমি তাঁর খাদেম মাত্র। যিনি কা'বার মালিক তিনি যদি তা রক্ষা করার ইচ্ছা করেন, তাহলে করবেন এবং এ ব্যাপারে তিনি জানেন আর আপনি জানেন।'

আব্দুল মুত্তালিবের সাথীদের একজন আবরাহার কাছে প্রস্তাব দিল, 'আপনি যদি কা'বা ধ্বংস না করেন তাহলে আমরা আমাদের তেহামাহ এলাকার মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আপনার খেদমতে উপস্থিত করবো।' কিন্তু আবরাহা তাঁর এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে দম্ভভরে বলেছিল, 'আমি যে প্রতীজ্ঞা নিয়ে এসেছি, তা বাস্তবায়ন করেই ফিরে যাবো।'

আব্দুল মুত্তালিব তাঁর সাথীদের নিয়ে ফিরে আসার সময় পরামর্শ করলো কা'বা ধ্বংসের মর্মন্তুদ দৃশ্য তারা চোখে দেখতে পারবে না। অতএব তারা সবাই পাহাড়ের ওপাশে গিয়ে অবস্থান করবে। মক্কার অধিবাসীরা যখন পাহাড়ের দিকে যেতে থাকলো তখন আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে অনেকে কা'বায় এসে কা'বার দরোজার শিকল ধরে আল্লাহর কাছে আবেদন করলো, 'হে খোদা! আমরা বিশ্বাস করি, তুমি তোমার কা'বাকে রক্ষা করবে যেমন আমরা আমাদের সম্পদ রক্ষা করি। তোমার শক্তির ওপরে ক্রুশ শক্তি এবং তার পূজারিরা জয়ী হতে পারবে না সে বিশ্বাস আমাদের আছে। তবে তুমি নিজেই যদি তোমার ঘর তাদেরকে ধ্বংস করার সুযোগ দাও তাহলে তোমার মন যা চায় তাই করো।'

সে সময়ে কা'বাঘরে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মক্কার একটি লোকও এই বিপদের সময় কোন মূর্তির কাছে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেনি। তারা সাহায্য চেয়েছিল একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে। মক্কার নেতৃবৃন্দসহ আব্দুল মুত্তালিব মহান আল্লাহর কাছে যে ভাষায় দোয়া করেছিলেন, তা ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে শব্দের পার্থক্যসহ বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে তারা আবেদন করে পাহাড়ের দিকে চলে গেল এবং কি ঘটে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। পরের দিন উষা লগ্নে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো কা'বাঘর ধ্বংস করার লক্ষ্যে। তার বাহিনীর সামনে হস্তী বাহিনী এবং পেছনে ছিল পদাতিক বাহিনী। বাহিনীর প্রথমেই আবরাহা তার হাতীর ওপরে উপবিষ্ট ছিল। আবরাহার হাতী যাত্রা শুরু করলেই তাকে সবাই অনুসরণ করবে। যাত্রা শুরু করে মক্কার কাছাকাছি এসে সে হাতী দাঁড়িয়ে পড়লো। হাতী মক্কার দিকে কোনক্রমেই অগ্রসর হলো না। চালক হাতীর মাথায় এবং শুড়ে আঘাতের পরে আঘাত করলো, কিন্তু হাতী কোনক্রমেই মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলো না। ইয়েমেনের দিকে যেতে ইশারা করলে হাতী দ্রুত বেগে অগ্রসর হয় কিন্তু মক্কার দিকে এক পা-ও অগ্রসর হয় না।

এটা ছিল আবরাহার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশেষ সতর্ক সংকেত। কিন্তু দাম্ভিক আবরাহা সে সংকেত অমান্য করলো। এই জঘন্য পাপ কাজ থেকে সে নিজেকে বিরত করলো না। এ সময় হঠাৎ প্রচন্ড বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে লাগলো। সেই সাথে কোন এক অদৃশ্য পরিমন্ডল থেকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁক উড়ে এলো। তাদের মুখে এবং পায়ে ছিল প্রস্তর খন্ড।

পাখির ঝাঁক প্রথমে ভয়ংকর শব্দ করলো, তারপর আবরাহার বাহিনীর ওপরে পাথর খন্ড বৃষ্টির আকারে বর্ষন করতে লাগলো। সে পাথর যার দেহের ওপরে পড়তো, দেহ ভেদ করে বের হয়ে যেত এবং সাথে সাথে গোটা দেহ পচে গলে নিঃশেষ হয়ে যেত। পবিত্র কোরআনের ভাষায়, 'সামান্য সময়ের ব্যবধানে আবরাহার বিশাল হস্তী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী চর্বিত তৃণ খন্ডের আকার ধারণ করেছিল।'

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনানুসারে, পাথর কুচির স্পর্শেই দেহে বসন্ত উদগত হতো এবং আরব দেশে সেবারই সর্বপ্রথম এই রোগ দেখা দিয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, পাথর কুচি যার ওপরেই পড়তো, তার দেহে

মারাত্মক চুলকানি শুরু হতো। চুলকানির কারণেই দেহ ফেটে গোস্ত খসে পড়ে হাড় বেরিয়ে যেতো। যারা কোনক্রমে গলিত দেহ নিয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের ভেতরে স্বয়ং আবরাহাও ছিল। তাঁর অবস্থা এমন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল যে, ক্ষত-বিক্ষত পচা গলা ঝলসানো দেহ দেখে ভয়ে মানুষ চমকে উঠতো। তাকে চেনার কোন উপায় ছিল না। মনে হত, সে যেন একটা গলিত মাংস পিন্ড। পালাতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে পড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছিল।

স্বয়ং আবরাহা খাশয়াম এলাকায় পৌঁছে মারা গিয়েছিল। মহান আল্লাহ হাবশীদের এই শাস্তি দিয়েই বিরত ছিলেন না। এই ঘটনার তিন চার বছরের মধ্যে ইয়েমেন থেকে হাবশীদের দোর্দন্ড শাসনের অবসান ঘটান। ইয়েমেনের বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সাইফ ইবনে যীইয়াজান নামক একজন প্রতাপশালী ইয়েমেনী নেতা পারস্য সম্রাটের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে। পারস্যের মাত্র একহাজার সৈন্যের আক্রমণে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেন থেকে হাবশীদের শাসনের অবসান ঘটে।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে মুহাস্সাব নামক উপত্যকার কাছে মুহাস্সির নামক স্থানে। মহান আল্লাহ এই ইতিহাস গোটা মানব জাতির শিক্ষার জন্য পবিত্র কোরআনে সূরা ফীল-এ বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেন, এই ঘটনা বিশ্বনবীর আগমনের পঞ্চাশ দিন পূর্বে ঘটেছিল এবং সেই বছরই আরবে মারাত্মক বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছিল। মহান আল্লাহ এভাবেই প্রতিটি যুগে ইসলামী আন্দোলন বিরোধী বাতিল শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতার ওপর যাদের বিশ্বাস নেই তারা তাদের লেখনীতে মহান আল্লাহ প্রেরিত পাথর কুচি বর্ষনের কথা এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র উল্লেখ করেছে, আবরাহার বাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে।

ইউরোপের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছে বসন্ত রোগের কথা। তাদের সমর্থক কিছু সংখ্যক মুসলমান ঐতিহাসিকও মুরব্বিদের সুরে সুর মিলিয়েছে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম সম্পর্কিত কোন অলৌকিক ঘটনা স্বীকৃতি দিতে এসব ঐতিহাসিকদের ভীষণ কার্পণ্যতা। কেননা, পবিত্র কোরআন ঘোষনা করেছে, মহান আল্লাহ পাখি প্রেরণ করে আবরাহাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর এ সমস্ত জড়বাদি ঐতিহাসিকগণ বলছেন, আবরাহার বাহিনীর এক অংশ ধ্বংস হয়েছিল সংক্রামক ব্যাধিতে আরেক অংশ ধ্বংস হয়েছিল ভয়ংকর ঝড়ের কবলে নিপতিত হয়ে। পবিত্র কোরআনের বর্ণনাকে তারা মিথ্যা ও গুরুত্বহীন প্রমাণ করার লক্ষ্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।

ঐতিহাসিক Philip K. Hitti আবরাহাকে এবং তাঁর বাহিনীকে ধ্বংস করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ যে পাখির ঝাঁক প্রেরণ করে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সে ঘটনাকে শুধুমাত্র বসন্ত রোগের ঘটনা বলে উল্লেখ করে কোরআন বর্ণিত ইতিহাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এই লোকটি বলতে চেয়েছে কোরআন যাকে 'সিজ্জিল' হিসাবে উল্লেখ করেছে, সেটা আসলে বসন্ত রোগ ছিল।

কেন এবং কি উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ইসলাম সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনাগুলোর ওপরে অবিশ্বাসের ছায়াদান করা হয় তা আমাদের কাছে বোধগম্য। কা'বা ধ্বংস করার দুঃসাহস যারা করেছিল, তাঁরা সবাই ছিল খৃষ্টান। এই খৃষ্টানরাই সেদিন মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সামান্য ক্ষুদ্র পাখির কাছে চরমভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়েছিল। এই ইতিহাস খোদ খৃষ্টান এবং তাদের তল্পীবাহকরা বিকৃত করে পরিবেশন করে

মানসিক তৃপ্তি লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। নিজেদের ব্যর্থতা আর কলঙ্ক ঢাকতে এ ধরণের অসংখ্য কল্পিত ঘটনার জন্ম তাঁরা দিয়েছে এবং আগামীতেও দেবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। আর আমুল ফীল বা হস্তী বছরের সূচনা সেখান থেকেই হয়েছিল। আমুল ফীল শব্দটা হলো আরবী, বাংলায় হস্তী বছর বলা হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্ম সনকে আমুল ফীল বা হস্তী বছর বলা হয়।

এই ঘটনাটি ছিল একটা অলৌকিক অসধারণ বিস্ময়কর ঘটনা। গোটা আরব জগতে মুহূর্তের মধ্যে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। সে যুগের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণ এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছিল এবং সেসব কবিতা বর্তমান সময় পর্যন্তও মওজুদ রয়েছে। সেই সাথে মওজুদ রয়েছে আরব নেতৃবৃন্দসহ আব্দুল মুত্তালিবের প্রার্থনা–যা তারা কা'বাঘর রক্ষার জন্য মহান আল্লাহর কাছে করেছিল। আবরাহার ধ্বংসের ব্যাপারে ও কা'বাঘর রক্ষার ব্যাপারে তাদের প্রার্থনা ও কবিতার মধ্যে এমন একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে শব্দের মাধ্যমে তারা দেব-দেবীর প্রশংসা করে বলেছে যে, তোমরাই কা'বা রক্ষা করেছো, তোমরাই কা'বার রক্ষক এবং তোমরাই আবরাহাকে ধ্বংস করেছো। বরং তাদের প্রার্থনা ও কবিতার প্রতিটি ছত্রে একমাত্র আল্লাহর কথাই উল্লেখ করেছে এবং আল্লাহরই প্রশংসা করে বলেছে, একমাত্র তুমিই কা'বাকে রক্ষা করতে সক্ষম এবং তুমিই আবরাহাকে ধ্বংস করেছো। বিষয়টি এখানেই শেষ নয়, এই ঘটনার পর থেকে কুরাইশরা ১০ বছর কোন বর্ণনায় ৭ বছর পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করেনি।

ওপরে উল্লেখিত ইতিহাসের আলোকে আলোচ্য সূরাটির বক্তব্য বুঝতে হবে। যে সময় এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল, সে সময় পর্যন্ত আরবের একজন লোকও এমন ছিল না যে, সে উল্লেখিত ইতিহাস জানতো না। বালক কিশোর যুবক তরুণ বৃদ্ধ সবাই এই ইতিহাস অবগত ছিল। কারণ সেটা ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। গোটা আরববাসীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আবরাহার কবল থেকে কা'বাঘর সেই সব দেব-দেবী রক্ষা করেনি, যুগ যুগ ধরে তারা যাদের পূজা আরধনা করে আসছে–বরং কা'বাঘর রক্ষা করেছেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁরই অসীম ক্ষমতাবলে আবরাহা ধ্বংস হয়েছে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দও কা'বা রক্ষার জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিল।

এ জন্য এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই সূরায় দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র ঘটনাটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন কোন আল্লাহর গোলামীর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন না। তিনি সেই আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার জন্যই আহ্বান জানাচ্ছেন, যে আল্লাহর কাছে তোমরা আবরাহার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাতর স্বরে প্রার্থনা করেছিলে, যে আল্লাহর প্রশংসা করে তোমরা কবিতা রচনা করেছিলে এবং তোমরা এ কথাও বিশ্বাস করেছিলে যে, ঐ আল্লাহই আবরাহাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আল্লাহর দিকেই তোমাদেরকে ডাকছেন। এখন যদি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূলকে তোমরা অস্বীকার করো, তাহলে সেই আল্লাহ পূর্বে যেমন ছিলেন, বর্তমানেও তেমনি আছেন এবং ভবিষ্যতে তেমনি থাকবেন। আবরাহাকে তিনি যেভাবে পর্যদুস্ত করেছেন, তোমাদেরকেও তিনি একই ভাবে পর্যদুস্ত করতে সক্ষম। সুতরাং কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা পরিহার করে ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করো। ❑

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) তুমি কি দেখোনি তোমার মালিক (কা'বা ধ্বংসের জন্যে আগত) সেই হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি (সে সময় যালেম)-দের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন নি? (৩) তিনি তাদের ওপর (ঝাঁকে ঝাঁকে) আবাবীল পাখী পাঠিয়েছেন? (৪) এ পাখীগুলো (বাহিনীর) ওপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করেছে? (৫) (অতপর) তিনি তাদের জন্তু জানোয়ারের চর্বিত (ঘাষ পাতার)-এর মতো করে দিলেন।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি কি দেখোনি তোমার মালিক কা'বা ধ্বংসের জন্যে আগত সেই হাতিওয়ালাদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল?' এই আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি দেখে সাধারণভাবে মনে হবে যেন, আল্লাহর রাসূলকে কথাটি বলা হচ্ছে। আসলে বিষয়টি এমন নয়। কথাগুলো বলা হচ্ছে সেই সবলোকদের উদ্দেশ্যে যারা দ্বীনি আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করছিল। কারণ সে সময়ে যারা ইসলামের সাথে বিরোধিতা করছিল, তারা সবাই কা'বা ধ্বংস করতে যারা এসেছিল, তাদের মর্মান্তিক ইতিহাস অবগত ছিল। এদের মধ্যে এমন ব্যক্তি অনেকেই ছিল, যারা সেই বিস্ময় উদ্রেককারী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। এই জন্যই তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তোমরা তো সেই ঘটনার সাক্ষী-যারা হস্তী বাহিনী নিয়ে কা'বা ধ্বংস করতে এসে আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়ে স্বয়ং নিজেরাই নির্মূল হয়ে গিয়েছিল।

হস্তী বাহিনী নিয়ে কোন শক্তি কা'বা ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তাদের কথা আয়াতে এ জন্য বলা হয়নি, কারণ যাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা সবাই অবগত ছিল যে, কারা কোন উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর কা'বা ধ্বংস করতে এসেছিল। সেই ইতিহাস গোটা আরবের লোকদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। ছোট্ট একটি বালক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত সেই ঘটনা জানতো। অধিকাংশ প্রত্যক্ষদর্শী সে সময় পর্যন্ত বর্তমান ছিল এবং তাদের মুখ থেকে পরবর্তীতে জন্মগ্রহণকারী লোকেরা শুনতো। এ জন্য সবার কাছে নিজ চোখে দেখা ঘটনার অনুরূপ ঘটনার মতোই সেই ইতিহাস তারা বিশ্বাস করতো। এ কারণে সেই ইতিহাসের বিস্তারিত বর্ণনা এই সূরায় দেয়া হয়নি।

এরপর ২ থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত ধ্বংসের বিবরণ এভাবে শোনানো হয়েছে যে, যেসব জালেমের দল কা'বাঘর ধ্বংস করতে এসেছিল, তারা যে নীল নক্সা প্রণয়ন করেছিলো-যে ষড়যন্ত্রে তারা মেতে উঠেছিল, তাদের সেই ষড়যন্ত্র কিভাবে সেই আল্লাহ নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, তা তোমরা স্বয়ং নিজের চোখে দেখেছিলে। তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, কা'বা ধ্বংস করে নিজেদের নির্মিত ঘরের দিকে লোকদেরকে নিয়ে যাবার জন্য এবং কুরাইশদের ও গোটা আরববাসীদেরকে আতঙ্কিত করে আরব থেকে বাণিজ্যের যে পথটি সিরিয়া ও মিসরের দিকে গিয়েছে, সেই পথের ওপরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এভাবে হাবশীরা আরবদেরকে শোষণ করে নিজেদের মুখাপেক্ষী বানানোর এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। তাদের ষড়যন্ত্রের সেই জাল তিনি কিভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন, তা কি তোমরা দেখোনি? তিনি তাঁর দুশমন সেই জালিমদের ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করেছিলেন, সে ব্যাপারেও তোমরা স্বয়ং সাক্ষী।

আলোচ্য সূরায় আবাবীল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এ কারণে অনেকেই ধারণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আবাবীল পাখী প্রেরণ করেছিলেন। প্রকৃত বিষয় হলো, আরবী আবাবীল শব্দের অর্থ হলো, অধিক সংখ্যক-যা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছুটে আসে। কারণ সেই পাখীগুলো লোহিত সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসেছিল এবং প্রত্যেক পাখীর ঠোঁটে ও দু'পায়ে পাথর কুচি ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, সেই পাখীর ঠোঁট ছিল পাখীর ঠোঁটের মতোই কিন্তু তাদের পায়ের থাবা ছিল কুকুরের মতো। ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবের লোকজন এই পাখী ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি এবং ঘটনার পরেও সেই পাখীগুলোকে আর দেখা যায়নি। কেউ বলেছেন, সেই পাথর কুচি ছিল ছাগলের বিষ্ঠার আকারের, কেউ বলেছেন, তা ছিল মটর দানার অনুরূপ। আবার কেউ বলেছেন, তা ছিল ছোট্ট এক ধরনের ফলের অনুরূপ। এই ঘটনার পরে মক্কার বহু লোকদের কাছে সেই পাথর কুচির নমুনা রক্ষিত ছিল।

ইতিপূর্বে কখনো না দেখা এবং পরবর্তীতেও যার দেখা মেলেনি, সেইসব ক্ষুদ্র পাখীর ঝাঁক হঠাৎ ধুমকেতুর মতোই উদিত হয়ে এমন একটি বিশাল বাহিনীর ওপরে পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করেছিল, যে বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার এবং সে বাহিনী তৎকালের শ্রেষ্ঠ সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। শুধু তাই নয়, মক্কার লোকগুলো ইতিপূর্বে কোনদিন হাতী দেখেনি। অথচ সেই বাহিনীতে বহু সংখ্যক হাতীও ছিল। এ ধরনের একটি অত্যাধুনিক বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করেছিল ছোট্ট পাখীর ঝাঁক শুধুমাত্র ক্ষুদ্র পাথর কণা দিয়ে। এ কথাগুলোই এই সূরায় এভাবে বলা হয়েছে যে, 'এ পাখীগুলো কি এই সুসজ্জিত বাহিনীর ওপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করেছে?'

সেই পাথর কণা নিক্ষেপের ফলে সমরাস্ত্রে সজ্জিত সেই বিশাল বাহিনীর অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, জন্তু-জানোয়ার ঘাস-পাতা চিবানোর পরে যে অবস্থা হয়, তাদের অবস্থাও তেমনি হয়েছিল। ধান থেকে চাল বের করে নেয়ার পরে যে খোসা পড়ে থাকে বা খোসাযুক্ত শস্য থেকে দানা বের করে নেয়ার পরে যে আবরণটি পড়ে থাকে, সেই নিষ্পেষিত খোসার অনুরূপ হয়েছিল সেই বিশাল বাহিনীর অবস্থা। এসব ঘটনা তাদের দৃষ্টির সামনেই ঘটেছিল, যারা বিশ্বনবীর আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করছিল।

নিকট অতীতের সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাস শুনিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষনকারী লোকগুলোকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে, তোমরা যারা আমার প্রেরিত রাসূলের ও বিধানের সাথে বিদ্রোহ করছো, তাঁর সাথে বিরোধিতা করছো, তোমরা নিজেদের চোখে দেখেছো যে, আল্লাহর সাথে বিদ্রোহের মস্তক উত্তোলন করলে পরিণতি কতটা ভয়াবহ হয়। নিজের চোখে সেই ঘটনা দেখেও তোমরা কিভাবে আমার প্রেরিত রাসূল ও বিধানের সাথে বিরোধিতা করছো? তোমরা আমার রাসূল ও কোরআনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছো, আবরাহার বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের জাল আমি আল্লাহ কিভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে থাকি, তা কি তোমরা দেখোনি? আমার সাথে শত্রুতার পরিণতি কতটা মর্মান্তিক হতে পারে, তা কি তোমরা নিজের চোখে অবলোকন করোনি?

এই সূরায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঐ লোকগুলোকে সাবধান করে দিয়েছেন, যারা তাঁর দ্বীনের সাথে শত্রুতা করে। দ্বীনি আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সেই আল্লাহ অমর অক্ষয়-তিনি চিরঞ্জীব এবং কালের প্রবাহে তাঁর ক্ষমতার কোনহ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। তিনি পূর্বেও যেমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, বর্তমানেও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। যারা তাঁর দেয়া বিধানের সাথে বিরোধিতা করবে, তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠাকামীদের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করবে, তাদের ষড়যন্ত্র তিনি ঐভাবেই ব্যর্থ করে দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, যেভাবে তিনি হস্তীওয়ালাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছিলেন।

সেই সাথে এই সূরা অবতীর্ণ করে মুসলমানদের হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করেছেন এভাবে যে, তোমরা যাঁর বিধান অনুসরণ করছো এবং সেই বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান-মাল কোরবানী করে আন্দোলন করছো, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। কারণ যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছো, সেই আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন, তিনি তোমাদের অবস্থাও দেখছেন এবং তোমাদের সাথে যারা বিরোধিতা করছে, তাদের অবস্থাও দেখছেন। আমার বিধানের বিরোধিরা যখন সীমালংঘন করবে, তখনই আবরাহার সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল, তাদের সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হবে। সুতরাং নির্ভীক চিত্তে অসীম সাহসের সাথে একমাত্র আমার ওপরে নির্ভর করে সাহসী পদক্ষেপে আন্দোলনের ময়দানে এগিয়ে যাও।

সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–১০৬

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরায় কুরাইশদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সূরাটির প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটি 'কুরাইশ' এ জন্য এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোরআনের অধিকাংশ গবেষক বলেছেন, এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সবাই একমত। এই সূরার মূল বক্তব্যের সাথে সূরা ফীলের মূল বিষয়বস্তুর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই দুটো সূরার মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে বলে অনেকে মন্তব্যের দিক থেকে এতটা অগ্রসর হয়েছেন যে, এই দুটো সূরা আসলে একটি সূরা। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছে লিখিত যে মুসাহফ ছিল, তার ভেতরেও এই সূরা দুটো এমনভাবে লিখিত হয়েছে যে, দুটো সূরার মধ্যে বিস্‌মিল্লাহ পর্যন্ত লেখা হয়নি। পরবর্তীতে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিপুল সংখ্যক সাহাবীদের সহযোগিতায় সরকারীভাবে আল্লাহর কোরআনের যে অনুলিপি তৈরী করিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করেছিলেন, তার ভেতরে সূরা ফীল ও সূরা কুরাইশকে দুটো সূরা হিসাবে পৃথক করা হয়েছে। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সেভাবেই চলে আসছে। প্রকৃত অর্থেও এ সূরা দুটো পৃথক সূরা এবং পৃথকভাবেই তা অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সূরা দুটোর বিষয়বস্তুতে সামঞ্জস্য থাকলেও এর বক্তব্য ও আলোচিত বিষয় ভিন্ন।

এই সূরাটির সাথে সূরা ফীল-এর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এ এই সূরার মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে এই ঐতিহাসিক পটভূমি জানা একান্ত আবশ্যক। বহু পূর্ব থেকেই আল্লাহর রাসূলের উর্ধ্বতন বংশ ছিল সে সময়ের সবচেয়ে সম্মানও মর্যাদার অধিকারী। তারপর তিনি যে কুরাইশ গোত্রে আগমন করেছিলেন সে কুরাইশ গোত্রও ছিল সে সময়ে সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী। যিনি এই গোষ্ঠীকে কুরাইশ নামে অভিহিত করেছিলেন তিনি হলেন আন্ নজর ইবনে কেনানা। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, আন্ নজরের নাতি এবং মালিক ইবনে নজরের সন্তান ফিহিরের উপাধি ছিল কুরাইশ। সুতরাং ফিহিরের পরবর্তী বংশধরগণই কুরাইশ নামে অভিহিত হয়েছে। আল্লামা হফেজ ইরাকীও এই বর্ণনা সমর্থন করেছেন।

তবে 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ নিয়ে অভিধানকারকদের মধ্যে মতানৈক্য বিরাজমান। কেউ এই শব্দের অর্থ করেছেন, সমস্ত কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরে পুনরায় একত্র হওয়া। এই অর্থ প্রযোজ্য হয় কুছাই ইবনে কিলাবের প্রতি। কেননা, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাঁর সময়েই তাদের শতধা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী মক্কায় একত্রিত হয়েছিল।

আবার কেউ বলেছেন, 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ হলো ব্যবসা বাণিজ্য ও উপার্জন। কেননা তাদের উপার্জনের মাধ্যম ছিল ব্যবসা। কেউ বলেছেন ,'কুরাইশ' শব্দের অর্থ হলো, খোঁজ করা। এই অর্থ প্রযোজ্য হয় নজর ইবনে কিনানার প্রতি। কেননা, তাঁর সম্পর্কে আরব ইতিহাস বলে, সে অভাবী মানুষ খোঁজ করে করে তাদেরকে সাহায্য করতো।

কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো বিশাল জলধীর মত। যা সমস্ত কিছুই ধ্বংস করে ফেলে। কেউ বলেছেন, কুরাইশ ইবনে বদর ইবনে নজর ইবনে কিনানা বংশের একজন লোক ছিল। সে দ্রব্যাদি সরবরাহ করতো এবং সরবরাহের পথে প্রহরার ব্যবস্থা করতো। এ কারণে আরববাসী ঐ কাফেলা দেখলেই বলতো, কুরাইশদের কাফেলা।

'দারুণ নদওয়া' নামে একটা পরামর্শ পরিষদ গঠন করেছিল কুছাঈ। কুরাইশদের সমস্ত সমস্যা নিয়ে সেখানে আলোচনা করে সমাধান করা হত। ইতিহাসে দেখা যায়, এই ব্যক্তি ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক। সমাজের কল্যাণে সে বহু কিছু করেছিল। কা'বা শরীফের খেদমত করার লক্ষ্যে সে একটা সমিতি গঠন করেছিল। মক্কায় আগত অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা সে করেছিল। হাজীদের তত্ত্বাবধান, তাদের পানি পান করানো এবং আহারাদীর ব্যবস্থা সে করেছিল। এ উপলক্ষ্যে সে গোত্রের সবার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে মিনায় হাজীদেরকে আহার করাতো। চামড়ার মশক নির্মাণ করে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতো। হজ্জের সময় আলোর ব্যবস্থা সে করেছিল। তাঁর প্রচেষ্টাতেই তাদের গোত্র বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে মক্কার আশে পাশে বসবাস শুরু করেছিল।

আল্লামা ইবনে আব্দে রাব্বিহি তাঁর গ্রন্থ 'ইকদুল ফরিদ'-এ উল্লেখ করেছেন, কুছাই ইবনে কিলাবের জনপ্রিয়তার কারণেই তাকে কুরাইশ উপাধিদান করা হয়েছিল। কেউ বলেছেন, কুরাইশ ছিল একটা বিশাল মাছের নাম। সে সময়ে কুছাঈকে লোকজন ঐ বিশাল মাছের সাথে তুলনা করতো।

আল্লামা সুহাইলী (রাহ) বলেন, একটা কবিলার নাম ছিল কুরাইশ। ইসলাম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, আরবের লোকেরা নানা ধরনের জানোয়ারের পূজা করতো এবং যে গোত্র যে জানোয়ারের ভক্ত ছিল, তারা সেই জানোয়ারের নামেই গোত্রের নামকরণ করতো। তাদের এই অভিমত যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার হীন চক্রান্তের ফসল হলো তাদের ঐ কষ্ট কল্পনা। কেননা, আরব ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত গবেষণালব্ধ অভিমত হলো বনী ফিহিরের উপাধি ছিল কুরাইশ।

কুছাঈয়ের পুত্র সন্তান ছিল ছয়জন। আব্দুদ্দার, আব্দে মানাফ, আব্দুল উজ্জা, আব্দ ইবনে কুছাঈ, তাখাম্মুর ও বাররাহ। কুছাঈয়ের ইন্তেকালের পরে তাঁর বড় সন্তান আব্দুদ্দার কা'বার মুতাওয়াল্লীর পদে আসীন হয়। তাঁর অযোগ্যতার কারণে পরবর্তীতে এই পদে আসীন হয়েছিলেন আব্দে মানাফ। এই আব্দে মানাফের খান্দানেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের গর্ভধারিণী হযরত হাজেরা অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি যেমন মনে মনে আশা করছিলেন তাঁর বসবাসের এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠুক এবং তাঁর আকাংখা অনুযায়ীই তিনি জোরহামীদের কা'বা এলাকায় বসবাস করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। ক্রমশঃ জোরহামীদের প্রভাব প্রতিপত্তি সেখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অপরদিকে হযরত ইসমাঈলের বংশধরগণ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করার লক্ষ্যেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কা'বার ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল শুবশান্ গোত্র। ক্রমশঃ তাদের অনাচার বৃদ্ধি পেলে তারা যুদ্ধ করে জোরহামীদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করে এবং জোরহামীগণ চলে যাবার সময় কা'বার সমস্ত সম্পদ যমযম কূপের ভেতরে নিক্ষেপ করে যমযম কূপের চিহ্ন মুছে দিয়ে যায়।

নানা ঘটনাবলীর পরে কুছাঈ ইবনে কিলাবের হাতে পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন অনিয়মের অবসান ঘটে এবং কা'বা কুরাইশদের নিয়ন্ত্রণে আসে। কুছাঈয়ের মা ফাতেমা বিনতে সায়াদ স্বামীর ইন্তেকালের কারণে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল।

সে ব্যক্তির নাম ছিল রাবিয়া ইবনে হারাম। কুছাঈও শিশু বয়সে পিতৃহারা হয়ে সে মায়ের সাথেই সৎ পিতার কাছে শামে বসবাস করতো। কুছাঈ যখন উপযুক্ত বয়েসে পদার্পণ করে জানতে পেরেছিল তার গোত্রের সমস্ত লোকজন বাস করে মক্কায়। তারপরই সে বনী খুযায়ার হজ্ব যাত্রীদের সাথে মক্কায় চলে এসেছিল।

মক্কায় পূর্ব হতেই কুছাঈয়ের ভাই যুহরা বাস করতো। তার প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল। কুছাঈ তাঁর এই ভাইয়ের কাছেই রয়ে গেল। এই সময়ে কা'বার মুতাওয়াল্লী ছিল হোলাইল ইবনে হোবশিয়া খোযায়ী। এই ব্যক্তির মেয়েকে কুছাঈ বিয়ে করেছিল। এরপর কুছাঈ কিভাবে কা'বার মুতাওয়াল্লী পদে আসীন হয়েছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, স্বয়ং হোলাইল ইন্তেকালের সময় নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল কুছাঈকে ঐ পদে আসীন করার জন্য, আবার কেউ বলেছেন, শ্বশুরের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কুছাঈ দাবী করেছিল ঐ পদের সে অধিক যোগ্য-অতএব তাকেই ঐ পদ দান করতে হবে।

এই অবস্থায় দুটো দলের সৃষ্টি হলো এবং শক্তিশালী দল দুর্বল দলকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দিল। পরবর্তীতে ইয়ামুর ইবনে আওফকে বিচারক মেনে নিয়ে তারা এক সালিস করলো। সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হলো যে, যেহেতু কুছাঈ নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং সে বনী ইসমাঈলীদের বংশধর। অতএব কা'বার মুতাওয়াল্লী কুছাঈ-ই হবে।

ক্রমশঃ সে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিদ্বারা গোটা মক্কার নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর প্রভাব এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, সে সময়ে কোন মেয়ের বিয়ে হলে তাঁর বাড়িতে এনে বিয়ে দিতে হতো। যে কোন সমস্যা দেখা দিলেই গোত্রের অন্যান্য নেতারা তার কাছেই সমাধানের জন্য ছুটে আসতো। গোটা মক্কার যখন সে অবিসংবাদিত নেতা, তখন সে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে থাকা কুরাইশদের একত্রিত করে তাদের মধ্যে গোটা মক্কা ভাগ করে দিয়েছিল। মক্কার আশে-পাশের এলাকা সে ভাগ করে দিয়েছিল কা'ব ইবনে লুয়াই-এর বিভিন্ন শাখার মধ্যে।

মক্কার আশে পাশে যারা বাস করতো তাদেরকে বলা হত হারামবাসী। এদের ভেতরে ছিল বনী নওফেল, বনী আল মুত্তালিব, বনী আবদে শামস, বনী আদী, বনী হাশিম, বনী আব্দুদ্দার, বনী জুমাহ্, বনী আব্দুল উজ্জা, বনী সাহম, বনী যুহরা, বনী তাইম ও বনী মাখযুম। এদেরকে কুরাইশ আল্‌বিতাহ্ বলা হতো। এ ছাড়া অন্যদেরকে মক্কার বাইরের এলাকা ভাগ করে দিয়েছিল। এভাবে শহরের বিভিন্ন অংশে এক একটি পরিবারকে সে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কুছাঈয়ের ইন্তেকালের পরে তাঁর পুত্র আবদে মানাফের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছিল। আব্‌দে মানাফেরও পুত্র সন্তান ছিল ছয়জন। তার মধ্যে আমর ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং নানা গুনাবলী সম্পন্ন। এই আমরেরই উপাধী ছিল হাশিম। আমর পরবর্তীতে মক্কার মুতাওয়াল্লীর পদে আসীন হয়েছিল। ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে পূর্ব থেকেই কিছু পদ্ধতি মক্কায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এককভাবে কারো কোন দায়িত্ব পালনের কোন সুযোগ ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন নেতা এক একটি দায়িত্ব পালন করতো। হাজীদের পানি পান করানো এবং খাদ্যের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হাশিম পালন করতো। কেননা, যমযম কূপের কোন চিহ্ন ছিলনা। বিধায় চামড়ার মশকে পানি সংরক্ষণ করা হত। হাজীদের আহারের জন্য কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের কাছ থেকে চাঁদা এসে হাশিমের কাছে জমা হতো।

মক্কায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আমর বহু উট জবাই করে রুটি বানিয়ে মানুষকে খেতে দিয়েছিল। তারপর রুটি টুকরা টুকরা করে ছিড়ে এক ধরনের খাবার বানিয়ে তা মানুষকে খেতে দেয়া হয়েছিল। আরবী 'হাশিম' শব্দের অর্থ হলো কোন কিছু ভেঙ্গে গুড়ো করা। তিনি রুটি টুকরো করে মানুষকে খেতে দিয়েছিলেন বলে তাকে হাশিম উপাধি দান করা হয়েছিল। হাশিম ছিল একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। সে তাঁর ভাই নওফেল, আবদে শামস এবং মুত্তালিবের সাথে পরিকল্পনা করেছিল, কিভাবে ব্যবসার ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নত করা যায়। পরিকল্পনা মাফিক তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিল।

তাদের পরিকল্পনা ছিল, আরবদের পথে প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে মিশর এবং শামে যে ব্যবসা চলছিল সে ধরনের ব্যবসা করা। বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করতে হবে এবং তা বাজারজাত করতে হবে। এমন এক সময়ে তারা একাজে হাত দিয়ে সাফল্য লাভ করেছিল, যখন আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করতো পারস্যের সাসানী সরকার। রোম সরকার কুরাইশ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে শুল্ক আদায় করতো, হাশিম তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দিয়ে সে শুল্ক মওকুফ করিয়েছিল। একইভাবে তিনি এবং তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরা বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছ থেকে ব্যবসায়ীক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে আরব জগতে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটান। বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে তাদের একটা ভিন্ন সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্যবসার পণ্য সামগ্রী যে পথে সরবরাহ হতো, তা যেন লুণ্ঠিত না হয় এবং পূর্বের ন্যায় কেউ যেন অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করতে না পারে-এ ব্যাপারে তারা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গোটা আরবে লুঠতরাজ এবং ছিনতাই চলতে থাকলেও কুরাইশদের ব্যবসার কাফেলা বা বাণিজ্য বহরের গায়ে কেউ হাত দিত না। এর আরেকটি কারণ হলো, তারা ছিল আল্লাহর ঘরের খাদেম-এ কারণেও সর্বত্র তারা ছিল মর্যাদার পাত্র। ব্যবসার ক্ষেত্রে হাশিমরা চার ভাই এতটা উন্নতি করেছিল যে, তাদেরকে উপাধি দান করা হয়েছিল 'মুত্তাজিরীন' অর্থাৎ পেশাগত ব্যবসায়ী। আরবের চারদিকের রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন গোত্রের সাথে তারা যে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এ কারণে তাদেরকে উপাধিদান করা হয়েছিল 'আস্হাবু ইলাফ'। যার অর্থ হলো বন্ধুত্ব সৃষ্টিকারী।

এভাবে তারা চারদিকে তাদের বহু রাজনৈতিক মিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের চার ভাইয়ের এই শুভ উদ্যোগের কারণে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে কুরাইশদের ব্যবসা বাণিজ্যই শুধু নয়-সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসারও সুযোগ হয়েছিল। ফলে কুরাইশদের দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তার পরিধি এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, গোটা আরবে তাদের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। অর্থ-সম্পদের দিক থেকে, জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির দিক থেকে তথা সমস্ত দিকেই তারা আরবের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। কুরাইশদের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই মক্কা আরব উপদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

এভাবে তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ইরাক থেকে লেখন পদ্ধতির বর্ণমালা সংগ্রহ করে এনেছিল। সে লেখন পদ্ধতি পরবর্তীতে আল্লাহর কোরআন লেখার কাজে এসেছিল। সে সময়ে কুরাইশদের মধ্যে যতো জ্ঞানী এবং শিক্ষিত লোক ছিল তা অন্য কোন গোত্রে ছিল না। মুসানাদে আহমাদে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি হাদীসে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'কুরাইশ

বংশের লোক অন্য সব লোকদের নেতা।' কুরাইশদের অসংখ্য গুণাবলীর কারণেই আল্লাহর রাসূল উক্ত মন্তব্য করেছিলেন। এভাবে কুরাইশরা যখন ক্রমশঃ উন্নতিদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, ঠিক তখনই মক্কাকে গুরত্বহীন করে ব্যবসা-বাণিজ্যের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিজেরা গ্রহণ করার লক্ষ্যে আবরাহা মক্কায় আক্রমণ করতে এসেছিল।

সে যদি বিজয়ী হতে পারতো, তাহলে কুরাইশদের সম্মান ও মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে পড়তো এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরে হাবশী ও রোমানরা একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতো। কুরাইশরা কুছাঈ ইবনে কিলাবের পূর্বে যে বিক্ষিপ্ত ও দূরাবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল, তার থেকেও ভয়ঙ্কর পরিণতি তাদেরকে বরণ করে নিতে হতো। কা'বা ধ্বংস করে এসে আবরাহার বিশাল বাহিনীর করুণ পরিণতি দেখে গোটা আরববাসীর মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, কা'বা সত্যকার অর্থেই আল্লাহর ঘর এবং তারা পূর্বের তুলনায় কা'বার প্রতি অধিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতো। সেই সাথে কা'বার সেবক কুরাইশদের সম্মান ও মর্যাদা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি লাভ করলো এবং তাদের কর্তৃত্ব সর্বত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চারদিকে বিস্তার লাভ করলো।

সাধারণ আবরবাসীদের মনে কুরাইশদের সম্পর্কে ধারণা জন্ম নিলো যে, কুরাইশদের প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। এ জন্য কুরাইশরা আরবের সর্বত্র নির্ভীকভাবে যাতায়াত করতো পারতো এবং তারা যেখানেই যেতো, সেখানেই সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করতো। এমন কোন শক্তি তখন ছিল না যে, তারা কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা দেয় বা তাদের বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করে। তাদের জন্য সর্বত্রই ছিল সম্মান-মর্যাদা আর নিরাপত্তা। এসবই সম্ভব হয়েছিল একমাত্র কা'বা ঘরের কারণে। কা'বা ঘরের সম্মান-মর্যাদার কারণেই কুরাইশরা সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, প্রাচুর্যতা, বিত্ত-বৈভব, ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। আরবের লোকগুলোও এ কথা অকপটে স্বীকৃতি দিতো যে, আল্লাহর ঘর এই কা'বাই তাদেরকে অভাব থেকে মুক্তি দিয়েছে, নিরাপত্তা ও সম্মান-মর্যাদা দিয়েছে, সর্বত্র দিয়েছে উচ্চ আসন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করলেন এবং এই সূরা অবতীর্ণ হলো, তখন আরবের লোকগুলো উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবগত ছিল বলেই আলোচ্য সূরায় উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র ছোট্ট কথায় তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমরা স্বয়ং নিজেরাই সাক্ষ্য দাও যে, এই ঘর আল্লাহর-কোন দেব-দেবীর নয়। এই ঘরের কারণেই তোমরা অভাব মুক্ত হয়ে বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছো এবং সম্মান-মর্যাদা লাভা করেছো। নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছো। ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে নিজেদেরকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছো। সুতরাং তোমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো, যে আল্লাহর ঘরের কারণে তোমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে, এখন সেই আল্লাহর দাসত্ব করা। তিনি যাকে নবী-রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন, তাঁর প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর ওপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করা।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকূ ১

(১) কুরাইশ বংশের নিরাত্তার জন্যে, (২) তাদের শীত ও গরম কালের সফরের নিরাত্তার জন্যে-(৩) তাদের এই ঘরের মালিকেরই ইবাদাত করা উচিত। (৪) যিনি দুর্দিনে তাদের খাবার সরবরাহ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি থেকেও নিরাপদ করেছেন।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে এই সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরাইশদেরকে নানা ধরনের নে'মাত দান করে কিভাবে ধন্য করেছেন, তা আমরা আলোচ্য সূরার পটভূমিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। একমাত্র কা'বা ঘরের উপলক্ষ্যেই তাদেরকে এসব নে'মাত দানে ধন্য করা হয়েছিল, এ কথা স্বয়ং কুরাইশরা যেমন অবতগত ছিল, তেমনি অবগত ছিল গোটা আরববাসী। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত দান করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা পূর্বের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি করেছেন, এই কথাটি তখন পর্যন্তও তারা অনুভব করতে সক্ষম হয়নি। আর সেই নে'মাতটি ছিল, স্বয়ং কুরাইশদের মধ্যে থেকেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আখেরী জামানার পয়গম্বর বিশ্বনেতা, শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানবতার মহান মুক্তির দুত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্বাচিত করেছেন। সেই অভ্রান্ত জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কোরআনও সেই কুরাইশদের মধ্য থেকে নির্বাচিত নবী-রাসূলের ওপরেই অবতীর্ণ করেছেন।

সমস্ত নে'মাতের তুলনায় এই নে'মাতটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত, এ কথা তারা তখন পর্যন্তও অনুধাবন করতে পারেনি। এ কারণেই তারাই সর্বপ্রথম কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতকে তারা অস্বীকার করে আসছিল। এ জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরায় তাদেরকে সেই নে'মাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, তোমাদের আচরণ তো বড়ই বিস্ময়কর! শুধু তোমরাই নও, গোটা আরববাসী এ কথা জানে যে, এই ঘরটি স্বয়ং আল্লাহর। আর এই ঘরের সম্মান ও মর্যাদার কারণেই তোমরা সর্বত্র সম্মান-মর্যাদা, উচ্চ আসন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, অভাবমুক্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ জীবনযাত্রা, নিরাপত্তা, নেতৃত্ব ও শাসকের পদ লাভ করেছো। এ কথা তোমরা জানো এবং জানো বলেই আবরাহা যখন আক্রমণ করতে এসেছিল, তখন তোমরা তোমাদের

পূজিত দেব-দেবীর কাছে আশ্রয় বা সাহায্য কামনা না করে একমাত্র আমারই কাছেই আশ্রয় এবং কাতর কণ্ঠে সাহায্য কামনা করেছিলে। তাহলে জেনে শুনে সেই আল্লাহর দাসত্ব না করে, তাঁর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত না করে কিভাবে তোমরা কল্পিত দেব-দেবীর পূজা আরধনা করছো? এটা তো বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার!

একটির পর আরেকটি নে'মাত আমি তোমাদেরকে দান করলাম। পৃথিবী ও আখিরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল ও কোরআন তোমাদের ভেতরে দিলাম সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মাতের সাথে তোমরা কি বিস্ময়কর আচরণ করছো? তোমাদের আপনজন, তোমাদেরই কল্যাণকামী আমার রাসূল তো তোমাদেরকে নতুন কোন আদর্শের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে না। তিনি তোমাদেরকে সেই পুরনো পাঠ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন মাত্র। যে আল্লাহ তোমাদেরকে অসংখ্য নে'মাত দানে ধন্য করেছেন, সেই আল্লাহর দাসত্ব করা তোমাদের কর্তব্য, সেই কর্তব্য পালনের দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

গ্রীষ্মকালে মক্কায় প্রচন্ড গরম অনুভূত হতো কিন্তু সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে সে সময় গরমের অতটা তীব্রতা অনুভূত হতো না। এ জন্য মক্কার কুরাইশরা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য যাত্রা করতো। আর ঠান্ডার মৌসুমে মক্কা এলাকায় তীব্র শীত নেমে আসতো। কিন্তু সে সময় দক্ষিণ আরবের দিকটায় উষ্ণতা বিরাজ করতো। এ কারণে মক্কার কুরাইশরা শীতের মৌসুমে দক্ষিণ আরবের দিকে বাণিজ্য যাত্রা করতো। মৌসুম অনুকূলে হওয়ার কারণে তারা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করতো। এটাও ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এক বিরাট নেয়ামত। এই নে'মাতের কথাও আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যাতায়াতের পথে যেখানে অন্যান্য বাণিজ্য বহর দস্যু-তস্করদের হাতে পড়ে লুণ্ঠিত হতো, সেখানে কুরাইশরা কা'বা ঘরের সেবক হওয়ার কারণে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে বাণিজ্য করে মাতৃভূমিতে ফিরে আসতো।

এসব নে'মাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বলছেন, তোমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, সেই ঘরের মালিকের দাসত্ব করা এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করা, যে ঘরের কারণে তোমরা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করছো, তোমাদের বাণিজ্য বহরে দুস্য-তস্করেরা আক্রমণ করছে না, তোমরা নিরাপত্তা পাচ্ছো এবং বিপুল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হচ্ছো।

কা'বা ঘরে তারা ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং প্রতিদিন ঘটা করে এসব মূর্তির পূজা করা হতো। কিন্তু তারা এ কথারও স্বীকৃতি দিতো যে, এই মূর্তিগুলো তাদের রব্ব নয়। তাদের রব্ব হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা এবং তিনিই আবরাহার হামলা থেকে তাদেরকে হেফাজত করেছেন। এই কুরাশরা-যারা আল্লাহর রাসূলের আন্দোলনের সাথে বিরোধিতা করছিল, তারা এ কথাও জানতো যে, এই ঘরের সেবক হওয়ার পূর্বে বা এই ঘরের আশ্রয়ে আসার পূর্বে তারা ছিল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত এবং হতদরিদ্র। কোথাও তাদের সম্মান-মর্যাদা ছিল না। অভাব ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। অন্যান্য গোত্রের মতোই তারাও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতো। কিন্তু তারা যখন এই ঘরের আশ্রয়ে এলো এবং কা'বাঘরের সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো, তখনই তাদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটলো। নেতৃত্বের

আসন তারা লাভ করলো এবং সম্মান ও মর্যাদা তাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। অভাব দূরিভূত হয়ে স্বচ্ছলতার সোনালী সূর্য উদিত হলো। ঐ ঘরের মালিকের অনুগ্রহেই যে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেছে, এ কথা তারা উত্তমভাবেই আবগত ছিল।

আল্লাহ তা'য়ালা সেই কথাই তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, চরম বিপদের সময় তোমরা মূর্তি ত্যাগ করে আমারই কাছে প্রার্থনা করেছিলে। সেই বিপদ দূর হবার পরেও দীর্ঘ সাত আট বছর আমারই বন্দেগী করেছিলে। তারপর তোমাদের এমন কি হলো যে, তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে মূর্তিপূজা শুরু করলে? যা ছিল তোমাদের কর্তব্য, সেই কর্তব্যের দিকেই তোমাদেরই আল আমীন তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তোমরা কেন তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁর সাথে বিরোধিতা করছো?

এই মক্কা অতীতে কতটা দৈন্য দশায় নিপতিত ছিল, জনমানবহীন ভয়াবহ এক রুক্ষ প্রান্তর ছিল, আল্লাহর কোরআন থেকেই তা অবগত হওয়া যায়। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর শিশু সন্তান ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে সেই কা'বা ঘরের কাছেই রেখে গিয়েছিলেন, যখন কা'বা মাটির নিচের চাপা পড়েছিল। তিনি তখন দোয়া করেছিলেন–

رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِیْ بِوَادٍغَيْرِذِیْزَرْعٍ عِنْدَبَيْتِكَ....اِلَى اخِرِالايَةُ

হে আমার রব্ব! আমি পানি ও তরুলতা শূন্য এক মহাপ্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার মহাসম্মানিত ঘরের কাছে এনে পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার রব্ব! আমি এই কাজ এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে নামাজ কায়েম করবে। অতএব লোকদের হৃদয়কে এদের প্রতি অনুরক্ত বানিয়ে দাও এবং খাওয়ার জন্য তাদেরকে ফল দান করো। (সূরা ইবরাহীম-৩৭)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের এই দোয়া থেকেই এ কথা প্রমাণিত হলো যে, মক্কা এলাকা কি ধরনের বিরান ভূমি ছিল। কুরাইশরা এই এলাকায় আসার পূর্বে দারিদ্র পীড়িত বিক্ষিপ্ত ছিল। যখনই তারা এই এলাকায় আগমন করলো, তখনই তাদের পূর্বের অবস্থা ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকলো। আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বরকতে ঐ এলাকাকে আল্লাহ তা'য়ালা গোটা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে সম্মানিত এলাকায় পরিণত করলেন। যে সময় আরব ভূমির কোন একটি এলাকাও নিরাপদ ছিল না। দিন রাতের কোন একটি মুহূর্তও মানুষের জন্য নিরাপদ ছিল না। যে কোন মুহূর্তে দুস্যু তস্করের দল আক্রমণ করে নির্বিচারে হত্যা-লুন্ঠন-ধর্ষন চালাতো। কোন মানুষ নিজের গোত্রের বাইরে গেলেই জীবিত ফিরে আসবে বা তাকে ধরে দাস হিসাবে বিক্রি করা হবে না, এই নিশ্চয়তা ছিল না। এমন কোন কাফেলা ছিল না, যারা নিরাপদে পথ চলতে পারতো। যেসব বাণিজ্য কাফেলা যে পথে যাতায়াত করতো, সেই পথে যেন তারা আক্রান্ত না হয়, এ জন্য তারা এলাকার গোত্রপতিকে ঘুষ দিতে বাধ্য হতো।

পক্ষান্তরে মক্কার লোকগুলো ছিল এর ব্যতিক্রম। সর্বত্র তাদের জন্য ছিল নিরাপত্তা এবং সম্মান ও মর্যাদা। তারা যে কোন অবস্থায় যে কোন স্থানে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারতো। ঘাতক যদি তাদের মাথার ওপরে তরবারি উঁচু করে তুলতো আর সেই মুহূর্তে সে যদি জানতো

পারতো, লোকটি মক্কার, তখনই তার উঁচু তরবারি নিচে নেমে আসতো। 'লোকটি মক্কী এলাকার' নিরাপত্তা ও সম্মান-মর্যাদা লাভের জন্য তার ঐ পরিচয়টিই যথেষ্ট ছিল। আলোচ্য সূরায় এসব নে'মাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই তাদেরকে বলা হয়েছে, যে ঘরের কারণে তোমরা আজ নেয়ামতে পরিপূর্ণ, তোমাদের উচিত হলো সেই ঘরের যিনি মালিক, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা। তিনি যে রাসূলকে প্রেরণ করেছেন সেই রাসূলের আনুগত্য করা এবং কোরআনের বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করা। তাহলে তোমরা বর্তমানে যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, এর থেকেও শত গুণ বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে সক্ষম হবে।

কা'বা স্বয়ং আল্লাহ নয় বা আল্লাহর সত্তা এমনও নয় যে, তিনি কা'বাঘরে অবস্থান করবেন। ঐ ঘরটিকে স্বয়ং আল্লাহ নির্বাচন করেছেন যেন সমস্ত মুসলমান ঐ ঘরকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয় এবং ঐক্যবদ্ধ থাকে। ঐ কেন্দ্র থেকেই তাওহীদের আলোর মশাল গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করে। আল্লাহ তা'য়ালা যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেই বিধান কোথায় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রয়োগ করা হবে, সে সিদ্ধান্ত যেন ঐ কেন্দ্রে বসেই মুসলমানরা গ্রহণ করে। ঘরটিকে স্বয়ং আল্লাহ মুসলমানদের সামগ্রিক কাজের ব্যাপারে নির্বাচিত করেছেন বলেই তাকে বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়েছে। সেই ঘরের কারণে যদি মানুষ সম্মান-মর্যাদা, নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, নেতৃত্ব ও শাসকের পদ লাভ করতে সক্ষম হয়, তাহলে যারা ঐ ঘরের মালিকের দাসত্ব করবে, তাঁর রাসূলকে একমাত্র অনুসরণযোগ্য নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে, গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব এবং ধন-সম্পদ তো তারাই লাভ করবে–এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এই ওয়াদা করেছেন এবং তাঁর ওয়াদা-ই সবথেকে সত্য। কোরআনের এই থিউরি কোন কাল্পনিক বিষয় নয়। বাস্তবে তা প্রমাণও করে দিয়েছে আল্লাহর কোরআন। দরিদ্র, অভাবী উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যহীন একটি জাতি যখন ঐ ঘরের মালিক স্বয়ং আল্লাহর গোলামী করেছে, তখন তারা এই পৃথিবীর শাসকের আসনসহ যাবতীয় কিছু লাভ করেছিল। পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছিল। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে পৃথিবী ইতিপূর্বে কখনো সেই সোনালী রাষ্ট্র দেখেনি, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের অবর্তমানেও আকাশের নিচে ও যমীনের বুকে সেই সোনালী দিন আর ফিরে আসেনি। বর্তমানেও মুসলমানদের ললাটে সেই সৌভাগ্য শশীর উদয় পুনরায় হতে পারে, যদি তারা সেই ঘরের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব করে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলকেই একমাত্র অনুসরণীয় নেতা হিসাবে মেনে নেয়।

সূরা আল-মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-১০৭

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার শেষ আয়াতে 'আল মাউন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা থেকে 'মাউন' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এই সূরাটি মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। আবার কেউ বলেছেন, এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে এই সূরাটির প্রথম তিনটি আয়াত মক্কায় এবং পরবর্তী চারটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের মতে শেষোক্ত মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এই ধারণাই প্রবলভাবে অনুভূত হয় যে, এই সূরায় মানুষের যেসব দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তা মদীনায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই দুর্বলতা সংশোধনের লক্ষ্যেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ এই সূরার মধ্যে নামাজের ব্যাপারে অমনোযোগিদের প্রতি তীব্র ভাষায় অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আর নামাজের ব্যাপারে অমনোযোগী ছিল সাধারণতঃ মুনাফিকরা। মুনাফিকদের যেসব শ্রেণী রয়েছে, আলোচ্য শ্রেণীর মুনাফিকদের উদ্ভব মক্কায় হয়নি, হয়েছিল মদীনায়।

কারণ হিজরতের পরে মদীনায় যখন ইসলামী নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে এমন অনেক লোক ছিল যারা নিতান্ত আত্মরক্ষামূলক কৌশল হিসাবে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছিল। এই লোকগুলো ইসলামী বিধি-বিধানের ঐটুকুই প্রদর্শনীমূলকভাবে অনুসরণ করতো, যেটুকু করলে কেউ তাদেরকে মুসলিম সমাজ বহির্ভূত লোক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারবে না। মক্কায় এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ সেখানে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। গোপনে নির্জন স্থানে গিয়ে নামাজ আদায় করতে মুসলমানরা বাধ্য হতো। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাদের ওপরে অমানবিক নির্যাতন করা হতো, এই দৃশ্য দেখার পরে অনেকের পক্ষেই প্রকাশ্যে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেয়া সম্ভব হতো না। তাছাড়া সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়েও অনেকে মুসলমান হয়নি। কিন্তু তারা আল্লাহর রাসূলকে একজন সত্য রাসূল এবং কোরআনকে আল্লাহর বাণী হিসাবে মানতো। কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে ভয় পেতো। এই শ্রেণীর মুনাফিকের অস্তিত্ব ছিল মক্কায়।

আখিরাতের প্রতি প্রবল বিশ্বাস ও জবাবদিহির অনুভূতি হৃদয়ে না থাকলে একজন মানুষের চরিত্রে কি ধরনের খারাপ গুণ ও বৈশিষ্ট্য এসে বাসা বাঁধে, সেটাই এই সূরার মূল আলোচিত বিষয়। পরকালের প্রতি যারা সন্দেহ, সংশয় পোষণ করে বা অবিশ্বাস করে, এরা অপরের অধিকার বা প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়না। সমাজের দুর্বল ও অভাবিদেরকে কোন ধরনের সাহায্য করে না। ইয়াতিমদেরকে লাঞ্ছিত করে বিদায় দেয়। প্রাথমিক তিনটি আয়াতে কাফির শ্রেণীর লোকদের কতকগুলো নিকৃষ্ট স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী চারটি আয়াতে ঐসব মুনাফিক শ্রেণীর লোকদের স্বভাব উল্লেখ করে তাদের ওপরে অভিশাপ দিয়ে বলা হয়েছে, নামাজ আদায় না করলে মুসলিম সমাজের ভেতরে অবস্থান করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে না, এ জন্য তারা প্রদর্শনীমূলক নামাজ আদায় করে। প্রতিবেশীদের কোন প্রয়োজন এরা পূরণ করতে নারাজ। কেউ কোন প্রয়োজনে তাদের কাছে এলে তারা সক্ষম থাকার পরেও অক্ষমতা প্রকাশ করে। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের কর্মকান্ড উল্লেখ করে এ কথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, যাদের হৃদয়ে পরকাল সম্পর্কে কোন অনুভূতি নেই, তারা কখনো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। ❊

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) তুমি কি সে ব্যক্তির কথা (কখনো) ভেবে দেখেছো, যে শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করে, (২) এ তো হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে নিরীহ ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়, (৩) মিসকীনদের খাবার দিতে কখনো সে (অন্যদের) উৎসাহ দেয় না। (৪) (মর্মান্তিক) দুর্ভোগ রয়েছে সেসব (মুনাফিক) নামাজীদের জন্যে, (৫) যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে গাফলতি করে। (৬) (তারা যাবতীয়) কাজ কর্ম শুধু প্রদর্শনীর জন্যেই সম্পাদন করে, (৭) ছোটখাটো জিনিস পর্যন্ত (যারা অন্যদের) দিতে বারন করে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

কাযী আবুল হাসান মাআর্দি (রাহ) তাঁর 'আ'লামুন্ নুবুওয়াহ্' নামক গ্রন্থে আল্লাহর রাসূলের জীবনীর ওপরে একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিককালে। একজন ইয়াতিম বালকের যাবতীয় সহায়-সম্পদ আবু জেহেলের হাতে দিয়ে তাকেই সেই বালকের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু সে ঐ ইয়াতিম বালককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতো না। এই চরিত্র শুধু আবু জেহেলেরই ছিল না, তৎকালীন মক্কার অধিকাংশ নেতাদেরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আবু জেহেলের অনুরূপ ছিল। বালকটির চেহারায় দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট এবং পরনে শত ছিন্ন পোষাক। এই অবস্থায় সে একদিন আবু জেহেলের কাছে এসে আবেদন জানালো, তাকে যেন তারই পিতার গচ্ছিত সম্পদ থেকে কিছু দেয়া হয়, বর্তমানে তাকে প্রচন্ড অভাব গ্রাস করেছে। কিন্তু আবু জেহেল ইয়াতিম বালকের প্রাপ্য বুঝিয়ে না দিয়ে তার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

মক্কার হারাম শরীফে বসে ইসলাম বিরোধী কতক নেতাও সে দৃশ্য অবলোকন করলো। আল্লাহর রাসূলও সে সময় হারাম শরীফের একদিকে বসে ছিলেন। বালকটি অশ্রুসিক্ত নয়নে হতাশ মনে এলোমেলো পদবিক্ষেপে ফিরে যাচ্ছিলো। হারাম শরীফে বসে থাকা কতক নেতা আল্লাহর রাসূলকে নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে সেই ইয়াতিম বালকটিকে ডেকে আল্লাহর রাসূলকে দেখিয়ে বললো, 'ঐ যে ঐ লোকটি বসে রয়েছে, তুমি তাঁর কাছে যাও। সে তোমার প্রাপ্য আবু জেহেলের কাছ থেকে আদায় করে দেবে।'

সহজ সরল মনের অধিকারী দারিদ্র পীড়িত নিষ্পাপ বালকটি জানে না ঐ লোকটি স্বয়ং আল্লাহর রাসূল এবং তাঁকে অপমান করার জন্যই এই লোকগুলো ষড়যন্ত্র করছে। বালকটি সরল মনে রাসূলের কাছে গিয়ে ঘটনা জানালো। আল্লাহর রাসূল মমতা সিক্ত কণ্ঠে বালকটিকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'তুমি আমার সাথে এসো, তোমার প্রাপ্য আদায় করে দেয়া আমারই কাজ।' এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়পদে আবু জেহেলের বাড়ির দিকে গেলেন–সাথে তাঁর সেই ইয়াতিম বালক। এদিকে হারাম শরীফে উপবিষ্ট ইসলামের দুশমনরা একদৃষ্টে তাকিয়ে রাসূল কিভাবে অপমানিত হচ্ছে আবু জেহেলের হাতে, তা দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিল। আল্লাহর রাসূল আবু জেহেলের দরোজায় কারাঘাত করলেন–ইসলামের দুশমন দরোজা খুলে সামনেই দন্ডায়মান আল্লাহর রাসূলকে দেখে হকচকিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই তার চেহারায় আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রাসূল তাকে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'এই ইয়াতিম বালকের প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দাও।'

আবু জেহেল তড়িৎগতিতে রাসূলের আদেশ পালন করলো। ইয়াতিম বালক তার প্রাপ্য বুঝে পেয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রাসূলের দিকে তাকালো। রাসূলও মমতাভরা দৃষ্টিতে বালকের দিকে তাকিয়ে নিজের স্থানে চলে গেলেন। এতক্ষণ হারাম শরীফে বসে যারা রাসূল কিভাবে লাঞ্ছিত হয় তা দেখার অপেক্ষায় ছিল, প্রত্যাশার বিপরীত দৃশ্য দেখে তাদের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তারা ছুটলো আবু জেহেলের কাছে। উত্তেজিত কণ্ঠে তারা জানতে চাইলো, 'ব্যাপার কি! আমরা তাঁকে পাঠালাম এ কারণে যে, তুমি তাঁকে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত করবে, তা না করে তুমি তাঁর আদেশ পালন করলে যে?' আবু জেহেলের চেহারা থেকে তখনো আতঙ্কের চিহ্ন মুছে যায়নি। সে ভয়ার্ত কণ্ঠে সাথীদেরকে জানালো, 'আমি দরোজা খুলেই দেখি সামনে মুহাম্মাদ দাঁড়িয়ে আর তাঁর দুদিকে দু'জন ভয়ঙ্কর দর্শন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর দর্শন চেহারা আমি জীবনে দেখিনি। আমি যদি তাঁর আদেশ পালন না করতাম তাহলে ঐ ভয়ঙ্কর লোক দুটো আমাকে নির্ঘাত হত্যা করতো।'

এই ঘটনা থেকে সে যুগের সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন নেতৃত্বের দাবীদার পরকালের ভীতি শূন্য লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজের দুর্বল ও ইয়াতিম লোকদের সাথে তারা কেমন নিকৃষ্ট আচরণ করতো এবং কিভাবে তাদেরকে শোষণ করতো, তার একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। **আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে,** 'তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে অথবা সেই ব্যক্তির কথা কি তুমি ভেবে দেখেছো' এই কথা দ্বারা এটা রাসূলকে বা শ্রোতাকে এটা বুঝানো হয়নি যে, যে ব্যক্তি এই ধরনের নিকৃষ্ট আচরণ করে, তাকে তুমি বাস্তবে নিজ চোখে দেখেছো। বরং রাসূলের বা শ্রোতার চিন্তার জগতে এই সূত্রই দেয়া হয়েছে যে, যারা পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী, তাদের আচরণ কতটা নিকৃষ্ট হতে পারে, তা কি তোমরা ভেবে দেখেছো?

ইসলামী আদর্শ ও ইসলামের বিপরীত আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তাধারায়, নৈতিকতায়, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং বাস্তব জীবনধারায়-চরিত্রে যে বিরাট ব্যবধান ও পার্থক্য সৃষ্টি হয়, সেটাই এই সূরায় ছোট্ট ছোট্ট আয়াতে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী জীবন আদর্শ ও আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি, পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস মানব মন্ডলীর বাস্তব জীবন চিত্রে যে সব কল্যাণকর গুণাবলী সৃষ্টি করে এবং যে সব মহৎ গুণাবলী মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে অপরূপ সুষমামন্ডিত করে তোলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

এসেছে এ সূরাটিতে। চিত্রের অপর পৃষ্ঠে দেখা যায় যারা আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি অমোনযোগী এবং পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী বা সন্দিহান তাদের বাস্তব জীবনধারা কতটা ঘৃণিত আচরণ সম্বলিত হতে পারে, মানুষের প্রতি তারা কতটা নির্দয় নিষ্ঠুর হতে পারে, আবার ভন্ড বক ধার্মিক ও প্রদর্শনীমূলক মন-মানসিকতা নিয়ে যারা ধর্মের আলখেল্লা গায়ে দেয়, তারা মানুষের সাথে কিভাবে ভন্ডামী করে এবং মানব কল্যাণে তারা কতটা অসহযোগিতামূলক আচরণ করে, এ বিষয়টিও আলোচ্য সূরায় প্রতিফলিত হয়েছে।

এই পৃথিবীর পরে দ্বিতীয় কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই, পৃথিবীতে যা কিছুই করা হচ্ছে-এসব কর্মকান্ডের কোন জবাবদিহি কারো কাছে করতে হবে না। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীতে যারা নিজের জীবন পরিচালিত করতে করছে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো, এরা অন্যের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয় না। অপরের অর্থ-সম্পদ কিভাবে কুক্ষিগত করা যায়, এই প্রচেষ্টা এদের কর্মকান্ডে প্রকাশ পায়। এদের বিশ্বাস হলো কোন কল্যাণকর কাজের প্রতিফল পরকালে পাওয়া যাবে না এবং মন্দ কাজের জন্য কোন শাস্তির ব্যাবস্থাও সেখানে নেই। সুতরাং অযথা সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণের চিন্তা করে সময় নষ্ট করা এবং এসবের পেছনে নিজের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার পেছনে কোন সার্থকতা নেই। বরং এই পৃথিবীতে সুখ-সম্ভোগের জন্য যতটা পারা যায় সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে যদি অন্যের অধিকার খর্ব করতে হয়, তাও করতে হবে।

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে যে 'দ্বীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ শুধু বিচার দিবসই নয়-বরং এর মধ্যে ইসলামের সামগ্রিক আদর্শের কথা নিহিত রয়েছে। ইসলামী আদর্শের বা জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাতের ওপরে। এই তিনটি বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাসী বা সন্দেহপোষণকারী লোকগুলো কি ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তা স্পষ্ট করে পরবর্তী আয়াতসমূহে বলে দিয়েছেন। এরা অধিকারীর অধিকার বুঝিয়ে দেয় না, দুর্বল ও ইয়াতিমদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দেয়। অভাবী এবং ক্ষুধার্তের কোন প্রয়োজন এরা নিজেরা যেমন পূরণ করে না, এ ব্যাপারে অপরকেও উৎসাহিত করে না। সুতরাং যারা ইয়াতীম ও দুর্বলদের অধিকার হরণ করে, শক্তি প্রয়োগ করে দুর্বল ও ইয়াতীমদের প্রাপ্য থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করে, ক্ষুধার্তকে নিজেরাও আহার করায় না এবং অপরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দেয় না, এরাই আসলে ইসলামী জীবন ব্যাবস্থার প্রতি অবিশ্বাসী। এরা যদি ইসলামী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতো, পরকালের প্রতি বিশ্বাস থাকতো, তাহলে এই ধরনের নিকৃষ্ট আচরণ এরা করতে পারতো না।

সূরা আসরের তাফসীরে আমরা এ কথা স্পষ্ট করে বলে এসেছি যে, আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করেছে, ঈমান এনেছি-এ কথা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে শুধু স্বীকৃতি দিলেই ঈমানের দাবী আদায় হবে না। সেই সাথে আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করতে হবে। ইসলামের সত্যতাকে কেবলমাত্র মৌখিকভাবে স্বীকার করার নামই ঈমান নয়-প্রকৃত ঈমান সেটাই যা হৃদয়ে গভীর প্রত্যয় সৃষ্টি করে দেয় এবং মানব জীবনে ঈমানের দাবী পূরণের যাবতীয় পারিপার্শ্বিক ও আনুষাঙ্গিক গুণাবলী বিকশিত করে। সেটার নামই বিশ্বাস যে বিশ্বাসের স্বীকৃতির সাথে জীবনের যাবতীয় কাজের অপূর্ব সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলাম শুধুমাত্র তার অনুসারীদের কাছ থেকে মৌখিক স্বীকৃতি চায় না। বরং মৌখিক

স্বীকৃতির সাথে হৃদয়ের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও জীবনের সকল কর্মকান্ডে তার সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপনই ইসলাম চায়। যে মুখের কথার সাথে বাস্তব কর্মময় জীবনের কোন সাদৃশ্য নেই, সেটার নামই ভন্ডামী। এই ভন্ডামী আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা যে মহান আদর্শ প্রেরণ করেছেন, সেই ইসলাম কোন সঙ্কীর্ণ, প্রদর্শনীমূলক, কৃপণ ও অনুদার আদর্শ নয়। এই আদর্শ শুধুমাত্র প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি সর্বস্ব আদর্শও নয়। ইসলাম যে জীবন দর্শন উপস্থাপন করেছে, তা নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা বিবর্জিত কোন জীবন দর্শনের নাম নয়। বরং একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁর প্রতি পরম নিষ্ঠা, তাঁর দাসত্বে একাগ্রচিত্ততা, আন্তরিকতা ও নিবেদিত প্রাণ হওয়ার আদর্শই হলো ইসলাম। এই আদর্শ তার অনুসারীদেরকে কতটা সৎকর্ম পরায়ণ করে তুলতে পারে, কতটা দৃষ্টান্তমূলক উত্তম আচরণ ও অতুলনীয় অনুপম চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে, কতটা উন্নত ও মানুষের কল্যাণকামী গুণাবলীতে ভূষিত করতে পারে, সে কথাগুলোর দিকেই আলোচ্য আয়াত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এরপর আলোচ্য সূরার ৪ থেকে ৬ নম্বর আয়াতে ঐ লোকগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যারা দায়ে ঠেকে একান্ত বাধ্য হয়ে নামাজ পড়ে এবং ইসলামের কিছু বিধি-বিধান প্রদর্শনীমূলকভাবে অনুসরণ করে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'মর্মান্তিক দুর্ভোগ রয়েছে সেসব মুনাফিক নামাজীদের জন্যে, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে গাফলতি করে। তারা যাবতীয় কাজ-কর্ম শুধু প্রদর্শনীর জন্যেই করে।'

উল্লেখিত আয়াতে যে শ্রেণীর নামাজী লোকদের কথা বলা হয়েছে, সেই লোকগুলো শুধু মদীনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সর্বত্রই তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। এসব লোক নামাজ পড়ে কিন্তু নামাজের প্রতি তারা মনোযোগী নয়। এরা নামাজের আনুষ্ঠানিকতা শুধু আদায় করে, কিন্তু তাদের নামাজে প্রাণশক্তি নেই। তাদের আত্মা নামাজের জীবনী শক্তি দ্বারা সঞ্জীবীত নয়। তাদের সামগ্রীক জীবনধারা নামাজের চরিত্র, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নয়। তারা নামাজে যা পড়ে, তার সাথে তাদের বাস্তব জীবনধারার কোন সাদৃশ্য নেই। মুয়াজ্জিনের আযান এদের কানে আসে, কিন্তু কেন এবং কোন উদ্দেশ্যে মুয়াজ্জিন এদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে, সে ব্যাপারে এদের কোন চেতনা নেই। নামাজ আদায় করতে মসজিদে গেল, আনুষ্ঠানিক কিছু ক্রিয়াকর্ম করলো, তারপর মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে পূর্বে সে যেমন ছিল, নামাজ আদায় করার পরও তেমনি রইলো। কোন পরিবর্তন তার ভেতরে এলো না।

অথবা নামাজের সময় চলে যাচ্ছে, সেদিকে তার কোন চেতনাই নেই। ওয়াক্তের শেষ সময়ে একান্ত অপরগ হয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে অজু করে অনাগ্রহের সাথে নামাজে দাঁড়ালো। রুকু-সেজদা ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম যথাযথভাবে আদায় না করে অত্যন্ত ব্যস্তার সাথে নামাজের ক্রিয়াকর্ম শেষ করলো। নামাজ আদায় করলো বটে, কিন্তু তা অত্যন্ত অন্যমনস্ক ও অনানুরাগী মানসিকতা সহকারে, একান্ত অনিচ্ছাক্রমে। এটা যেন নামাজই নয়, একটা বড় ধরনের ভারী বোঝা তার ঘাড়ের ওপরে চেপে বসে আছে, একটা দুর্বহ বোঝা তার মাথার ওপরে, অতএব দুই চার বার কপাল ঠুকে তা নামিয়ে দিতে পারলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। দোয়া-দরুদ ও কেরআত এত দ্রুত গতিতে পাঠ করলো, তা যথাযথভাবে পাঠ করা হলো

কিনা অথবা এর অর্থ বিকৃত হয়ে গেল কিনা, সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপ করলো না। নামাজে সে যা পাঠ করলো তার আপন প্রভু মহান আল্লাহর সামনে অর্থাৎ সে স্বয়ং আল্লাহকে যা শুনালো, তার অর্থ বুঝার চেষ্টা করলো না।

মসজিদে জামাআতে নামাজ আদায় করতে গেল কিন্তু ইমাম সাহেব তার মতো ব্যস্ততার সাথে নামাজ আদায় করছে না, এ জন্য তার বিরক্তির কোন সীমা থাকে না। ঘন ঘন কাশি দেয়া আরম্ভ করলো অথবা তন্দ্রায় আক্রান্ত হয়েছেন যেন, এমনভাবে হাই তোলা শুরু করলো। সে যে তার আপন প্রভু গোটা সৃষ্টি জগতের মালিক, সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তাঁরই হাতে তার জীবন ও মৃত্যুর বাগডোর, সে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এ কথা তার স্মরণে নেই। সে যে এমন এক সত্তার সামনে দাঁড়িয়েছে, যিনি তার মনের গহীনে কোন কোণে কি কল্পনার সৃষ্টি হচ্ছে, সে সংবাদও রাখেন, এ কথা তার চেতনাতেই নেই। মন তার ছুটে যাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বা কৃষিক্ষেত্রে। এ যেন পূজার ছলে ঠাকুর ঘরে বসে নিজের প্রেমিকাকে নিয়ে সুখ স্বপ্নে বিভোর থাকা, জড় পদার্থে নির্মিত দেবতার সামনে বসে তার পূজা করলেও তার কিছু যায় আসে না অথবা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে কল্পনা করলেও তার কিছুই যায় আসে না। কারণ মাটি পাথরে নির্মিত দেবতার তো কোন অনুভূতিই নেই। এদের নামাজও যেন তেমনি। নামাজে দাঁড়িয়ে মনে মনে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি হিসাব করে, ধারণা যেন এমন তার মনের কোন সংবাদই আল্লাহ রাখেন না।

এদের নামাজে কোন প্রাণ নেই, নিছক একটা যান্ত্রিক পুতুলের মতোই দাঁড়িয়ে থাকা এবং ওঠা-বসা করা। ঈমানদারদের প্রতিটি পদেক্ষপ নিয়ন্ত্রিত হয় নামাজ দ্বারা। নামাজ যেমন একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করে এ কথাই ঘোষণা করা হয় যে, সে আল্লাহর গোলাম। তেমনি প্রতিটি কাজ-কর্মে সে আল্লাহর গোলামীর স্বাক্ষর রাখবে। নামাজে যেমন রাসূলের শেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজই সে রাসূলের অনুসরণে করবে। নামাজ আদায়কালে কতকগুলো হালাল কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন কথা বলা, আহার করা, এদিক-ওদিক তাকানো, কারো ডাকে সাড়া দেয়া ইত্যাদি। হালাল কাজ নামাজের মধ্যে হারাম কাজে পরিণত হলো মহান আল্লাহর নির্দেশে। নামাজ আদায় করে মানুষ এ কথারই ঘোষণা দিয়ে থাকে যে, নামাজের বাইরের জীবনেও সে একমাত্র আল্লাহর আদেশই পালন করবে। নামাজের মধ্যে যা পাঠ করা হলো, সেই পাঠের সাথে বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য থাকবে, এ কথাই নামাজ আদায় করে আল্লাহর সামনে ওয়াদা করা হয়।

যারা নামাজ আদায় করে কিন্তু উল্লেখিত কোন একটি দিকও তাদের বাস্তব জীবনে প্রকাশিত হয় না, তাদের নামাজের কোন মূল্য নেই। নামাজ আদায় করছে মিথ্যা কথাও বলছে, সুদ, ঘুষ খাচ্ছে। অন্যায় পথে অর্থ উপার্জন করছে। অপরের অধিকার ক্ষুন্ন করছে। এরা তো আসলে প্রদর্শনীমূলক নামাজ আদায় করছে। পরকালের শাস্তির ভয় বা পুরস্কার লাভের প্রতি বিশ্বাস যদি এদের হৃদয়ে থাকতো, তাহলে তারা অবশ্যই নামাজসহ ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পরম শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে আদায় করতো। তাদের যে ঈমান নেই, এ কথার বড় প্রমাণ হলো তারা নামাজের প্রতি আন্তরিক নয়। নামাজের ব্যাপারে যারা অমনোযোগী, এরা হলো মুনাফিক। এদের নামাজ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন-

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ-

তারা নামাজের জন্য আসে বটে, কিন্তু আসে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়। আর আল্লাহর পথে তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে বটে, কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছা সহকারে। (সূরা তওবা-৫৪)

এদের একমাত্র উদ্দেশ্য এরা আদম শুমারীর খাতায় এবং সমাজে একজন মুসলিম হিসাবে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে চায়। এ জন্য একান্ত অনিচ্ছার সাথে ইসলামের কিছু বিধি-বিধান প্রদর্শনীমূলকভাবে অনুসরণ করে। বিয়ের সময় ইসলামী রীতি অনুসরণ না করলে, খাত্না না করলে, কোন আত্মীয় ইন্তেকাল করার পরে কবর না দিলে বা দোয়ার অনুষ্ঠান না করলে লোক নিন্দা করবে, সমাজেও হয়ত স্থান হবে না।

এ উদ্দেশ্যেই এরা অনাগ্রহভরে ইসলামের কিছু নিয়ম নীতি পালন করে। এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মানুষ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বের কোন জীব নয়। নামাজে দাঁড়ালে একদিকে নফ্সে আম্মরা ধোকা দেয় অপরদিকে খোদ শয়তান প্রতারণা করে। এ অবস্থায় মন এদিক ওদিক চলে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি যখনই অনুভব করে তার মন নামাজের দিকে নেই, তখনই সে সচেতন হয়ে মনকে নামাজের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। এটা মানব স্বভাবের অন্তর্গত এবং প্রকৃতিগত ব্যাপার। কিন্তু নামাজের প্রতি অমনোযোগী হওয়া, অনিচ্ছাভরে, অনাগ্রহের সাথে নামাজ পড়া, এসব স্পষ্ট মুনাফেকী এবং পরকালের প্রতি ঈমানহীনতার চিহ্ন।

অধিকাংশ সময় এই শ্রেণীর মুনাফিকরা দেখার কেউ না থাকলে বা একাকী অবস্থানকালে নামাজই আদায় করে না। এরা কোন একটি ভালো কাজই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে না। এরা যা কিছুই করে তা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে, প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে, নাম-যশ ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে অথবা কোন স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে করে থাকে। মাথায় টুপি ব্যবহার করা রাসূলের রীতি। রাসূল যা করেছেন তাই করলে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা টুপি ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্যে যে, লোকজন তাকে পরহেযগার মনে করবে।

বিশেষ করে নির্বাচনের সময় নিজের নামের পূর্বে হাজী শব্দ এবং মাথায় টুপি ব্যবহার করে এরা ভোটারদের কাছে নিজেকে পরহেযগার হিসাবে উপস্থাপন করতে চায়। মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নয়–মানুষের কাছে নিজেকে সৎ হিসাবে প্রমাণ করা। এ **জন্যই আলোচ্য সূরার ৬ নম্বর আয়াতে** বলা হয়েছে, 'তারা যাবতীয় কাজ-কর্ম শুধু প্রদর্শনীর জন্যেই করে।'

পৃথিবী সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজিয়ে তারপর এখানে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ প্রেরণ করেছেন এবং এই মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে তাদের কল্যাণ সাধন করার উদ্দেশ্যেই নবী-রাসূল ও তাদের মাধ্যমে হেদায়াত প্রেরণ করেছেন। মানুষ যেন ব্যক্তিগতভাবে নিজের মধ্যে উন্নত গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যেন উন্নত গুণাবলীর প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়, এই লক্ষ্যেই নবী-রাসূল ও কোরআনের আগমন। মানুষ সামাজিক জীবনে একে অপরের প্রয়োজন পূরণ করবে, পরস্পরের অভাব দূর করবে এবং এভাবে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা।

ঈমানদারদের সমাজ হবে একটি মানবদেহের ন্যায়। মনব দেহের কোন অঙ্গ ব্যথা সৃষ্টি হলে সে ব্যথা যেমন গোটা দেহ অনুভব করে, তেমনি ঈমানদারদের সমাজে কোন একটি লোকের অসুবিধা দেখা দিলে গোটা সমাজই সে অসুবিধা অনুভব করবে। এভাবে পরস্পরে অসুবিধা

দূর করলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং সক্ষম হওয়ার পরও যারা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে না, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি।

পক্ষান্তরে মুনাফিকরা যেহেতু পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাসী নয়, সেহেতু তারা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে পরকালীন জীবনের জন্য কিছু অর্জন করবে, সেটা তারা করতে আগ্রহী নয়। নামাজের কোন গুণাবলী ও নিদর্শন তাদের চরিত্র এবং জীবনধারায় প্রকাশিত হয় না, তাদের হৃদয়ে নামাজের কোন্ প্রভাব পড়ে না। আর এই ধরনের নামাজ যারা পড়ে তারাই নিত্য প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য-সামগ্রী, কোন কল্যাণধর্মী সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রকাশ করার ব্যাপারে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

আল্লাহর বান্দাহ্দের উপকার ও কল্যাণ সাধন, তাদের কল্যাণ কামনা ও সহযোগিতা প্রদান করে না। যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং নামাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেই তারা নামাজ আদায় করতো, তাহলে তারা কিছুতেই আল্লাহর বান্দাহ্দের কল্যাণ সাধন, সাহায্য প্রদান ও ছোটখাটো জিনিস দিয়ে উপকার করা থেকে বিরত থাকতো না।

আলোচ্য সূরা শেষ হয়েছে 'মাউন' শব্দ দিয়ে। সাধারণত আরবী ভাষায় মাউন বলা হয় ক্ষুদ্র ও স্বল্প জিনিসকে, যার মাধ্যমে মানুষজন সামান্য কিছু উপকার লাভ করতে পারে। মাউন শব্দের এই অর্থের দিক দিয়ে যাকাতও মাউন শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কারণ যাকাত প্রকৃত অর্থে বিপুল সম্পদের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আর যাকাত প্রদান করা হয় অভাবীদের অভাব মোচনের জন্য। প্রতিবেশীদের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য কারো একটি কলমের প্রয়োজন হতে পারে, এভাবে বই, চেয়ার, টেবিল, বিছানার চাদর, মেহমানের সংখ্যা বেশী হলে এক রাতের জন্য থাকার স্থান, থালা, বাটি, গ্লাস, তরকারী, লবণ, মরিচ, নগদ অর্থ ইত্যাদি। সংসারে সবারই সব জিনিস থাকে না।

প্রতিবেশীর যখন এসব প্রয়োজন হয়, তখন ঈমানদারদের সমাজের এসব জিনিস একটি পরিবারে থাকলে তা দশটি পরিবারের উপকারে আসে। কিন্তু মুনাফিকরা এই উপকারও করতে রাযী নয়। উপকার করলে যখন কোন বিনিময় পাওয়া যাবে না, তখন শুধু শুধু কেন উপকার করবো-এই বিশ্বাসের কারণেই তারা সমাজ জীবনে পরস্পরকে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে এবং অন্যকেও তা করতে নিরুৎসাহিত করে। এটাও মুনাফিকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ জন্য আলোচ্য সূরার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস লোকদেরকে দেয়া থেকে তারা বিরত থাকে।'

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) (হে নবী) আমি তোমাকে (নে'মাতের) কাওসার দান করেছি। (২) (আমার স্মরণের জন্যে) তুমি নামাজ কায়েম করো এবং (আমারই উদ্দেশ্যে) তুমি কোরবানী করো। (৩) (তুমি জেনে রেখো) তোমার নিন্দুকরাই হবে শেকড়-কাটা (অসহায় বৃক্ষ)।

সূরা আল–কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–১০৮

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে 'কাওসার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাসহ বেশ কয়েকজন সাহাবার মতে এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতেও এই সূরা মক্কী। কতিপয় গবেষক বলেছেন এই সূরা মাদানী। তবে অধিকাংশ গবেষকগণ এই সূরায় আলোচিত বিষয় ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই সূরা মক্কায় ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন আল্লাহর রাসূলের ওপর একের পর এক বিপদ মুসিবতের পাহাড় ভেঙে পড়ছিল। সময়ের ব্যবধানে আল্লাহর রাসূলের সবক'টি পুত্র সন্তান মহান আল্লাহর আদেশে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। রাসূলের জীবনে এক শোকাতুর পরিবেশ বিরাজ করছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ সময় নিকটাত্মীয়রা এসে রাসূলকে সান্ত্বনা দেবে।

কিন্তু তাদের আচরণ ছিল স্বাভাবিকের থেকে বিপরীত। অধিকাংশ আপন আত্মীয় ইসলাম বিরোধী হবার কারণে তারা রাসূলকে সান্ত্বনা দেয়ার পরিবর্তে বরং আনন্দ উৎসব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েই ইসলামের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কারণ তাঁর কোন পুত্র সন্তান রইলো না। কারো মৃত্যুর পরে তার পুত্র সন্তানই পিতার মিশন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র সন্তান রইলো না, সে নির্বংশ হয়ে গেল। অতএব তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সূচনা করা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটবে–এ কারণে ইসলাম বিরোধিরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিল। এই অবস্থাতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরা অবতীর্ণ করে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের এক ক্রান্তিকালে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। তিনি নবুওয়াত লাভ করেছেন এবং নবী হিসাবে সবেমাত্র দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। মাত্র গুটি কয়েক লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছে। প্রতিপক্ষ

তাদেরকে নিষ্পেষিত করার যাবতীয় পথ অবলম্বন করেছে। রাসূল এবং তাঁর সাথীগণ একমাত্র মহান আল্লাহরই গোলামী করে যাচ্ছেন এবং প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা ও আচরণকে তিনি প্রকাশ্যে অস্বীকার করছেন। শুধুমাত্র এই কারণেই তাঁর নিজের গোত্র গোটা কুরাইশ সম্প্রদায় তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে গোটা জাতির মধ্যে তাঁর যে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসন ছিল, সে আসন ছিনিয়ে নেয়া হলো। যে দৃষ্টিতে ছিল তাঁর প্রতি অসীম ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা–সেই দৃষ্টিতে এখন এক অবিমিশ্র প্রতিহিংসা পুঞ্জিভূত হলো। মুখের যে ভাষায় ছিল মমতা, স্নেহ আর শ্রদ্ধার সুর, সেখানে জমায়েত হলো হৃদয় বিদীর্ণকারী তরবারির তীক্ষ্ম ধার আর কর্কশতা।

গোটা সমাজ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা হলো এবং তিনি যেন এক সমাজ পরিত্যক্ত আত্মীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন চরম অসহায় এক ব্যক্তি। তাঁর পরম প্রিয় সাথীবৃন্দ অত্যাচার আর নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। চারদিক থেকে তাদেরকে বিতাড়িত আর নির্যাতিত হতে হলো। আল্লাহর রাসূলের নয়নের মণি কলিজার টুকরো পুত্র সন্তানগণ একের পর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো শোকের বাণ তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল। চরম হাহাকার আর মর্মান্তিক বেদনাচ্ছন্ন দিনগুলোয় অতি আপনজন আর প্রতিবেশীদের মনে সহানুভূতি সৃষ্টি হবার পরিবর্তে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগলো। নিষ্পাপ নিষ্কলুষ পরোপকারী মহান এক ব্যক্তি-যিনি মানবতার মহান মুক্তির দুত, তাঁর প্রতি এই পাষাণসম আচরণে মহান আল্লাহর করুণার সাগরে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হলো।

তিনি এই ছোট্ট সূরা অবতীর্ণ করে তাঁর প্রিয় বন্ধুকে জানিয়ে দিলেন, 'আপনাকে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী যে বিশেষণে বিশেষিত করছে, আপনি তা নন। বরং যারা আপনাকে নির্বংশ বলছে, তারাই একদিন নির্বংশ হয়ে যাবে। আর আপনাকে আপনার রব যা দান করেছেন, তা ইতিপূর্বে এই পৃথিবীতে কাউকে দান করা হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কাউকে দান করা হবে না। আখিরাতে আপনাকে কাওসার দান করা হবে। আপনি আপনার রব-এর জন্য সালাত আদায় করতে থাকুন এবং তাঁরই নামে কোরবানী দিন।' এ সূরার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝার জন্য সূরা দোহা-এর তাফসীর সামনে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আল্লাহর কোরআনের সূরা দোহা ও সূরা আলাম নাশরাহ্-এর বর্ণনায় দেখা গিয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে দ্বীনি আন্দোলনের সূচনা পরবর্তী অধ্যায়ে কি ধরনের মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। গোটা আরবের কোথাও তিনি একটু স্বস্তির নিশ্বাস গ্রহণ করবেন, এমন পরিবেশ ছিল না। আন্দোলন সফল হবে, এমন ক্ষীণ আশা করাও অসম্ভব ছিল। ঠিক এমনি এক হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশে মহান আল্লাহ সূরা দোহা-য় তাঁর রাসূল ও রাসূলের সাথীদেরকে আশার আলো দেখিয়ে জানিয়ে দিলেন, এই অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হবে না এবং অন্ধকারে পেছনেই আলো রয়েছে। অচিরেই তোমাদের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য শশী উদিত হবে।

এরপর সূরা আলাম নাশরাহ-তে জানানো হলো, আজ তোমার নাম নিশানা মুছে দেয়ার জন্য প্রতিপক্ষ চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন তাদের নাম-নিশানা ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে। তোমার নাম গোটা পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের প্রতি মুহূর্তে পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হতে থাকবে। বর্তমানে তুমি দেখছো, তোমার জন্য চারদিকের পরিবেশ সঙ্কীর্ণ হয়ে

আসছে, কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতার পরেই রয়েছে প্রশস্ততা। বর্তমানের এই বিপদ দেখে চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ো না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আন্দোলনের ময়দানে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হও। বিজয় তোমারই পদচুম্বন করবে।

যে পরিবেশ পরিস্থিতে রাসূলকে সূরা দোহা ও আলাম-নাশরাহ্ অবতীর্ণ করে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, ঠিক সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তির কারণেই সূরা কাওসার অবতীর্ণ করে রাসূলকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করলেন, তখন তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতো, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জাতি থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন।' আরবের প্রচলিত প্রথা ছিল, পিতা কোন কাজ অসমাপ্ত রেখে গেলে বা কোন ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে অথবা মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে তার সন্তানের ওপরে প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্ব দিয়ে যেতো। অধিক পুত্র সন্তান ছিল তাদের কাছে অহঙ্কার আর গৌরবের বিষয়।

আল্লাহর রাসূলের সবক'টি পুত্র সন্তান এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করলো। মক্কার ইসলাম বিরোধী লোকগুলো এ কথা ভেবে খুব খুশী হলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর ইসলাম শেষ হয়ে যাবে। কারণ তাঁর তো কোন পুত্র সন্তান নেই, পুত্র সন্তান থাকলে ইসলামী আদর্শকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতো। সুতরাং লোকটি বর্তমানে শেকড়হীন নির্বংশ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর রাসূলের প্রসঙ্গে কোথাও আলোচনা শুরু হলেই মক্কার ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দ মন্তব্য করতো, 'তাঁর কথা বাদ দাও, সে তো নির্বংশ হয়ে গিয়েছে। তাঁর কোন পুত্র সন্তানই নেই, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর নাম নেয়ার মতো আর কেউ এই পৃথিবীতে থাকবে না।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূলের সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করলে আবু জেহেলও ঐ একই মন্তব্য করেছিল। রাসূলের চাচা আবু লাহাবের বাড়ি আর রাসূলের বাড়ি ছিল পাশাপাশি। রাসূলের সন্তান ইন্তেকাল করলে ঐ কুখ্যাত ব্যক্তি দৌড়ে তার সাথীদের কাছে গিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জানালো, 'আজ রাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।'

আল্লাহর রাসূলকে আত্মীয়-স্বজন সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলো। তাঁকে বন্ধুহীন করা হলো। এমনকি তাঁর সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। পুত্র সন্তানগুলো একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো। তাঁর নাম উচ্চারণ করার মতো পৃথিবীতে কেউ আর রইলো না। তাঁকে যে আদর্শ প্রচার করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, সেই আদর্শের কথা শুনতে কেউ প্রস্তুত ছিল না।

এই অবস্থায় হতাশা আর ব্যর্থতা তাঁকে গ্রাস করার কথা। চরম করুণ এই অবস্থায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধুর মনে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করে তাঁকে জানালেন, আপনি হতাশ হবেন না, কে বলেছে আপনি অসহায়, নির্বংশ! আমি আপনাকে এমন নে'মাত দানে ধন্য করেছি যে, যা ইতোপূর্বে পৃথিবীর কোন মানুষকে দেয়া হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্তও দেয়া হবে না। আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।

কল্যাণ, বরকত, মঙ্গল ও নে'মাতসমূহের আধিক্য ও বিপুলতাকে বুঝানোর জন্য এই সূরায় কাওসার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে অসংখ্য নে'মাতের মধ্যে হাউযে কাওসারও দান করেছেন। হাওযে কাওসার সম্পর্কে হাদীসে এত অধিক বর্ণনা এসেছে

যে, এর যথার্থতা সম্পর্কে একবিন্দু সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হাউযে কাওসার সম্পর্কে ছেহা সিত্তাহ্ হাদীসের সমস্ত বর্ণনা গুলো একত্রিত করলে বিশাল একটি গ্রন্থ রচিত হবে। মৃত্যুর পরবর্তীতে জীবনে কিয়ামতের ময়দানে প্রচন্ড তৃষ্ণায় মানুষ যখন পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকবে, তখন সেই হাউযে কাওসার থেকে আল্লাহর রাসূল তাঁর অনুসারীদেরকে পানি পান করিয়ে পিপাসা নিবৃত্ত করবেন।

শুধু তাই নয়, জান্নাতেও তাঁকে কাওসার নামক একটি নহর দেয়া হবে। কিয়ামতের ময়দানে রাসূলের সমস্ত উম্মত প্রবল পিপাসায় কাতর হয়ে ছুটবে হাউযে কাওসারের দিকে। রাসূল সে সময়ে হাউযে কাওসারে মাঝখানে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকবেন। রাসূল সবার পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে পানি দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। এ সময় ঐ লোকগুলোকে দেখিয়ে রাসূলকে বলা হবে, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকগুলো আপনার আদর্শের সাথে বিরোধিতা করেছে, অনেকে আপনার আদর্শ বিকৃত করেছে এবং নতুন প্রথা উদ্ভাবন করেছে। রাসূল তখন সেই লোকগুলো তাড়িয়ে দেবেন।

হাউযে কাওসার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, জান্নাতের কাওসার নহর থেকে দুটো প্রবাহমান ধারা এনে হাউযে কাওসারের সাথে সংযোগ ঘটানো হবে। এর পানি দুধের বা বরফের অথবা রৌপ্য থেকেও শুভ্র দেখাবে, আরামদায়ক ঠান্ডা হবে এবং মিষ্টির দিক থেকে হবে মধুর থেকেও মিষ্টি। এই হাউযের নিচের মাটি হবে মিশ্কের সুগন্ধিযুক্ত। নিচের অংশে থাকবে মহামূল্যবান হীরা, জহরত ও মণিমুক্তা। এর ওপর দিয়েই অতুলনীয় স্বাদযুক্ত সেই পানি প্রবাহিত হতে থাকবে। এর দুই পাড় হবে স্বর্ণ নির্মিত।

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী ধারণা করতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র সন্তান নেই এবং তাঁকে গোটা আরব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। লোকজনকে তাঁর আদর্শ গ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর নাম নিশানা অচিরেই পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। তাদের এই ধারণা ও মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মহান আল্লাহ আলোচ্য সূরায় তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আপনার প্রতিপক্ষের যাবতীয় ধারণা মিথ্যা। তাদের কথার মূলে সততার কোন চিহ্ন নেই। তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং স্বকপোলকল্পিত। প্রকৃত বিষয় হলো আমি আপনাকে অগণিত নে'মাত দান করেছি। আপনাকে আপনি যতো নে'মাত দিয়েছি, সেই নেয়ামতের ক্ষুদ্র একটি অংশও কাউকে দেয়া হয়নি।

সর্বপ্রথম আপনার ভেতরে আমি এমন অনুপম গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছি, যা গত হয়ে যাওয়া কোন মানুষের ভেতরেও ছিল না এবং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো মানব সন্তানের আগমন ঘটবে, তাদের ভেতরেও দেয়া হবে না। আপনার চলা, বলা, কথা, হাঁটা, ওঠা-বসা, অঙ্গি-ভঙ্গি তথা আপনার যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য সমগ্র মানব সন্তানের থেকে পৃথক। এই ধরনের অনুপম ও অতুলনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য আমার পক্ষ থেকে কেউ লাভ করেনি। অতুলনীয় চারিত্রিক অলঙ্কারে আপনাকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। আপনাকে নবুওয়াত, কোরআন, উর্ধ্ব জগৎ ও পরকালীন জগতের জ্ঞানের মতো নে'মাত দেয়া হয়েছে। অতুলনীয় এক জীবন বিধান আপনাকে দেয়া হয়েছে। আপনার ভেতরে যাবতীয় বিষয়ে যে যোগ্যতা, কর্মকুশলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃঢ়তা, অতুলনীয় জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, সত্য আর মিথ্যাকে পার্থক্য করার সুক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি আপনাকে দেয়া হয়েছে।

রাসূলকে আল্লাহ তা'য়ালা এমন নে'মাত দান করলেন, যে নে'মাত সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তহীন, অতুলনীয়। তাঁকে এমন এক জীবন বিধান দান করা হয়েছে, যা মানব প্রকৃতির সাথে সাম

স্যপূর্ণ, বিজ্ঞান সম্মত, সহজে বোধগম্য এবং কালজয়ী। এই জীবন বিধান পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তার অতুলনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যসহ টিকে থাকার যোগ্যতা সম্পন্ন। পৃথিবীর প্রতি কোণে কোণে তাঁর নাম পরম শ্রদ্ধাভরে যেন উচ্চারিত হয়, সে ব্যবস্থা করেছেন।

প্রতিটি মুসলিম শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে এবং মৃত্যুর সময় তার কানে যেন বিশ্বনবীর নাম শোনানো হয়, সে ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা গোটা বিশ্বের মধ্যে এমন একটি ধর্মমত কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যে ধর্মের কোন একটি বিধি-বিধানকে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করার দুঃসাহস কিয়ামত পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারবে না। তাঁরই মাধ্যমে মহান আল্লাহ এমন একটি জাতি গোটা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন, যে জাতি আন্তর্জাতিক সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছে এবং এই জাতির লোকদের অপেক্ষা অধিক সৎ চরিত্রের ও উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন এবং সহনশীল-অসাম্প্রদায়িক, পরোপকারী, মানবতার কল্যাণকামী লোক পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির ভেতরে নেই।

আল্লাহর রাসূল তাঁর জীবিত কালেই নিজের চোখে দেখে ছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে কিভাবে অগণিত নেয়ামত দানে ধন্য করেছেন। সাহাবাগণের কাছ থেকে তিনি এমনভাবে সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করেছেন যে, তাঁর মুখের থু-থু, গায়ের ঘাম ও রক্ত, কুলি করা পানি মাটির স্পর্শে আসতে দেননি-উদরস্থ করেছেন, দেহে মালিশ করেছেন। তাঁকে অক্ষত রাখার জন্য সাহাবগণ তাঁর চারদিকে বুক পেতে দিয়ে নিজের বুকে অস্ত্রের আঘাত বরণ করেছেন। বর্তমানেও তাঁর অধিকাংশ অনুসারীরা তাঁর আদর্শ থেকে দূরে সরে গেলেও তাঁর নামটির প্রতি কেউ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে নিজের দেহের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে হলেও তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। তাঁর প্রচেষ্টায় যে উম্মত তিনি গড়েছিলেন, কয়েক শতাব্দী পরেও সেই উম্মত পৃথিবীর আনাচে কানাচে তাঁর নামের প্রসার ঘটাতে ব্যস্ত। এসবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দেয়া অগণিত নে'মাতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি।

আল্লাহর রাসূলের পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না, প্রতিপক্ষ ধারণা করেছিল তাঁর কোন বংশধর পৃথিবীতে নেই, সুতরাং তাঁর আদর্শ প্রচার ও প্রসার করার মতো কেউ থাকবে না এবং তাঁর বংশের বিস্তৃতিও ঘটবে না। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে পুত্র সন্তান উঠিয়ে নিলেও তাঁর বর্তমানে এবং অবর্তমানে এত অধিক সংখ্যক অনুসারী দান করেছেন যে, তারা নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও তাঁকেই বেশী ভালোবাসে। আর তাঁর এই অনুসারীরা পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাঁর জন্য নিজের প্রাণ বিলিয়ে দেয়ার জন্য সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে সদাপ্রস্তুত থাকবে।

এখানেই শেষ নয়, রাসূলের আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সন্তানদের বংশধরকেও তাঁরই বংশের সাথে মিলিত করে দিয়ে গোটা পৃথিবীতে তাঁদেরকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা টিকে থাকবে। প্রতিদিনের প্রতিটি প্রহরে গোটা পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে তাঁর ওপরে দরুদ পাঠ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ তাঁকে এভাবেই অমূল্য নে'মাত দান করে ধন্য করেছেন। এ জন্যই আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে নবী! আমি তোমাকে নে'মাতের কাওসার দান করেছি।'

এসব অগণিত নে'মাতের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে বলছেন, আপনাকে যখন এত অধিক নে'মাত দান করা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে কাউকে দেয়া

হয়নি, সুতরাং আপনাকে যারা উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে, আপনাকে নির্বংশ বলছে, আপনার কর্তব্য হলো তাদের বিপরীত পন্থা অনুসরণ করা। ওরা যে আদর্শ ও পন্থা অনুসরণ করার কারণে আপনাকে নির্বংশ বলছে, আপনি সেই আদর্শের ওপরে অটল থাকুন। আপনার রব্ব-এর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরবানী করুন। ওরা ওদের নিজের হাতে নির্মিত মূর্তির সামনে পশু বলি দিচ্ছে, তাদের সামনে মাথা নত করছে, আপনি তার বিপরীত করুন। আপনি আপনার রব-এর সামনে মাথানত করুন এবং রব-এর নামে কোরবানী করুন।

আল্লাহর রাসূলকে দ্বীনি আন্দোলন বিরোধী লোকগুলো নির্বংশ বলতো, তারা ধারণা করতো, রাসূলের নাম নেয়ার মতো এবং তাঁর আদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর মতো কোন মানুষ এই পৃথিবীতে থাকবে না। তারা বলতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেকড় কাটা বা নির্বংশ। এ জন্য আলোচ্য সূরার শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, 'পরিশেষে তোমার নিন্দুকরাই হবে শেকড়-কাটা-নির্বংশ।'

এই সূরার শেষের আয়াতে 'আবতার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে এই শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। যে গাছের শেকড় কাটা হয়েছে এবং এখন তা শুকিয়ে মারা যাবে, এ অবস্থাকেও 'আবতার' বলা হয়েছে। আল্লাহর নাম ও প্রশংসাসহ যে কাজ শুরু করা হয়নি, সে কাজকেও 'আবতার' বলা হয়েছে। কোন কাজে যে ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছে, তাকেও 'আবতার' বলা হয়েছে। যে লোকের জন্য ভালো কোন কিছু আশা করা যায় না এবং তার সফল হবার কোন আশাই নেই, তাকেও 'আবতার' বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়গণ এবং ঘনিষ্ঠ মহল পরিত্যাগ করেছে, তাকেও 'আবতার' বলা হয়েছে। আবার যে ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান নেই, তার মৃত্যুর পরে তার নাম বিকশিত করার মতো বা তার বংশধারা চালু রাখার মতো কেউ নেই, তাকেও 'আবতার' বলা হয়েছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মক্কার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী আল্লাহর রাসূলকে 'আবতার' বলতো।

ওদিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে তাদের ধারণার বিপরীত সংবাদই দিয়ে ভবিষ্যতে কারা আবতার হবে তা জানিয়ে দিলেন এবং রাসূলের জীবিত কালেই তা দেখিয়েও দিলেন–আবতার কারা হলো। ওরা রাসূলকে নির্বংশ, নিঃসঙ্গ মনে করেছিল, ধারণা করেছিল তাঁর আদর্শ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু মাত্র ১৩ বছরের মধ্যেই তারা দেখতে পেলো রাসূলের আদর্শ গ্রহণকারীদের একটি বিরাট দল তৈরী হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই আদর্শের প্রচার, প্রসার ও টিকিয়ে রাখার জন্য যে লোকগুলো প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছে, সেই লোকগুলো তাদেরই ভাই, বোন, চাচা, মামা এবং প্রাণপ্রিয় সন্তান। যারা রাসূলকে নির্বংশ বিশেষণে বিশেষিত করেছিলো, তারা দেখতে পেলো, বিরাট একটি দল প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে, যারা রাসূলের আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য যে কোন মুহূর্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং একটির আরেকটি যুদ্ধে ঐ লোকগুলো তার প্রমাণও দিয়ে দিলো।

নিবর্ংশ বিশেষণে তারা যাকে বিশেষিত করেছিল, মক্কার সেই ইয়াতিম বালকটি পরিণত বয়েছে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যখন মক্কা আক্রমণ করতে এলেন, তখন নির্বংশ বিশেষণ যারা দিয়েছিল, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা এমনকি মৌখিকভাবে সান্ত্বনা দেয়ার মতো একটি লোকও আরবে খুঁজে পাওয়া গেল না। ফলে বাধ্য হয়ে তারা নিতান্ত অসহায়ের মতো নির্বংশ বিশেষণ যাকে তারা দিয়েছিল, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে

হলো। এরপর তারা দেখলে তদানীন্তন পৃথিবীর মানচিত্রের সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার একচ্ছত্র শাসক হলেন ঐ লোকটি যাঁকে তারা শেকড় কাটা বলেছিল। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখতে থাকলো, গোটা পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্র থেকে আগত প্রতিনিধি দল কিভাবে আল্লাহর রাসূলের পদচুম্বন করে। ইসলামের সাথে যারা বিরোধিতা করে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবেই কালক্রমে তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে দিলেন।

বিষয়টি এখানেই শেষ হলো না। ইসলাম বিরোধিদের জন্য আরো বিস্ময়ের অপেক্ষা করছিল। আরবেরই শুধু নয়, আরবসহ আরবের বাইরের জগৎ থেকে দলের পরে দল লোক এসে ঐ লোকটির হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছিল, যে লোকটিকে তারা শেকড় কাটা বলেছিল। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য সূরায় রাসূলের নিন্দুক–ইসলাম বিরোধিদের ব্যাপারে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন, তা ক্রমশঃ বাস্তবায়ন করতে থাকলেন এবং এই ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

আবু জেহেল, আবু লাহাব, উমাইয়া ইবনে খালফ, উকবা ইবনে আবু মুয়ীত, উতাইবা, উম্মে জামীল প্রমুখ ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের বংশধর অবশ্যই পৃথিবীতে রয়েছে। কিন্তু এ কথা কারো বলার মতো হিম্মত নেই যে, আমরা অমুকের বংশধর। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের বংশধররা যেমন গৌরবের সাথে দাবী করে যে, আমরা অমুকের বংশধর। কিন্তু সে যুগের ইসলাম বিরোধী নেতাদের বংশধরদের মধ্যে এমন কারো সাহস নেই, যিনি বলবেন আমি আবু জেহেল বা আবু লাহাবের বংশধর।

ঘৃণিত লোকদের সাথে কারো সম্পর্ক রয়েছে, এই দাবী করা কেউ পছন্দ করে না। রাসূলের পর থেকে যারাই ইসলামের সাথে বিরোধিতা করেছে, দ্বীনি আন্দোলনকে এই যমীন থেকে উৎখাত করতে চেয়েছে, স্বয়ং তাদেরই নাম-নিশানা এই পৃথিবী থেকে মুছে গিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীর যে দেশে এবং যেখানেই আন্দোলনের সূচনা হয়েছে, সেই আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে আন্দোলনে আত্মনিবেদিত লোকদের ওপরে চলেছে পৈচাশিক নির্যাতন। কারাগারের অন্ধকার জীবনে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে। তারপরেও এই আন্দোলনের গতি রোধ করা যায়নি। যারা বিরোধিতা করেছে, বরং তারাই আবু জেহেল আর আবু লাহাবদের মতো ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে গিয়েছে এবং মুছে যেতে থাকবে। সূরা কাওসারে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী তাঁর অনুগত বান্দাহ্দেরকে মক্কার ইসলাম বিরোধিদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কথাগুলোই শিক্ষা দিয়েছেন।

সূরা আল-কাফিরুন

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–১০৯

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতে 'কাফিরুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সূরা অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কে মতভেদ বিরাজমান। কেউ বলেছেন এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, আবার কেউ বলেছেন, এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর কোরআনের অধিকাংশ গবেষকগণ এই সূরার মূল বিষয়বস্তু এবং আলোচিত বিষয়কে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে, এই সূরা মক্কায় নবুওয়াতের প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

মক্কায় দাওয়াতী কাজের সূচনাকালে প্রতিপক্ষ একে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। তাদের ধারণা ছিল, সময়ের ব্যবধানেই একদিন এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে, মানুষের মন থেকে ইসলাম নামক শব্দটিও মুছে যাবে। কিন্তু তাদের ধারণা ও বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করে রাসূলের আন্দোলন একটি পর্যায়ে উপনীত হলো, তখন প্রতিপক্ষ রাসূলের তৎপরতাকে তাদের জন্য হুমকি হিসাবে বিবেচনা করলো। প্রথমে তারা রাসূলকে বুঝিয়ে এই পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরে তারা শক্তি প্রয়োগ করে রাসূলকে বিরত করার চেষ্টা করলো। এতেও তারা ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধান্ত নিলো, কোন রকমে যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটা আপোষ করা যায়, তাহলে তাদের সম্মান যেমন রক্ষা হয় তেমনি তাদের শোষণমূলক আদর্শও টিকে থাকে। এই লক্ষ্যে তারা নানা ধরনের আপোষ ফর্মূলা নিয়ে রাসূলের দরবারে হাজির হতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, 'কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আল্লাহর রাসূলের কাছে এভাবে আপোষ ফর্মূলা নিয়ে এলো যে, আমরা আপনাকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করবো যেন আপনি সবথেকে ধনী হয়ে যান। আপনি যে মেয়েকে বিয়ে করতে চান আমরা তার সাথেই আপনাকে বিয়ে দেবো। আমরা আপনাকেই আমাদের নেতা নির্বাচন করে আপনার আনুগত্য করবো তবে একটি শর্ত হলো, আপনি আমাদের উপাস্য মাবুদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না। আমাদের এই প্রস্তাব আপনি মেনে নিতে অপারগ হলে বিকল্প প্রস্তাবও রয়েছে। যা আপনি গ্রহণ করলে আপনার জন্যও উত্তম হবে এবং আমাদের জন্যও উত্তম হবে।' আল্লাহর রাসূল তাদের বিকল্প প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তারা প্রস্তাব দিলো, আপনি পূর্ণ এক বছর আমাদের মা'বুদ লাত ও ওজ্জার পূজা-উপাসনা করবেন এবং এক বছর আমরাও আপনার মা'বুদের উপাসনা করবো।

আল্লাহর রাসূল তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, তোমাদের প্রস্তাবের ব্যাপারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কি সিদ্ধান্ত জানানো হয়, তা জানা প্রয়োজন।

রাসূলের পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের প্রস্তাব শুনতে চাওয়া এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ কি সিদ্ধান্ত জানান, সে ব্যাপারে তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলার অর্থ এটা নয় যে, তাওহীদের সাথে বোধহয় শিরকের সামান্যতম সহ-অবস্থানের কোন সুযোগ রয়েছে। প্রতিপক্ষ যে প্রস্তাব দিয়েছে, ইসলামের সাথে তার দূরতম সম্পর্ক নেই এবং তাদের প্রস্তাব নিয়ে কোন ধরনের আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না, এ কথা আল্লাহর রাসূলের ভালোভাবেই জানা ছিল। তিনি যদি সরাসরি না করে দিতেন, তাহলে প্রতিপক্ষ একের পর এক নানা ধরনের উদ্ভট প্রস্তাব দিয়ে যেতো এবং তাদের প্রস্তাবের ব্যাপারে আল্লাহ কি বলছেন, তা তারা বার বার জানতে

চাইতো। এ কারণে আল্লাহর রাসূল প্রথম সুযোগেই বিষয়টি আল্লাহর ওপরে ছেড়ে দিয়ে ইসলাম বিরোধিদের মুখ বন্ধ করে দিলেন। প্রতিপক্ষের এ ধরনের নানা প্রস্তাবের জবাব হিসাবেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরা অবতীর্ণ করে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, তারা যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই প্রস্তাব যারা নিয়ে এসেছিল, হয় তারা জেনে বুঝেই ঐ নিকৃষ্ট প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল অথবা মহান আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তারা কখনো এ কথা বুঝার চেষ্টাই করেনি যে, বিশ্ব-জাহানের প্রভু কত বিরাট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর এসব মূর্খ ও অজ্ঞ লোকজন যাদের মা'বুদের আসনের অংশীদার ও উপাস্য হওয়ার অধিকারী বানিয়ে বসে রয়েছে, তারা কত নিকৃষ্ট ও নগণ্য। এরা নিজেরা যে শিরকের মধ্যে লিপ্ত এবং সেই শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে তারা মুসলমানদেরও লিপ্ত করার অপচেষ্টা করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা যুমারের ৬৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলকে বলে দিলেন, আপনি তাদেরকে বলে দিন–হে মূর্খের দল! তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করতে বলো আমাকে?

দুনিয়া পূজারি ও ইসলাম সম্পর্কে নাদান কিছু ব্যক্তি এই সূরাটিকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টিকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষের সূরা বলে প্রচার করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সে ধরনের কোন ভাবধারাই এই সূরার মধ্যে নেই। ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছে একমাত্র মহান আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে। এই দাসত্বের মধ্যে অন্য কারো দাসত্বের কোন মিশ্রণ ঘটানো যাবে না এবং আল্লাহর দাসত্বের সাথে যদি অন্য কারো দাসত্বের মিশ্রণ ঘটানো হয়, তাহলে তা আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করবে না। এমন কোন কাজের অনুমোদন ইসলাম দেয় না, যে কাজের মধ্যে শিরকের নাম-গন্ধ রয়েছে। কারণ শিরক্‌কে ইসলাম সবথেকে বড় জুলুম হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং একে ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ্ হিসাবে বিবেচনা করেছে। যে কোন ধরনের শির্‌ক এবং অন্য কোন কিছুর পূজা-উপাসনা বা উপাস্য দেব-দেবীর সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেই এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

বিকৃত কোন ধর্মমত, তাওহীদের বিপরীত কোন চিন্তা-চেতনা, মতবাদ, মতাদর্শ এবং মানুষের বানানো আইন-কানুনকে পুরোপুরি বা আংশিক স্বীকৃতি দিয়ে ইসলাম তাকে নিজের পাশে স্থান দেবে, এই প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং কথাটি দ্বীনি আন্দোলনের সূচনাতেই প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল–মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরা অবতীর্ণ করে সেই প্রয়োজনই পূরণ করেছেন। সে যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা পৃথিবীর যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তারা যদি সংখ্যায় একজনও হয়, তবুও তাকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এই ঘোষণাই দিতে হবে যে, শিরকের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্যই আলোচ্য সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছে, হে সত্য অস্বীকারকারীর দল, সত্য গোপনকারী গোষ্ঠী! আমরা সেসবের গোলামী করি না, যাদের গোলামী তোমরা করো। আর না তোমরা তাঁর গোলামী করো, যাঁর গোলামী আমি করি। আমি তাদের দাসত্ব করতে মোটেও প্রস্তুত নই, যাদের দাসত্ব তোমরা করেছো। আর না তোমরা তাঁর দাসত্ব করতে প্রস্তুত যাঁর দাসত্ব আমি করি। তোমাদের আদর্শ, জীবন পরিচালনা পদ্ধতি, চিন্তা-চেতনা একান্তভাবেই তোমাদেরই, আর আমার জীবন বিধান একান্তভাবেই আমার।

❋

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে--

রুকূ ১

(১) (হে নবী) তুমি বলে দাও, হে কাফেররা, (২) আমি (তাদের) ইবাদাত করি না-যাদের ইবাদাত তোমরা করো, (৩) না তোমরা (তার) ইবাদাত করো-যার ইবাদাত আমি করি। (৪) আমি (তাদের) ইবাদাত করবো না-যাদের তোমরা ইবাদাত করো, (৫) না তোমরা কখনো (তার) ইবাদাত করবে-যার ইবাদাত আমি করি। (৬) (অতপর) তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে, আর আমার পথ আমার জন্যে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী যে আপোষ প্রস্তাব দিয়েছিল, মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরার প্রথম আয়াতে তাদেরকে যে শব্দে সম্বোধন করলেন, সেই শব্দের ভেতর দিয়েই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা তো দূরের কথা-ঐ ঘৃণ্য প্রস্তাব বিবেচনার যোগ্যই নয়। প্রথম আয়াতেই তাদেরকে 'কাফিরূন' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি গালি বিশেষ নয় এবং গালি হিসাবে তা ব্যবহৃতও হয় না। এর শাব্দিক অর্থ হলো, 'অমান্যকারী, সত্য গোপনকারী বা অবিশ্বাসী।' এখানে এই শব্দটি তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে মেনে নেয়নি এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আদর্শ উপস্থাপন করেছেন, তাও মেনে নেয়নি। প্রতিপক্ষ আল্লাহর রাসূলের কাছে যে আপোষ ফর্মূলা দিয়েছিল, তা বিবেচনাযোগ্যই নয় এবং রাসূল ও তাঁর অনুসারী এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে 'কাফিরূন' শব্দ দিয়ে শত যোজন একটি পার্থক্য রেখা আল্লাহ্ তা'য়ালা অঙ্কন করলেন। এই রেখা অতিক্রম করা কোন মুসলমানের পক্ষেই যে সম্ভব নয়, পরবর্তী আয়াতে 'আমি তাদের ইবাদাত করি না' বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়ে দেয়া হলো।

ইসলাম বিরোধিরা রাসূলের কাছে তাওহীদ ও শিরকের পাশাপাশি অবস্থান সম্পর্কে নানা আপোষ ফর্মূলা পেশ করতে থাকলো এবং রাসূল স্বয়ং তাদেরকে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে কি সিদ্ধান্ত আসে তা জানার জন্য তাদেরকে অপেক্ষা করতে বললেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আলোচ্য আয়াতে রাসূলকে উদ্দেশ্য করে 'বলে দিন' এই নির্দেশসূচক বাক্যের দ্বারা এ কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, যে সিদ্ধান্ত জানানো হচ্ছে, তা রাসূলের পক্ষ থেকে নয়-বরং তা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই জানানো হচ্ছে। কারণ স্রষ্টা ও প্রতিপালক রাসূল নন-স্বয়ং আমি আল্লাহ। সুতরাং আমার সৃষ্টি কেবলমাত্র আমারই সামনে মাথানত করবে,

অন্য কারো সামনে নয়-এই নির্দেশ দেয়ার অধিকারী আমার কোন সৃষ্টি নয়-স্বয়ং আমি আল্লাহ। সুতরাং আমি আল্লাহ স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছি, ঐ ধরনের ফর্মূলা যারা পেশ করছে এবং এ জাতিয় চিন্তা-চেতনায় যারা উদ্বুদ্ধ, তারা অবশ্যই সত্য গোপনকারী, অবিশ্বাসী তথা সত্য অমান্যকারী কাফির।

আমি যে রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁর প্রতি যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছি, তা যারা গ্রহণ করে না, অনুসরণ করতে আগ্রহী নয়, এর বিকল্প কিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারা অবশ্যই কাফির। আর এই কাফিরদের পথের সাথে মুমিনদের পথের কোন সাদৃশ্য থাকতে পারে না। এই দুই পরস্পর বিরোধী মত ও পথের ভেতরে কোনভাবেই সমঝোতা বা আপোষ হতে পারে না। সত্য আর মিথ্যা সন্ধি করে পাশাপাশি অবস্থান করবে, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মানুষকে আমি একটি সত্তা দিয়েছি, সেই সত্তা ক্ষণিকের জন্য আমার সামনে আত্মসমর্পণ করবে আবার পর মুহূর্তেই ভিন্ন কোন কিছুর সামনে নিজেকে নিবেদন করবে, এ ধরনের দ্বৈত দাসত্বকারী গোলামের আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আমার গোলাম কেবলমাত্র আমারই কাছে তার সত্তাকে নিবেদন করবে, আমার সামনেই আত্মসমর্পণ করবে।

আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম বিরোধিদেরকে এমন এক উপাধিতে সম্বোধন করেছেন, যা তাদের চারিত্রিক অবয়বকে প্রকাশ করে দিয়েছে এবং তাদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। এই 'কাফিরুন' উপাধি প্রয়োগ করে এ কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, দুই পরস্পর বিরোধী চিন্তা-চেতনা, আকিদা, বিশ্বাস, মতবাদ-মতাদর্শের মধ্যে কোনভাবেই আপোষ হতে পারেনা। ইসলাম ও কুফর তথা তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে এতো বিরাট ব্যবধান যে, এ দুয়ের মিলনের জন্য মাঝখানে কোন সেতুবন্ধ রচনা করা কারো পক্ষেই কখনো সম্ভব নয়। নবী-রাসূলগণ তাওহীদের যে সংজ্ঞা পেশ করেছেন, তা শিরকমুক্ত একত্ববাদের পথ। তাওহীদ এক স্বতন্ত্র চলার পথ এবং শিরক এক ভিন্ন গতির পথ। মানব প্রকৃতি ও জীবনধারার মধ্যেই এই দুই পরস্পর বিরোধী মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটানো তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রের গমন।

তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। মানব প্রকৃতিতে তাওহীদ বিশ্বাস এমন এক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, যা মানুষের সমগ্র জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির চিন্তা, চেতনা, প্রত্যয়, মূল্যবোধ, অনুভূতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসননীতি ইত্যাদি তাওহীদের আলোকে ও প্রভাবেই পরিচালিত হয়। তাওহীদ বিশ্বাসী ব্যক্তির জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ তাওহীদের আলোকেই হয়ে থাকে। তাওহীদ বিশ্বাসী মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার প্রদর্শিত পথকেই নিজের জীবন পদ্ধতি হিসাবে নির্বাচিত করে এবং তাওহীদ ভিত্তিক জীবনাদর্শের প্রতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তার প্রকাশ্য বা গোপন সকল পর্যায়ের কর্মকান্ড তাওহীদের নূরের মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সুতরাং তাওহীদের সাথে বিন্দুমাত্র শিরকের সংমিশ্রণ তাওহীদের অনুসারীগণ বরদাশ্ত করতে পারে না এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সেই ঘোষণা আপোষহীন ভাষায় এভাবেই দেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে, 'তুমি বলে দাও-হে কাফিররা, আমি তাদের ইবাদাত করি না-যাদের ইবাদাত তোমরা করো, না তোমরা তার ইবাদাত করো-যার ইবাদাত আমি করি। আমি তাদের ইবাদাত করবো না-যাদের তোমরা ইবাদাত করো, না তোমরা কখনো ইবাদাত করবে-যার ইবাদাত আমি করি। তোমাদের পথ তোমাদের জন্যে, আর আমার পথ আমার জন্যে।'

একমাত্র তাওহীদের অনুসারীরা ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য জাতি এবং কাফির মুশরিকরা আবহমান কাল থেকে যেসব জিনিসকে মা'বুদ হিসাবে কল্পনা ও তাদেরকে শক্তির উৎস মনে করে পূজা-উপাসনা করে আসছে। এসবের সাথে মুসলমানদের কোন প্রকার সংশ্রব নেই। ওরা যেসব মা'বুদের পূজা-আরাধনা করে, এসব মা'বুদকে তারা বড় মা'বুদের প্রতিনিধি মনে করে। আল্লাহ তা'য়ালাকে তারা মা'বুদ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বলে যে, আমরা এই ছোট্ ছোট মা'বুদের পূজা-আরাধনা করি এ জন্য যে, এদের মাধ্যমে আমরা স্বয়ং বড় মা'বুদ তথা আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চাই। কারণ স্বয়ং বড় মা'বুদ তার ক্ষমতাকে ছোট মা'বুদদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন মা'বুদকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। কারো হাতে ধন-ভান্ডারের চাবি দেয়া হয়েছে, কাউকে দেয়া হয়েছে বিপদ থেকে ত্রাণকারীর দায়িত্ব। আবার কাউকে দেয়া হয়েছে রোগ-ব্যাধি-জ্বরা সম্পর্কিত দায়িত্ব।

এই ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে তাদের মধ্যে কেউ সন্তান লাভের জন্য বিশেষ কোন মা'বুদের সামনে মাথানত করে, মাজারে গিয়ে মানত করে, জ্বিনের সাহায্য কামনা করে। ধন-দৌলত বা ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য বিশেষ কোন মূর্তির পূজা করে। রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য কারো নামে পূজা দেয়। বন-জঙ্গলে গিয়ে কোন বিশাল বৃক্ষের পূজা করে। এভাবে অগণিত মা'বুদের পূজা-উপাসনা করে থাকে তাওহীদের বিপরীত আদর্শের অনুসারীরা। এরা মনে করে মহান আল্লাহ হলেন সমস্ত মা'বুদ ও রব্ব-দের মধ্যে সবার চেয়ে বড়। ইতিহাসে দেখা যায়, আবু জেহেল বদরের যুদ্ধে যাবার সময় কা'বাঘরের গেলাফ ধরে বলেছিল, 'ইয়া রাব্বুল আরবাব' অর্থাৎ হে ছোট খোদাদের বড় খোদা।' যুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করো।

সুতরাং তারা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিল না। তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল কিন্তু সে বিশ্বাস ছিল শিরক্ মিশ্রিত। তারা আল্লাহ তা'য়ালার সাথে শিরক্ করতো। আমরা সূরা আসরের তাফসীরে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীসহ তাঁর ওপরে ঈমান আনতে হবে। একমাত্র তাঁকেই যাবতীয় শক্তির উৎস ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে, একমাত্র তাঁর সামনেই মাথানত করতে হবে এবং যে কোন ব্যাপারে তাঁরই ওপরে নির্ভর করতে হবে, তাঁরই কাছে আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করতে হবে আর এটার নামই তাওহীদ।

আল্লাহর কোরআনের ঘোষণানুসারে তাওহীদপন্থীদের দৃষ্টিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র মা'বুদ, তিনি অসংখ্য মা'বুদদের মধ্যে বিশেষ একজন মা'বুদ নন। এ জন্য একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে, তাঁর ইবাদাতের মধ্যে অন্য কারো ইবাদাত বিন্দুমাত্র শামিল থাকবে না। মানুষ কেবলমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো ইবাদাতের সংমিশ্রণ ঘটাবে না, এই নির্দেশই মানুষকে দেয়া হয়েছে।

(বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি' শিরোণাম থেকে 'ইবাদাত শব্দের ভুল ব্যাখ্যা' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

সূরা ফাতিহার ৪ নম্বর আয়াতে মানুষকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, তারা কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত তথা দাসত্ব করবে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করবে। সূরা আল বাইয়্যেনার ৫ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে, মানুষ তাদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করে নেবে। সূরা নেছার ১৪৬ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে, 'একমাত্র আল্লাহর জন্যই দ্বীনকে খালেস করে নেবে।' নিজের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে নেয়ার অর্থ হলো,

মানুষ একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাথে তার আনুগত্য যুক্ত হবে না। নিজের সমস্ত আগ্রহ, উৎসাহ, আকর্ষণ, ভক্তি, ভালোবাসা সমস্ত কিছুই আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করবে। আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য ত্যাগ করা যায় না এমন কোন জিনিসের সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করবে না।

সূরা আল আ'রাফের ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমার রব্ব তো ইনসাফ ও সত্যতার আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁরই আদেশ এই যে, তোমরা প্রতিটি ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকো নিজের দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে।' মানুষ ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিজের লক্ষ্য স্থির রাখবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগীর একবিন্দু অংশও যেন তার ইবাদাতের সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। প্রকৃত মা'বুদ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আনুগত্য, দাসত্ব, বিনয় ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা যেন কিছুতেই মনে স্থান না পায়। পথপ্রদর্শন, সাহায্য ও মদদ এবং সংরক্ষণ এবং হেফাজত লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে।

কিন্তু এ জন্য শর্ত এই যে, এসব বিষয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, তাকে নিজের দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য খালেস করে নিতে হবে। জীবনের সমগ্র ব্যবস্থা চলবে কুফর, শিরক ও নাফরমানী এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তিসমূহের দাসত্বের ভিত্তিতে আর সাহায্য চাওয়া হবে আল্লাহর কাছে এমন যেন না হয়। কারণ এভাবে চাওয়ার অর্থ এটাই হবে যে, 'হে পরোয়ারদেগার! আমরা তোমার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছি, এখন বিজয়ের জন্য তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো।'

সূরা যুমারের ২ আয়াত থেকে শুরু করে ১৫ আয়াত পর্যন্ত বেশ কয়েক স্থানে বলা হয়েছে, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করো, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই খালেস করো, সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য, হে নবী এদেরকে বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করি। বলে দাও, আমি আনুগত্যসহ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই দাসত্ব করবো।' দ্বীনকে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্ব করার অর্থ হলো, আল্লাহর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং শুধু তাঁরই পূজা করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তাঁরই আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করবে। মানুষের উচিত হলো দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর বন্দেগী ও দাসত্ব করা। কারণ নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহর অধিকার। অন্য কথায় বন্দেগী ও দাসত্ব লাভের মতো অন্য কেউ নেই। সুতরাং আল্লাহর সাথে তাঁর পূজা-অর্চনা করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুনের আনুগত্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কেউ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো একনিষ্ঠ ও অবিমিশ্র দাসত্ব করে তাহলে সে মারাত্মক অন্যায় কাজ করে। অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহর দাসত্বের সাথে সাথে অন্য কারো দাসত্বের সংমিশ্রণ ঘটায় তাহলে সেটাও প্রত্যক্ষভাবে ন্যায় ও সত্যের পরিপন্থী। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নাম-যশ অর্জনের আশায় অর্থ-সম্পদ দান করি। এ ব্যাপারে কি আমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে? আল্লাহর রাসূল বললেন, দেয়া হবে না। লোকটি পুনরায় জানতে চাইলো, আমাদের উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করা এবং পৃথিবীতে প্রশংসা লাভ করা, দুটোই থাকে তাহলেও কি পুরস্কার দেয়া হবে না? রাসূল বললেন, কোন কাজ যতক্ষণ না আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে হতে ততক্ষণ তিনি তা গ্রহণ করেন না।

পৃথিবীতে তাওহীদের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং তা হয়েছে। কিন্তু শিরকের ব্যাপারে আবহমান কাল থেকেই কখনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত কখনো হবেও না। কোন্ কোন্ সত্তা বা শক্তি আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে পৃথিবীর মুশরিকরা কখনো একমত হতে পারেনি। কারো কাছে কোন দেবতা বা দেবীরা এর মাধ্যম। কিন্তু তাদের মধ্যেও সব দেব-দেবী সম্পর্কে ঐকমত্য নেই। মাজারের ব্যাপারেও কোন ঐকমত্য নেই। কেউ মনে করে অমুক মাজার, কেউ মনে করে অমুক বোযর্গ, কেউ মনে করে অমুক গ্রহ আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম। কিন্তু এসবের মধ্যেও কার কি মর্যাদা এবং আল্লাহর কাছে পৌঁছার মাধ্যম সে ব্যাপারে তারাও পরস্পর একমত নয়। কারো মতে মৃত মহাপুরুষগণ এর মাধ্যম। কিন্তু এদের মধ্যেও অসংখ্য ভিন্নমত বিদ্যমান। কেউ একজন মহাপুরুষকে মানলে আরেকজন অপর একজনকে মানছে।

এর কারণ হলো, ভিন্ন ভিন্ন এসব মহাপুরুষ সম্পর্কে তাদের এই ধারণা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কোন তালিকাও আসেনি যাতে বলা হয়েছে, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত। সুতরাং আমাকে পেতে হলে তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করো। এটা বরং এমন এক আকীদা–যা কেবল কুসংস্কার ও অন্ধভক্তি এবং পুরনো দিনের লোকদেরকে যৌক্তিক এবং অন্ধ অনুসরণের কারণে মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। এ কারণেই শিরককারী মুশরিকদের মধ্যে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

সুতরাং ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ হলো, মহান আল্লাহর ইবাদাতের সাথে অন্য কারো ইবাদাতের সামান্যতম সংমিশ্রণ ঘটানো যাবে না। মুসলিম শরীফের একটি হাদীস-হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেন–মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যে কোন ধরনের শরীক থেকে আমি সর্বাধিকভাবে বিমুখ। কেউ যদি এমন আমল করে যাতে আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, আমি সেই আমল থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।'

সুতরাং যে কোন ধরনের শিরক থেকে নিজেকে মুক্ত করে একমাত্র তাওহীদের আনুগত্য করার ঘোষণাই এই সূরায় দেয়া হয়েছে। শেষের আয়াতে চূড়ান্তভাবে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে, 'তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্যে, আর আমার দ্বীন আমার জন্যে।'

তোমরা যেসব মা'বুদের দাসত্ব করছো, আমি তোমাদের মা'বুদের দাসত্ব বা গোলামী করতে পারি না। তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরষরা যার যার পূজা-উপাসনা করেছো, তার পূজারী হওয়া তাওহীদের অনুসারীদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর অধিক সংখ্যক মা'বুদের পূজা-উপাসনা পরিত্যাগ করে এক ও একক মা'বুদের ইবাদাত গ্রহণ করার ব্যাপারে তোমাদের মনে যে বিতৃষ্ণা ও অনমনীয়তা দেখা যাচ্ছে তাতে তোমরা নিজের ভ্রান্ত ইবাদাত থেকে বিরত হবে এবং আমি যে আল্লাহর ইবাদাত করি তাঁর ইবাদাত তোমরা করবে, এই আশা তোমাদের ব্যাপারে পোষণ করা যায় না। সুতরাং তোমাদের পথ এবং আমাদের পথ কখনো একই মোহনায় মিলিত হতে পারে না। জাহিলিয়াতের সবটাই জাহিলিয়াত আর ইসলামের সবটাই ইসলাম, সুতরাং এ দুয়ের কখনো সহ-অবস্থান হতে পারে না এবং পরস্পরে হাত ধরাধরি করে চলতেও পারে না।

ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম নামক ঘরে প্রবেশ করতে হলে জাহিলিয়াতের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেই তবে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। ইসলামের কতিপয় বিধি-বিধানও

অনুসরণ করা হবে এবং জাহিলিয়াতেরও কিছু বিধি-বিধান অনুসরণ করা হবে তথা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা হবে, এই অবকাশ ইসলাম কাউকে দেয়নি। মুসলমান নামধারী এক শ্রেণীর নাদান ব্যক্তিবর্গ এই সূরার লাকুম দ্বীনুকুম অলিয়াদ্বীন–আয়াতকে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। তাদের জেনে রাখা উচিত এ আয়াত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দলীল নয়–বরং যার যার ধর্মের পক্ষে থাকার শ্রেষ্ঠ দলীল। তাছাড়া দুনিয়ার সকল মোফাস্‌সিরীন ও মুহাদ্দিসীন একমত যে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কোরআনের দৃষ্টিতে একটি কুফ্‌রি মতবাদ। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তথা পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনে শরীক হতে পারেনা। কারণ এ মতবাদ ঈমানকে খন্ডিত করে।

এ ব্যাপারে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ঘোষণা বলবৎ থাকবে যে, খন্ডিতভাবে ইসলাম অনুসরণ করা যাবে না বা ব্যক্তি জীবনে ইসলামের নামাজ-রোজা-হজ্জ-এর বিধান পালন করা হবে, আর সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে জাহিলিয়াতের বিধান অনুসরণ করা হবে, এই সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে দেননি। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন। এ দুয়ের সংমিশ্রণ, সহ-অবস্থান, সন্ধি, পরস্পর তাল মিলিয়ে চলার কোন পথ উন্মুক্ত নেই।

মুসলমানদের দ্বীন হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক দ্বীন এবং এর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আইন-বিধান, আকীদা-বিশ্বাস তথা জীবনের সামগ্রিক দিক সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর দেয়া বিধানের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে শিরকের কোন নাম-গন্ধও নেই। এর কোন একটি পর্যায়ে বা স্তরে শিরকের কোন মিশ্রণ নেই এবং শিরকের প্রতি সামান্যতম নমনীয়তাও নেই। সম্পূর্ণ শিরকের পঙ্কিলতা মুক্ত এক পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থার সাথে শিরকের বিন্দুমাত্র আপোষ হতে পারে না–এ জন্য চিরস্থায়ীভাবে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের পথ তোমাদের জন্য আর আমার পথ আমার জন্য। তোমরা যে জীবনধারা অনুসরণ করছো, তা একান্তভাবেই তোমাদের জন্যই, আর আমরা যে জীবনধারা অনুসরণ করছি, তা একান্তভাবেই আমাদেরই জন্য। এর ভেতরে আপোষ করার কোন সুযোগই নেই।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) যখন আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে (ও বিজয়) আসবে, (২) তখন (তুমি দেখবে) মানুষরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে, (৩) অতপর তুমি তোমার মালিকের প্রশংসা করো এবং তাঁর কাছেই ইস্তিগ্ফার করো, অবশ্যই তিনি পরম ক্ষমাশীল।

সূরা আন–নাসর

মদীনায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–১১০

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এই সূরার প্রথম আয়াতের 'নাছর' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, রাইসুল মোফাচ্ছিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'এই সূরা পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ সূরা। এরপর অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা আল্লাহর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ হয়নি।' তিরমিজী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, 'এই সূরাটি বিদায় হজ্জের কালে আইয়ামে তাশরিকের সময়ে মীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর আল্লাহর রাসূল নিজের উটনীর পিঠে আরোহণ করে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষন দিয়েছিলেন।'

হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই সূরার পরে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সবশেষে আল্লাহর রাসূলের ওপরে কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সম্পর্কে মত পার্থক্য বিরাজমান। গবেষক এবং ঐতিহাসিকগণ বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়া এবং আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের মাঝে ব্যবধান হলো তিন মাস কয়েক দিন। ইতিহাসেও প্রমাণ পাওয়া যায়, বিদায় হজ্জ এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের মাঝে ব্যবধান হলো তিনমাস কয়েক দিন। নাসায়ী শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, এই সূরাটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন, 'আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আমার জীবনকাল পূর্ণ হয়ে এসেছে।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, উম্মাহাতুল মুমেনীন হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, এই সূরাটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এই বছর আমার ইন্তেকাল হবে।' এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কেঁদে উঠলেন। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আমার

বংশধরদের মধ্যে তুমিই আমার সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হবে।' রাসূলের কথা শোনার পরে হযরত ফতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার পবিত্র ওষ্ঠ প্রান্তে জান্নাতী হাসি ফুটে উঠলো।

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বিখ্যাত এবং বয়স্ক ও সম্মানিত লোকদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলে আমাকেও আহ্বান করতেন। আমার বয়স অল্প হেতু ব্যাপারটা অনেকেই পছন্দ করতেন না। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন বলেই ফেললেন, 'আমাদের সন্তানগণ তো এই ছেলেরই সমান, তাহলে একে বিশেষভাবে এই বৈঠকে আহ্বান করা হয় কেন ?'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখন বললেন, 'জ্ঞানের দিক থেকে এই ছেলের সম্মান এবং মর্যাদা তো আপনারা জানেন।' পরে তিনি একদিন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বয়স্ক লোকদেরকে আহ্বান করলেন। আমাকেও তাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে বলা হলো। আমি বুঝলাম কেন আমাকে তাদের মাঝে ডাকা হয় এটা দেখানোর জন্যই হযরত ওমর আমাকে ডেকেছেন। বৈঠকে কথাবার্তা চলছিল এমন সময় ওমর ইবনে খাত্তাব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা সূরা নাসর সম্পর্কে কি বলেন ? কেউ বললেন, 'যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ও আমাদের বিজয় লাভ হবে তখন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করবো ও ক্ষমা প্রার্থনা করবো, এই সূরায় এই নির্দেশই আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।' আরেকজন বললেন, 'এর অর্থ শহর নগর ও দূর্গসমূহ জয় করা।'

অন্য সবাই নীরব থাকলেন। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমাকে বললেন, 'হে ইবনে আব্বাস ! তোমার মতামত কি এদের মত ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে তোমার মতামত বলো।' আমি বললাম, 'এই সূরায় আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের সংবাদ দেয়া হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য এলে এবং বিজয় লাভ হলে তখন বুঝতে হবে, তাঁর জীবনকাল পূর্ণ হয়ে এসেছে। এরপর তিনি যেন আল্লাহর প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।' এ কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'তুমি যা বললে, এ ছাড়া আমিও অন্য কিছুই জানিনা।'

সূরা নাসরের নাজিল কাল সম্পর্কে কেউ কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আল ওয়াকেদী আসবাবুন্নুযুল গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই সূরা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের দুই বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল।' ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ) ও ইমাম যুরকানী (রাহ) আল ওয়াকেদীকে সমর্থন করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়্যেম (রাহ) তাঁর 'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'হিজরী দশ সালে ঠিক আইয়ামে তাশরীকের দিন এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিলা।' ইমাম সুয়ূতী (রাহ) তাঁর মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে বলেছেন, 'এই সূরাটি মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই অবতীর্ণ হয়েছিল।'

যাই হোক, এই সূরা অবতীর্ণ হবার সাথে সাথেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুভব করেছিলেন, তাঁর প্রিয় বন্ধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবার তাঁকে কাছে ডাকছেন। পৃথিবীতে তিনি যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন, তা পূর্ণ হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যে জীবন বিধানের প্রয়োজন ছিল, সে জীবন বিধান পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এবার তাঁর দায়িত্ব হলো জীবনের অবশিষ্ট ক'টা দিন আল্লাহর প্রশংসা করা আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল বলেছেন, নবী

রাসূলদেরকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তাঁরা কি মৃত্যুকে কবুল করবে না পৃথিবীর জীবনকে অগ্রাধিকার দান করবে।' সুতরাং নবী এবং রাসূলগণ পৃথিবীর জীবন থেকে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যই প্রাধান্য দান করেছেন।

এ সূরায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূলকে জানিয়ে দিলেন, কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যখন পূর্ণতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে এবং আন্দোলন সফলতা অর্জন করবে, বিপুল সংখ্যক মানুষ দলে দলে ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকবে, তখন এ কথাই উপলব্ধি করতে হবে, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য আপনাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব আপনি আপনার বন্ধু আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্যে গমন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এরপরই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, আপনি আপনার ওপরে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন, এখন আপনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আপনার রব-এর হামদ ও তাসবীহ করতে থাকুন। তাঁর তাসবীহ এ জন্যই করবেন যে, একমাত্র তাঁরই অসীম অনুগ্রহে আপনি পৃথিবীতে এক বিশাল বিপ্লব সাধন করেছেন, কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বিজয়ের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন আপনি আপনার রব-এর কাছে ইস্তিগ্ফার করতে থাকুন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন, এর মানে এই নয় যে, তাঁর ওপরে নবুওয়াত ও রেসালাতের যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল-তা পালনে তিনি অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন অথবা কোন ভুল-ভ্রান্তি করেছেন। বরং এর মানে হলো, মালিকের প্রতি অনুগত বান্দার বিনয় প্রকাশ করা বা ক্ষমা প্রার্থনা করাও ইবাদাত। দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, আন্দোলনের ময়দানে তাঁকে ও তাঁর প্রিয় সাথীদেরকে সীমাহীন যন্ত্রণা আর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এখন সেই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হয়েছে। তিনি তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষম ছিলেন। একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার অসীম অনুগ্রহেই তিনি সফলতা অর্জন করেছেন। এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বশেষ স্তরে উপনীত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো মালিকের প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও তাঁর প্রতি সীমাহীন বিনয় প্রকাশ করেই অতিবাহিত করতে হবে–এই আদেশই মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে দিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীর যে কোন ভূখন্ডে যখন কোন বিপ্লব সাধিত হয়েছে, কোন পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, কোন আন্দোলন বিজয়ী হয়েছে, কোন মতাদর্শ বা মতবাদ বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েছে, তখন বন্যার স্রোতের মতোই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে বিজয় উৎসব পালন করা হয়েছে এবং বর্তমানেও করা হয়। বিপ্লবের যিনি নায়ক বিপুল অর্থ ব্যয় করে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে তাকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। শুধুমাত্র বিপ্লবের নায়ককেই নয়, তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং নিকটাত্মীয়দেরকেও প্রচার মাধ্যমে উত্থাপন করে তাদের গুণগান গাওয়া হয়। দেশের কবি-সাহিত্যিকগণ নানাভাবে তার জীবনী অঙ্কন করে বিশালাকের গ্রন্থ রচনা করে, তাকে কেন্দ্র করে অগণিত পংক্তিমালা রচনা করা হয়। সংবাদ পত্রগুলো তার ওপরে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। বিপ্লবের মহানায়ক ও তার সঙ্গী-সাথীদের গুণগান এমনভাবে প্রচারিত হতে থাকে যে, সাধারণ জনগণ তা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে গোটা দুনিয়ার মানুষ এর বিপরীত চিত্রই দেখতে পেলো। আত্মপ্রচার, বিজয়ের গৌরব ও অহঙ্কারের কোন চিহ্ন

কোথাও নেই। রয়েছে শুধু বিনয় আর নম্রতা, লাজনম্র কণ্ঠে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ইতিপূর্বে পৃথিবীর ইতিহাস ও মানচিত্রে আল্লাহর রাসূলের অনুরূপ বিপ্লব কেউ সংঘটিত করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্তও কেউ সক্ষম হবে না। মাত্র তেইশ বছর আন্দোলন করে তাওহীদ ভিত্তিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধর্মমত, একটি জাতি, একটি রাষ্ট্র এবং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন কোন বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তখন সেখানে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। রাশিয়ায় ১৯১৭ সনে অক্টোবরে বলশেভিক বিপ্লবের সময় জার সরকারের কুকুরটিকে পর্যন্ত হত্যা করেছিল বলশেভিকরা। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের মাত্র দশ বছরের রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই বিশাল এলাকা ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার কালে মুসলিম বাহিনীর হাতে প্রতিপক্ষের মাত্র ২৫১ জন নিহত হয়েছিল আর ১২০ জন মুসলিম মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছিলেন। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে সন্ধান করলেও মানুষের প্রাণের প্রতি এমন বিরল সম্মান প্রদর্শনের একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আল্লাহর রাসূল মাত্র তেইশ বছর আন্দোলন করে একটি জাতির চিন্তা-চেতনা, আকিদা-বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি-দৃষ্টিকোণ, সভ্যতা-সাংস্কৃতি, নৈতিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিকতা, পারিবারিক নীতি, যুদ্ধনীতি, তাদের স্বভাব-চরিত্র এবং অভ্যাস ও রুচি তথা একটি জাতির প্রতিটি দিকে যে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। একটি অসভ্য, মূর্খ, বর্বর, নীচ, হিংস্র, প্রতিশোধ পরায়ণ, মায়া-মমতাহীন, নিষ্ঠুর-নির্মম চরিত্রের অধিকারী জাতিকে ওহী ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত করে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে যাবতীয় দিকে এমন যোগ্য করে গড়ে ছিলেন যে, গোটা বিশ্বের সম্মান ও মর্যাদার আসন তাঁরা লাভ করেছিল এবং বিশ্বের নেতৃত্ব তাদের পায়ে চুম্বন করেছিল। মাত্র তেইশ বছরে তিনি যে যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তৈরী করেছিলেন, বর্তমান বিজ্ঞানের হিরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীর প্রশংসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একযোগে প্রচেষ্টা চালিয়েও তাঁদের অনুরূপ একজন মানুষও কিয়ামত পর্যন্তও ঐ শিক্ষা ব্যতীত গড়তে সক্ষম হবে না।

দুনিয়া কাঁপানো এত বড় বিপ্লব যিনি সাধন করলেন, তিনি বিজয় উৎসবের ধারে কাছেও গেলেন না। বিজয়ীর হাসিও তিনি তাঁর জীবনের এক অসতর্ক মুহূর্তেও হাসলেন না। গৌরব করার মতো একটি শব্দও তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নির্গত হলো না। পৃথিবী সেদিন অবাক বিস্ময়ে দেখেছে, যেদিন আল্লাহর রাসূল মক্কা বিজয় করলেন। আল্লাহর রাসূল মক্কা বিজয়ের সময় যে উটে বসেছিলেন, তাঁর পেছনে বসেছিলেন মূতার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত হযরত যায়িদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সন্তান হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-যিনি ছিলেন ক্রীতদাস পুত্র । রাসূলের পবিত্র মাথা মোবারকে এ সময় ছিল লোহার শিরস্ত্রাণ। আল্লাহর রাসূল বিজয়ী হতে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মাথা মোবারক ক্রমশ সিজ্‌দায় চলে যাচ্ছে। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, এ সময় রাসূলের পবিত্র মাথা মোবারক মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার ভারে এতটাই নুয়ে পড়েছিল যে, তাঁর পবিত্র দাড়ি মোবারক উটের শরীরের সাথে স্পর্শ করছিলো।

আহা! ঐ বিলালের ওপরে কি নিষ্ঠুর নির্যাতনই না করেছে মক্কার নিষ্ঠুর কাফেররা। তাঁর পবিত্র শরীরের গোস্ত আর রক্ত মক্কার পথে প্রান্তরে ছিটকে পড়েছে। তিনিও নবীর সাথে আছেন। কিন্তু তাঁর মনেও নেই কোন প্রতিশোধের সামান্যতম স্পৃহা। প্রতিটি সাহাবার চোখে মুখে

মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। গোটা বিশ্বের কোন নেতা বা কোন বিজয়ী বাহিনীর এমন কোন ইতিহাস নেই, তারা বিজিত এলাকায় ক্ষমা আর করুণার মালা নিয়ে প্রবেশ করেছে। শুধু মাত্র ব্যতিক্রম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীরা। ক্ষমা আর করুণার সাগরে প্রাণের শত্রুও অবগাহন করেছে।

আল্লাহর রাসূল মক্কা জয়ের পর মুহূর্তেই উপস্থিত জনমন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষনের সমাপ্তিতে সামনে দন্ডায়মান জনতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর পবিত্র সুন্দর চোখ দুটো যেন করুণার সিন্ধুর মতই হয়ে এলো। তিনি দেখলেন, ভীত-বিহ্বল ঐ লোকগুলো তাঁর মুখের দিকে আজ একান্ত অসহায়ের মতই এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখের ভাষায় ফুটে উঠেছে অসহায়ত্ব আর ক্ষমার আকুতি।

নির্যাতিত নবী দেখছেন, ঐ তো-ঐ লোকগুলোর সাথেই তারা মিলে মিশে আজ একাকার হয়ে তাঁর সামনে বসে আছে, যে লোকগুলোকে সত্য গ্রহণের অপরাধে তারা জ্বলন্ত আগুনের ওপরে চিৎ করে শুইয়ে বুকের ওপর পাথর চাপা দিয়েছে। হযররত বিলালের গলায় রশি পরিয়ে কাঁটা ও পাথরের ওপর দিয়ে টেনে হিচ্ড়ে নিয়ে গেছে, বিলালের শরীরের গোস্ত চামড়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। খাব্বাবের শরীরে এখনো সে ক্ষত দগদগ করছে। শিয়াবে আবু তালিবে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। ঐ তো সেই লোকগুলো। অনাহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁর প্রিয় খাদিজা ঐ যে ভেঙ্গে পড়লেন, তাঁর আশ্রয়দাতা চাচা আবু তালিব ভেঙ্গে পড়লেন, আর উঠতে পারলেন না। আবু জেহেলকে সহযোগিতা দিয়ে সুমাইয়াকে যারা হত্যা করেছিল, তারাও তো সামনেই আতঙ্কিত চেহারায় দন্ডায়মান।

তাঁর প্রিয় চাচা হামজার কলিজা যারা চিবিয়ে ছিল, তারাও দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজে বসে আছে। তাঁর গর্ভবতী মেয়ে যয়নবকে আঘাত করে উটের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়ে গর্ভের সন্তানকে হত্যা করেছিল, তারাও বসে আছে। তাঁকে যারা সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে তারাও মাটির দিকে চোখ দিয়ে বসে আছে। তাঁকে যারা হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল, তাঁর সেই প্রাণের শত্রুও অবনত মস্তকে বসে আছে। বদর ওহুদ খন্দকে যারা রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, তারাও তাঁর সামনে বসে আছে। রাসূল তাদের দিকে তাঁর করুণা সিক্ত নয়ন যুগল তুলে ধরলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা আমার নিকট কি ধরনের ব্যবহার আশা করছো ?' উপস্থিত জনমন্ডলী সমস্বরে বলে উঠলো, 'আপনি আমাদের সম্মানিত ভাই, আমাদের মর্যাদাবান ভাতিজা!'

করুণার সাগরে প্লাবন সৃষ্টি হলো। তরঙ্গের পরে তরঙ্গ আছড়ে পড়লো প্রাণের শত্রুদের ওপর। আল্লাহর রাসূল মমতাসিক্ত কণ্ঠে ঘোষনা করলেন, 'আজ আমার কোন অভিযোগ তোমাদের বিরুদ্ধে নেই। আজ তোমরা সবাই মুক্ত।'

অমুসলিমরা পরাজিত জাতির সাথে কি ধরণের আচরণ করেছে ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। যুদ্ধের শেষ মুহুর্তে আমেরিকা হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে যে নির্মম আচরণ করেছে, পৃথিবীর মানুষ সে নৃশংস ঘটনা কি কোনদিন ভুলে যাবে? পৃথিবী দেখেছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজিত জাতির সাথে কি সুন্দর আচরণ করলেন। অনুপম এই আচরণ দিয়েই পৃথিবীর দিকে দিকে ইসলামী আদর্শের বিস্তার ঘটানো হয়েছে-শক্তি প্রয়োগে নয়। এই সূরায় মুসলমানদেরকে ঐ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে, বিজয় দানের মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং বিজয়ের পরে কোন গৌরব নয়-আল্লাহ তা'য়ালার হাম্‌দ আর তাস্‌বীহ আদায় করতে হবে এবং ইস্‌তিগ্‌ফার করতে হবে। যিনি বিজয় দান করেছেন, একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করতে হবে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

লক্ষণীয়-আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, যখন বিজয়ী হবে অথবা বিজয় আসবে। বরং এ কথা বলা হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় লাভ হবে। এ কথার পরিষ্কার অর্থ হলো, 'ইসলাম বিজয়ী হয়-দ্বীনি আন্দোলন বিজয়ের সিংহদ্বারে উপনীত হয় একমাত্র মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহেই।' বিজয়ী হওয়ার জন্য ইসলাম জনবল বা অস্ত্র বলের মুখাপেক্ষী নয়। বিজয়ী হওয়ার পূর্বশর্ত হলো মুমীন হওয়া। আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা হতাশ হোয়ো না, চিন্তিত হোয়ো না, বিজয় তোমাদেরই, যদি তোমরা মুমীন হও।' ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী করার জন্য প্রয়োজন এই আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত একদল নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনী এবং জনসমর্থন। এই দুটো উপাদান কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বর্তমান থাকলে মহান আল্লাহ বিজয় দান করবেন।

আল্লাহর রাসূল মক্কায় আন্দোলনের সূচনা করে দীর্ঘ ১৩ বছরে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বিজয়ের প্রথম উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় উপাদান সংগ্রহ করলেন মদীনায়। সংগৃহীত কর্মী বাহিনীকে দিনের পর দিন প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে বিজয় লাভের যোগ্য করে গড়ে তুললেন। নানা দিকের চরম প্রতিকুল অবস্থা আল্লাহর সৈনিকদের মধ্যে অকল্পনীয় দৃঢ়তা সৃষ্টি করলো। তাঁদের সেই দৃঢ়তার সামনে বাতিল শক্তি তৃণবৎ উঁড়ে গেল এবং আল্লাহ তা'য়ালা অসীম অনুগ্রহ করে বিজয় দান করলেন। এই বিজয় জনবল, সামরিক শক্তি, যুদ্ধ-কৌশল ইত্যাদির কারণে আসেনি। এসব বৈষয়িক কারণেই যদি ইসলাম বিজয়ী হতো, তাহলে হুনাইনের প্রান্তরে বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টি হতো না। সেখানে মুসলমানদের জনবল ও সামরিক শক্তি প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিক ছিল। মহান আল্লাহ সেখানে দেখিয়ে দিলেন, মুসলমানরা বিজয়ী হয় একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্যেই, তাঁরই অসীম অনুগ্রহে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের প্রথম শর্তই হলো মুমীন হতে হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলের ওপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তিনি যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে বিজয়ী করেছেন। ইসলাম কারো করুণা ও দয়ার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আসেনি এবং দ্বীনি আন্দোলনও কারো মুখাপেক্ষী নয়। কোন ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতা ও কৃতিত্বের কারণেও এই আন্দোলন বিজয়ী হয় না। যারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে তারা মুমীনের যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করার আন্তরিক চেষ্টায় যাবতীয় প্রতিকূলতা সত্বেও ময়দানে তৎপর থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করবেন এবং প্রয়োজনীয় সময়ে বিজয়ী করবেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনশক্তি চাইলেই বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। বিজয় দানের মালিক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে।' কিভাবে সে বিজয় অর্জিত হবে? মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-এটাই কি সেই বিজয়? না, এটা তো বিজয়ের সূচনামাত্র। একটির পর একটি গোত্র, দলের পরে দল, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়, এলাকার পর এলাকা আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে আসবে। তাওহীদের আলোকে মানব বাগান আলোকিত হবে। গোটা আরব ভূ-খন্ডের সীমানা অতিক্রম করে ইসলাম দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্বের মানচিত্রে ইসলামী রাষ্ট্র সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন হবে। ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে ও মুসলিম একটি মিল্লাত হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করবে এবং এর প্রভাব কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার মতো অবস্থায় উপনীত

হবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যই রাসূলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। রাসূল এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন আর তখনই বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং এটাই হলো চূড়ান্ত বিজয়।

কিভাবে ইসলাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এলাকার পর এলাকা ইসলামের ছায়াতলে আসছে ও মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে, ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করার মতো কোন শক্তি নেই, যারা মাথা উঁচু করবে তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। এই দৃশ্য আল্লাহর রাসূল তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে দেখেছেন এবং তাঁর অবর্তমানে ইসলাম পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে যাবে, তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি সে সাক্ষ্যই দিচ্ছিলো। এই পর্যন্তই তাঁর দায়িত্ব ছিল এবং তিনি তা সমাপ্ত করেছেন, এখন তাঁর অখন্ড অবসর। অবসরের এই মুহূর্তগুলো তিনি কিভাবে অতিবাহিত করবেন, সে পথও তাঁকে দেখিয়ে দিয়ে বলা হলো, 'তখন তুমি তোমার রব-এর হামদ সহকারে তাঁর তসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ইস্তিগ্ফার করো। নিঃসন্দেহে তিনি পরম ক্ষমাশীল।'

মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে আল্লাহর রাসূল যে অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করলেন, যে সফলতা অর্জন করলেন এর যাবতীয় কৃতিত্ব স্বয়ং আল্লাহর। আল্লাহ তা'য়ালার একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত রাসূলের পক্ষে দুনিয়া কাঁপানো ঐ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব ছিল না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন, 'আপনার রব্ আপনাকে অসীম নে'মাত দানে ধন্য করেছেন।' অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের একটি বিরাট বিজয়, এটাও রাসূলের প্রতি মহান আল্লাহর অতি বড় নে'মাত। ঘৃণ্য জাহিলিয়াতে পরিপূর্ণ একটি সমাজে নবুওয়াত পূর্ব জীবনে তাঁকে আল্লাহ ত'য়ালা নিষ্পাপ রেখেছেন, এটা যেমন তাঁর প্রতি আল্লাহর নে'মাত, তেমনি তাঁর জীবনের প্রত্যেক দিকে তিনি যে সফলতা অর্জন করেছেন, সেটাও আল্লাহ্ তা'য়ালার অসীম নে'মাত।

এই কথাগুলোই উল্লেখিত আয়াতে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, আপনি যে সফলতা অর্জন করেছেন, মানবতার যে কল্যাণ সাধন করেছেন, শোষিত নিপীড়িত মানবতাকে মুক্তির সোপানে পৌঁছে দিয়েছেন, অগণিত মানুষের হৃদয় জগৎ থেকে শিরকের অন্ধকার দূরিভূত করে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেছেন, হে রাসূল! এই কৃতিত্ব আপনার নয়। আপনার কর্মকুশলতা, অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অক্লান্ত শ্রম, অতুলনীয় মেধা, সাংগঠনিক যোগ্যতা ইত্যাদির কারণে আপনি সফল হননি। সমস্ত কিছুর পেছনে আপনার রব-এর অসীম অনুগ্রহ ছিল বলেই আপনি সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। আপনার প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত এসব কিছুই সম্ভব হয়নি। সুতরাং এখন আপনার একমাত্র কাজ হলো, আপনার জীবনের অবশিষ্ট দিনের প্রতিটি প্রহর আপনি আপনার রব-এর প্রশংসা ও তাসবীহ করতে থাকবেন। তাঁর কাছেই ইস্তেগ্ফার করতে থাকবেন।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ইস্তেগ্ফার করা, ক্ষমা চাওয়াও ইবাদাত। এই ইবাদাতের গুরুত্ব অসীম। আল্লাহর রাসূল ছিলেন নিষ্পাপ–মাসুম। তবুও তিনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তওবা করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা খুবই খুশী হন। সূরা নূরের ৩১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, তাহলে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।' সূরা হুদের ৩১ আয়াতে বলেছেন, তোমরা নিজের রব-এর কাছে গুনাহ্ মাফ চাও, তারপর তাঁর কাছে তওবা করো। বোখারী শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আল্লাহর শপথ!

আমি একদিনে ৭০ বারেরও অধিক তওবা করি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল বলেন, হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা আমি প্রতিদিন ১০০ বার তওবা করি। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার 'ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে তিনি ভালোবাসেন' শিরোণাম থেকে 'আল্লাহর কাছে খুশীর বিষয় ও প্রিয় জিনিস' শিরোণাম পর্যন্ত দেখুন।)

নবীগণ মাসুম-নিষ্পাপ, তাঁরা কোন গুনাহ্ করেননি। সুতরাং তাঁরা কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন অথবা কেনই বা তাদেরকে ক্ষমা চাইতে বলা হবে? প্রকৃত বিষয় হলো, বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো ক্ষমা চাওয়া। মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুত বা অপ্রত্যাশিত সাহায্য যখন মানুষ লাভ করে, তখন বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা একান্ত আবশ্যক। ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে বান্দাহ্ নিজের দীনতা-হীনতাই প্রকাশ করে মহান আল্লাহর অসীমতা ও বিশালতার স্বীকৃতি প্রদান করে। মানবীয় চেষ্টা-সাধনা যে কোন অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল ও সীমিত। আর মহান আল্লাহর শক্তি, অনুগ্রহ অসীম-এ জন্যও মানুষকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এই ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে বান্দাহ্ তার সকল অহমিকা ও গর্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিজের অসহায়ত্ব, দূর্বলতা, দীনতা, সঙ্কীর্ণতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে নিবেদন করে। বিনয় প্রকাশ ও ক্ষমা চাওয়ার কারণে মহাসত্যের বাহক নবী-রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের মন-মানসিকতায় এই বিশ্বাস ও চেতনা দৃঢ়তর এবং স্থায়ী হয় যে, একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই বিরোধিদের ওপরে তাদেরকে বিজয়ী ও আধিপত্য বিস্তারের সম্মান-মর্যাদা দান করেছেন।

এ জন্য সর্বাবস্থায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এই বিনয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা মুমীনদের একটি স্থায়ী গুণ। মহান আল্লাহই মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের খেদমত করা সবার তকদীরে জোটে না। মহান আল্লাহ একান্ত অনুগ্রহ করে যাকে কবুল করেন, তার ভাগ্যেই জোটে ইসলামের খেদমত করা এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের আন্দোলনে শামিল হয়ে নিজেকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা। সুতরাং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে এ কথা মনে স্থান দেয়া যাবে না যে, আমি দ্বীনি আন্দোলনের জন্য অনেক কিছুই করেছি। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যত বিরাট ত্যাগ স্বীকারই করা হোক না কেন, এ জন্য এই চিন্তাও করা যাবে না যে, আমি কিছু একটা করতে পেরেছি।

বরং এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে যে, তিনি অনুগ্রহ করে তাকে এই আন্দোলনে শামিল করেছেন। তাঁরই কাছে কাতর কণ্ঠে ক্ষমা চাইতে হবে দিবারাত্রি অনুক্ষণ। কারণ মুসলিম হিসাবে তার ওপরে যে দায়িত্ব ছিল, সে দায়িত্ব সে যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না, বার বার ভুল হচ্ছে, আন্দোলনের কাজে দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে, এসব দুর্বলতার জন্য পরকালে আল্লাহর দরবারে তাকে জবাবদিহি যেন করতে না হয়, এ জন্য সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আন্দোলনকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করার লক্ষ্যে সে যে কাজটুকু করতে পারছে, এই কাজ যেন আল্লাহ কবুল করেন, এ জন্য বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে। যেমনভাবে আন্দোলনের কাজ আঞ্জাম দেয়া প্রয়োজন ছিল, তা দেয়া যাচ্ছে না, তার ওপরে মহান আল্লাহর যে হক ছিল, সে হক সে আদায় করতে পারছে না, এ জন্য মহান মালিকের দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মুমীনের ভুল-ভ্রান্তি তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন-কেননা তিনি পরম ক্ষমাশীল। ❇

সূরা আল-লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-১১১

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-ইসলামের ঘৃণিত দুশমন আবু লাহাবের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, ধ্বংস হয়ে যাক আবু লাহাবের দুটো হাত। এ কারণেই 'লাহাব' শব্দটিকেই এই সূরার নাম হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মক্কায় যে লোকগুলো ইসলামের সাথে বিরোধিতার দিক দিয়ে অগ্রগামী ছিল, আব্দুল উয্যা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং তার স্ত্রী আরদা ছিল তাদের অন্যতম। এই লোকটি ছিল আল্লাহর রাসূলের আপন চাচা এবং সে দেখতে ছিল সকালের সোনালী সূর্যের লালিমার মতো উজ্জ্বল, এ জন্য তাকে আবু লাহাব নামে ডাকা হতো। তার স্ত্রীও দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ছিল, এ জন্য তাকে উম্মে জামিল বলা হতো। এই আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী আত্মীয়তা ও নৈতিকতার যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে অত্যন্ত নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে আল্লাহর রাসূলের সাথে বিরোধিতা করে যাচ্ছিলো। তার নির্মম পরিণতির কথা উল্লেখ করেই এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আবু লাহাবের তুলনায় আল্লাহর রাসূলের অনেক বড় বড় শত্রু ছিল, কিন্তু কারো নাম উল্লেখ করে কোরআনের কোন সূরা অবতীর্ণ হয়নি এবং আল্লাহ তা'য়ালা অভিশাপও দেননি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচার নির্মম পরিণতি উল্লেখ পূর্বক এই সূরায় অভিশাপ দেয়া হয়েছে।

তদানীন্তন আরব সমাজে যে কোন মুহূর্তে এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপরে আক্রমণ করবে, এই ভয়ে প্রতিটি গোত্র এক ভীতিকর পরিস্থির মধ্যে বাস করতো এবং প্রাণ ও ধন-সম্পদের কোন নিরাপত্তা ছিল না, এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ কারণে নিজ গোত্র ও বংশীয় আত্মীয়দের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত সে সমাজে কারো পক্ষে নিজের প্রাণ, ধন-সম্পদ ও সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অবস্থা বিরাজ করছিল। এই কারণে সে যুগে নিজ গোত্র ও বংশীয় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাদের অধিকার আদায় করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ জন্য নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তারা বংশীয় আত্মীয়তা রক্ষা করে চলতো। বংশের কেউ ন্যায় করুক বা অন্যায় করুক, সবাই তারই পক্ষ অবলম্বন করতো।

আল্লাহর রাসূলের বংশ ছিল বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব। কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রসহ গোটা মক্কার সবাই যখন আল্লাহর রাসূলের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল, তখন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব তাঁকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানাচ্ছিলো। রাসূলের চাচা স্বয়ং আবু তালেব রাসূলের শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন। যদিও রাসূলের বংশের অধিকাংশ লোকজন তখন পর্যন্ত ঈমান এনে রাসূলের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা শুধু বংশীয় কারণে রাসূলকে সমর্থন জানাচ্ছিলেন। পক্ষান্তরে রাসূলের বংশের মাত্র একটি লোক নীতি-নৈতিকতার মাথায় পদাঘাত করে আল্লাহর রাসূলের সাথে প্রচন্ড বিরোধিতা করে যাচ্ছিলো। লোকটি ছিল আল্লাহর রাসূলের আপন চাচা আবু লাহাব এবং তার ঘৃণিত স্ত্রী উম্মে জামিল। তদানীন্তন আরব সমাজে চাচাকে পিতার মতোই সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হতো এবং তার দায়িত্ব ছিল, আপন ভাতিজাকে সে নিজ সন্তানের মতোই আদর স্নেহ করবে এবং যে কোন অবস্থায় ভাতিজার সমর্থনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যেমন করেছিলেন আবু তালেব।

কিন্তু আবু লাহাব আল্লাহর বিধানের সাথে শত্রুতায় এতটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা আরবের নিয়ম-নীতিকে পদাঘাত করে আপন ভাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবান ছেলের বিরুদ্ধে অন্যান্য গোত্রের লোকদের সাথে একত্রিত হয়ে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিল। লোকটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত জাহিলিয়াতের এতই অন্ধ পূজারী ছিল যে, জাহিলিয়াতের প্রতি আকর্ষণ ও মমত্ববোধের কারণে তার পাষাণ হৃদয় থেকে আপন ভাইয়ের ইয়াতিম সন্তানের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা মুছে দিয়েছিল। হযরত রাবিয়া ইবনে ইবাদুদ দায়েলী বলেন, আমি এবং আমার আব্বা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী-সাথীদের সাথে একদিন সকালে পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূল যখন বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। রাসূলের কথা শেষ হওয়া মাত্রই একজন অপূর্ব দর্শন লোক উঠে অন্যান্য লোকদের সম্বোধন করে বলছিল, 'এই লোকটি মিথ্যা কথা বলছে। সে তোমাদেরকে তোমাদের পূজনীয় দেব-দেবীদের থেকে পৃথক করতে চায়। সে এক নতুন ধর্মের প্রচার করছে এবং বলছে তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারা এতদিন যা করে এসেছো, তা সবই মিথ্যা। লোকটি বড়ই ভয়ঙ্কর, এই লোকটির কোন কথা তোমরা শুনবে না এবং তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।'

আমি সে সময় আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহর রাসূলের সাথে বিরোধিতা করছে, ঐ লোকটির পরিচয় কি?' আমার পিতা আমাকে জানালেন, 'লোকটি আল্লাহর রাসূলের চাচা আবু লাহাব।' ইতিহাসে দেখা যায়, এই লোকটি এবং তার স্ত্রী আল্লাহর রাসূলকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। লোকটির বাড়ি এবং আল্লাহর রাসূলের বাসগৃহ ছিল একই প্রাচীর পরিবেষ্টিত। ইবনে আছদায়েল হাযালী, আদী ইবনে হামরা, আবু মুয়ীত এবং মারওয়ানের পিতা হাকাম ইবনে আ'স ছিল রাসূলের নিকটতম প্রতিবেশী। এ কারণে প্রায় সময়ই তারা রাসূলকে কষ্ট দেয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা রাসূলের ঘরের প্রবেশ পথে কাঁটা ও অন্যান্য আবর্জনা বিছিয়ে রাখতো। যেন রাসূল ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তাঁর কদম মোবারকে কাঁটা বিদ্ধহয়, তাঁর সন্তানরা কষ্ট পায়। আল্লাহর রাসূল ঘরে নামাজ আদায় করছেন, এই অবস্থায় তারা তাঁর ওপরে পচা নাড়ি-ভূঁড়ি ছুড়ে দিতো। সন্তানদের মুখে এক মুঠো খাবার তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলের ঘরে রান্না হচ্ছে, সে রান্নার ভেতরে আবর্জনা ছুড়ে দিয়ে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করা হতো। আল্লাহর রাসূল ঘরের বাইরে এসে প্রতিবেশীদের কাছে শুধু মৃদু কণ্ঠে অভিযোগ করতেন, তোমরা আমার নিকটতম প্রতিবেশী, কিন্তু তোমরা এ কি ধরনের ব্যবহার করছো?

তিরমিজী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত তারেক ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি যুলমাজায বাজার এলাকায় দেখলাম আল্লাহর রাসূল লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলছেন, 'হে লোকজন! তোমরা লা-ইলাহা বলো, কল্যাণ লাভ করবে।' এ অবস্থায় পেছন থেকে একটি লোক আল্লাহর রাসূলকে পাথর দিয়ে আঘাত করছে। পাথরের আঘাতে আল্লাহর রাসূলের পা দুটো রক্তে ভিজে গেল। লোকটি আল্লাহর রাসূলকে দেখিয়ে অন্যান্য লোকদেরকে বলতে থাকলো, 'এই লোকটি যা বলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এর কোন কথায় তোমরা কেউ কান দিয়ো না।' আমি লোকদের কাছে ঐ লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে তারা আমাকে জানালো, লোকটি হলো রাসূলের চাচা আবু লাহাব। আল্লাহর রাসূলের সন্তান ইন্তেকাল করলে সে শোক প্রকাশের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধিদের কাছে গিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিল, আজ রাতে মুহাম্মাদের পুত্র মারা গেছে। সে শেকড়হীন হয়ে পড়লো।

আল্লাহর রাসূল নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে তাঁর দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলে উত্বা এবং উতাইবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নবুওয়াত লাভ করার পরে মহান আল্লাহর আদেশে দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন, তখন আবু লাহাব তার দুই পুত্রকে ডেকে বলেছিল, 'তোমরা যদি মুহাম্মাদের মেয়েদেরকে পরিত্যাগ না করো, তাহলে তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক থাকবে না।' জাহিল সন্তানদ্বয় বর্বর পিতার আদেশ পালন করলো। এমনকি উতাইবা আল্লাহর রাসূলের সামনে এসে কোরআনের দুটো সূরার নাম উচ্চারণ করে বললো, 'আমি এসব বিশ্বাস করিনা।' জাহিল এ কথা বলেই আল্লাহর রাসূলের পবিত্র শরীর মোবারকের দিকে থু-থু নিক্ষেপ করেছিল। মহান আল্লাহ তা'য়ালা কাফির কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সে থু-থু তাঁর নবীর দেহ স্পর্শ করতে দেননি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল উতাইবাকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন, 'হে আমার আল্লাহ! এর ওপরে তুমি তোমার কুকুরগুলোর ভেতর থেকে একটি কুকুরকে লেলিয়ে দিয়ো।'

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে আবু লাহাব তার সন্তান উতাইবাকে নিয়ে একটি কাফেলার সাথে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছিল। পথিমধ্যে কাফেলা রাত যাপন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করলো। স্থানীয় লোকজন তাদেরকে সাবধান করে বলেছিল, 'এখানে প্রায়ই হিংস্র জন্তুর আগমন ঘটে।' এ কথা শোনার সাথে সাথে আবু লাহাব সাথের লোকদেরকে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমরা আমার ছেলেটাকে হেফাজত করো। আমি মুহাম্মাদের অভিশাপকে ভীষণ ভয় করি।' কাফেলার লোকজন আবু লাহাবের সন্তান উতাইবাকে শুইয়ে দিয়ে তার চারদিকে সমস্ত উট শুইয়ে দিয়ে নিজেরাও ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। রাসূলের আবেদন মহান আল্লাহ কবুল করেছিলেন। তিনি একটি বাঘ পাঠিয়ে দিলেন। উটের বেষ্টনী ভেদ করে বাঘটি আল্লাহর রাসূলের ওপরে থু-থু নিক্ষেপকারী উতাইবাকে ক্ষত-বিক্ষত করে উদরস্থ করেছিল।

তদানীন্তন আরব সমাজে যদি কেউ দেখতো যে, তার গোত্রের ওপর অন্য কোন গোত্র অতি প্রত্যুষ্যে আক্রমণ করতে আসছে। তখন সে নিকটস্থ পাহাড়ের ওপরে উঠে উচ্চ কণ্ঠে বলতো, 'ইয়া সাবাহাহ্' অর্থাৎ হায়, সকালের বিপদ!।' এই ধ্বনি শুনে গোত্রের লোকজন একত্রিত হলে মূল সংবাদটি তারা জানিয়ে দিতো, যেন সবাই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করতে বললেন এবং নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করতে বললেন। এ সময়ে আল্লাহর রাসূল একদিন সকালে সাফা পর্বতের ওপরে উঠে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'ইয়া সাবাহাহ্।' লোকজন জানতে চাইলো এভাবে সতর্ক করছে কে? জানানো হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে উচ্চ কণ্ঠে সতর্ক করছেন। কুরাইশদের সমস্ত গোত্রের লোকজন ছুটে এলো কি ধরনের বিপদ তা জানার জন্য।

আল্লাহর রাসূল প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে বলি এই পাহাড়ের পশ্চাৎ দিক থেকে সমরাস্ত্রে সজ্জিত একদল শত্রু বাহিনী তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?' সমবেত লোকজন জানালো, 'অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করবো, কারণ তুমি কখনো মিথ্যা কথা বলোনি।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'আমি তোমাদের প্রতি সতর্ককারী হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদেরকে সাবধান করছি, তোমাদের সামনে এক কঠিন আযাব অপেক্ষা করছে।' এ কথা

শোনার সাথে সাথে সমবেত লোকদের মধ্য থেকে আবু লাহাব রাসূলের দিকে পাথর ছুড়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি পাথর হাতে উঠিয়ে নিয়ে ক্ষোভের সাথে বললো, 'তাব্বাল লাকা ইয়া মুহাম্মাদ, আলে হাযা জামা'তানা? অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাও হে মুহাম্মাদ, তুমি কি এই জন্য আমাদেরকে একত্রিত করেছো?'

আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় নিয়ম-নীতির মাথায় পদাঘাত করে রক্তের সম্পর্কের তোয়াক্কা না করে আবু লাহাব সস্ত্রীক আল্লাহর রাসূলের সাথে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে যাচ্ছিলো। এই কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের এই ঘৃণিত দুশমন আবু লাহাবের নাম নিয়ে তার নিকৃষ্ট পরিণতির কথা উল্লেখ করে অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। এই লোকটি ব্যতীত ইসলামের অন্য কোন দুশমনের নাম আল্লাহর কোরআনে উল্লেখ পূর্বক অভিশাপ দেয়া হয়নি। আল্লাহর রাসূলকে সমর্থন জানানোর কারণে নবুওয়াত লাভের সপ্তম বছরে সমস্ত কুরাইশ গোত্র একত্রিত হয়ে আল্লাহর রাসূলের বংশ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে সম্মিলিতভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বয়কট করেছিল। কেউ তাদের কাছে কোন কিছু বিক্রি করতে পারবে না এবং তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করতেও পারবে না–মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই ধরনের ঘৃণিত চুক্তিতে তারা আবদ্ধ হলো।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই চুক্তির কারণে শুধু আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানরাই দুঃসহ অবস্থার ভেতরে নিপতিত হয়নি। তখন পর্যন্ত ঐ দুই গোত্রের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী ইসলাম কবুল করেনি, তাঁরাও বর্ণনাতীত দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। মুসলমানদের সাথে সাথে তাঁরাও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনাহারে থেকেছে, গাছের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের শিশুগণও মুসলিম শিশুদের সাথে ক্ষুধার যন্ত্রণায় আকাশ বাতাস দীর্ণ-বিদীর্ণ করে আর্তনাদ করেছে। মহান আল্লাহর কি অসীম রহমত, তাঁরা তাদের দৃষ্টির সামনে দেখেছে, তাদেরই কলিজার টুকরা সন্তান প্রচন্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আর্তচিৎকার করছে। চিকিৎসার অভাবে রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। পানির অভাবে বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বস্ত্রের অভাবে অর্ধোলঙ্গ থাকতে বাধ্য হচ্ছে। নিজেদের পেটেও ক্ষুধার দানব হুংকার দিচ্ছে। কষ্টার্জিত সহায় সম্পদ বাড়ি ঘর পশুপাল সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ সব তাঁরা নিজ দৃষ্টির সামনে দেখছিল।

কিন্তু তাদের ভেতরে কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। যে মুসলমান, ইসলাম এবং আল্লাহর রাসূলকে কেন্দ্র করে তাদের আজ এই দুরাবস্থা, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। একটি বারও তাদের মনে এ কল্পনাও আসেনি, রাসূলকে অন্যান্য গোত্রের হাতে সমর্পণ করলেই তাঁরা এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তাদের কলিজার টুকরা শিশু সন্তানগুলো পেট পুরে খাদ্য লাভ করতে পারে। সমস্ত সহায়-সম্পদ রক্ষা পেতে পারে। মহান আল্লাহর অসীম কুদরত যে, এই অমুসলিম জনগোষ্ঠী যে কোন ধরনের মর্মান্তিক যন্ত্রণা হাসি মুখে বরণ করেছে রাসূলের দিকে তাকিয়ে।

আল্লাহর রাসূলের পক্ষের দুই গোত্র অবরোধের কবলে পতিত হবার পরে তাঁরা দ্রুত একটা বৈঠক করলো। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, শহরে এই অবস্থায় তাঁরা বাস করতে থাকলে কোন ক্রমেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারবে না। সুতরাং অন্য কোথাও অবস্থান করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা যাবে না, এতে কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁরা শিয়াবে আবি তালিবে গিয়ে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো। শিয়াবে আবি তালিব নামক জায়গাটা

ছিল মক্কার একটা পাহাড়ের এলাকা। সেখানে বনী হাশিমের লোকজন বসবাস করতো। এলাকাটা ছিল সমস্ত দিক থেকে সুরক্ষিত পাহাড়ি দূর্গের মত। তাদের ধারণা ছিল, এখানে থাকলে তাঁরা বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারবে। এ ঘটনা ছিল নবুওয়াত লাভের সাত বছরের সময় মহরম মাসে। ঐ দুই গোত্রের মুসলিম অমুসলিম সবাই আল্লাহর রাসূলের সাথে এই দুঃসহ অবস্থা হাসি মুখে বরণ করে নিল।

এই ধরণের বিপদ যে আসবে তা ঐ দুই গোত্র উপলব্ধি করতে পারেনি। বিপদ ছিল আকস্মিক। এ কারণে তাঁরা প্রস্তুতি গ্রহণের কোন সুযোগ পায়নি। তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য যা ছিল তাই নিয়ে তাঁরা পাহাড়ের ঐ দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সামান্য কয়েক দিনের ভেতরেই তাদের সমস্ত খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তখনই বিপদ মূর্তিমান আকার ধারণ করেছিল। একটা দুটো দিন নয়-দীর্ঘ তিনটি বছর অনাহারে চরম কষ্টের ভেতরে তাদেরকে ঐ শিয়াবে আবি তালিবে বন্দী জীবন-যাপন করতে হয়েছিল।

বংশের সমস্ত লোকগুলো যখন এই দুঃষহ অবস্থায় নিপতিত, তখন আবু লাহাব ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে নিজ বংশের লোকগুলোর করুণ অবস্থা দেখে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে বিপদ যেন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় সে ব্যবস্থাই ঘৃণিত লোকটি করে যাচ্ছিলো। কোন ব্যবসায়ী কাফেলা মক্কায় আগমন করলে আবু লাহাব তাদের কাছে গিয়ে পরামর্শ দিতো, বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের লোকগুলো কিছু কিনতে এলে তাদের কাছে এত বেশী দাম চাইবে, যেন তারা কিনতে না পারে অথবা তাদের কাছে কিছুই বিক্রি করবে না। এতে যদি তোমাদের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহলে তা আমি পূরণ করে দেবো।' এভাবে সে নিজ বংশ ও গোত্রের লোকগুলোকে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে বাধ্য করতো। নিজের আপন ভাইয়ের ইয়াতিম ছেলের বিরুদ্ধে এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা কেউ গ্রহণ করতে পারে, মক্কার লোকগুলো তা কল্পনাও করতে পারতো না।

আলোচ্য সূরায় আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আবু লাহাবের স্ত্রী যখন শুনলো তাদের দু'জনের প্রতি অভিশাপ দিয়ে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে এক মুঠো পাথর হাতে নিয়ে কা'বাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল তখন হযরত আবু বকরকে সাথে নিয়ে কা'বাঘরের সামনে অবস্থান করছিলেন। মেয়ে লোকটিকে উগ্রমূর্তি ধারণ করে আসতে দেখে হযরত আবু বকর আল্লাহর রাসূলকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! মেয়ে লোকটির উদ্দেশ্য ভালো নয়। আপনি আড়ালে চলে যান। রাসূল বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়ালে রাখবেন।' আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলা এগিয়ে এসে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে হযরত আবু বকরকে বললেন, 'হে আবু বকর! তোমার সাথী নাকি আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে কবিতা রচনা করেছে? আমি যদি তাকে সামনে পেতাম তাহলে এই পাথর তার মুখে ছুড়ে দিতাম। তার মনে রাখা দরকার, আমিও একজন মহিলা কবি।'

হযরত আবু বকর বললেন, অবশ্যই না। কা'বাঘরের মালিকের শপথ! আমার সাথী কখনো কবিতা রচনা করেন না। তাঁর মুখ থেকে কখনো কবিতা নির্গত হয় না। আবু লাহাবের স্ত্রী বললো, 'তুমি অবশ্যই সত্যবাদী।' অভিশপ্ত মহিলা কিছুক্ষণ পাগলের প্রলাপ বকে চলে গেল। এরপর হযরত আবু বকর তাঁর পাশে দাঁড়ানো আল্লাহর রাসূলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি

কি লক্ষ্য করেছেন, সে আপনাকে দেখতে পেয়েছে?' রাসূল বললেন, 'মহিলা আমাকে দেখতে পায়নি। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার দৃষ্টি থেকে আমাকে আড়ালে রেখেছিলেন।'

আবু লাহাবের ঘৃণিত ভূমিকার কারণে তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে যখন এই সূরা অবতীর্ণ হলো, তখন লোকজন এটা স্পষ্ট অনুভব করলো যে, ইসলাম এমন একটি আপোষহীন আদর্শ, যে আদর্শ কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা দেখাতে মোটেও প্রস্তুত নয়। রাসূলের চাচা সম্পর্কে যখন সবথেকে কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হলো, তখন অন্য কারো ব্যাপারে ইসলাম বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করবে না, এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল। ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করার কারণে অনেক দূরের কেউ পরম আপনজনে পরিণত হয়।

আবার এই আদর্শের সাথে বিরোধিতা করার কারণে একান্ত আপনজন অনেক দূরে চলে যায়। এখানে কে পিতা আর কে সন্তান, ইসলাম সে বিচার করে না। ইসলাম বিচার করে, লোকটি আল্লাহর অনুগত কিনা, আল্লাহর বিধানের সাথে লোকটির কি সম্পর্ক। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ-বদরের যুদ্ধে এ কথা আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিল ইসলাম। কারণ এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, আপন আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেই। ইসলামে সম্পর্কের একমাত্র মানদন্ড হলো ঈমান। পিতা যদি আল্লাহর বিধানের বিপরীত আদর্শের অনুসারী হয়, তাহলে সন্তান কোনক্রমেই পিতার আদর্শের অনুসারী হতে পারে না।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) (ইসলাম বিরোধিতার কারণে) আবু লাহাবের দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক–ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও। (২) তার ধন-সম্পদ তার কাজে আসবে না–না (কাজে আসবে) তার আয় উপার্জন, (৩) বরং (তা অতি সত্বর জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে) নিক্ষিপ্ত হবে, সে (নিজেও) সেই আগুনের লেলিহান শিখায় নিমজ্জিত হবে। (৪) (তার সাথে থাকবে) জ্বালানী (কাঠের বোঝা) বহনকারী তার স্ত্রীও। (৫) (অবস্থা দেখে মনে হবে) তার গলায় যেন খেজুর পাতার পাকানো শক্ত কোনো রশি জড়িয়ে আছে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

যার অগ্নিশিখা রয়েছে, আরবী ভাষায় তাকেই আবু লাহাব বলে। শুধু লাহাব অর্থ আগুনের শিখা। লোকটির প্রকৃত নাম একটি দেবতার নামের সাথে সংযুক্ত ছিল। উয্যা নামক যে দেবতার পূজা তারা করতো, তারই নামের সাথে সংযুক্ত করে তার নাম রাখা হয়েছিল, আব্দুল উয্যা অর্থাৎ উয্যার দাস। নিজের হাতে মাটির মূর্তি বানিয়ে তার নাম দেয়া হয়েছে উয্যা এবং তাকে পূজাও করা হয়। আর সেই মূর্তির গোলাম বিবেচনা করে মানুষের নাম রাখা হলো। মানুষ ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সে আল্লাহর গোলাম। মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে তার দেহ এবং এই দেহকে প্রতিপালনও তিনিই করছেন। আল্লাহ তা'য়ালার প্রভুত্বের বিপরীতার্থক অর্থ প্রকাশ করে আব্দুল উয্যা নামটি। এই নাম উল্লেখ করে অভিশাপ বর্ষণ করা মহান আল্লাহর পক্ষে শোভনীয় নয়।

কারণ কোনক্রমেই মানুষ কোন মূর্তির গোলাম হতে পারে না। এ জন্য সেই ঘৃণিত নামটিও আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ না করে লোকটির উপনাম 'আবু লাহাব' নামটি উল্লেখ করেই তার ঘৃণ্য পরিণতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। পরকালে লোকটির স্থান যেখানে হবে, তার উপনামও সেই স্থান অর্থাৎ জাহান্নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লোকটির চেহারা ছিল আগুনের মতোই টকটকে এবং এ কারণে তাকে ডাকা হতো আগুনের শিখা বলে, তেমনি তার অনন্তকালের বাসস্থানও হবে আগুনের ভেতরেই।

সেই উপনামটিই উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরার প্রথম আয়াতে বলেছেন, 'আবু লাহাবের দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক–ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও।' কেন এবং কোন

পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা আবু লাহাবের প্রতি এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ বর্ষণ করলেন, তার কারণসমূহ এই সূরার পটভূমিতে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত লোকটির নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে আলোচ্য সূরায় ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। এ সূরায় বলা হয়েছে তার দুটো হাত ধ্বংস হয়ে যাবার কথা। এখানে তার দেহের সাথে সংযুক্ত হাত দুটোর কথা বুঝানো হয়নি। যেমন কারো সম্পর্কে যখন বলা হয়, 'অমুককে সমর্থন দিয়ে তার হাতকে শক্তিশালী করুন।' এ কথার অর্থ এটা নয় যে, তার দেহের সাথে সংযুক্ত হাত দুটোকে শক্তিশালী করুন। বরং এর অর্থ হলো, তাকে সমর্থন দিয়ে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করুন। তেমনি আবু লাহাবের হাত দুটো ধ্বংস হয়ে যাক বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি, বুদ্ধি, কলাকৌশল ও উদ্দেশ্য সমস্ত কিছুই বানচাল হয়ে যাক। সে চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে নিপতিত হোক।

শুধুমাত্র ব্যক্তি আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে যাক, এই ভবিষ্যৎ বাণী এই সূরায় করা হয়নি। বরং ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের ধ্বংস স্তুপের ওপরে দ্বীনি আন্দোলনের বিজয় কেতন উড্ডিন হবে, সেই ভবিষ্যৎ বাণীই এই সূরায় করা হয়েছে। কারণ লোকটি ছিল আল্লাহর রাসূলের আপন চাচা, রাসূল যখন কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনা করলেন, শুধুমাত্র এই কারণে লোকটি তখন আরব সমাজের সর্বজন স্বীকৃত নীতি-নৈতিকতার মাথায় পদাঘাত করে আপন ভাতিজার বিরুদ্ধে কতটা ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছিল, তা আলোচ্য সূরার পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই লোকটি দ্বীনি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে লোকদেরকে সংগঠিত করেছিল। রাসূলের পবিত্র দেহ মোবারকে সে নিজের হাতে পাথর ছুড়ে রাসূলকে রক্তাক্ত করেছিল। রাসূলের নিরাপরাধ মেয়ে দুটোকে অকারণে তালাক দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। তাওহীদের আলো নির্বাপিত করার জন্য এমন কোন প্রচেষ্টা নেই, যা সে গ্রহণ করেনি। মহান আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছিল, আবু লাহাব ছিল তাদেরই নেতা। ইসলাম বিরোধী লোকগুলোই ছিল তার শক্তির উৎস।

আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ হবার মাত্র সাত-আট বছর অতিবাহিত না হতেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধেই মূলত ইসলাম বিরোধিদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল। কারণ ইসলাম বিরোধী অধিকাংশ নেতা–যারা ছিল আবু লাহাবের প্রেরণা ও শক্তির উৎস, তারা সবাই বদরের প্রান্তরে নিহত হয়েছিল। আবু লাহাব স্বয়ং সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও অর্থ, জনশক্তি ও অস্ত্র দিয়ে ইসলাম বিরোধিদের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছলো, তখন সে মানসিক দিক দিয়ে এতটাই ভেঙ্গে পড়েছিল যে, সে শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আলোচ্য সূরায় ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছিল, তার হাত দুটো ধ্বংস হয়ে যাক অর্থাৎ তার যাবতীয় শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাক। সেই ভবিষ্যৎ বাণীই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল বদরের প্রান্তরে। বদরের যুদ্ধে অর্থক্ষয়, জনশক্তি ধ্বংস তথা সমস্ত সঙ্গী-সাথী সমর্থকদের হারিয়ে লোকটি উন্মাদ প্রায় হয়ে শয্যা গ্রহণ করেছিল। এই শয্যাই তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়ালো।

বদরের যুদ্ধের পর এক সপ্তাহও আবু লাহাব জীবিত থাকেনি। সে এমন মারাত্মক ধরনের সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিল যে, তার গোটা শরীরে পচন ধরেছিল। বমন উদ্রেককারী উৎকট দুর্গন্ধে তার ঘরেও কেউ প্রবেশ করতো না। পরিবারের একটি লোকও তার মৃত্যুর সময় দুর্গন্ধের কারণে এবং ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে কাছে আসতে পারেনি। তার মৃত্যুর পরে তিনদিন লাশ একই ভাবে ঘরে পড়েছিল। লাশ পচে গলে চারদিকে এক অসহনীয় পরিবেশ

সৃষ্টি করেছিল। পিতার লাশের সৎকার না করার কারণে শেষ পর্যন্ত লোকজন আবু লাহাবের ছেলেদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তখন তারা অর্থের বিনিময়ে কয়েকজন হাবশী গোলাম যোগাড় করে তাদের দিয়ে গর্ত খনন করালো। লোকগুলো নাকে কাপড় বেঁধে বেশ দূর থেকে দীর্ঘ লাঠির সাহায্যে লাশ ঠেলে নিয়ে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণী এভাবেই কার্যকরী হয়েছিল।

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'তার ধন-সম্পদ তার কাজে আসবে না–না তার আয় উপার্জন, বরং তা অতি সত্বর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে, সে নিজেও সেই আগুনের লেলিহান শিখায় নিমজ্জিত হবে।' সে যুগে কুরাইশদের মধ্যে যারা প্রথম শ্রেণীর ধনী ছিল, আবু লাহাব ছিল তাদের অন্যতম। কুরাইশদের মধ্যে মাত্র চারজন লোক আট কেজি দশ তোলা স্বর্ণের অধিকারী ছিল। আবু লাহাবের কাছেও সেই পরিমাণ স্বর্ণ ছিল। বদরের যুদ্ধে সে যোগ দেয়নি। আ'স ইবনে হিশাম নামক একজন লোকের কাছে সে চার হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। লোকটিকে প্রস্তাব দেয়া হলো, সে যদি আবু লাহাবের পক্ষে যুদ্ধ করে তাহলে ঐ চারহাজার দিরহাম মাফ করে দেয়া হবে। লোকটি ঋণ পরিশোধের সুযোগ পেয়ে আবু লাহাবের প্রস্তাব গ্রহণ করে বদরের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। আর আবু লাহাব এভাবেই যুদ্ধের ঝুঁকি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিল। বদরের যুদ্ধে মক্কার ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নিহত হয়েছিল এবং এই যুদ্ধই ছিল ইসলাম বিরোধিদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সূচনা।

প্রচুর অর্থ-বিত্তের অধিকারী হবার পরও সমাজের লোকজন তাকে একজন অসৎ লোক হিসাবেই জানতো। কারণ জাহিলিয়াতের যুগে কা'বাঘরের ধন-ভান্ডার থেকে একটি সোনার হরিণ চুরি হয়েছিল এবং লোকজন আবু লাহাবকেই সন্দেহ করেছিল। কারণ লোকটি ছিল সাংঘাতিক কৃপণ প্রকৃতির এবং অর্থলোভী। অর্থ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে সে বৈধ বা অবৈধের সীমারেখা অনুসরণ করতো না। বিপুল পরিমাণ অর্থ সে পূঞ্জিভূত করে রেখেছিল। এ ছাড়া মানুষের ছেলে সন্তানও একটি বড় সম্পদ। আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'একজনের পুত্রও তার উপার্জন।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য সূরায় বলেছেন, ঘৃণিত আবু লাহাবের ধন-সম্পদ কোনই কাজে আসবে না। মহান আল্লাহর বাণী অনুসারে সামান্য কিছু দিনের ব্যবধানে ঘটলোও তাই। তার কোন সম্পদই উপকারে আসলো না।

চার হাজার দিরহাম দিয়ে যাকে যুদ্ধে প্রেরণ করলো, সেই যুদ্ধে জাহিলি আদর্শের ধারক-বাহকরা সর্বহারা হলো। তার এক সন্তান বাঘের উদরস্থ হলো। ঘৃণিত অবস্থায় মৃত্যুর সময় তার কাছে কেউ এলো না। গলিত লাশ তিনদিন পড়ে রইলো। কিছু লোক অর্থের বিনিময়ে সেই লাশ গর্তে ফেলে দিলো। যে ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে সে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশপ্ত হলো, তার মৃত্যুর পরে তারই সন্তানরা ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছিল। তার দুর্‌রা নামক এক মেয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মক্কা বিজয়ের সময় তার অপর দুই পুত্র উত্‌বা এবং মুয়াত্তাব হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করেছিল। গোটা আরবের লোকজন দেখলো, আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করতে গিয়ে আবু লাহাব কত ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করলো। এভাবে মহান আল্লাহর ভবিষ্যৎ বাণী লোকজন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে দেখলো।

আল্লাহর কোরআনের এই বাণী শুধু আবু লাহাবের জন্যই প্রযোজ্য নয়। কিয়ামত পর্যন্ত যারা মহান আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে আবু লাহাবের অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে, তাদের সবারই ঐ একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। নিকট ইতিহাস সাক্ষী, যারাই কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘৃণিত ভূমিকা পালন করেছে, তাদের কেউ-ই সম্মানের সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারেনি।

ইরানের রেজাশাহ্ পাহ্লভী ক্ষমতার মসনদের বসেই প্রভু আমেরিকার নির্দেশে দেশের তাওহীদি জনতার মিছিলে ট্যাংক, কামান চালিয়ে রক্তের প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী অগণিত আদম সন্তানকে নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন করে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিয়েছে। এরপরও জনতার আন্দোলনের বিজয় ঠেকাতে পারেনি আবু লাহাবের উত্তরসুরী রেজাশাহ্ পাহ্লভী। নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে সে। পলায়নকালে নিজের একান্ত বাধ্যগত বিমান চালকও তার ব্যক্তিগত বিমান চালাতে রাজি হয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে সে নিজেই বিমান চালিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা তাকে পচা ইঁদুরের মতোই দূরে ছুড়ে দিয়েছিল। সেখানে তাকে জায়গা দেয়নি, সে চলে যেতে বাধ্য হলো পানামায়। সেখানেও তার জায়গা হলো না। চলে গেল মিসরে, বিপুল সহায়-সম্পদ আর জনবল থাকার পরেও সেই স্বৈরাচারকে মিসরের অখ্যাত হাসপাতালের বারান্দায় অসহায় অসম্মানজনক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

তুরস্কের কামাল পাশা, ইসলামের নাম শুনলে যার গাত্রদাহ শুরু হতো। আরবী বর্ণমালা সে সহ্য করেনি। মুয়াজ্জিনের আযানের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল আর তখনি সেই মুয়াজ্জিনকে ধরে টুকরো টুকরো কেটে নির্মমভাবে হত্যা করালো কামাল পাশা। অগণিত আলেম এবং ইসলামপন্থী লোকদেরকে সে নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিলো। মুসলিম নারীদেরকে বোরকা পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো আবু লাহাবের সেই উত্তরসুরী। এমনকি মুসলিম নারী মাথায় ওড়না ব্যবহার করবে, এটাও সহ্য করা হয়নি তুরস্কে। এই সেদিনও কামাল পাশার উত্তরসুরীরা মাথায় ওড়না ব্যবহারের কারণে পার্লামেন্টের একজন মুসলিম নারীর সদস্যপদ পর্যন্ত বাতিল করে দিয়েছে।

মিসরের জামাল উদ্দিন নাসের–মিসরের তাওহীদি জনতার ওপরে অবর্ণনিয় নির্যাতন চালিয়েছে। কালের শ্রেষ্ঠ সন্তান কোরআনের সৈনিকদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। দ্বীনি আন্দোলনের অগণিত সৈনিকদেরকে সহায়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। হাসানুল বান্নাকে গুলী করে শহীদ করা হয়েছে। জয়নাব আল গাজালীর মতো বিদূষী নারীর ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন করা হয়েছে। বিশ্ব-বিখ্যাত কালজয়ী তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন রচয়িতা সাইয়েদ কুতুবকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তার ওপরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দিয়ে জামাল আব্দুন নাসের প্রহরীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, দেখে এসো তো; কুকুরের সাথে আমার কুকুরগুলো কেমন ব্যবহার করছে!

প্রহরীরা সাইয়েদ কুতুবের কক্ষে গিয়ে দেখেছে, তিনি নামাজে সিজ্দায়রত আছেন, আর তাদের লেলিয়ে দেয়া হিংস্র কুকুরগুলো তার ওপরে আক্রমণ করার পরিবর্তে তাকেই প্রহরা দিচ্ছে। পরিশেষে জালিম নাসের আল্লাহর সৈনিক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করে দিয়েছে। কামাল পাশা, জামাল আব্দুন নাসের ও রেজাশাহ্ পাহলভীসহ আবু লাহাবের

উত্তরসূরীদের পরিণতি ঐ আবু লাহাবের অনুরূপই হয়েছে। আল্লাহর কোরআনের এই ভবিষ্যৎ বাণী কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই বাস্তবায়িত হতে থাকবে।

মৃত্যুর পরে পরকালীন জগতে আবু লাহাব এবং তার অনুসারী দল আল্লাহর জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখায় নিমজ্জিত হবে। শুধু আবু লাহাবই নয়, তার স্ত্রী–যার প্রকৃত নাম ছিল আরদা বা আরওয়া এবং চেহারার দিক থেকে অপূর্ব সুন্দরী হওয়ার কারণে তাকে ডাকা হতো উম্মে জামিল নামে, সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন। এই নারী আল্লাহর রাসূলের সাথে কতটা জঘন্য আচরণ করতো, তা আলোচ্য সূরার পটভূমিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই নারী স্বভাবের দিক থেকেও অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির ছিল। একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে দিয়ে অথবা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কথা বানিয়ে বলার ব্যাপারে তার জুড়ি ছিল না। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ঐ ঘৃণিত নারী রাতের অন্ধকারে কন্টকযুক্ত গাছের শাখা এনে রাসূলের ঘরের সামনে বা চলার পথে বিছিয়ে রাখতো। এ কারণেই আলোচ্য **সূরার ৪ নম্বর আয়াতে** তাকে 'কাঠ বহনকারিণী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আবু লাহাব কুরাইশদের চারজন শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন ছিল। তার স্ত্রী কণ্ঠে একটি বহু মূল্যবান অলঙ্কার ব্যবহার করতো। সে দেব-দেবীদের নামে শপথ করে বলতো, প্রয়োজনে সে এই অলঙ্কার বিক্রি করে সেই অর্থ দ্বীনি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার কাজে ব্যয় করবে। কন্টকযুক্ত গাছের শাখা সে রাতের অন্ধকারে খেজুর গাছের পাতার তৈরী রশি দিয়ে বেঁধে এনে রাসূলের ঘরের সামনে বিছিয়ে রাখতো। এ জন্যই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তার কণ্ঠেও সেই মূল্যবান অলঙ্কার খেজুর পাতার পাকানো রশির মতোই ঝুলতে থাকবে।

আরবী ভাষায় খুব বেশী পাকানো রশিকে 'মাসাদ' বলা হয়। তার কণ্ঠহার কিয়ামতের দিন পাকানো রশির মতোই ব্যবহৃত হবে। যে অলঙ্কার নিয়ে সে গর্ব আর অহঙ্কার প্রদর্শন করতো, সেই অলঙ্কারই তার কণ্ঠনালীকে এমনভাবে বেষ্টন করবে যে, তার শ্বাস নেয়ার কোন সুযোগ থাকবে না। জাহান্নামের জ্বালানী কাঠের মতোই এই নারীকে আল্লাহ তা'য়ালার ফেরেশ্তারা বেঁধে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে। যুগে যুগে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের মতোই যেসব নারী আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ভূমিকা অবলম্বন করবে, তারাও কিয়ামতের দিন উম্মে জামিলের সাথেই জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

সূরা ইখলাস

মক্কায় অবতীর্ণ–পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং–১১২

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ–এ সূরাটির নাম হলো 'ইখলাস'। এটা শুধু নামই নয় বরং এই সূরার যা বিষয়বস্তু তার শিরোনামও এটা। কারণ এ সূরায় খালেস তাওহীদ, একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল তাওহীদের কথা বলা হয়েছে। কোরআনের অন্যান্য সূরায় উল্লেখিত কোন একটি শব্দকে সে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এ সূরায় ইখলাস শব্দটির উল্লেখ কোথাও নেই। এ সূরার অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার দৃষ্টিতেই আলোচ্য সূরার এই নামকরণ করা হয়েছে। আসলে যে ব্যক্তিই এ সূরাটির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে এর মূল কথার প্রতি ঈমান আনবে সে শিরক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ সূরাটি মক্কায় অথবা মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, এ বিষয়ে মতভেদ বিরাজমান। এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে হাদীসে যেসব বর্ণনা এসেছে তা বিভিন্ন মতের উৎস। এখানে সেসব বর্ণনা একাধারে পেশ করা হচ্ছে। তাহলে এ সূরা মক্কী না মাদানী এ মতপার্থক্য কেন ঘটেছে, তা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যাবে।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা বর্ণনা করেন, নাজরানের সাতজন পাদ্রী এসে আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করলো, আমাদেরকে বলুন আপনার রব কি ধরণের, কি জিনিস দিয়ে তৈরী ? আল্লাহর নবী বললেন, আমার রব কোন জিনিস দিয়ে তৈরী নন, তিনি এসব থেকে স্বতন্ত্র। এ সময়ে আল্লাহ এ সূরা ইখলাস অবতীর্ণ করেন। ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বলেন, ইহুদীদের একদল লোক রাসূলের কাছে এলো। তাদের ভেতরে কায়াব ইবনে আশরাফ ও হুওয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তারা জানতে চাইলো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনার রব্ব কি ধরনের যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন, বলুন ? তখন আল্লাহ এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, খায়বরের কয়েকজন ইহুদী আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলেছিল, হে আবুল কাশেম ! আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আবরণের নূর থেকে, আদমকে মাটির পচা গলা গাড়া থেকে, ইবলিসকে অগ্নিশিখা থেকে, আকাশ মন্ডল ধূম্র থেকে এবং পৃথিবীকে মাটির ফেনা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন বলুন, আল্লাহকে কি দিয়ে বানানো হয়েছে ? আল্লাহর রাসূল তাদের এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। পরে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে তাঁকে বললেন, হে রাসূল আপনি বলে দিন, 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ'। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একজন আরব আল্লাহর রাসূলকে বললো, আপনার রব-এর বংশ পরিচয় আমাদেরকে বলুন। তখন আল্লাহ এই সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

আমের ইবনুত তোফায়েল আল্লাহর রাসূলকে বললো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আপনি আমাদেরকে কোন জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন ? আল্লাহর রাসূল বললেন, আল্লাহর দিকে। আমের বললো, তাহলে আপনি আমাদেরকে আল্লাহর পরিচিতি বলুন। তিনি স্বর্ণ নির্মিত না রোপ্য নির্মিত অথবা লোহা দ্বারা নির্মিত। এরপর জবাবে সূরায়ে ইখলাস অবতীর্ণ হয়েছিল।

আবুল আলীয়া হযরত উবাই ইবনে কায়াবের সুত্রে বলেছেন, মুশরিকরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনার মাবুদের বংশ পরিচয় আমাদেরকে বলুন। তখন

আল্লাহ এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। দাহ্হাক, কাতাদাহ ও মুকাতিল বর্ণনা করেন, ইহুদীদের কয়েকজন আলেম আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আপনার আল্লাহর পরিচিতি আমাদেরকে বলুন। আমরা হয়ত আপনার ওপরে ঈমান আনতে পারি। তাওরাতে আল্লাহ নিজের পরিচিতি বলেছেন। আপনি বলুন তিনি কোন জিনিস দিয়ে তৈরী। কোন পদার্থের না স্বর্ণ নির্মিত না তামা, পিতল, লোহা বা রোপ্য নির্মিত। তিনি কি আহার করেন, তিনি দুনিয়াকে কার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন এবং তাঁর পরে এ দুনিয়ার উত্তরাধিকারী কে হবে? এর জওয়াবে আল্লাহ সূরায়ে ইখলাস অবতীর্ণ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলকে বলেছিল, আপনার আল্লাহর বংশ তালিকা আমাদেরকে বলুন। তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। আরবরা যখন কোন অপরিচিত লোকের সাথে পরিচিত হতে চাইতো তখন তারা বলতো, 'এ ব্যক্তির বংশ তালিকা আমাদেরকে বলো।' কারণ কারও সাথে পরিচিত হওয়ার ও কারো পরিচয় লাভ করার ক্ষেত্রে তার বংশ তালিকা ও গোত্র জানাই ছিল তাদের আবহমান কালের রীতি। তাই তারা আল্লাহর রাসূলকে বলেছিল, আপনার রব্ব-এর বংশ তালিকা বলুন।

এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর রাসূল মানুষকে যে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, মানুষ সে আল্লাহর পরিচয় জানার জন্য প্রশ্ন করছিল। আর তাদের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বনবী এ সূরাটি পেশ করছিলেন। সর্বপ্রথম মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলকে আল্লাহ সম্পর্কিত প্রশ্ন করলে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং পরবর্তীতে মদীনায় আল্লাহর রাসূল ঐ একই প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরা ইখলাস পেশ করার আদেশ দেয়া হয়। এসব বর্ণনার প্রত্যেকটিতেই যেমন বলা হয়েছে, 'এই সময় সূরাটি অবতীর্ণ হয়' এ কারণে এ কথা মনে করার অবকাশ নেই যে, এসব বর্ণনা বোধহয় পরস্পর বিরোধী।

আসলে তা নয়। প্রকৃত বিষয় হলো, কোন বিষয়ে একবার কোন আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হলে পরে উক্ত বিষয়ে যখনই আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তর বা বিষয় অমুক আয়াতে বা সূরায় রয়েছে। অথবা তাদের প্রশ্নের উত্তরে অমুক আয়াত বা সূরা পড়ে শুনিয়ে দিন। হাদীসসমূহের বর্ণনাকারীগণ এ ধরণের ঘটনার বর্ণনা করেন এ ভাষায় যে, অমুক ব্যাপার ঘটেছিল বা অমুক প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন এ আয়াত বা এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এই ব্যাপারকে 'পুনরায় অবতীর্ণ' হওয়াও বলা হয়। অর্থাৎ বিশেষ কোন আয়াত অথবা সূরার একাধিকবার অবতীর্ণ হওয়া।

সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, এ সূরাটি মক্কী–সর্বপ্রথমত মক্কায় এটা অবতীর্ণ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এর বিষয়বস্তু চিন্তা করলে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, এই সূরা মক্কায় সেই প্রথম যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল। সে সময় পর্যন্ত আল্লাহর মূল সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয়দানের উদ্দেশ্যে অন্য কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। অথচ লোকজন আল্লাহর রাসূলের কাছে আল্লাহর দাসত্ব করার কথা শুনে এ কথা জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল যে, যে আল্লাহর দাসত্ব করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, সে আল্লাহ কি ধরনের। এটা যে একেবারে প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম তার আরেকটি প্রমাণ রয়েছে। মক্কায় হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে যখন উত্তপ্ত বালুর ওপরে বুকের ওপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখতো ইসলাম বিরোধিরা,

তখন তিনি 'আহাদ আহাদ' বলে আল্লাহকে ডাকতেন। এই 'আহাদ' শব্দটি এ সূরা থেকেই গৃহীত। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সূরাটি মক্কায় প্রাথমিককালে অবতীর্ণ।

এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ বিশ্লেষণ পর্যায়ে ওপরে উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের ওপর একবার সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আল্লাহর রাসূল যখন তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন আল্লাহ সম্পর্কে পৃথিবীর ধর্মসমূহের ধারণা কি ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূর্তিপূজক মুশরিকরা কাঠ, পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি পদার্থ দিয়ে নির্মিত দেব-দেবীর পূজা করছিল। এগুলোই ছিল তাদের খোদা। তাদের খোদাদের আকার আকৃতি ও দেহ ছিল। দেব-দেবীর যথারীতি বংশধারা চলতো। তাদের কোন দেবী স্বামীহীনা ছিল না। কোন দেবতা স্ত্রীহারা ছিল না। তাদের পানাহারের প্রয়োজন হতো এবং তাদের পূজারীরা এর ব্যবস্থা করে দিতো। মুশরিকদের মধ্যে অনেক লোক বিশ্বাস করতো, আল্লাহ মানবীয় আকার আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। আর কোন কোন মানুষ আল্লাহর অবতার হয়ে থাকে। তখনকার খৃষ্টানরা এক খোদা বিশ্বাস করতো বলে দাবি করতো, কিন্তু তাদের সে এক খোদার অন্তত একজন তো পুত্র ছিলই। আর খোদায়ীর ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রের অংশীদার ছিল। এমনকি তার মাতাও ছিল এবং শাশুড়ীও ছিল। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

ইহুদীরা এক খোদার পূজারী হলেও তাদের ধারণা ছিল, খোদার দেহ আছে এবং তিনি মানবীয় গুণের উর্ধ্বে নন। তাদের সে খোদা ভ্রমণ বিলাসী ছিল, কুস্তি লড়তো, মুষ্ঠিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। তিনিও একটি পুত্রের জন্মদাতা ছিলেন এবং সে পুত্রের নাম ছিল উযাইর। এসব ধর্ম বিশ্বাসী লোকদের বাইরে ছিল অগ্নিপূজক–মজুসী ও নক্ষত্র পূজারী সাবেয়ী। এ অবস্থায় লোকদেরকে যখন এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার আহ্বান জানানো হলো, তখন তাদের মনে সেই আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে উপাস্য হিসেবে চলে আসা সব রব ও মাবুদকে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহকে মাবুদ মেনে নেয়ার এই যে আহ্বান করা হচ্ছে, সেই মাবুদের পরিচয় জানার আকাংখা মানুষের মনে তীব্র হয়ে উঠেছিল।

কোরআনে এ প্রশ্নের জওয়াবে মাত্র কয়েকটি শব্দসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্র সূরা অবতীর্ণ করে আল্লাহর মহান সত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করেছে। কোরআনের এই জওয়াবে আল্লাহ সম্পর্কে সব ধরনের মুশরিকী ধারণা কল্পনার মুলোৎপাটন হয়ে গিয়েছে। এটা শিরক আকীদার সূচীভেদ্য অন্ধকারের চির অবসান ঘটিয়েছে। আল্লাহর সত্তার সাথে সৃষ্টিকুলের মধ্যে কারো কোন গুণের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য হওয়ারও কোন অবকাশই থাকলো না। প্রকৃতপক্ষে এটা মহান আল্লাহর কোরআনের এক অতি বড় চিরন্তন মুজিযা আর কিয়ামত পর্যন্ত এই মুজিযা অক্ষুন্ন থাকবে ইনশাল্লাহ।

এ কারণেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাটির অসংখ্য ফযিলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি মুসলমানদেরকে নানাভাবে এর গুরুত্ব অনুধাবন করানোর চেষ্টা করেছেন। তাওহীদের অনুসারীরা এই সূরাটি অধিক পাঠ করুক এবং মানুষের মাঝে এর সর্বাধিক প্রচার ঘটুক এবং বিস্তৃতি লাভ করুক, আল্লাহর রাসূলের এটাই ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা। কারণ এ সূরায় ইসলামের মৌলিক আকীদা তওহীদ মাত্র চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কথাগুলো কর্ণে প্রবেশ মাত্রই তা মানসপটে স্থায়ী ও সুদৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায় এবং অতি সহজেই একে মুখস্থ করা যায়।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, এই সূরাটি এক তৃতীয়াংশ কোরআনের সমান। কোরআনের গবেষকগণ আল্লাহর রাসূলের এ কথার নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহর কোরআন যে ইসলাম পেশ করে, তার প্রধান আকীদা তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত। এ তিনটি হলো হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। এ সূরাটি নির্ভেজাল ও অকাট্য তাওহীদের আকীদা পেশ করে। গবেষকগণ বলেন, এ কারণেই আল্লাহর নবী এই সূরাকে আল্লাহর কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান বলেছেন।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন এক অভিযানে আল্লাহর রাসূল একজনকে নেতা বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি অভিযানে থাকালীন প্রত্যেক নামাযেই এ সূরা তেলওয়াত করতেন। অভিযান থেকে ফিরে আসার পরে লোকজন বিষয়টি আল্লাহর রাসূলকে জানালে তিনি তাঁকে প্রশ্ন করার কথা বলেছিলেন। লোকজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলো, তুমি এমন কেন করেছিলে ? লোকটি বলেছিল, এ সূরায় আল্লাহর পরিচয় ও গুণ বলা হয়েছে। এ কারণে তা পাঠ করতে আমার অত্যন্ত ভালো লাগে। আল্লাহর রাসূল এ কথা শুনে বলেছিলেন, সেই লোককে বলো, আল্লাহও তাকে পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এক আনসার ব্যক্তি কুবা মসজিদে নামাজ আদায় করছিলেন। তাঁর নিয়ম ছিল প্রত্যেক রাকায়াতে প্রথমে এ সূরা পাঠ করে পরে অপর যে কোন সূরা পাঠ করতেন। লোকজন এতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, তুমি এমন করছো কেন ? এ সূরা পাঠ করার পরে একে যথেষ্ট মনে না করে তুমি এর সাথে আরেকটি সূরা মিলিয়ে পাঠ করছো এটা ঠিক নয়। হয় এ সূরা পাঠ করো না হয় একে বাদ দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করো। কিন্তু এভাবে মিলিয়ে পাঠ করো না।

লোকটি বলেছিল, আমি তা ত্যাগ করতে পারিনা। তোমরা চাইলে আমি ইমামতি করবো, না চাইলে আমি তা ছেড়ে দেবো। শেষে বিষয়টি আল্লাহর রাসূলের কাছে পেশ করা হলে তিনি লোকটিকে বললেন, তোমার সাথীরা যা চায় তা করতে তোমার বাধা কোথায়? লোকটি বললো, এ সূরাটিকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, এ সূরাটি এবং তোমার এমন ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়েছে।

কোন প্রয়োজনে এ সূরা এক হাজার বার পাঠ করে নফল নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে আবদেন জানালে মহান আল্লাহ তা কবুল করেন। এ সূরা যারা প্রতি দিন যতবার সম্ভব পাঠ করবে, মহান আল্লাহ তাদেরকে অভাব মুক্ত রাখবেন। এ সূরা বার বার অর্থসহ বুঝে পাঠ করলে হৃদয়-মন শিরক্ মুক্ত থাকে।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে––

রুকু ১

(১) (হে নবী) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি একক, (২) তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন, (৩) তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। (৪) (আর) তাঁর সমতুল্যও দ্বিতীয় কেউ নেই।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আরবের লোকগুলো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল না, বরং তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল, এ কথা আমরা এই তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি। তবে তারা আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীসহ তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ক্ষমতা বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। সুতরাং যাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেই দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য তার পূজা আরাধনা করতে হবে–এটাই ছিল তাদের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস অনুসারেই তারা জীবন পরিচালিত করতো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার একচ্ছত্র গোলামীর দিকে তাদেরকে আহ্বান জানালেন, রাসূলের এই আহ্বান ছিল তাদের কাছে শতাব্দী সঞ্চিত চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিপন্থী। এ জন্যই তারা আল্লাহর রাসূলকে স্বয়ং আল্লাহর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং প্রশ্নের ধরণ কেমন ছিল, তা আমরা এই সূরার শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ে উল্লেখ করেছি।

আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতেই রাসূলকে নির্দেশ দেয়া হলো-আপনি বলে দিন, আমি যে রব্ব-এর দাসত্বের দিকে তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি এবং আমি স্বয়ং যাঁর দাসত্ব করি, তিনি নতুন কোন আল্লাহ নন। তিনি তোমাদের চিরপরিচিত আল্লাহ, চরম বিপদের মুহূর্তে তোমরা যাঁর কাছে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকো। আল্লাহ বলতে তোমরা যে শক্তিকে বুঝো, আমিও সেই শক্তির গোলামী করার জন্যই তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। তোমরা যাঁকে নিজের স্রষ্টা বলে জানো, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর ভেতরে যা কিছুই রয়েছে, তার স্রষ্টা হিসাবে জানো, তোমাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক হিসাবে যাঁকে জানো, আলো-বাতাস দানকারী, বৃষ্টি বর্ষণকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, প্রকাশ্যে ও গোপনে যাবতীয় কিছু শ্রবণকারী ও দর্শনকারী এবং আশ্রয় দানকারী হিসাবে যে শক্তিকে তোমরা জানো, আমি সেই আল্লাহর দিকেই তোমাদেরকে ডাকছি। আমি নতুন কোন মা'বুদের দিকে তোমাদেরকে ডাকছি না।

তৎকালীন আরবে 'আল্লাহ' শব্দটি অপরিচিত ছিল না। আল্লাহর অস্তিত্বে তারা বিশ্বাসী ছিল এবং যে কা'বাঘরে তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে তাদেরকে উপাস্য হিসাবে মানতো, সেই

ঘরকেও তারা কখনোই 'মূর্তিদের বা উপাস্যদের ঘর' বলতো না। সেই ঘরকেও তারা আল্লাহর ঘর হিসাবেই মানতো এবং এ জন্যই বলতো 'বায়তুল্লাহ্'। আবরাহার আক্রমণের সময়েও তারা সমস্ত উপাস্যদের বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেয়েছিল। তাদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহর রাসূলও মহান আল্লাহর আদেশে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের একান্ত পরিচিত সেই আল্লাহর দিকেই আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, নতুন কোন মা'বুদের দিকে অবশ্যই নয়। সেই আল্লাহ্ হলেন এক এবং একক। তাঁর কোন বিকল্প নেই। এ জন্যই আলোচ্য আয়াতে 'আহাদ'–অর্থাৎ একক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ওয়াহিদ-অর্থাৎ এক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্যই 'আহাদ' শব্দটি নিরঙ্কুশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ অস্তিত্বের জগতে শুধু তাঁরই সত্তা এমন যে, তাঁর সত্তায় কোন দিক দিয়েই বহুত্বের কোন অবকাশ নেই। তাঁর এককত্ব বা অনন্যতা সমস্ত দিক দিয়েই পরিপূর্ণ এবং অতুলনীয়। গোটা সৃষ্টিজগতের অন্য কোন জিনিসই সেই আল্লাহর অগণিত গুণের একটি গুণেও গুণান্বিত নয়। শুধুমাত্র তিনিই একক ও অনন্য, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই, তিনিই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'আল্লাহ্-আল ইলাহ্' শিরোণাম দেখুন।)

আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে সেই আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তিনি কারোরই মুখাপেক্ষী নন।' অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারেই তিনি কারো মুক্ষাপেক্ষী নন-বরং তিনিই সমস্ত কিছুর ওপরে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং বিশ্বলোকের সমস্ত কিছুই একান্তভাবে তাঁরই মুখাপেক্ষী। মূর্তিপূজক মুশরিকদের ধারণা স্বয়ং স্রষ্টা তার ক্ষমতার দফতর বিভিন্ন জনের ওপরে বন্টন করে দিয়েছে। রিযিক, ধন-দৌলত দানের ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়েছে, কাউকে রোগাক্রান্ত করা ও রোগ থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কাউকে মনোবাসনা পূরণকারী, আশা-আকাংখা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কাউকে ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, আবার কাউকে জয়-পরাজয়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। স্রষ্টা একজন সরকার প্রধানের অনুরূপ। সরকার প্রধানের কাছে কোন আবেদন পৌছাতে হলে বা তার কাছে যেতে হলে যেমন অনেকের মাধ্যমে যেতে হয়, তেমনি স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জন করতে হলেও কারো মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। সরকার প্রধান যেমন নানা দুর্বলতার কারণে একা দেশ পরিচালনা করতে অক্ষম বলেই তিনি উপদেষ্টা পরিষদ, মন্ত্রী পরিষদ ইত্যাদি গঠন করে তাদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করে থাকেন, তেমনি স্রষ্টাও নানা ধরনের দফতরের মাধ্যমে তার সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করছেন।

রাসূলের কাছে যারা স্বয়ং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের ধারণা বা বিশ্বাস ছিল উপরোক্ত রূপ। অর্থাৎ তারা যে 'স্রষ্টার' সাথে পরিচিত, সেই স্রষ্টা দুর্বলতা মুক্ত নন। একা তার পক্ষে সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলেই তিনি বিভিন্ন দফতরের মাধ্যমে সৃষ্টিজগৎ পরিচালনা করে থাকেন। বিভিন্ন দফতরের দায়িত্বশীলদের মধ্যে তিনি ক্ষমতা বন্টন করে দিয়েছেন। এইসব দায়িত্বশীলগণও স্ব স্ব ক্ষেত্রে একজন মা'বুদ বা ইলাহ্। স্বয়ং স্রষ্টার যেমন উপাসনা করতে হবে, ঐ সব মা'বুদদেরও উপাসনা করতে হবে। মুশরিকদের ধারণা-বিশ্বাস খন্ডন করে আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, তিনি শুধু একই নন–একক, তিনি ওয়াহিদ নন, আহাদ। তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন। তিনি এমন দুর্বল নন যে, তাঁর ক্ষমতা কারো ভেতরে বন্টন করে দিতে হবে। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ একান্তভাবেই তাঁর মুখাপেক্ষী। পৃথিবীর

প্রত্যেকটি জিনিস নিজের অস্তিত্ব ও স্থিতির জন্য, নিজের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব নিবৃত্তির জন্য সচেতনভাবে শুধুমাত্র তাঁরই প্রতি করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীর ছোট্ট একটি অণু থেকে বিশাল ঐ আকাশের যে কোন প্রয়োজন তিনিই পূরণ করে থাকেন।

আল্লাহ–তিনি একক, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র তাঁরই জন্য, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই তাঁর তাস্বীহ্ করছে, তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর রব্ব, তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, প্রবল ক্ষমতাশালী, শ্রবণকারী, তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত, তিনি আকার আকৃতি রচনাকারী, তিনি প্রশস্ততা বিধানকারী, সুক্ষ্মদর্শী, আকাশ ও যমীনের স্রষ্টা, অপরিসীম বরকতশালী, তিনি কারো কাছে দায়ী নন বরং প্রত্যেকে তাঁরই কাছে দায়ী, আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তাঁর সামনে সিজ্দাবনত, তাঁর থেকে পালিয়ে বাঁচার কোনো উপায় নেই, তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী। তিনি দোয়া শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী, সব ব্যাপারের চূড়ান্ত পরিণতি তাঁরই হাতে, তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অধিকার কারো নেই, কেউ তার অংশীদার হওয়া থেকে তিনি পবিত্র, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর রাজত্বে কেউ অংশীদার নেই, তিনিই মানুষের রব্ব ও মালিক, কোনো অংশীদার ব্যতীতই তিনি একাই সৃষ্টিকার্য সম্পদান করেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর সব সৃষ্টির তত্ত্বাবধানকারী তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই, তিনি সমস্ত ভান্ডারের মালিক, সমগ্র সৃষ্টিলোকের তিনিই পরিচালক ও শাসক।

তিনিই সমস্ত কিছুর রক্ষক, কেউ তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয় এবং তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। তিনি অজয়, অমর, চির শাশ্বত, তিনি রিযিক দান করেন–গ্রহণ করেন না। তিনি একক অবিভাজ্য সত্তা, অসংখ্য জিনিসের সংযোজনে তৈরী নন, অবিভাজ্য, অবন্টনীয় সমগ্র সৃষ্টিলোকের ওপর তাঁর প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠতম। যে কোন ধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত। তিনিই মা'বুদ, সমস্ত সৃষ্টি একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে, তিনিই একমাত্র দাসত্ব লাভের অধিকারী। তাঁর কাজের ব্যাপারে কোন দফতর বন্টন করতে হয় না। তাঁর কাজে কেউ অংশগ্রহণ করবে, এই শক্তি ও অধিকার কারো নেই। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলকে বলে দিলেন, আপনি এভাবেই আমার প্রকৃত পরিচয় প্রশ্নকারীদের কাছে জানিয়ে দিন যে, আমি ঐ আল্লাহর দিকেই তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। যেহেতু তিনিই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক, সেহেতু একমাত্র তাঁরই ইবাদাত, বন্দেগী, গোলামী, দাসত্ব ও উপাসনা করতে হবে।

মক্কার মুশরিকসহ পৃথিবীর সমস্ত মুশরিকদের ধারণা হলো, স্রষ্টা এই সৃষ্টিজগৎ পরিচালনার ব্যাপারে যাদের ভেতরে ক্ষমতা বন্টন করে দিয়েছেন, তারা স্রষ্টার বিশেষ আত্মীয়-পরিজন। এদের কারো ধারণা হলো, ফেরেশ্তাগণ হলেন আল্লাহর মেয়ে এবং জ্বিন হলো আল্লাহর কাজের অংশীদার। কারো ধারণা হলো, তিনি অসংখ্য সন্তান-সন্ততির অধিকারী এবং তাদের হাতেই তিনি আপন ক্ষমতা ন্যস্ত করেছেন। আবার কারো বিশ্বাস হলো, কল্যাণের স্রষ্টা একজন এবং অকল্যাণের স্রষ্টা আরেকজন। আবার কারো ধারণা হলো, তিনি স্বয়ং কোন সন্তান জন্ম দেননি বটে, কিন্তু তিনি সন্তান দত্তক নিয়েছেন বা কাউকে সন্তান বানিয়েছেন। অর্থাৎ স্রষ্টা আপন সৃষ্টিকে পরিচালনার ব্যাপারে কোন উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করতে অক্ষম বলেই তিনি তার উত্তরাধিকারী বানানোর জন্য অন্য কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুশরিকদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুসারে স্রষ্টা মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। তিনি বিশেষ জাতিভুক্ত এক সত্তা বিশেষ। তিনি বিয়ে করেন, তার সন্তান হয়, পিতা-মাতার মাধ্যমে তিনি

জন্মগ্রহণ করেন, উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য সন্তান জন্মদানে অপারগ হলে তিনি অন্যের সন্তান দত্তক গ্রহণ করেন। অর্থাৎ মানুষের যে অবস্থা হয়, মানুষের স্রষ্টারও সেই একই অবস্থা হয়। মানুষের সাথে স্রষ্টার পার্থক্য মাত্র শক্তির ক্ষেত্রে।

মুশরিকদের এই জাহিলি ধ্যান-ধারণা খন্ডন করে **আলোচ্য সূরার ৩ ও ৪ আয়াতে** বলা হয়েছে, 'তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তার সমতুল্যও দ্বিতীয় কেউ নেই।' প্রশ্নকারীরা আল্লাহর পরিচয় জানতে চাইলো এবং আলোচ্য সূরার ১ ও ২ নম্বর আয়াতে জানিয়ে দেয়া হলো, তিনি একক এবং অভাবশূন্য তথা যে কোন ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত। ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে প্রশ্নকারী মুশরিকদের যাবতীয় অমূলক ধারণা, কল্পনা, বিশ্বাস ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে জাহিলি চেতনার মুলোৎপাটন করে বলা হলো, তাঁর থেকে যেমন কেউ জন্ম নেয়নি অনুরূপ তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোন সন্তান নেই। এমনকি সমগ্র সৃষ্টিলোকে তাঁর অনুরূপ, তাঁরই মতো, তাঁর সমকক্ষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, তাঁর কাজ, ক্ষমতা ও ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি দিক দিয়ে একবিন্দু পরিমাণ সমকক্ষ ও সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন শক্তির অস্তিত্ব ইতিপূর্বে যেমন ছিল না, বর্তমানেও কেউ নেই এবং ভবিষ্যতেও কেউ হবে না।

তাওহীদের প্রতি এভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালাকে যে কোন ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত, অংশীদার থেকে মুক্ত এবং যাবতীয় শক্তির উৎস বলে বিশ্বাস করতে হবে। কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে যারা আসমানী কিতাবের অনুসারী হওয়ার দাবী করতো এবং বর্তমানেও করে আসছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর জগৎ থেকে তাওহীদের অবিকৃত রূপ মুছে গিয়েছে। এ কারণেই তারা কাউকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে এক মারাত্মক ভ্রান্ত আকিদার জন্ম দিয়েছে। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই মৌলিক গলদের কারণেই মানুষের ভেতরে কাল্পনিক দেব-দেবী থেকে শুরু করে কবরে শায়িত মৃত মানুষ ও একশ্রেণীর জীবিত পীরদেরকে ভাগ্য পরিবর্তনকারী হিসাবে বিশ্বাস করে, তাদের সামনে মাথানত করা হচ্ছে, তাদেরকে অসীম শক্তিশালী বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। মানুষের ভেতর থেকে আপন স্রষ্টা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে যাবতীয় অমূলক কাল্পনিক ও স্বকোপলকল্পিত ধ্যান-ধারণা, চেতনা ও বিশ্বাস দূরিভূত করে, খালেস তাওহীদি আকিদা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

এই সূরায় আরেকটি দিক মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা যে কোন ধরনের দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং গোটা সৃষ্টি জগৎ পরিচালনার ব্যাপারে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তিনি এমন দুর্বল নন যে, মানুষের জন্য তিনি জীবন বিধান রচনা করতে সক্ষম হবেন না। বরং তিনিই মানুষের জীবন বিধান রচনাকারী ও দানকারী। মানুষকে একমাত্র তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবন পরিচালনা করতে হবে। মানুষ যখন একমাত্র আল্লাহকে একক সত্তা বলে স্বীকৃতি দেবে, তখন সেই মানুষের এই অধিকার নেই যে, সে অন্য কারো রচনা করা আইন-কানুন অনুসরণ করে। তাওহীদ বিশ্বাসের মৌলিক কথা এটাই, মানুষ কেবলমাত্র এক আল্লাহরই দেয়া আইন-কানুন অনুসরণ করবে, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে। আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ করে অন্য কারো বিধান অনুসরণ করার স্পষ্ট অর্থ হলো, আল্লাহর সাথে শিরক্ করা। আর শিরক্ হলো ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ্ এবং শিরক্কারীর জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম করে দেয়া হয়েছে।

*

সূরা আল-ফালাক

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-১১৩

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ- এই সূরার প্রথম আয়াতে 'ফালাক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং উক্ত শব্দটিকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সূরা ফালাক ও সূরা নাস মক্কায় একই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সূরা দুটোর বিষয়বস্তু, বক্তব্য এতটাই অভিন্ন যে, এই সূরা দুটোকে একত্রে 'মুয়া'ওবিযাতাইন' বলা হয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দুটো সূরা। যদিও কোন কোন গবেষক এ দুটো সূরাকে মাদানী নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সূরা দুটোর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কোরআনের অধিকাংশ গবেষক বলেছেন, এ দুটো সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল যখন দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, তখন মক্কার মুশরিকরা প্রথম দিকে একে কোন গুরুত্বই দেয়নি। কিন্তু ক্রমশ তারা যখন অনুভব করলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ প্রচার করছেন, তা সমাজে বিস্তৃতি লাভ করলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা যে আদর্শ অনুসরণ করে আসছে এবং যে আদর্শের ওপরে তাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে- তখনই তারা বিরোধিতা শুরু করেছিল। প্রথম দিকে তারা মৌখিকভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে যাচ্ছিলো। কিন্তু আল্লাহর ইসলাম যতোই প্রভাব বিস্তার করতে থাকলো, ততোই মক্কার কুরাইশদের বিরোধিতা প্রচন্ড আকার ধারণ করলো। এ সময়ে তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে 'কিছু নাও এবং কিছু দাও' এমন ধরনের একটা আপোষ করার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ মুশরিকরা তাওহীদ ও শিরক্-এ দুটো পরস্পর বিরোধী আদর্শের সহ-অবস্থানের জন্য আল্লাহর নবীর কাছে আপোষ প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছিলো।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরা কাফিরুন অবতীর্ণ করার মাধ্যমে যখন তাদের দেয়া প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হলো, তখন আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে বিরোধিতার প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি করা হলো। বিশেষ করে মক্কার ঐসব পরিবারের পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূলের প্রতি গালি আর অভিশাপ বর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি করা হলো, যেসব পরিবারের দু'একজন সদস্য ইসলাম কবুল করেছিলেন। মক্কার সর্বত্র আল্লাহর নবী সমালোচিত হতে লাগলেন। ইসলামের গতিরোধ করার লক্ষ্যে মক্কার কুরাইশরা বৈঠকের পর বৈঠক করে আল্লাহর রাসূলের তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করতে থাকলো। এমনকি রাসূলকে পৃথিবী থেকে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রও করা হলো। কিন্তু তাদের ভয় ছিল, রাসূলের বংশ বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিব গোত্র বিষয়টি জানতে পারলে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। সুতরাং তারা যেন হত্যাকারীর পরিচয় জানতে না পারে, এ জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করে রাসূলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

আদম সন্তানের চিরন্তন শত্রু খোদ ইবলিস শয়তান এবং জ্বিন শয়তানও এ সময়ে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে মানুষ শয়তানদের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সাধারণ জনগোষ্ঠী যেন আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে অথবা রাসূল যেন তাঁর তৎপরতা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন, এ লক্ষ্যে ইবলিস শয়তান, জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের দল সাম্ভাব্য যাবতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। মক্কার সমাজে সে সময় শিরক্মূলক ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ, যাদুটোনা, তন্ত্র-মন্ত্র ও গণকদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। এসব কুফরী পদ্ধতি অবলম্বন করে

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ক্ষতি করা হতো। আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধেও মুশরিকরা এসব অস্ত্র প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি। রাসূল যেন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন, তিনি যেন উন্মাদ হয়ে যান এবং শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েন, এ লক্ষ্যে তারা তৎপর হয়ে উঠেছিল।

একদিকে আদম সন্তানের চির বৈরী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ইবলিশ শয়তানের চতুরমুখী ষড়যন্ত্র অপরদিকে মানুষ শয়তানের প্রচন্ড বিরোধিতার মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের জন্য এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তিনি নির্বিঘ্নে জীবন-যাপন করবেন সে উপায় আর থাকলো না। সামনে পেছনে, ডানে বামে তিনি যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেদিকেই বিরোধিতার প্রচন্ড ঝড় দেখতে পান। কোথাও যেন কোনো আশ্রয় তাঁর জন্য নেই। ঠিক এই পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই সূরা দুটো অবতীর্ণ করে তিনি তাঁর রাসূল ও অনুগত বান্দাহ্দেরকে জানিয়ে দিলেন, এই অবস্থায় পৃথিবীর বস্তুগত আশ্রয়ের কোনো প্রয়োজনই তোমাদের নেই। তোমাদের সমাজ, দেশ ও জাতি সত্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে তোমাদেরকে এক মুহূর্তকাল সহ্য করতে রাজি নয়, এ কারণে হতাশ হবার বা আতঙ্কিত হবার কোনোই কারণ নেই। তোমাদের সাথে রয়েছেন তোমাদের স্রষ্টা-প্রতিপালক, গোটা সৃষ্টিলোকের প্রতিপালক, পরিচালক ও শাসক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

অতএব তোমরা আশ্রয় কামনা করো তাঁরই কাছে। সাহায্য কামনা করো এবং তাঁরই ওপরে নির্ভর করো, যিনি তোমাদের রব, শাসক ও ইলাহ। যাবতীয় অকল্যাণ, দুষ্কৃতি, ক্ষতি, অনিষ্ট, হিংসা, যাদুকরের যাদু, হিংসুকদের হিংসা, রাতের অন্ধকারে যারা ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করে, যারা আল্লাহর দ্বীনের দুশমন তাদের ষড়যন্ত্র থেকে একমাত্র তাঁর সাহায্য কামনা করো, তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা চাও। কারণ তিনিই হলেন সব-থেকে বড় আশ্রয়, তাঁর কাছে যারা আশ্রয় গ্রহণ করে, পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই, যারা তার ক্ষতি করতে পারে।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) (হে নবী) তুমি বলো, আমি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিকের আশ্রয় চাই, (২) (আশ্রয় চাই) যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, (৩) আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত) অনিষ্ট থেকে–(বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকারকে (যমীনে) বিছিয়ে দেয়। (৪) (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে জাদু-টোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, (৫) হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি তোমার আশ্রয় চাই, বিশেষ করে) হিংসুক ব্যক্তি থেকে , যখন সে তার হিংসায় জ্বলে ওঠে।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

এই সূরার প্রথম আয়াতেই বলা হয়েছে, হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই তাঁর কাছে যিনি প্রভাতের রব্ব, যিনি উজ্জ্বল প্রভাতের মালিক। আলোচ্য আয়াতে রব্ব এবং ফালাক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (তাফসীরে সাঈদী–সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াতের তাফসীরে রব্ব শব্দের আমরা বিস্তারিত তাফসীর করেছি। আর ফালাক শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সূরা ফাতিহার তাফসীরের 'তিনিই রব্ব-যিনি অসীম অনুগ্রহশীল' শিরোনাম পড়ুন।)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে সমস্ত ঈমানদারকে আদেশ দিয়েছেন, তোমরা যে কোন বিপদে এবং প্রয়োজনে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই সাহায্য কামনা করবে, তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং একমাত্র তাঁর ওপরে নির্ভর করবে। তাওহীদ বিশ্বাসের মূল কথাও এটাই, এর বিপরীত যারা করবে, তারা অবশ্যই শিরক করবে। আমরা সূরা আসরের তাফসীরে এ কথা উল্লেখ করেছি যে, 'আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি' এ কথাটিই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় গুণাবলীসহ তাঁর ওপরে ঈমান আনতে হবে। যে কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে একমাত্র তিনিই রক্ষা করতে পারেন, অন্তরে দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে এবং বাস্তব জীবনেও এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

তাওহীদ বিশ্বাসের অনিবার্য দাবী হলো, যে কোন ব্যাপারে নির্ভর করা ও আশ্রয় প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর কাছেই করা যাবে, অন্য কারো কাছে নয়। এটা তাওহীদি আকিদার দাবীই শুধু নয়, এটা আকিদার অবিচ্ছেদ্য অংশও। মানুষ যেহেতু আল্লাহর গোলাম, সেহেতু তাকে যে কোন প্রয়োজনে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে এবং তাঁরই কাছে যাবতীয় প্রয়োজনে আশ্রয় কামনা করতে হবে। প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণ তাঁর উম্মতদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার কোন ক্ষতি করেন না। তিনি যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, এসব বস্তু ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষ তা ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে। আল্লাহ তা'য়ালা আগুন সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। এই আগুনকে কোন মানুষ যদি ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তাহলে আগুনের দ্বারায় অবশ্যই ক্ষতি হবে। কারণ আগুনের বৈশিষ্ট্যই হলো জ্বালানো। মুশরিকদের ধারণা ও বিশ্বাস হলো, যে কোন বিপদে দেব-দেবী ও জ্বিন তাদেরকে উদ্ধার করতে পারে। কল্যাণ ও অকল্যাণ করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। এ জন্য তারা রোগ থেকে মুক্ত থাকা ও মুক্তি লাভের জন্য, ধন-দৌলত, সম্মান-মর্যাদা, সন্তান লাভ, মনের আশা-আকাংখা বা যে কোন প্রকৃতি দুর্যোগ থেকে দেব-দেবী, মাজারে শায়িত মৃত মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। জীবিত কোন পীর-বুযর্গকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তার কাছে সাহায্য কামনা করে। কিন্তু যারা ঈমানদার–তাওহীদ বিশ্বাসী, তাঁরা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই যাবতীয় ক্ষমতার উৎস, কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বলে বিশ্বাস করবে এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জীবন পরিচালিত করবে।

প্রত্যেক নবী-রাসূলই যে কোন ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর কাছে দৃশ্যমান বস্তুর অনিষ্ট থেকে এবং অদৃশ্যমান জিনিসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তিনি যে ভাষায় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, তা বোখারী, মুসলিম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে। আমরা এখানে কতিপয় দোয়ার বাংলা অনুবাদ পেশ করছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্, আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে অথবা কারো দ্বারা আমি পথভ্রষ্ট হতে, আমি অন্যকে পদস্খলন করতে অথবা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হতে, আমি অন্যকে নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হতে এবং আমি অন্যকে অবজ্ঞা করতে বা নিজে অপরের দ্বারা অবজ্ঞা হওয়া থেকে। আমি বিতাড়িত শয়তান হতে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর করুণাময় সত্বা এবং শাশ্বত সার্বভৌম শক্তির নামে। হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর তুমি যা বন্ধ করে দাও তা দেয়ার মতো কেউ নেই। তোমার গযব হতে কোনো বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারেনা।

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই তোমার গযব হতে। তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করা যায় না; তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য নিজের প্রশংসা যেরূপ তুমি নিজে করেছো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি আমার উপর রহম করো, তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো, তুমি আমার জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির পূরণ করে দাও, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান করো এবং তুমি আমাকে রিযিক দান করো ও আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি মাসীহে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে, আশ্রয় চাচ্ছি জীবন মৃত্যুর ফিৎনা হতে, হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি পাপাচার ও ঋণভার থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কার্পণ্যতা থেকে এবং আশ্রয়

চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম দুঃখ কষ্ট থেকে, দুনিয়ার ফিৎনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান করো, আমার কর্ণের নিরাপত্তা দান করো, আমার চক্ষুতে নিরাপত্তা প্রদান দান করো। আল্লাহ তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি, কুফুরী এবং দারিদ্রতা থেকে, আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহর পূর্ণ গুণাবলীর বাক্য দ্বারা তাঁর কাছে আমি অনিষ্টকর সৃষ্টির অপকার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখো আমার সম্মুখের বিপদ থেকে এবং পশ্চাতের বিপদ থেকে, আমার ডানের বিপদ থেকে এবং বামের বিপদ থেকে, আর উর্ধ্ব দেশের গযব থেকে। তোমার মহত্ত্বে দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ থেকে আগত বিপদ হতে, তথা মাটি ধ্বসে আকস্মিক মৃত্যু হতে। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আর শয়তান এবং তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট হতে এবং কোনো মুসলমানের অনিষ্ট করা হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই পূণ্য আর তাকওয়ার জন্য এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ তোমার কাছে চাই, যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ সাধ্য করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করো দাও। হে আল্লাহ! তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী, আর আমাদের গৃহে রেখে আসা পরিবার পরিজনের তুমি রক্ষণাবেক্ষণকারী।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্ছিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে। হে আল্লাহ ! সপ্ত আকাশের এবং তার ছায়ার প্রভু! সপ্ত যমীন এবং তার বেষ্টিত স্থানের প্রভু! শয়তানসমূহ এবং তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের প্রভু! প্রবল ঝড় হাওয়া এবং যা কিছু ধুলি উড়ায় তার প্রভু! আমি তোমার কাছে এই মহল্লার কল্যাণ এবং গ্রামবাসীর কাছ থেকে কল্যাণ আর এর মাঝে যা কিছু কল্যাণ আছে সবটাই প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এর অনিষ্ট হতে, এর বসবাসকারীদের অনিষ্ট হতে এবং এর মাঝে যা কিছু অনিষ্ট আছে তা থেকে।

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর সৃষ্টি বস্তুর সমুদয় অনিষ্ট থেকে। আল্লাহর ঐ সকল পূর্ণ কথার সাহায্যে আমি আশ্রয় চাই যা কোনো সৎলোক বা অসৎ লোক অতিক্রম করতে পারেনা ঐ সকল বস্তু হতে যা আল্লাহ নিকৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে সৃষ্টি করেছেন। যা আকাশ হতে নেমে আসে এবং যা আকাশে চড়ে, আর যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে। এবং দিন রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই, আর প্রত্যেক আগন্তুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই।

আল্লাহর রাসূলের এসব দোয়া ঈমানদারদেরকে এ কথাই স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, যাবতীয় কিছুর ব্যাপারে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে এবং তাঁর কাছেই আশ্রয়

প্রার্থনা করতে হবে। শুধু তাই নয়, উপরোক্ত দোয়াসমূহ যেন সূরা ফালাক এবং সূরা নাসেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

আলোচ্য সূরার ২ নম্বর আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাহ্দেরকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন, তাঁরই সৃষ্টি করা প্রতিটি জিনিসের অনিষ্ট থেকে। সেই রাতের অন্ধকারে সংঘটিত অনিষ্ট থেকে, যে রাত তিনি মানুষের আরামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। নির্জন রাতে যারা যাদু-টোনা করে মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাদের অপচেষ্টা থেকে। আর যারা হিংসার আগুনে জ্বলে অপরের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাদের সেই অপচেষ্টা থেকে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহ নানা ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যারা অবগত রয়েছেন, তারা তা যথাস্থানে প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু কেউ যদি বস্তুর ক্ষতিকর গুণ সম্পর্কে না জেনে তা ব্যবহার করে, তাহলে তা অবশ্যই ক্ষতি করবে। আল্লাহ তা'য়ালা এমন অনেক ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন, যা ব্যবহার করলে দেহে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে অথবা উদরে প্রবেশ করলে মৃত্যু পর্যন্তও ঘটতে পারে। কিন্তু এসব উদ্ভিদও মানুষের কোনো না কোনো উপকারে অবশ্যই লাগে। এ জন্য যারা এসব ব্যবহার করবে তাদেরকে এর ব্যবহার বিধি জানতে হবে। এ কারণে ঐসব বস্তুর ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে হবে, যেসব বস্তুর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে মানুষের জানা রয়েছে। আর মানুষ অনেক বিষয় সম্পর্কেই জানে না, যা তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব ক্ষতি থেকেও আল্লাহর দরবারে পানাহ্ চাইতে হবে।

উর্ধ্ব আকাশ থেকে প্রতি মুহূর্তে মারাত্মক ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর দিকে ধাবিত হচ্ছে। ক্ষতিকর বাতাস ও গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ এসব ক্ষতিকর বস্তু চোখে দেখতেও পায় না। এসব ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল শিখিয়েছেন। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুর ক্ষতিকর দিক থেকে আল্লাহর রাসূল মহান আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতেন এবং ঈমানদারকেও তা চাইতে হবে। আলোচ্য সূরায় রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যাদুকরদের যাদু থেকে এবং হিংসুকের হিংসা থেকে পানাহ্ চাইতে বলা হয়েছে। অধিকাংশ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে রাতের পরিবেশে। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার রাতের অন্ধকারে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়। আততায়ী হত্যা করার জন্য অন্ধকারের নির্জন পরিবেশকেই বেছে নেয়। চোর-ডাকাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাতের পরিবেশেই অনিষ্ট করে থাকে।

তদানীন্তন আরব সমাজে রাতের অন্ধকারেই এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপরে আক্রমণ পরিচালিত করতো। আল্লাহর রাসূলকে রাতের অন্ধকারেই হত্যা করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এ জন্য রাতের অন্ধকারে যেসব ক্ষতি হতে পারে, তা থেকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য তাঁর বান্দাহ্দেরকে বলেছেন। যারা যাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে থাকে, তারা কোন সুতা বা রশির ওপরে মন্ত্র পাঠ পূর্বক ফুঁক দেয় আর একটি করে গিরা দিতে থাকে। এ জন্য আলোচ্য সূরায় 'গিরায় ফুঁক' দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একশ্রেণীর চরিত্রহারা ভ্রষ্টা নারী পছন্দের পুরুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ধোকা-প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে, পুরুষটির ইচ্ছা শক্তির ওপরে

নিজের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে থাকে। এসব ক্ষতি থেকেও আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। যাদু করা আল্লাহর কোরআনের ভাষায় সুস্পষ্ট কুফরী। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যাদুকরা হলো পরকাল বিনষ্টকারী কুফরী কাজ। এই কাজ করা কবীরা গুনাহ্।

হিংসুকের হিংসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বনু আবদে মনাফ গোত্র থেকে নবী নির্বাচিত করলেন, এ কারণেও মক্কার বিভিন্ন গোত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের ধারণা ছিল, নবী আসবে তাদের গোত্রের ভেতর থেকে। ফলে তারা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে। খোদ আবু জেহেল ছিল এই প্রকৃতির লোক। এই লোকটি যে কোন ব্যাপারে তার গোত্রকেই প্রাধান্য দিতো এবং তার গোত্র সবার ওপরে স্থান লাভ করুক, এই চেষ্টাই সে করতো।

বনু আবদে মনাফ বংশ থেকে আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূল নির্বাচিত করলেন, এই হিংসা আবু জেহেল গোপন রাখতে পরেনি। নিজের বংশ গৌরব করে সে বলেছিল, বনু আবদে মনাফ এবং আমাদের মধ্যে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজ করতো। তারা বিশাল আয়োজন করে লোকদেরকে দাওয়াত খাওয়ালে আমরাও অনুরূপ করতাম। কোন পথিক বা কাফেলার জন্য তারা কোন বাহনের ব্যবস্থা করে দিলে আমরাও তাই করতাম। এভাবে আমরা ও বনু আবদে মনাফ সম্মান-মর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে সমান হয়ে গেলাম, তখন তারা দাবী করলো, আমাদের বংশে একজন নবী আছেন, যাঁর কাছে আকাশ জগৎ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়। এ ব্যাপারে আমরা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হলাম। এখন আমরা কিভাবে তাদের সাথে সমকক্ষতার দাবী করতে পারি! আল্লাহর শপথ! আমরা কোনভাবেই তাদের নবীকে মানবো না এবং তাকে সত্য বলে স্বীকৃতিও দেবো না।

এই হিংসুক মনোভাবাপন্ন লোকগুলো একমাত্র নিজের ব্যতীত অন্যের ভালো কামনা করে না। এই হিংসার আগুন পরিবার, সমাজ ও দেশকে এক মারাত্মক বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে। সমাজের লোকগুলো তাদের পছন্দানুসারে কাউকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলো, প্রতিপক্ষ হিংসায় জ্বলে উঠে পরিকল্পিতভাবে গোটা সমাজে এক বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করে এ কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করলো যে, যাকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছে, সেই লোকটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার কারণেই সমাজে এই বিপর্যয়কর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

হিংসার প্রকৃতি ও ধরন যেমনই হোক না কেন এবং যারাই হিংসা করুক না কেন, হিংসুকের হিংসার আগুনের ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে হবে। সেই সাথে মহান আল্লাহর ওপরেই নির্ভর করতে হবে, তাঁরই ওপরে ভরসা করতে হবে যে, আল্লাহ যতক্ষণ না চাইবেন, ততক্ষণ এমন কোন শক্তি নেই যে, তার কোন ক্ষতি কেউ করে। হিংসুকের হিংসা অসীম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে এবং নিজের চারিত্রিক মাধুর্যতা দিয়ে হিংসুকের স্বভাব-চরিত্র পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করতে হবে যেন, হিংসুক ব্যক্তির মন থেকে আল্লাহ তা'য়ালা হিংসা মুছে দেন। হিংসুকের ভেতর থেকে হিংসা দূরিকরণের যাবতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করার পরও যদি হিংসুক হিংসা করতেই থাকে, তাহলে এ জন্য পেরেশানীতে না ভুগে একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

বাংলা অনুবাদ

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে--

রুকু ১

(১) (হে নবী) তুমি বলো, আমি আশ্রয় চাই-মানুষের মালিকের কাছে। (২) (আমি আশ্রয় চাই) মানষের (আসল) বাদশাহর কাছে, (৩) (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের মা'বুদের কাছে। (৪) (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে, যে (প্ররোচনা দিয়েই) গা ঢাকা দেয়। (৫) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। (৬) জ্বিনদের মধ্য থেকে (হোক মানুষদের মধ্য থেকে) হোক-তাদের অনিষ্টের হাত থেকে (আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় চাই)।

সূরা আন-নাস

মক্কায় অবতীর্ণ-পবিত্র কোরআনের সূরার ক্রমিক নং-১১৪

শানে নযুল ও সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়ঃ-এই সূরার প্রথম আয়াতে 'নাস' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং উক্ত শব্দটিকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সূরা ফাল্যাক ও সূরা নাস মক্কায় একই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সূরা দুটোর বিষয়বস্তু, বক্তব্য এতটাই অভিন্ন যে, এই সূরা দুটোকে একত্রে 'মুয়া'ওবিযাতাইন' বলা হয়। এর অর্থ হলো, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দুটো সূরা। যদিও কোন কোন গবেষক এ দুটো সূরাকে মাদানী নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সূরা দুটোর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কোরআনের অধিকাংশ গবেষক বলেছেন, এ দুটো সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরার মূল বিষয়বস্তু ও আলোচিত বিষয়ও সূরা ফালাকের অনুরূপ।

আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা

আলোচ্য সূরার প্রথম তিন আয়াতে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে, আশ্রয় চাইতে হবে তাঁর কাছে **যিনি মানুষের রব**। যিনি মানুষের বাদশাহ এবং মানুষের ইলাহ। এখানে মহান আল্লাহর তিনটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষেরই শুধু নন, গোটা সৃষ্টিলোকের রব। তিনি সৃষ্টিই শুধু করেননি, যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, পথপ্রদর্শন করেছেন, প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। মানুষকে সুন্দর কাঠামোয় সৃষ্টি করে তাকে যে পৃথিবীতে রাখা হয়েছে, সেই পৃথিবীকে তিনি বসবাসের উপযুক্ত করে গড়েছেন। মানুষর যাবতীয় প্রয়োজন তিনিই পূরণ করছেন। তিনিই মানুষের

প্রতিপালনকারী, মানুষের মালিক ও মনিব। সুতরাং মানুষ যে কোন প্রয়োজনে একমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় কামন করবে।

তিনি মালিকিন্নাস–মানুষের বাদশাহ, শুধু বাদশাহ-ই নন-একচ্ছত্র বাদশাহ। মানুষের জীবন পরিচালনের ক্ষেত্রে যেসব আইন, কানুন ও বিধানের প্রয়োজন, সে প্রয়োজন তিনিই পূরণ করেন। তিনি মানুষের নিরঙ্কুশ শাসক। গোটা সাম্রাজ্যের তিনিই একমাত্র অধিপতি। তাঁর সার্বভৌমত্বে কারোই অংশ নেই।

তিনি ইলাহিন্নাস–মানুষের একমাত্র ইলাহ। তিনিই দাসত্ব লাভের অধিকারী, অন্য কেউ নয়। মানুষ শুধুমাত্র তাঁরই বন্দেগী, ইবাদাত, দাসত্ব, উপাসনা ও আরধনা করবে। তাঁরই সামনে মস্তক অবনত করবে, তাঁরই কাছে নিজেকে নিবেদন করবে, সাহায্য কামনা করবে, যে কোন অবস্থায় তাঁরই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাইবে। আল্লাহর কোরআনে ইলাহ শব্দটিকে দুটো অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব বস্তু দাসত্ব, ইবাদাত, বন্দেগী, উপাসনা বা আরধনা লাভের উপযুক্ত নয় কিন্তু মানুষ সেসব বস্তুকে ইলাহ্-এর আসনে আসীন করে তার সামনে মাথানত করে, তাদের কাছে সাহায্য চায়, নিজের মনের কামনা বাসনা পেশ করে, তাদেরকে শক্তির উৎস মনে করে। অথবা দেশের প্রচলিত আইন-কানুন যা মানুষ অনুসরণ করে। এগুলোকেও ইলাহ বলা হয়েছে। এগুলোকে এ জন্য ইলাহ বলা হয়েছে যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহর সামনেই মাথানত করবে এবং একমাত্র তাঁরই আইন-কানুন অনুসরণ করবে। কিন্তু তা না করে ভিন্ন কোনো সত্তার সামনে যখন মাথানত করলো, ভিন্ন কারো আইন-কানুন মেনে চললো, তখন তাকেই ইলাহ্-এর সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হলো।

অথচ এসব কিছুর অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। ইবাদাত, বন্দেগী, দাসত্ব, উপাসনা ও আরধনা লাভের হকদার একমাত্র আল্লাহ্ ছুবহানাহু তা'য়ালা। মানুষ তাঁকে ইলাহ বলে মানুক আর না-ই মানুক, তিনিই ইলাহ। পবিত্র কোরআনে যেখানে আল্লাহ তা'য়ালাকে ইলাহ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এই দ্বিতীয় অর্থেই উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই আইন অনুসরণ করতে বাধ্য। তিনি গোটা সৃষ্টি জগতে যে নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা অনুসরণ করতে এবং তার অধীনে জীবন-যাপন করতে সমস্ত সৃষ্টি বাধ্য এবং এ জন্যই একমাত্র তাঁকেই ইলাহ হিসাবে কবুল করে মানুষ তাঁরই সামনে মাথানত করবে, তাঁর কাছেই আশ্রয় কামনা করবে এবং তাঁরই দাসত্ব করবে। তিনিই ইলাহ–তিনি ব্যতীত অন্য কোন শক্তি নেই, যে শক্তি মানুষকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে, কোন সৃষ্ট বস্তুর বা শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজত করতে পারে। মানুষ কোন্ অনিষ্টকর শক্তির অনিষ্ট থেকে আপন রব্ব, মালিক ও ইলাহ্-এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে।

৪ থেকে ৬ নম্বর আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, আশ্রয় চাও সেই সব কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট থেকে, যারা ধারাবাহিকভাবে কুমন্ত্রণা দিতেই থাকে এবং কুমন্ত্রণা দিয়েই আড়ালে চলে যায়। যেসব শক্তি মানুষের চিন্তা-চেতনার জগতে প্রভাব বিস্তার করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। জ্বিনদের মধ্যে যারা কুমন্ত্রণা দেয় এবং মানুষদের মধ্যেও যারা কুমন্ত্রণা দেয়।

শয়তান মানুষের সামনে মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে তুলে ধরে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে। এই কাজটি সে একবার করেই চলে যায় না, বার বার করতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ নিষিদ্ধ কাজটি মানুষটির দ্বারায় সংঘটিত করাতে

সক্ষম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। সৃষ্টির শুরু থেকেই ইবলিস শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর ধোকা ও প্রতারণার জালে যেসব জ্বিন ও মানুষ নিপতিত হয়েছে, তারাও শয়তানের অনুরূপ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের ভেতরে সৃষ্টিগতভাবে যে অসৎ প্রবণতা রয়েছে, তাকে উস্কে দিয়ে পথভ্রষ্ট করাও ইবলিস শয়তানের কাজ। ইবলিসই শুধু শয়তান নয়, জ্বিনের মধ্যে যেমন শয়তান রয়েছে, মানুষের ভেতরেও অনুরূপ শয়তান রয়েছে এবং মানুষের সত্তার ভেতের রয়েছে শয়তানি শক্তি। এই চার ধরনের শয়তান মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে থাকে।

সূরা আনআমে বলা হয়েছে, জ্বিনের মধ্যে এবং মানুষের ভেতরে শয়তান রয়েছে, তারা আকর্ষণীয় কথাবার্তা ও ধোঁকা-প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে। নাসায়ী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আবুযার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি মসজিদে আল্লাহর রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি নামাজ আদায় করেছি কিনা। আমি জানালাম এখন পর্যন্ত করিনি। তিনি আদেশ দিলেন নামাজ আদায় করার জন্য। আমি তাঁর নির্দেশ অনুসারে নামাজ আদায় করার পর তিনি আমাকে বললেন, হে আবুযার! মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানের ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও। আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যেও আবার শয়তান হয় নাকি? আল্লাহর রাসূল বললেন, হ্যাঁ।

আলোচ্য সূরারও শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস' অর্থাৎ মানুষ এবং জ্বিনের মধ্যেও শয়তান রয়েছে। একদিকে মানুষের দেহ সত্তার ভেতর থেকে মানুষকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করার লক্ষ্যে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, অপরদিকে ইবলিস শয়তান, জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান আল্লাহর বান্দাহ্দেরকে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ শয়তান হলো তারাই, যারা আল্লাহর বিধান থেকে অন্যান্য মানুষকে দূরে রাখার লক্ষ্যে নানা পথ ও মত তৈরী করেছে এবং সেই পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে। নানা সমস্যায় নিপতিত মানুষের সামনে মুক্তির পথ হিসাবে এমন সব মতবাদ, মতাদর্শ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে, যা মহান আল্লাহর বিধানের বিপরীত।

ধর্মের নামে বাতিল পথ ও মত তৈরী করে তার ওপরে ইসলামের খোলস চড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যেন কোরআনের জ্ঞান বিবর্জিত সাধারণ মানুষ এটাকেই আসল ইসলাম মনে করে তা অনুসরণ করতে থাকে এবং প্রকৃত ইসলামের সাথে বিরোধিতা করে। যারা আল্লাহর দেয়া বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জান-মাল কোরবানী করে দ্বীনি আন্দোলন করছে, তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলোয় এমন ধরনের প্রচারণা চালানো হচ্ছে, যেন সাধারণ মানুষ ধোঁকা ও প্রতারণায় নিপতিত হয়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকগুলো সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। নানা ধরনের বই-পত্র, নাটক-সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে সত্যের বাহকদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব কাজ একবার মাত্র করেই তারা বিরত হচ্ছে না। আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, এরা বার বার সেই একই কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

সত্যের বাহকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ এবং প্রচারণা বার বার প্রচার করতে থাকে। ক্রমাগত একই কথা বার বার শুনতে শুনতে মানুষ প্রভাবিত হয়, মিথ্যাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এই ঘৃণ্য পথই অবলম্বন করে থাকে আল্লাহর বিধানের শত্রুরা। শয়তান এসব কাজে তার মানুষ মুরীদদেরকে নিয়োজিত করেছে। আর সে স্বয়ং সত্যের বাহকের ভেতরে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে, 'তোমার বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে, এর প্রতিবাদ তোমাকে করতেই হবে, নতুবা সাধারণ মানুষের ভেতরে তোমার বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে। অথবা তোমার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ যেসব অস্ত্র ছুড়ে দিচ্ছে, তোমাকেও অনুরূপ অস্ত্র ছুড়ে দিতে হবে।'

শয়তানের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকটি বা গোষ্ঠী যেন তাদের আসল কাজ বন্ধ রেখে প্রতিপক্ষের সাথে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। নিজের যাবতীয় শক্তি দাওয়াতী কাজ থেকে ফিরিয়ে এনে শত্রু পক্ষের উত্থাপিত মিথ্যা অপবাদ আর অভিযোগের জবাব দেয়ার কাজে নিয়োগ করে। শত্রু পক্ষ যে নোংরা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, সেও যেন সেই একই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবেই কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকগুলোকে সত্য প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব পালনে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে থাকে। শয়তান কিভাবে কোন পথে এবং কোন পদ্ধতিতে ঈমানদারকে তার প্রকৃত দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে, তা অনুধাবন করতে হবে এবং মহান আল্লাহর কাছে শয়তানের এসব কুমন্ত্রণা থেকে পানাহ্ চাইতে হবে। সত্যের বাহক যখন আল্লাহর কাছেই আশ্রয় কামনা করবে, তখন মিথ্যা শক্তির মোকাবেলা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা করবেন।

এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকগুলোর ওপরে শয়তান যেভাবে আক্রমণ পরিচালিত করে, সেভাবে নামাজ-রোজা পালনকারী সাধারণ কোন মানুষের ওপরে সে আক্রমণ করে না। কারণ শয়তান জানে, নামাজ-রোজা পালনকারী সাধারণ লোকটি শুধুমাত্র নিজেই নামাজ-রোজা পালন করছে, অন্যদেরকে সে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে না এবং সমাজ ও দেশের বুক থেকে যাবতীয় অন্যায়-অসত্য, অবিচার-অনাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে কাজ করছে না। সুতরাং নামাজ-রোজা পালনকারী সাধারণ এই লোকটির দ্বারা শয়তানের সাম্রাজ্যে সামান্যতম ক্ষতি হবারও কোন আশঙ্কা নেই-অতএব তার ওপরে চতুর্মুখী আক্রমণ করারও কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যে লোকটি নিজে নামাজ-রোজাসহ আল্লাহর অন্যান্য বিধান অনুসরণ করছে, অন্যকে সেই পথে আহ্বান জানাচ্ছে, সে যে পরিবেশে বাস করছে সেই পরিবেশকে আল্লাহর রঙে রঙিন করার চেষ্টা করছে এবং সমাজ ও দেশের বুকে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জান-মাল ব্যয় করে আন্দোলন করছে, এই লোকটির ওপরে শয়তান চতুর্মুখী আক্রমণ করে থাকে। কারণ এই লোকটিই তার সবচেয়ে বড় শত্রু, কারণ এই শত্রুই তার শয়তানী সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই শ্রেণীর লোকগুলোকে শয়তান সাধারণের তুলনায় ভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে ধোকা দিয়ে থাকে। এদেরকে শয়তান সরাসরি কোনো বড় ধরনের পাপের দিকে আমন্ত্রণ জানায় না। কারণ সে জানে, বড় ধরনের পাপের দিকে তাকে আমন্ত্রণ জানালে লোকটি ধরে ফেলবে যে, তাকে শয়তান ধোকা দিচ্ছে। এ জন্য প্রথমে সে ছোট ছোট পাপের কাজ তাকে দিয়ে করানোর চেষ্টা করে থাকে। দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে অলসতা ধরিয়ে দেয় অথবা সাংসারিক

এমন কোনো সমস্যাকে তার সামনে বড় করে তুলে ধরে যে, তার পক্ষে সেই মুহূর্তে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করা অসম্ভব করে তোলে। অথবা যে নফল ইবাদাত সে স্বভাবে পরিণত করেছে, সেই নফল ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাকে ধারণা দেয়, এটা নফল কাজ, সুতরাং না করলেও চলবে। অর্থাৎ ছোট্ট সওয়াবের কাজ থেকে তাকে দূরে রাখার চেষ্টা করে এবং ছোট্ট ছোট্ট পাপের কাজে তাকে জড়িয়ে ফেলে। এভাবে ক্রমশ তার ঈমানকে দুর্বল করে দ্বীনের মূল কাজের ব্যাপারে তাকে অকর্মণ্য করে তোলে।

ময়দানে যখন ঈমানদার আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় থাকে, তখন শয়তানী শক্তি তার ওপরে চতুর্মুখী আক্রমণ চালায়। তার বিরুদ্ধে প্রতিদিনই ধারাবাহিকভাবে পত্র-পত্রিকায় বিশালাকের প্রবন্ধ লেখা হতে থাকে, ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় প্রচারণা চলতে থাকে, অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়, নানা ধরনের প্রচারণা পত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ সাম্ভাব্য যাবতীয় পদ্ধতি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। শয়তান এই সুযোগে সত্যের বাহককে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে যে, 'তোমার বিরুদ্ধে একরাশ মিথ্যা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এখন যদি তুমি নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করো, তাহলে দেশের সাধারণ জনগণ তোমাদেরকে শক্তিহীন দুর্বল আর কাপুরষের দল মনে করবে। আর এ কথা তো অবশ্যই সত্য যে, দেশের জনগণ সব সময় শক্তিশালী দলকেই পছন্দ করে থাকে। সুতরাং নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করো না। ছোবল না দিলেও ফোঁস করে উঠতে তো দোষ নেই। অতএব একটু ফোঁস করে ওঠো।'

শয়তান এবাবে কুমন্ত্রণা দিয়ে মহাসত্যের বাহকদেরকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং সংঘাত-সংঘর্ষে নিক্ষেপ করে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে দিয়ে শক্তি ক্ষয় করাতে থাকে। এভাবে নানা পদ্ধতিতে ও কৌশলে শয়তান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করে থাকে। এই ঈমানদারদের করণীয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ-وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ-

বলো, হে আমার রব! আমি শয়তানগুলোর উত্তেজনা ও উস্কানি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমনকি হে পরোয়ারদেগার! সে আমার কাছে আসুক এ থেকেও আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (সূরা মুমিনুন-৯৭-৯৮)

শয়তান যখন দেখতে পায় যে, সত্য আর মিথ্যার সংগ্রামে সত্যপন্থীরা ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে হীনতা এবং সুকৃতির মাধ্যমে দুষ্কৃতির মোকাবেলা করা হচ্ছে, তখন সে চরম অস্বস্তির মধ্যে নিপতিত হয়। এ সময়ে শয়তান যে কোনোভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদের দ্বারা কোন খারাপ কাজ সংঘটিত করে এ কথাই সাধারণ মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, 'তোমরা দেখতে থাকো। খারাপ কাজ বা কথা শুধু আমরাই বলি না। যারা নিজেদেরকে সৎ এবং আল্লাহভীরু বলে দাবী করে, তারাও আমাদের থেকে কোন অংশে কম নয়।' এ জন্য সত্যের বাহকদেরকে মনে রাখতে হবে যে, এক পক্ষের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি এবং অপর পক্ষের জবাবী তৎপরতার মধ্যে ইনসাফের সাথে তুলনামূলক বিচারের যোগ্যতা সাধারণ মানুষের ভেতরে থাকে না। যতক্ষণ তারা দেখে বিরোধী পক্ষ যে কোন ধরনের হীন ও জঘন্য আচরণ করছে কিন্তু সত্যের বাহক লোকগুলো ভদ্রতা ও শিষ্টাচার এবং সত্যের পথ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপরে তার গভীর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যদি তাদের পক্ষ থেকে কোন অযৌক্তিক বা সত্যের বাহকদের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী কোন আচরণ করা হয়, সে আচরণ কোন বড় ধরনের অবিচারের বিপরীতে করা হলেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে উভয় দলই সমান হয়ে যায়। সেই সাথে বিরোধী পক্ষও সাঁড়াশী আক্রমণ করার অজুহাত পেয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানের ধোকা থেকে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য বলেছেন-

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ-اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা অনুভব করতে পারো তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন। (সূরা হামীম সাজদাহ্-৩৬)

শয়তান অত্যন্ত দরদী বন্ধু সেজে ধোঁকা দিতে থাকে যে, 'তোমাদের প্রতিপক্ষ যে অত্যাচার করছে, তা কোনক্রমেই সহ্য করা উচিত নয়। তোমরা যদি এর প্রতিশোধ গ্রহণ না করো, তাহলে তোমরা প্রভাবহীন হয়ে পড়বে।' শয়তানের এই ধোকা অনুভব করতে পারলে ঈমানদার হয়তো চিন্তা করে থাকে যে, 'শয়তান আমাকে ধোকা দিয়ে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমি তার ধোকা অনুভব করতে পেরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি, এখন শয়তান আমাকে দিয়ে কোন অঘটন ঘটাতে সক্ষম হবে না।' মনে এই কথা উদয় হওয়ার অর্থও শয়তানের আরেকটি ধোকা। এ জন্য যে কোন অবস্থায় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতে হবে। প্রতিপক্ষ যখন প্রচন্ড বিরোধিতা শুরু করে, তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার পর যে বিষয়টি ঈমানদারদের মনে প্রশান্তি, ধৈর্য ও তৃপ্তি এনে দেয়, তাহলো সে এ কথা অনুভব করে যে, আমার সাথে যা করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে আমার আল্লাহ অনবহিত নন। তিনি সমস্ত কিছুই দেখছেন।

প্রতিপক্ষের কাছ থেকে যতো মিথ্যা অপবাদ, অভিযোগ, নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, যতোই ষড়যন্ত্র করা হোক না কেন, সবই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে কৌশলের সাথে পথ অতিক্রম করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কঠোরতা, রূঢ় আচরণ, তিক্ত কথাবার্তা ও প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ড দ্বীনি আন্দোলনের কাজের পক্ষে মারাত্মক বিষের মতোই কাজ করে। এসব বিষয় আন্দোলনের কাজ ব্যবহত করে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'আমার আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি ক্রোধ ও সন্তোষ উভয় অবস্থাতেই ইনসাফের কথা বলবো। যে আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবো। যে আমার ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেবে, আমি তাকে তার হক আদায় করে দেবো। যে আমার ওপরে অত্যাচার করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।' আল্লাহর রাসূল যাঁদেরকে দাওয়াতী কাজে প্রেরণ করতেন, তাদেরকে তিনি বলতেন, 'তোমরা যেখানেই যাও, সেখানেই তোমাদের উপস্থিতি যেন লোকদের আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ঘৃণা ও অসন্তোষের কারণ যেন না হয়। মানুষের জন্য শান্তি ও সহজতা বিধান করাই তোমাদের কর্তব্য, সঙ্কীর্ণতা ও কঠোরতা কারো জন্যই করবে না।'

সত্যের বাহকগণ তখনি সফলতা অর্জন করবে, যখন তারা জটিল কথাবার্তার অবতারণা না করে মানুষদেরকে সহজ-সরল কথার মধ্য দিয়ে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান জানাবে। যে কথা সহজবোধ্য তাই মানুষকে শোনাতে হবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যারা বাধার সৃষ্টি করে, তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যর্থতা এবং দ্বীনি আন্দোলনের সাফল্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে

দেয়। কারণ সাধারণ মানুষ যতোই হিংসা বিদ্বেষের মধ্যে নিমজ্জিত থাক না কেন, তারা যখন দেখতে পায় যে, একদিকে ভদ্র মার্জিত ও উন্নত চরিত্রের লোকগুলো পরম সত্য ও কল্যাণময় কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে আর অপরদিকে বিরোধিরা বিরোধিতা করতে গিয়ে সাধারণ নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে নিকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করছে, তখন ক্রমশ সাধারণ মানুষের মনে আল্লাহর বিধান বিরোধিদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং সত্যের বাহকদের প্রতি মমতা জাগে।

বিরোধিদের অত্যাচার, অপকর্ম ও মূর্খতাব্যঞ্জক আপত্তি-অভিযোগের কারণে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী যদি নিজের মন-মানসিকতায় কোন ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে, তখন সাথে সাথে তাকে এ কথা স্মরণ করতে হবে যে, এটা শয়তানের প্ররোচনা এবং তখনি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা যেন তাঁর বান্দাহ্কে এই শয়তানী প্ররোচনার প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া ও শয়তানের প্রভাবে আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর কোন অশোভন কাজ করা থেকে হেফাজত করেন। এ কথা সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে যে, আবেগ উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নয়-দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ অত্যন্ত শান্ত পরিবেশে ও ঠান্ডা মন-মানসিকতার সাথে আঞ্জাম দিতে হয়। পরিবেশ পরিস্থিতিকে খুবই ভালোভাবে বুঝে এবং বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করে শান্ত মনে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

পক্ষান্তরে শয়তান যেহেতু এই কল্যাণকর কাজের সুষ্ঠুতা ও উন্নতি কখনোই সহ্য করতে পারে না, এ জন্য শয়তান স্বয়ং এবং তার মুরীদদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামীদের ওপর নানাভাবে আক্রমণ করে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুপ্রেরণা দিতে থাকে। এ ধরনের যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যই সূরা ফালাক ও সূরা নাসের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অনুগত বান্দাহ্দেরকে একান্তভাবে তাঁরই কাছে আশ্রয় কামনা করতে আদেশ দিয়েছেন।

❁

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ ط اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً ط اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আল্লাহ, আমায় কবরে আমার একাকীত্বের ভয়াবহতার সময় তুমি আমাকে কোরআনের আলো দিয়ে প্রশান্তি দান করো। হে আল্লাহ, কোরআন দিয়ে তুমি আমার ওপর দয়া করো, কোরআনকে তুমি আমার জন্যে ইমাম, নূর, পথপ্রদর্শক ও রহমত বানিয়ে দিয়ো। হে আল্লাহ, আমি এর যা কিছু ভুলে গেছি তা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিয়ো, যা কিছু আমি-আমার জ্ঞান থেকে হারিয়ে ফেলেছি তার জ্ঞান তুমি আমায় প্রদান করো, তুমি আমাকে দিবানিশি এর তিলাওয়াতের তাওফীক দিয়ো। হে সৃষ্টিকুলের মালিক, তুমি এই কিতাবকে আমার জন্যে চূড়ান্ত দলিল বানিয়ে দিয়ো। আমীন ! আমীন !! ✶

গ্রন্থপঞ্জি

١- تفسير الجامع الاحكام القران

٢- تفسير جامع البيان

٣- تفسير درالمنثور

٤- تفسير فتح القدير

٥- تفسير قرطبى

٦ -تفهيم القران

٧- فى ظلال القران

٨- تفسير ابن كثير

٩- تفسير روح المعان

١٠- تفسير روح البيان

١١- تفسير البغوى

٢١- تفسير الفخر الرازى

٣١- تفسير الطبرى

٤١- بخارى

٥١- مسلم

٦١- ابوداؤد

٧١- ترمذى

٨١- ابن ماجه

٩١- نسائ

٢٠- البيهقى

١٢- رياض الصالحين

٢٢- طبرانى

٣٢- مسند احمد

٤٢- الرض القران

٥٢- زاد المعاد

26. Siratun-Nababiya by Abul Hasan Ali Nadvee.

27. Siratun-Nabee by Allama Shibli Noomani.

28. Al-Zihad by Allama Moududee.

29. Sirat-A-Sarwar-e-Alam by Allama Moududee.

30. The Life of Muhammad by Muhammad Hosain Heykal.

31. Encyclopeadia of Religion and Ethics

32. Al-Quran the Ultimate Miracle by Ahmed Deedat.

33. The Expanding Universe by John Gribbin.

34. Stars and Planets by Ian Ridpath.

35. Space Time Physics-Edwin F. Taylor, John Archibald Wheeler.

36. Light Upon Light by Ferdous Khan.

37. Nature, Spirituality and Science by Sukhraj Tarneja.

38. Dawn of A New Era by Sir Barnard Lovell.

39. The Study of The Physical World-Cheronis, Parsons & Ronneberg.

40. The Story of our Earth by Richard Carrington.

41. The Stars by Roger Hall.

42. The Solar Family by Peter Francis.

43. The Origin of Man by Dr. Maurice Bucaile.

44. Astronomy The Cosmic Journey by W. k. Hartman.

45. Biological Science by D. E. Meyer and R. Buchanan.

46. Medical Embryology for Medical colleges.

47. The Creation of the Universe by G. Gamow.

48. The Life and Death of Stars by Geoffery Bath.

49. The Framework of the Stars by Nigel Henbest.

50. To the Edge of Eternity by John Gribbin.

51. A Brief History of Time by Stephen Hawking.

52. Galaxies and Quasars by William J. Kaufmann.

তাফসীরে সাঈদী
আমপারা
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী